ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী

মধ্যপ্রাচ্যঃ অতীত ও বর্তমান

মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক
অনূদিত

বাংলা একাডেমী : ঢাকা
বাংলা একাডেমী : ঢাকা

ডিসেম্বর, ১৯৭১

বাএ ৯৮৭

পাণ্ডুলিপি : অনুবাদ বিভাগ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রকাশক
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ,
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর
এস. খান
শাহজাহান প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৯৭/২, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা—২

প্রচ্ছদ : কাইয়ুম চৌধুরী

মূল্য : ষাট টাকা

MADHYAPRACHYA : ATIT O BARTAMAN—Bengali translation of Yahya Armajani's Middle-East Past & Present. Translated by Muhammad Enam-ul Huq. Published by Bangla Academy, Dacca, Bangladesh. Price : Taka 60·00 only.

অনুবাদকের কথা

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলা ভাষা চালু করিবার ফলে মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাকলেস্টার কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ইয়াহইয়া আরমাজানী প্রণীত 'Middle East Past & Present' গ্রন্থখানি বাংলায় অনুবাদ করা হইল। মাতৃভাষায় গবেষণামূলক গ্রন্থ সহজলভ্য করিবার জন্য বাংলা একাডেমী বিশ্ববিদ্যালয়-সমূহের শিক্ষকবৃন্দের পরামর্শ অনুযায়ী এই গ্রন্থ অনুবাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বস্তুতঃ বাংলাভাষায় ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের উপর গবেষণা চালাইতে হইলে প্রাথমিকভাবে এই ভাষায় বিভিন্ন উপকরণ ও উপাদানের প্রয়োজন; অথচ বাংলাভাষায় এই ধরনের গ্রন্থ বিরল। মধ্য-প্রাচ্যের আধুনিক ইতিহাসের উপর অনুবাদ হইলেও, এই গ্রন্থখানিই সম্ভবতঃ বাংলাভাষায় প্রথম পুস্তক। ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষায় যথেষ্ট গবেষণামূলক গ্রন্থ রহিয়াছে। সেই গ্রন্থগুলি অনুবাদ করিয়া লইতে পারিলেও বাংলাভাষায় গবেষণার কাজ সহজতর হইবে। তাই এই ব্যাপারে বাংলা একাডেমীর উদ্যোগ যথার্থই প্রশংসনীয়।

বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অবসরপ্রাপ্ত ইরানী অধ্যাপক ইয়াহইয়া আরমাজানী ত্রিশ বৎসর যাবৎ মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস শিক্ষা দান করেন, তাই অত্র অঞ্চলের ইতিহাস বিষয়ক খুঁটিনাটি বিষয়ে তাঁহার গভীর জ্ঞান রহিয়াছে। আধুনিক মধ্যপ্রাচ্যের উপর তাঁহার সন্নিবেশিত তথ্যাবলী অতি প্রাঞ্জল ও ধারাবাহিক। বিভিন্ন খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর তিনি যথার্থ ও সমুচিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। গতানুগতিক ইতিহাস পরিহার করতঃ তিনি মধ্যপ্রাচ্যের সাধারণ মানুষ যাহা চিন্তা করে তাহাই পাঠকের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তবে মধ্যপ্রাচ্যের অতীত ইতিহাস, বিশেষতঃ খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগ সম্পর্কে লেখক কর্তৃক বিবৃত মতামতের সহিত সবাই একমত নাও হইতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় খলিফা হযরত

ওমরের সমস্ত কার্যক্রমকে তিনি ইরানী দৃষ্টিভঙ্গীতে যাচাই করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইসলাম যেহেতু তখন প্রায় সম্পূর্ণভাবে আরবীভাষী লোকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সেহেতু তৎকালে ইসলামের জন্য কৃত সমস্ত কাজই আরবীয় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এই ব্যাপারে তিনি মোটামুটিভাবে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের মতানুসারী বলিয়া মনে হয়। তবে ইহাও বোধহয় অসত্য নহে যে কোন কোন আরব সেনাপতি অনারব ভূমিতে কিছুটা বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। যুদ্ধের ডামাডোলে কোন সভ্যতা বা জনপদ ধ্বংস হওয়া এক কথা। নিয়মিত কর্মপন্থা গ্রহণ করিয়া সভ্যতা ধ্বংস করা আরেক কথা। উদাহরণস্বরূপ দশম শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আল-বিরুনীর একটি বিবরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। উমাইয়া খলিফা প্রথম ওয়ালিদের সেনাপতি কুতাইবা আল-বিরুনীর জন্মভূমি খোরেজম ধ্বংস করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "খোরেজমী লিপির লেখক, শিক্ষক ও খোরেজমী ভাষাতাত্ত্বিক সবাইকে কুতাইবা নিহত করে খোরেজমী সংস্কৃতির নামগন্ধ নিশ্চিহ্ন করে দিলেন; খোরেজমের জ্ঞানী পণ্ডিতদেরকে হত্যা করে সমস্ত লিখিত পুস্তকাদি পুড়িয়ে ও সমস্ত লিপি-চিহ্ন ধ্বংস করে দেওয়ার ফলে খোরেজমের লোক সবাই নিরক্ষর হয়ে রইল এবং স্মৃতির উপর নির্ভর করা ছাড়া তাদের আর গত্যন্তর রহিল না।"* আল-বিরুনী আরও বলেন: "আবদুল্লাহ্ বিন মুসলিম একটি বই লিখেছেন আরবেতর ইরানীদের উপরে আরবদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করার উদ্দেশ্যে। তাতে তিনি বলেছেন, নক্ষত্রবিদ্যায় অন্যান্য জাতি অপেক্ষা আরবরা শ্রেষ্ঠ। আমি বুঝতে পারি না তিনি কি সত্যই বিষয়টি জানেন না, না না-জানার ভাণ করছেন। এ রকম উক্তি থেকে ইরানীদের বিরুদ্ধে তাঁর (আবদুল্লাহ্ বিন মুসলিমের) আক্রোশই প্রমাণিত হয়। আরবদের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করার জন্য ইরানীকে হীন ও ঘৃণ্য জাতি বলে উপস্থাপিত করতে হবে; তাদেরকে কাফির, ইসলাম বিরোধীও বলতে হবে এবং সেইসব দোষ তাদের উপর আরোপ করতে হবে যে সব দোষের জন্য কোরানে বেদুঈন আরবদেরই নিন্দা করা হয়েছে।" *

---

* অধ্যাপক আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্ অনূদিত আল-বিরুনীর ভারত তত্ত্ব গ্রন্থের অনুবাদকের ভূমিকা-পৃ: ২৩।

অবশ্য ইহাও সত্য যে সেনাপতি কুতাইবা কর্তৃক আল-বিরুনীর জন্মভূমি খোরেজম ধ্বংস করিবার কারণ সম্পর্কে তিনি কিছুই উল্লেখ করেন নাই। মধ্য এশিয়ার সঘদিয়ানদের সহিত মুসলমান বিজয়ীদের এক চুক্তি হয়। সেই চুক্তি অনুসারে সঘদিয়ানগণ রীতিমত কর প্রদান-পূর্বক মুসলমানদের আমিলদিগকে সাদরে গ্রহণ করার কথা। কিন্তু কুতাই-বার পূর্ববর্তী ইয়াজীদ বিন মুহাল্লাবের স্থলে কুতাইবাকে মধ্য এশিয়ার সেনাপতি নিযুক্ত করা হইলে সঘদিয়ানগণ তাহাদের চুক্তি ভঙ্গ করতঃ আমিলদিগকে তাড়াইয়া দেয় এবং অনেক মুসলমান বসতিস্থাপনকারীকে হত্যা করে। ফলে কুতাইবা ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ স্থলে ধ্বংসলীলা চালাইয়া এই বিদ্রোহ দমন করেন।* সে যাহাই হউক, কুতাইবা বা এই ধরনের আরব সেনাপতিদের দুর্ব্যবহারের ঘটনা উমাইয়া শাসনামলের ঘটনা। কিন্তু লেখক খোলাফায়ে রাশেদীন ও উমাইয়াদের শাসনব্যবস্থাকে একই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করিয়াছেন।

আধুনিক মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাবলীকে লেখক ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দের আরব-ইসরাইলী যুদ্ধ পর্যন্ত টানিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দের আরব-ইসরাইলী যুদ্ধের সীমান্ত পশ্চিমে সিনাই মরুভূমি অতিক্রম করিয়া সুয়েজ খাল পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। পূর্বে সমগ্র জেরুজালেম দখল করিয়া তাহারা জর্দান নদী বরাবর সীমান্ত টানিয়া আনে। সিরিয়া সীমান্তে তাহারা গোলান পার্বত্য এলাকাসহ বেশ কিছু কৌশলগত এলাকা দখল করে। ইসরাইলের সীমান্তবর্তী আরব রাষ্ট্রবর্গ বেশ কোণঠাসা হইয়া পড়ে। স্বীয় পরাজয়ের গ্লানিতে এবং সৈন্যাধ্যক্ষের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রেসিডেন্ট নাসের পদত্যাগ করেন। কিন্তু প্রবল জনমতের চাপে পড়িয়া পদত্যাগ প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন। ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুল নাসেরের মৃত্যুর পর আনোয়ার সাদাত মিসরের প্রেসিডেন্ট হন। প্রেসি-ডেন্ট আনোয়ার সাদাত ভিন্ন প্রকৃতির লোক। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মিসরীয় সেনাবাহিনীকে বেশ চাঙ্গা করিয়া তোলেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে আরব-ইসরাইলী যুদ্ধে হৃত সমস্ত

* Syed Amir Ali: A Short History of the Saracens, PP.—103, 104.

অস্ত্রশস্ত্রের পরিবর্তে সোভিয়েত রাশিয়া মিসরকে নতুন অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করে। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে ইসরাইলের সহিত আর একটি যুদ্ধে মিসরীয় বাহিনী ইসরাইলী প্রতিরক্ষা-ব্যূহ ভেদ করিয়া সিনাই মরুভূমিতে ঢুকিয়া পড়ে এবং বেশ কিছু এলাকা দখল করিয়া লয়। জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় তথায় অস্ত্রবিরতি হয়। আনোয়ার সাদাত ইসরাইলের সহিত আলোচনায় বসিতে সম্মত হন। আলোচনার মাধ্যমে ইসরাইল সিনাই এলাকা ছাড়িয়া দিতে সম্মত হয় এবং জেনেভায় অনুষ্ঠিতব্য আসন্ন মধ্যপ্রাচ্য সম্মেলনে একটি আপোষরফার সিদ্ধান্ত উভয় পক্ষ মানিয়া লয়। সিরিয়া এই আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে।

এদিকে দক্ষিণ লেবাননে ফিলিস্তিনী মুক্তি সংস্থা বেশ জোরদার হইয়া উঠে। অচিরেই লেবাননের ডানপন্থী খ্রীস্টানদের সহিত ফিলিস্তিনীদের দাঙ্গা আরম্ভ হয়। এই সংঘর্ষে সিরিয়া খ্রীস্টানদের পক্ষ অবলম্বন করে। উনিশ মাস স্থায়ী এই দাঙ্গায় ষাট হাজার লোক প্রাণ হারায়। ফিলিস্তিনী-গণ খ্রীস্টান প্রেসিডেন্ট সুলেমান ফ্রাঞ্জীর পদত্যাগ দাবী করে। লেবাননের সরকারী সেনাবাহিনীর খ্রীস্টান অংশ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলে প্রধানমন্ত্রী রশীদ কারামী ইহার প্রতিবাদে পদত্যাগ করেন। লেবাননের এই গৃহযুদ্ধে খ্রীস্টানগণ কোণঠাসা হইয়া পড়িলে মিসরীয় সেনাবাহিনী তাহাদের সাহায্যে আগাইয়া আসে। বেশ কয়েক-বার যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের পর আরব লীগের মধ্যস্থতায় লেবাননে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন প্রেসিডেন্ট ইলিয়াস সার্কিজ ঘোষণা করেন যে লেবানন মুসলমান ও খ্রীস্টান উভয়েরই মাতৃভূমি। তিনি সশস্ত্র বাহিনী, নিরাপত্তাবাহিনী ও অর্থনীতি পুনর্গঠন সহ নয়া লেবানন গড়িয়া তোলার আহ্বান জানান। প্রেসিডেন্ট সার্কিজ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে অর্থনীতিবিদ সেলিম আল-হোসের নাম ঘোষণা করেন। জনাব হোসের বয়স ৪৬। তিনি লেবাননের শিল্প ও উন্নয়ন ব্যাঙ্কের প্রধান। চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী তিনি সুন্নী মুসলমান। আরব লীগের চার জাতি কমিটি ৭ই জানুয়ারী ১৯৭৭-এর মধ্যে সকল পক্ষকে ভারী অস্ত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত ইসরাইলের সহিত শান্তি চুক্তি

স্বাক্ষর করিতে রাজী। তাঁহার মতে ২৮ বৎসর আগে ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা হইতেই মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করিতেছে। ইহার অবসানকল্পে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করা উচিত। আসন্ন জেনেভা সম্মেলনে সমগ্র আরব বিশ্বের পক্ষ হইতে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণের তিনি পক্ষপাতী। ইসরাইল কিংবা সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে এই শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পর ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দের পরে দখলকৃত আরবভূমি হইতে ইসরাইলী সৈন্য প্রত্যাহার করিবার জন্য প্রেসিডেন্ট সাদাত প্রস্তাব দেন। তিনি জোর দিয়া বলেন যে একটি ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র গঠন করিতেই হইবে। জর্দান নদীর পশ্চিম তীর আর গাজা উপত্যকা এই ভূখণ্ড দুইটিকে একটি করিডোর দ্বারা যুক্ত করিয়া ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব। তবে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ও জর্দানের সম্পর্ক কি হইবে তাহা লইয়া একটি চুক্তির প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিন ফিলিস্তিনী মুক্তি সংস্থার উপস্থিতি মানিয়া জেনেভায় মধ্যপ্রাচ্য সম্মেলনে যোগদানে ইসরাইলের অসম্মতি ঘোষণা করেন। তবে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দে মধ্যপ্রাচ্য প্রশ্নে অর্থবহ আপোষ রফার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাঁহার মতে ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র গঠন করিতে চাহিলে তৎপূর্বে ইসরাইল ও জর্দানের মধ্যে অবশ্যই চুক্তি স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

দামেস্কে ফিলিস্তিনী মুক্তি সংস্থার কেন্দ্রীয় পরিষদের বৈঠকে জর্দান নদীর পশ্চিম তীর এবং গাজা এলাকা লইয়া আপাততঃ স্বাধীন ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অন্যদিকে আসন্ন জেনেভা সম্মেলনে পৃথক পৃথক প্রতিনিধি প্রেরণের স্থলে একটি মাত্র আরব প্রতিনিধিদল প্রেরণ সংক্রান্ত প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের প্রস্তাব সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আসাদ কর্তৃক সমর্থিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যে সঙ্কট নিরসনের প্রারম্ভিক উপায় হিসাবে এই সিদ্ধান্ত এবং সর্বোপরি, দুইদিন পূর্বেও যাঁহাদের মুখ দেখাদেখি প্রায় বন্ধ ছিল, বৃহত্তর স্বার্থে তাঁহাদের ঐকমত্যে পৌঁছান নিঃসন্দেহে একটি অতি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। দুইটি প্রস্তাবে এই সত্যই স্পষ্ট হইয়া উঠে যে, আরবরা সঙ্কট নিরসনে অধিকতর বাস্তব পন্থা অনুসরণে চেষ্টিত। তাহারা ইসরাইলকে অস্বীকার করার স্থলে পারস্পরিক স্বীকৃতির মাধ্যমেই অঞ্চলের শান্তি স্থিতি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী। আরবদের বাস্তব পথ

অনুসরণে প্রেসিডেন্ট সাদাতের অবদান যে সমধিক তাহা অনস্বীকার্য। মধ্যপ্রাচ্যে বৃহৎ শক্তির ডিক্টেশনের প্রতিবাদে তিনিই প্রথম সোচ্চার হইয়াছিলেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মধ্যপ্রাচ্য-সঙ্কট নিরসনে স্বীয় ভূমিকা পালনের সুযোগও প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা অনস্বীকার্য যে, স্বল্প সময়ে এবং একেবারেই মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটের ন্যায় বহু পুরাতন বিরোধ নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব ডঃ কিসিঞ্জারের পর্যায়ক্রমিক শান্তি প্রচেষ্টা সম্ভবতঃ সেই কারণেই সাদাত কর্তৃক সমর্থিত হইয়াছিল, এবং তিনি ইসরাইলের সহিত সমঝোতাভিত্তিক সম্পর্কের মাধ্যমে সুয়েজের পূর্ব তীরস্থ গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল পুনরুদ্ধারে সক্ষম হইয়াছিলেন।

প্রস্তাবিত ফিলিস্তিনী রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের উদ্দেশ্যে আরব কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু হইবার কথা। সিরীয় প্রেসিডেন্ট হাফিজ আসাদের কায়রো আগমনের প্রাক্কালে মিসরীয় পত্রিকা 'আল-আহরাম' এই তথ্য প্রকাশ করে। এই রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভেও সমর্থ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। বলাই বাহুল্য, ইসরাইল ফিলিস্তিনী অধিকার স্বীকার করুক বা না করুক সে অবস্থায় অধিকৃত জর্দান নদীর পশ্চিম তীর এবং অধিকৃত গাজা উপত্যকা প্রত্যর্পণ ব্যতীত গত্যন্তর থাকিবে না এবং জাতিসংঘে ফিলিস্তিনী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তি অধিকতর সহজ হইবে।

অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্রের 'নিউজ উইক' সাময়িকীর সহিত এক সাক্ষাতকারে জাতিসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল কুর্ট ওয়াল্ডহেইম আশা প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দে মধ্যপ্রাচ্য সঙ্কটের সামগ্রিক নিষ্পত্তির সম্ভাবনা উজ্জ্বল। তিনি বলেন, সকল পক্ষই জেনেভা সম্মেলন পুনরায় আহ্বান করিবার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী এবং জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে ও গাজা এলাকায় একটি ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে আরব বিশ্বের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রবণতা পরিলক্ষিত হইতেছে। ফিলিস্তিনীদের পৃথক রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্তকে তিনি বিজ্ঞজনোচিত বলিয়া মনে করেন।

মিসর ও সিরিয়ার তরফ হইতে একটি যৌথ কমাণ্ড গঠনের কথা ঘোষণা করা হয়। উভয় দেশের প্রতিরক্ষা, কূটনীতি, তথ্য, বিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক বিষয় এই যৌথ কমাণ্ডের আওতাধীন থাকিবার প্রস্তাব করা হয়।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সম্প্রতি সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল-আসাদ মিসর সফরে গিয়াছিলেন এবং তাঁহার সেই সফরকালেই মিসর ও সিরিয়ার মধ্যকার এই যৌথ কমাণ্ড গঠনের বিষয়টি স্বাক্ষরিত ও প্রকাশিত হয়। মাত্র কিছুকাল পূর্বেও আরব বিশ্বের অন্যতম প্রধান এই দুইটি দেশ পারস্পরিক বিবাদে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। লেবাননের গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া উভয় দেশের সম্পর্ক এতই তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল যে প্রেসিডেন্ট আসাদ কায়রো শীর্ষ বৈঠক বর্জন করিতেও দ্বিধা করেন নাই। পরিশেষে সৌদী আরবের বাদশাহ খালেদের রাষ্ট্রনায়কোচিত দূরদর্শিতার ও সফল মধ্যস্থতায় মিসর-সিরিয়ার বিবাদের নিষ্পত্তি ঘটে। শুধু তাহাই নহে, এই বিবাদ নিষ্পত্তির ফলে লেবানন-গৃহযুদ্ধের অবসানও ত্বরান্বিত হয়। বলা বাহুল্য, মিসর-সিরিয়া সম্পর্কের উন্নতি ও অবনতি ইতিহাসাশ্রিত। প্রেসিডেন্ট নাসেরের সময় মিসর-সিরিয়া একত্রীকরণের মধ্য দিয়াই একটি "যুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র" রূপ লাভ করিয়াছিল। অবশ্য তাঁহার জীবদ্দশাতেই সেই ফেডারেশন ভাঙ্গিয়া যায়। তথাপি মিসর আজও "যুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র" নামটি আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। পরবর্তীকালে সাদাতের আমলেও মিসর, লিবিয়া ও সুদান সমবায়ে লুপ্ত ফেডারেশন বা কনফেডারেশন গঠনের কথা উঠিয়াছিল, কিন্তু তাহা কার্যে পরিণত হয় নাই।

১৯৭৬ সালের নভেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের আগমনের সাথে সাথে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তির নূতন দিগন্তের উন্মোচন হয়। ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইতে ইহা মার্কিন ইহুদী সম্প্রদায় এবং মার্কিন সরকারের উপর নির্ভর করিয়া চলে। আরবদের বিরুদ্ধে একতরফাভাবে ইসরাইলকে অস্ত্র প্রদানই ছিল প্রত্যেক মার্কিন সরকারের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য। কিন্তু জিমি কার্টার আসেন নূতন অভিব্যক্তি লইয়া। "ফিলিস্তিনীদের আবাসভূমির" প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি পুনরুল্লেখ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের বহুল প্রচারিত সাপ্তাহিক সাময়িকী 'টাইম' উল্লেখ করে, "এই প্রথম একজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট সেই অর্থপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করিলেন।" যৎসামান্য সীমান্ত অঞ্চল ব্যতীত সমস্ত অধিকৃত অঞ্চল হইতে ইসরাইলের অপসারণের কথা কার্টার উল্লেখ করেন। প্রচলিত আরব দাবী ছাড়াইয়া গিয়া তিনি ফিলিস্তিনী আরব উদ্বাস্তুদের ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব করেন। ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী

আইজ্যাক রবিন ও প্রেসিডেন্ট কার্টারের সহিত আলোচনায় নিরুৎসাহ লক্ষ্য করিয়া আরবগণ চমকিত হয়। ইহার অর্থ হইল মার্কিন সরকার ইহুদী-দিগকে আর সরাসরি সমর্থন দিতে প্রস্তুত নহে। প্রেসিডেন্ট সাদাত জিমি কার্টারের সহিত ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে তাঁহার মতামত সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা গ্রহণ করেন।

প্রেসিডেন্ট সাদাত জেনেভা সম্মেলনের প্রতি বৃহৎ শক্তিবর্গকে তাগাদা দিলে অক্টোবর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন মধ্য-প্রাচ্যের শান্তির ব্যাপারে একটি যুক্ত ইশতাহার ঘোষণা করে। তাহারা নিরাপত্তা পরিষদের ২৪২ নম্বর প্রস্তাবের মূল বক্তব্য পুনরায় তুলিয়া ধরে। উক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে অধিকৃত আরব এলাকা প্রত্যা-র্পণের পর শান্তি ও নিরাপত্তার সহিত বসবাস করিবার অধিকার ইসরা-ইলের রহিয়াছে। যুক্ত ইশতাহারে ফিলিস্তিনীদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের কথাও পুনরুল্লেখ করা হয়। এই যুক্ত ইশতাহার মার্কিন ইহুদী প্রতিষ্ঠান-সমূহ ও অন্যান্য ইসরাইলী সমর্থক দলসমূহের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। কার্টার ইহাতে পিছপাও হন এবং যুক্ত ইশতাহার প্রত্যা-হার করেন। মার্কিন ইহুদীদের শক্তি লক্ষ্য করিয়া সাদাত তাঁহার কর্মসূচী পুনর্বিবেচনা করেন এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৭৭ সালের ৯ই নভে-ম্বর তিনি ইসরাইল গমন করিয়া ইহুদীদের সহিত সরাসরি আলোচনা করিবার প্রস্তাব দেন। পরবর্তী ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বেগিন তাঁহাকে এক আমন্ত্রণের মাধ্যমে এই প্রস্তাবে সাড়া দেন। প্রেসিডেন্ট সাদাত ইসরাইল সফর করেন এবং ২০শে নভেম্বর ইসরাইলী পার্লামেন্টে ভাষণ দেন। পরে বেগিনও মিসর সফর করেন এবং সাদাতের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকের ফলাফল এখনও অস্পষ্ট। ইতিমধ্যে সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া, আলজিরিয়া ও ফিলিস্তিনী মুক্তি সংস্থা প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের এই একক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সোচ্চার হইয়া উঠে। কিন্তু সৌদী আরব ও জর্দান এই ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

আনোয়ার সাদাত ইসরাইলী ও আরবদিগকে জেনেভার শান্তি সম্মে-লনে বসাইতে সক্ষম হইলেও মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি আর কতদূর? কার্টার প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মতে সবকিছু সঠিক পথায় অগ্রসর হইলেও

মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যার নিষ্পত্তির পথ বন্ধুর ও সুদূর পরাহত। জেনেভায় ফিলিস্তিনীদের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে নীতি নির্ধারণের সমস্যা অতি দ্রুত সমাধান করা গেলেও, একটি সামগ্রিক আরব-ইসরাইলী চুক্তির দ্বার এখনও পূর্ববত রুদ্ধ। বিশেষতঃ দুইটি মৌলিক প্রশ্নে এখনও উভয়পক্ষ অনড়। প্রথমটি হইল, আরবদের দাবী, ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরাইল কর্তৃক দখলকৃত আরব এলাকা হইতে ইহুদী সৈন্যাপসারণ। অপরদিকে ইহুদী নেতৃবৃন্দ মিসরীয় সিনাই-এর কিছু অংশ বা সম্পূর্ণ এলাকা হইতে সৈন্যাপসারণ করিতে রাজী। কিন্তু সিরিয়ার গোলান উচ্চভূমি অথবা জর্দান নদীর পশ্চিম তীর হইতে সম্পূর্ণ সৈন্য প্রত্যাহার করিতে প্রস্তুত নহেন। দ্বিতীয়তঃ, আরব দাবী অনুযায়ী জর্দান নদীর পশ্চিম তীর ও গাজা এলাকা লইয়া ফিলিস্তিনী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন। এই ধরনের প্রস্তাব ইসরাইল সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে, কারণ তাহাদের মতে ইহা হইবে বিভিন্ন গোলযোগের কেন্দ্রস্থল এবং ইহুদী রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রতি বিরাট হুমকি। তাই সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল-আসাদ এবং ফিলিস্তিনী মুক্তি সংস্থার নেতৃবৃন্দ সাদাতের এই শান্তি প্রচেষ্টায় যথেষ্ট সন্দেহ পোষণ করেন। তাঁহারা মনে করেন, এই প্রচেষ্টায় জেনেভায় আলোচনা আরম্ভ হইলে মিসর ইসরাইলের সহিত সামগ্রিক নিষ্পত্তির পরিবর্তে একটি পৃথক সমঝোতায় আসিতে বাধ্য হইবে।

বিগত মার্চ মাসে সংঘটিত ঘটনাবলী পুনরায় প্রমাণ করিয়াছে যে মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি এখনও সুদূর পরাহত। ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে মার্চ ইসরাইলী বাহিনী দক্ষিণ লেবাননে অবস্থিত ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তু শিবিরে হানা দেয়। অতি প্রত্যুষে পরিচালিত এই হামলাকে স্মরণাতীত কালের সবচাইতে বড় হামলা বলিয়া অভিহিত করা হয়। লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলের সমস্ত ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তু গ্রামসমূহ এই অতর্কিত হামলার শিকার হয়। জলেস্থলে-অন্তরীক্ষে প্রায় ২৫০০০ ইসরাইলী সৈন্য এই সম্প্রসারণবাদী হামলায় অংশ গ্রহণ করে। অতর্কিত আক্রমণের ফলে মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ইসরাইলীরা লেবানন সীমান্তের ৬ মাইলের মধ্যে নিরপেক্ষ এলাকা তৈয়ার করে। বিমান হইতে বোমার আঘাতে উদ্বাস্তু শিবিরগুলি গুড়াইয়া দেওয়া হয়।

অতর্কিত আক্রমণে সাধারণ ফিলিস্তিনীরা দিশাহারা হইয়া পড়িলেও

পি. এল. ও. বাহিনী প্রতিরোধ গড়িয়া তোলে। প্রতিরোধ যুদ্ধের মুখে হাজার হাজার উদ্বাস্তু ফিলিস্তিনী লেবাননের রাজধানী বৈরুত অভিমুখে পাড়ি জমায়। এই হামলার বিরুদ্ধে যখন ফিলিস্তিনী প্রতিরোধ যুদ্ধের শুরু তখনই প্রস্তাব আসে দক্ষিণ লেবাননে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী মোতায়েনের।

ইসরাইলের সম্প্রসারণবাদী আক্রমণে ফিলিস্তিনীরা শুধু উৎখাত হয় নাই, সেই সঙ্গে লাঞ্ছিত হইয়াছে লেবাননের সার্বভৌমত্ব। লাঞ্ছিত লেবাননের বুক এখন শান্তিরক্ষী বাহিনীর পদভরে কম্পিত। দীর্ঘ ২০ মাসের রক্তক্ষয়ী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর লেবাননে এমনিতে ৩০ হাজার মিসরীয় শান্তিরক্ষী বাহিনী রহিয়াছে। ইহাদের আনয়ন করিয়াছে আরবলীগ। পুনরায় জাতিসংঘের প্রায় ৪১০০ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন হইয়াছে। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের স্থিতিহীন পরিস্থিতির দায়ভাগ জোর করিয়া লেবাননের উপর চাপান হইয়াছে।

ভূমধ্যসাগর তীরবর্তী লেবানন নামের ছোট্ট দেশটি কাহার? এই প্রশ্ন আজ অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে দেখা দিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যের মাত্র ৪০১৫ বর্গমাইল আয়তনের এই দেশটিকে এক সময়ে মধ্যপ্রাচ্যের স্বর্গ বলিয়া অভিহিত করা হইত। সে সময় মধ্যপ্রাচ্যের অনেকেই স্বস্তির অন্বেষায় ঘুরিয়া আসিত লেবানন।

১৯৭০ খ্রীস্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত এই দেশটির পরিস্থিতি মোটের উপর শান্ত ছিল। সত্তরের দশকের সূত্রপাত হইতেই শুরু হয় এই দেশের অশান্ত পরিস্থিতি। জাতিগত বিরোধকে কেন্দ্র করিয়া সূত্রপাত ঘটে অশান্তির। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের কনভেনশন অনুযায়ী খ্রীস্টানরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। ফলে শাসনতান্ত্রিক সুযোগ-সুবিধা ছিল তাহাদেরই বেশী। সেই সুবাদে সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাহাদের প্রতিপত্তি স্বাভাবিকভাবেই ছিল বেশী। ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে খ্রীস্টানদের সংখ্যালঘিষ্ঠতা শাসনতান্ত্রিক এই পরিস্থিতিকে জটিল করিয়া তোলে।

১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দের আদমশুমারীতে দেখা যায় লেবাননের জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ মুসলমান। অন্যদিকে খ্রীস্টান জনসংখ্যার হার মাত্র ৪১ শতাংশ। বাকী ৩ শতাংশ দুরজি সম্প্রদায়ভুক্ত। অতএব, মুসলমানরা জনসংখ্যার হারে সুবিধা দাবী করিলে শুরু হয় গণ্ডগোল। ফলে ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দ হইতে

১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ১৯ মাসের রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা ঘটে। আর্থিক ক্ষতি এবং ব্যাপক প্রাণহানি ছাড়াও লুণ্ঠিত হয় লেবাননের সার্বভৌমত্ব। ইহার পর হইতে বার বার এই দেশটির সার্বভৌমত্ব লুণ্ঠিত হইতেছে। তৃতীয় বিশ্বের দুর্বল দেশগুলির সার্বভৌমত্বের রক্ষাকবচ জাতিসংঘ পর্যন্ত লেবাননের সার্বভৌমত্বের গ্যারান্টি দিতে ব্যর্থ হইয়েছে। এই জন্যই প্রশ্ন উঠিয়াছে লেবানন দেশটি কাহার? লেবানন কি লেবাননবাসীর? অথবা মধ্যপ্রাচ্য শান্তিরক্ষী বাহিনীর, নাকি ইসরাইলের তাবেদার লেবাননের দক্ষিণপন্থী ফালাঞ্জী খ্রীস্টান বাহিনীর?

ইসরাইলের এইবারের আক্রমণ দীর্ঘদিনের চিন্তাপ্রসূত। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দেই এই ধরনের একটি পরিকল্পনা লওয়া হইয়াছিল। কিন্তু মিসর ও সিরিয়ার দরুন ইহা সম্ভবপর হয় নাই। এই দুইটি রাষ্ট্রই ইসরাইলের যে-কোন ধরনের সৈন্য পরিচালনার বিপক্ষে ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিককালে প্রেসি-ডেন্ট সাদাতের একতরফা শান্তি প্রস্তাব এবং ফলে আরব ঐক্যে যে ফাটল ধরিয়াছে তাহারই সূত্র ধরিয়া এই আক্রমণ পরিচালনা করা হয় বলিয়া অনেকের ধারণা। এইখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল, সাদাতের শান্তি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল-আসাদ ফিলিস্তিনীদের উৎসাহ যোগাইলেও সিরিয়ার ইহুদী আক্রমণের মুখে তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চুপ থাকেন।

ইসরাইলী পক্ষ হইতে বলা হইয়াছে যে, অতি সম্প্রতি তেলআবিবে সংঘটিত ফিলিস্তিনী সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণে নিহত ইহুদীদের আত্মার শান্তির জন্যই এই আক্রমণ। আরও বলা হইয়াছে যে, লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলের ফিলিস্তিনী শিবির হইতেই এই আক্রমণ চালানো হইয়া-ছিল। তাই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বন্ধ করিবার জন্যই এই আক্রমণ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইসরাইলের বহুদিনের লালিত স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করিবার মোক্ষম উপায় হিসাবে তেলআবিবের ঘটনাকে বাছিয়া লওয়া হয়। ইসরাইলের লেবানন আক্রমণের মূল লক্ষ্য হইল ফিলিস্তিনীদিগকে সর্বশেষ এলাকা হইতেও উৎখাত করা।

এবারের যুদ্ধ আরেকটি বিষয় প্রমাণ করিয়াছে যে, ফিলিস্তিনীরাও লড়িতে জানে। দক্ষিণ লেবাননের লিতানী নদী বরাবর অগ্রসর হইলেও ইসরাইলকে ইহার জন্য প্রচুর খেসারত দিতে হইয়াছে। প্রতিটি ইঞ্চি

এলাকা দখল করিতে তাহারা প্রচণ্ড ফিলিস্তিনী প্রতিরোধের সম্মুখীন হইয়াছে। শুধু তাহাই নহে, বর্তমান অবস্থানেও তাহারা প্রচণ্ড ফিলিস্তিনী আক্রমণের সম্মুখীন। তাই প্রথমতঃ নিশ্চয়তা ছাড়া এ এলাকা ছাড়িয়া দিবে না বলিয়া ঘোষণা করিলেও ইসরাইল এখন জাতিসংঘের আহ্বানের ছত্রছায়ায় সৈন্যাপসারণে সম্মত হইয়াছে।

বি. বি. সি. ও ভয়েস অব আমেরিকার খবর অনুযায়ী দক্ষিণ লেবাননের পূর্বতন প্রান্ত আরকুপের ১২ কিলোমিটার প্রশস্ত অঞ্চলের ৭টি অবস্থান হইতে ইসরাইলী বাহিনী সরিয়া গিয়াছে (১১।৪।৭৮)। জাতিসংঘ বাহিনীর নরওয়ের ইউনিট আরকুপে অবস্থান গ্রহণ করিয়াছে। মধ্যাঞ্চল হইতেও তাহারা সরিয়া যাইবে বলিয়া খবরে প্রকাশ। আশা করা যাইতেছে যে, অতি শীঘ্র ইসরাইলী বাহিনী সমগ্র দক্ষিণ লেবানন ত্যাগ করিবে।

এদিকে লেবাননে নূতনভাবে দাঙ্গা আরম্ভ হইয়াছে। বৈরুতে খ্রীস্টান ও মুসলমানদের খণ্ডযুদ্ধ মোকাবিলার জন্য আরব শান্তিরক্ষী বাহিনী রাজপথে ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে। সাম্প্রতিক দাঙ্গায় মাত্র ৪ দিনে ১৭ ব্যক্তি প্রাণ হারাইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব বৈরুতে সংঘর্ষে লিপ্ত দুই সম্প্রদায়ের অবস্থানের মাঝামাঝি স্থানে আরব বাহিনী ট্যাঙ্ক লইয়া অবস্থান গ্রহণ করিয়াছে। বি বি. সি. জানায়, দাঙ্গা উপদ্রুত কয়েকটি এলাকার ঘরবাড়িতে আগুন জ্বলিতে দেখা গিয়াছে। সংঘর্ষে খ্রীস্টান ও মুসলমানেরা স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে। ইতিমধ্যে সংঘর্ষ অবসানের জন্য উভয় পক্ষের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনা শুরু হইয়াছে। নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকরী করার তাগিদ দিতেছেন। যুদ্ধবিরতি না হইলে সহসাই পরিস্থিতি আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে।

লেবাননে বড় রকমের একটা যুদ্ধ বাধিবার সবকয়টি লক্ষণই নানাভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি রাজধানী বৈরুত হইতে দলে দলে লোক অপসারণের কাজ শুরু হইয়াছে। বৈরুতে স্থায়ী বসবাসকারী বহু আরব ও খ্রীস্টান শহর ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। ইদানিং কূটনৈতিক মিশন হইতেও লোক অপসারণ শুরু হইয়াছে। বৈরুত হইতে ইতিমধ্যেই সিরিয়া ও সোভিয়েত মিশনের লোকজনদের সরাইয়া নেওয়া হইয়াছে।

অষ্ট্রেলিয়া বৈরুতে অবস্থানকারী তাহার সকল নাগরিককে অবিলম্বে লেবানন ত্যাগ করার নির্দেশ দিয়াছে। খবরে প্রকাশ, সিরিয়ার ভারী গোলন্দাজ বহর এবং অন্যান্য বাহিনী রাজধানী বৈরুতের দিকে অগ্রসর হইতেছে। উত্তর সীমান্তে ইসরাইলী বাহিনীও সতর্ক অবস্থার মধ্যে রহিয়াছে।

লেবাননের এহেন পরিস্থিতি নিছক খ্রীস্টান ও মুসলিম সম্প্রদায়ের জমি ও অবস্থান দখলের সংঘাত বলিলে অবশ্যই ভুল হইবে। বিষয়টির বহিরঙ্গের এই রকম একটি ছাপ দেওয়া হইয়াছে বটে, তবে ইহা আর গোপন নাই যে, লেবাননের খ্রীস্টান সম্প্রদায়কে সীমান্তের পরপার হইতে অস্ত্র ও পরামর্শ যোগাইতেছে আরব স্বার্থের চরম শত্রু ইসরাইল। লেবাননের গৃহযুদ্ধও তাই আসলে সার্বিক মধ্যপ্রাচ্য সমস্যারই একটি প্রতিফলন। মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা হইতে ইহাকে কোন প্রকারেই ভিন্ন করিয়া দেখা যায় না।

অতি সম্প্রতি লেবাননের প্রেসিডেণ্ট ইলিয়াস সার্কিজ ও সিরিয়ার হাফিজ আল-আসাদের বৈঠকের পরিপ্রেক্ষিতে লেবাননে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হইয়াছে। শীঘ্রই আরব শান্তি বাহিনী হিসাবে সিরীয় সৈন্যদের স্থলে সৌদী ও ইরানী সৈন্য মোতায়েন করা হইতেছে।

বিগত ২৭শে এপ্রিল ১৯৭৮, আফগানিস্তানে সেনাবাহিনীর সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতার পালাবদল ঘটিয়াছে। নাদির খানের সর্বশেষ বংশধর প্রেসিডেণ্ট দাউদের পতন হইয়াছে এবং সামরিক বাহিনীর সহায়তায় ক্ষমতায় বসিয়াছেন নূর মোহাম্মদ তারাকী। দাউদ ১৯৭৩ সালের ১৭ই জুলাই সেনা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া তাঁহার ভাই এবং ভগ্নিপতি বাদশাহ জহীর শাহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছিলেন। আফগানিস্তানকে রাজতন্ত্রের বদলে প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। ক্ষমতায় আসিবার পর হইতে গত বৎসর পর্যন্ত তিনি ঘোষণার মাধ্যমেই আফগানিস্তানের শাসন পরিচালনা করেন। গত বৎসর তিনি প্রথম প্রজাতান্ত্রিক দেশ হিসাবে ঘোষণা করিয়া সংবিধান চালু করেন।

প্রেসিডেণ্ট দাউদের ক্ষমতারোহণ এবং ক্ষমতাচ্যুতির প্রক্রিয়া এক হইলেও ঘটনা ভিন্নতর হইয়াছে। প্রেসিডেণ্ট দাউদ ক্ষমতায় আসিয়াছিলেন বাদশাহ জহীর শাহকে সরাইয়া এবং তাই ঐ অভ্যুত্থান ছিল রক্তপাতহীন,

কিন্তু বর্তমান অভ্যুত্থান হইয়াছে রক্তক্ষয়ী, যাহাতে প্রেসিডেন্ট দাউদ স্বয়ং নিহত হইয়াছেন। কাবুলের রাস্তায় হাজার হাজার লোক নিহত হইয়াছে। মৃত্যু পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট দাউদ আত্মসমর্পণ করেন নাই।

১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে বাদশাহ জহীর শাহকে উৎখাতের সময় দাউদ বলিয়াছিলেন, আধুনিক জগতে রাজতন্ত্র চলিতে পারে না। জহীর শাহের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হিসাবে দীর্ঘ ১০ বৎসর (১৯৫৩ হইতে ১৯৬৩) তিনি জহীর শাহের অধীনে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বও পালন করিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালেও তিনি প্রকাশ্যে রাজতন্ত্রের সমালোচনা করিতেন। এই কারণে প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে তিনি পদচ্যুত হইয়াছিলেন। প্রধানমন্ত্রী থাকা অবস্থাতেই সেনাবাহিনীর সোভিয়েত ঘেঁষা জেনারেলদের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া উঠে। ১৯৭৩ সালে ইহাদের সাহায্যেই তিনি ক্ষমতারোহণ করেন।

১৯৭৭ সালে প্রজাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র ঘোষণার মাধ্যমে দাউদ প্রেসিডেন্ট হিসাবে বৈধ ক্ষমতাবান পুরুষ হিসাবে আবির্ভূত হন। ১৯৭৩ সালের অভ্যুত্থানের সহযোগী সামরিক অফিসারদের সঙ্গে তাঁহার মতান্তর শুরু হয়। এইসব সামরিক অফিসাররা আরও অধিক সোভিয়েত ঘেঁষা নীতি প্রবর্তনের পক্ষপাতি ছিলেন। অন্যদিকে দাউদ চাহিতেন সবাইর নিকট হইতে সমদূরত্বে অবস্থান করা। নূতন ক্ষমতাবান বিপ্লবী কাউন্সিল ইতিমধ্যে নিজেদেরকে নিরপেক্ষ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহারা বিশ্বের সকল দেশের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিবেন। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ইসলাম, গণতন্ত্র, ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও দেশের অগ্রগতি হইবে মৌল নীতি।

সম্প্রতি দক্ষিণ ইয়ামানে সোভিয়েত, কিউবান এবং পূর্ব জার্মানীর সৈন্য বাহিনীর উপস্থিতির জন্য আরব পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে নিন্দা জ্ঞাপন করা হইয়াছে। ইতিপূর্বে দক্ষিণ ইয়ামানের প্রেসিডেন্ট রুবাইয়া আলী মস্কোপন্থী এক অভ্যুত্থানে আটক হন এবং দুইদিন পরে তাঁহাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে হত্যা করা হয়। রুবাইয়া আলীকে উৎখাতের মধ্য দিয়া এখন দক্ষিণ ইয়ামানে ক্ষমতায় বসিয়াছেন আলী নাসের। আলী নাসের মস্কোপন্থী। তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট নেতা ইসমাইল। নিহত প্রেসিডেন্ট রুবাইয়া আলী সাম্প্রতিক দিনগুলিতে কিছুটা নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ

করিয়াছিলেন। ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট আলী নাসেরের সাহায্যে সোভিয়েত মহল বেশ তৎপর। দক্ষিণ ইয়ামানের রাজধানী এডেন তৈল রফতানীর প্রধান বন্দর এবং আরব সাগরের প্রবেশপথ।

এই অভ্যুত্থান ও হত্যাকাণ্ডের দুইদিন পূর্বে দক্ষিণ ইয়ামানের প্রেসিডেন্টের একজন বিশেষ দূত একটি ব্রিফকেস হাতে উত্তর ইয়ামানের প্রেসিডেন্ট আহমদ হোসেন আল-ঘাসমির সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। কিন্তু ব্রিফকেসে রক্ষিত বোমা বিস্ফোরণে প্রেসিডেন্ট ঘাসমি এবং দূত উভয়েই মারা যান। ব্রিফকেসের মধ্যে রক্ষিত বোমা সম্পর্কে দূত কিছুই জানিতেন না বলিয়া প্রকাশ। এই ষড়যন্ত্রে বিদেশী শক্তির হাত রহিয়াছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

শাহানশাহ্ রেজা শাহ্ পাহ্লভীর প্রশ্রয়ে ইরান সম্প্রতি খোলামেলা রাজনৈতিক বিতর্কের এক নূতন যুগে প্রবেশ করিতেছে। দেশটিতে হয়ত একদলীয় শাসনই বহাল থাকিয়া যাইবে তবে সরকারী দলের মধ্যকার বিভিন্ন উপদল এবং বাহিরের ছোট ছোট দলগুলি সরকারকে সমালোচনা করিবার অধিক স্বাধীনতা পাইবে। অবশ্য শাহের সমালোচনা করা যাইবে না কিছুতেই।

অভিযোগ উঠিয়াছে ইরানের সিকিউরিটি ফোর্স এবং পুলিশ সাধারণ মানুষের উপর কারণে অকারণে অতি নির্দয় অত্যাচার ও নিপীড়ন চালায়। আইন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বিত্তশালীদের স্বার্থে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। ইরানের রাজকীয় সরকার শিক্ষার নামে দেশে ও সমাজে পাশ্চাত্যের উগ্র আধুনিকতা আমদানী করিয়াছে। মেয়েরা পর্দার বাহিরে বহুদূর চলিয়া আসিয়াছে। নগ্ননৃত্য, দেহপ্রদর্শনী, অনাচার ও ব্যাভিচারে সারাদেশ আচ্ছন্ন। ইরানের শিক্ষা ব্যবস্থার ইসলামের শিক্ষা ও আইনের বিশেষ কোন প্রতিফলন নাই, যদিও দেশের শতকরা ৯৮ জন লোক মুসলমান। ইরান যদিও তেলসমৃদ্ধ দেশ, তেলের সূত্রে প্রচুর অর্থের মালিক, তবু গত এক যুগের মধ্যে সাধারণ মানুষের অবস্থা উপরের দিকে উঠিল না। ইরানের মাথাপিছু আয় আড়াই হাজার ডলারের মত হইলেও সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশ আজও প্রত্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চলে মানবেতর জীবন যাপন করে।

কিছুদিন পূর্বে তেহরানের ৭৫ মাইল দূরবর্তী কোম শহরে শাহের বিরুদ্ধবাদী ওলামাগণ এক বিশাল বিক্ষোভে ফাটিয়া পড়ে। এই বিক্ষোভ মিছিল ছিল বন্যার মত করালগ্রাসী এবং সমুদ্রগর্জনের মত ভয়াবহ। শাহের সিকিউরিটি ফোর্স এই মিছিলের উপর বেপরোয়া গুলী বর্ষণ করে। মার্কিন সাময়িকী নিউজ উইকের সংবাদদাতা স্মিট লিখিয়াছেন, দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হইলেও কোমের বড় মসজিদে নামাজ পড়ার কার্পেটে রক্তের দাগ মুছিয়া যায় নাই। কোম মসজিদের ইমাম ৮১ বছরের বৃদ্ধ আয়াত উল্লাহ্ শরিয়ত মাদারী ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়াছেন, "আমাদের দাবী-দাওয়া যদি মানিয়া লওয়া না হয় তবে আমার যারা অনুসারী তাহাদিগকে শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পতাকা তুলিবার আদেশ দিতেই হইবে।" আয়াত উল্লাহ্‌র দাবী: শাসনতন্ত্র যে-কোন ব্যক্তি, এমন কি শাহেরও উপরে। কেউ তাহার সুবিধামত কিছুটা শাসনতন্ত্র কিছুটা ব্যক্তিগত অভিরুচি ও খেয়ালখুশী অনুসরণ করিবে তাহা হইতে পারে না। দেশকে চালাইতে হইবে শুধু শাসনতন্ত্রেরই নির্দেশে।

শুধু কোম শহরে নহে, এই দাবী ইরানের আরও ৫০টি শহরে উঠিয়াছে। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া রাজনৈতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামাও হইয়া গিয়াছে। পাঁচ মাস ব্যাপী এই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সরকারী হিসাবেই মৃতের সংখ্যা ৪০ জন।

এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও বিক্ষোভকে কেন্দ্র করিয়াই ইরানে রাজনীতির নূতন মোড় পরিবর্তন। গত জুন মাসে (১৯০৮) পার্লামেন্টের সাত জন ডিপুটি একটি সরকারী বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেন। এমন ঘটনা এই প্রথম। শাহ্ এবং সাধারণভাবে ইরানীরা মনে করেন যে, তিন বৎসর পূর্বে চালু করা একদলীয় ব্যবস্থায় এখন আর কাজ হইতেছে না। তাই কিছু রদবদল আবশ্যক। সরকার স্পষ্ট বলিয়াছেন, আইন বদলাইতে না হয় এমন গঠনমূলক সমালোচনা আদৃত হইবে। রাজতন্ত্রের ভূমিকার উপর অবাধ বিতর্ক চালাইতে পারিবে এমনটি কেহই আশা করে না, তবে রাজনৈতিক দলগুলি অনুগত বিরোধী দল হিসাবে জনমত তুলিয়া ধরিবার সুযোগ পাইবে।

সরকারী বক্তব্য ইহা মনে করা যায় যে, অধিকাংশ রাজনৈতিক

তৎপরতা রাস্তখিজ দলের কাঠামোর মধ্যেই চলিতে থাকিবে। তবে গ্রুপগুলি চাহিলে তাহাদের রাজনৈতিক দল হিসাবে কাজ করিতে দেওয়া হইবে। এতকাল রবার ষ্ট্যাম্পরূপে গণ্য পার্লামেণ্ট এবং রাস্তখিজ জনমতের ব্যাপকতর প্রতিধ্বনি করুক শাহ্ এখন তাই চান। ইহারই আলোকে প্রধানমন্ত্রী ও রাস্তখিজ সেক্রেটারী জেনারেল জমশেদ আমুজগারসহ দলীয় নেতারা দলের প্রতিদ্বন্দ্বী উপদলের জন্য একটি নূতন ভূমিকা অনুমোদন করিয়াছেন। তাঁহাদের সরকারের ব্যর্থতার সমালোচনা করিবার এবং নিজেদের অফিস ও প্রাদেশিক শাখা খুলিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে।

কিছু সদস্য নূতন দল গঠন করার উদ্দেশ্যে রাস্তখিজ ছাড়িয়াছেন। পার্লামেণ্টে ডানপন্থী উপদলের নেতা মোহসিন পিজেশপুর বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার ৩৭ বৎসর আগের দলটি পুনরুজ্জীবিত করিবেন। পার্লামেণ্টের ভিতর ও বাহিরের আরো দুইটি উপদল ও রাজনৈতিক দল গঠনের পরিকল্পনা নিয়াছে। একটি দল হইবে পশ্চিম ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিক দলগুলির আদলে, আর অপরটির লক্ষ্য হইবে আমূল সংস্কার। অবশ্য আগামী জুনের পার্লামেণ্টের নির্বাচনের পূর্বে ইরানে বহুদলীয় ব্যবস্থা চালু হইবে কিনা তাহা বলার সময় এখনও আসে নাই। বহুদলীয় পদ্ধতির সম্ভাবনা লইয়া এখন বিতর্ক চলিতেছে। একমাত্র নিষিদ্ধ দল কম্যুনিস্ট পার্টি ছাড়া অপর বিরোধী উপদলগুলি পূর্ণাঙ্গ দলের মতই কাজ চালাইতেছে। কম্যুনিস্টদের হয়তো শুধু গ্রুপরূপেই থাকিয়া যাইতে হইবে, অন্যথায় রাস্তখিজের মধ্যে থাকিয়া কাজ করিতে হইবে।

তথ্যমন্ত্রী দারিয়ুস হুমাউন গত সপ্তাহে সাংবাদিকদের জানান, একদলীয় ব্যবস্থার ছায়াতলে আমরা বিভিন্ন গ্রুপ ও শাখাকে অধিকতর সুযোগ দিতে চলিয়াছি।

সম্প্রতি যুদ্ধবিধ্বস্ত মধ্যপ্রাচ্যের জন্য শান্তির নীল নকশায় স্বাক্ষর দানের মধ্য দিয়া ওয়াশিংটন হইতে হেলিকপ্টারযোগে ৩৫ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত মার্কিন প্রেসিডেণ্টের রেস্ট হাউজ ক্যাম্প ডেভিডে যুক্তরাষ্ট্রের

প্রেসিডেন্ট কার্টারের মধ্যস্থতায় মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এবং ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বেগিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত শীর্ষ বৈঠক সমাপ্ত হয়। ইসরাইল জর্দান নদীর পশ্চিম তীর হইতে সৈন্য প্রত্যাহার, তথায় ইসরাইল, জর্দান ও ফিলিস্তিনীদের অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে অন্তর্বর্তীকালীন স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসন গঠন, এবং তিন মাসের মধ্যে সিনাই প্রশ্নে মিসরের সহিত শান্তি চুক্তি সম্পাদনে সম্মত হইয়াছে। বিগত ১৭ই সেপ্টেম্বর (১৯৭৮) তারিখে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট সাদাত ও প্রধানমন্ত্রী বেগিন দলিল দুইটিতে স্বাক্ষর দান করেন। চৌদ্দ দিনে দারুণ আশা ও হতাশার মধ্যে অব্যাহত আলোচনা শেষে সম্পাদিত দলিল দুইটি হইল "মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রতিষ্ঠার কাঠামো" এবং "মধ্যপ্রাচ্য মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের রূপরেখা"। এই দলিল মোতাবেক জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে ইসরাইল, জর্দান ও ফিলিস্তিনীদের যৌথ সার্বভৌমত্বের ব্যবস্থা থাকিবে, তবে স্বায়ত্তশাসনের পাঁচ বৎসরের অন্তর্বর্তীকালীন মেয়াদে সেখানে বিশেষ কয়েকটি স্থানে সামান্য কিছু সংখ্যক ইসরাইলী সৈন্য থাকিবে। তিন মাসের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় শান্তি চুক্তি সম্পাদনের পর তিন হইতে নয় মাসের মধ্যে ইসরাইল মিসরের সিনাই হইতে অধিকাংশ সৈন্য সরাইয়া নিবে। অতঃপর দুই দেশের মধ্যে কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন এবং দুই দেশের মধ্যে "যুদ্ধ নয়—শান্তি"র অবস্থা ঘোষণা করা হইবে। ইহার দুই হইতে তিন বৎসরের মধ্যে ইসরাইল সিনাই হইতে সর্বশেষ সৈন্য সরাইয়া নিবে।

সম্পাদিত নীল নকশার ব্যাপারে মধ্যপ্রাচ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ইসরাইলের জনগণ ইহাকে স্বাগত জানাইলেও কায়রো ও সৌদী বেতার বিনা মন্তব্যে এই খবর পরিবেশন করে। কায়রোর পথচারীদের একাংশকে উল্লসিত দেখা যায় আবার পি. এল. ও. এবং সিরিয়া ইহা প্রত্যাখ্যান করে। পি. এল. ও. মুখপাত্র ঘোষণা করেন, পি. এল. ও-কে ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি অসম্ভব। ক্যাম্প ডেভিড সমঝোতা দলিলে পি. এল. ও-র নাম পর্যন্ত উল্লেখ করা হয় নাই। সমঝোতাকে পি. এল. ও. নিছক দ্বিপক্ষীয় ব্যাপার এবং অধিকৃত অঞ্চলে ইসরাইলের দখলকার আরও পাঁচ বৎসর মানিয়া নেওয়ার পরাজয় বলিয়া উল্লেখ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সমঝোতাকে সাদাতের আত্মসমর্পণ বলিয়া উল্লেখ করে। ইসরাইল সত্যিকারভাবে সৈন্য অপসারণ

করিবে কিনা সে ব্যাপারে মস্কো সন্দিগ্ধ। জর্দানের মতে, এই সমঝোতা শান্তির দ্বার উন্মোচিত করিলেও আরবদের অনৈক্য আরও ঘনিভূত করিবে। জেরুজালেম ও জর্দান নদীর পশ্চিম তীরে আরব শহরগুলির পৌর নেতৃবৃন্দ ক্যাম্প ডেভিড সমঝোতা সম্পূর্ণ রূপে প্রত্যাখ্যান করেন। ফিলিস্তিনীদের অধিকারের প্রশ্ন এড়াইয়া যাওয়া, পি. এল. ওর প্রতি উপেক্ষা এবং স্বাধীনতার পরিবর্তে স্বায়ত্তশাসনের টোপ ও পূর্ণ ইসরাইলী প্রত্যাহারের ব্যবস্থা না থাকায় সমঝোতাটি মিসর-ইসরাইল রফায় পর্যবসিত হইয়াছে বলিয়া আরব, পৌর নেতৃবৃন্দ মনে করেন। অপর দিকে দামেস্ক সম্মেলনে যোগদান-কারী সাদাতবিরোধী আরব দেশগুলি মিসরের সহিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছে। আলজিরিয়া, লিবিয়া, সিরিয়া, দক্ষিণ ইয়ামান ও পি. এল. ও. কে লইয়া গঠিত আপোষবিরোধী আরব ফ্রন্ট ক্যাম্প ডেভিড শীর্ষ বৈঠকের ফলাফল নস্যাৎ করার সংকল্প ঘোষণা করে। এই জোটের ইশতাহারে আরব লীগের সদর দপ্তর কায়রো হইতে অন্য কোন আরব দেশে স্থানান্তরের দাবী জানায়।

এদিকে ষোলটি আরব দেশ বাগদাদ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে সম্মত হইয়াছে। এই বাগদাদ সম্মেলনের উদ্যোক্তা হইতেছে ইরাক। সিরিয়া সহ ইরাক, আলজিরিয়া, লিবিয়া ও দক্ষিণ ইয়ামান আরব জাহানের বুকে রুশপন্থী হিসাবে খ্যাত। এই ৪টি রাষ্ট্রই প্রধানতঃ প্রেসিডেন্ট সাদাতের সরাসরি আলোচনার বিরোধী। অবশ্য খোদ ফিলিস্তিনী মুক্তি সংস্থাও ক্যাম্প ডেভিড আলোচনার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছে। এদিকে সউদী আরব এবং জর্দানও এইবারের ক্যাম্প ডেভিড আলোচনায় তেমন সন্তুষ্ট নহে। ইরাকের আহ্বানে বাগদাদে অনুষ্ঠিতব্য শীর্ষ বৈঠকে উপ-রোক্ত রুশপন্থী রাষ্ট্র কয়টি বাদেও বাকী যে ডজনখানেক রাষ্ট্র যোগ দিতে যাইতেছে তাহাতে অনুমান করা চলে যে, যেসব মধ্যপন্থী আরব রাষ্ট্র এতকাল যাবৎ মার্কিন উদ্যোগে মিসর ইসরাইল আলোচনায় কিছু একটা সুফল প্রত্যাশা করিতেছিলেন তাঁহারা হতাশ হইয়াছেন। সুতরাং বাগদাদ বৈঠকে তাহাদের যোগদান যতটা না মিসর বা মার্কিন বিরো-ধিতা তাহার চাইতে অধিক এই হতাশার বহিঃপ্রকাশ। তাছাড়া এই বৈঠকে তাহাদের যোগদানের অর্থ ইহাও নহে যে, মধ্যপন্থী এইসব রাষ্ট্র

রাশিয়ার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তবে জর্দান কিংবা সৌদী আরবের এবারের মনোভাব মার্কিন মনোভাবকে প্রভাবিত করিবে নিঃসন্দেহে। এমনিতেই সাদাতের মুখ রক্ষা করিতে কার্টার প্রশাসন যথেষ্ট দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তবুও যে পর্যায়ে আসিয়া ক্যাম্প ডেভিডের ফলাফল স্তিমিত হইতেছে এবং সাদাতের অবস্থা নাজুক ও তাঁহার বিরোধিতা জোরদার হইতেছে সেই পর্যায়টি গোটা মধ্যপ্রাচ্যের জন্য একটি বিশেষ সন্ধিক্ষণ। ইহাতে স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে, আরব জাহানের সমস্যা সমাধানের বিষয়টি এখন শুধু আমেরিকার উপরই নির্ভরশীল নহে, বরং আমেরিকা, মিসর, ইসরাইল, রাশিয়া, ফিলিস্তিনী সংস্থা, রুশ সমর্থক গ্রুপ এবং মধ্যপন্থী আরব রাষ্ট্রবর্গ সকলের সম্মিলিত প্রয়াস যে মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সমাধানের জন্য জরুরী তাহাই আর একবার প্রমাণিত হইয়া গেল। তবে প্রত্যেকের প্রেক্ষাপট ভিন্ন, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে মিলের চাইতে গরমিল বেশী।

মোটামুটি ইহাই বর্তমান মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনা-প্রবাহের সংক্ষিপ্ত রূপ। যাহা হউক, এই দেশের মানুষের দৃষ্টিতে ধর্মীয় দিক হইতে আপত্তিকর বিভিন্ন বিষয়ের উপর আমি সংক্ষিপ্ত টীকা প্রদান করিয়াছি। তবে অতি দ্রুত অনুবাদ করিবার ফলে সর্বত্র টীকা প্রদান করা সম্ভব হয় নাই। আশা করি, এই অনুবাদ আধুনিক মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের উপর বাংলা ভাষায় গবেষণার কাজে সহায়তা করিবে।

এই গ্রন্থ অনুবাদের ব্যাপারে আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যাপক ড· মুইন উদ্দীন আহমদ খানের নিকট হইতে সর্বদাই উৎসাহ পাইয়া আসিয়াছি। তিনি এই অনুবাদটি সম্পাদনা করিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহ ও উপদেশ না পাইলে এত শীঘ্র গ্রন্থখানি অনুবাদ সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। ইহা ছাড়া আমার অগ্রজ অধ্যাপক খায়ের-উল-বশরের নিকট হইতেও আমি এই গ্রন্থের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রকার উপদেশ লাভ করিয়াছি। আমি সকলের নিকট কৃতজ্ঞ।

পূর্বোল্লিখিত ইতিহাসের ধারাবিবরণী সমকালীন পর্যায় পর্যন্ত টানিয়া আনিতে গিয়া আমি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। এই ব্যাপারে আমি উক্ত পত্রিকাগুলির সম্পাদকমণ্ডলীর প্রতি কৃতজ্ঞ।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক

ভূমিকা

এই গ্রন্থ একটি উদারনৈতিক আর্ট কলেজে ২০ বৎসর মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস শিক্ষা দিবার ফলশ্রুতি। যেসব ছাত্র ও সাধারণ পাঠকের এই এলাকার ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে কোন জ্ঞান নাই, এবং যে সব শিক্ষক নিজেরা এই ক্ষেত্রে পারদর্শী, কিংবা তেমন পারদর্শী নহেন, তাহাদের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ লিখিত। এই গ্রন্থের উপাদানসমূহ বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া শ্রেণীকক্ষে আলোচিত ও তথা হইতে আহরিত। এই ক্ষেত্রে যেগুলি মধ্যপ্রাচ্যের লোকদের অতীত ও বর্তমান সমস্যাবলী, গুণাবলী, এবং অবদান-সমূহ সম্পর্কে জ্ঞানলাভে ছাত্রদের সহায়ক শুধু সেগুলিই এখানে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

মধ্যপ্রাচ্য এই গ্রন্থে চারি খণ্ডে বিধৃত। প্রথম খণ্ডে ইসলামের আবির্ভাব ও বিস্তৃতি সম্পর্কে, দ্বিতীয় খণ্ডে ওসমানীয় ও সাফাভীয় সাম্রাজ্য, তৃতীয় খণ্ডে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ ও মধ্যপ্রাচ্য এবং চতুর্থ খণ্ডে অনেক জাতিগত রাষ্ট্রে বিভক্ত আধুনিক যুগ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। যাহারা এক বৎসরের শিক্ষা কোর্সে মধ্যপ্রাচ্য অধ্যয়ন করেন তাহারা প্রথম সেমিস্টারে সুফলদায়কভাবে প্রথম দুই খণ্ড কাজে লাগাইতে পারেন এবং দ্বিতীয় সেমি-স্টারে অবশিষ্ট দুই খণ্ড কাজে লাগাইতে পারেন।

এই গ্রন্থে বর্ণিত সংস্কৃতি গঠনে অনেক জাতির অবদান রহিয়াছে; কিন্তু অন্ততঃপক্ষে তিনটি শ্রেণীর আলোচনা ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস তেমন বুঝা যায় না। এই শ্রেণীগুলি হইল আরবীভাষী লোকজন, পারস্যবাসী ও তুর্কী। কোন আলোচনায় উপরোল্লিখিত যে-কোন একটিকে বাদ দিলে, তাহা অত্র এলাকার একটি বিকৃত ছবি প্রদান করিবে মাত্র। অত্র গ্রন্থে ছত্র বা শব্দ গণনা না করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর ব্যাপারে আমি গোটা অঞ্চলের ইতিহাসে ইহার প্রকৃত স্থান দিতে চেষ্টা করিয়াছি।

যে-কোন ইতিহাস গ্রন্থের ন্যায় এই গ্রন্থেরও একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় রহিয়াছে। ইহার প্রাসঙ্গিক বিষয় দেশীয়। আশা করি, পারস্যে আমার জন্ম ও লালনপালনের ফলে প্রধান বিষয়াদিতে আরব ও তুর্কী প্রসঙ্গ আলোচনা বাধাগ্রস্ত হয় নাই। ইহা লিখিবার সময় আমার উদ্দেশ্য ছিল, যাহাতে পাঠক অত্র এলাকার ভিতর হইতে বাহিরে দেখেন, বাহির হইতে ভিতরে নহে। ইহার অর্থ এই নহে যে বিদেশী সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান-লাভ মূল্যহীন বা অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে পাঠ করিলে ইহা আমাদিগকে মানব-প্রকৃতির সেই অনুভূতি লাভে সহায়তা করে, যাহাকে আমরা 'জ্ঞান' বলি। ইহার অর্থ এই নহে যে, এই এলাকার তেল যুক্তরাষ্ট্রের জন্য প্রয়োজনীয় বরং এই জন্য এতদ্‌ঞ্চলের জনগণের দোষগুণ, বুদ্ধিমত্তা ও বোকামী বিশ্বের জনগণের ভাগ্যকে প্রভাবিত করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও করিতে পারে।

এই গ্রন্থ প্রণয়নে আমি আরব, পারস্য, তুর্কী ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের গবেষণামূলক রচনাদি ব্যবহার করিয়াছি। তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করিতে পারিলে আমি খুশী হইতাম। কিন্তু বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া ব্যবহারে তাহাদের সংখ্যা এত অধিক হইয়াছে যে, উল্লেখ করিতে গেলে তাহা কয়েক পাতা হইবে। তাঁহাদের গবেষণাপ্রসূত কার্যাবলী ছাড়া এই পুস্তক প্রণয়ন সম্ভব হইত না এবং এই কারণেই তাহাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা গভীর ও অকপট।

বিগত পনের বৎসর ধরিয়া মিনেসোটার সেণ্টপলের "লুই· ডব্লিউ এণ্ড মন্‌ড্‌ হিল ফেমিলি ফাউণ্ডেশন"(Louis W· and Mond Hill Family Foundation of st. Paul Minnesota) সেই শহরের চারিটি কলেজকে সহযোগিতার ভিত্তিতে বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে অধ্যয়নে সাহায্য করিয়া আসিতেছে। মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের একজন সমন্বয়কারী হিসাবে অধ্যয়ন ও গবেষণার কাজে এই অঞ্চলের দেশসমূহ ভ্রমণ করিবার জন্য আমি এই প্রতিষ্ঠানের নিকট বৃত্তি লাভ করি। প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থটি আমাদের কর্মসূচীর প্রতি তাহাদের বিশ্বাসের ফলশ্রুতি। তাহাদের আগ্রহের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার একটি নিদর্শনস্বরূপ ইহা তাঁহাদের করকমলে অর্পিত হইল।

ম্যাকলেস্টার কলেজের ইতিহাসের অবৈতনিক অধ্যাপক মিঃ কেনেথ

হোল্ম্‌স্‌-এর প্রতি আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি, যিনি অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া আমাকে অতি মূল্যবান উপদেশাদি দান করিয়াছেন। ম্যাকলেস্টার কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক জেমস্‌ ওয়ালেস (James Wallace Professor of History) বয়েড মি· শেপারের সাহায্য ছাড়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। তিনি আমার সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাঠ করেন। ইতিহাসে জ্ঞান এবং সম্পাদক হিসাবে আমেরিকান হিস্টরিক্যাল রিভিউর দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা তাঁহার অসংখ্য উপদেশাদিকে অমূল্য করিয়া তুলিয়াছে। লস এঞ্জেল্‌সের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা নিক্কি কেড্ডির নিকট আমি কৃতজ্ঞ। তিনি সমগ্র পাণ্ডুলিপি পাঠ করেন। তাঁহার ধারালো ও জোরালো সমালোচনা ও উপদেশাবলীর ফলে এই গ্রন্থের মান অনেকাংশে উন্নত হইয়াছে। আমার ছাত্র এ্যালেন জিবাস ও জেমস্‌ পলজিনকেও আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা যথাক্রমে অর্ধেক ও সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া আমাকে উপদেশ প্রদান করেন। এহেন ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যদি কোন ভুলভ্রান্তি থাকিয়া যায়, তবে আমি সেগুলির এবং সমস্ত ব্যাখ্যা ও উপসংহারে ভুলত্রুটির দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি।

পরিশেষে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি আমার ধৈর্যশীল ও দীর্ঘকালীন কষ্টসহিষ্ণু সচিবদ্বয়, ক্যাথারিন ক্রস ও নেন্সী নেলসনকে যাঁহারা পুনঃ পুনঃ পাণ্ডুলিপি টাইপ করিবার পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা এতই অভিজ্ঞ যে, মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের একটি গবেষণায় তাঁহারা পরিপূর্ণ কৃতিত্ব লাভ করিতে পারেন। আমার স্ত্রী ও পরিবার, যাহারা কমপক্ষে তিন বৎসর এই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিবার সময় আমার সঙ্গে ছিল, তাহাদিগকে আমার কৃতজ্ঞতার কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

সেণ্টপল, মিনেসোটা

ইয়াহ্ইয়া আরমাজানী

সূচীপত্র

মধ্যপ্রাচ্য পরিচিতি

প্রথম খণ্ড

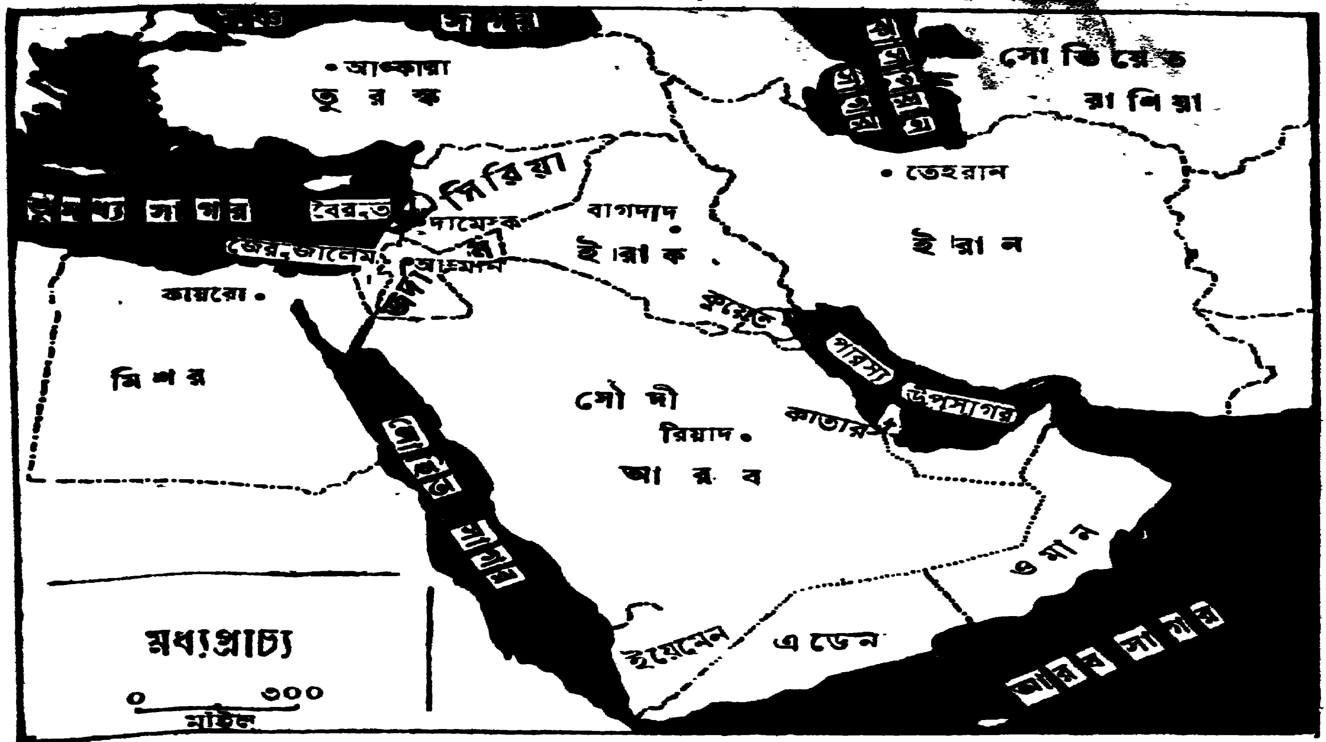
ইসলামী সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন

তৃতীয় খণ্ড

সাম্রাজ্যবাদ ও জাগরণ

চতুর্থ খণ্ড

আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য


আঙ্কারা
তুরস্ক
সোভিয়েত
রাশিয়া
কাসপিয়ান সাগর
তেহরান
ইরান
সিরিয়া
বৈরুত
দামেস্ক
বাগদাদ
ইরাক
ভূমধ্য সাগর
জেরুজালেম
আম্মান
কায়রো
কুয়েত
পারস্য উপসাগর
মিশর
সৌদী
রিয়াদ
আরব
কাতার
লোহিত সাগর
ওমান
ইয়েমেন
এডেন
আরব সাগর
মধ্যপ্রাচ্য
০ ৩০০
মাইল

মধ্যপ্রাচ্য পরিচিতি

আলোচ্য এলাকার নাম অনেকটা ইহার অন্তর্গত বিভিন্ন সমস্যাবলীর ন্যায় বিতর্কমূলক। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে প্রায় সমগ্র এলাকা ছিল ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ। ইউরোপে তখন ইহা 'নিকট-প্রাচ্য' নামে পরিচিত ছিল। ইরান, আফগানিস্তান এবং কোন কোন সময় ভারতবর্ষকেও মধ্যপ্রাচ্য বলা হইত। এশিয়ার অবশিষ্টাংশকে 'দূরপ্রাচ্য' বা প্রাচ্য বলা হইত।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ওসমানীয় সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া বলকান এলাকা অনেকগুলি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইলে 'নিকট প্রাচ্য' শব্দটি অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। তবে বিভিন্ন ফাউণ্ডেশন, কলেজ এবং সমিতির মাধ্যমে 'নিকট প্রাচ্য' নামটি প্রচলিত থাকে। কিছুসংখ্যক লেখক অবশ্য 'মধ্যপ্রাচ্যের' চেয়ে 'নিকট প্রাচ্য' নামটিকে অধিক পছন্দ করেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পূর্ব-ইরান হইতে মিসরের পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত সমগ্র এলাকাকে সামরিক এবং ল্যাণ্ডলীজ পলিসির ব্যাপারে এককরূপে গণ্য করা হইত। ফলে সৈনিকেরা পুঁথিগত ধারণা বর্জন করিয়া ইহার নামকরণ করেন 'মধ্যপ্রাচ্য'। যুদ্ধশেষে এই নাম স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এত ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইয়া পড়ে যে অবশেষে ইহাই স্থায়ী নামে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইউরোপীয় ভাবধারায় লালিত-পালিত কিছু সংখ্যক কর্মকর্তা সঠিক ভৌগোলিক সীমারেখার জন্য 'নিকট', 'মধ্য' এবং 'দূর' শব্দগুলির প্রতি বিরূপ হইয়া পড়েন। তাঁহারা জাতীয়তাবাদে অনুপ্রাণিত হইয়া এই এলাকাকে 'পশ্চিম এশিয়া' বা 'দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া' নামে অভিহিত করেন। ইহা ছাড়া আরও দুইটি নামের কথা উল্লেখ করা যায়। একটি হোগার্থের (Hogarth) ভাষায় 'অতি নিকট প্রাচ্য'

(Nearer East) এবং অন্যটি কাহনের (Kahn) ভাষায় 'অপেক্ষাকৃত নিকট প্রাচ্য' (Hither East)।

দুর্ভাগ্যবশতঃ যাঁহারা 'মধ্যপ্রাচ্য' নামটি ব্যবহার করেন তাঁহাদের অনেকেই ইহার সম্পুর্ণ এলাকার ব্যাপারে একমত নহেন। এইরূপ একটি চরমপন্থী ধারণা পোষণ করে 'মধ্যপ্রাচ্য প্রতিষ্ঠান' (Middle East Institute)। এই প্রতিষ্ঠানের মতে মরক্কো হইতে ইন্দোনেশিয়া এবং সুদান হইতে উজবেকিস্তান পর্যন্ত সমগ্র 'মুসলিম জাহান'ই হইতেছে 'মধ্যপ্রাচ্য'। আবার 'দেয়ার গোজ দি মিড্ল ইষ্ট'-এর ন্যায় আধুনিক গ্রন্থগুলি মধ্যপ্রাচ্য বলিতে শুধু 'ফারটাইল ক্রিসেণ্ট'[১] এবং মিসরকে বুঝায়। রয়েল ইনষ্টিটিউট অব ইণ্টারন্যাশনাল এফেয়ার্স (বৃটিশ) মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করিয়া 'মধ্যপ্রাচ্য' বলিতে ইরান, তুরস্ক, আরব ও ফারটাইল ক্রিসেণ্ট, মিসর, সুদান ও সাইপ্রাসকে বুঝায়। আলোচ্য গ্রন্থসহ অন্যান্য গ্রন্থে মধ্য-প্রাচ্য বলিতে সুদান ও সাইপ্রাস ব্যতীত অবশিষ্ট এলাকাগুলিকে বুঝান হইয়াছে।

৬৩৫ খ্রীস্টাব্দ হইতে মোটামুটি ১০০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মিসর, আরব, ফারটাইল ক্রিসেণ্ট ও ইরানের ইতিহাস একই প্রকৃতির। ১৩০০ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইরান ব্যতীত তুরস্ক এবং উপরোল্লিখিত এলা-কাগুলির ইতিহাসও একই ধরনের। ফলে এই গ্রন্থে মিসর, তুরস্ক, ইরান, আরব ও ফারটাইল ক্রিসেণ্টের ন্যায় একটি সীমিত এলাকাকে মধ্যপ্রাচ্য নামে অভিহিত করা ততটা অযৌক্তিক হয় নাই। কারণ ১৩০০ বৎসরেরও অধিককাল এই এলাকা ছিল সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মধারার মূলকেন্দ্র,—যাহা পর্যায়ক্রমে ইহার বহির্ভূত এলাকাকেও প্রভা-বান্বিত করিয়াছে। অতএব এই এলাকার বিভিন্ন আন্দোলন বুঝিতে পারিলে ইহার বহিরাঞ্চলের জীবন ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা যায়।

সমগ্র ভূ-ভাগটি যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় বৃহৎ এবং পারস্য উপসাগর, লোহিত-সাগর, ভূমধ্যসাগর, কৃষ্ণসাগর ও একইভাবে কাম্পিয়ান সাগরের জলরাশি

১। 'ফারটাইল ক্রিসেন্ট' বা 'উর্বর হেলাল' বলিতে ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, জর্দান ও ইসরাইলকে বুঝায়।

দ্বারা পরিবেষ্টিত মোটামুটি একটি ক্ষেত্রফল বিশেষ। দক্ষিণ মিসর ও আরব ব্যতীত এই এলাকাটি গ্রীষ্মমণ্ডলের বাহিরে অবস্থিত।

ভূমি

ভৌগোলিক দিক হইতে মধ্যপ্রাচ্য তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত।

১। দক্ষিণ এলাকা : এই এলাকায় পড়ে সমগ্র মিসর এবং উত্তর দিকে ফার্টাইল ক্রিসেণ্টের নিম্ন বাক লইয়া সমগ্র আরব উপদ্বীপ। আরব মালভূমি লইয়া ইহা আফ্রিকান সাহারা পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই অঞ্চলের গড় উচ্চতা ২,০০০ হইতে ৩,০০০ ফুট। এই মালভূমির উচ্চস্থল লোহিত সাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত হিজাজে বিদ্যমান। এই উচ্চস্থল ৯,০০০ ফুট উচ্চ এবং ক্রমান্বয়ে উচ্চতর হইয়া দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ইয়েমেন পর্যন্ত বিস্তৃত। সেখানে ইহার উচ্চতা ১৪,০০০ ফুট। এই পর্বতশ্রেণী মধ্য-আরবে মেঘের আদ্রতা বহনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়া পৃথিবীর ভয়ঙ্করতম মরুভূমি 'রুব-আল-খালি' (শূন্য এলাকা) সৃষ্টি করিয়াছে।

২। উত্তর এলাকা : এই এলাকা মধ্যপ্রাচ্যের উত্তরভাগে বিস্তৃত। ভূতাত্ত্বিক গোলযোগ এইখানে তিনটি বিস্তৃত পর্বতশ্রেণী সৃষ্টি করিয়াছে। এইগুলি তুরস্কের তারুস পর্বত, পশ্চিম ইরানের জাস্‌রস পর্বত এবং উত্তর ইরানের আলবুর্জ পর্বত। এইসব উঁচু-নীচু পর্বতশ্রেণীর মধ্যে পূর্ব-তুরস্কের আরারাত পর্বত (১৭,০০০ ফুট) হযরত নূহের (আঃ) নৌকা অবতরণ স্থল হিসাবে পাশ্চাত্যবাসীদের নিকট সুপরিচিত। দামাবন্দ (১৯,২০০ ফুট) নামে আরেকটি সুউচ্চ পর্বত উত্তর-ইরানে অবস্থিত। সারা বৎসর ইহা বরফাবৃত থাকে। হিমালয় পর্বতের পশ্চিমে ইহা সর্বোচ্চ পর্বত-শ্রেণী। পারস্যের পৌরাণিক উপাখ্যানে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।

প্রায় সমগ্র তুরস্ক আনাতোলিয়া মালভূমিতে অবস্থিত। ইহার উচ্চতা গড়ে ৩,০০০ হইতে ৫,০০০ ফুট এবং সর্বোচ্চ পর্বতশ্রেণীর উচ্চতা ৬,০০০ হইতে ৮,০০০ ফুট। বৃষ্টিপাত হয় গড়ে ১০ হইতে ১৭ ইঞ্চি এবং তাপমাত্রা জানুয়ারী মাসে ৩০ ডিগ্রী ফারেনহাইট হইতে জুলাই মাসে ৮৬ ডিগ্রীতে উঠা-নামা করে।

আধুনিক ইরানের অর্ধেকেরও বেশী অংশ ইরানী মালভূমিতে অবস্থিত এবং ইহা দেশের রাজনৈতিক সীমারেখা অতিক্রম করিয়া পাকিস্তান ও আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা ২০০ হইতে ৮,০০০ ফুট। ইরানী মালভূমি পর্বতশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত। যাহার মধ্য হইতে পানি নিষ্কাশনের কোন পথ নাই কিন্তু আনাতোলিয়া মালভূমি সেইরূপ নহে। ফলে ইরানী মালভূমির মধ্যভাগ প্রায় বৃষ্টিপাতহীন বলিয়া ইহার মধ্যে দুইটি মরুভূমি সৃষ্টি হইয়াছে। ইহার একটি হইল উত্তরে লবণাক্ত দাশত-ই-কবীর এবং অন্যটি দক্ষিণে শক্ত বালির সাধারণ মরুভূমির ন্যায়—দাশত-ই-লুত। মালভূমির বহিঃপ্রান্তের গড় বৃষ্টিপাত ৯.২ ইঞ্চি। তাপমাত্রা জানুয়ারী মাসে ৩৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট হইতে জুলাই মাসে ৮৫ ডিগ্রী ফারেনহাইটে উঠা-নামা করে।

৩। মধ্য এলাকা : এই এলাকা উত্তর ও দক্ষিণ অংশের মধ্যভাগে অবস্থিত। ইহা দক্ষিণ ফিলিস্তিন হইতে উত্তর দিকে বাঁকিয়া তারুস-এর দক্ষিণ পর্বত গাত্র পর্যন্ত এবং পুনরায় নীচের দিকে তাইগ্রীস-ইউফ্রেটিস উপত্যকা হইয়া পারস্য উপসাগর ও ওমান পর্যন্ত বিস্তৃত। পশ্চিমে দুইটি ছোট পর্বতশ্রেণী ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে সমান্তরালভাবে অবস্থিত। এইগুলি হইল লেবানন ও এ্যান্টি-লেবানন (Anti -Lebanon)। ইহাদের উচ্চতা দক্ষিণে ৫,০০০ ফুট এবং উত্তরে মেরোনাইট সেণ্টারে (Maronite Centre) ১৬,০০০ ফুট। উত্তর ও দক্ষিণের পর্বতশ্রেণী এবং মিসর ও আরবের ভগ্ন অঞ্চল হইতে দক্ষিণ ও পশ্চিমের এই অঞ্চল সামুদ্রিক জীবনের স্তূপকেন্দ্র বিধায় পারস্য উপসাগরের উভয় তীরে বিশাল তৈল ক্ষেত্রের সৃষ্টি হইয়াছে।

মধ্যপ্রাচ্যের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক বৈচিত্র্য হইল—শুষ্কতা। জরিপ করিয়া দেখা গিয়াছে, মধ্যপ্রাচ্যের শতকরা ৯০ ভাগ এলাকা শুষ্ক। সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মানবিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা হইল পানি। কারণ পানি যেখানে নাই সেখানে জীবনও নাই। বস্তুতঃ মরুভূমির ফার্সী প্রতিশব্দ বি-আবান, 'পানিহীন'। মধ্যপ্রাচ্যের শতকরা পাঁচ হইতে ছয়ভাগ অঞ্চলে চাষাবাদ হয় এবং ইহার মধ্যে এক-পঞ্চমাংশে পানির প্রয়োজন হয়। প্রাচীন আসিরীয়, ব্যাবিলনীয় এবং রোমানগণ

পানি সংরক্ষণের জন্য জলধারা ও চৌবাচ্চা নির্মাণ করিত। প্রাচীন পারস্যবাসীগণ 'কানাত' বা ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ করিয়া পাহাড় হইতে মাইলের পর মাইল সমতল ভূমিতে পানি সরবরাহ করিত। এখনও আরব ও সাহারা উভয়স্থানে বেদুইন স্ত্রীলোকগণ পানীয় জল সংরক্ষণের প্রয়োজনে উটের মূত্র দ্বারা চুল পরিষ্কার করিয়া থাকে। কায়রো শহরের বাহিরে 'স্ফিংস' (Sphinx*)-এর পাদদেশে দাঁড়াইয়া নীলনদের দিকে তাকাইলে সহজেই চোখে পড়ে যেখানে পানি আছে সেখানেই গাছ-গাছড়া জন্মিয়াছে এবং পানির নাগালের এক ইঞ্চি বাহিরে কিছুই জন্মায় নাই।

ভৌগোলিকগণ মধ্যপ্রাচ্যকে মোটামুটি ছয়টি ভাগে ভাগ করেন ঃ

(১) মরুভূমি, যেখানে কিছুই জন্মায় না, যথা নীল নদের পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চল, আরবের রুব-আল-খালী এবং ইরানের কবীর ও লুত।

(২) ফারটাইল ক্রিসেণ্টের দক্ষিণে শুষ্ক অনুর্বর ভূমি। এইখানে বসন্তের সময় উটের জন্য কিছু ঝোঁপ ও কাঁটা পাওয়া যায়। পানির জন্য বেদুইন-গণ এক অস্থায়ী পানির গর্ত হইতে আরেকটিতে ছুটাছুটি করে।

(৩) দক্ষিণ তুরস্ক, পশ্চিম ইরাক ও পূর্ব ইরানের অপেক্ষাকৃত কম শুষ্ক ভূমি। এই অঞ্চলের ভূমি চাষাবাদযোগ্য না হইলেও মোটামুটি মেষ ছাগল চরাইবার উপযোগী।

(৪) স্থায়ী বসতি এবং কোথাও কোথাও বৃহৎ শহর পরিবেষ্টিত মরুদ্যান —যেখানে প্রতিনিয়ত পানি পাওয়া যায়।

(৫) তুরস্ক ও ইরানের পাহাড়ী অঞ্চল আর সেখানকার চাষাবাদপূর্ণ সবুজ উপত্যকা, সমতল পর্বতপার্শ্ব এবং পর্বতগাত্রের অসংখ্য গ্রামসমূহ।

(৬) কৃষ্ণসাগর, কাস্পিয়ানসাগর, লোহিতসাগর, ভূমধ্যসাগর এবং পারস্য উপসাগরের উপকূলীয় এলাকা। এই জলপথগুলির প্রাচুর্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির প্রত্যেকটির জন্য সমুদ্র পথ উন্মুক্ত করিয়াছে।

এই এলাকার মধ্যে শুধু দুইটি নদী প্রবাহিত। একটি নীল নদী যাহার উৎস হইল ইথিওপিয়ার উচ্চভূমি হইতে উত্থিত নীলবর্ণের নীল এবং মধ্য

* গ্রীক উপাখ্যানের সিংহীর মূর্তি। ইডিপাস ইহার ধাঁধার উত্তর দিতে সক্ষম হওয়ায় ইহা আত্মহত্যা করে।—অনুবাদক।

আকৃতির উচ্চভূমি হইতে প্রবাহিত সাদা নীল।* উহারা খার্তুমে মিলিত হয় এবং ৪১৪৫ মাইল অতিক্রম করিয়া উত্তরে ভূমধ্যসাগরে পতিত হয়। মিসর দেশের উৎপত্তির দ্বারা নীল নদী লিবিয়া মরুভূমিকে বিভক্ত করিয়াছে। ইহার চাষাবাদ উপযোগী এলাকা নদীর উভয় তীরে দশ মাইলব্যাপী মরুদ্যান বিশেষ। অতএব মিসর সত্যই "নীল নদের দান"। নীলনদ দুই-ভাবে জীবনদাতা। ইহা শুধু পানিই বহন করে না বরং ইহার বার্ষিক বন্যা মাটির উর্বরাশক্তি বৃদ্ধি করে। দশ কোটি টন সরস পলিমাটি এই কাজে সহায়ক।

মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি নদীপথ শাত-ইল-আরব। কোন কোন স্থলে ইহা ইরাক ও ইরানের সীমান্ত হিসাবে কাজ করিতেছে। ইউফ্রেটিস ও তাইগ্রীস নদী পারস্য উপসাগরে পতিত হইবার ৬০ মাইল পূর্বে মিলিত হইয়াছে। এই সম্মিলিত প্রবাহই শাত-ইল-আরব। উভয় নদী তুরস্কের উচ্চভূমি হইতে উৎসারিত হইয়া মিলিত হইবার পূর্বে চক্রাকারে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়াছে। শাত-ইল-আরব আবার কারুন নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। কারুন নদী ইরানে অবস্থিত। ইহা জাগরস পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়াছে এবং আহওয়াজ পর্যন্ত নৌ-পরিবহনযোগ্য। এই বিশুষ্ক এলাকায় উল্লেখযোগ্য নদীগুলি হইল উত্তর তুরস্কের কিজেল ইরমাক (লাল নদী) এবং উত্তর ও দক্ষিণ ইরানের যথাক্রমে সফেদ রুদ (শ্বেতনদী) ও কার্খ। ভৌগোলিক দিক হইতে অপেক্ষাকৃত অনুল্লেখযোগ্য কিন্তু রাজনৈতিক দিক হইতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হইল জর্দান নদী। লিতানী নদী ও অরেন্ট নদী। এইগুলি সিরিয়া, লেবানন, জর্দান ও ইসরাইলের কিয়দংশে পানি সরবরাহ করে।

উত্তর ইরানের কাস্পিয়ান উপকূল এবং উত্তর-পূর্ব তুরস্কের কিয়দংশ ব্যতীত এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাত শুধু অকিঞ্চিতকরই নয় বরং যাহা হয় তাহাও বসন্ত ও শীত মৌসুমে সীমাবদ্ধ থাকে। গ্রীষ্মকালে খরা একটি নিয়মিত ব্যাপার। সাধারণতঃ আরব, ফারটাইল ক্রিসেণ্ট, মিসর এবং ইরানের কিয়দংশে উত্তপ্ত গ্রীষ্ম ও উষ্ণ শীতের সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে। তুরস্কের

* নীলবর্ণের নীল বা ব্লু নাইল বাহর আল আজরক। সাদা নীল বা হোয়াইট নাইল বা বাহর আল আবয়াজ।—অনুবাদক।

পার্বত্য এলাকায়, ইরানে ও লেবাননে ঠাণ্ডা শীতকাল ও ঠাণ্ডা গ্রীষ্মকালই সচরাচর বিরাজ করে।

হাজার হাজার বৎসর পূর্বে এই এলাকা বিশাল অরণ্যে পরিপূর্ণ ছিল বলিয়া যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ, অযত্ন ও মেষ-ছাগলের দরুণ গুটিকতক স্থান ব্যতীত সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য বর্তমানে বনহীন এলাকায় পরিণত হইয়াছে। কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ তীরে এবং লেবাননের পাহাড়ে যথেষ্ট পরিমাণ ওক ও জুনিপার বৃক্ষ পাওয়া যায়। অবশিষ্ট এলাকার একমাত্র বৃক্ষ পপ্‌লার।

মধ্যপ্রাচ্যের, প্রায় সব দেশেই গম, বার্লি, রাই, শিম, মসুর, পিয়াজ, ডালিম, নাশপাতি, ও কিসমিস উৎপন্ন হয়। জাম্বুরা ফল জন্মে লেবানন, ইসরাইল ও ইরানে। আপেল জন্মে লেবাননে। ডুমুর ফল ও শুপারী জন্মে তুরস্কে, জলপাই জন্মে ইসরাইল, জর্দান ও ইরানে। আঙ্গুর এই এলাকার প্রায় সর্বত্রই জন্মে। পারস্যের পীচফল ও তরমুজ বিশ্ববিখ্যাত এবং অনুরূপভাবে খ্যাত ইরাকের খেজুর। শেষোক্ত ফলটি পারস্য উপসাগরীয় এলাকার বেশীর ভাগ লোকের প্রধান খাদ্য। ইহার বীচি পশুর আহার্য এবং এই বৃক্ষের আঁশ দ্বারা দড়ি প্রস্তুত করা হয়। ইহার কাঠ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

শিল্প-ফসলের মধ্যে প্রধান হইল মিসরের তুলা, ফারটাইল ক্রিসেন্টের শন, ইয়েমেনের কফি এবং ইরান ও তুরস্কের চা।

এই এলাকায় কুকুর, মেষ, ছাগল, শূকর ও গর্দভের ন্যায় অনেকগুলি গৃহপালিত পশু ছিল কিন্তু চারণভূমির অভাবে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা বর্তমানে খুবই নগণ্য হইয়াছে এবং দুগ্ধ সরবরাহও অপ্রতুল হইয়া পড়িয়াছে। ঘোড়া ও উট প্রাচ্যের দেশ হইতে আনা হইয়াছে বলিয়া লোকের ধারণা। পারস্যের বিড়াল ও আরবী ঘোড়ার সুখ্যাতি সত্ত্বেও এই এলাকার প্রধানতম প্রাণী হইল উট। ভারবাহী জন্তু হিসেবে উটের স্থান আধুনিক কোন যানবাহন এখন পর্যন্ত পূরণ করিতে পারে নাই। বেদুইন জীবনে উট খুবই প্রয়োজনীয় জীব। উট বেদুইনদের জন্য দুধ ও মাংস যোগায়। ইহার লোম দ্বারা তাঁবু ও জামা প্রস্তুত হয়, গোবরে জ্বালানী হয় এবং মূত্র দ্বারা মাথার চুল পরিষ্কার করা হয়। 'মরুভূমির জাহাজ' হওয়া সত্ত্বেও ইহা

পানি উত্তোলনের চাকা ঘুরায় এবং লাঙ্গল টানে।

এই এলাকায় প্রচুর সামুদ্রিক খাদ্য পাওয়া যায়। কিন্তু ইসলাম ও ইহুদী খাদ্য-আইনের ফলে অধিবাসীদের মধ্যে ইহার প্রচলন খুবই সীমিত। পারস্য উপসাগরের সার্ডিন, কাস্পিয়ান সাগরের কেভিয়ার এবং কৃষ্ণ সাগরের চিংড়ী (Tuna) বিশ্ববিখ্যাত।

মধ্যপ্রাচ্যে চাষাবাদ খুবই সীমিত। তৈল ব্যতীত অন্য কোন খনিজ সম্পদই এই এলাকায় তেমন পাওয়া যায় না। তৈল সম্পদ এই এলাকাকে শুধু বিশ্বের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পরিণত করে নাই, ইহাকে আন্তর্জাতিক শক্তির প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও পরিণত করিয়াছে। মোটামুটি হিসাবে দেখা গিয়াছে যে ২০০০ খ্রীস্টাব্দে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন ছাড়া বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে তৈলের চাহিদা দাঁড়াইবে বৎসরে ১৬৫ কোটি টন। এই চাহিদার অর্ধেক আসিবে মধ্যপ্রাচ্য হইতে। তদুপরি সেখানকার তৈল সম্পদ এত ব্যাপক যে অনেকদিন পর্যন্ত ইহা ফুরাইবে না। এই অফুরন্ত তৈল সম্পদের অধিকাংশ রহিয়াছে ইরান, ইরাক, সৌদি আরব ও কুয়েতে। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশের তৈল সম্পদ অতি নগণ্য।

রণকৌশলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এই এলাকার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা আফ্রিকা, এশিয়া ও ইউরোপের সঙ্গমস্থল। ভূমধ্যসাগর বা 'মধ্যসাগর'-এর পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত এই এলাকা পৃথিবীর বৃহৎ মহাসাগরগুলির সংযোগস্থল যাহা 'প্রাচ্যের সেতু' বলিয়া অভিহিত। অতি প্রাচীনকাল অবধি ইহা পাশ্চাত্য হইতে চীন ও ভারতবর্ষের স্থলপথ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে।

মধ্যপ্রাচ্যের তিনটি প্রণালী বিশ্বের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করায় এই এলাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথে পরিণত হয়। ১৬ মাইল দীর্ঘ সফরাস এবং পঁচিশ মাইল দীর্ঘ দার্দানালিস বা হেলেস্পণ্ট মারমারা সাগরের দ্বারা সংযুক্ত হইয়া কৃষ্ণসাগরের সহিত ভূমধ্যসাগরের সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। এই সমস্ত প্রণালী অসংখ্য দিগ্বিজয়ীর কার্যকলাপের সাক্ষ্যস্বরূপ বিরাজমান। যেরযেস (Xerxes *) কর্তৃক ক্রোধে বেত্রাঘাত

* যেরযেস্ (৫১৯-৪৬৫ খৃঃ পূর্বাব্দ) প্রথম দারিয়েসের পুত্র এবং পারস্যের সম্রাট। তিনি গ্রীস আক্রমণ করেন এবং ৪৮০ খৃঃ পূর্বাব্দে সালামিস নামক স্থানে পরাজিত হন।
—অনুবাদক।

করিবার অনেক পূর্বকাল হইতে আজ পর্যন্ত ইহা পৃথিবীর ইতিহাসে একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিতর্কের স্থান হইয়া রহিয়াছে।

আরেকটি প্রসিদ্ধ জলপথ হইল আরব সাগরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত বাব-আল-মানদেব প্রণালী। সুয়েজ খালের মাধ্যমে ইহা ভূমধ্যসাগরের সহিত আরবসাগর ও ভারতমহাসাগরের সংযোগ স্থাপন করে।

তৃতীয় জলপথ হইল হরমুজ প্রণালী। ইহা পারস্য উপসাগরের মাধ্যমে তাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদী বিধৌত এলাকার সহিত ভারত-মহাসাগরের সংযোগ স্থাপন করে।

আধুনিক কালে রেলপথের সূচনা মধ্যপ্রাচ্যে বিরাট পরিবর্তন সাধন করে। উদাহরণস্বরূপ বার্লিন-বাগদাদ রেলপথের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীর 'প্রাচ্য-সমস্যার' (Eastern Question) প্রধান কারণ। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের এক বা একাধিক আধুনিক বিমান বন্দরে অবতরণ না করিয়া কেউ বেশী দূর যাইতে পারে না।

অর্থনৈতিক ও রণকৌশলের গুরুত্ব ছাড়াও মধ্যপ্রাচ্য কতকগুলি প্রাচীন সভ্যতার জন্মভূমি এবং বিশ্বের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মের যথা, ইহুদীধর্ম, খ্রীস্টানধর্ম এবং ইসলামের সূতিকাগৃহ হিসাবে বিরাজমান। ফলে ঐতিহাসিক, ধর্মতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর জন্য এই এলাকায় প্রচুর গবেষণার উপকরণ রহিয়াছে।

সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যকে প্রাচীন গৃহ-স্থাপত্যশিল্পের পর্যায়ে ফেলা যায়। ইহার চারিটি বাহু ও একটি কেন্দ্রস্থল রহিয়াছে। একটি বাহু উত্তর পশ্চিমে তুরস্ক, দ্বিতীয়টি পূর্বে ইরান, তৃতীয়টি দক্ষিণে সৌদী আরব এবং চতুর্থটি দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত মিসর। কেন্দ্রীয় স্থান হইল ফারটাইল ক্রিসেণ্ট। ইহার মধ্যে রহিয়াছে বর্তমান লেবানন, সিরিয়া, ইসরাইল, জর্দান ও ইরাক। প্রত্যেকটি বাহু হইতে কেন্দ্রস্থলের দিকে একটি প্রবেশ পথ রহিয়াছে। তুরস্ক ও ইরানের সম্মুখদ্বার ছাড়াও প্রত্যেকটির পশ্চাৎদ্বার আছে। তুরস্কের পশ্চাৎদ্বার ইউরোপের দিকে এবং ইরানের পশ্চাৎদ্বার এশিয়ার দিকে। ইতিহাসে পাওয়া যায় যখনই এই দুই দেশের কোন একটির কেন্দ্রস্থলের পথ বন্ধ হইয়াছে তখনই সেই দেশ বিচলিত বোধ করিয়াছে, যদিও সেইজন্য বিচলিত হওয়ার কোন কারণ ছিল না।

সমগ্র ইতিহাসে এশিয়া মাইনরের জাতিসমূহ, প্রথমে বাইজেণ্টাইনগণ এবং পরে তুর্কীগণ, ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিয়াছে। অনুরূপভাবে সেই সময়ে পারস্যবাসীগণও চীন, ভারতবর্ষ ও পাশ্চাত্যের জাতিসমূহের সহিত যোগসূত্র রক্ষা করিয়াছে।

অপরদিকে অন্য দুইটি বাহু, সৌদী আরব ও মিসরের অন্য কোন অঞ্চলের দিকে পশ্চাৎদ্বার নাই অথবা তাহারা সেইগুলি ব্যবহার করে নাই। যুগ যুগ ধরিয়া আরব ও মিসরের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জনবলের পদসঞ্চার হইয়াছে ফারটাইল ক্রিসেণ্টের দিকে। ফলে যখনই এই দুই দেশের কোনটির কেন্দ্রস্থলের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে তখনই উহা নিজেকে বিপন্ন মনে করিয়াছে। ইতিহাসে দেখা যায় যতগুলি শক্তি ফারটাইল ক্রিসেণ্ট আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে তাহারা প্রায় সকলেই মিসর ও আরব উপদ্বীপ জয় করিতে সক্ষম হইলেও তুরস্ক বা ইরান জয় করিতে পারে নাই। ফলে আরব জাতীয়তাবাদ ছাড়াও ফারটাইল ক্রিসেণ্টে বিংশ শতাব্দীর ঘটনাবলীর প্রতি সৌদী আরব ও মিসরের স্বার্থ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পক্ষান্তরে তুরস্ক ও ইরানের ভূমিকা এই ব্যাপারে খুবই নগণ্য।

অধিবাসী

মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় অধিকাংশ অধিবাসী যথা, মিসরীয়, লেবানন, তুর্কী ও পারস্যগণ গ্রীক, ইটালীয়ান, স্পেনীয় ও আইরিশদের ন্যায় সাধারণ ককেশীয় জাতি। এই এলাকায় বিশেষ করিয়া সুদানে নিগ্রো ধরনের লোকও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে রহিয়াছে। উত্তর-পূর্ব ইরানের তুর্কমানগণের ন্যায় কতকগুলি মঙ্গোলীয় জাতিও এই অঞ্চলে বাস করে। কিছু কিছু বিচ্ছিন্ন অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য দীর্ঘকাল যাবত একটি সংযোগস্থল হিসাবে থাকার ফলে বিভিন্ন জাতিতে এত মিশ্রণ ঘটিয়াছে যে, দৈহিক গঠনের দিক হইতে তাহাদের পার্থক্য নির্ণয় করা একরূপ অসম্ভব।

মধ্যপ্রাচ্যের লোকদের মধ্যে অন্য যেকোন বিষয়ের চাইতে বেশী পার্থক্য সৃষ্টি করিয়াছে ভাষা।

(ক) ইন্দো-ইউরোপীয়ান : এই শ্রেণীর প্রধান অংশ হইল পারস্যবাসীগণ। তাহাদের সহিত আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান এবং তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান ও পাকিস্তানের কিছু অংশের ভাষা ও সংস্কৃতিগত সম্পর্ক রহিয়াছে। ফার্সী ভাষার সহিত ভারতবর্ষ ও ইউরোপের ভাষাগত মিল রহিয়াছে। তেমনি মধ্যপ্রাচ্যে আরমেনিয়ান ও কুর্দদের সহিত পারস্যবাসীদের ভাষাগত সম্পর্ক রহিয়াছে। অবশ্য ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হইতে তাহাদের সহিত পারস্যবাসীদের পার্থক্য রহিয়াছে। আরমেনিয়গণ মধ্যপ্রাচ্য ও পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। তবে তাহাদের প্রধান অংশ রহিয়াছে আরমেনিয়ার সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে। অপরদিকে কুর্দগণ তত বিশ্বজনীন নহে। তাহাদের অধিকাংশ বাস করে তুরস্ক, ইরান ও ইরাকের একটি বিশেষ এলাকায়। উভয় শ্রেণীর মধ্যে জাতীয়তাবাদী বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে।

(খ) তুর্কী জাতি : মধ্যপ্রাচ্যের এই শ্রেণীর প্রধান অংশ হইল তুর্কগণ। প্রাচ্যে তাহাদের ভাষাগত মিল রহিয়াছে তুর্কমান ও উজবেকদের সহিত এবং পাশ্চাত্যে মিল রহিয়াছে হাঙ্গেরীয় ও ফিনিশদের সহিত। আলোচ্য গ্রন্থে আমরা দেখিতে পাইব মধ্যপ্রাচ্যে তুর্কীগণ তুলনামূলক ভাবে নবাগত।

(গ) সেমিটীয় : সেমিটিক ভাষাভাষী লোকজন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সন্নিহিত এলাকায় বাস করে। তাহারা ইন্দো-ইউরোপীয়দের ন্যায় বিক্ষিপ্ত বা তুর্কীদের ন্যায় পৃথকভাবে বসবাস করে না। মধ্যপ্রাচ্যের এই শ্রেণীর প্রধান অংশ হইল আরবী ভাষী লোকজন। ইহারা কোন বিশেষ 'জাতি' নহে, কারণ তাহাদের মধ্যে অঞ্চলগত, জাতিগত ও ধর্মগত পার্থক্য রহিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যের আরবী ভাষী লোকদের সঙ্গে সুদান, উত্তর আফ্রিকা এবং সুদূর পশ্চিমের আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার লোকদের ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত সম্পর্ক রহিয়াছে।

হিব্রুভাষী ইহুদীদের সহিত আরবদের ভাষাগত সম্পর্ক বিদ্যমান। মধ্যপ্রাচ্যে তাহারা পৃথক রাষ্ট্রের অধিকারী। আরেকটি সংশ্লিষ্ট শ্রেণী হইল আসিরীয়গণ বা কালদিয়ানগণ। তাহারা সিরিয়াক ভাষায় কথা বলে। আসিরীয়গণ খ্রীস্টান এবং প্রায়ই ইরান ও ইরাকে বাস করে। ইহাদের একটি

ক্ষুদ্র অংশ সিরিয়া ও লেবাননে বাস করে এবং বৃহদাংশ মধ্যপ্রাচ্যের বাহিরে যুক্তরাষ্ট্রে বাস করে।

ধর্মীয় শ্রেণীবিন্যাস

ভাষাগত শ্রেণীর বিভিন্নতা ধর্মীয় পার্থক্য দ্বারা বিশৃঙ্খল। এই ধর্মীয় পার্থক্যগত বিশৃঙ্খলা বেশ জটিল। মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ লোক মুসলমান। তাহারা আবার সুন্নী ও শিয়া মতবাদে বিভক্ত। বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমান সুন্নী। তাহারা নিজেদেরকে সুন্নাহ্ বা রাসুলুল্লাহ্‌র (দঃ) নির্দেশিত পথের অনুসারী বলিয়া বিশ্বাস করেন কিন্তু তাহাদের এই দাবীর যথার্থতার ব্যাপারে ওহাবীগণ প্রশ্ন তুলিয়াছেন। ওহাবীবাদ সৌদী আরবের রাষ্ট্রীয় ধর্ম। শিয়াদের প্রধান বিভাগগুলি হইল (ক) জাফরী বা বার ইমামবাদী (Twelvers)। ইহা ইরানের রাষ্ট্রীয় ধর্ম এবং ইহার অনুসারীগণ মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশেও ইতস্ততঃ বাস করে; (খ) ইসমাইলীয়গণ বা সাত (Seveners) ইমামবাদীগণ সমগ্র ইসলামী বিশ্বে বিক্ষিপ্ত; (গ) যায়েদীয়গণ, যাহাদের ধর্ম ইয়েমেনের রাষ্ট্রীয় ধর্ম; (ঘ) আলাবীয়গণ, যাহারা উত্তর সিরিয়ায় বাস করে।

সুফীগণ ইসলামী সমাজের অন্তর্ভুক্ত। তাহারা কোন পৃথক মতবাদ সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু উলামাগণ বা ইসলামের ধর্মীয় পণ্ডিতগণ তাহাদের অতীন্দ্রিয় মরমীবাদের যথার্থতায় সন্দেহ প্রকাশ করেন। ইসলামের ক্রমবিকাশ আলোচনার সময় এই সমস্ত শ্রেণী সম্পর্কে আরো আলোকপাত করা হইবে।

এই অঞ্চলের অমুসলিম ধর্মগুলি সম্পর্কে কোন জ্ঞান না থাকিলে মধ্যপ্রাচ্যের কোন ভূমিকাই সম্পুর্ণ হইবে না। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এই সমস্ত ধর্মের কোন আলোচনা অসমীচীন বিধায় এইখানে কিছু সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হইল।

মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মীয় ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু হইল খ্রীস্টানরা। মধ্যপ্রাচ্যে খ্রীস্টানগণ চারিটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ঃ

(ক) প্রাচ্যদেশীয় সনাতন গীর্জা (Eastern Orthodox Church)। ইহা প্রাচ্যের চারিটি প্রাচীন নগরী হইতে উদ্ভূত—কনস্টান্টিনোপল (বর্তমানে ইস্তাম্বুল), আলেকজান্দ্রিয়া, এন্টিওক ও জেরুজালেম। এইগুলি ১০৫৪

খ্রীস্টাব্দে পাশ্চাত্য গীর্জা হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে। পরবর্তীকালে এই গীর্জা গ্রীক সনাতন (Greek Orthodox), রুশসনাতন (Russian Orthodox) ইত্যাদি প্রথায় বিভক্ত হইয়াছে এবং প্রত্যেকটি নিজ নিজ স্বাধীন গীর্জার অধিকারী (Antocephalous) এবং প্রত্যেকটির নিজস্ব ধর্মযাজক আছে। তবে কনস্টান্টিনোপল-এর ধর্মযাজকের অনুসারীগণ প্রধানতঃ গ্রীক। কিন্তু কায়রো কেন্দ্রের আলেকজান্দ্রিয়া ধর্মযাজকের অনুসারীগণ আরব ও গ্রীক এন্টিওক ও জেরুজালেমের ধর্মযাজকের অধিকাংশই খ্রীস্টান-আরব। এন্টিওক ধর্মযাজকের কেন্দ্রস্থল দামেস্ক।

(খ) প্রাচ্যদেশীয় গীর্জাগুলি (Oriental Churches): এই সম্প্রদায়ের অনেকগুলি শাখা রহিয়াছে:

১। মিসরের কিপ্তি গীর্জা (The Coptic Church of Egypt)। এই গীর্জা, যাহার ধর্মযাজক কায়রোতে বাস করেন, কল্সেডন্ পরিষদের (Counsil of Chalcedon) সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করিয়া মনোফিজাইট (Monophysite) হইয়া যান। মনোফিজাইটগণ যীশুখ্রীস্টের একাত্মতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ইহা ইথিওপিয়ার গীর্জার মত। তবে পার্থক্য এই যে মিসরে স্তোত্রমালা হইল কিপ্তি ও আরবী ভাষায়। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে কিপ্তদের ভাষা আরবী। স্তোত্রমালার কিছু অংশে কিপ্তি ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র।

২। সিরীয় গীর্জা, যাহাকে 'জেকোবাইট'ও বলা হয়। এই গীর্জাও মনোফিজাইট এবং সিরিয়ার হামসে বসবাসকারী এন্টিওক ধর্মযাজক দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার স্তোত্রমালা সিরিয়াক ভাষায় পরিচালনা করা হয়।

৩। আর্মেনীয় গীর্জা: প্রায়শঃই 'গ্রেগরীয়ান' নামে উল্লেখিত এই গীর্জা প্রাচ্যদেশীয় সনাতনের মতানুসারী। আরমেনিয়ার সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ইসমির্জন ক্যাথলিক (Catholicos of Etchmizdzin) ইহার গুরুত্বপূর্ণ ধর্মযাজক। ইহা একটি জাতীয় গীর্জা, কারণ ককেশাশে আরমেনিয়ানদের জাতিগত অস্তিত্ব ছিল। সুদীর্ঘ ইতিহাসে তাহারা প্রথমে বাইজান্টাইন-পারস্য যুদ্ধ ও পরে ওসমানীয়-পারস্য যুদ্ধের মাঝখানে পতিত হয়। ফলে বিগত শতাব্দীগুলিতে তাহারা ওসমানীয় ও পারস্যবাসী

উভয়ের এবং পরে রুশদের অধীনস্থ হইয়া পড়ে। রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের ফলে ইরিভানকে রাজধানী করিয়া আরমেনিয়ান সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইহা ছাড়াও আরমেনিয়ান সম্প্রদায়গুলি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে বিক্ষিপ্ত।

৪। নেস্তোরিয়ানগণ (The Nestorians) : গীর্জা হিসাবে নেস্তোরিয়ানগণ যীশুখ্রীষ্টের দুই প্রকৃতিতে বিশ্বাসী। ইসলামের আগমনের পূর্বে সমগ্র এশিয়ায় তাহারাই ছিল খ্রীস্টানধর্মের প্রধান প্রচারক। ইরানের ধর্মযাজকের পক্ষ হইতে তাহারা সুদূর চীন পর্যন্ত ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করে। 'জাতি' হিসাবে তাহাদিগকে আসিরীয় বলা হয় এবং তাহারা কথা বলে সিরীয় ভাষায়—যাহা সেমিটিক ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাহাদের ধর্মযাজক, মার শিম্মুন (Mar Shimmun), পার্থিব ও ধর্মীয় শাসনকর্তা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কৃষিজীবী সিরিয়ানগণ ইরানের আধিপত্যে বসবাস করিত। অপরদিকে জীলো (Jeeloo) নামে পরিচিত পাহাড়ী অধিবাসীগণ তুর্কীদের অধীনে বাস করিত। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় উভয় শ্রেণীই আন্তর্জাতিক কোন্দলের শিকারে পতিত হয়। মধ্যপ্রাচ্যে সর্ববৃহৎ আবসেনিয়ান বসতি হইল ইরান ও ইরাকে।

(গ) রোমান ক্যাথলিক। তাহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী ল্যাটিন রীতিনীতি অনুসরণ করে এবং তাহারা মধ্যপ্রাচ্যে বসতকারী ইউরোপীয় রোমান ক্যাথলিক। বিভিন্ন সনাতন ও প্রাচ্যদেশীয় গীর্জার ব্যক্তিগত ধর্মান্তরিত লোকদের লইয়া ইহা গঠিত। আরেকটি শ্রেণী এবং অপেক্ষাকৃত বৃহৎ শ্রেণী হইল ইউনিয়েট গীর্জা (Uniate Church)। এই নাম দেওয়া হয় সনাতনদিগকে—যাহারা পোপের আধিপত্য স্বীকার করে কিন্তু অপরদিকে উপাসনায় প্রাচ্যদেশীয় রীতিনীতি পালন করিতে পারে। তাহাদের ধর্মযাজক বিবাহ করিতে পারেন। মোটামুটিভাবে ইউনিয়েটগণ তাহাদের মৌলিক জাতীয় নীতিতে বিশ্বাসী এবং তাহাদের নিজস্ব ধর্মযাজকও আছে। এইগুলি হইল গ্রীক ক্যাথলিক, সিরীয় ক্যাথলিক, আরমেনীয় ক্যাথলিক, কলডীয় ক্যাথলিক (নেস্তোরিয়ান), কিপ্তি ক্যাথলিক ও মেরোনাইট ক্যাথলিক। শেষোক্তটি সর্ববৃহৎ উপবিভাগ এবং রীতি অনুসারে লেবানন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হয় এই বিভাগ হইতে।

(ঘ) এ্যাঙ্গলিকান ও প্রটেস্টাণ্ট (Anglican and Protestant) ঃ এ্যাঙ্গলিকানগণের কাজ হইল মধ্যপ্রাচ্যের বৃটিশ সম্প্রদায়গুলির এবং প্রাচ্য-দেশীয় ধর্মান্তরিতদের নেতৃত্ব প্রদান। এই দলে কিছু ধর্মান্তরিত মুসলমান ও ইহুদীও রহিয়াছে। প্রটেস্টাণ্ট গীর্জাগুলির উদ্ভব হইয়াছে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর আমেরিকান গীর্জাগুলির মিশনারী কার্যাবলী হইতে। ইহার সদস্যবৃন্দ হইল প্রাচ্যদেশীয় গীর্জা, এবং ইসলাম, ইহুদী ও জরথুস্ত্র ধর্ম হইতে নূতন দীক্ষিত লোকজন।

মধ্যপ্রাচ্যের আরেকটি অমুসলিম ধর্ম হইল ইহুদী ধর্ম—যাহা ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষভাবে কাজ করিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যের মূল ইহুদী অধিবাসীদের সকলেই শেফারডিম (Sepheardim) সম্প্রদায়ভুক্ত। অপরদিকে ইসরাইলে বসবাসকারী আশকেনাজিম (Ashkenazim) সম্প্র-দায়ভুক্ত সকলেই ইউরোপ হইতে সম্প্রাগত। সৌদী আরব, জর্দান ও ইয়েমেন ব্যতীত মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ দেশেই ছোট ছোট ইহুদী সম্প্রদায়-ভুক্ত লোকজন আছে বলিয়া দাবী করা হয়।

মধ্যপ্রাচ্যের তৃতীয় অমুসলিম ধর্ম হইল আরব বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত পারস্যবাসীদের জরথুস্ত্র ধর্ম (অগ্নি উপাসক)। ইহা ইহুদীধর্ম বিশেষভাবে খ্রীস্টানধর্ম ও ইসলামকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। ইহার দুইটি শাখা, মিথরাই-জম (Mithraism) এবং মনিচ্যানিজম (Manicheanism) খ্রীস্টানদের মত রোমান সাম্রাজ্যের নাগরিকদের ধর্মীয় আনুগত্য দাবী করে। আরব বিজয়ের পর যাহারা নিহত হয় নাই বা ধর্মান্তরিত হয় নাই তাহাদের একটি বিরাট অংশ ভারতবর্ষে পলায়ন করিয়া ভারত ও পাকিস্তানে পার্সী সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছে। জরথুস্ত্রদের একটি ক্ষুদ্র অংশ এখনও ইরানে বসবাস করে।

মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য অমুসলিম ধর্মসমূহের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলির কথা উল্লেখ করিতেই হইবে ঃ

দুর্জী বা দ্রুজেস (The Drwzes) ঃ লেবানন, সিরিয়া ও ইসরাইলে বসবাসকারী এই ধর্মানুসারীগণ শিয়া সম্প্রদায়ের ইসমাইল উপ-বিভাগের একটি অংশ। তাহারা ফাতেমীয় বংশের খলিফা হাকিমকে (৯৯৬ হইতে ১০২১ খ্রীঃ) সৃষ্টিকর্তার অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে। এই নামটি বোধ হয় তাহাদের প্রথম মিশনারী দারাজী (Darazi ১০১৯) হইতে উদ্ভূত

তাহারা কোন ধর্ম গ্রহণ করে নাই কিন্তু প্রত্যেক ধর্মের সার গ্রহণ করিয়া কালক্রমে একটি আলাদা জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

ইয়াজিদিগণ (The Yazidis) : নিজেদের ধর্মে তাহারা শয়তানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলেও তাহাদের প্রতিবেশীগণ তাহাদিগকে 'শয়তান পূজারী' বলিয়া অভিহিত করে। ইয়াজিদিবাদ শিয়া ইসলামের একটি প্রশাখা। তবে ইহাতে মুসলিম, ইহুদী, খ্রীস্টান ম্যানিকিয়রবাদ ও শামানবাদ-এর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। এই ধর্মে প্রায় ২৫,০০০ হাজার বিশ্বাসী রহিয়াছে। তাহারা উত্তর সিরিয়া ও ইরাকে বাস করে।

সাবিয়ান (The Sabian) : ইহাদিগকে প্রাক-ইসলামী যুগের আরবের সাবিয়ান বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। এই সাবিয়ানগণকে (বা ম্যানডিন্স্, Mandians) সাধারণতঃ, কিন্তু ভ্রমবশতঃ বোধ হয় সেণ্টজন দি ব্যাপটিস্ট মতাবলম্বী খ্রীষ্টান (The Christians of St. John Baptist) বলা হয়। ইহাদের ধর্ম জুদিও-খ্রীস্টান (Judio-Christian) ছাঁচে গড়া। কোরান শরীফে ইহাদের কথা তিনবার উল্লেখ আছে। বোধ হয় এজন্যেই মুসলমান-গণ ইহাদিগকে 'আসমানী কেতাবের অধিকারী' মর্যাদা প্রদান করে। ধর্মীয় রীতি অনুসারে তাহাদের গোসল করিবার নীতিতে মুগ্ধ হইয়া আরবগণ ইহাদিগকে মুখতাসিলা (যাহারা গোসল করে) বলিয়া অভিহিত করে। এই কারণে ব্যাপ্টিস্ট জনের অনুসারীদের সহিত তাহাদের স্বাভাবিক সম্পর্ক ধারণা করা হয়। বর্তমানে তাহারা প্রায়ই ইরাকে বাস করে এবং রৌপ্যশিল্প বিশেষজ্ঞ হিসাবে সুপরিচিত।

বাহাইগণ (The Bahais) : ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে ইরানে প্রতিষ্ঠিত এই ধর্ম শিয়া ইসলামের শায়খী সম্প্রদায়ের একটি প্রশাখা। ইহাকে 'বাবী' বলা হইত। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে বাহাইগণ বাবীগণ হইতে আলাদা হইয়া নিজস্ব একটি ধর্ম গঠন করে। বহু ঝড়-ঝাপটার মধ্য দিয়া এক শতাব্দীরও অধিক কাল টিকিয়া থাকিবার পর এই ধর্ম সার্বজনীনতা লাভ করে। বাহাইদের অধিকাংশ লোক ইরানে বাস করে, যদিও তাহা স্বীকৃত নহে। তাহাদের কেন্দ্রস্থল ইসরাইলের হাইফা। বিশ্বের অনেক জায়গায় তাহাদের 'অধিবেশন' রহিয়াছে।

প্রভেদ ও ঐক্য

বহু শতাব্দী যাবৎ বিভিন্ন প্রকারের সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক স্বায়ত্ত-শাসন ভোগী এই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের উপর রহিয়াছে এগারটি আধুনিক রাষ্ট্র ও প্রায় সাতটি শেখ-শাসিত রাষ্ট্র। ইহাদের প্রত্যেকটি বিভিন্ন প্রকারের স্বাধীনতা ও উন্নতির অধিকারী। সৌদি আরব ব্যতীত কোন রাষ্ট্রই একক ধর্মীয় সম্প্রদায় লইয়া গঠিত নহে, অতএব কঠোর ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক আনুগত্যের প্রশ্নে প্রায়ই ইহাদের মধ্যে অথনৈক্য দেখা দেয়। ফলে মধ্য-প্রাচ্যের সব রাষ্ট্রেই জনসাধারণের পরিচয় তাহাদের ধর্মের মাধ্যমে হয় বলিয়া সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক বলিয়া মনে করে। এই বিপত্তি অতিক্রমের জন্য লেবানন একটি পন্থা আবিষ্কার করিয়াছে। এই পন্থার পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যানুসারে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলিকে সমানুপাতিক রাজনৈতিক ক্ষমতা দেওয়া হয়। একজন মেরোনাইট ক্যাথ-লিককে সর্বদা প্রেসিডেণ্ট মনোনীত করা হয়, একজন সুন্নী মুসলমানকে করা হয় প্রধানমন্ত্রী, একজন শীয়া মুসলমানকে করা হয় পার্লামেণ্টের স্পীকার, একজন সনাতন খ্রীস্টানকে মন্ত্রীসভায় লওয়া হয়, একজন দুর্জীকে আরেকটি মন্ত্রীসভায় লওয়া হয় ইত্যাদি। ইহা একটি অনিশ্চিত ব্যাপার হইলেও শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থানের জন্য ইহা ইরাকের অবস্থার তুল-নায় অনেক উন্নততর। ইরাকে শীয়া সংখ্যাগুরু জনসাধারণ সুন্নী সংখ্যা-লঘু জনসাধারণ কর্তৃক শাসিত হয়। তদুপরি তাহাদের মধ্য রহিয়াছে কুর্দগণ, যাহারা সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত কিন্তু ভাষাগতভাবে পারস্যবাসীদের সহিত সংযুক্ত। আরমেনিয়ান ও আসিরীয়গণ অবশিষ্ট ইরাকীদের ভাষাও ব্যবহার করে না, ধর্মও পালন করে না।

উপরে বর্ণিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, মধ্যপ্রাচ্যের জনসাধারণের মধ্যে সাংস্কৃতিক প্রভেদ রহিয়াছে। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে শ্রেণী ভাগ খুবই জোরালো। লোকজন নিজেদের মধ্যে আনুগত্যের প্রশ্নে বিভিন্ন বিরোধে পতিত হয়, কখনও ভাষাগতভাবে যথা আরবী, আরমে-নীয়, হিব্রু, কুর্দী, ফার্সী, সিরীয় ও তুর্কী এবং কখনও ধর্মগতভাবে যথা, বাহাই, দ্রুজেন, ইহুদী, সনাতনী, প্রটেস্টাণ্ট, রোমান ক্যাথলিক, সাবি-য়ান, শীয়া, সুন্নী, ইয়াজিদী বা জরথুস্ত্র এবং কখনও কখনও বিরোধে

পতিত হয় জাতিত্বের ভিত্তিতে'; যখন জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের প্রশ্ন উঠে। শেষোক্ত প্রকৃতির আনুগত্য ইসরাইলী, পারস্যবাসী ও তুর্কীদের মধ্যে যত প্রবল, অন্যান্য আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তত প্রবল নহে। এই প্রভেদ লক্ষ্য করিয়া নৃতত্ত্ববিদ কার্লটন কুন (Carleton Coon) মন্তব্য করিয়াছেন, মধ্যপ্রাচ্য বিভিন্নজাতির সংমিশ্রণ, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক শ্রেণী সম্বলিত জোড়াতালি দেওয়া বালাপোষ বিশেষ।

এতদসত্ত্বেও এই জোড়াতালি দেওয়া বালাপোষের মধ্যেই রহিয়াছে কতকগুলি সুতা যাহা সব জায়গার সাথে সংশ্লিষ্ট, ফলে যে-কেউ এখানে একই প্রকৃতির চিত্র দেখিতে পায় ও একটি ঐক্য লক্ষ্য করে। এই চিত্র-গুলির একটি হইল জনসাধারণের সমাজ জীবন। ইহাতে সহজেই বলা যায় সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে তিন ধরনের সামাজিক জীবন বিদ্যমান : বেদুইন, গ্রাম ও শহর।

মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত জনসাধারণের শতকরা বোধহয় পাঁচ ভাগেরও কম বেদুইন। লেবাননে প্রায় নাই। অপরদিকে সৌদী আরবে তাহাদের সংখ্যা শতকরা পঁচিশ হইতে ত্রিশ ভাগ। বেদুইনদের প্রধান সমস্যা হইল ঘাস এবং পানি সংগ্রহ করা। কিন্তু তাহা নির্ভর করে স্থানীয় এলাকার সুযোগ-সুবিধার উপর। তাহাদের প্রধান পেশা হইল মেষ, ছাগল ও উট চরানো। ফারটাইল ক্রিসেণ্ট ও আরব উপদ্বীপের যেসব বেদুইন সমতল ভূমিতে পানির সন্ধান করে তাহাদিগকে বলা হয় 'ক্রোবলীয়' (Horizontal). পক্ষান্তরে পাহাড়ী, ইরান ও তুরস্কের যেসব বেদুইন গ্রীষ্মকালে ঘাসের সন্ধানে পাহাড়ের উপরে বাস করে তাহাদিগকে 'শীর্ষবিন্দু স্থানীয়' (Vertical) বলা হয়। কিন্তু উভয়ের সামাজিক জীবন একই প্রকৃতির এবং তাহারা একজন বংশগত নেতা কর্তৃক শাসিত হয়। এই নেতা আরবদের মধ্যে 'শেখ' এবং পারস্যবাসী ও তুর্কীদের মধ্যে 'খান' নামে পরিচিত। বেদুইনগণ প্রকৃতপক্ষে স্বাবলম্বী। তাহারা যেসব দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারে না সেগুলির জন্য শহরবাসীদের নিকট মেষ, দুধ, পনীর, মাখন ও উল বিক্রয় করে। তাহারা সকলেই তাঁবুর মধ্যে বাস করে এবং মুহূর্তের আদেশে নিজেদের সব মালামাল লইয়া যাত্রা করিতে পারে। তাহাদের আনুগত্য কেন্দ্রীয় সরকারের চাইতে গোত্রের প্রতিই বেশী।

আধুনিক আয়কর, পার্লামেন্ট, সামরিক কাজ বা জাতীয় সীমান্ত তাহারা বুঝে না বা বুঝিলেও গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া মনে করে। পূর্বে গোত্র-গুলিকে রাজ্যের মেরুদণ্ড মনে করা হইত। স্ব স্ব এলাকায় তাহারা স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিত এবং বিনিময়ে রাজা বা খলীফাকে যুদ্ধের সময় সৈন্য প্রদান করিত। তাহাদের আনুগত্য প্রকাশ শাসকের ক্ষমতার উপর নির্ভর করিত। বর্তমান জাতীয় বাজেট, জাতীয় সেনাবাহিনী ও জাতীয় শিক্ষার যুগে অবশ্য তাহারা এক অসম যুদ্ধে লিপ্ত এবং তাহাদের বেদুইন জীবন যাত্রা একদিন নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, মধ্যপ্রাচ্যের শতকরা ৭৫ হইতে ৮০ ভাগ লোক কৃষিজীবী। ক্ষেত-খামার ইহাদের প্রধান অর্থনৈতিক আধার। সেই সঙ্গে আছে শিল্পবিদ্যা। সামাজিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র গ্রাম মূলতঃ একত্রে নির্মিত কতকগুলি ঘর বিশেষ। মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সর্বত্রই এই সমস্ত ঘর রৌদ্রে পোড়ান ইট দ্বারা নির্মিত। উত্তর সিরিয়া ও আরবের কিছু অংশ ব্যতীত সমগ্র এলাকায় গ্রাম্য বাড়ীগুলি প্রায়ই একতলা বা দ্বিতল। উত্তর সিরিয়া ও আরবের কিছু অংশের বাড়ীগুলি এলোমেলো ঘনক্ষেত্র বিশেষ, পাহাড়ী অঞ্চলের গ্রামগুলি পাহাড়ের পার্শ্বদেশে সন্নিবিষ্ট। এইসব গ্রামের অধি-কাংশই প্রধান সড়ক হইতে দূরে বলিয়া এইগুলি প্রায় চোখেই পড়ে না। অধিকাংশ কৃষকদের চাষাবাদ পদ্ধতি প্রায় গত কয়েক হাজার বৎসরেও কোন পরিবর্তন হয় নাই। তবে কেহ কেহ মোটামুটি উন্নততর পদ্ধতি ব্যবহার করে আবার অনেকেই আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। বৈজ্ঞানিক কৃষি পদ্ধতির ব্যাপারে অজ্ঞতা, নিরক্ষরতা, রোগ এবং জমিদারী প্রথার ফলে এতদঞ্চলের চাষীদের মধ্যে আর্থিক প্রাচুর্য মোটেই থাকে না। গুটিকয়েক ছাড়া অধিকাংশ চাষী দারিদ্রের ভিতর দিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

গ্রামবাসীদের পোশাক খুবই সাধারণ। তাহা মিসরীয়দের 'রাত্রিকালীন পোশাক' হইতে পারস্যবাসীদের লম্বা কোর্তা ও পায়জামায় সীমাবদ্ধ। রুটির সঙ্গে কিছু তরকারী তাহাদের নিত্যদিনের আহার্য। গ্রাম্য মহিলাগণ তাহাদের শহুরে বোনদের ন্যায় নিভৃতে বাস করে না, আবার গোত্রীয় মহিলাদের ন্যায় স্বাধীনতাও ভোগ করে না। গোত্রীয় লোকজন গর্বিত ও

অস্থির কিন্তু গ্রামের লোকজন নম্র ও তৃপ্ত। মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সব আধুনিক রাষ্ট্র চাষীদের অবস্থার উন্নতিকল্পে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার উদ্বোধন করিয়াছে। এই পরিকল্পনার মধ্যে জমি বণ্টন হইতে আরম্ভ করিয়া শিক্ষা বিস্তার ও সমবায় প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত আছে। ইরানে একটি অত্যাধুনিক কর্মপন্থা অবলম্বন করিয়া হাজার হাজার যুবককে 'শিক্ষা বাহিনী' বা 'স্বাস্থ্য বাহিনী' বা এই ধরনের কোন বাহিনীতে তালিকাভুক্ত করা হয়। তাহারা বাধ্যতামূলক সামরিক কাজের পরিবর্তে দুই বৎসর সমগ্র দেশের গ্রামগুলিতে কাজ করে।

সুশৃঙ্খল ও আধুনিক জীবনযাত্রা মধ্যপ্রাচ্যে সর্বদাই বিরাজমান ছিল। এই দিক দিয়া দামেস্ক পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রাচীন নগর হিসাবে গর্ববোধ করিতে পারে। ইহা ছাড়া বাগদাদ, বৈরুত, কায়রো, ইস্পাহান, ইস্তাম্বুল, জেরুজালেম ও মক্কা যেকোন মাপকাঠিতে প্রাচীন নগর। মধ্যপ্রাচের শহর ও নগরগুলিকে সাধারণ শ্রেণীভুক্ত করা দুরূহ ব্যাপার, তবে শুধু এইটুকু বলা যায় যে এইগুলি পরস্পর বিরোধী। এইখানে আধুনিক ইমারতের পার্শ্বেই রহিয়াছে হাজার বৎসরের পুরাতন রৌদ্রে ঝলসানো ইটের তৈয়ারী মসজিদ বা বাড়ী। দেশের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি যেমন শহরে বাস করে তেমনি সবচেয়ে দরিদ্র ব্যক্তিও শহরে বাস করে। রাস্তায় উচ্চশিক্ষিত লোকদের সঙ্গে গা ঘেষাঘেষি করিয়া চলিতেছে নিরক্ষর লোকজন। বহু মহিলা প্যারিসের অত্যাধুনিক পোশাক পরিধান করে এবং নৃত্য করে অতি সাম্প্রতিক কালের। অপরদিকে তাহাদের পার্শ্বেই তাহাদের ভগ্নীগণ প্রাচীন যুগের নিভৃত জীবন যাপন করে।

মধ্যপ্রাচ্যের সরকারগুলি শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ নগর সরকাররূপে বিদ্যমান এবং আজ পর্যন্তও তাহারা শহরের অধিবাসীদের স্বার্থ রক্ষা করিয়া আসিতেছে। মধ্যপ্রাচ্যের উঠতি মধ্যবিত্তশ্রেণী শহরে বাস করে। এই শহরেই রাজনৈতিক দল গঠিত হয়, নতুন শাসনতন্ত্র রচিত হয় এবং সরকার গঠন ও ভাঙ্গিবার জন্য রাজনৈতিক বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। আবার কৃষকদিগকেও ব্যবসা-বাণিজ্য ও কলকারখানার কাজে লাগাইবার জন্য ব্যাপকভাবে শহরে আকর্ষণ করা হয়। ফলে শহরের বস্তিগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের শহরবাসীরা অতীতের প্রতিষ্ঠিত জীবন যাত্রা এবং ভবিষ্যতের অপূর্ণ আশার মধ্যে দোদুল্যমান। এখন

তাহারা প্রশান্ত গ্রামবাসী, যাহারা অন্য কোন জায়গায় যাইতে অনিচ্ছুক। সঙ্গে সঙ্গে পরিতৃপ্ত ইউরোপীয়ানের মত অনুভব করে যে তাহারা ইতিমধ্যে আসিয়াছে। এই ধারণার ভিতর তাহারা স্বপ্নমান। সমগ্র দেশের বোঝা যেন তাহাদের স্কন্ধে। অথচ তাহারা এত চতুর ও সুযোগ সন্ধানী যে দেশীয় লোকদের বিশৃঙ্খলার সুযোগ তাহারা পুরাপুরি গ্রহণ করে।

গ্রামে এবং শহরের জীবনে পরিবারগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এই সব পরিবারে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত। শহুরে জীবন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ এখনও এই রীতি ভঙ্গ করে নাই। পরিবারকে বাদ দিয়া মধ্যপ্রাচ্যবাসীর জীবনের কোন মূল্য নাই। আত্মীয়তার বন্ধন আর্থিক ও রাজনৈতিক নিরাপত্তার ব্যাপার। কোন লোক গ্রাম বা বেদুইন গোত্র ত্যাগ করিলেও সে পরিবারের পরিচয় বহন করিয়া চলে।

মধ্যপ্রাচ্যের সামাজিক কাঠামোর সবচাইতে ছোট অঙ্গ হইল পরিবার। অনেক ক্ষেত্রেই ইহা একটি বর্ধিত পরিবার গোষ্ঠী, যাহার মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ পুরুষ পরিবারের প্রধান এবং সমস্ত ব্যাপারে সে পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করে। আধুনিক যুগে রাজনৈতিক আনুগত্য প্রায়ই পারিবারিক বন্ধনের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত।

মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষতঃ শহরে ক্ষুদ্র পরিবারের সংখ্যা বর্তমানে ব্যাপক। পরিবারকে সম্প্রসারণ করা হইবে নাকি ক্ষুদ্র অবস্থায় রাখা হইবে তাহা নির্ভর করে অর্থনৈতিক উৎপাদন শক্তি, জমি বণ্টন শর্তের প্রকৃতি এবং নাগরিকীকরণের উপর। পরিবার তাহার অন্তর্ভুক্ত লোকদের নিরাপত্তা বিধান করে সত্যি কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতি পরিবারের মধ্যে বেশ উত্তেজনা সৃষ্টি করে এবং মাঝে মাঝে পরিবারের মধ্যে ও বৃহদাকার শ্রেণীর মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদের জটিলতার কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

বেদুইনদের মধ্যে নারী-পুরুষ সাধারণতঃ আলাদা এবং স্ত্রীলোকগণ সরাসরি পুরুষের অধীন। মহিলাদের মর্যাদার নামে উহাদের মুখাবয়ব ঢাকা পর্দা মুসলিম রক্ষণশীলতার প্রধান নিদর্শন। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক স্থানে পর্দা উঠিয়া গেলেও মহিলাদের পরিবর্তনশীল মর্যাদার ব্যাপারে অনেক বাধাবিপত্তি রহিয়াছে। মধ্যপ্রাচ্য এখনও একটি পুরুষ প্রধান

মধ্যপ্রাচ্যে শ্রেণী সচেতনতার অনেক নিদর্শন রহিয়াছে। শহরে ও গ্রামে মোটামুটি তিনটি শ্রেণী পাওয়া যায়। এইগুলি হইল উচ্চ শিক্ষিত 'ইলিট' শ্রেণী। ক্ষুদ্র মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং দরিদ্র শ্রেণী। বেদুইনদের মধ্যে বংশানুক্রমিক অভিজাত শ্রেণী ছাড়া এই স্তরবিন্যাস তুলনামূলকভাবে কম। বক্তৃতার অভ্যাস, চলাফেরা ও প্রাত্যহিক জীবনের অন্যান্য দিক সামাজিক মর্যাদাকে প্রভাবিত করে। কোন সমাজে কিছুক্ষণ কাটাইলেই সেই সমাজের শ্রেণীবিন্যাস সহজেই আঁচ করা যায়। সামাজিক মর্যাদা নিরূপণের কয়েকটি মাপকাঠি হইল পরিবারের প্রতি আনুগত্য, পরিবারের আকার, বয়স, জায়গা-জমি, ধনসম্পদ, রাজনৈতিক ক্ষমতা, ধর্ম, শিক্ষা ও শিল্পকলার জ্ঞান।

অনেক শতাব্দী হইতে উচ্চ শিক্ষিত শাসক শ্রেণী ও জনগণের মধ্যে বিরাট অর্থনৈতিক বৈষম্য বিরাজমান। সামাজিকভাবে তাহারা সম্পূর্ণ পৃথক ছিল না এবং আদর্শগতভাবে তাহাদের লক্ষ্য ও নীতি ছিল অভিন্ন। জমিদার ও কৃষক সকলের শয্যা, খাদ্য পরিধেয় একই ধরনের ছিল। তাহারা উভয়ে ছিল আচার-অনুষ্ঠান পালনকারী মুসলমান, ইসলামী নিয়মপ্রণালীতে বিশ্বাসী এবং ভাল-মন্দ সম্পর্কে একই ধারণা পোষণকারী। তবুও তাহাদের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল। জমিদার-শ্রেণীর খাদ্য ছিল অপেক্ষাকৃত প্রচুর এবং পোশাক ও বিছানাপত্র ছিল উন্নতমানের। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার ছোঁয়াচ এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন করিয়াছে। ইহা শুধু আর্থিক বৈষম্যই বৃদ্ধি করে নাই বরং ইহা অন্যান্য বৈষম্যও সৃষ্টি করিয়াছে। এখন একজন দরিদ্র ব্যক্তি তাহার ধনী প্রভুর সম্মুখে তেমন নিঃসঙ্কোচ বোধ করে না যেরূপ তাহার পিতা কোন এক সময় বোধ করিত। একজন পাশ্চাত্য শিক্ষিত অভিজাত শাসক নিজের সম্পদের কল্যাণে দেশবাসী হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছে। সে তাহার পিতার ন্যায় একই ধরনের ঘরে বাস করে না, মেঝেতে সে ঘুমায় না, বসেও না বা একই ধরনের আহার গ্রহণ করে না। সে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ধরনের আরাম-আয়াস উপভোগ করে। অথচ গ্রামবাসীর জীবনে অতি অল্প পরিবর্তনই আসিয়াছে। নব্য অভিজাতবর্গ প্রায়ই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করে না এবং পূর্বের নীতিও মানিয়া চলে না। এমন কি তাহারা কথা-বার্তার

সময় পাশ্চাত্য শব্দ এত ব্যবহার করে যে অশিক্ষিত দরিদ্র লোকদের পক্ষে ঐ ভাষা বোঝাও দুরূহ হইয়া পড়ে।

বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের সামাজিক কাঠামো বিরাট পরিবর্তনের মুখে—ভূমি সংস্কার অনেক হইয়াছে, আরও হইবে। এমন কি যেখানে ভূমি সংস্কার অল্প হইয়াছে, সেখানেও শক্তিমান জমিদারেরা ক্ষমতা ছাড়িতে বাধ্য হইতেছে। যথেষ্ট শিক্ষা থাকিলে যেকোন লোক নিজ সামাজিক অবস্থার উন্নতির সাধন করিতে পারে। কিছু পরিমাণ ধনসম্পদ এই ব্যাপারে অত্যন্ত সহায়ক। কিন্তু পর্যবেক্ষকগণের ধারণা প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা লাভের জন্য সামরিক পেশার সহিত খানিকটা শিক্ষা যোগ হইলেই ভাল হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির এবং বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নিরক্ষর জনসাধারণ দক্ষ শ্রমিকের সংখ্যা যোগাইবে। তাহারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের অংশ আদায় করিতেও সক্ষম হইবে।

জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদের অনুভূতিও মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় সমস্ত অধিবাসীদের মধ্যে দেখা যায়। জাতীয়তাবাদ একটি কৌশল মাত্র। ইহা যদিও মিসরীয়দিগকে সিরিয়দের বিরুদ্ধে এবং ইরাকীদিগকে পারস্যবাসীদের বিরুদ্ধে স্থাপন করে, তাহা সত্ত্বেও ইহার উপাদানগুলি সকলের নিকটই সমান।

(১) এই সব উপাদানগুলির একটি হইল অতীতের গৌরব লইয়া গর্ব করা। মধ্যপ্রাচ্যবাসী, সে যেখানকারই হোক না কেন চায় যে সবাই তাহার অতীত সম্পর্কে অবগত হইয়া তাহাকে প্রশংসা করুক। অতীত তাহার গর্বের অনুপ্রেরণা বোঝায়। কোন জাতির মহত্ত্ব বলিতে যদি বলপূর্বক অন্যের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন বুঝায়, তাহা হইলে মধ্যপ্রাচ্য এই মহত্ত্বের দাবী করিতে পারে। কোন এক সময় মধ্যপ্রাচ্যের জাতি, যথা, মিসরীয়, ব্যাবিল-নীয়, পারস্যবাসীগণ, আসিরীয়, আরবীয় তুর্কীরাও আজিকার আণবিক শক্তির অধিকারীদের ন্যায় শক্তিশালী ছিল। নৃশংসয় শক্তির দ্বারা তাহারা বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এবং বর্তমান পাশ্চাত্যের বিশাল সাম্রাজ্যগুলির চাইতেও অধিক এলাকার উপর এবং অধিক জনসংখ্যার উপর তাহাদের ক্ষমতা চাপাইয়া দিয়াছিল। পরবর্তী পাতাগুলিতে দেখা যাইবে

বড় বড় সেনাপতিদের যথা খালেদ ইবন ওয়ালিদ, সাদ ইবন ওয়াক্কাস, মাহমুদ গজনী ও ওসমানীয়দের কয়েকজন সুলতান—চেঙ্গিস খান, তৈমুর লঙ্গ, নাদিরশাহ এবং আরও অনেকের মধ্যে যে কোন একজনের অসম সাহসিকতা, সামরিক ও রাজকীয় কার্যকৌশল, ইউরোপের সমকক্ষ অতি প্রসিদ্ধ সেনাপতিদেরকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। রোমান সাম্রাজ কর্তৃক জারীকৃত 'প্যাক্স রোমানা' (Pax Romana) এশিয়ার চেঙ্গিস খানের বংশধরগণ কর্তৃক স্থাপিত 'শান্তির' নিকট ছিল খুবই নগণ্য। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে মার্কো পোলো পশ্চিম রাশিয়া বা ভূমধ্যসাগর হইতে সমগ্র এশিয়ার উত্তর ও মধ্যভাগ দিয়া কুবলাই খানের রাজধানী পিকিং পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট সড়কে নির্ভয়ে ভ্রমণ করিতে পারিয়াছিলেন।

আবার কেহ কেহ বিশ্বাস করে, শুধু নৃশংস শক্তি দ্বারা মহত্ত্ব বিচার করা যায় না বরং বুদ্ধিমত্তার গুণাগুণের দ্বারা বিচার করা যায়—যাহা সভ্যতার উন্নতিতে স্থায়ী অবদান রাখে। এই ক্ষেত্রেও মধ্যপ্রাচ্যের লোকেরা গর্ব করিতে পারে। একজন পাশ্চাত্যবাসীর জীবনের বাধাধরা দিনগুলি মধ্যপ্রাচ্যের অনেক অবদানে সুষমামণ্ডিত। তাহার বৎসর সূচিত হয় একজন ফিলিস্তিনবাসীর জন্মের দ্বারা। তাহার মাস, সপ্তাহ, দিন, ঘণ্টা নির্ধারিত হয়, মিসরীয় ও ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা আরম্ভকৃত এবং পারস্যবাসীদের দ্বারা পূর্ণাঙ্গকৃত গণনা করিবার কৌশল ও পঞ্জিকা দ্বারা। তুর্কীগণ কর্তৃক ইউরোপে প্রচলিত 'গোসলখানায়' সে গোসল করে এবং 'টার্কিশ' তোয়ালে দ্বারা নিজেকে বিশুষ্ক করে।

প্রাতঃরাশে সে কফি 'কাওয়া' (আরবী) পান করিতে পারে। সে যে চাকার উপর গাড়ী চালাইয়া অফিসে যায় তাহা মধ্যপ্রাচ্যে কেউ আবিষ্কার করিয়াছে। দিনে সে যেসব বৈজ্ঞানিক ও ব্যবসায়িক শব্দ ব্যবহার করিতে পারে যথা এলজেব্রা 'আল-জাবর' (আরবী), এলকহল, 'আল-কহল' (আরবী) অথবা ট্যারিফ 'তা রিফা' (আরবী) তা আরবী থেকে অদ্ভুত। তাহার ধর্মগ্রন্থের নামকরণ হইয়াছে 'বিব্‌লস' (Biblos) হইতে যাহা লেবাননের একটি শহরের নাম, যেখানে সর্বপ্রথম বই লিখার চিন্তা উদিত হয়। তাহার পোষ্ট অফিস পারস্যবাসীদের একটি প্রতিষ্ঠান যাহা সম্পর্কে হেরডটাস উল্লেখ করিয়াছেন; সে কাগজ দ্বারা লেখে যাহা মুসলমানগণ পাশ্চাত্যে

আনয়ন করিয়াছে ; সে 'আরবী গণিত শাস্ত্র' ব্যবহার করে যাহা ভারতবর্ষে উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং আরবগণ ইউরোপে রপ্তানী করিয়াছে।

বাড়ীতে সে আরাম কেদারায়, 'দিভান' (ফার্সী) বা সোফায় 'সফ্ফা' (আরবী) বিশ্রাম করিতে পারে এবং ম্যাগাজিন বা 'মাখজান' (আরবী) পড়িতে পারে। সে পাজামা 'পা-জামা' (ফার্সী) পরিধান করে এবং তোষকে 'মাটরাহ্' (আরবী) শুইয়া থাকে। বস্তুতঃ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকবর্গ মধ্যযুগের মুসলমানদের নিকট রেনেসাঁর ঋণের কথা অধিক স্বীকার করেন, কারণ মুসলমানরা গ্রীক ও রোমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতি রক্ষা করিয়াছে, গুরুত্বপূর্ণ উন্নতি সাধন করিয়াছে এবং ইউরোপের নিকট প্রেরণ করিয়াছে।

রেনেসাঁর অনেক পূর্বে মধ্যপ্রাচের বিভিন্ন জাতের মুসলমানগণ ল্যাটিন, গ্রীক, সিরিয়া, ফার্সী, সংস্কৃত, চীনা এবং অন্য যেকোন ভাষায় যেকোন বিষয়ের গ্রন্থ যেখানেই পাইয়াছে সংগ্রহ করিয়াছে এবং বাগদাদে আনিয়াছে। খলিফা মানুন খ্রীস্টান হুনাইন ইবন ইসহাকের (৮০৯—৮৭৩) নেতৃত্বে একটি 'অনুবাদ সংস্থা' প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই সংস্থা প্রায়ই গ্রীক পাণ্ডুলিপি আরবীতে অনুবাদ করেন। ইউরোপে ল্যাটিনকে যেরূপ পবিত্র ভাষা জ্ঞান করা হইত, মধ্যপ্রাচ্যে আরবীকেও অনুরূপ পবিত্র ভাষা জ্ঞান করা হইত।

পরবর্তী মুসলমানগণ এইগুলি পাঠ করে ও আয়ত্ত করে এবং এভিরোসের (ইবনে রোশদ্) ন্যায় দার্শনিক সৃষ্টি করে, যাঁহার নিকট সেণ্ট থমাস একুইনাস (St. Thomas Aquinas) ঋণী ছিলেন ; ওমর খৈয়ামের ন্যায় গণিতশাস্ত্রবিদ সৃষ্টি করেন, যিনি জালালী পঞ্জিকা উদ্ভাবন করেন। ইহা এখনও ইরানে ব্যবহৃত হয়। এই পঞ্জিকা সমকালীন পাশ্চাত্যে ব্যবহৃত গ্রেগরীয়ান পঞ্জিকার চাইতেও নির্ভুল। চিকিৎসাশাস্ত্রে মুসলমানগণ বেশ কয়েকজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক তৈয়ার করিয়াছে। তন্মধ্যে রহিয়াছেন রাযী ও আবিসিনা। ইহাদের প্রণীত গ্রন্থ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চিকিৎসা শাস্ত্রে একমাত্র উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক হিসাবে পরিগণিত ছিল। তাঁহাদের 'আবক্ষ ছবি প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা শাস্ত্র বিভাগের হলগুলিতে শোভাবর্ধন করে।' পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের বর্ণনা করা হইবে। সভ্যতার উপর তাহাদের অবদান প্রশ্নাতীত।

আবার এরূপ অনেকে আছে যাহারা বিশ্বাস করে, সত্যিকারের মহত্ব

রহিয়াছে আধ্যাত্মিকতার উপর, যাহা মানবীয় ও গঠনমূলক। এই ক্ষেত্রেও মধ্যপ্রাচ্যের অধিবাসীদের যথেষ্ট অবদান আছে। বিশ্বের তিনটি বিখ্যাত একেশ্বরবাদী ধর্মের জন্মভূমি মধ্যপ্রাচ্য। ইহুদী ধর্মের প্রবর্তক হযরত মূসার (আঃ) জন্মভূমি মিসর, খ্রীস্টান ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা যীশুর জন্মভূমি ফিলিস্তিন এবং ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদের (দঃ) জন্মভূমি আরব। এইসব ধর্মের প্রত্যেকটি আবার ইরানে প্রতিষ্ঠিত স্বল্প পরিচিত জরথুস্ত্র ধর্মের নিকট ঋণী। মধ্যপ্রাচ্যের এইসব ধর্মের নিকট পাশ্চাত্য সভ্যতা ইহার অতি প্রিয় নীতিমালা ও জীবনের দিকদর্শন এবং আল্লাহ, মানুষ, ইহকাল ও পরকালের ধ্যান-ধারণার ব্যাপারে ঋণী।

(২) বাস্তবিকপক্ষে অতীতের শারীরিক শক্তি, বুদ্ধিমত্তার উৎকর্ষ এবং আধ্যাত্মিক অবদানের স্মৃতি একজন মধ্যপ্রাচ্যবাসীর অন্তরে এমনভাবে জাগ্রত যে সে বর্তমান বা ভবিষ্যতের চিন্তা ছাড়িয়া অতীতে বাস করিবার আকাঙ্খা পোষণ করে। অপরদিকে বর্তমানের কথা তাহার চিন্তায় আসিলেই সে অশ্রদ্ধা ও আত্মদৈন্যের শিকারে পতিত হয়। এই হীনমন্যতা তাহার বর্তমান জাতীয়তাবাদের দ্বিতীয় উপাদান। সে শুধু পাশ্চাত্যের শিল্প-কলার উপর নির্ভরশীল নয়, সে প্রকাশ্যে (একজন তুর্কীর ক্ষেত্রে) বা গোপনে (একজন আরব বা পারস্যবাসীর ক্ষেত্রে) একজন ইউরোপবাসীর মত হইবার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। সে পাশ্চাত্য ধরনের কাপড়-চোপড় পরিধান করে, পাশ্চাত্য ধরনের খাদ্য গ্রহণ করে। পাশ্চাত্য সঙ্গীত উপভোগ করে, পাশ্চাত্য আইনের অধীনে বাস করে, পাশ্চাত্য দর্শন পাঠ করে এবং পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠানসমূহ পছন্দ করে।

মধ্যপ্রাচ্যবাসীগণ যখনই একত্র হয় তাহারা পাশ্চাত্যবাসীদের সমকক্ষ হইবার সুদীর্ঘ পথের কথা এবং তাহাদের সমাজের ধীরগতির কথা আলোচনা করে। কোন পাশ্চাত্যবাসীর মুখোমুখী হইলেই তাহাদের গর্বে হস্তক্ষেপ হয় তাহারা আত্মরক্ষাকারী এবং কোন কোন সময় যুদ্ধংদেহী হইয়া উঠে। একদিকে তাহারা অনুভব করে বাঁচিবার জন্য তাহাদিগকে পাশ্চাত্য হইতে মূল্যবোধ ধার করিতে হয় এবং অপরদিকে এই কাজের জন্য তাহারা অনুতাপ করে। তবুও ইসলামী মধ্যপ্রাচ্যে ধার করিবার ব্যাপারে আত্ম-গ্লানি অনুভব করিবার কোন নজীর নাই। আরবের মরুভূমিতে ইসলামের

আবির্ভাবের সময় ইহা একটি নতুন ও তেজস্বী ধর্ম ছিল। ইহার কোন ঐতিহ্য ছিল না এবং একটি আদিম সাংস্কৃতিক পরিবেশের মধ্য হইতে ইহা উদিত হয়। মোটামুটিভাবে ইহা অতৃপ্ত আগ্রহের পরিতৃপ্তি সাধনে এবং পরিধি বিস্তৃতিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আনন্দ উপভোগ করে। ইসলাম হেলেনীয় চিন্তাধারায় আকৃষ্ট হইয়াছে, পারস্য ছাঁচের শাসনপদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে এবং যেকোন সংস্কৃতি হইতে প্রচুর পরিমাণে ধার করিতে দ্বিধা বোধ করে নাই। তাই প্রশ্ন জাগে বর্তমানে ধার করিতে এই দ্বিধা কেন?

ইহার একটি কারণ হইল, অনেকগুলি এলাকায় ইসলাম খ্রীস্টান ধর্মের স্থলাভিষিক্ত হইয়া একটি ধর্মীয় সমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল এবং বর্তমানে খ্রীস্টান নামের সভ্যতা হইতে শিক্ষা গ্রহণের দ্বিধাবোধ। বোধ হয় আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণ হইল—যেইসব দেশ ও সংস্কৃতি হইতে ইসলাম ধার করিয়াছে সেইগুলি হয়ত ধ্বংসের মুখোমুখি ছিল বা সবেমাত্র পরাস্ত হইয়াছিল। ফলে বিজয়ী মুসলিম সেনাবাহিনী যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির মতই তাহার ভাবধারা গ্রহণ করিয়াছে। অবস্থা এখন সম্পূর্ণ বিপরীত। পাশ্চাত্যের সঙ্গে বর্তমান সংঘর্ষে মুসলমানগণ নিজের অবস্থা সম্পর্কে আস্থাশীল নহে। এখন যেকোন ধার, শক্তির চাইতে দুর্বলতারই পরিচায়ক। অধিকন্তু, ইসলামের নেতৃবৃন্দ সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাদের স্বধর্মীগণ যে পাশ্চাত্য ভাবধারা গ্রহণ করিতেছে তাহা স্বীয় ঐতিহ্যকে সুশোভিত করিবার জন্য নহে বরং পাশ্চাত্যের উন্নততর চিন্তাধারাকে উহার স্থলাভিষিক্ত করিবার জন্য।

(৩) আধুনিক জাতীয়তাবাদের তৃতীয় উপাদান হইল ধর্মনিরপেক্ষতা। মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত দেশগুলিতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার প্রভাব সমভাবে বিদ্যমান, "যদিও ইহা কোন কোন দেশে তুলনামূলকভাবে উন্নততর। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর খ্রীস্টান ধর্মের ন্যায় ইসলামও এখন একই বিবাদে লিপ্ত। খ্রীস্টান ধর্মের ন্যায় ইসলামকেও কোন না কোন ভাবে আধুনিক বিজ্ঞান, ভাবধারা ও প্রতিষ্ঠানকে প্রতিঘাত করিতে হইতেছে। অন্ততঃপক্ষে দুই প্রকারের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। 'সিভিলাইজেশন অন ট্রায়াল' (Civilization On Trial) গ্রন্থে আরনল্ড টয়েনবি বলেন, "যখনই কোন সভ্যসমাজ এই ধরনের ভয়াবহ অবস্থা বা অন্য কোন প্রকারের পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় তখন উহার মোকাবেলার জন্য দুইটি পথ

খোলা থাকে। একটি হইল উগ্র গোঁড়ামীবাদ (Zealotism) যাহা 'অপরিজ্ঞাত হইতে সুপরিচিতে আশ্রয় গ্রহণ করে।' এবং উন্নতমানের কৌশল ও নতুন অস্ত্রের বিরুদ্ধে সমাজ 'ইহার পুরাতন যুদ্ধ-প্রকৃতির অনুশীলন দ্বারা প্রতিঘাত করে।" অপর পথকে তিনি বীরত্ববাদ (Herodeanism) নামে অভিহিত করিয়াছেন, যাহার "আদর্শ জ্ঞাত বিপদ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার অত্যন্ত কার্যকরী পন্থা হইল ইহার গোপনীয়তাকে আয়ত্ব কর।" এবং উন্নতমানের কৌশল ও নতুন অস্ত্রের বিরুদ্ধে 'পুরাতন যুদ্ধকৌশল পরিত্যাগ করতঃ শত্রুর নিজস্ব যুদ্ধকৌশল ও অস্ত্র আয়ত্ব করিয়া শত্রুকে প্রতিঘাত করা।'

মধ্যপ্রাচ্যে অধিকাংশ 'গোড়ামীবাদীদেরকে' পরিচালনা করেন ধর্মীয় নেতাগণ—যাহারা পশ্চিমা প্রতিষ্ঠান ও পশ্চিমা ভাবধারার আক্রমণে শঙ্কিত। তাঁহারা খাঁটি ইসলামে ফিরিয়া যাইতে চান 'যখন ইহা ছিল পবিত্র এবং বিদেশী ভাবধারা হইতে কলুষমুক্ত।' নির্দিষ্টভাবে তাহারা প্রথম চারি খলিফার যুগ বুঝাইতে চান, যখন পবিত্র কোরানই ছিল একমাত্র পথ নির্দেশ গ্রন্থ এবং সুন্নাহ ছিল একমাত্র আইন। এই দলের কোন কোন 'প্রগতিশীল' ব্যক্তি ধারের গুরুত্ব কমাইবার জন্য দাবী করিয়া থাকেন যে, ইলেকট্রিক এবং টেলিফোন হইতে জেট বিমান ও মহাশূন্যে রকেট নিক্ষেপণের এইসব আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি উন্নতি সম্পর্কে পবিত্র কোরানই প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী করে।

অপরদিকে 'বীরত্ববাদীদের' প্রতিক্রিয়া ভিন্নরূপ। উহাদের নেতৃত্ব দেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রগতিশীল যুবশ্রেণী যাহারা মুক্তির পথ নির্দেশ করেন সম্পূর্ণ আধুনিকীকরণের মধ্যে। এই সমস্ত আধুনিকপন্থীগণ আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। একদল রাজনীতিবিদ গণতন্ত্রের পশ্চিম ইউরোপীয় নীতিতে বিশ্বাসী। তাহারা জ্ঞানের (Enlightenment) আদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং ঐসব শক্তিতে বিশ্বাসী যাহা একদিন আমেরিকা ও ফরাসী বিপ্লব আনয়ন করিয়াছিল। আধুনিক পন্থীদের দ্বিতীয় দল এমন গণতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী যাহা সোভিয়েত ইউনিয়নে ও আধুনিক চীনে কমিউনিস্ট বিপ্লবের দ্বারা 'কলুষমুক্ত' ও 'সিদ্ধি' লাভ করিয়াছে, তাহারা কার্ল মার্ক্স-এর যুক্তির দ্বারা এবং কমিউনিস্ট শক্তির উল্কাবৎ উত্থানের দ্বারা

প্রভাবিত। আধুনিকপন্থীদের তৃতীয় দল পশ্চিমকে কমিউনিস্ট-বিশ্বের উপর প্রাধান্য অর্পণ করিয়া নিজেদেরকে নিরপেক্ষ বলিয়া থাকেন এবং গণতন্ত্রের সহিত সামাজিক সংস্কারের সংযোগ করিতে চেষ্টা করেন, আবার একই সঙ্গে কমিউনিস্ট-বিশ্বের একদলীয় গণতন্ত্রে আকৃষ্ট হন। কমিউ-নিস্টদের ধর্মবিরোধীগণ ছাড়া অধিকাংশ আধুনিকপন্থীগণ ধর্মনিরপেক্ষ, যাহারা একদিকে যেমন ধর্মের বিরোধিতা করেন না অপরদিকে তেমনি বর্তমান সমস্যার সমাধানে ইসলাম বা অন্য কোন ধর্মের কোন ভূমিকা দেখিতে পান না।

আধুনিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইবার ব্যাপারে উনবিংশ শতাব্দীর খ্রীস্টধর্মের ন্যায় ইসলামও একই অন্তর্বিরোধে লিপ্ত। ইসলাম ধর্ম-নিরপেক্ষ ও ধার্মিকের মধ্যে কোন পার্থক্য করে না এবং সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে রচিত ইহার আইন-কানুন ধর্মগতভাবে বিংশ শতাব্দীতেও অবশ্য পালনীয়। তাই সমন্বয় সাধনের সমস্যা আরও জটিল। অপর-দিকে মধ্যপ্রাচ্যের আধুনিক আন্দোলনগুলি সম্পর্কে ছাত্রদেরকে সর্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, সংস্কৃতি ও ধর্মচর্চার একত্রীকরণে ইসলাম সর্বদা আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছে। যদিও অনুরূপ যোগসূত্র কায়েম করিবার ব্যাপারে খ্রীস্টধর্ম সাধারণতঃ বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে।

(৪) জাতীয়তাবাদের চতুর্থ উপাদান হইল সন্দেহপ্রবণতা। একজন আধুনিক জাতীয়তাবাদী, সে আরব হউক, পারস্যবাসী হউক বা তুর্কী হউক, ইউরোপের প্রতি সন্দেহপরায়ণ না হওয়াটা যেন তাহার জন্য লজ্জার ব্যাপার। এমন ক্ষেত্রে তাহার বন্ধুমহল তাহাকে বড় জোড় 'সহজে প্রতা-রিত ব্যক্তি' হিসাবে চিহ্নিত করে, নতুবা কম করিয়া হইলেও তাহাকে 'কমিউনিস্ট' অথবা 'সাম্রাজ্যবাদী' বলিয়া আখ্যায়িত করে। মধ্যপ্রাচ্যকে একটি 'শিবিরাগ্নির' সঙ্গে তুলনা করা যায়। কোন এক সময় ছিল, যখন ইহার শিখা অতি উচ্চে উঠিয়া চতুষ্পার্শ্বের এলাকাগুলিকে আলোকিত করিয়াছে। ইহার আলো ও উত্তাপ অনেক লোককে আকৃষ্ট করিয়াছে, সেই সমাজে অনেক কিছু শিক্ষা হইয়াছে এবং অনেক কিছুর অংশ দেওয়া-নেওয়া হইয়াছে। ইতিহাসের পরবর্তী পাতাগুলিতে দেখা গিয়াছে যে লোকজন গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং সময়ের ছাই তাহাদের বিশাল আগুনকে ঢাকিয়া

ফেলিয়াছে। তাহারা এখন আবার জাগরিত হইয়াছে এবং ছাইগুলিকে সরাইয়া ফেলিয়া জ্বলন্ত অঙ্গারের সাহায্যে একটি নূতন আগুন জ্বালাইতে চেষ্টা করিতেছে। এই প্রচেষ্টায় তাহারা দুইটি সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। প্রথম সমস্যা হইল—যতবার, বিশেষতঃ গত দেড় শতাব্দীতে, তাহারা উন্নতির চেষ্টা করিয়াছে বাহিরের হস্তক্ষেপের ফলে বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে। এই সমস্ত শক্তি হইল বৃটিশ, রুশ, ফরাসী, জার্মান ও আমেরিকান। ফলে মধ্যপ্রাচ্যের জাতীয়তাবাদীগণ এই বিশ্বাসে পৌঁছিয়াছে যে, পাশ্চাত্য দেশগুলি কমিউনিস্ট-অকমিউনিস্ট নির্বিশেষে কেহই তাহাদের জাগরণ পছন্দ করে না। উটের অনুপস্থিতি বা আধুনিক বাজার সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের পর্যটকদের সাধারণ মন্তব্যকে সাদামাটা মন্তব্য হিসাবে গ্রহণ না করিয়া বলা হইতেছে যে, ইহা আসলে উন্নতি ব্যাহত করার শুরুক্ষণ প্রচেষ্টাই বটে। বিদেশীদের বিরুদ্ধাচরণ প্রবণতা সম্পর্কিত ধারণা যাহা কখনও বাস্তবভিত্তিক, আবার কখনও কাল্পনিক—মধ্যপ্রাচ্যের জনসাধারণের চিন্তা বিকাশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হইয়াছে।

(৫) নূতন আগুন প্রজ্বলিত করিবার প্রচেষ্টায় বাধাদানকারী দ্বিতীয় সমস্যা হইল অভিরুচি। ইহা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, যাহা জাতীয়তাবাদের পঞ্চম উপাদান। একটি প্রাচীন সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হিসাবে মধ্যপ্রাচ্যবাসীর পক্ষে কোন্‌টা রাখা দরকার এবং কোন্‌টা ছাটাই করা দরকার তাহাই বড় সমস্যা। জাতি হিসাবে পাশ্চাত্যের আগ্রাসী সংস্কৃতির মুখোমুখী দাঁড়াইয়া তাহারা পরিবর্তন আশা করিতেছে। কিন্তু তাহাদের সমস্যা হইল কোন্‌টা গ্রহণ করিবে এবং কোন্‌টা প্রত্যাখ্যান করিবে। এই সিদ্ধান্তগুলি সহজ নহে বলিয়া মাতা, কন্যা, পিতা, পুত্র ও বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ সঙ্গীতের বিষয় ধরা যাক। অনেকেই পাশ্চাত্য সঙ্গীত প্রত্যাখ্যান করে, আবার অনেকে তাহাদের নিজস্ব প্রচলিত প্রাচ্য সঙ্গীতকে ঘৃণা করে। যাহারা পাশ্চাত্য সঙ্গীতকে ভালবাসে তাহাদের মধ্যে আবার যাহারা প্রাচীন পাশ্চাত্য সঙ্গীত ভালবাসে এবং যাহারা জাজ (Jazz) সঙ্গীত ভালবাসে—এই দুই দলের মধ্যে তীব্র বিরোধ রহিয়াছে। এই বিরোধের মধ্যে আবার যে দল উভয়ের সংমিশ্রণ কামনা করে তাহাদের কথা ভুলিলে চলিবে না। এই বিশৃঙ্খলা জীবনের সর্বক্ষেত্রে অভিনব,

যাহা গন্থে, পোশাক, শিক্ষায়, রাজনীতিতে এমন কি ধর্মে পর্যন্ত প্রতিফলিত।

ইসলাম

ইসলামই হচ্ছে সেই সর্বজনীন ও জীবন্ত আদর্শ যা মধ্যপ্রাচ্য নামের জোড়াতালি দেওয়া বালাপোষটিকে একত্রিত করে। ইসলামে অনেক শ্রেণী ও মতাদর্শ রহিয়াছে। এইগুলি ৭২ ভাগে বিভক্ত বলিয়া অনেকে ধারণা করেন। তবুও এতদঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে এখনও সুদৃঢ় ঐক্য রহিয়াছে। অনেক লেখক বলিয়া থাকেন যে, 'ইসলাম শুধু একটি ধর্মই নহে, ইহা একটি জীবনাদর্শও বটে।' অবশ্য এক দিক হইতে প্রত্যেক ধর্মই একটি জীবনাদর্শ। এই বক্তব্য দ্বারা তাঁহারা বুঝাইয়া থাকেন যে, ইসলাম জীবনের সব কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করে। অতএব ইহা শুধু আধ্যাত্মিক পথ নির্দেশই করে না। বরং কতকগুলি নিয়ম-প্রণালী, আইন-কানুন ও সাধারণ পরিবেশও সৃষ্টি করে, যাহা দ্বারা সেই আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য সাধন করা যায়। ব্যক্তি বিশেষের এখতিয়ার অতি অল্পই কার্যকর। ইসলাম তাহাকে বলিয়া দেয় কতবার, কখন এবং কিভাবে প্রার্থনা করিতে হইবে ও কোন্ দিকে মুখ করিয়া তাহা আদায় করিতে হইবে; বিবাহ, তালাক, সম্পত্তি ও উত্তরাধিকারের ব্যাপারে ইহার আইন-কানুন রহিয়াছে। যুদ্ধবিগ্রহ এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে ইহার বিধি-নিষেধ সুস্পষ্ট। এইগুলি সমস্ত ইসলামী দেশগুলিতে প্রায় সমান। প্রায় ১৩০০ বৎসরেরও অধিককাল পর্যন্ত মুসলমানগণ অন্যদের সঙ্গে বা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করিয়াছে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছে, পুস্তক রচনা করিয়াছে। বিদ্রোহ সংঘটিত করিয়াছে এবং বিভিন্ন সৌধ নির্মাণ করিয়াছে। সমস্তগুলি ইসলামের পরিপ্রেক্ষিতে—হয়ত ইহার জন্য বা বিরুদ্ধে বা ইহার উদ্যোগে। ফলে ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান না থাকিলে মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস বুঝা যায় না। অতএব এই গ্রন্থ ইসলাম হইতে শুরু হইবে।

আরম্ভ করিবার পূর্বে কিছু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আলোচ্য সভ্যতা প্রধানতঃ আরব বিজয়ের দ্বারা আরম্ভ হয়, অতএব কখনও কখনও ইহাকে 'আরব সভ্যতা' নামে অভিহিত করা হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আধুনিক রাষ্ট্রগুলির

মধ্যে যেগুলি 'আরব' নামে পরিচিত তাহারা নিজেদেরকে সেই সংস্কৃতির একমাত্র উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করে এবং বিশ্বসভ্যতায় 'আরব' অবদানের ব্যাপারে গর্ববোধ করে। ইহা যেমন গোলমেলে প্রকৃতির তেমনি ইহা অসত্য। প্রথমে আরব বেদুইনগণ যখন সিরিয়া, মেসোপটোমিয়া, মিসর ও ইরান জয় করেন, তখন তাহারা অনারব দেশগুলি জয় করেন। এই প্রতিক্রিয়ায় এই সমস্ত মরু-সন্তানগণ তাহাদের সঙ্গে শুধু ইসলামই আনয়ন করেন নাই, বরং আরবী ভাষাও আনিয়াছিলেন, যাহাকে তাহারা 'ফেরেশতাদের ভাষা' বলিয়া বিশ্বাস করেন। অধিকন্তু এই ভাষা বিজিত জাতিগুলির উপর এমনভাবে চাপাইয়া দেওয়া হয় যে, ইহা শেষ পর্যন্ত শিক্ষার মাধ্যম এবং অফিসের ভাষায় রূপান্তরিত হয়। ফলে একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত জাতীয় উৎপত্তি বিস্মৃত হইয়া সমস্ত বিদ্যার্থীগণ আরবীতে বিদ্যাচর্চা করেন। এই সমস্ত পণ্ডিত ব্যক্তিদের একটি বিরাট অংশই ছিলেন অনারব। প্রকৃত-পক্ষে, অনেকেই আরবদের সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন না। ইহাদের ভিতর উত্তর আফ্রিকার পণ্ডিত ইবনে খালদুনের নাম উল্লেখযোগ্য।

পরবর্তীকালে কোন কোন জাতি, যাহারা সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে আরবগণ কর্তৃক বিজিত হয়, যথা সিরীয়, মিসরীয় ও উত্তর আফ্রিকানরা আরবীকে নিজেদের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে। তবে অন্যরা যথা পারস্যবাসী, তুর্কী ও ভারতীয়গণ, আরবীকে মুখের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে নাই। তাহারা পরে নিজেদের রচনায় আরবী ভাষা পরিত্যাগ করে, যেরূপ ইউরো-পীয়গণ ল্যাটিন ভাষা পরিত্যাগ করিয়াছে।

বস্তুতঃ বিংশ শতাব্দীতে আরব জাতীয়তাবাদের উদ্ভব পর্যন্ত 'আরব' বলিতে শুধু মূল আরব উপদ্বীপের লোকদিগকেই বুঝাইত। এমন কি প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফারটাইল ক্রিসেন্টের কিছু সংখ্যক নেতা কর্তৃক প্রস্তাবিত 'আরবী যে বলে সে-ই আরব' এই মত মিসরীয়গণ প্রথমে গ্রহণ করে নাই। এই প্যান-আরবীয় নীতি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পর্যন্ত অনেক অনুসারীকেই প্রভাবিত করিতে পারে নাই।

সমস্ত আরবীভাষী লোকদিগকে একটি আরব জাতিতে ঐক্যবদ্ধ করিবার ইচ্ছাটি বোধগম্য এবং সম্পূর্ণ আইনসঙ্গতও বটে। যদিও আরবীভাষী সম্প্র-দায়গুলির মধ্যে অনেকে ইহার বিরোধীও রহিয়াছেন। কিন্তু মধ্যযুগে যাহারা

আরবীতে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাদের সবাইকে 'আরব' বলিবার স্বপক্ষে কোন যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। যুক্তরাষ্ট্রের কিছু সংখ্যক পণ্ডিত বর্তমানে আকাঙ্ক্ষিত 'আরব' শব্দটিকে যাহারা মধ্যযুগে আরবী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহাদের নির্দিষ্ট রাখিবার উদ্দেশ্যে মরুভূমির প্রাথমিক বিজয়ীদেরকে 'আরবীয়' (Arabian) রূপে উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে বিভ্রান্তি আরও বাড়িয়াছে। ইহা শুধু একতরফাই নহে, বরং ইহার ফল-স্বরূপ এমন উদ্ভট দাবীও উত্থিত হইতেছে যে, পারস্য উপসাগরকে 'আরব উপসাগর' নামে অভিহিত করা উচিত।

ইসলামের বিজয়ের পর হইতে মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্রে এত পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে যে এই সমস্ত সমস্যা অন্যান্য লোকদিগকেও প্রভাবিত করিতেছে। বর্তমানে সোভিয়েত উজবেকিস্তানের লোকজন একাদশ শতা-ব্দীর বিখ্যাত চিকিৎসক ও দার্শনিক আবিসিনাকে উজবেক বলিয়া দাবী করে। কারণ তিনি বোখারায় জন্মগ্রহণ করেন যাহা বর্তমানের উজবেকি-স্তানের সীমানায় পড়িয়াছে। পারস্যবাসীরা তাহাকে একান্ত নিজস্ব বলিয়া দাবী করে, কারণ তাহার মাতৃভাষা ছিল ফার্সী এবং তিনি ইরানে বাস করেন ও পরলোকগমন করেন। আরব লীগের তথ্য দফতর আবিসিনার অবদানকে বিশ্বের নিকট 'আরবদের অবদান' বলিয়া অভিহিত করে এবং তাহার একমাত্র কারণ হইল তিনি তাঁহার বৈজ্ঞানিক কার্যাবলী আরবীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আবিসিনা কাহাদের ছিলেন ?

বিশৃঙ্খলা পরিহার করিবার জন্য আমরা আলোচ্য যুগকে আরব, পারস্য-বাসী বা উজবেক বলিয়া বিবেচনা করিব না বরং ইহাকে তাহার নিজস্ব চরিত্র বলিয়া অভিহিত করিব। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বোধ হয় 'ইসলামিক' নামটিই সর্বোৎকৃষ্ট কারণ ইসলামই এই সমগ্র এলাকার একমাত্র সাধারণ পরিচিতি। ইসলামই আরবীকে একটি পবিত্র ভাষায় রূপান্তরিত করিয়াছে, যাহার ফলে সমস্ত মূল্যবান রচনাগুলি আরবীতে লেখা হইয়াছে। যদিও এই সভ্যতার কোন কোন অবদানকারী নিজেরা মুসলমান ছিলেন না ; তথাপি কোন প্রশ্নই থাকিতে পারে না যে তাঁহারা ইসলামের উদ্যোগেই তাঁহাদের কাজ করিয়াছেন।

প্রথম খণ্ড

ইসলামী সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন

প্রথম অধ্যায়

ইসলামের পূর্বে মধ্যপ্রাচ্য

হযরত মুহম্মদ (সঃ) ৫৭০ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ৬২২ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রথম ইসলামী সরকার গঠন করেন। ৬৩৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইহা দিগ্বিজয়ের ধ্বজা ধরিয়া আক্রমণাত্মক অভিযানের জন্য প্রায় প্রস্তুত হইয়া পড়ে। এমন কি প্রাথমিক পর্যায়েও এই অভিযান উত্তর-পূর্বে ইরান এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে মিসর পর্যন্ত অতিক্রম না করিয়া ক্ষান্ত হয় নাই। এই সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন অংশের লোকজন হযরত মুহম্মদ (সঃ) ও তাঁহার আদর্শ সম্পর্কে মোটামুটি অজ্ঞ ছিল এবং তাহাদের নিজস্ব সমস্যাদি লইয়া ব্যস্ত ছিল।

ইউরোপ সবেমাত্র মহাশক্তিশালী রোমের পতন এবং রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশের ধ্বংসের আঘাত কাটিয়া উঠিতে শুরু করিয়াছে। বিভিন্ন গোত্র যথা ফ্রাংক (Frank), মেরোভিঞ্জিয়ান (Merovengeans), ভিসিগথ (Visigoths), অস্ট্রগত (Ostrogoths) ও অন্যান্যরা একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছে কিন্তু কেহই নিজেদের অভিলাষ অন্যদের উপর চাপাইতে সমর্থ হয় নাই। ইউরোপের জনসাধারণের বিরাট অংশ তখনও বর্বর থাকা সত্ত্বেও গীর্জাই ছিল তাহাদের একমাত্র প্রধান প্রতিষ্ঠান যাহাকে জনসাধারণ মান্য করিত। ইহা ছিল মহান পোপ গ্রেগরীর যুগ, যিনি ৫৯০ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার রাজত্ব আরম্ভ করেন। তখন হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর বয়স ছিল ২০ বৎসর এবং ইহার ১৪ বৎসর পর মহামান্য পোপ মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন চারিজন প্রসিদ্ধ ল্যাটিন ধর্ম যাজকদের (Latin Fathers) শেষ পুরুষ এবং মধ্যযুগীয় পোপদের প্রথম পুরুষ। তিনিই মধ্যযুগের সূচনা করেন বলা যায়। তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহাকে পোপ নিযুক্ত করা হইলেও ক্ষমতাসীন হইয়া তিনি খুব কর্মঠ

হইয়া উঠেন। গীর্জার সম্পদ তিনি দান-দাক্ষিণ্যে খরচ করেন, গরীব দিগকে খাওয়ান এবং যুদ্ধ বন্দীদিগকে মুক্ত করেন। তিনি একটি বিরাট ধর্ম-অভিযান পরিচালনা করেন। এবং ইউরোপের সুদূর অঞ্চলগুলিতে ধর্মাশ্রম নির্মাণে সহায়তা করেন। ইংল্যাণ্ডবাসীকে খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করিবার মূলে তিনি ছিলেন পুরোধা। এই সন্ন্যাসীই সর্বপ্রথম পোপ, যিনি নিজেকে 'প্রভুর নফরদের নফর' বলিয়া উল্লেখ করেন। তবুও তিনি দাবী করেন পোপ হিসাবে রোমের বিশপকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল গীর্জার অধিনায়ক হিসাবে স্বীকার করা উচিত। তিনি মনে করেন, পাশ্চাত্যে একজন সম্রাটের অবর্তমানে গীর্জাকেই উক্ত শূন্যস্থান পূরণ করা উচিত। কথিত আছে যে, তিনি প্রার্থিব বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া প্রতি মুহূর্তের জন্য শোক প্রকাশ করিতেন। কিন্তু তবুও তিনি রাজার ক্ষমতা গ্রহণ করা প্রয়োজনীয় মনে করতেন। পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে দেখা যাইবে এই ব্যাপারে তিনি হযরত মুহম্মদের (সঃ) সঙ্গে এক মত ছিলেন।

ভারতবর্ষে সাহিত্য বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় কৃতিত্বের অধিকারী গুপ্ত বংশের সোনালী যুগ শেষ হইয়াছে। এক শতাব্দীকাল হূনদের দাসত্ব ও ক্ষমতা লাভের আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের পর গুপ্তবংশের হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬ খ্রীস্টাব্দে উত্তর ভারতে একটি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া শাসনকার্য পরিচালনা আরম্ভ করেন। তিনি হযরত মুহম্মদের (সঃ) মৃত্যুর ১৫ বৎসর পর ৬৪৭ খ্রীস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ঐ ৪২ বৎসরে তিনি দেশে শান্তি ও নিরাপত্তা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার রাজধানী কণৌজ, শিল্প ও শিক্ষার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। শিবের পূজার অনুসারী হইয়াও হর্ষবর্দ্ধন বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন এবং মহান রাজা অশোকের (খ্রীস্টপূর্ব ২৭৪—২৩৬) সমকক্ষ হইতে চেষ্টা করেন। প্রসিদ্ধ চীনা বৌদ্ধ পর্যটক হুয়ান চুয়াং (Hsuan Chuang) বর্ণনা করেন, হর্ষবর্দ্ধন প্রতি পাঁচ বৎসর পর একটি ভোজের পর্ব ঘোষণা করিতেন এবং উহাতে প্রত্যেক ধর্মের দরিদ্রদিগকে নিমন্ত্রণ করিতেন। খাজাঞ্চীখানার সমস্ত উদ্বৃত্ত অর্থ তিনি আমন্ত্রিতদের মধ্যে বিতরণ করিতেন এবং এই অনুষ্ঠানে তিনি তাঁহার সমস্ত অলংকার ও রাজকীয় পোশাক-পরিচ্ছদ দান করিয়া দিতেন। এইসব কিছু এক ব্যক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং ইহার পরিণতি ভয়াবহ

আকার ধারণ করিয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর উপমহাদেশে পুনরায় গোলযোগ আরম্ভ হয় এবং রাজাগণও যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়। এই অবস্থা হযরত মুহম্মদের (সঃ) অনুসারীদের আগমন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

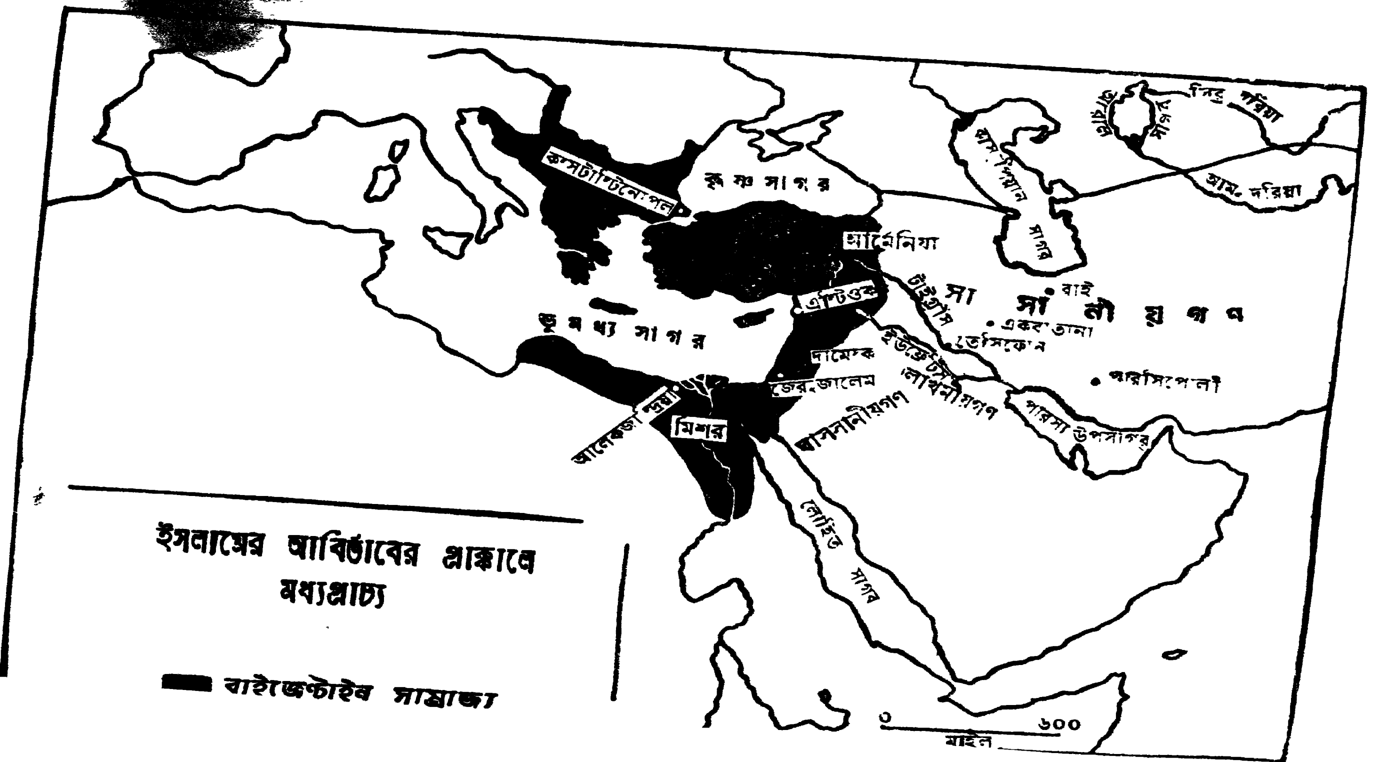
চীনে হযরত মুহম্মদের (সঃ) জীবদ্দশায় একটি পুনর্জাগরণের সূচনা হয়। চীনের প্রসিদ্ধ তয়াং বংশ (T'ang Dynasty) যাযাবর আক্রমণকারীদের শাসনের স্থলাভিষিক্ত হইয়া চীনের সোনালী যুগের সূচনা করে। চীনের একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট তাই সুং (Tai Tsung ৬২৭—৬৪৯ খ্রীঃ) হযরত মুহম্মদের (সঃ) মক্কা হইতে মদীনায় হিজরতের পাঁচ বৎসর পর সিংহাসন আরোহণ করেন এবং ৬৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। অনেক বৎসরব্যাপী নিষ্ঠুর যুদ্ধ বিগ্রহের পর তাই সুং বাণিজ্যে উৎসাহ প্রদান, খাল খনন, যুদ্ধ-বন্দীদের পুনর্বাসন এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া শান্তি স্থাপনে মনোনিবেশ করেন। কথিত আছে যে, কোন একজন তাঁহাকে অপরাধীদের ব্যাপারে কঠোর হইতে উপদেশ দিলে তাইসুং তাঁহার গুরু কনফুসিয়াসের (Confucius) সর্বশ্রেষ্ঠ বাণীতে উত্তর দেন—"আমি যদি খরচ হ্রাস করি, করের বোঝা হাল্কা করি, শুধু চরিত্রবান কর্মধ্যক্ষদের নিযুক্ত করি যাহাতে জন-সাধারণের নিকট যথেষ্ট কাপড়-চোপড় থাকে, তবে ইহা রাহাজানী দূর করিবার জন্য কঠোরতম শাস্তি প্রয়োগ করিবার চেয়েও অধিক কার্যকরী হইবে।" এই সময়েই প্রসিদ্ধ চীনা বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী হুয়ান চুয়াং ভারতবর্ষ সফর করেন এবং প্রায় ৭৫টি বৌদ্ধ পুস্তক চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। ঐতি-হাসিকগণ ধারণা করেন, এই সময়েই চীনে 'ব্লক মুদ্রণ' আবিষ্কৃত হয়। হযরত মুহম্মদের (সঃ) সময় সম্ভবতঃ চীনই ছিল বিশ্বের সব চেয়ে বেশী সুশাসিত রাষ্ট্র।

আরও পূর্ব দিকে জাপানে তখন সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আলোড়ন চলিতে ছিল। হযরত মুহম্মদের (সঃ) সমসাময়িককালে জাপানে ছিলেন দেশের প্রথম সম্রাজ্ঞী সুইকু (৫৯২—৬২১ খ্রীঃ) যিনি যুবরাজ শোতোকু তাইশীর (Shotoku Taishi) প্রতিনিধিত্বের সময় বৌদ্ধ মন্দিরসমূহ নির্মাণ করেন এবং বৌদ্ধ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। পরে যুবরাজ একটি 'শাসনতন্ত্র' জারী করেন। এই শাসনতন্ত্র ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের কনফুসীয়দের নীতিশাস্ত্র, চীনা রাজনৈতিক আদর্শ ও বৌদ্ধ ধর্মীয় মতবাদের সংমিশ্রণ। এই সমস্ত আন্দোলন

চীনের তিয়াং বংশের দৃষ্টান্তে সুদৃঢ় হইয়া ৬৪৬ সালের তাইকওয়া সংস্কারে পরিচালিত হয় যদ্বারা সম্রাটকে অতি উচ্চ ক্ষমতা ও ঐশ্বরিক আসনে উন্নীত করা হয়। তাঁহাকে সমগ্র জাপানের মালিক বলিয়া গণ্য করা হয় এবং তাঁহার আদেশ মান্য করিবার জন্য প্রত্যেকে বাঁচিয়া থাকে বলিয়া মনে করা হয়। একদিকে হযরত মুহম্মদের (সঃ) অনুসারীগণ যখন আরবের মরুভূমি হইতে বাহির হয় গোত্রীয় সামন্তবাদের জীবন শেষ করিয়া—অপরদিকে জাপান তখন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের যুগে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করে।

আরব উপদ্বীপের উত্তরের ভূখণ্ড তখন দুইটি বৃহৎ ও গর্বিত শক্তির পদানত ছিল। পশ্চিমে ছিল বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্য যাহার আধিপত্যে ছিল সমগ্র বলকান এলাকা ও এশিয়া মাইনর, ভূমধ্যসাগরের পূর্বতীর, মিসর এবং উত্তর আফ্রিকার কিছু অংশ। ইহা ছিল রোমান সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী এবং ইহার রাজধানী ছিল বাইজাণ্টিয়ম বা কনস্টাণ্টিনোপলে। এই সাম্রাজ্যের সরকারী ধর্ম ছিল প্রাচ্য সনাতন খ্রীস্টান ধর্ম (Eastern Orthodox Christianity) এবং ইহার ভাষা ছিল গ্রীক। পূর্বে ছিল প্রাচীন আখমানিয়ান সাম্রাজ্যের (Achamanean Empire) উত্তরাধিকারী সাসানীয়গণ কর্তৃক শাসিত পারস্যবাসীগণ। কাস্পিয়ান সাগরের উভয় তীর ফারটাইল ক্রিসেণ্টের পূর্ব অংশ এবং টাইগ্রীস ও সিন্ধু নদী সমূহের মধ্যবর্তী সমগ্র এলাকা সাসানীয়দের আধিপত্যে ছিল। তাহাদের শীতকালীন রাজধানী ছিল টাইগ্রীস নদীর তীরে অবস্থিত চেসিফনে (Chesiphon) এবং গ্রীষ্মকালীন রাজধানী ছিল একবাতানায় বা আধুনিক হামাদানে। তাহাদের ধর্ম ছিল জরথুস্ত্র এবং তাহাদের ভাষাকে বলা হইত পাহলভী বা মধ্যযুগীয় ফার্সী। পারস্য ও বাইজেণ্টাইন উভয়েই ছিল স্বেচ্ছাচারী। ধর্মকে তাহারা রাষ্ট্রের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিত। তবে ভাষা ও সংস্কৃতিগতভাবে পারস্যবাসীগণের মধ্যে অধিক একাত্মতা ছিল বলিয়া নিজেদের ঐতিহ্যের ব্যাপারে তাহারা গর্বিত ছিল। এই দুইটি সাম্রাজ্য সর্বদাই যুদ্ধে লিপ্ত থাকিত এবং কোন পক্ষই অপর পক্ষকে পদানত রাখিবার মত শক্তিশালী ছিল না।

হযরত মুহম্মদের সঃ) জন্মের কয়েক বৎসর পূর্বে এই দুইটি সাম্রাজ্য সমসাময়িক দুই জন প্রসিদ্ধ সম্রাটের শাসনাধীন ছিল। বাইজেণ্টাইনে সম্রাট ছিলেন জাস্টিনিয়ান (৫২৭—৫৬৫ খ্রীঃ) এবং পারস্যের শাহানশাহ ছিলেন



ইসলামের আবির্ভাবের প্রাক্কালে মধ্যপ্রাচ্য

সরু আনুসিরাওঁয়া (৫৩১—৫৭১ খ্রীঃ) যাঁহাকে গ্রীকগণ বলিত 'খসরু' এবং ারবগণ 'ক্যসরা'। উভয় শাসকই ছিলেন কর্মঠ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং একচ্ছত্র মতায় বিশ্বাসী। উভয়েই ছিলেন সংস্কারক এবং আইন প্রণেতা। তাঁহারা কে অপরকে ভাই সম্বোধন করিতেন। তাঁহারা একটি অনন্ত শান্তি চুক্তি ম্পাদন করেন। এই ব্যাপারে জাস্টিনিয়ান ১১,০০০ পাউণ্ড স্বর্ণ প্রদান রেন। কারণ তিনি ইটালী আক্রমণ করিবার জন্য নির্ভয় হইতে চাহিয়া- হলেন। যাহা হউক, এই চুক্তি এক যুগও স্থায়ী হয় নাই। ৫৪০ খ্রীস্টাব্দে ানুশিরাওঁয়ার সেনাবাহিনীকে এণ্টিওকের বহির্দ্বারে মোতায়েন করা য়। জাস্টিনিয়ান-এর অবস্থা তখন নাজুক। তিনি ৫৪৫ সালে ২০০০ পাউণ্ড দান করিয়া একটি পাঁচ বৎসর মেয়াদী চুক্তি সম্পাদন করেন। শেষ পর্যন্ত ৬২ খ্রীস্টাব্দে ৫০ বৎসর মেয়াদী একটি শান্তি চুক্তির জন্য জাস্টিনিয়ান বাৎস- াক ৩০,০০০ খণ্ড স্বর্ণ প্রদানে রাজী হন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর অনতিবিলম্বেই নরায় সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। দুই সাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ একটি নিয়মিত ঘটনায় রিণত হয়।

তবে এই ধারণা হওয়া উচিত নয় যে, পারস্যবাসী ও বাইজেণ্টাইনগণ াহাদের সমস্ত সময় যুদ্ধবিগ্রহে ব্যয় করিত। শান্তির সময় তাহাদের জেদের মধ্যে কূটনৈতিক, সাংস্কৃতিক মতাদর্শের এবং বাণিজ্যিক দ্রব্য সাম- ীর বিনিময় হইত। মসলা, মূল্যবান পাথর, হাতীর দাঁত ও রেশমের ্যবসায়ীগণ বেশ তৎপর ছিল। শিল্পকলার উন্নতি, পাণ্ডুলিপির জাঁকজমক আড়ম্বরপূর্ণ গীর্জা নির্মাণে বাইজেণ্টাইনগণ যথেষ্ট সময় ব্যয় করিত এবং ভীর ধর্মীয় আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিত। পারস্যবাসীগণ নিজেদের লাকায় ছিল জ্ঞানদীপ্ত শিক্ষা-দীক্ষার পৃষ্ঠপোষক। ভারতবর্ষ ও চীনের সঙ্গে াহারা ব্যবসা করিত। তাহারা অতি সুন্দর সুন্দর সৌধ নির্মাণ করে, একটি ্ঠু শাসনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠন করে এবং গুণ্ডী শাপুর (Gundi Shapur)- শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে, যাহা সমসাময়িক কালের সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবৃত্তির ন্দ্রে পরিণত হয়। যুদ্ধ-বিগ্রহ সত্ত্বেও উভয় দেশের মধ্যে ব্যবসা, শিল্পকলা ভাবধারার বিনিময় অব্যাহত থাকে।

কিন্তু যুদ্ধও অব্যাহত থাকে। সাম্রাজ্যগুলি অন্য দুইজন অসাধারণ ক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির জন্ম দেয় : ইরানে খসরু পারভেজ (৫৮৩—৬২৮ খ্রীঃ)

এবং বাইজেণ্টিয়ামে হেরাক্লিয়াস (৬১০—৬৪১ খ্রীঃ)। অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস, খসরু পারভেজ যিনি ৫৮৯ সালে বাইটাইল সম্রাট মৌরীস কর্তৃক পুনর্বহাল হইয়াছিলেন, শতবর্ষীয় ফোকাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। উল্লেখযোগ্য যে, ফোকাস মৌরীসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং ৬০৩ খ্রীস্টাব্দে তাহাকে হত্যা করেন। ১৯ বৎসর ধরিয়া পারস্যবাসী-গণের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে এবং তাহারা দারা এণ্টিওক, আলেপ্পো ও দামেস্ক অধিকার করে। ৬১৪ খ্রীস্টাব্দে খসরু পারভেজ জেরুজালেম ধ্বংস করেন এবং আসল ক্রস (True Cross) ইরানে লইয়া যান। ইহা খ্রীস্টান দের একটি আকাঙ্ক্ষিত সম্পদ এবং তাহাদের বিশ্বাস যীশু খ্রীস্টকে ইহার উপর ক্রুশবিদ্ধ করা হইয়াছিল। ৬১৬ খ্রীস্টাব্দে খসরু আলেকজান্দ্রিয়ার দিকে অভিযান পরিচালনা করেন। ৬১৯ খ্রীস্টাব্দে পারস্য সেনাবাহিনী পুনরায় দ্বিতীয় দারিয়াসের পর এই প্রথমবার মিসর দখল করে। ইতি-মধ্যে আরেকটি পারস্যবাহিনী সমগ্র এশিয়া মাইনর জয় করিয়া ৬১৭ খ্রীস্টাব্দে কালাসডন (Chaladan) দখল করে এবং বসফরাস অতিক্রম করিয়া কনস্ট্যান্টিনোপলে পৌঁছে।

৬১০ খ্রীস্টাব্দে হযরত মুহম্মদ (সঃ) আল্লার রসুল বা প্রেরিত পুরুষ হিসাবে প্রত্যাদিষ্ট হন। ঠিক সেই বৎসর হেরাক্লিয়াস বাইজেণ্টিয়ামের সম্রাট হন। বার বৎসর পর্যন্ত তিনি পারস্যবাসীদের হাতে পরাজিত হইতে থাকেন এবং যুদ্ধের প্রস্তুতিতে সময় ব্যয় করেন। ৬২২ খ্রীস্টাব্দে হযরত মুহম্মদ (সঃ) মদীনায় রসুল ও রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে ক্ষমতা হাতে নেন। হেরাক্লিয়াস সেই বৎসরই পারস্যবাসীদিগকে প্রতিঘাত করেন। তিনি গর্বিত, ক্লান্ত পারস্য বাহিনীর উপর একের পর এক যুদ্ধে জয় লাভ করেন। ৬২৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি ঢেসিফোনের সিংহদ্বারে উপনীত হন। খসরু পারভেজ তদীয় পুত্রের হাতে নিহত হন এবং হেরাক্লিয়াস আসল ক্রুশসহ তাঁহার হারানো সব কিছু উদ্ধার করেন। কিন্তু ইহা একটি অর্থহীন বিজয়, কারণ, ইরান ও বাইজেণ্টিয়াম উভয়েই প্রচুর রক্তক্ষরণে তখন নিঃশেষিত। ধ্বংস তাহা-দের প্রান্তে। তাহাদিগকে মরণাঘাত দিল আরব উপদ্বীপের দক্ষিণের অধিবাসীগণ, যাহারা এককালে ছিল উভয় শক্তির বশ্য ও পদানত।

ইরান ও বাইজেণ্টিয়ামের যুদ্ধবিগ্রহ আরব পর্যন্ত পৌঁছায় নাই। উত্তরের

সুসভ্য সাম্রাজ্যদ্বয় ইহাকে অসভ্য এলাকা হিসাবে গণ্য করিত। এই এলাকায় মোট জনসংখ্যার ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ অধিবাসী ছিল যাযাবর বেদুইন। তাহারা সর্বদা অবাধ্যতার পরিচয় দিত। মরুভূমি হইতে পরিচালিত আক্রমণকে প্রতিহত করিবার জন্য উভয় সাম্রাজ্য দুইটি শক্তিশালী গোত্রকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে। পারস্যবাসীগণ গাস্‌সানী গোত্রকে বাইজেণ্টাইনদের তত্ত্বাবধানে থাকিতে অনুমতি প্রদান করে এবং বাইজেণ্টাইনগণ প্রতিদানে হীরার লাখমি গোত্রের সঙ্গে পারস্যবাসীদের একই সম্পর্ক স্বীকার করে। তবে দক্ষিণ আরব ইহার অপেক্ষাকৃত কোমল জলবায়ু, স্থায়ী সংস্কৃতি ও স্বল্প ব্যবধানের জন্য অধিকাংশ সময় ইরানের পদানত ছিল। পারস্যের খোদিত প্রস্তরে হামীর, এডেন, ইয়েমেন এবং দক্ষিণ আরবের অন্যান্য স্থানগুলিকে করদাতা অঞ্চল হিসাবে দেখা যায়। এই সমস্ত অঞ্চলের সহিত বাইজেণ্টাইনদের সম্পর্ক ছিল ইথিওপিয়া ও লোহিত সাগরের মাধ্যমে।

আরব উপদ্বীপের মধ্যে ও উত্তর অংশে হেজাজ ও নজ্‌দ্‌ ছিল বেশীর ভাগই অনুর্বর মরুভূমি। মরুদ্যানের সংখ্যা ছিল খুবই কম। এই বিশাল মরুভূমির বেদুইন অধিবাসীগণ পানি দেখিলে উট হইতে অবতরণ করিত এবং সেই পানি নিঃশেষ হওয়া পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করিত। পরবর্তী কালের বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক ইব্‌ন খাল্‌দুনের (১৩৩২—১৪০৬ খ্রীঃ) মতানুসারে যাযাবররা ছিল নিরক্ষর, তাহারা কোন নৈপুণ্যের ধার ধারিত না এবং তাহারা ছিল সভ্যতা ধ্বংসকারী। আরবগণ রান্নার পাত্র স্থাপন করিবার জন্য পাথর ব্যবহার করে। অতএব পাথর সংগ্রহ করিবার জন্য তাহারা দালান কোঠা ভাঙিয়া ঐগুলি বাহির করিয়া লয়। আলানীর জন্য কাঠ সংগ্রহ করিতে গিয়া তাহারা ছাদ ভাঙিয়া ফেলে। লুঠতরাজ ছিল আরব অর্থনীতির একটি স্তম্ভ এবং আরবদের জীবনপদ্ধতি। সমগ্র জীবন ধরিয়া তাহারা খাদ্য, উট ও স্ত্রীলোকদের পিছনে ব্যয় করিত।

এই এলাকায় অল্প সংখ্যক বসতি ছিল। উহাদের একটি ছিল হেজাজের মক্কা, লোহিত সাগর হইতে প্রায় ৫০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত। এই শহরের প্রাণমূল ছিল জমজম নামক একটি কূপ। ইহা অর্থনৈতিক উন্নতির চাবিকাঠি ছিল দক্ষিণ আরব হইতে উত্তরের ভূমধ্যসাগরের বন্দরগুলি

পর্যন্ত পরিচালিত মসলা সরবরাহের পথে অবস্থিত। ইহার বিখ্যাত হইবার মূলে ছিল প্রাচীন পবিত্রস্থান কা'বা, যাহা উপদ্বীপের অধিবাসীদের ধর্মের কেন্দ্রস্থল ছিল।

আনুমানিক খ্রীস্টের জন্মের এক হাজার বৎসরেরও অনেক পূর্বে এতদ-অঞ্চলের আরবগণ আকাশ হইতে একটি উল্কাখণ্ড পড়িতে দেখে এবং এই কারণেই ইহাকে পবিত্র জ্ঞান করে।* তাহারা এই কৃষ্ণ পাথর 'হাজর-উল-আসওয়াদ' (Hajar-ul-Aswad) কুড়াইয়া লয় এবং ইহাকে কেন্দ্র করিয়া একটি ঘনক্ষেত্রফল (cubic) বিশিষ্ট ঘর নির্মাণ করে। তাহাকেই কা'বা বলা হয়। প্রতিবেশী গোত্রগুলি এই কা'বাকে পূজা করিবার জন্য প্রত্যেক বৎসর আসিতে আরম্ভ করে। কয়েক শতাব্দীর মধ্যে কা'বার চতুর্দিকে একটি উপসনালয় গড়িয়া উঠে ও উপদ্বীপের পৌত্তলিক আরবদের মধ্যে ইহার উপাসনা সার্বজনীনতা লাভ করে। চান্দ্রপঞ্জিকার জিলহজ্জ মাসের ১২ তারিখে এখানে একটি বাৎসরিক তীর্থ অনুষ্ঠিত হইত। একটি অলিখিত আইন অনুসারে এই সময় এবং আরও দুইমাস পর্যন্ত সর্বপ্রকার আক্রমণ নিষিদ্ধ ছিল এবং বিভিন্ন গোত্র বিনা উৎপীড়নে এখানে আসা যাওয়া করিতে সক্ষম ছিল। তীর্থযাত্রী তাহার কাপড় পরিবর্তন করিয়া 'এহরাম' অর্থাৎ সেলাইবিহীন দুই খণ্ড সাদা কাপড় পরিধান করিয়া একটি চতুষ্কোণ আঙ্গিনায় প্রবেশ করিত, যাহার মধ্য-খানে কা'বা অবস্থিত। কৃষ্ণ পাথরে চুম্বন করিয়া সে ইহাকে সাত বার প্রদক্ষিণ করিত, তিন বার দৌড়াইয়া এবং চার বার হাঁটিয়া। প্রত্যেকবার কৃষ্ণ পাথরকে চুম্বন করিতে হইত, তারপর সে একটি প্রার্থনা আবৃত্তি করিত এমন এক জায়গায় যাহা পারে ইসলামী আমলে 'ইব্রাহীমের ঘর' হিসাবে পরিচিত হয়। ইহার অর্থ হইল ইব্রাহীমই সর্বপ্রথম এই কা'বা নির্মাণ করেন। অতঃপর সে শহরের বাহিরে দুইটি পাহাড়ের নিকটে যাইত, একটিকে বলা হয় সাফা এবং অপরটিকে বলা হইত মারওয়া। সাত বার সাফা পাহাড়ে উঠিয়া এবং পুনরায় নামিয়া মারওয়া পাহাড়ে উঠিয়া সেই প্রার্থনা আবৃত্তি করিতে করিতে সে প্রত্যেকটি পাহাড়ের চুড়ায়

* আল-কোরানের ভাষ্য অনুযায়ী হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এই পাথরটি কুড়াইয়া লন এবং কা'বা গৃহ তৈয়ার করিয়া হজ্জের নিয়ম প্রচলিত করেন।—অনুবাদক

আরোহণ করিত। অতঃপর সে মক্কায় ফিরিয়া আসিয়া কা'বার চতুর্দিকে হাঁটিয়া প্রদক্ষিণ করিত এবং কৃষ্ণ পাথরকে চুম্বন করিত।

তারপর ছয় দিন তীর্থযাত্রী বিশ্রাম করিত। বোধ হয় তখন ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে খেলাধূলা প্রতিযোগিতা এবং কবিতা শ্রবণে অতিবাহিত করিত। অষ্টম দিবসে সে নিকটবর্তী মীনা গ্রামে যাইয়া রাত্রি কাটাইত। তারপরের প্রত্যুষে সে আরাফাত পাহাড়ে হাঁটিয়া যাইত এবং সেখান হইতে রাত্রি অতিবাহিত করিবার জন্য মুজদালিফায় গমন করিত।

দশম দিবস তীর্থযাত্রার সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। কারণ, ইহা কোরবানীর দিন। তাহার পরে আসে ঈদ-আল-কবীর বা মহান ভোজ। এই দিন তীর্থযাত্রী মীনায় গমন করিয়া তিনটি বিশাল খুঁটি বিশিষ্ট উপাসনালয়ে যাইত। এই মন্দিরই বোধ হয় দুষ্ট শয়তানকে প্রশমিত করিবার নিমিত্ত কোরবানীর স্থান। এই শয়তানকে বলা হয় শয়তান-আল-কবীর বা সর্ববৃহৎ শয়তান। অতঃপর সে তাহার অর্থের সমানুপাতিক একটি প্রাণী লইয়া সে-জায়গায় কোরবানী দিত। ইহার পর সে তাহার নিত্য-নৈমিত্তিক কাপড় পরিধান করিয়া মক্কায় গমন করিত এবং পুনরায় বিনিময় ব্যবসা সমাধা করিয়া দেশে ফিরিয়া যাইত।

লুণ্ঠন, আক্রমণ ও পানির সন্ধান ব্যতীত মোটামুটি ইহাই ছিল আরবদের ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন। কা'বার ধর্মীয় অনুশাসনগুলি প্রায় পরিবর্তনহীনভাবেই মুসলমানেরা অদ্যাবধি পালন করিয়া থাকে।

মক্কা একটি রাজধানীর ন্যায় গড়িয়া উঠে। তীর্থযাত্রীগণ তাহাদের গোত্রীয় দেবতাগুলি আনিয়া কা'বার আঙ্গিনায় স্থাপন করে। তীর্থের অনুশাসনাদির পর আরবগণ পণ্য বিনিময় করিয়া, খেলাধূলার প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করিত এবং কবিতায় তাহাদের শৌর্যবীর্য-গাঁথা আবৃত্তি করিত। উষ্ট্র-দৌড় এবং ঘোড়-দৌড় এই প্রতিযোগিতার অন্যতম ছিল। কবি ছিলেন একাধারে চারণ, একজন জ্ঞানী লোক, ঐতিহাসিক, গীতিবাগীশ ও অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি। কৌতুক ও অভিশাপের মাধ্যমে তিনি তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রগুলিকে তিরস্কার করিতেন এবং স্বীয় গোত্রের লোকদিগকে তাহাদের বীরত্ব, সম্মান ও সাহসিকতার

কথা স্মরণ করাইয়া দিতেন। প্রাক-ইসলামী আরবের সেই কবিতাবলীর অতি অল্প নমুনাই বর্তমানে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, পুরস্কার প্রাপ্ত কবিতাগুলি কা'বার প্রবেশদ্বারে লটকাইয়া দেওয়া হইত এবং সে-গুলিকে 'মুয়াল্লাকাত' বা 'ঝুলন্ত' বলা হইত। বর্তমানে প্রাপ্ত কবিতা-গুলির বিষয় বস্তু হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি, অন্ততঃ তিনটি বিষয় ছিল আরবদের অত্যন্ত প্রিয়—কড়া মদ, বেগবান ঘোড়া এবং মরু-ভূমিতে কালো তাঁবুর মধ্যে সুন্দরীর ক্ষণিক সঙ্গ।

তখন হইতে মক্কা, মধ্য ও উত্তর আরবের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। শহরের রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল কোরাইশ গোত্রের হাতে। হযরত মুহম্মদের (সঃ) সময় কোরাইশ বংশ ক্ষমতার শীর্ষ অতিক্রম করিয়া ইহার প্রতিপত্তি ও আধিপত্য হারাইতে আরম্ভ করে বলিয়া ইঙ্গিত পাওয়া যায়। উপ-গোত্রগুলির মধ্যে তখন অনৈক্য বিরাজমান এবং এইগুলি উহাদের প্রতিবেশী প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রগুলিকে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে আহ্বান করে। এতদসত্ত্বেও কোরাইশ বংশ তখনও ক্ষমতা ও আধিপত্যের আসনে অধিষ্ঠিত ছিল। হজ্বের মৌসুম শেষ হইবার পর গোত্রগুলি উপদ্বীপের চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িত এবং তাহাদের চিরাচরিত নীতি—পানি, সম্পদ ও স্ত্রীলোকের লুণ্ঠন কার্যে ব্যস্ত হইয়া পড়িত। অপর দিকে কোরাইশ নেতাগণ পরবর্তী মৌসুমে ব্যবসা করিবার নিমিত্ত তাহাদের পুঁজি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে উত্তরে সিরিয়া, মিসর ও ইরানে সুরক্ষিত কাফেলা প্রেরণ করিত। ফলে কোরাইশদের মধ্যে উৎসাহী ব্যক্তিবর্গ বহির্বিশ্ব সম্পর্কে তেমন অজ্ঞ ছিল না। বাইজেন্টিয়ানে ও ইরানের মধ্যে প্রায়শঃ সংঘটিত যুদ্ধে তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইত—এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। এতদ্বারা তাহারা এক-জনের বিরুদ্ধে আরেকজনকে লেলাইয়া দেওয়ার নিয়মাবলী শিখিতে পারিত। আরবে ইহুদী ও খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বীদের বসতি থাকিবার ফলে পৌত্তলিক আরবগণ তাহাদের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখিত। তাহাদের ঈশ্বরদের মধ্যে আরবগণ আল্লাহ নামটি জানিত (ওল্ড টেস্টামেন্টের এ্যল-লোহ বা এ্যালোহীম-এর ন্যায়)। মক্কায় হানিফ নামে পরিচিত এক শ্রেণীর লোক ছিল যাহাদিগকে একেশ্বরবাদী বলিয়া বোধ হইত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ হযরত মুহম্মদ (সঃ)

উপরে সংক্ষেপে বর্ণিত পরিবেশে এবং খুব সম্ভবতঃ ৫৭০ খ্রীস্টাব্দে হযরত মুহম্মদ (সঃ) মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কোরাইশ বংশের একটি ছোট ও আপাততঃ দৃষ্টিতে অল্প প্রতিপত্তিশালী হাশেমী উপ-গোত্রের লোক ছিলেন। তাঁহার পিতা আবদুল্লাহ তাঁহার জন্মের পূর্বে মারা যান এবং জন্মের ছয় বৎসর পর তাঁহার মাতা আমেনা মৃত্যুমুখে পতিত হন। পিতামহ আবদুল মোত্তালিব তাঁহাকে লালন-পালন করেন এবং আবদুল মোত্তালিবের মৃত্যুর পর চাচা আবু তালিব তাঁহাকে লালন-পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

অন্যান্য রসুলদের জীবনীর ন্যায় হযরত মুহম্মদের (সঃ) জীবনও সম্ভবতঃ তাহার ভক্ত অনুসারীদের দ্বারা কাল্পনিক আকার ধারণ করে। কারণ ভক্তগণ তাঁহার তিরোধানের একশতাব্দী বা অনুরূপ সময়ের পর তাঁহার জীবন-চরিত্র রচনা করেন। হযরত মুহম্মদের (সঃ) জীবনের প্রথম ২৪ বৎসরের বিশেষ কোন বিবরণ পাওয়া যায় না এবং যাহা পাওয়া যায় তাহাও খুবই সংক্ষিপ্ত। সুক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার প্রাথমিক জীবন সম্পর্কে অনেক কাহিনীকে একত্রিত করিলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে তিনি কাজ গ্রহণ করেন। এই প্রতিষ্ঠানে কোরাইশদেরও অংশ ছিল। কাফেলার একজন বালক-সদস্য হিসাবে, সম্ভবতঃ তিনি ফারটাইল ক্রিসেণ্ট, মিসর এবং বোধ হয় ইরানও সফর করেন। এই সময় তিনি রাত্রিতে কাফেলার ইহুদী-খ্রীস্টান সদস্যদের সহিত তাঁহার নিজের লোকদের ধর্মীয় বিতর্ক শুনিতেন। ইহুদী-খ্রীস্টানরা নিজেদের ধর্মীয় গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি সহকারে বিতর্ক করিতেন। কিন্তু তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন যে তাঁহার লোকদের

সেইরূপ ব্যবহারযোগ্য কোন ধর্ম গ্রন্থ নাই। ইহা ছিল হতাশাব্যঞ্জক। তাই জীবনের প্রথম ভাগে তিনি নিশ্চয়ই ইচ্ছা পোষণ করেন যে, তাঁহার লোকদের একটি ধর্মগ্রন্থ থাকা বাঞ্ছনীয়। কোরানে আমরা একাধিকবার পাঠ করি, "এখন আরবীতে তোমাদের একটি গ্রন্থ আছে" যাহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

এই সময় হযরত মুহম্মদ (সঃ) যাহাই করিয়া থাকুন না কেন, ইহা মোটামুটি পরিষ্কার যে তিনি ব্যবসার আদান-প্রদানের খাতিরেই তাহা করিয়াছেন। কারণ, তিনি ব্যবসার সমস্ত বিষয়ের সহিত সুপরিচিত হইয়া উঠেন। ৫৯৪ খ্রীস্টাব্দে, হযরত মুহম্মদ (সঃ)এর বয়স যখন ২৪ বৎসর, খাদীজা নাম্নী এক ধনী ব্যবসায়ী তাঁহার ব্যবসার ম্যানেজার নিযুক্ত করিবার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যে অভিজ্ঞ একজন লোক খোঁজ করিতেছিলেন। খাদীজা তাঁহার দ্বিতীয় স্বামীকে হারাইয়া ব্যবসা সংক্রান্ত কাজ-কারবার নিজেই তদারক করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। তিনি যে নিজে কাজ-কারবার তদারক করিতে পারিতেন একথা প্রমাণ করে যে, প্রাক-ইসলামী আরবে মহিলাদের মর্যাদা তত নিম্নমানের ছিল না। হয়ত অর্থনৈতিক কারণে কোন কোন গোত্র নবজাত শিশুকন্যা হত্যা করিত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তখন মহিলারা শুধু যে সম্পত্তির মালিক হইত তাহা নহে, বরং ইচ্ছা করিলে তাহারা আত্মনির্ভরশীলও হইতে পারিত। পরিবারের একজন বন্ধু খাদীজার এই কাজের জন্য হযরত মুহম্মদের (সঃ) নাম শুপারিশ করে। তিনি ছিলেন সৎ, অভিজ্ঞ এবং কোরাইশ বংশেরও। খাদীজা তাঁহাকে সচিব নিযুক্ত করেন এবং এক বৎসর পর তাঁহার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন খাদীজার বয়স ৪০ বৎসর এবং হযরত মুহম্মদের (সঃ) বয়স মাত্র ২৫ বৎসর। খাদীজা যেহেতু ধনী, সামাজিক প্রতিপত্তির অধিকারিণী এবং হযরত মুহম্মদের (সঃ) চাকুরীদাত্রী, অতএব তিনিই বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন—এই জাতীয় জনশ্রুতিই সম্ভবতঃ সত্য।

স্বভাবতই হযরত মুহম্মদ (সঃ) রাতারাতি একজন কাফেলার খুব-সদস্য হইতে একটি উন্নতশীল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তায় উন্নীত হন এবং কোরাইশ গোত্রের একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিরূপে পরিণত হন। পঁচিশ বৎসর তিনি খাদীজার সহিত পরম সুখে জীবন যাপন করেন। তাঁহার দুই পুত্র ও চারি কন্যার জন্ম হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পুত্রগণ শৈশবেই মারা

যান। ঘরে পরিতৃপ্ত জীবন এবং বাহিরে একটি উন্নতশীল ব্যবসা। অন্যান্য ধনী লোকদের ন্যায় তিনিও মক্কার পার্শ্ববর্তী হেরার একটি পাহাড়ী গুহা বা ঘর লইয়া উহাকে সজ্জিত করেন। শহরের গরম ও চেঁচামেচি হইতে বাঁচিয়া সেইখানে ধ্যান করিতেন।*

৬১০ খ্রীস্টাব্দের রমজান মাসের শেষের দিকে হযরত মুহম্মদ (সঃ) গুহায় বিশ্রাম লওয়ার সময় একটি আওয়াজ শুনিতে পান। এই আওয়াজকে তিনি পরে 'ঘণ্টাধ্বনি' বলিয়া বর্ণনা করেন। বর্তমান ইসলামী বিশ্বের ন্যায় প্রাক-ইসলামী আরবে রমজান ছিল একটি রোজার মাস এবং ধর্মের প্রতি একজন অনুরাগী ব্যক্তি হিসাবে হযরত মুহম্মদ (সঃ) তখন নিশ্চয়ই রোজা রাখিয়া ছিলেন। এই আওয়াজ তাঁহাকে বলিল, 'ইকরা বিইছমে র বিবকা'—"প্রভুর নামে পড় যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, যিনি মানুষকে একটি জমাট রক্ত বিন্দু হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।" তিনি ভীত হইয়া পড়েন। কথিত আছে যে, মুহম্মদ (সঃ) মনে করিলেন, যে কবিকে তিনি ঘৃণা করেন সেই কবিদের ন্যায় তাঁহাকে 'ভূতে পাইয়াছে'। তাঁহার ধারণা এত গভীর হয় যে, তিনি রীতিমত আত্মহত্যা করিতে সিদ্ধান্ত নেন।** তিনি নিশ্চিয়ই বিহ্বল হইয়া পড়িয়া থাকিতে পারেন। কোন্ প্রভুর নামে তিনি কথা বলিবেন? মক্কার চতুর্পার্শ্বে তখন মোটের উপর তিন শতের অধিক প্রভু বিরাজমান!*** তাঁহার স্ত্রীর নিকট তিনি এই অভিজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেন। খাদীজা তাঁহার এক চাচাত ভাই ওয়ারাকারের নিকট যান ও মুহম্মদের সঃ) অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। তিনি একজন খ্রীস্টান ছিলেন। কথিত আছে ওয়ারাকার চীৎকার করিয়া বলেন, "দেখ তিনি এই জাতির জন্য একজন প্রেরিত পুরুষ হইবেন। তাঁহাকে চিত্তশুদ্ধ রাখিতে বল।" হযরত মুহম্মদ (সঃ) ঐশী আদেশ প্রাপ্ত হন। পরে এই স্মরণীয় ঘটনাকে 'শক্তির রাত্রি' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

সংক্ষিপ্ত বিরতির পর হযরত মুহম্মদ (সঃ) যখন পুনরায় 'উত্থিত ও

* লেখকের এই মতের সঙ্গে আমরা একমত নহি। মক্কার ধনী লোকেরা ধ্যান করিবার জন্য কুত্রাপী এইরূপ গুহায় যাইতেন না এবং উহাকে সজ্জিতও করিতেন না। —অনুবাদক।

** এখানেও লেখকের সঙ্গে আমরা একমত নই কারণ, এই সময়ের ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমাদের জানা আছে।—অনুবাদক।

*** উপরে দ্রষ্টব্য : পৃষ্ঠা—২৮ (ইংরেজী মুল গ্রন্থ)।

সাবধান' হইবার জন্য আদেশ প্রদানকারীর সেই আওয়াজ শুনিলেন তাঁহার মধ্যে আর সংশয় রহিল না যে, আল্লাহ তাহাকে তাঁহার প্রেরিত পুরুষ হইবার জন্য বাছিয়া লইয়াছেন। আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ হিসাবে তাঁহাকে যাঁহারা বিশ্বাস করিয়াছে তাঁহাদের মধ্যে খাদীজা ছিলেন সর্বপ্রথম। তাহার পর হইতে তাঁহার নিকট আরও ঘন ঘন ঐশীবাণী আসিতে লাগিল এবং 'সেই আওয়াজকে' তিনি ফেরেশতা জিব্রাইলের আওয়াজ বলিয়া সনাক্ত করিলেন, যিনি তাঁহাকে আল্লাহর বাণী পড়িয়া শুনান।

প্রায় দশ বৎসর পর্যন্ত মুহম্মদ (সঃ) আল্লার একত্ব প্রচার করেন, যাহা মক্কা নগরের চিরাচরিত পৌত্তলিকতার বিরোধী ছিল।

"বল ঃ তিনিই আল্লাহ, এক।
আল্লাহ, যাঁহার নিকট সকলেই সর্বদা যাজ্ঞা করে। তিনি কাহারও নিকট হইতে জন্ম নেন নাই বা তিনি কাহাকেও জন্ম দেনও না।
এবং তাহার সমকক্ষ কেউ নয়।"

(আল-কোরান ঃ ১১২)

আল্লাহ সম্বন্ধে হযরত মুহম্মদের (সঃ) ভাবধারণা এবং নবীদের নিকট আল্লাহর ঐশীবাণী প্রেরণের নীতি ইহুদী ও খ্রীস্টানদের ঐতিহ্য হইতে তাঁহার নিকট আসিয়াছে। ইহুদী-খ্রীস্টান ঐতিহ্য অনুসারেই মুহম্মদ (সঃ) নিজেকে একজন নবী মনে করেন। অতএব আদম, নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, হারুণ, ইস্রাইলদের সন্তানগণ, মরিয়ম ও যীশু সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্য খুবই স্বাভাবিক। পুরাতন নবীদের ন্যায় তিনিও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধাচরণ করেন। আল্লাহর একত্ব এবং ইহকাল পরকালে তাঁহার ক্ষমতা সম্বন্ধেও তিনি তাঁহার বাণী প্রচার করেন। আল্লাহ শুধু ইহুদী ও খ্রীস্টানদের ব্যাপারে নয়, বরং আরবদের ব্যাপারেও আগ্রহী। তিনিই কা'বা গৃহকে ইয়েমেনের আবিসিনীয় শাসক আবরাহার হস্তী আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন। খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দশকে সংঘটিত হয় বলিয়া এই ঘটনাটি তাঁহার শ্রোতাদের নিকট পরিষ্কার স্মরণ রহিয়াছে।

"তুমি কি দেখ নাই তোমাদের প্রভু কি ভাবে হস্তীওয়ালাদের শায়েস্তা করিয়াছেন? তিনি কি তাহাদের কৌশলগুলিকে নিষ্ফল করিয়া দেন নাই এবং তাহাদের বিরুদ্ধে আবাবিল পাখী প্রেরণ করেন নাই, যেগুলি

তাহাদের উপর পোড়া মাটির পাথর নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে (গো-মহিষাদি দ্বারা) ধ্বংসকৃত সবুজ ফসলের ন্যায় রাখিয়া গিয়াছে ?''

—(আল-কোরান ঃ ১০৫)

তিনি হজ্বের মাসের সুযোগ গ্রহণ করেন। তখন হাজার হাজার লোক মক্কায় আগমন করেন। তিনি ক্ষমতাশীল ও দয়ালু আল্লাহর কথা প্রচার করেন যে, 'আল্লাহ হযরত মুহম্মদকে (সঃ) প্রেরণ করিয়াছেন তাহা-দিগকে পৌত্তলিকতা হইতে বিরত রাখিবার জন্য, শেষ বিচারের দিন এবং পরকালে তাহাদের শাস্তি বা পুরস্কার সম্পর্কে সাবধান করিবার জন্য, এই সমস্ত সাবধান বাণীতে তিনি পরম বাগ্মিতার পরিচয় প্রদান করিতেন। সময় সম্পর্কে তিনি তাহাদিগকে সাবধান করেন ঃ

''সূর্যকে যখন বিপর্যস্ত করা হয়,
এবং তারকারাজি যখন পতিত হয়,
এবং যখন পর্বতসমূহকে নাড়াইয়া দেওয়া হয়,
এবং যখন বড় ও ছোট সমস্ত উটগুলিকে ত্যাগ করা হয়,
এবং যখন সমুদ্রসমূহ উত্থিত হয়,
এবং যখন আত্মাগুলিকে পুনঃসংযোজন করা হয়··· ।

—(আল-কোরান ঃ ৮১)

তিনি তাহাদিগকে নিশ্চয়তা দান করেন যে,...''যখন শিঙ্গা একবার ধ্বনিত হইবে এবং ভূমণ্ডলকে সমস্ত পর্বতসহ উপরে তুলিয়া এক প্রচণ্ড শব্দে ধ্বংস করা হইবে। তখন সেইদিন সমস্ত ঘটনাবলী পুনঃপ্রকাশ পাইবে··· । সেইদিন তোমাদিগকে অনাবৃত করা হইবে ; তোমাদের কোন গোপন তথ্য লুক্কায়িত থাকিবে না··· ।''

—(আল-কোরান ঃ ৬৯)

খুব বেশী সংখ্যক লোক তাঁহাকে অনুসরণ করে নাই। তাঁহার স্ত্রী, তাঁহার চাচাত ভাই আলী এবং তাহার চাকর জায়েদ ছিলেন প্রথম-দের মধ্যে। বহু সংখ্যক ক্রীতদাস তাঁহার সাবধান বাণীতে কান দেন, কিন্তু তাহাদের কোন প্রতিপত্তি ছিল না। সম্পন্নলোকদের মধ্যে যিনি তাঁহার বাণী গ্রহণ করেন তিনি হইলেন আবু বকর। কোরাইশদের মধ্যে তিনি বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। বাকী সকলেই হয়ত তাঁহাকে

অবজ্ঞা করে বা বড়জোর তাঁহাকে ঠাট্টা করে এবং তাঁহাকে পাগল ও ভূতে পাইয়াছে বলিয়া বিদ্রূপ করে। তার প্রত্যুত্তরে বলা হয় :

"অস্তমিত তারকার শপথ,
তোমাদের সাথী ভুল করেন নাই বা প্রবঞ্চিত হন নাই ;
বা তিনি তাঁহার স্বীয় ইচ্ছার কথাও বলেন না ..।"

—(আল-কোরান : ৫৩)

"এবং আপনি নিজের প্রতি আপনার প্রভুর অনুগ্রহের জন্য একজন উন্মাদ নন।" এবং পুনরায় "সোবেহসাদেক ও গভীর রাত্রির শপথ, আপনার প্রভু আপনাকে ত্যাগ করেন নাই বা আপনাকে ঘৃণাও করেন না... ।"

—(আল-কোরান : ৫৩)

কোরাইশরা নিজেদের মধ্যে একজন রসুল পাওয়াটাকে গর্বের চোখে দেখে নাই। হয়ত হযরত মুহম্মদের (সঃ) সঙ্গী ব্যবসায়ীগণ তাঁহার এই ধর্ম প্রচারে নিজেদের অর্থনৈতিক বিপর্যয়কে দেখিতে পায়। নূতন ধর্মের প্রসার কা'বার চতুর্দিকে এবং কা'বার মধ্যে অবস্থিত সমস্ত দেবদেবী সমূহকে ধ্বংস করিবে। ফলে হজ্বযাত্রা (প্রাক-ইসলামী রীতি অনুসারে) বন্ধ হইয়া যাইবে এবং হজ্ব ছাড়া মক্কার অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া পড়িবে। কোরাইশগণ তাহাদের অর্থনৈতিক প্রাধান্য হারাইবে। সত্যকথা বলিতে কি বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তৈল আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত আরবের সর্ববৃহৎ আয়ের উৎস ছিল হজ্ব। অতএব রসুলের দাবীর সাথে বাণিজ্যিক মুনাফার সেই পুরাতন সংঘাত পুনরায় আত্মপ্রকাশ করে। নিঃসন্দেহে হযরত মুহম্মদ (সঃ) কোরাইশদের উন্নতি ব্যহত হইবার ব্যাপারটি অনুধাবন করিয়াছিলেন, কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁহার কিছুই করণীয় ছিল না। তিনি দৃঢ় বিশ্বাস ও সাদাসিদা ভাবে তাঁহার ধর্ম প্রচারের কাজ চালাইয়া যান।

অত্যাচার এড়াইবার জন্য মুহম্মদের (সঃ) অনেক অনুসারী ইথিওপিয়ায় (আবিসিনীয়া) হিজরত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কিন্তু ইহাতেও কোন ফলোদয় হয় নাই। আপোষের মাধ্যমে কৃতকার্যতা লাভের ব্যাপারে মুহম্মদ (সঃ) নিশ্চয়ই উদগ্রীব হন। এক সময় হয়ত তিনি স্বীকার করিতে উদ্যত হন দেব-মন্দিরে তিনটি দেবী-মূর্তি—লাত, মানাত ও উজ্জা ঘাঁটি হইতে

পারে যদিও এইগুলি আল্লাহর অধঃস্তন। তবে পরে তিনি এরূপ প্ররোচনার বিরোধিতা করিয়া এক আল্লাহর কথা ঘোষণা করেন।

এই সংগ্রামে হযরত মুহম্মদের (সঃ) জীবন বিপর্যস্ত হয় নাই। তিনি ছিলেন হাশিম উপ-গোত্রের সদস্য এবং উহার নেতা আবু তালিব তাঁহার চাচা। এই বৃদ্ধ লোক যদিও তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের ধর্ম মানিয়া লন নাই তথাপি তিনি তাঁহাকে আশ্রয় দেন। তদস্থলে হযরত মুহম্মদকে (সঃ) গ্রহণ-কারী ক্রীতদাসগণ অত্যাচারের সমস্ত বোঝা বহন করেন। প্রাক-ইসলামী আরবের আইন অনুসারে ক্রীতদাসদের কোন নিরাপত্তা ছিল না। বোধ হয় এই সমস্ত ক্রীতদাস ছাড়িয়া দিবার প্ররোচনায় মুহম্মদের (সঃ) নিকট নিম্নবর্ণিত ঐশীবাণী প্রেরণ করা হয়:

> "(হে রসুল) বলুন: ওহে অবিশ্বাসীগণ। তোমরা যাহার আরাধনা কর আমি তাহার আরাধনা করি না; বা আমি যাহার আরাধনা করি তোমরা তাহার কর না; এবং তোমরা যাহার আরাধনা কর আমি তাহার আরাধনা করিব না, বা আমি যাহার আরাধনা করি তোমরা তাহার আরাধনা করিবে না। তোমাদের নিকট তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার ধর্ম।"
>
> —(আল-কোরান : ১০৯)

হযরত মুহম্মদের (সঃ) জীবনের সবচেয়ে বিপদপূর্ণ সময় ছিল ৬১৯ খ্রীস্টাব্দ। সেই বৎসর তাঁহার পালক-পিতা, চাচা ও আশ্রয়দাতা আবু তালিব মারা যান। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন আবু লাহাব। ইনি মুহম্মদের (সঃ) ধর্মের একজন গোড়া শত্রু, যাহাকে মুহম্মদ (সঃ) ঐশী বাণীর মাধ্যমে অভিশাপ প্রধান করেন:

> "আবু লাহাবের ক্ষমতা ধ্বংস হইবে এবং সে ধ্বংস হইবে। তাহার ধনসম্পদ ও উপার্জন তাহাকে পরিত্রাণ দিবে না। তাহাকে জলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হইবে এবং তাহার কাঠবহনকারী স্ত্রীর গলায় খেজুর দড়ির মালা থাকিবে।"
>
> —(আল-কোরান: ১১১)

অবস্থার চরম অবনতি ঘটে তাঁহার প্রিয়তমা স্ত্রী খাদীজাও সেই বৎসরই মারা যান। তাঁহার পক্ষে খাদীজাকে হারানো ছিল জাহাজের

নোঙর হারাইবার ন্যায়। ইহার পর হইতে জীবনের স্রোত তাঁহাকে এদিক হইতে ওদিকে দোলাইতে থাকে। খাদীজার জীবদ্দশায় ২৫ বৎসর পর্যন্ত তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর দশ বৎসরে তিনি অনেকগুলি বিবাহ করেন। কিছু সংখ্যক মহিলাকে তিনি আশ্রয় দেওয়ার জন্য বিবাহ করেন। কারণ তাহাদের স্বামীগণ তাহার ধর্মের জন্য জীবন দান করেন বলিয়া প্রচলিত রীতি অনুসারে তিনি তাহাদিগকে বিবাহ করিতে বাধ্য হন। অন্যান্যগুলিকে তিনি বিবাহ করেন রাজনৈতিক কারণে—অন্য গোত্রের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য। যেকোন লোক কোরান ও হাদীস হইতে এই তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন যে, খাদীজার মৃত্যুর পর তিনি গৃহজীবনে অনুরূপ শান্তি আর ফিরিয়া পান নাই।

এই প্রথম বারের মত হযরত মুহম্মদ (সঃ) মক্কা ছাড়িয়া অন্যত্র তাঁহার ভাগ্য পরীক্ষা করিবার বিষয়টি চিন্তা করেন। প্রতিবেশী শহর তায়েফে তিনি ইহার সম্ভাব্যতা অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁহার প্রতি তায়েফের লোকদের রাগ যে এত অধিক তাহা তিনি কল্পনাও করেন নাই। সেখানে প্রস্তরাঘাতে প্রায় মৃত্যুর মুখে তাঁহাকে গোপন আশ্রয় নিতে হয়। কিছু সংখ্যক উদার কোরাইশ নেতার মধ্যস্থতা ও আশ্রয়ের নিশ্চয়তা পাইয়া হযরত মুহম্মদ (সঃ) সেখান হইতে মক্কায় প্রত্যাগমন করেন।

হযরত মুহম্মদের (সঃ) সৌভাগ্যবশতঃ মক্কার ২০০ মাইল উত্তরে অবস্থিত ইয়াসরিব শহরে এমন কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়, যেগুলি পরে তাঁহার উপকারে আসে। ইয়াসরিবে তিনটি ইহুদী গোত্রের আদি বসতি ছিল। এই গোত্রগুলি হইল বনি নজির, বনি কোরাইজা ও বনি কাইনুকা। দুইটি পৌত্তলিক গোত্র আওস ও খাজরাজ এই শহর আক্রমণ করে। ইহারা দক্ষিণ আরব হইতে আসিয়াছে বলিয়া দাবী করে। তাহারা কিছু সংখ্যক ইহুদী হইতে জমি ছিনাইয়া লয়। কতকগুলিকে ক্রীতদাসে পরিণত করে এবং অবশিষ্ট ইহুদীদের সহিত সন্ধি করে। পরবর্তীকালে নেতৃত্ব লইয়া আওস ও খাজরাজের মধ্যে মতবিরোধ হওয়ার ফলে তাহারা একে অন্যের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই অন্তর্বিরোধের ফলে জননিরাপত্তা গভীরভাবে বিঘ্নিত হয় বলিয়া কেউ ব্যবসাবাণিজ্যের জন্য চলাফেরা করা নিরাপদ মনে করিত না। দুই গোত্রের সমমর্যাদার কিছু সংখ্যক নেতৃবৃন্দ এই বিরোধের অবসানের জন্য

চেষ্টা চালান কিন্তু এই মধ্যস্থতা করিবার মত যোগ্যতা কাহারও ছিল না। ফলে একজন বহিরাগত মধ্যস্থতাকারীর প্রয়োজন হইয়া পড়ে। হযরত মুহম্মদ (সঃ) সেই মধ্যস্থতাকারীতে পরিণত হন। হযরত মুহম্মদকে (সঃ) মনোনীত করাটা নিছক আকস্মিক নহে। প্রথমতঃ ইয়াসরিববাসীগণ হযরত মুহম্মদের (সঃ) ধর্ম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল। তাহাদের শহরবাসী ইহুদীগণ মূসা ও তাহাদের নবীদের সম্পর্কে পূর্বেও বলিয়াছিল এবং একজন মাসিয়াহর আগমন সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করিয়াছিল। ফলে হযরত মুহম্মদের (সঃ) কথাগুলি সম্পর্কে সকলে অবহিত ছিলেন। স্মরণ করা যাইতে পারে, ইয়াসরিব শহরটি ইয়েমেন ও দামেস্কের বাণিজ্য পথে অবস্থিত অর্থনৈতিক দিক হইতে ছিল মক্কার প্রতিদ্বন্দ্বী। ইয়াসরিববাসীগণ হযরত মুহম্মদ (সঃ) ও অন্যান্য কোরাইশ নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিদ্যমান বিবাদের কথা জানিত। মুহাম্মদকে (সঃ) তাহারা শুধু একজন নতুন নবী হিসাবে পায় নাই বরং তাঁহার মধ্যে একজন সুদক্ষ লোকের সন্ধান পাইয়াছিল—যিনি কোরাইশ গোত্রের আভ্যন্তরীণ পরিষদের সঙ্গে সুপরিচিত, যিনি তাহাদিগকে মক্কা নগরীর প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরুদ্ধে নেতৃত্ব প্রদান করিতে সক্ষম।

৬২০ খ্রীস্টাব্দে ছয়জন খাজরাজ বংশের লোক হযরত মুহম্মদের (সঃ) সঙ্গে নূতন ধর্মে দীক্ষিত আরও অনেক লোক লইয়া আসে। ৬২২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইয়াসরিবের আওস্ ও খাজরাজ গোত্রের বেশ কিছু সংখ্যক লোক হযরত মুহম্মদকে (সঃ) তাহাদের নগরে আসিবার আমন্ত্রণ জানায়। এই অবস্থায় হযরত মুহম্মদের (সঃ) নিজস্ব অভিরুচি না থাকাই স্বাভাবিক, কারণ জন্ম-নগরী পরিত্যাগে তিনি নিশ্চয়ই অনিচ্ছুক ছিলেন। তবুও তাঁহার অনুসারীদের বেশ কিছু সংখ্যক লোককে তিনি ছোট ছোট দলে বিভক্ত করিয়া সেই শহরে পাঠাইয়া দেন। তাঁহাদের মধ্যে ওমর ও ওসমানের ন্যায় ধনী কোরাইশও ছিলেন। তিনি নিজে তাঁহার শ্বশুর আবু বকর, তাঁহার চাচাত ভাই ও জামাতা আলী এবং দুইজন স্ত্রী সমভিব্যাহারে সকলের অগোচরে মক্কা ত্যাগ করেন এবং ৬২২ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর নাগাদ ইয়াসরিব পৌছেন।* ইহাকেই হিজরত বা দেশত্যাগ

*হিজরতের সময় একমাত্র হযরত আবু বকরই (রাঃ) মহান নবীর সংগে থাকেন।
—অনুবাদক।

বলা হয়। প্রায় ১৭ বৎসর পর ইসলামের খলীফা থাকাকালে ওমর ইহাকে মুসলিম পঞ্জিকার প্রথম বৎসর হিসাবে নামকরণ করেন। হযরত মুহম্মদ (সঃ) কর্তৃক ইয়াসরিববাসীদের সঙ্গে আল্-আকাবার সন্ধি নামে একটি জোট স্থাপন করা হইলেও মক্কাবাসীদের পক্ষে তাহাদের সম্পদ মেয়েলোক ও সন্তান-সন্ততি লইয়া অপরিচিত ও শত্রু গোত্রগুলির মধ্যে বসবাস করাতে বেশ সাহসিকতার পরিচয় নিহিত। ইহার পর হইতে এই সমস্ত লোকদিগকে 'মুহাজিরুন' বা দেশত্যাগী বলা হয়। অপরদিকে আতস্ ও খাজরাজ গোত্রের মধ্যে যাঁহারা মুহম্মদকে (সঃ) অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন তাঁহারা 'আনসার' বা সাহায্যকারী নামে পরিচিত হন। পরে এই নগরীকে আর ইয়াসরিব বলা হয় না, বরং মদীনাত-আল-নবী বা নবীর নগরী বা শুধু মদীনা নামে ইহা সুপরিচিত হয়।

নূতন নগরীতে হযরত মুহম্মদ (সঃ) তিনটি জটিল সমস্যার সম্মুখীন হন। প্রথমটি হইল মদীনায় তিনি শুধু আল্লাহর রসুলই নন এবং একটি রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তাও বটে। তাঁহাকে একাধারে একটি সম্প্রদায়ের ভাল-মন্দ দেখাশুনা, বিচারের কাজ, আইন রচনা এবং তাঁহার অনুসারীদিগকে সংগঠিত করিতে হয়। মদীনায় তাঁহার রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়িত্ব তাঁহার নবীর দায়িত্বকে ছাড়াইয়া যায় বলিয়াও ধারণা করা হয়। সম্ভবতঃ তাঁহার এবং তাঁহার অনুসারীদের মতানুসারে এই দুইটি দায়িত্বকে এক-ত্রীভূত করা হয়। ওল্ড টেস্টামেন্ট (তৌরাত) অনুসারে মুসা যে বিষয়েই কথা বলিতেন তাহা মুসার নহে বরং ইয়াহওয়ের অর্থাৎ আল্লাহরই। অনুরূপ রাজনৈতিক নেতা হিসাবে হযরত মুহম্মদের (সঃ) আইন প্রণয়ন এবং বিভিন্ন মামলার রায় ঘোষণাবলীকে শুধু মানুষ মুহম্মদের (সঃ) ঘোষণাবলী নহে বরং আল্লাহর পবিত্র আদেশ বলিয়া গণ্য করা হয়। নবী রাজা হিসাবে তাঁহার মধ্যে সরকার ও ধর্ম সম্মিলিতরূপ লাভ করে এবং পার্থিব ও পরলৌকিক স্বার্থ এক ও অভিন্ন হইয়া যায়। ইসলাম একটি ধর্মভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং আজ পর্যন্ত অন্ততঃ পক্ষে মতবাদ অনুসারে ইহা তাহাই।

ফলে মুহম্মদের (সঃ) মদীনায় প্রাপ্ত ঐশী বাণীগুলিতে পূর্বের ন্যায় সরলতা বা কাব্যিক সৌন্দর্য নাই। এইগুলি অনেকটা পুনরাবৃত্তি ও বাগবহুল।* মক্কার বাণীগুলি যেখানে সাবধানবাণী ও মিনতিপূর্ণ, সেইখানে মদীনারগুলি আদেশ ও ভীতিপ্রদর্শন মূলক। কোরানিক আইনের তালিকার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও পার্থিব আইন কানুন রহিয়াছে। সেইগুলি হইল ওজু, ব্যভিচার, ভিক্ষা, মধ্যস্থতা, যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি, চুক্তি, তালাক, মদ্যপান, বিবাদ, ক্ষমা, সাধারণ আচরণ, ভাল, মূর্তিপূজা, ন্যায় বিচার, বিবাহ, এতিম, মাতাপিতা, যুদ্ধ, মেয়েলোক, প্রার্থনা প্রভৃতি। এইগুলি ইসলামী সম্প্রদায়ের জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহর আদেশাবলী। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বিভিন্ন জাতির ধর্মানুসারীগণ বিভিন্ন সময়ে এই আইনগুলিকে ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া অনেক পরিশ্রম করিয়াছে কিন্তু তাহারা কিছুই পরিবর্তন করিতে পারে নাই। একটি ঐশ্বরিক শাসনে ধর্ম ও রাষ্ট্র অবিভাজ্য। আধুনিক মুসলমান উভয় সংকটে পড়িয়াছে। একদিকে মুসলমান হিসাবে সে নিজের জাতিত্বকে তাহার ধর্মের সহিত চিহ্নিত করিতে চায়, অপরদিকে একজন আধুনিক হিসাবে সে এমন একটি সমাজ চায়, যেখানে ধর্ম ও রাষ্ট্র পৃথক। এ ব্যাপারে যথাযথ পন্থা নির্বাচন কঠিন ও বিপ্লবাত্মক। তুরস্ক এখন একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কিন্তু জনসাধারণ এই রীতির সহিত খাপখাওয়াইয়া চলিতে পারিতেছে না, আধুনিক অর্থে 'তুর্কী' বলিতে তুরস্কের অধিবাসী যে

---

* লেখকের এই উক্তির সহিত আমরা একমত নহি। বস্তুতঃ মদীনায় অবতীর্ণ সূরাগুলি আইন সংক্রান্ত বিষয়ে পরিপূর্ণ। এই সমস্ত সূরায় ইসলামের মৌলিক উপাদানসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। এই সম্পর্কে অধ্যাপক পি, কে, হিট্টির বক্তব্য সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন: "...বিজয়ের যুগে অবতীর্ণ মদীনার সূরাসমূহ দীর্ঘ বাগবহুল এবং আইন সংক্রান্ত বিষয়ে সমৃদ্ধ। এইগুলিতে ধর্মীয় বিধিসমূহ এবং নামাজ, রোজা, হজ্ব ও পবিত্র মাসসমূহের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এইগুলিতে আরও রহিয়াছে মদ, শূকর, জুয়াখেলা নিষিদ্ধকারী আইনসমূহ, জাকাত ও জিহাদের ব্যাপারে রাজস্ব ও সামরিক আইন-কানুন, খুন, প্রতিশোধ গ্রহণ, চুরি, সুদ খাওয়া, বিবাহ ও তালাক, অবৈধ যৌনক্রিয়া এবং ক্রীতদাস মুক্ত করা সংক্রান্ত বেসামরিক ও ক্রিমিনাল আইনসমূহ। P. K. Hitti : History of the Arabs, Macmillan & Co. Ltd., London, 1953, Page—124 (অনুবাদক)।

কোন ধর্মাবলম্বীকে বুঝায়—এমন কি সে নাস্তিক হইলেও কিন্তু জনসাধারণ একজন 'তুর্কী' বলিতে মুসলমানকেই বুঝায়। তুরস্কের সমস্ত অমুসলিম নাগরিকগণ নিজেদের মধ্যে একটি শ্রেণী হিসাবে পরিচিত, তুর্কী হিসাবে নহে। এই রাষ্ট্রে 'মুসলমান' বলিয়া পরিচয় প্রদানকারী একজন আধুনিক যুবক ধর্মের প্রতি অনুগত হইতেও পারে, নাও হইতে পারে। তাহার ধারণা 'ইসলামী' মতবাদে ধর্ম ও জাতীয়তা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে খাঁটি ধর্মীয় আনুগত্য ছাড়াও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সে ইসলামের প্রতি অনুগত থাকিতে পারে।

মদীনায় হযরত মুহম্মদের (সঃ) দ্বিতীয় সমস্যাটি হইল 'ইহুদী সমস্যা'। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মদীনা শহরে অনেক ইহুদী বসবাস করিত। ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, হযরত মুহম্মদ (সঃ) নিজেকে একজন ইহুদী-খ্রীস্টান ঐতিহ্যের নবী বলিয়া বিবেচনা করেন।* ঐতিহাসিকগণ একমত যে, হযরত মুহম্মদ (সঃ) আশা করিয়াছিলেন, ইহুদী ও খ্রীস্টানগণ তাঁহাকে পূর্ণ সমর্থন দান করিবে। তিনি খ্রীস্টান ধর্মের তুলনায় ইহুদী ধর্মের প্রতি অধিক নৈকট্য অনুভব করিতেন বলিয়া মক্কায় ইতিমধ্যেই তিনি অনেকগুলি ইহুদী আচার-অনুষ্ঠান পালন আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেইগুলি হইল রোজা রাখা, জেরুজালেমের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়া ইত্যাদি। মদীনায় আগমনের পর তিনি আশা করেন ইহুদীগণ তাঁহাকে নবী হিসাবে গ্রহণ করিবে এবং পৌত্তলিকতার নির্মূল সাধনে তাঁহাকে সাহায্য করিবে। এই ব্যাপারে তাঁহার ধারণা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। মদীনার ইহুদীগণ তাহাকে নবী হিসাবে গ্রহণ করিতে শুধু অস্বীকারই করে নাই বরং তাঁহাকে ছলনাকারী হিসাবে ঠাট্টা করিয়াছে এবং তৌরাত সম্পর্কে জ্ঞানহীনতার জন্য তাঁহাকে বোকা বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছে। তাহারা তাঁহাকে তৌরাত বিকৃত করিবার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে এবং একজন আরবকে 'মসিহ' হিসাবে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। তবুও মুহম্মদ (সঃ) তাঁহার আশায় অটল থাকেন।

> "ওহে বিশ্ববাসীগণ আল্লাহর প্রতি নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হও এবং তাঁহার রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। তিনি

* উপরে দ্রষ্টব্য। পৃঃ—৩২ (মূল গ্রন্থ)

তোমাদিগকে তাঁহার দ্বিগুণ দয়া প্রদান করিবেন... ।"

—(আল-কোরান ঃ ৫৭)

তিনি ইহুদীদিগকে ইহাও স্মরণ করাইয়া দেন যে, "আল্লাহর দয়ার ব্যাপারে তাহাদের কোন একচেটিয়া অধিকার নাই। ধর্মগ্রন্থ প্রাপ্ত লোকদের (অর্থাৎ ইহুদী ও খ্রীস্টানগণ) জানা উচিত, তাহারা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ন্ত্রণ করে না, কিন্তু অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে। যাহাকে ইচ্ছা তিনি তাহা প্রদান করেন।"

—(আল-কোরান ঃ ৫৭)

এই সমস্ত এবং এই ধরনের অন্যান্য যুক্তিগুলি যখন দৃঢ়ভাবে বাধা প্রাপ্ত হয় তখন হযরত মুহম্মদ (সঃ) ইহুদীদিগকে আল্লাহর বাণী বিকৃত করিবার দায়ে অভিযুক্ত করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং পরে তিনি হত্যা ও নির্বাসনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুহম্মদ (সঃ) এবং মক্কাবাসীদের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে মদীনা ও উহার আশেপাশের ইহুদীগণ নিরপেক্ষ ছিল নাকি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল তাহা এতদিন পরে নিরূপণ করা কঠিন। তবে নিশ্চিত বলা যায়, মুহম্মদ (সঃ) তাহাদিগকে শত্রু জোটের (অর্থাৎমু মদীনা আক্রমণকারী মক্কাবাসী ও বেদুইন গোত্রসমূহ) পক্ষাবলম্বনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করেন। অনূ্যন ৬২৫ খ্রীস্টাব্দে মুহম্মদ (সঃ) বনি নাজির নামে একটি ইহুদী গোত্রকে মদীনা হইতে বহিষ্কার করেন। দুই বৎসর পর বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে বনি কোরাইজা গোত্রের আনুমানিক ৬০০ লোককে কতলের শাস্তি প্রদান করা হয় এবং অবশিষ্ট লোকদিগকে নির্বাসিত করা হয়। ৬২৯ খ্রীস্টাব্দে মদীনার উত্তরে খায়বর নামে একটি মরুদ্যানের ইহুদী-দিগকে নির্বাসিত করা হয়। এইসব ইহুদীর সম্পত্তি মদীনায় মুহম্মদের (সঃ) সহিত মিলিত হইবার জন্য আগত মুহাজিরিনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

ইহুদীদের ব্যাপারে অভিজ্ঞতার দরুণই বোধ হয় মুহম্মদ (সঃ) একটি স্বাধীন কর্মসূচী গ্রহণ করেন এবং একটি আরব ধর্মীয় সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবার সিদ্ধান্ত নেন। ইহুদী-খ্রীস্টান ঐতিহ্য তিনি পরিত্যাগ করেন নাই। উপরন্তু তিনি দাবী করেন, ইহুদী ও খ্রীস্টানগণ আল্লাহর আদেশাবলী অমান্য করিয়াছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাহাদের ধর্মগ্রন্থ বিকৃত করিয়াছে। যিনি ইহুদী রীতি অনুসারে উত্তরে জেরুজালেমের দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতেন

তিনি পরে দক্ষিণে মক্কার দিকে মুখ ঘুরাইয়া ফেলেন। তখন হইতে সমস্ত মুসলমান মক্কার দিকে মুখ করিয়া নামাজ আদায় করে। তাহারা বিশ্বাস করে, আল্লাহর আদেশে ইব্রাহীম (সঃ) কা'বা নির্মাণ করিয়াছিলেন। দেব-দেবীর মূর্তি স্থাপনের দরুণ যেহেতু কা'বাগৃহকে অপবিত্র করা হইয়াছে, সুতরাং মুহম্মদের (সঃ) কর্তব্য হইল মূর্তিগুলি ধ্বংস করিয়া আল্লাহর উপাসনা প্রতিষ্ঠা করা। শনিবার ও রবিবার ইহুদী ও খ্রীস্টানদের পবিত্র দিন। মুহম্মদ (সঃ) শুক্রবারকে পবিত্র দিন হিসাবে বাছিয়া লন। শিঙ্গা ফুকিয়া ইহুদীগণ লোকদিগকে উপাসনার জন্য আহ্বান করিত এবং খ্রীস্টানগণ ঘণ্টার দ্বারা ডাকিত। মুহম্মদ (সঃ) আজান বা মানুষের কণ্ঠ ব্যবহারের প্রচলন করেন। একটি পৃথক ও স্বতন্ত্র ধর্মীয় সম্প্রদায় গঠন করিবার নিমিত্ত তিনি নামাজ, রোজা, আহার্যের আইন-কানুন ও অন্যান্য রীতিনীতিতে অনেক পরিবর্তন সুচনা করেন।

তৃতীয় ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা যাহা হযরত মুহম্মদ (সঃ) সমাধান করেন তাহা হইল মক্কাবাসীদের সংগে তাঁহার ব্যবহার। এই চিন্তা বোধ হয় তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল মক্কায় এবং মদীনায় আগমনের প্রথম দিকে। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, যিশু এবং অন্যান্য নবীগণ যেইভাবে আল্লাহর বাণীর প্রচেষ্টা সাধারণ মানুষের হাতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তিনি সেই ভাবে ছাড়িয়া দিবেন না। বরং মূসার ন্যায় তিনি পৃথিবীর উপর স্বয়ং আল্লাহ প্রদত্ত আইনের ভিত্তিতে একটি স্বাধীন আল্লাহর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইহা একমাত্র কুটনীতি, যুদ্ধ ও বিজয়ের মাধ্যমে করা সম্ভব। ৬২২ খ্রীস্টাব্দ হইতে ৬৩২ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার অন্তর্ধান পর্যন্ত এই দশ বৎসর মদীনায় থাকাকালীন মুহম্মদ (সঃ) প্রায় প্রত্যেক বৎসর যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। এই যুদ্ধের প্রায় প্রত্যেকটিতে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। আরবদের উপর ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠা করিবার জন্যই মূলতঃ এই সমস্ত যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়। যেহেতু মক্কা নগরী ছিল সবচাইতে শক্তিশালী বিপক্ষ সেইহেতু হযরত মুহম্মদ (সঃ) এই নগরীর উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

মদীনায় আগমনের অব্যবহিত পরেই হযরত মুহম্মদকে (সঃ) মক্কা হইতে আগত তাঁহার অনুসারীদের এবং মদীনায় তাঁহার সমর্থনকারীদের

সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে তিনি মক্কার কাফেলাগুলির উপর আক্রমণ করিবার আদেশ প্রদান করেন। ৬২৪ খ্রীস্টাব্দে হিজরতের দ্বিতীয় সালে যুদ্ধমুক্ত রমজান মাসে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে মক্কা অভিমুখে প্রত্যাগমনকারী একটি সম্পদপূর্ণ কাফেলার খবর পাইয়া তিনি উহা আক্রমনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই পরিকল্পনার কথা জানিতে পারিয়া আবু-সুফিয়ান সাহায্যের জন্য মক্কায় খবর পাঠান। অন্যূন ৯০০ মক্কাবাসী ও ৩০০ মুসলমান মদীনার ২০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে বদর নামক স্থানে যুদ্ধে মিলিত হয়।

যুদ্ধটি ছিল সংক্ষিপ্ত, ছোট এবং উন্মুক্ত। হযরত মুহম্মদ (সঃ) জয়লাভ করেন। কিছু সংখ্যক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ইহাকে গুরুত্বহীন যুদ্ধ হিসাবে অভিহিত করেন। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষে মৃতের সংখ্যা ছিল মাত্র ৬০ জন। কিন্তু মুসলিম ঐতিহাসিক ইহাকে যুদ্ধসমূহের যুদ্ধ 'গজওয়াত' হিসাবে অভিহিত করেন। ইসলামের ইতিহাসে প্রকৃত পক্ষে ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধসমূহের একটি। হযরত মুহম্মদ (সঃ) যদি এই যুদ্ধে পরাজিত হইতেন তবে ইসলাম খুব সম্ভবতঃ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যাইত। তবে এই বিজয় হযরত মুহম্মদের নেতৃত্বকে দৃঢ় করিয়াছে এবং প্রমাণ করিয়াছে যে, তিনি আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করিতে ছিলেন। কোরান বলিয়াছে, "আল্লাহ আমাদিগকে ইতিমধ্যেই বদরের যুদ্ধে বিজয় প্রদান করিয়াছেন।" এই বিজয়কে অলৌকিক বলিয়া বিশ্বাস করা হয় এবং এই খবর মরুভূমির চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। পরবর্তী যুদ্ধসমূহে মুসলমানগণ পূর্ণ আস্থা পোষণ করেন যে, তাহারা আল্লাহর জন্য যুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যদি মারা যান তাঁহারা শহীদ হইবেন এবং বেহেস্তে যাইবেন, আর যদি বাঁচিয়া থাকেন তাহা হইলে যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির ভাগ পাইবেন। এই প্রথম যুদ্ধ ভবিষ্যতের জন্য দৃষ্টান্ত হইয়া দাঁড়ায় যাহাতে আল্লাহর সৈনিকগণ বারবার শাহাদৎ বরণের নিমিত্ত মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া যুদ্ধে যোগ দান করেন।

কিন্তু মক্কাবাসীগণ এই যুদ্ধকে সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। পর বৎসর ৩০০০ সৈন্যের নেতৃত্বে আবু সুফিয়ান যুদ্ধে অগ্রসর হন। মরুভূমির অধিকাংশ যুদ্ধে স্ত্রীলোকগণ পুরুষদিগকে উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য

সঙ্গে যাইত। কথিত আছে হযরত মুহম্মদ (সঃ) তাঁহার স্ত্রীদের মধ্যে একজনকে তাঁহার সংগে যুদ্ধে লইয়া যাইতেন।* উভয়পক্ষ ওহুদে মিলিত হয়। এই যুদ্ধে হযরত (সঃ) অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হন এবং আহত হন। ক্ষতির কারণ ছিল মদীনার একটি গোত্রের অবাধ্যতা। যাহাই হউক, কোন অজ্ঞাত কারণে মক্কাবাসীগণ তাহাদের বিজয়ের ফল লাভ করিতে পারে নাই। হযরত মুহম্মদও (সঃ) অনতিবিলম্বে তাঁহার ক্ষতি কাটাইয়া উঠেন।

মক্কার বিরুদ্ধে হযরত মুহম্মদ (সঃ) আরবদিগকে ইসলামের পতাকা-তলে সমবেত করিতে সক্ষম হন নাই, কিন্তু মক্কাবাসীগণ হযরত মুহম্মদের (সঃ) সৈন্য বাহিনীকে তাহাদের কাফেলা আক্রমণ করিতে ছাড়িয়া দিতে পারে না। পুনরায় ৬২৭ খ্রীস্টাব্দে এক বিরাট বাহিনী লইয়া আবু সুফিয়ান মদীনা অভিমুখে অগ্রসর হন। নগরের ভিতরে থাকিয়া হযরত মুহম্মদ (সঃ) একটি মাত্র প্রবেশদ্বার রক্ষা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ইহাও খুবই দুষ্কর হইত যদি তিনি পারস্যবাসী সলমানের পরামর্শ অনু-সারে পরিখা খনন না করিতেন। সুলমান সম্ভবতঃ একজন পারস্যবাসী অফিসারের আরব আর্দালী ছিলেন। তাঁহার অনুসারীদের বিরক্তির মুখে হযরত মুহম্মদ (সঃ) পরিখা খনন করেন। এই ধরনের যুদ্ধে সম্পুর্ণ অনভিজ্ঞ মক্কাবাসীগণও এরূপ কাপুরুষোচিত পন্থায় বিরক্ত হয়। কাপুরু-ষতা হউক বা না হউক, ইহাতে কাজ হইয়াছে। এক সপ্তাহ পর্যন্ত হযরত মুহম্মদের (সঃ) উদ্দেশ্যে অপমানজনক কবিতা আবৃত্তি করিয়া মক্কাবাসীগণ অবরোধ তুলিয়া বাড়ীর দিকে ফিরিয়া যায়। এই যুদ্ধকে খন্দকের বা পরিখার যুদ্ধ বলা হয়।

ব্যবসার বাধা সৃষ্টি এবং ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে উল্লেখ না করিলেও এই সমস্ত যুদ্ধে মক্কাবাসীগণ যথেষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। অপর দিকে হযরত মুহম্মদের (সঃ) হারাইবার মত তেমন কিছু ছিল না এবং অনুভব করেন অবস্থা তাঁহার অনুকূলে। অধিকন্তু জেরুজালেম হইতে মক্কার দিকে কেবলা বা নামাজের দিক পরিবর্তন এবং কা'বার প্রতি তাঁহার

---

*নীতি অনুসারে রসুলুল্লাহ (সঃ) আরবের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্ত্রীলোকদের যুদ্ধে নিতেন না। নবীর মহিলাগণ যুদ্ধে থাকিতেন উৎসাহ প্রদান করিবার জন্য নহে, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করিবার জন্য।—অনুবাদক।

সম্মান প্রদর্শন প্রমান করে হযরত মুহম্মদ (সঃ) মক্কাকে পবিত্র মনে করিতেন। এই কারণে মক্কায় হজ্বযাত্রীকে তিনি তাঁহার নূতন ধর্মের অংশ হিসাবে পরিগণিত করেন। এইভাবে হজ্বের স্থান হিসাবে মক্কা ইহার অর্থনৈতিক প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখে এবং এই পূর্ণ নিশ্চয়তায় মক্কাবাসীগণ যুদ্ধ বিগ্রহ চালাইয়া যাওয়ার পক্ষে কোন যুক্তিপূর্ণ কারণ খুঁজিয়া পায় না। হযরত মুহম্মদ (সঃ) তাঁহার দিক হইতে সমুচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং কুটনীতিকে তরবারীর উর্ধ্বে স্থান দেন। ৬২৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি হোদাইবিয়ার সন্ধি সম্পাদন করেন। মুসলমান ও মক্কাবাসীগণ এই সন্ধির মাধ্যমে একই মর্যাদায় অভিষিক্ত হয় এবং মুসলমানদের মক্কায় হজ্ব পালনের কোন বাধাই থাকে না।

এই সন্ধির মাধ্যমে দুই নগরীর মধ্যে যুদ্ধ বন্ধ হয়। কোরাইশদের অনেক প্রভাবশালী লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন খালেদ-ইবন-আল-ওয়ালিদ ও আমর-ইব্ন-আল-আ'স, যাঁহারা পরে ইসলামের দুইজন খ্যাতনামা সেনাপতিতে পরিণত হন। দশ বৎসরের জন্য স্বাক্ষরিত এই হোদাইবিয়ার সন্ধির দুই বৎসর পর হযরত মুহম্মদ (সঃ) সসৈন্যে মক্কা অভিমুখে অগ্রসর হইবার কারণ খুঁজিয়া পান। সম্ভবতঃ মক্কাবাসী তাঁহাকে বাধা প্রদান করিবে না এই মর্মে তিনি নিশ্চয়তা লাভ করিয়াছিলেন। নতুন ধর্ম কা'বার প্রতি ইহার সম্মান অক্ষুন্ন রাখিয়া কোরাইশদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করে। এই অবস্থায় স্বয়ং আবু সুফিয়ান আসিয়া তাঁহার আনুগত্য প্রকাশ করেন। অন্যরাও তাঁহাকে অনুসরণ করেন। হযরত মুহম্মদ (সঃ) বিজয়ীর বেশে তাঁহার জন্ম-নগরীতে প্রবেশ করেন। তিনি কা'বার চারিদিকে সমস্ত মূর্তি ধ্বংস করিবার আদেশ প্রদান করেন এবং ইহাকে হারাম বা নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করেন। তাঁহার গোত্রের পরাজিত লোকদিগের প্রতি তিনি মহানুভবতার পরিচয় দেন এবং মদীনাবাসীদিগকে স্বস্তি দিবার জন্য মদীনায় ফিরিয়া যাইয়া ইহাকে রাজনৈতিক রাজধানী হিসাবে চালাইয়া যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে ইসলামের ধর্মীয় রাজধানী হিসাবে মক্কার মর্যাদা অক্ষুন্ন থাকে।

হযরত মুহম্মদের (সঃ) কাজ তখনও শেষ হয় নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য

ছিল সমগ্র আরবকে একত্রিত করা। তিনি যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। শীঘ্রই ওমান, হাদ্রামাউত এবং এমন কি ইয়ামেনসহ আরবের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রতিনিধিবৃন্দ আসিয়া ইসলাম গ্রহণ করেন। ধর্মান্তর অনুষ্ঠানটি ছিল খুব সরল। মৌলিক স্বীকৃতি এবং জাকাত বা দরিদ্র-কর প্রদানের অঙ্গীকার একটি গোটা গোত্রের নূতন ধর্মে প্রবেশ করিবার পক্ষে যথেষ্ট। তাহার বিশ্বাসের বশে আসিত—নাকি প্রয়োজনের খাতিরে আসিত তাহা নিরূপণ করা দুষ্কর।

৬৩২ খ্রীস্টাব্দে হিজরতের দশম বৎসরে হযরত মুহম্মদ (সঃ) তাহারা শেষ হজ্জ সমাপনের জন্য মক্কা যান। তিনি তখন সর্বজন স্বীকৃত আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ এবং আরবের জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব। তিনি একটি হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করেন যাহা ইহার শ্রোতাদের স্মরণে চির অম্লান থাকিয়া যায়। ইহা 'বিদায় ভাষণ' নামে পরিচিত।

এই ভাষণে তিনি তাঁহার অনুসারীদের বলেন, প্রত্যেক মুসলমান পরস্পর ভাই। এই ভাবে তিনি ইসলামী আনুগত্যকে গোত্রীয় আনুগত্যের উপর স্থান দেন। তিনি তাঁহার অনুসারীদিগকে আরও উপদেশ প্রদান করেন, ধর্মীয় বন্ধন রক্তের বন্ধনের চেয়ে অধিক পালনীয়। অনুমতি ছাড়া তাঁহার অনুসারীদের একে অপরের জিনিসে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করিয়া তিনি বস্তুতঃপক্ষে লুণ্ঠনাক্রমণ বন্ধ করিয়া দেন। ইহার তিন মাস পর (৮ই জুন, ৬৩২ খ্রীঃ) তিনি তাঁহার প্রিয় স্ত্রী আয়শার হাতের উপর মস্তক রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তিনি যে স্থানে পরলোক গমন করেন, সেই স্ত্রীর ঘরের মেঝেয় তাঁহাকে কবর দেওয়া হয়।

হযরত মুহম্মদ (সঃ) একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় রাখিয়া যান—যাহা একটি সশস্ত্র শিবিরও বটে। ইহার নামাজের স্থান একাধারে বিচারালয়ের এবং সামরিক কমাণ্ডের হেড কোয়ার্টার। তিনি এমন একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন যাহাতে বংশগত উত্তরাধিকারীর দাবী অস্বীকৃত। প্রত্যেকটি মুসলমান সামরিক তালিকাভুক্ত এবং নামাজের ইমাম যুদ্ধের অধিনায়ক। হাদিসে উল্লেখ আছে তিনি তাঁহার সমসাময়িক নরপতিদের নিকট পত্র লিখেন এবং তাঁহাদিগকে ইসলাম গ্রহণে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করেন। যাহা তিনি করিতে চাহিয়াছিলেন তাহা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এখন আরবদের

একজন নবী ও একটি ধর্মগ্রন্থ আছে। তিনি মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বলেন, 'আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ' এবং মানুষের ন্যায়ই তাঁহার শক্তি ও দুর্বলতা ছিল। তিনি এমন একটি ব্যক্তিত্বের অধিকারী যদ্বারা অনেক বৎসর পরও তাঁহার অনুসারীগণ তাঁহার আচরণের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিষয় এবং তাঁহার প্রত্যেকটি কথা অধ্যয়ন করে। তাঁহার জীবন বংশানুক্রমে ব্যক্তিগত ধর্মপরায়ণতা ও সরকারী নীতির আদর্শ হিসাবে কাজ করিয়া আসিতেছে।

তৃতীয় অধ্যায়

ইসলাম, আল্লাহর বাণী

হযরত মুহম্মদের (দঃ) প্রধান পদবী রাসুলুল্লাহ, 'আল্লাহর বার্তাবাহক'। মুসলমানরা সর্বদাই বার্তাকে তাহার বাহক মুহম্মদের (দঃ) উপর প্রাধান্য দিয়া আসিতেছে। খ্রীস্টান ধর্মের যীশুর ন্যায় মুহম্মদ (দঃ) ইসলামের কেন্দ্রীয় নহেন। কড়াকড়িভাবে বলিতে গেলে খ্রীস্টানরা যেরূপ খ্রীস্টের লোক, মুসলমানরা অনুরূপ মুহম্মদের (দঃ) লোক নহে। বরং তাহারা গ্রন্থের লোক। এই গ্রন্থ পবিত্র কোরান—যাহা আল্লাহর বার্তা।

এই বার্তাকে বলা হয় ইসলাম এবং যাহারা ইহা গ্রহণ করে, তাহাদিগকে বলে মুসলিম। 'ইসলাম' শব্দটি আবার তিনটি ব্যঞ্জণবর্ণের মূল 'সলম' (سلم) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ 'আনুগত্য'। শব্দটির আরেক অর্থ শান্তি, কারণ যুদ্ধে শত্রুর আত্মসমর্পণের (আনুগত্য) পরই আসে শান্তি। এই কারণে ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে আরবী অভ্যর্থনা 'আস-সালামু আলাইকুম'—অর্থ 'আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হউক।' বিংশ শতাব্দীর কোন কোন অতি আধুনিক মুসলমান দাবী করেন ইসলামের অর্থ 'শান্তির ধর্ম'। তবে ইতিহাসগতভাবে ইসলামের অর্থ 'আনুগত্যের ধর্ম'—আল্লাহর ইচ্ছার প্রতি আনুগত্য। মূল সলমের উপর ভিত্তি করিয়া বিবেচনা করিলে ইসলামের ব্যকরণসিদ্ধ গঠন অনুযায়ী অর্থ দাঁড়ায় বশ্যতা। মুসলিম অর্থ—'যে বশ্যতা স্বীকার করিল', মুসলিমা অর্থ—'যে (স্ত্রীলোক) বশ্যতা স্বীকার করিল'। অনারব ইসলামী দেশে মুসলিম শব্দের পরিবর্তে 'মুসলমান' ব্যবহার করা হয়।

এই ব্যাখ্যায়, যে-ই আল্লাহর ইচ্ছার উপর আনুগত্য প্রকাশ করে সে-ই মুসলমান। কারণ এই শব্দের সরল অর্থ হইতেছে—সে আনুগত্য প্রকাশ করিয়াছে। ইসলামের বর্ণনা অনুসারে প্রথম যিনি আল্লাহর প্রতি আনুগত্য

প্রকাশ করেন তিনি ইব্রাহীম। অবশ্য এই অর্থে একজন ইহুদী যেমন 'মুসলমান' তেমনি একজন খ্রীস্টানও। ইসলামের এই ব্যাপক ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত এবং কোন একদিন ইহা সর্বজনীন হইবার ক্ষেত্রে কাজে আসিতে পারে। তবে, আজ পর্যন্ত সমগ্র ইসলামের ইতিহাসে শুধুমাত্র একটি অতি ক্ষুদ্র শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ এমন ব্যাপক ভিত্তিতে চিন্তা করেন, তাঁহারা সুফী। ইসলামের সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যাটিই ইতিহাসগতভাবে সঠিক। অতএব, ইসলাম অর্থ আল্লাহ্র ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করা। ইহার রূপ আল্লাহ্র বার্তাবাহক এবং রাষ্ট্রপ্রধান হযরত মুহম্মদের (দঃ) নিকট যথাযথ অবতীর্ণ হইয়াছে।

ইসলাম নামে প্রচলিত ধর্মে আল্লাহ্র ইচ্ছার নিকট ব্যক্তি বিশেষের আত্মসমর্পণের কিছু শর্ত রহিয়াছে। মানুষ আল্লাহ্র আওতাধীন বসবাস করিতে স্বীকৃত। এই স্বীকৃতির স্বরূপ তাঁহার বার্তাবাহকের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহার সমস্ত কাজ আল্লাহ্ কর্তৃক জারীকৃত আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের তুলনায় ইসলাম আইনের আলোচনাকে প্রাধান্য দিয়া থাকে। আইনকে ইসলাম ধর্মতন্ত্রের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মনে করে।* ইসলামী বিশ্বে আল্লাহ্র আইন বা শরীয়ত অধ্যয়ন অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিধান। প্রথমে একটি সাধারণ ধর্মতত্ত্ব আইনের পটভূমি প্রদান করে। এই তত্ত্বের রূপরেখা এবং ব্যবহারবিধি হযরত মুহম্মদের (দঃ) মৃত্যুর পূর্বেই পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করিয়াছিল। এই রূপ পবিত্র কোরানের পৃষ্ঠাগুলিতে পাওয়া যায়।

বশ্যতার শর্তাবলী কমপক্ষে দশটি। ইহাদের পাঁচটি হইল বিশ্বাস বা ঈমান সংক্রান্ত, বাকী পাঁচটি অনুশীলন বা ধর্মীয় বিধি সংক্রান্ত—যাহার অপর নাম ইবাদত।

'ঈমান' : বিশ্বাস

১। আল্লাহ্র একত্ব : ইসলামের প্রথম ও সর্বপ্রধান নীতি হইল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (সম্পূর্ণভাবে) আল্লাহ্ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই। আল্লাহর একত্ব ইসলামী বিশ্বাসের প্রধান ভিত্তি। ইহা ছাড়া প্রত্যেক কিছু বাতুল এবং অর্থহীন। খ্রীস্টান ধর্মের ত্রিত্বকে (Treinty) পবিত্র কোরান

* নীচে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১০৩ (মূল গ্রন্থ)

(১১২ অধ্যায় পূর্বে বর্ণিত)* আল্লাহ্‌র প্রতি অপবাদ হিসাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। ইসলাম ধর্মের মতে শিরক বা আল্লাহ্‌র অংশীদার হইবার ধারণাটিকে ক্ষমাহীন পাপ মনে করা হয়। আল্লাহ্‌ সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টিকর্তা, আইনদাতা, বিচারক, প্রতিপালক, ত্রাণকর্তা ও আদেশকারী। আল্লাহ্‌ অনেক গুণের বা সিফাতের অধিকারী—তিনি করুণাময় ও দয়ালু। কিন্তু এই গুণাবলী তাঁহার মহিমা, শক্তি ও ক্ষমতার নিকট ম্লান হইয়া রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আল্লাহ্‌ তাঁহার নামের 'আসমা-উল-হুসনা,' মাধ্যমে সর্বাধিক পরিচিত। তাঁহার নাম ও গুণাবলী সমার্থক বলিয়া মনে হয়। মুসলমানদের তসবিহ্‌র মধ্যে ৯৯টি পুঁতি আছে, যেগুলির প্রত্যেকটি আল্লাহ্‌র ৯৯টি নামের প্রতিনিধিত্ব করে। এইসব নামের কয়েকটি হইল নাসির 'বিজয়ী' ফাতাহ্‌, 'উন্মুক্তকারী' কাহ্‌হার 'পরাস্তকারী' ও ওয়াহ্‌হাব 'প্রদানকারী'। এক শক্তিশালী ও সর্বোৎকৃষ্ট আল্লাহ্‌র উপর এই আপোহীন বিশ্বাসই যে ইসলামের শক্তির প্রধান উৎস তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থের ন্যায় পবিত্র কোরানেও আল্লাহ্‌ সম্পর্কে বিভিন্ন পরস্পর-বিরোধী মন্তব্য রহিয়াছে। পরবর্তীকালের মুসলিম ধর্মশাস্ত্রবিদগণ এইসব সমস্যা লইয়া অনেক বিতর্ক করিয়াছেন এবং এখনও করিতেছেন। তবে ইসলামে এই আলোচনাগুলিকে বুদ্ধিপ্রসূত আমোদ-প্রমোদ বলিয়া গণ্য করা হয় যেগুলি দৈনন্দিন জীবনে অনাবশ্যক। একজন মুসলমান বুদ্ধিগতভাবে যত সজাগই হউন না কেন তাহার মধ্যে একটি আত্মসমর্পণমূলক (ইসলাম) উপলব্ধি রহিয়াছে। এই উপলব্ধি অপরিবর্তনীয়।

২। নবুয়ত : ইসলাম মূলতঃ যুগধর্মী। ইহা বিশ্বাস করে মানব ইতিহাসের প্রত্যেক যুগে আল্লাহ্‌ মানুষকে শিক্ষা দিবার জন্য এবং শেষ বিচার সম্পর্কে সতর্ক করিবার জন্য কাহাকেও না কাহাকে প্রেরণ করিয়াছেন। কোরানে এইসব মানুষকে প্রায়ই নবী—'প্রত্যাদৃষ্ট ব্যক্তি' বা রসুল—'বার্তা-বাহক' হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। যেহেতু আল্লাহ্‌ ও ইহুদীদের ইবা-হওয়ে এবং খ্রীস্টানদের স্বর্গীয় পিতা একই ধারণার অভিব্যক্তি, সেহেতু আদম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ নবী হযরত মুহম্মদ (দঃ) পর্যন্ত যে সমস্ত মহাপুরুষ প্রেরিত হইয়াছেন তাঁহারা ইহুদী-খ্রীস্টান ঐতিহ্যের অধিকারী।

*উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩১ (মূল গ্রন্থ)

অনুরূপ মানবজাতির ইতিহাসকেও একই ইহুদী-খ্রীস্টান ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হয়। যাহারা ইতিমধ্যে বা ভবিষ্যতে এই প্রকৃত ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ের সহিত অর্থাৎ ইসলামের সহিত নিজদিগকে সংযুক্ত করিয়াছে বা করিবে তাহারাই প্রকৃতপক্ষে মানবেতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। অন্যান্যদের প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিগণ আল্লাহর বার্তাবহ নহে ও তাহাদের গ্রন্থসমূহ আল্লাহ্‌র বাণী হিসাবে নির্ভরযোগ্য নহে।

আল্লাহ্ যুগে যুগে বার্তাবাহক (নবী) প্রেরণ করিয়াছেন। আদম হইলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রথম। ইব্রাহীম শুধু একজন নবীই নন বরং তিনি প্রথম মুসলমানও বটে। কারণ তিনি আল্লাহ্‌র ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করেন এবং যেখানে তাঁহাকে যাইতে আদেশ করা হইয়াছিল সেখানেই তিনি গিয়াছিলেন। অনুরূপভাবে ইসলামী মতানুসারে মূসা, দাউদ, যীশু (ঈসা) এবং তৌরাত ও ইঞ্জিলে বর্ণিত মহাপুরুষগণই বার্তাবাহক বা নবী। তবে বহু সংখ্যক নবীর মধ্যে পবিত্র কোরানে মাত্র ২৮ জনের কথা উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে চারিজন আরব—যাঁহাদের বিষয়ে বাইবেলে উল্লেখ নাই। ইঁহাদের একজন হইলেন 'দুই শিং বিশিষ্ট'—যাঁহাকে ব্যাখ্যাকারীগণ মহান আলেকজাণ্ডার বলিয়া বিশ্বাস করেন। অসমসাহসিক কার্যাবলীর জন্য এই ব্যক্তিটি মধ্যপ্রাচ্যে একটি উপকথার নায়ক হিসাবে পরিচিতি লাভ করিয়াছেন।

হযরত মুহম্মদকে (দঃ) শেষ নবী হিসাবে বিবেচনা করা হয়। কখনও কখনও তাঁহাকে 'শীলমোহর' হিসাবে বা অধিক সচরাচর তাঁহাকে খাতাম-উন-নবীইন, "নবীগণের সমাপ্তি ঘোষক" হিসাবে উল্লেখ করা হয়। তাঁহার পর আর কোন নবী হইবে না। আল্লাহ্ মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য সংক্ষিপ্ত বিরতিতে এতগুলি নবী পাঠাইয়াছেন—এই কথা চিন্তা করিয়া উপসংহারে উপনীত হইতেও কিছুটা বিসদৃশ লাগে যখন আমরা অনুভব করি তিনি ১৩০০ বৎসরের অধিক সময়ের মধ্যে আরেকজন পাঠাইবেন না। এই অনুমান মুসলমানদের নিকট অনেক সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। শিয়া সম্প্রদায় হযরত মুহম্মদের (দঃ) শেষ নবীত্বের কথা স্বীকার করিয়াও বারজন ইমামে বিশ্বাস করে—যাঁহারা মুহম্মদের (দঃ) পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকের উত্তরাধিকারী ও শিয়া সম্প্রদায়ের প্রশাখা। আধুনিক বাহাই মতাবলম্বীগণ

ইসলামের মূল যুগধর্মী চরিত্র গ্রহণ করিয়া হযরত মুহম্মদের (দঃ) শেষ নবী হইবার বিষয়টিকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

বোধ হয় অধিকাংশ মুসলমান হযরত মুহম্মদকে (দঃ) সর্বশ্রেষ্ঠ নবী বলিয়া বিশ্বাস করেন। তবে কোরানে এইধরনের বিশ্বাসের কোন শাস্ত্রীয় তত্ত্ব নাই। মুহম্মদ (দঃ) একাধিকবার স্বীয় অতিমানবীয় ক্ষমতার কথা বা কোরান ব্যতীত অন্য কোন অলৌকিক ঘটনার কথা অস্বীকার করিয়া নিজের গুনাহ্র জন্য ক্ষমা প্রার্থনার কথা বলিতেন। তিনি এবং ইব্রাহীম, মুসা ও যীশু (ঈসা) সমমর্যাদার নবী—যাঁহাদিগকে তাঁহার ন্যায় প্রধান নবী হিসাবে গণ্য করা হয়। শেষোক্ত হিসাবে তিনি গুরুত্বপূর্ণ শুধু এইজন্য যে, তিনি আল্লাহ্র নিকট হইতে সর্বশেষে বাণী পাইয়া আসিয়াছেন। পবিত্র কোরানে এই চারিজন প্রধান নবীর বিশেষ বিশেষ উপাধি রহিয়াছে। ইহা হযরত মুহম্মদের (দঃ) ব্যক্তিগত বিনয়ের পরিচয় বহন করে যে, তাঁহার উপাধি সবচাইতে শিষ্ট। কোরানে ইব্রাহীমকে বলা হয় খলীলুল্লাহ্, 'আল্লাহ্র বন্ধু' মুসাকে বলা হয় কলীমুল্লাহ 'আল্লাহ্র মুখপাত্র', যীশুকে বলা হয় রুহুল্লাহ্ 'আল্লাহ্র আত্মা' এবং কালীমাতুল্লাহ্, 'আল্লাহ্র কথা'। মুহম্মদকে (দঃ) বলা হয় রসুলুল্লাহ্, 'আল্লাহ্র বার্তাবাহক', এবং কোন কোন সময় শুধু নবী, বার্তাবাহক।

৩। ধর্মগ্রন্থ ঃ আল্লাহ্র একত্ববাদের পর ইসলামে ইহা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। খ্রীস্টান ধর্মে নিউ টেস্টামেণ্ট (ইঞ্জিল) গুরুত্বপূর্ণ প্রধানতঃ এইজন্য যে ইহা যীশু খ্রীস্টের জীবন চরিত—যিনি এই ধর্মের মূলকেন্দ্র। অপরদিকে ইসলামে হযরত মুহম্মদ (দঃ) গুরুত্বপূর্ণ প্রধানতঃ এইজন্য যে তিনি সেই গ্রন্থের (পবিত্র কোরান) বাহক—যাহা এই ধর্মের মূলকেন্দ্র।

নবীদিগকে পাঠাইবার সময় আল্লাহ প্রত্যেককে এক একখানি গ্রন্থ দান করেন। প্রত্যেক গ্রন্থই সেই যুগের মানুষের পথপ্রদর্শনের প্রায় সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় বহন করে। কোন কোন সময় আল্লাহ তাঁহার একজন ফেরেশতার মাধ্যমে নবীর নিকট এই ধর্মগ্রন্থ প্রেরণ করেন। ফেরেশতা জিব্রাইল আল্লাহ্র শেষ গ্রন্থ পবিত্র কোরান শেষ নবী হযরত মুহম্মদের (দঃ) নিকট পড়িয়া শুনান বলিয়া সাধারণ বিশ্বাস। রক্ষণশীল মুসলমানদের মতে পবিত্র কোরান আল্লাহ্র কথা—কালাম—যাহা সৃষ্টি করা হয় নাই।

* নীচে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১০০। (মূল গ্রন্থ)

অন্য কথায়, আল্লাহ্ কর্তৃক বিশ্ব সৃষ্টির পূর্বেও কোরান ছিল এবং এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মুসলমানগণ বিশ্বাস করে এই ধর্মগ্রন্থ আল্লাহ্র অসৃষ্ট কথা। আল্লাহ্র বাণীর মূর্তরূপ হিসাবে ইহার আলোচ্য বিষয়ে চরম উৎকর্ষতা কিম্বা ইহার ভাষায় পরম সৌন্দর্য ও প্রাঞ্জলতা অননুকরণীয়। প্রকৃতপক্ষে মুহম্মদের দঃ) প্রদত্ত একমাত্র অলৌকিক জিনিস হইল ইজাজ বা অলৌকিক কোরান। রক্ষণশীল ইসলামী মতে কোরান পাঠ ও অনুধাবন করা যায় কিন্তু সমালোচনা করা যায় না। ইহার কোন অংশ গোপনীয় না রাখিয়া ,বা সমালোচনা না করিয়া ইহাকে অনুকরণ করিতে হইবে। শির্ক্—'পৌত্তলিকতা' যেরূপ মারাত্মক পাপ, তদরূপ বেদায়াত—কোরানের আইন পরিবর্তন বা ঐগুলি হইতে বিমুখ হওয়াও দণ্ডনীয় অপরাধ।

সমস্ত পন্থা ও বিধি বিশ্বাস ও অভ্যাস পবিত্র কোরানসম্মত হইতে হইবে। মুহম্মদের (দঃ) নিকট কোরান বিভিন্ন সময় 'অবতীর্ণ' বা নাযিল হইয়াছে বলিয়া মুসলমানগণ বিশ্বাস করে। অতএব মুহম্মদ (দঃ) কোরানের প্রণেতা নহেন। আল্লাহ ইহার গ্রন্থকার এবং মুহম্মদ (দঃ) প্রকৃতপক্ষে ইহার লিপিকার। হযরত মুহম্মদের (দঃ) গুরুত্ব কোরানের একটি প্রতিফলন মাত্র। মুসলনমানগণ এই মহাগ্রন্থ কোরানের অনুসারী—যাহার মধ্যে ইসলামের শর্তাবলী, আত্মসমর্পণ, লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। তাহারা মুহম্মদের (দঃ) অনুসারী নয় এবং অনুরূপভাবে নিজেদেরকে মুহম্মদীয় বলাটা পছন্দ করে না। কোরান যেহেতু মুহম্মদের (দঃ) নিকট আরবী ভাষায় প্রেরিত হইয়াছে সেহেতু রক্ষণশীলগণ সর্বদা ইহার অনুবাদের প্রতি বীতস্পৃহ। বিশ্বের মুসলমানদের এক বিরাট অংশ আরবী জানে না। কিন্তু প্রায় সমস্ত মুসলমান তাহাদের ভাষায় আরবী বর্ণমালা গ্রহণ করিবার ফলে তাহারা মোটামুটি কোরান পাঠ করিতে পারে—যদিও ইহার বেশীর ভাগ তাহারা বুঝে না। আল্লাহর প্রকৃত শব্দাবলী বারবার পাঠ করিবার মধ্যে পুণ্য আছে বলিয়া বিশ্বাস করা হয়।

মুসলমানী মতে, ওল্ড ও নিউ টেস্টামেণ্টও (তৌরাত ও ইঞ্জিল) আসমান হইতে 'অবতীর্ণ' হইয়াছে এবং মূসা ও ঈসা নবীদ্বয়কে দেওয়া হইয়াছে। পবিত্র কোরান যেহেতু সর্বশেষ আল্লাহর বাণী সেইজন্য ইহার পূর্ববর্তী

সবগুলি ইহার দ্বারা বাতিল হইয়া গিয়াছে। আধুনিক সমস্যাবলী সম্পর্কেও ইহা অধিক কার্যকরী।

মহাগ্রন্থের মতবাদ ইসলামে সহনশীলতা ও কঠোরতা প্রদান করে। ইহা মুসলিমদিগকে ইহুদী ও খ্রীস্টান এবং পরে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ব্যাপারে সহনশীল করিয়াছে। এই মহাগ্রন্থের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম সমগ্র মানব-জাতিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে—মহাগ্রন্থ প্রাপ্ত জাতি এবং মহাগ্রন্থহীন জাতি। ইহুদী ও খ্রীস্টানগণ আহলি-কিতাব, 'মহাগ্রন্থ প্রাপ্ত জাতি'। এই জাতিকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা যায় না। ইসলাম গ্রহণে উৎসাহিত না হইলে তাহাদিগকে ইসলামের আশ্রয়ে নিজেদের ধর্মে থাকিতে দেওয়া উচিত। এই মতবাদের ফলে ইহুদী ও খ্রীস্টানগণ যথেষ্ট ধর্মীয় স্বাধীনতাসহ মুসলমানদের মধ্যে বাস করিবার সুযোগ পাইয়াছে। বস্তুতঃ খ্রীস্টান ইউ-রোপে যখনই ইহুদীদের উপর উৎপীড়ন চালানো হইয়াছে তাহারা তখনই মুসলিম দেশে গিয়া শান্তিতে বসবাস করিবার সুযোগ পাইয়াছে। মহাগ্রন্থের মতবাদ ওসমানীয় সাম্রাজ্যে 'মিল্লাত' বা স্বায়ত্তশাসিত 'সম্প্রদায়' নামে পরিচিত পদ্ধতির উৎস। উল্লেখ করা যাইতে পারে মিল্লাত এমন একটি শব্দ যাহা ধর্মীয় শ্রেণীর ভিত্তিতে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু অনারবদের মধ্যে কোন কোন সময় ইহা রাজনৈতিক জাতীয়তা প্রকাশার্থেও ব্যবহৃত হয়।

অধিকন্তু এই মতবাদ কিছুটা সুযোগসুবিধাও সৃষ্টি করে। ইরানের জরথুস্ত্রদিগকে 'মহাগ্রন্থহীন জাতি' হিসাবে গণ্য করা হইত। ফলে ইসলামী বিশ্বে তাহাদের কোন স্থান ছিল না। প্রাথমিক বিজয়ীদের নিকট যখন প্রতীয়মান হয় যে সবাইকে দীক্ষিত, হত্যা বা নির্বাসিত করা যায় না তখন তাহাদের 'ব্যাপারে' কিছুটা সহনশীলতা অবলম্বন করিতে হয়। ফলে জর-থুস্ত্রদেরকে 'মহাগ্রন্থ প্রাপ্ত জাতি' হিসাবে গণ্য করা হয়। হিন্দু ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মকে সরকারীভাবে এই ধরনের স্বীকৃতি প্রদান করা না হইলেও আকবর (১৫৫৬—১৬০৫) ও অগণিত সাধারণ ব্যক্তিবর্গের ন্যায় ভারতবর্ষের মুসলিম রাজন্যবর্গ এই বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দিয়া হিন্দু ও বৌদ্ধদের সহিত 'মহাগ্রন্থ প্রাপ্ত জাতিদের ন্যায়' ব্যবহার করিয়াছিলেন।

তবে আধুনিক মুসলমানদের জন্য মিল্লাত পদ্ধতিটি যেমন বিরক্তিকর তেমনি একটি হতবুদ্ধির কারণও বটে। ইহা বরং সুস্পষ্ট যে, পাশ্চাত্য হইতে

আমদানীকৃত জাতীয়তার ভাবধারা প্রকৃতিগত ভাবে রাজনৈতিক এবং ইহা দ্বারা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ একই জাতিতে পরিণত হইতে পারে। কিন্তু ইহা আবার জাতীয়তার ভিত্তি হিসাবে ইসলামী ভাবধারার সহিত সংঘাতেরও সৃষ্টি করে। বিংশ শতাব্দীর মুসলিম দেশসমূহ একদিকে গণতান্ত্রিক হইতে চায় এবং সমস্ত নাগরিকদিগকে সমানাধিকার প্রদান করিতে চায়, আবার অপরদিকে মুসলমানও থাকিতে চায়। ফলে তাহারা নিজেদেরকে পরস্পরবিরোধী আবর্তে জড়াইয়া ফেলে। উদাহরণ স্বরূপ অনেকগুলি মুসলিম দেশে মিল্লাত পদ্ধতিও রাখা হইয়াছে আবার পাশাপাশি আধুনিক শাসনতন্ত্রও প্রদান করা হইয়াছে—যাহা সকলের প্রতি সমতার কথা ঘোষণা করে। কোন কোন দেশে অমুসলিমগণ উচ্চ পদমর্যাদা আশা করিতে পারে না, এমন কি আধুনিক মুসলমানদের যথেষ্ট শুভাকাঙ্খা সত্ত্বেও, তাহারা দ্বিতীয় স্তরের নাগরিক।

উপরে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, মহাগ্রন্থের মতবাদ ইসলামে কঠোরতা আনয়ন করিয়াছে। অস্পষ্ট আল্লাহর বাণী হিসাবে কোরান একটি নিরুদ্ধ গ্রন্থে পরিণত হইয়াছে। কেহ ইহার মৌলিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন করিতে বা ইহাকে সমালোচকের দৃষ্টিতে পাঠ করিতে পারে না। কোরানের ধর্মীয় ক্রমবিকাশ ও আইন সংক্রান্ত মতবাদের ভিত্তি খুঁজিয়া বাহির করিবার যে কোন প্রচেষ্টাকে গর্হিত বলিয়া গণ্য করা হয়।

৪। শেষ বিচার : কোরানের অত্যন্ত সুস্পষ্ট বাক্যগুলির মধ্যে পরকালের বিষয় যথা বেহেশত, দোজখ, শেষ বিচারের দিন, পুনরুত্থান এবং কিয়ামত ও দোজখের প্রান্ত সম্পর্কে অতি সামান্য বক্তব্য আলোচনা করা হইয়াছে। এইসব ভাবধারায় মুসলমানদের বিশ্বাস খ্রীস্টানদের ন্যায়ই। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে, এইখানে হযরত মুহম্মদকে (দঃ) মধ্যস্থতাকারী মনে করা হয় না। একমাত্র "যাহারা তওবা করে ও ঈমান আনে এবং কাজে ন্যায়নিষ্ঠ" এবং যাহারা ধর্মের জন্য শহীদ তাহারাই বেহেশতে যাইবে।

৫। ফেরেশতা ও জীন : কোরানে এইগুলিকে আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ফেরেশতা আল্লাহর সৃষ্ট জীব যাহারা সর্বদা তাঁহার ইবাদত করে এবং তাঁহার আদেশ পালন করে। তাহাদের কর্তব্য হইল মানুষের কার্যাবলী লিপিবদ্ধ করা, শেষ বিচারের

দিন সাক্ষী হওয়া, আল্লাহ্র আরশ্ বহন করা এবং সাধারণতঃ যাহাদিগকে আল্লাহ্ অনুগ্রহ করেন তাহাদের কাজে লাগা। জীনকেও আল্লাহ্ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ধর্ম বিশ্বাসী। কতকগুলি জীন বিদ্রোহ করিয়া শয়তানে পরিণত হইয়াছে। এই চরিত্রে তাহারা মানুষকে বিপথে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করে এবং নবীকে বাধা দিতে চেষ্টা করে। তাহাদের নেতা ইবলিস্, যে একজন ফেরেশতা ছিল কিন্তু আদমের বশ্যতা স্বীকার না করায় সে আল্লাহ্র আশীর্বাদ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

'ইবাদত' বা অনুশীলন

একজন মুসলমানের নিকট এইগুলি ঈমানের চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ। যদিও উপরে বর্ণিত দফাগুলি বিশেষ করিয়া আল্লাহ্র একত্ববাদ এবং মহাগ্রন্থ একটি রীতি স্থাপন করিয়াছে, কিন্তু ইবাদতের দফাগুলিকে আরকান বা ইসলামের স্তম্ভ বলিয়া গণ্য করা হয়।

১। সাক্ষ্য ঃ প্রত্যেক মুসলমানকে তাহার ঈমান সম্পর্কে প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে হইবে বা তাহার বিশ্বাস সম্পর্কে সাক্ষ্য শাহাদাত দিতে হইবে। ইহা প্রকৃতপক্ষে এক বাক্যে ইসলামের ধর্মমত লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্, "আল্লা ছাড়া কোন উপাস্য নাই ঃ মুহম্মদ (সঃ) আল্লাহ্র বার্তাবাহক।" ইহা আল্লাহ্র একত্ব প্রকাশ করে এবং আল্লাহর বার্তাবাহক কর্তৃক প্রচারিত আনুগত্যের শর্তাবলীর স্মারক। ইসলামী বিশ্বে ইহা বারবার উচ্চারিত বাক্য। নবজাতকের কানে কানে ইহা বলা হয়, তাহার দ্বারা সমস্ত জীবনে ইহা প্রায়শই আবৃত্ত হয় এবং কবরে যাইবার পূর্বে ইহা তাহার মুখনিঃসৃত শেষ বাক্য। বিশ্বাসীদিগকে নামাজে ডাকিবার জন্য ইহা ব্যবহার করা হয় এবং ইসলামের যুদ্ধ সমূহে ইহা মুসলমানদের যুদ্ধনাদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই বাক্য একজন অমুসলিমকে ইসলামের পতাকাতলে একীভূত করে।

২। সালাত বা নামাজ ঃ একজন মুসলমান, পুরুষ বা স্ত্রীলোককে দৈনিক পাঁচবার নামাজ আদায় করিতে হয়। প্রাতঃকালে, দ্বিপ্রহরে, মধ্য-অপরাহ্নে, সূর্যাস্তে, এবং রাত্রে। নামাজ আরবীতে এবং মক্কার দিকে মুখ করিয়া পড়িতে হয়। নিয়মমাফিক নামাজের আরম্ভ হইতে শেষ অবধি অংশকে একটি রাকায়াত বলে। জোহর, আছর এবং এশার নামাজের

প্রত্যেকটিতে চারি-রাকায়াত আছে আবার মাগরেবের নামাজে তিন রাকায়াত এবং ফজরের নামাজে দুই রাকায়াত আছে। মুয়াজ্জিন মসজিদের মিনার হইতে মুসলমানদিগকে দৈনিক পাঁচবার নামাজের জন্য আহ্বান করে। আধুনিক যুগে সেই আহ্বানকে টেপ রেকর্ড করিয়া লাউডস্পীকারের সাহায্যে মিনার হইতে বাজানো হয়। যে ব্যক্তি নামাজ পড়িবে তাহাকে পাক-সাফ হইতে হইবে। এই পাক-সাফের কাজটি হইল বিধিসম্মত উপায়ে হাত ও মুখমণ্ডল ধোঁত করা। অতঃপর পানি দ্বারা মস্তক ও পা মর্দন করা। পানি দুষ্প্রাপ্য হইলে এই সমস্ত কাজ মাটি দ্বারা করা যায়। নামাজের সময় কতকগুলি শারীরিক কসরত করিতে হয়। সেইগুলি হইল, সোজা হইয়া দাঁড়ানো, হস্তদ্বয় হাঁটুর উপর রাখিয়া মেরুদণ্ড বাঁকানো, নিতম্বের উপর বসা এবং ভূমিতে প্রণত হওয়া। মসজিদে নামাজ পড়া উত্তম কিন্তু ইহা বাধ্যতামূলক নহে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহিলাগণ নামাজ পড়িবার জন্য মসজিদে যাইতেন, কিন্তু বর্তমানে ইহার প্রচলন নাই। যেইখানে সুবিধা—বাড়ীতে, কর্মস্থলে বা মসজিদে নামাজ আদায় করিতে হইবে। নামাজের বেশীর ভাগই মসজিদে পড়া হয় ব্যক্তিগত-ভাবে। সমিতিভুক্ত নামাজ ইসলামে নাই বলিলেই চলে। 'মসজিদের তালিকাভুক্ত' হইবার কোন রেওয়াজ নাই। ইসলামে কোন পুরোহিত শ্রেণী নাই, কোন পুরোহিতের পদে নিয়োগের রীতি নাই এমন কি সুস্পষ্ট কোন পুরোহিততন্ত্রও নাই। ধর্মীয় নেতাদের মধ্যে যাঁহারা বিবাহসম্পন্ন করান, কাফনের কাজ সমাধা করেন এবং কোন কোন সময় ইসলাম প্রচার করেন তাহাদিগকে আরবীভাষী দেশগুলিতে বলা হয় ইমাম, ইরানে বলা হয় মোল্লা এবং তুরস্কে বলা হয় হোজ্জা। বড় বিদ্বান ব্যক্তিদিগকে বলা হয় ওলামা—জ্ঞানী। তাঁহারা সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে ও ধর্মতাত্ত্বিক মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করেন। মুসলিম বিশ্বে মহাবিদ্যালয়গুলিতে শুধু ধর্মপ্রচারকই সৃষ্টি করে না বরং উকিল এবং কোরানের ভাষা আরবীর শিক্ষকও সৃষ্টি করা হয়।

৩। দান : দান বা যাকাত ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। যাকাত ভিক্ষা নহে। ইসলামে দুই প্রকারের দান আছে। প্রথমটি সদকা, স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভিক্ষা দান; যাহা সব ধর্মেই রহিয়াছে। অন্যটি যাকাত, বাধ্যতামূলক

দান, যাহা কর প্রদানের সমতুল্য। ইসলামী আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র যখন ক্ষমতায় ছিল তখন এই কর সমস্ত মুসলমানদের নিকট হইতে আদায় করা হইত। সরকার ইহাকে যুদ্ধ ও শান্তি উভয় কাজে ব্যবহার করিত। সাধারণতঃ একজন লোকের আয় হইতে শতকরা আড়াই ভাগ প্রদানই জাকাত। অবশ্য ইহা কখনও সমভাবে কার্যকরী হয় নাই।

যাকাত বাধ্যতামূলকভাবে শুধু মুসলমানদের উপরই ধার্য করা হয়। 'মহাগ্রন্থ প্রাপ্ত জাতি' জিজিয়া বা ব্যক্তিগত কর নামে একটি ভিন্ন ধরনের কর প্রদান করিত। ইহা নিরাপত্তার জন্য প্রদান করা হইত। নীতিগত ভাবে যেহেতু ইসলামের সমস্ত যুদ্ধই ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য পরিচালনা করা হয় তাই অমুসলিমদিগকে সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করা হয় না। সামরিক কর্তব্যের পরিবর্তে অমুসলিমদিগকে এই বিশেষ কর প্রদান করিতে হয়। কোন মসজিদ, প্রতিষ্ঠান বা সম্প্রদায় না থাকিলে সমস্ত স্বেচ্ছাপ্রদত্ত দান সরকারই আদায় করে। জায়গাজমি এবং নগদ অর্থে আদায়কৃত এই সমস্ত দান পূর্বেও এবং এখনও ওয়াকফ্ বা ধর্মীয় দান খয়রাত নামক একটি বিশেষ খাতে সরকার গচ্ছিত রাখে। সমস্ত আধুনিক মুসলিম রাষ্ট্রে একটি সংস্থা বা ধর্মীয় দানখয়রাত আওকাফের মন্ত্রীসভা থাকে।

৪। সওম বা রোজা : মুসলিম পঞ্জিকার সমগ্র নবম মাসে রমজান পালন করা হয়। ইহা ইসলামের পূর্বেও আরবদের জন্য পবিত্র ছিল এবং পরেও অনুরূপ পবিত্র বোধ হয় এইজন্য যে, হযরত মুহম্মদ (দঃ) এই মাসে স্বর্গীয় আহ্বান লাভ করেন। রোজা বা উপবাস প্রাতঃকালের পূর্বে সাধারণতঃ একবেলা খাওয়ার পর আরম্ভ হয় এবং সমস্ত দিন উপবাস থাকিয়া সন্ধ্যার সময় রোজা ভঙ্গ করা হয়। এই সময় রাত্রিবেলা জাগ্রত অবস্থায় এবং কোরান পাঠে কাটানো উচিত। অধিকাংশ মুসলিম দেশে রোজার সমগ্র মাসে অফিস-আদালত সকাল বেলায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং কোন কোন সময় রেষ্টুরেন্টগুলিকেও খুলিতে দেওয়া হয় না।

৫। হজ্ব : আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকিলে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জীবনে অন্ততঃ একবার মক্কায় যাওয়া অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি তীর্থ-গমন বা হজ্ব সমাপন করে তাহাকে 'আল-হাজ্ব' উপাধি দেওয়া হয় এবং অনারব দেশে

উপাধি হয় হাজী। মক্কা এবং ইহার চতুর্পার্শ্বের হজ্বের নিয়ম-কানুন ইসলামের বহু পূর্বে প্রচলিত নিয়ম-কানুনের মতই। বিশ্বের সমস্ত অঞ্চল হইতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান প্রত্যেক বৎসর হজ্ব পালন করে। এই অভিজ্ঞতা যে মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত উঁচুদরের তাহা প্রশ্নাতীত। অধিকন্তু হজ্ব বিশ্বের মুসলমানদের মধ্যে একাত্মবোধের সৃষ্টি করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে।

৬। ধর্মীয় যুদ্ধ ঃ কোন কোন মুসলমান বিশেষ করিয়া খারেজী মতবাদের অনুসারীগণ ধর্মীয় যুদ্ধ বা জিহাদকে ইসলামের ষষ্ঠ স্তম্ভ বলিয়াছেন। কোরানের বিভিন্ন অংশে যুদ্ধ এবং মুসলমানের কর্তব্য হিসাবে ইহার কথা উল্লেখ আছে। "তোমাদের যুদ্ধের আদেশ হইয়াছে যদিও ইহা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয়; কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, তোমাদের জন্য যাহা উত্তম উহাকে তোমরা অপছন্দ কর।"—(কোরান ২ ঃ ২১৬)। "অতঃপর পবিত্র মাসগুলি অতিক্রম করিবার পর পৌত্তলিকদিগকে যেখানেই আপনি পান হত্যা করুন এবং তাহাদিগকে (বন্দী) করুন এবং তাহাদিগকে অবরোধ করুন এবং তাহাদের জন্য এক একটি ঃ অতর্কিত আক্রমণের চৌকি প্রস্তুত করুন। কিন্তু তাহারা যদি অনুতাপ করে এবং নামাজ আদায় করে ও যাকাত প্রদান করে তবে তাহাদের পথ উন্মুক্ত করুন। দেখুন! আল্লাহ্ ক্ষমাশীল দয়ালু।"—(কোরান ৯ ঃ ৫)। এইগুলি এবং এইরূপ অন্যান্য বাক্যের জন্যই ইসলামের এই বিস্তৃতি। বস্তুতঃ মুসলমানরা ইসলামী রাষ্ট্র দার-আল-সালাম বহির্ভূত সমস্ত ভূ-খণ্ডকে দার-আল হারব বা যুদ্ধ এলাকা বলিয়া বিবেচনা করে। তবে বিগত কয়েক বৎসরে এই ধর্মাবলম্বী এই আহ্বানে সাড়া দেয় নাই। সর্বশেষ এই আহ্বান দেওয়া হয় ১৯১৪ সালের শরৎকালে—যখন ওসমানী সুলতান তদানীন্তন ইসলামের খলিফা ব্রিটিশ ও ফরাসীদের বিরুদ্ধে সর্বান্তকরণে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন। খুব বেশী সংখ্যক লোক ইহাতে কান দেয় নাই। মুসলমান আরবগণ স্বয়ং খলিফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল। জিহাদ শব্দের অর্থ চেষ্টা করা। অনেক আধুনিক জাতীয়তাবাদী ইহাকে দরিদ্র, রোগ, নিরক্ষরতা তেমনি উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুক্তি চেষ্টা অর্থে ব্যবহার করে।

সৎকাজ ঃ বিশ্বাস ও অনুশীলন সম্পর্কে উপরে বর্ণিত দফাগুলি ছাড়াও ইসলামে একটি সাধারণ ধারণা রহিয়াছে যাহাকে ইহছান বলা হয় এবং

যাহাকে 'সৎকাজে'র নামে অনুবাদ করা যায়। জুয়াখেলা, সুদ খাওয়া, মাদক দ্রব্য পান করা এবং শূকরের মাংস ভক্ষণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আইন রহিয়াছে। মুসলমানদের জন্য অনাথদের যত্ন নেওয়া দয়ালু হওয়া, সৎ ব্যবসা করা এবং ক্ষমা করা কর্তব্য। সাধারণভাবে যেখানেই থাকুক একজন মুসলমানকে হালালসিদ্ধ কাজ করিতে উৎসাহ প্রদান করা হয় এবং হারাম নিষিদ্ধ হইতে দূরে রাখা হয়, বাকী কাজ ক্ষমাশীল ও দয়ালু আল্লাহ্‌র উপর ছাড়িয়া দিতে উপদেশ দেওয়া হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রারম্ভ

প্রথম চারি খলিফা

আবুবকর ৬৩২—৬৩৪
ওমর ৬৩৪—৬৪৪
ওসমান ৬৪৪—৬৫৬
আলী ৬৫৬—৬৬১

উত্তরাধিকারের সমস্যা

হযরত মুহম্মদ (দঃ) ৬৩২ সালের ৮ই জুন পরলোক গমন করেন। জীবিতকালে তিনি নবী, বিচারক, বাদশাহ, ধর্মীয় নেতা ও সেনাপতির দায়িত্ব পালন করিতেন। কেহ তাঁহার অধিকারে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করে নাই। হযরত মুহম্মদের (সঃ) মৃত্যু ছিল অন্ততঃ দুইজন 'ব্যক্তির' পরলোক গমন—একজন আল্লাহ্‌র নবী এবং অন্যজন রাষ্ট্রপ্রধান। আল্লাহ্‌র শেষ প্রেরিত পুরুষ হিসাবে নবীর কোন উত্তরাধিকারী থাকিতে পারে না। তবে রাষ্ট্রনায়কের অতিরিক্ত বিষয় হিসাবে তাঁহার দায়িত্বের, যথা প্রধান সেনাপতি, আইনদাতা, বিচারক ইত্যাদির জন্য একজন উত্তরাধিকারী প্রয়োজন, যাহাকে খলীফা বলা হয়।

হযরত মুহম্মদ (সঃ) দেহ কবরে অর্পণ করিবার পূর্বেই উত্তরাধিকারের বিষয় লইয়া একটি তিক্ত বিবাদের সূত্রপাত হয়। খলীফা পদের জন্য একাধিক প্রার্থী দণ্ডায়মান হয়। এই বিবাদ বহু শতাব্দী ধরিয়া চলিতে থাকে এবং ইসলামের ইতিহাসকে রঞ্জিত করে। নবী-নৃপতির দেহের চতুর্দিকে উত্থিত যুক্তি কোন কোন সময় যুদ্ধের সূত্রপাত করে। একভাবে আজও ইহার

পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। দ্বাদশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিকের মতে, "ইসলামে খিলাফতের ন্যায় অন্য কোন বিষয় এত অধিক রক্তপাত ঘটায় নি।"

হযরত মুহম্মদ (সঃ) কর্তৃক রূপান্তরিত বিষয়গুলির মধ্যে একটি হইল গোত্রীয় বা জাতীয় ভ্রাতৃত্বকে ধর্মীয় ভ্রাতৃত্বের রূপদান। তিনি মানুষের ভ্রাতৃত্বের চাইতেও অধিক প্রচার করেন মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব। আধুনিক জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের মতবাদ ইসলামে স্থান পায় না। স্বয়ং নবী-নৃপতি হিসাবে হযরত মুহম্মদ (সঃ) একটি উঁচুদরের জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টি করিতে চাহিয়া ছিলেন।

যতদূর জানা যায়, হযরত মুহম্মদের (সঃ) কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি কাহাকেও তাঁহার উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান নাই। এই ব্যাপারে তিনি বোধ হয় গোত্রীয় রীতি অনুসরণ করেন। আরবগণ 'সালিশী' যুগের হিব্রুদের ন্যায় সারাজীবনের জন্য তাহাদের নেতা নির্বাচনে অভ্যস্ত ছিল। এই পদের যোগ্যতা বিচার করা হইত আলোচ্য সময়ে সম্প্রদায়ের প্রয়োজন অনুযায়ী। তবে অনেকেই দাবী করে যে মুহম্মদ (সঃ) আলীকেই তাঁহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন কিন্তু মনোনীত উত্তরাধিকারীর শত্রুগণ সেই উইল ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছে। যাহাই হউক, বিষয়টি হযরত মুহম্মদের (সঃ) মৃত্যুর সঙ্গে এমনভাবে জড়াইয়া পড়ে যে, উত্তরাধিকারী নির্বাচন করিবার পূর্বে কেউ নবীকে কবর দেওয়ার কথা চিন্তাও করে নাই।

আয়েশা (রাঃ) কর্তৃক মুহম্মদের (সঃ) মৃত্যুর সংবাদ ঘোষিত হইবার পর 'আনসার' নামীয় মদীনাবাসী আওস ও খাজরাজ বংশের নেতৃবৃন্দই প্রথম মাঠে অবতীর্ণ হন। তাঁহারা ছিলেন মক্কাবাসীদের চিরাচরিত শত্রু এবং তাঁহাদের নগরীতে সেই শত্রুর অর্থনৈতিক ও সামাজিক আধিপত্য বিস্তার হউক ইহা তাঁহারা কিছুতেই বরদাশত করিতে পারেন না। নিজেদের মধ্যে তাহারা যুক্তি প্রদান করেন যে আরবদের জন্য একজন নবী দান করিয়া কোরাইশরা যে সম্মান পাইয়াছেন তাহাতেই তাহাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। তাহারা মনে করেন নবীকে সাহায্য দানকারী মদীনাবাসীদিগকে একজন রাষ্ট্রপ্রধান নিয়োগ করিবার সম্মান দেওয়া উচিত। তবে তাহাদের সমস্যা ছিল সেই ব্যক্তি আওস হইবেন না, খাজরাজ হইবেন।

আনসারগণ যখন ক্ষমতা লইয়া নিজেদের মধ্যে বিতর্কে ব্যস্ত তখন মুহ-জিরগণ অর্থাৎ কোরাইশ নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাহারা হযরত মুহম্মদের (সঃ) সহিত মদীনায় আগমন করিয়াছিলেন তাহারা অলসভাবে বসিয়া ছিলেন না। এই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য তাহারা নবীর মসজিদে একত্রিত হন। আনসারগণ একটি সিদ্ধান্তে প্রায় উপনীত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া আবুবকর, ওমর এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের অনেকেই আনসারদের সভাস্থলে দ্রুত হাজির হন। সেখানে, সেই সভাকক্ষে যে বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয় তাহা আমেরিকার একটি প্রেসিডেন্সিয়াল কনভেনশনের লোকপ্রসিদ্ধ ধূম্রাবৃত মন্ত্রণা কক্ষের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। দ্বিতীয় খলিফা ওমর সেই সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং কয়েক বৎসর পর তিনি এই ঘটনা বিবৃত করেন।

আবুবকর আনসারদিগকে দৃঢ় ভাষায় বলেন, যে আরবগণ সমষ্টিগত-ভাবে 'শুধুমাত্র কোরাইশদের আধিপত্য স্বীকার করিবে'। এই উক্তির যথার্থতা আনসারদিগকে বিচলিত করে। কাবার রক্ষাকর্তা হিসাবে কোরাইশ ছিল খুবই প্রসিদ্ধ গোত্র। হযরত মুহম্মদ (সঃ) যাহা করিয়া-ছেন তাহাতে তাহাদের মর্যাদা তো খর্ব হয়ই নাই বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। আনসারগণ অতঃপর একটি পরিষদ হিসাবে গোত্রীয় নেতাদের একটি সন্ধির প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাব ছিল নিষ্ফল। যে একতা হযরত মুহম্মদ (সঃ) আরবদের উপর চাপাইয়া দিয়াছিলেন ইহার ফলে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়িত। প্রত্যেকের মনোভাব ইতিমধ্যে কঠিন আকার ধারণ করে এবং পরস্পরের মধ্যে হাতাহাতির উপক্রম হয়। এই সময় ওমর এক পর্যায়ে আবুবকরের নাম প্রস্তাব করিয়া তাঁহার প্রতি আনুগত্য বা বায়'আত প্রকাশ করেন। মুহাজিরগণ ইহার অনুসরণ করে। অতঃপর আনসারদের নড়বড়ে দল ভাঙ্গিয়া যায় এবং তাঁহারাও অনুরূপ আনুগত্য প্রকাশ করেন। ওমর তাঁহার বর্ণনা শেষ করেন এই বলিয়া, "আমরা সা'দ ইবনে ওবদার (যাহাকে আনসারগণ নির্বাচিত করিতে চাহিয়া-ছিলেন) উপর পতিত হইলাম এবং কে যেন বলিল আমরা তাহাকে হত্যা করিয়াছি ঃ আমি বলিলাম আল্লাহ তাহাকে হত্যা করিয়াছেন।"

নেতৃত্বের সংঘর্ষে আরেকটি দল ছিল যাহার কথা প্রায় সকলেই বিস্মৃত।

তাঁহারা হইলেন নবীর নিকটতম পরিবার, যাঁহারা পরলোকগত নেতার মৃতদেহের নিকট উপস্থিত থাকিবার ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী। মৃত্যুশয্যার চতৃপার্শ্বে ছিলেন আয়েশা, তাঁহার স্ত্রী—যাঁহার হাতের উপর নবী (সঃ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, ফাতিমা—নবীর একমাত্র জীবিতা কন্যা, কন্যার স্বামী হযরত আলী—যিনি হযরত মুহম্মদের (সঃ) চাচাত ভাই এবং আরও অন্যান্য কয়েকজন। তাঁহারা নিশ্চিন্তভাবে ধারণা করিয়াছিলেন, নবীর চাচাত ভাই, জামাতা এবং নবীর একমাত্র বংশধরের স্বামী হিসাবে আলীই একমাত্র স্বাভাবিক ও ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারের দাবীদার। পরে দাবী করা হয় নবীর তথাকথিত একটি অছিয়তনামা 'ধ্বংস' করা হয়, যাহাতে উত্তরাধিকারী হিসাবে আলীর নাম উল্লেখ ছিল। কথিত আছে, ফাতিমা তাঁহার স্বামীর স্বপক্ষে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দান করেন এবং ছয় মাস পর্যন্ত আলী আবুবকরের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে বিরত থাকেন, কিন্তু উভয় প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

আবুবকর

কোরাইশ এবং মুসলমানদের মধ্যে বয়স ও ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে আবুবকরই ছিলেন প্রথম। তিনি মুহম্মদের (সঃ) অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং তাঁহার শ্বশুরও ছিলেন। তিনিই হন প্রথম খলিফা, খলিফায়ে রাসুল আল্লাহ "আল্লাহর বার্তাবাহকের প্রতিনিধি"। কিঞ্চিতাধিক দুই বৎসর তাঁহার সংক্ষিপ্ত শাসন ইসলামের অধীনে আরবের পুনঃঐক্য সাধনার্থে অতিবাহিত হয়। মুহম্মদের (সঃ) প্রতি আরব গোত্রগুলির আনুগত্য ছিল অগভীর এবং তাহাদের উপর তাঁহার আধিপত্য সুদৃঢ় করিবার মত সময় তিনি পান নাই। নবীর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহারা পুনরায় তাহাদের অতীত জীবনে ফিরিয়া যায়। ইসলামের সঙ্গে তাহাদের সংযোগ রক্ষাকারী শক্তিশালী কবচ তাহারা ছিন্ন করে। ইহা হইল যাকাত বা কর প্রদান। কর প্রদানের সঙ্গে অপরিচিত একটি জাতির পক্ষে যাকাত একটি অর্থনৈতিক বোঝা, যাহা তাহাদের স্বাধীন জীবনযাত্রার পথের অন্তরায়। কোন কোন গোত্র ইসলাম হইতে যাহা শিক্ষা লাভ করিয়াছিল তাহা ভুলিবার পথ অবলম্বন করে। অন্যান্য গোত্রগুলি কোরাইশ গোত্রের দ্বারা

পরাজিত হইবার ভয়ে নিজস্ব নবীর দাবী করে। আবুবকর ও তাঁহার উপদেষ্টাদের নিকট ইহা অসহনীয় মনে হয়, এবং তাঁহারা শক্তির দ্বারা এই হুমকির মোকাবিলা করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

ইসলামের পতাকাতলে সমগ্র মদীনা বশীভূত। এইবার মক্কাবাসীগণ আরবের অবশিষ্টাংশে যুদ্ধ চালাইয়া যান। এই সমস্ত যুদ্ধে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ ছিলেন প্রধান সেনাপতি। তাঁহার চমৎকার সৈন্য পরিচালনায় গোত্রগুলি একের পর এক পরাজিত হয়। ৬৩৪ খ্রীষ্টাব্দে আবুবকর যখন মৃত্যুশয্যায়, খালিদের বিজয়ী বাহিনী তখন কোন কোন বিদ্রোহী গোত্রকে সিরিয়ায় পশ্চাদ্ধাবিত করে এবং বাইজান্টাইন সেনাবাহিনীর একটি অংশকে পরাজিত করে।

ওমর

উত্তরাধিকার লইয়া যাহাতে কোন বিবাদের সূত্রপাত না হয় সেইজন্য আবুবকর তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে উত্তরাধিকারী হিসাবে ওমরের নাম উল্লেখ করিয়া যান। খলিফার পিছনে সত্যিকার ক্ষমতার অধিকারী না হইলেও ওমর ছিলেন আবুবকরের সর্বদানিষ্ঠ পরামর্শদাতা। এই উচ্চাকাঙ্খী ও উদ্যমশীল ব্যক্তি, যিনি তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হন, শুধু একজন প্রাথমিক ইসলাম গ্রহণকারী নহেন বরং নবীর একজন শ্বশুরও। তাঁহার পুরা নাম ওমর ইবন আল-খাত্তাব। তাঁহার অনুপ্রাণিত নেতৃত্বে মরুভূমির আরবগণ আগ্নেয়গিরির ন্যায় উত্থিত হইয়া সম্মুখের সব কিছুকে গ্রাস করে। এক যুগের মধ্যে তাহারা বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যকে পরাজিত করিয়া পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর এবং দক্ষিণে মিসর পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। একই সঙ্গে তাহাদের বাহিনীর আরেকটি শাখা পারস্য সাম্রাজ্য জয় করিয়া মধ্য ইরানের দিকে অগ্রসর হয়। সেইযুগের দুইটি সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যের উপর একটি অধীনস্থ ও অশিক্ষিত জাতির এই দর্শনীয় ও দ্রুত বিজয় ঐতিহাসিকদিগকে হতবুদ্ধি করিয়া দেয় এবং এইজন্য ইহা অনেক আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। তবুও হুনদের দ্বারা রোম বিধ্বংস হইয়াছে এবং মোঙ্গলদের দ্বারা চীনাগণ বিজিত হইয়াছে। এইগুলির কারণ খুঁজিয়া বাহির করা খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে।

কিন্তু মুহম্মদের (সঃ) কল্পনার সাম্রাজ্য আরবদের বাহিরে বিস্তার লাভ করে নাই। খলিফা থাকাকালে আবুবকর ছিলেন সম্পূর্ণ কর্মব্যস্ত, তাই ইরাক ও সিরিয়ায় যাইবার জন্য খালিদকে আদেশ করিতে তিনি দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন। কিন্তু খালিদ ইতিমধ্যেই সিরিয়ায় প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং তাই এইসব বিজয়ের ব্যাপারে আবুবকর সম্মতি প্রদান করেন। তবে ওমর সম্ভানে পরিকল্পনা রচনা করিয়া এই অভিযানের নেতৃত্ব প্রদান করেন।

আরব উপদ্বীপের বেদুইনগণ কর্তৃক উত্তরের ফারটাইল ক্রিসেণ্ট লুণ্ঠন বোধহয় প্রথম নহে। খুব সম্ভবতঃ আসিরীয়, ব্যাবিলনীয়, কলদীয় ও ফুনিসিয় সেমিটিকগণ উপদ্বীপ হইতে বাহির হইয়া বিশাল সাম্রাজ্যসমূহ প্রতিষ্ঠা করে। হিব্রুগণ বহির্বিশ্বে একটি ধর্মীয় ছাপ রাখিয়া যায়। তাহাদের অনুসরণ করিয়া আরবগণও একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এবং তৎসঙ্গে একটি ধর্মও চাপাইয়া দেয়।

নতুন ধর্ম বিস্তারের জন্য বস্তু কর্মপন্থার নায়ক ওমরকে ইসলামের ইতিহাসে সেণ্ট পলের সহিত তুলনা করা যায়। কিন্তু সেণ্ট পলের ন্যায় তিনি রোমের নিকট আশ্রয় চান নাই বরং তিনি রোম ও ইরানের সাম্রাজ্যকে হুমকি প্রদর্শন করেন এবং পরাজিত করেন। তিনি একজন আরব, ইসলামের একজন একাগ্র অনুসারী এবং স্ব ধর্মমন্ত্রের জন্য তিনি আমীর-উল-মুমেনীন বা 'বিশ্বাসীদের সেনাপতি' সেই ধর্মের একজন পাকা বিশ্বাসী। তদনুসারে তাঁহার উদ্দেশ্য তিনটি—একটি হইল আরবকে ক্ষমতার কেন্দ্রস্থল করিয়া একটি আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করা। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করিবার জন্য তিনি সমস্ত অমুসলিম এমন কি খ্রীস্টান ও ইহুদীদিগকেও আরব হইতে বহিষ্কার করেন, যাহাতে আরবদেশ সম্পূর্ণভাবে একটি মুসলিম ভূমিতে পরিণত হয়। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হইল সেই সাম্রাজ্যে ইসলাম একমাত্র ধর্ম না হইলেও অন্তত: প্রধান ধর্মে পরিণত হয়। তৃতীয় উদ্দেশ্য হইল যেহেতু আল্লাহ ও পবিত্র কোরানের ভাষা আরবী সেইহেতু সাম্রাজ্যের ভাষাও আরবী হয়। ওমর ও তাঁহার সভাসদগণ বিশ্ব ইতিহাসে এইসব পরিকল্পনার ব্যাপারে প্রথম বা শেষ জাতি নহেন কিন্তু তুলনামূলকভাবে তিনি এবং তাঁহার অনুসারীগণ ছিলেন বেশী কৃতকার্য।

ইসলামের সৌভাগ্য, ওমর একাকী ছিলেন না। যুদ্ধবিগ্রহের ইতিহাসে

দুইজন অত্যন্ত মেধাবী সেনাপতি খালীদ ইবনে ওয়ালিদ এবং আমর ইবনে আল-আসও ওমরের মত যৌবনসুলভ উৎসাহে উদ্দীপ্ত ছিলেন। ইস-লামের প্রতি তাঁহাদের পূর্ণ বিশ্বাস ছাড়াও তাঁহারা ইহার মধ্যে বিরাট দুঃসাহসিক কর্মের উপকরণের সন্ধান লাভ করেন। অধিকন্তু ওমর ও তাঁহার সহকর্মীবৃন্দ আরবের বাহিরে যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করিবার উত্তেজনা লাভ করেন। নবীর (সঃ) পতাকা অনুসরণকারী অস্থির বেদুইনগণ তাঁহার মৃত্যুর পর নতুন ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহাদের ইচ্ছামত চলিতে থাকে। আবুবকর তাহাদিগকে পুনরায় পরাজিত করেন কিন্তু তাহারা তবুও অস্থির থাকিয়া যায়। মুসলমান হিসাবে তাহারা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করা বা অন্যের তাঁবু লুণ্ঠনাক্রমণের অভ্যাস ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। লুণ্ঠ-নাক্রমণ ছিল তাহাদের পুরুষানুক্রমিক স্বভাব যাহা এত সহজে ত্যাগ করা সম্ভব হয় নাই। অতএব ওমর তাহাদিগকে আরবের বাহিরে অমুস-লিমদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে উৎসাহ প্রদান করেন। ফলে একদিকে স্বদেশে তিনি বেদুইনদের অস্থিরতা হইতে অব্যাহতি লাভ করেন এবং অপর দিকে বিদেশে নতুন সরকারের জয়ের পথ প্রশস্ত করিয়া তোলেন। ইহা ছাড়া গোত্রীয় লোকদিগকে আরবের বাহিরে যুদ্ধে অনুপ্রাণিত করা তেমন দুরূহ ব্যাপার ছিল না, কারণ ইরান ও বাইজান্টিয়ামের ধনসম্পদ ছিল অপ্রতুল। এই অর্থনৈতিক পুরস্কারের সম্ভাবনায় আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা মুসলমানদিগকে একটি ভয়াবহ বাহিনীতে পরিণত করে। মুসলিম বেদুইনগণ বিশ্বাস করে যে, নিহত হইলে তাহারা বেহেশতে যাইবে, জয়ী হইলে যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির ভাগ পাইবে। খুব কম সংখ্যক সৈন্যই নিহত হইবার আশায় যুদ্ধে যোগদান করে। একজন মুসলিম ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, আবুবকর লোকদিগকে জেহাদে বা ধর্মীয় যুদ্ধে আহ্বান করেন এবং গ্রীকদের নিকট হইতে যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি করায়ত্ব করিবার সম্ভবনা তাহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন।

যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির ব্যক্তিগত আকাঙ্খা ছাড়াও দরিদ্র মদীনা সরকারের রাজস্ব আদায়ের আকাঙ্খার বিষয়কেও নিশ্চয়ই হেলা করা যায় না। কোরান বলে, 'ঐশীগ্রন্থ প্রাপ্ত লোকদের বিরুদ্ধেও যুদ্ধ কর···যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহারা রাজস্ব প্রদান করে··· ।' প্রথম দুই খলিফার অভিজ্ঞতা হইল শক্তি

প্রয়োগ করা ছাড়া আরবের গোত্রীয় লোকদের নিকট হইতে যাকাত আদায় করা যায় না। অতএব তাঁহারা আরবের বাহিরে 'মহাগ্রন্থ প্রাপ্ত লোকদের' নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিবার জন্য গোত্রীয় লোকদিগকে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করেন। স্বীয় কৃতকার্যতায় তাঁহারা নিশ্চয়ই বিস্মিত হন। শীঘ্রই তাঁহাদের দাবী তিনটি শব্দে পরিণতি লাভ করে—'ইসলাম, রাজস্ব অথবা অসি।'

অধিকাংশ মুসলিম ঐতিহাসিক ইসলামের প্রসারতায় ধর্মীয় উদ্দেশ্যের উপর জোর দেন। ইসলামের ইতিহাসের অধিকাংশ আধুনিক ব্যাখ্যাদানকারী ইহাকে ছোট করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পান। পূর্ববর্তীগণ যদিও বাড়াবাড়ি করিয়াছেন তবে পরবর্তীগণ ইতিহাস পাঠে দারিদ্রতা প্রদর্শন করিয়াছেন। মহাবিজয়ে ইসলাম কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে নাই এরূপ সিদ্ধান্তে আসা অসম্ভব। ইসলামই ছিল প্রত্যেক মুসলমানের যুদ্ধধ্বনি এবং প্রত্যেক গোত্রের পুনর্মিলনের ভিত্তি। ইসলাম ছাড়া বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে সংযোগ স্থাপন সম্ভব হইত না এবং এই ঐক্য ছাড়া তাহারা নিছক লুণ্ঠনাক্রমণকারী দলে পরিণত হইতেন। ওমর হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বনিম্ন স্তরের একটি সাধারণ সৈনিক পর্যন্ত প্রত্যেকটি আরবের অন্তরে আল্লাহ, মুহম্মদ (স), যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি, রাজস্ব, শাহাদত ও বেহেশত সমস্তই ছিল একই অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত।

প্রত্যেক কিছুর ন্যায়, বিজয়ের কারণসমূহ আক্রমণকারীর প্রারম্ভিক পদক্ষেপ ও যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল নহে। উত্তরের দুই বৃহৎশক্তির—বাইজান্টিয়াম ও ইরান শতাব্দকাল ধরিয়া একে অন্যের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এমন কি আরব বাহিনীগুলি যখন উত্তর দিকে অভিযানরত তখনও বাইজান্টাইন সম্রাট হেরাক্লিয়াস পারস্য বিজয়ে বিভোর—পারস্যবাসীদেরকে তিনি পিছু হটিতে বাধ্য করেন এবং তিনিও তখন পরিশ্রান্ত। অন্যদিকে পারস্যের শাহানশাহ পারভেজ তখন মৃত। পারভেজের মৃত্যুর পর ৬২৮—৬৩৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের ভিতর ইরানের সিংহাসন কয়েকবার হাত বদল হয়। ইহার পর শাহ ইয়াজদাজারদ শাহানশাহ নিযুক্ত হন। পরিশ্রান্ত ও রক্তক্ষয়ী বাইজান্টাইন ও পারস্যবাসী উভয়েই তখন মনেপ্রাণে শান্তি কামনা করিতেছিল। মোটের উপর তাহারাই ছিল তখন

যে কোন শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী। কেহ তাহাদিগকে আক্রমণ করিবে—তাহাও আবার নোংরা মরুভূমির বেদুইনগণ, ইহা তাহারা কল্পনাও করে নাই।

যুদ্ধে অর্থ ব্যয় হয় এবং অর্থ আসে জনগণের কাছ হইতে। যুদ্ধের ব্যাপক খরচ এবং উভয় দেশের নেতৃবৃন্দের উচ্চমানের খরচ জোগাইবার দরুণ বাইজান্টিয়াম ও ইরানের জনসাধারণ তখন বিশাল করের বোঝায় ভারগ্রস্ত।

অধিকন্তু, খ্রীস্টান ও জরথুস্ত্র উভয় ধর্মের প্রাথমিক শক্তি নিঃশেষ হইয়া তখন বাইজান্টিয়ামে সীমাহীন ধর্মতাত্ত্বিক শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে। অপর দিকে ইরানে পুরোহিত শ্রেণীর অত্যাচার আরম্ভ হইয়াছে। যীশুখ্রীস্টের মাত্র একটি প্রকৃতিতে বিশ্বাসী মনোফিজাইটগণ এবং তাহার অলৌকিক ও মানবীয় এই দুই প্রকৃতিতে বিশ্বাসী খ্রীস্টানদের মধ্যে তখন তুমুল সংঘর্ষ চলিতেছে। যীশুখ্রীস্টের প্রকৃতি উপেক্ষা করিয়া স্বীয় ইচ্ছা কার্যকরী করিবার জন্য হেরাক্লিয়াস এক অভিনব প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু ইহা কোন পক্ষকেই সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। উপরন্তু ইহা একটি তৃতীয় দলের সৃষ্টি করে।

ইরানে জরথুস্ত্রদের মোবেদগণ (The mobeds) অধৈর্য হইয়া তাহাদের উদ্দেশ্য হাসিল করিবার জন্য রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করে। রাষ্ট্রীয় ধর্মের বোঝা হাল্কা করিবার জন্য মনিচানিজম ও মাজদাকিজমের ন্যায় ধর্মীয় বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এই লোকদের নিকট সাধারণ ও ধর্মতাত্ত্বিক দিক হইতে সরলভাবে আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা টাটকা বায়ুর নিঃশ্বাস গ্রহণ করার সমতুল্য ছিল। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে আরব উপদ্বীপের উত্তরে ফারটাইল ক্রিসেন্টে অনেকগুলি আরব গোত্র বসবাস করিত। ইহাদের কেহ কেহ ছিল দক্ষিণের গোত্রগুলির আত্মীয়-স্বজন। ইহারা নিশ্চয়ই তাহাদের গ্রীক ও পারস্যবাসী উপপ্রভুদের নিকট হইতে মুক্তি লাভের সুযোগকে স্বাগত জানায়।

যাযাবর বাহিনী কর্তৃক সুসভ্য জাতিকে জয় করা ইতিহাসে কোন নতুন ঘটনা নহে। কিন্তু ইহা ব্যাখ্যা করা কঠিন। এইক্ষেত্রে বাইজান্টাইন ও পারস্যবাসীদের ক্ষমতা এত বিশাল ছিল যে আবুবকর তাঁহার সেনাবাহিনীকে প্রেরণ করিতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন এবং ওমরও ছিলেন খুবই সতর্ক। তবে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতিগণ ছিলেন অপরিচিত। অতএব মুসলিম বাহিনীর

অগ্রগতির জন্য অন্য কাহারো চাইতে এইসব সেনাপতিদিগকেই অধিক সম্মান দেওয়া উচিত।

৬৩৪ সালের দিকে অনেক সতর্কতামূলক অগ্রগতির পর খালেদ ইবনে ওয়ালিদ পূর্ব সিরিয়া আক্রমণ করেন। তিনি এই কাজ সম্পন্ন করিতে পারিতেন না যদি বাইজাণ্টাইনদের সহিত চুক্তিবদ্ধ আরব খাসসানীয়গণ তাঁহার সহিত সহযোগিতা না করিত। ৬৩৫ সালের ফেব্রুয়ারীর দিকে খালেদ দামেস্ক নগরী অবরোধ করেন। তিনি অধিবাসীদিগকে তিনটি শর্ত প্রদান করেন—যাহা ইসলামের পরবর্তী যুদ্ধসমূহে নির্ধারিত নিয়মে পরিণত হয়। এই শর্তগুলি হইল ইসলাম গ্রহণ করা। জিজিয়া প্রদান করা অথবা যুদ্ধ করা। ৬৩৫ সালের সেপ্টেম্বরে দামেস্ক আত্মসমর্পণ করে। এক বৎসর পর ৬৩৬ সালের আগস্টে ইয়ারমূকে হেরাক্লিয়াস ও খালেদের মধ্যে চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আরবদের জয়ের ফলে বাইজাণ্টাইন সম্রাটকে সমগ্র সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন মুসলমানদের নিকট ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করে। ৬৩৭ সালে সিরিয়া ও ৬৩৮ সালে জেরুজালেমের পতন হয়। এই ভাবে সংক্ষিপ্ত চারি বৎসরে আরবগণ ফারটাইল ক্রিসেণ্টের সর্বশ্রেষ্ঠ বাইজাণ্টাইন প্রদেশগুলির প্রভুত্ব অর্জন করে।

সিরিয়াকে কেন্দ্র হিসাবে রাখিয়া আরবগণ আর্মেনিয়া, জার্জিয়া ও উত্তর ইরাকের পার্বত্য অঞ্চলগুলিতে অনুসন্ধান চালায়। কিন্তু উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে কঠিন বাধার সম্মুখীন হয়। আমর-ইবনে-আল-আস যিনি মোটামুটি মিসরের সহিত পরিচিত ছিলেন, তথায় সেনাবাহিনীর একটি উপদল পরিচালনা করেন। এই পরিচালনার অনুমতি প্রদানে ওমর দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন। ৬৩৯ সালের দিকে তিনি সীমান্তে উপনীত হন এবং লিউসিয়াম ও হেলিপোলিশের দিকে অগ্রসর হন। নববলে বলিয়ান হইয়া তিনি নীল নদের পাড় ঘেষিয়া প্রসিদ্ধ নগরী আলেকজান্দ্রিয়া অভিমুখে অগ্রসর হন এবং ৬৪২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইহা পদানত করেন।

পশ্চিমে এইসব অভিযান চলাকালে ইসলামের তৃতীয় সেনাপতি সাদ-ইবনে ওয়াককাস প্রায় ৬০০০ সৈন্য লইয়া ইরানের দিকে অগ্রসর হন। তিনটি প্রধান যুদ্ধের মাধ্যমে পারস্য সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। প্রথমটি সংঘটিত হয় কাদিসিয়া নামক স্থানে ৬৩৫ সালের জুন মাসে এক উত্তপ্ত ধূলি

ঝড়ের দিনে। ইহাতে রুস্তমের নেতৃত্বে পারস্যবাসীগণ পরাজয় বরণ করে। দুই বৎসর পর ইউফ্রেটিস নদীর তীরবর্তী আরব গোত্রসমূহের সাহায্য লইয়া সাদ সাসানীয়দের রাজধানী তেসীফন অবরোধ করেন। ৬৩৭ সালে এই প্রসিদ্ধ রাজধানীর পতন হয়। নগরীর ধন-সম্পদ নিশ্চয়ই আরব সৈন্যদের কল্পনাতীত ছিল। ফলে তাহারা হৃদয় ভরিয়া তেসীফন লুণ্ঠন করে। কথিত আছে যে, তাহারা রন্ধনকার্যের জন্য কর্পূর ব্যবহার করে 'হলুদ খণ্ড' বা সাফরার (স্বর্ণ) পরিবর্তে 'সাদা খণ্ড' বা বায়দা (রৌপ্য) বিনিময় করে। স্বর্ণ তাহারা ইতিপূর্বে দেখে নাই, রৌপ্য তাহাদের নিকট মোটামুটি পরিচিত। ইয়াজদাজারদের সেনাবাহিনীর একটি অংশ আরবদের সঙ্গে নেহাবান্দ বা আধুনিক হামাদানের নিকটে মিলিত হয় এবং ৬৪১ খ্রীস্টাব্দে পরাজিত হয়। মার্ভ এলাকার কোন এক স্থানে শাহ্ স্বয়ং একজন লোভী চাষীর হাতে নিহত হন এবং এইভাবে ২২৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সাসানীয় শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

এইভাবে প্রায় আট বৎসরের মধ্যে আরবগণ মরুভূমি হইতে নির্গত হইয়া এক বিরাট ভূখণ্ডের অধিকারী হয়—যাহা পশ্চিম মিসর হইতে মধ্য ইরান এবং এশিয়া মাইনরের দক্ষিণ সীমান্ত হইতে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। যদিও তাহারা ইহা সম্পূর্ণভাবে জয় করে নাই কিন্তু তবুও এই বিজয় খুবই হৃদয়গ্রাহী। ইরান ও বাইজান্টিয়াম একে অপরের যতটুকু ক্ষতি করিতে পারে নাই আরবগণ তাহাদের উভয়কেই তাহা করিতে সক্ষম হয়।

আধুনিক মধ্যপ্রাচ্যকে জানিবার জন্য এই কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও মিসরের জনগণ ইয়ারমুকের যুদ্ধ অথবা দামেস্ক, জেরুজালেম ও আলেকজান্দ্রিয়ার আত্মসমর্পণের কথা সম্পূর্ণভাবে ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহারা এখন ইহাকে স্মরণ করিলেও ইসলামের বিজয়ের গর্ব লইয়া স্মরণ করে। তাহাদের এক বিরাট অংশ এখন মুসলমান হইয়া গিয়াছে এবং আরবী ভাষা গ্রহণ করিয়া আরব সাম্রাজ্যের একটি অংশ হিসাবে গর্ব অনুভব করিতেছে। কিন্তু পারস্যবাসীদের ব্যাপার ভিন্ন। তাহারা এখনও কাদিসিয়ার যুদ্ধ এবং আরবদের হাতে পরবর্তী পরাজয়-গুলির কথা তিক্ততার সহিত স্মরণ করে। ফার্টাইল ক্রিসেণ্ট ও মিসরের জনগণ ছিল একটি বিদেশী শক্তির অধীনে, অর্থাৎ বাইজান্টাইনদের।

আরবদের হাতে বাইজান্টিয়ামের পরাজয়কে জনগণ তাই প্রভু পরিবর্তন হিসাবে গণ্য করিয়াছিল। অতএব এই ধরনের পরিবর্তনকে স্বাগত জানানো তাহাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক। অপরদিকে পারস্যবাসীগণ কাহারো অধীনস্থ ছিল না বরং জাতীয়তাবাদের প্রতি তাহাদের আস্থা ছিল প্রবল। আরবদের বিজয়ের ফলে পারস্যবাসীদের মর্যাদা প্রভু হইতে ভৃত্যে রূপান্তরিত হইয়া যায়, যাহা তাহারা কখনও গ্রহণ করিতে পারে নাই। ফলে পরাজয়ের গ্লানি হইতে মুক্তি লাভের সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সচেতনভাবে আরব নেতৃত্ব ধ্বংস করিবার প্রয়াস পায়। ৭৫০ খ্রীস্টাব্দে তাহারা আরব সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ভাঙ্গিয়া দিতে সক্ষম হয়। তাহারা আরবী ভাষা বলিতে অস্বীকার করে এবং সুযোগ আসিবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা এই ভাষা লেখা বন্ধ করিয়া দেয়। তাহারা ইসলাম গ্রহণ করে। কিন্তু ১৫০০ খ্রীস্টাব্দে হইতে তাহারা এমন একটি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয় যাহা তাহাদিগকে সংখ্যাগরিষ্ঠ আরবগণ হইতে পৃথক বলিয়া চিহ্নিত করে।

কাদিসিয়ার যুদ্ধের তিনশত পঞ্চাশ বৎসর পর পারস্য কবি ফেরদৌসী এই ভাবধারাকে তাঁহার শাহনামা নামক গ্রন্থে—'নৃপতিদের গ্রন্থ'-এ অমর করিয়া রাখিয়াছেন। এই গ্রন্থে পৌরাণিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া আরবগণ কর্তৃক বিজিত হইবার কাল পর্যন্ত ইরানের ইতিহাস কাব্যে লিপিবদ্ধ করা হয়। পারস্যের স্কুল-ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খুব কমই আছে যে এই কাহিনীর সম্পূর্ণ বা কিছু অংশ মুখস্থ বলিতে পারে না। সিপাহ্‌বদের যুদ্ধের প্রাক্কালে 'সেনাপতি' রুস্তম পরাজয়ের পূর্বাভাস দান করেন এবং তেসিফনে তাঁহার ভ্রাতার নিকট এক হৃদয়গ্রাহী পত্র লিখেন।

উষ্ট্রের দুগ্ধ পান করিয়া এবং টিকটিকির মাংস ভক্ষণ করিয়া এই নোংরা ও পাদুকাহীন আরবগণের কাইয়ানের তাজ পরিধান করিবার আকাঙ্খা জন্মিয়াছে। হে অদৃষ্ট তোমার মাথার সহস্র ধিক্কার!

পারস্যবাসীগণ তাহাদের পরাজয় ভুলিয়া যায় নাই। পারস্যবাসীগণ যে 'ইয়াজদাজিরদী ক্যালেণ্ডার' ব্যবহার করে তাহার প্রথম বৎসর ধরা হয় শেষ সাসানীয় রাজার মৃত্যু বৎসররূপে। পারস্যবাসীগণ ওমরকেও ভুলে নাই। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত একটি বিশেষ দিনে তাঁহার

কুশপুত্তলিকা দাহ করা ছিল ইরানে চিরাচরিত প্রথা। ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর ২৩শে নভেম্বর ৬৪৪ সালে শোচনীয়ভাবে মৃত্যুবরণ করেন। ইহা বোধহয় কোন আকস্মিক ঘটনা নয় যে তাঁহার আততায়ী ছিল আবু লুলু ফিরোজ নামে একজন পারস্যবাসী।

পঞ্চম অধ্যায়

বিস্তৃতি ও প্রশাসনিক সমস্যা

ইসলামী শাখা-প্রশাখার দ্রুত বিস্তৃতির ফলে নিয়ম-কানুন, প্রশাসন ও বিচার বিভাগীয় বিভিন্ন সমস্যার উদ্ভব হয়। অথচ এইগুলি সম্পর্কে পবিত্র কোরানে কোন ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় নাই। শাসনকার্যের সরলতা ও কার্যকারিতার পরিপ্রেক্ষিতে আবুবকরের শাসন প্রণালী ছিল হযরত মুহম্মদের (সঃ) ন্যায়। রসুলুল্লাহর (সঃ) ন্যায় তাহার কর্মস্থল ছিল মদীনার মসজিদ। সেখানে তিনি মুসলমানদের নামাজে ইমামতি, বিভিন্ন দলের সমস্যাদির বিচার এবং সেনাবাহিনীকে নির্দেশ প্রদান করিতেন। ইসলামী সম্প্রদায় ছিল তখনও তুলনামূলকভাবে ছোট এবং সমস্যাবলীও পরিচিত ও সাধারণ। গোত্রসমূহের অনেক দিনের রীতি অনুসারে যোদ্ধাগণ কোন বেতন লইতেন না। প্রত্যেক সৈন্য যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির ভাগ পাইত এবং হত্যাকৃত শত্রুর যাবতীয় তৈজসপত্রের মালিক হইত। রাষ্ট্রের আয় তখনও বেশীরভাগ আসিত যাকাত এবং সমস্ত যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ হইতে—যাহা মুহম্মদ (সঃ) প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন।

বিশাল ভূখণ্ড আয়ত্তে আসিবার পর এইগুলির শাসন সংক্রান্ত বিষয়াদি পূর্বের ন্যায় পরিচালনা করা অসম্ভব হইয়া উঠে। নতুন নতুন নীতির প্রয়োজন হয়। এই ব্যাপারে ওমর ছিলেন সুযোগ্য ব্যক্তি। তাঁহাকে ইসলামের 'দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠাতা' বলিবার পশ্চাতে তাঁহার শাসন সংক্রান্ত নীতির কার্যকারিতা যেমনি রহিয়াছে তেমনি ইসলামের জন্য তাহার নতুন ভূখণ্ড বিজয়েও নিহিত। ইহা নির্ধারণ করা খুবই দুষ্কর যে ওমরের নামে প্রচলিত সমস্ত নীতির স্রষ্টা স্বয়ং তিনি নাকি এগুলির স্রষ্টা তাহার প্রপৌত্র উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় ওমর (৭১৭-৭২০) অথবা অন্য কেহ যিনি মর্যাদার জন্য ওমরের নাম ব্যবহার করেন।

রসুলের (সঃ) প্রতি ওমরের অকুণ্ঠ ভক্তি দৃষ্টে ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে, তিনি যতদূর সম্ভব হযরতের আদর্শ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবেন। বস্তুতঃ ওমরের প্রচলিত নীতিমালা রসুলের (সঃ) আদর্শকে প্রতিভাত করে। ইসলামী সম্প্রদায় এই প্রথমবারের মত নতুন ইসলাম গ্রহণকারী অনারব সমস্যার সম্মুখীন হয়। অনারব বিজিত জাতিগুলিকে লইয়া যে সমস্যার উদ্ভব হয় তাহা অনারবদের ইসলাম গ্রহণ হইতে উদ্ভূত সমস্যার চাইতে কম কঠিন ছিল।

পথপ্রদর্শক হিসাবে ওমরের সম্মুখে ছিল রসুল (সঃ) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন আদর্শ ও ঘটনাবলী। তিনি জানিতেন, হযরত মুহম্মদ (সঃ) একজন আরব—যাঁহাকে আল্লাহতালা ঐশীবাণী সমেত আরবদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি ইহাও জানিতেন যে, এই বাণী অনারবদের নিকট হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখা যায় না। তিনি বিশ্বাস করেন, ইসলামী সম্প্রদায় উম্মাহ* হইল সমস্ত মুসলমানদের ভ্রাতৃত্ব, সমস্ত মানবজাতির নহে। অধিকন্তু একটি বিশাল ভূখণ্ড তাহার আয়ত্বে আসিবার ফলে ওমর একটি সুদৃঢ় কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। আরবে অবস্থিত সেই কেন্দ্রে এই ভ্রাতৃত্বের অখণ্ডতা কিছুতেই নষ্ট হইবে না। এই আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া ওমর ইসলামকে ব্যাখ্যা করেন—যাহার অর্থ হইল, হযরত রসুলের (সঃ) বাণী গ্রহণকারী আরব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা। অনারব মুসলমানগণও এই মুসলিম উম্মার মধ্যে সামিল হইতে পারে কিন্তু ইহার আভ্যন্তরীণ চক্রের অংশ হইতে পারে না—এই সম্মান আরবদের একচেটিয়া প্রাপ্য।

জেরুজালেমে তাহাদের নিজস্ব সায়নাগগের মধ্যে কিছুটা স্বায়ত্বশাসন ভোগ করিবার ফলে ইহুদীগণও অনুরূপ সমস্যার সম্মুখীন হয়। অনেক পৌত্তলিক ইহুদী ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সেই ধর্ম গ্রহণ করে। যদিও ইহুদীগণ তাহাদের দীক্ষার ব্যাপারে কোন চেষ্টা করে নাই। কিন্তু তাহারা ইহা বুঝায় নাই যে এই সমস্ত দীক্ষিত লোকজন 'ইসরাইল বংশের' সমস্ত

---

* পাঠককে উম্মাহ্ বা সম্প্রদায় এই উক্তির সঙ্গে সুপরিচিত হইতে হইবে। প্রথমে উহা বুঝাইত মুসলমান আরব সম্প্রদায়কে। কিন্তু শীঘ্রই সমস্ত লেখকগণ ইহা দ্বারা বিশ্বের সমস্ত মুসলমানকে বুঝাইতে লাগিলেন। এই ভাবার্থে ইহা আধুনিক কালেও ব্যবহৃত হয়।

আশীর্বাদ লাভ করিবে। সায়নাগগে ইহুদীগণ 'নবদীক্ষিতদের আঙ্গিনা' (The court of the Proselytes) নামে একটি স্থান নির্দিষ্ট করে। নবদীক্ষিত লোকজন ঐ স্থান পর্যন্তই প্রবেশ করিতে পারিত তাহার চাইতে অধিক নহে। প্রায় অনুরূপভাবে ওমর ইসলামকে ব্যাখ্যা করেন—যদ্বারা মুসলিম ভ্রাতৃত্ব বলিতে শুধু আরব মুসলিমদের মধ্যস্থিত বিশেষ সুবিধাভোগী-দিগকে বুঝায়। এই ব্যাখ্যা সম্মুখে রাখিয়া তিনি বিভিন্ন আদেশ জারী করেন—সেইগুলি উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যার আলোকে সঠিক অনুধাবন করা যায়।

প্রথমতঃ তিনি সমস্ত অমুসলিমদিগকে আরব হইতে বহিষ্কার করেন। আজ পর্যন্ত অমুসলিমদিগকে আরব দেশের স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে গণ্য করা হয় না। দ্বিতীয়তঃ তিনি আরবদিগকে বিজিত দেশে ভূমি ক্রয় করিতে বাধা প্রদান করেন। তাহাদের নিজস্ব 'আবাস ভূমি' বলিতে সর্বদা আরবকেই বুঝাইবে। তৃতীয়তঃ আরব রক্ত অবিমিশ্র রাখিবার জন্য এবং আরব সামরিক আভিজাত্য বজায় রাখিবার জন্য তিনি অসবর্ণ বিবাহ এমন কি নবদীক্ষিত-দের সঙ্গে হইলেও অপছন্দ করেন। চতুর্থতঃ বিজিত লোকদের সঙ্গে আরব যোদ্ধাদের সংমিশ্রণ ও ভ্রাতৃত্ববোধ রোধ করিবার জন্য তিনি সেনানিবাসের প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে যাঁহারা সুপরিচিত তাহারা প্রধান নগরগুলির শহরতলীতে অবস্থিত সেনানিবাসগুলির কথা স্মরণ করিতে পারেন। মুসলিম সেনানিবাসগুলির মধ্যে যেগুলি পরে নগরীতে পরিণত হয় সেইগুলি হইল মিসরের ফুস্‌তাত, প্যালেস্টাইনের রমলা এবং ইরাকের কুফা ও বসরা।

অতএব চাষাবাদ, ব্যবসা এবং জেলাগুলির স্থানীয় প্রশাসন স্ব স্ব অধিবাসীদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তাহারা মুসলমানদের উপকারার্থে পরিশ্রম করে এবং তাহাদিগকে রাইয়া (Raiya) বা পশুপালক নামে অভিহিত করা হয়। খ্রীস্টান ভূখণ্ডে কার্যাবলীর দায়িত্ব ন্যাস্ত থাকে স্থানীয় বিশপদের হাতে এবং ইরানে থাকে 'দেহকান' বা দেশীয় জমিদারদের হাতে।

ওমরের প্রধান নীতির একটি এই যে, বিজিত ভূখণ্ডের সমস্ত স্থাবর সম্পত্তি ও জমির মালিক আরব-মুসলমান সমাজ—উম্মা। রাষ্ট্রের আয় আসে বিভিন্ন উৎস হইতে—সে নগদে হউক বা উৎপন্ন দ্রব্যে হউক। একটি হইল

খুম্‌স্‌ বা যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ যাহা রসুল (সঃ) করিয়াছিলেন। আরেকটি জিজিয়া বা অমুসলিমদের উপর ধার্যকৃত রাজকর। তৃতীয় উৎস সমস্ত অনারব চাষীদের উপর ধার্যকৃত ভূমি কর। মোট আয় এত বৃহৎ অঙ্কের যে ইহার ফলে আরবদিগকে যাকাত হইতে নিষ্কৃতি প্রদান করা হয়।* সমস্ত আয়ের মালিক যেহেতু উম্মা তাই যুদ্ধ, শাসনব্যবস্থা এবং জনহিতকর কার্যের সমস্ত খরচ মিটাইবার পর অবশিষ্ট অর্থ আরবদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। এই কাজের জন্য ওমর লোক গণনার আদেশ দেন ও একটি কার্যালয় স্থাপন করেন। ইহাকে তিনি পারস্যের 'দিভান' নামক প্রতিষ্ঠানের নামানুসারে 'দিওয়ান' নামে অভিহিত করেন। এই প্রতিষ্ঠানের কাজ হইল ভাগ-বণ্টন করা। উপরোক্ত নীতি আরবদিগকে শক্তিশালী করে। সমস্ত আরব মুসলিম উম্মার আভ্যন্তরীণ পরিষদের সভ্য। আরবদিগকে অভিজাত শ্রেণীতে উন্নীত করা হয় এবং যেহেতু তাহারা আরব তাই যাকাত প্রদান না করা ছাড়াও তাহারা একটি বার্ষিক ভাতা ভোগ করে।

লোক গণনার মাধ্যমে সমস্ত আরবদিগকে ইসলামী ধর্ম বিশ্বাসের মেয়াদ, রসুলুল্লাহর (সঃ) সেবা, গোত্রের মধ্যে প্রতিপত্তি ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়। সকলের উপরে থাকেন রসুলের (সঃ) পরিবার—যাঁহার প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা বাৎসরিক ১২০০০ দিরহাম (প্রায় ৩০০০ ডলার) ভাতা পান, পরবর্তী পদে থাকেন মুহম্মদের (সঃ) সহচরবৃন্দ যাঁহারা তাঁহার সহিত মক্কা হইতে হিজরত করেন, তারপর আসেন তাঁহার মদীনার সহচরবৃন্দ—যাঁহাদের প্রত্যেকে গড়ে বাৎসরিক ৫০০০ দিরহাম ভাতা লাভ করেন। অতঃপর বিভিন্ন আরব গোত্রের নারী, পুরুষ ও ছেলেমেয়েদিগকে ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের মেয়াদ অনুসারে শ্রেণী বিভক্ত করা হয়।

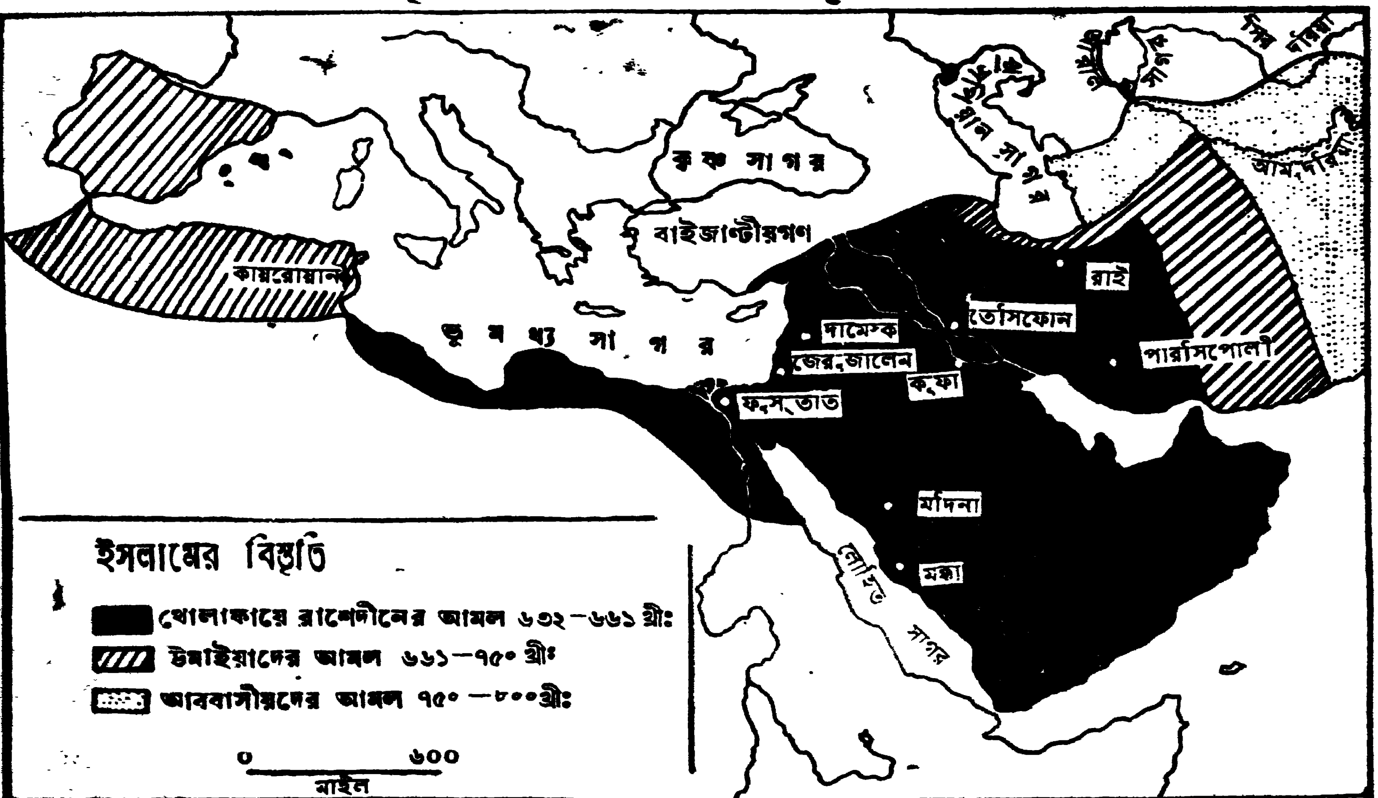
* লেখকের এই মন্তব্যের সহিত আমরা একমত নহি। বস্তুতঃ ওমরের (রাঃ) সময়ও যাকাত হইতে কাহাকেও নিষ্কৃতি প্রদান করা হয় নাই। এমন কি আরবে ঘোড়ার সংখ্যা কম থাকাতে তিনি প্রথম দিকে ঘোড়ার উপর যাকাত নির্ধারণ করেন নাই কিন্তু পরে ইরাক ও পারস্য বিজয়ের পর ঘোড়ার উপর ওমর (রাঃ) কর নির্ধারণ করেন। (বিস্তৃত বিবরণের জন্য ইমাম আবু ইউসুফ রচিত কিতাব আল-খারাজ পৃঃ ২১, ৩১ এবং বালাজুরী পৃঃ ৭ দ্রষ্টব্য—অনুবাদক।

সর্বনিম্ন সৈনিক বাৎসরিক ৬০০ দিরহাম ভাতা লাভ করেন এবং যাঁহারা যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিতেন না তাঁহারা প্রত্যেকে কমপক্ষে ২০০ দিরহাম লাভ করেন। অনেক আধুনিক ঐতিহাসিকদের দাবী যাহাই হউক না কেন, এই কথা ঠিক যে আরবগণ তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য ইসলামকে ব্যবহার করে। রসুল (সঃ) স্বয়ং না হইলেও অন্ততঃ ওমর ও তাঁহার সহচরবৃন্দ আরববাদকে ইসলামের সহিত চিহ্নিত করেন।

তবে আরবদের এই প্রাধান্যের নীতি সময়ের অগ্নি পরীক্ষায় টিকিতে পারে নাই। আজ হউক, কাল হউক বিশাল অনারব জনতা যে কারণেই ইসলাম গ্রহণ করুক না কেন, তাহারা কোরানকে ব্যাপক ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করিবে—যদ্বারা আরব মুসলিম ভ্রাতৃত্বের পরিবর্তে ব্যাপক মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ফুটিয়া উঠিবে। শীঘ্রই অনেক অনারব মুসলমান নিজদিগকে আরব হিসাবে পরিচয় দিতে থাকেন, কেহ কেহ পদাবনতি হইতে বাঁচিবার জন্য, অন্যরা ভাতা পাইবার জন্য, কিছু সংখ্যক মর্যাদা পাইবার জন্য। এইভাবে শত শত ব্যক্তিবর্গ আরও খানিকটা অগ্রসর হইয়া নিজদিগকে স্বয়ং মুহম্মদের (সঃ) বংশধর বলিয়া দাবী করে। রসুলুল্লাহ (সঃ)-এর এইসব মর্যাদা ও সুবিধাভোগী বংশধরগণ মুসলিম বিশ্বের বিশেষতঃ অনারব দেশে বহু রহিয়াছে।

ওসমান

ওমরের নীতি আশানুরূপ সময় পর্যন্ত স্থিতিশীল না হইবার কারণ তাঁহার উত্তরাধিকারী ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে দুর্বলতম শাসনকর্তা। ওমর যখন জানিতে পারিলেন—পারস্যবাসী আততায়ীর আঘাত হইতে তিনি রক্ষা পাইবেন না, তখন তিনি পরবর্তী খলিফা মনোনীত করিবার জন্য ছয় সদস্যের একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। আলী এবং ওসমান উভয়েই এই কমিটির সদস্য। আলীকে হতাশ করিয়া ওসমান খলিফা নির্বাচিত হন। ওসমান ইবনে আফফান তখন ৭০ বৎসর বয়স অতিক্রম করিয়াছেন। তিনিও আলীর ন্যায় হযরত মুহম্মদের (সঃ) জামাতা। তিনি কোরাইশ বংশের অভিজাত উমাইয়া উপগোত্রের লোক—যে গোত্রের নেতা আবু সুফিয়ান হযরত মুহম্মদের (সঃ) সময়


ইসলামের বিস্তৃতি
খোলাফায়ে রাশেদীনের আমল ৬৩২—৬৬১ খ্রীঃ
উমাইয়াদের আমল ৬৬১—৭৫০ খ্রীঃ
আব্বাসীয়দের আমল ৭৫০—৮০০খ্রীঃ
০ ৬০০
মাইল
কৃষ্ণ সাগর
বাইজান্টীয়গণ
কায়রোয়ান
ভূমধ্য সাগর
দামেস্ক
জেরুজালেম
ফুসতাত
তেসিফোন
রাই
পারসিপোলী
কুফা
মদিনা
মক্কা
লোহিত সাগর
আমুদরিয়া

তাঁহার প্রধান শত্রু ছিলেন। রসুলের (সঃ) ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দাবী অনুসারে মক্কা অধিকারের পর এই উমাইয়াগণ অক্ষতভাবে বাঁচিয়া যায়।

উমাইয়াগণ মদীনায় বসতি স্থাপন করিয়া ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্ব প্রদান করে। তাহাদের চেষ্টার ফলেই বোধ হয় ওসমান নির্বাচিত হন। ফলে তাঁহার পরিবর্তে কার্যতঃ উমাইয়া বংশের হাতেই রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা চলিয়া যায়। কোমলমতি, উৎসাহহীন এই বৃদ্ধ লোকটি জনসাধারণের কার্যাবলীর চাইতে পবিত্র কোরান তেলাওয়াত-কেই বেশী প্রাধান্য দেন এবং রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁহার পরিবারের লোকদিগকে বিশ্বাস করিতে থাকেন। ফলে শীঘ্রই তাঁহার উমাইয়া আত্মীয়স্বজন বিজিত প্রদেশগুলির শাসনকর্তা হিসাবে পুরাতন ও বিশ্বাসী যোদ্ধাদের স্থলাভিষিক্ত হন। এমন কি তিনি মিসর বিজয়ী আমর ইবনে আসকে গভর্ণর পদ হইতে অপসরণ করিয়া তদস্থলে রসুল (সঃ) কর্তৃক ধিকৃত তাঁহার পালিত ভাইকে নিয়োগ করেন। তাঁহার আত্মীয়স্বজন ওমরের আদেশ অমান্য করিয়া বিজিত দেশে জায়গাজমি দখল করিলে ওসমান না দেখার ভাণ করেন। অকোরাইশ আরবগণ এই আইন পছন্দ করিত না কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ওমরের ভয়ে উহার বিরোধিতা করিতে সাহস করে নাই তাহারাও ওসমানের এই অমনোযোগিতায় উৎসাহ লাভ করে।

সামরিক অভিযানগুলি আন্দোলনের ঢেউ বিদ্যমান থাকিবার ফলে অব্যাহত থাকে, ওসমানের প্রচেষ্টায় নহে। নৌ-আক্রমণে বাইজান্টাইন-দের নিকট হৃত আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরটি ৬৪৬ খীস্টাব্দে পুনরাধিকার করা হয়। উত্তর আফ্রিকায় মুসলিম বাহিনী বার্বার এলাকার উপর দিয়া অগ্রসর হইয়া ত্রিপলী ও প্রাচীন কার্থেজ অধিকার করে। ওসমান বার্বারদিগকে 'মহাগ্রন্থের লোক' হিসাবে মর্যাদা দান করেন। ৬৫২ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ মুসলমানগণ নুবিয়ানদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তি করিতে আরম্ভ করে। সিরিয়ার আরেকজন উমাইয়া বংশের সদস্য মুয়াবিয়ার নেতৃত্বে আক্রমণ পরি-চালিত হয়। তাঁহার নেতৃত্বে মুসলমানগণ তাহাদের প্রথম নৌযুদ্ধে সফলতা লাভ করে এবং সাইপ্রাস অধিকার করিয়া রোড্‌স্-এর দিকে

অগ্রসর হয়। উত্তরে মুসলমানগণ আজারবাইযান এবং আর্মেনিয়ার কিয়দংশ দখল করে এবং পূর্বে আধুনিক আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের প্রান্তদেশে অগ্রসর হয়।

তবে ইসলামের নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি অধিকতরভাবে আভ্যন্তরীণ বিষয় বিশেষতঃ ওসমানের অব্যবস্থার দিকে আকৃষ্ট হয়। তাঁহার বৈমাত্রের ভ্রাতাকে তিনি কুফার গভর্ণর নিযুক্ত করেন—যিনি রসুলের (সঃ) প্রতি থুথু নিক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চাচাত ভাইকে খাজাঞ্চিখানার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। কথিত আছে যে ব্যাপক স্বজনপ্রীতি ছাড়াও ওসমান গভর্ণর পদ নগদ অর্থ বা সুন্দরী ক্রীতদাসী উপঢৌকনের বিনিময়ে বিক্রয় করিতেন। ফলে রসুলের (সঃ) ঘনিষ্ঠতম সহচরদের অনেকেই তাঁহার বিপক্ষে চলিয়া যান। এই সমস্ত প্রতিক্রিয়াকে আলী ও তাঁহার সমর্থকগণ যে উৎসাহ প্রদান করেন তাহা একটি সাধারণ সত্য।*

ওসমানের স্থায়ী কৃতিত্ব হইল পবিত্র কো'র'নের একত্রীকরণ। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস এই যে কুফার বিদ্রোহ তাঁহার এই অবদানকে কেন্দ্র করিয়া সংঘটিত হয় এবং পরিণামে তাঁহার মৃত্যু ডাকিয়া আনে। মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র, বিশেষতঃ যেখানে আলীর সমর্থক শক্তিশালী, তিনি ক্রমশঃ জনসমর্থনহীন হইয়া পড়েন। কুফার পণ্ডিতগণ কোরানের মূল পরিবর্তন করিয়া উমাইয়াদের বিরুদ্ধে প্রেরিত আয়াতগুলি বিনষ্ট করিবার দোষে ওসমানকে অভিযুক্ত করেন। এই আন্দোলন মিসরে আলীর বন্ধুদিগকে ওসমানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত করে। মিসরীয়গণ আরেক ধাপ অগ্রসর হইয়া ৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে ৫০০ সৈন্যের একটি দল মদীনায় প্রেরণ করে এবং খলিফার গৃহ অবরোধ করে। বাস্তবতঃ এই সমস্ত ঘটনায় ওসমান নির্বিকার ভূমিকা পালন করেন। শোনা যায় সৈন্যগণ দরজা ভাঙ্গিয়া তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিবার সময় তিনি কোরান শরীফ তেলাওয়াতে রত ছিলেন এবং এই অবস্থাতেই তাঁহাকে হত্যা করা হয়। মুসলিম ঐতিহাসিকদের মতানুসারে তাঁহার হত্যাকারী ছিল তাঁহার বন্ধু প্রথম খলিফা আবু বকরের

* হযরত ওসমানের (রাঃ) বিরুদ্ধে আনীত এই সমস্ত অপবাদ অতি পুরাতন। আধুনিক অনেক গ্রন্থে এইগুলিকে খণ্ডন করিয়া প্রমাণ করা হইয়াছে যে তিনি এই সমস্ত দোষের ঊর্ধ্বে ছিলেন।—অনুবাদক

পুত্র মুহম্মদ। এইভাবে ইসলামের তৃতীয় খলিফা ভয়াবহ মৃত্যুবরণ করেন।

আলী

ওসমান হত্যার এক সপ্তাহ পর আলী খলিফার পদ গ্রহণ করেন। তিনি রসুলের (সঃ) চাচাত ভাই ও জামাতা এবং তাঁহার পুরাতন সহচরদের মধ্যে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। তিনি 'নির্বাচিত' হইয়াছেন বলাটা সঠিক নহে। যাঁহারা তাঁহাকে রসুলুল্লাহ্‌র (সঃ) 'একমাত্র' 'ন্যায্য উত্তরাধিকারী বলিয়া বিশ্বাস করেন তাঁহাদের সংষ্টির জন্য তাঁহার সমর্থকগণ তাঁহাকে চতুর্থ খলিফা হিসাবে ঘোষণা করেন মাত্র। যেই খেলাফত তাঁহার নিকট হইতে তিনবার 'ছিনাইয়া' লওয়া হয় তাহা শেষ পর্যন্ত উপযুক্ত ব্যক্তির নিকট অর্পণ করা হয়—ইহাই হইল তাঁহার সমর্থকদের ধারণা। কিন্তু আলী এবং তাঁহার সমর্থকদের দুর্ভাগ্যবশতঃ ইতিমধ্যে খেলাফতের অনেক প্রার্থী সৃষ্টি হইয়াছেন।

হযরত মুহম্মদের (সঃ) মৃত্যুর চব্বিশ বৎসর পর একটি নতুন জাতি বয়ঃপ্রাপ্ত হইযাছে যাহা প্রায় নিরবচ্ছিন্ন বিজয়ের অভিজ্ঞতা অর্জন করিযা অনেক দূর-দূরান্ত সফর করিয়াছে এবং ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে। নিত্যনতুন আমোদ-প্রমোদ উপভোগ করিয়াছে এবং বিরাট সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়াছে। মরুভূমির সাধারণ জীবন অপসারিত এবং তৎসঙ্গে যাঁহারা রসুলের (সঃ) সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সম্মান প্রদর্শন এবং ভক্তিজনিত ভয়ও সুদূর পরাহত। আলীর রাঃ) খেলাফত আরম্ভ হইবার অনতিকাল পরেই তাঁহার দুই আপন সহচর, তালহা ও জোবায়ের, তাঁহাকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করেন।

তিন দশকের ব্যবধানে স্বার্থপরায়ণ মুসলমানগণ উত্তরাধিকারের সমস্যায় জর্জরিত হইয়া পড়ে। ইহাতে তিনটি মতামতের সৃষ্টি হয়। একদলে বিশ্বাস করে যে, রসুলের (সঃ) উত্তরাধিকারী কোরাইশ বংশ হইতে হইবে। রসুলের (সঃ) মৃত্যুর অনতিকাল পরে মক্কা ও মদীনাবাসীদের মধ্যে এই যুক্তি মৌলিকরূপে দেখা দেয়। এই মতের পরিপ্রেক্ষিতে নেতৃবৃন্দের অঁধোষিত একটি সভায় আবুবকর মনোনীত হন। ওমর তাঁহার পূর্ব খলিফা কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং ওমর কর্তৃক একটি কমিটির দ্বারা ওসমান

নির্বাচিত হন। দৃশ্যতঃ এই নিয়মগুলি গ্রহণযোগ্য। কোরাইশ বংশের সমস্ত সদস্যই যেহেতু খেলাফতের যোগ্য ব্যক্তি তাই বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে এই ব্যাপারে যথেষ্ট প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় দল সাধারণ্যে 'বৈধতাবাদী' (legitimists) নামে সুপরিচিত। তাহারা বিশ্বাস করে যে, খেলাফত একটি ঐশ্বরিক পদ এবং নিযুক্ত ব্যক্তি ঐশী আদেশে এই পদে সমাসীন হন। ঐশী আদেশে মুহম্মদের (সঃ) রসুল-রাজা হইবার বিষয়টি যেহেতু প্রশ্নাতীত, তাহারা যুক্তি প্রদান করে যে উত্তরাধিকারীও সেইহেতু রসুলের (সঃ) পরিবার হইতে হইবে। এই নীতি অনুযায়ী মুহম্মদের (সঃ) জামাত', চাচাত ভাই এবং পোষ্যপুত্র হিসাবে আলীই বৈধ উত্তরাধিকারী। তাঁহার পর নেতৃত্ব যাইবে তাঁহার পুত্রদের নিকট অর্থাৎ মুহম্মদের (সঃ) পৌত্র প্রভৃতির নিকট। বৈধতাবাদীগণ 'শীয়ানে আলী' বা আলীর সমর্থক এবং পরবর্তীকালে শুধু শীয়া নামে পরিচিত হয়।

তৃতীয় দল মুসলমানদের মধ্যে একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে খেলাফত কোন বিশেষ পরিবারের অধিকার নহে। তাঁহারা পবিত্র কোরানের আদেশ অনুযায়ী বিশ্বাস করেন যে, মহত্ত্ব পুণ্য কাজের উপর নির্ভরশীল, রক্ত সম্পর্কের উপর নহে। তাঁহাদের নীতি অনুযায়ী একজন ক্রীতদাসও খলিফা হইতে পারে। সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে তাহারা অতি শুদ্ধাচারী এবং তাহারা রসুলের (সঃ) বাণী অনুযায়ী সাধারণ জীবন ভালবাসেন। প্রথমে আলীর সংজীবন দেখিয়া তাহারা তাঁহার সমর্থক হয় এবং তাঁহার শত্রুদের বিরুদ্ধাচরণ করে। পরে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া তাহারা খারেজী বা 'দলত্যাগী' নামে পরিচিত হন। ইসলামের খাঁটি আদর্শ রক্ষার্থে তাহারা স্বেচ্ছায় যোদ্ধায় পরিণত হয় এবং পরবর্তী খলিফাদের শরীরের কাঁটার ন্যায় অবস্থান করেন।

খুব সম্ভবতঃ তালহা ও জুবায়ের আশঙ্কা পোষণ করেন যে, খেলাফত কোরাইশকে বাদ দিয়া শুধু আলীর পরিবারের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। হযরত মুহম্মদের (সঃ) যুবতী স্ত্রী আয়েশা আলীকে ব্যক্তিগতভাবে অপছন্দ করিতেন। তিনি বসরায় বিদ্রোহীদের পক্ষাবলম্বন করেন। এইভাবে ইসলামের প্রথম গৃহযুদ্ধ রসুলের (সঃ) মৃত্যুর ২৩ বৎসর পর

৬৫৬ খ্রীস্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর বসরা শহরের উপকণ্ঠে সংঘটিত হয়। এক-দিকে তাঁহার জামাতা এবং অপরদিকে তাঁহার প্রিয়তমা স্ত্রী। ইহা উষ্ট্রের যুদ্ধ নামে পরিচিত, কারণ আয়েশা একটি উটের উপর সওয়ার হইয়া যোদ্ধাদিগকে উৎসাহ প্রদান করেন। এই যুদ্ধে আলী জয়ী হন। তিনি আয়েশার প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন করেন এবং তাঁহাকে মদীনায় প্রেরণ করেন।

এই সমস্যা তিরোহিত হইবার পর কুফায় রাজধানী স্থাপন করিয়া আলী শাসনকার্য পরিচালনা আরম্ভ করেন। ওসমান কর্তৃক নিযুক্ত প্রায় সব লোককে তিনি অপসারিত করেন এবং রসুলের সঃ) আদর্শে সাদাসিধা প্রকৃতির মানুষকে নিয়োগের মাধ্যমে সংস্কারের সূচনা করেন। তবে তিনি তখনও অধিক শক্তিশালী শত্রুর সম্মুখীন হন নাই। সিরিয়ার গভর্ণর এবং ওসমানের একজন আত্মীয় মুয়াবিয়া আলীকে স্বীকৃতি প্রদানে অস্বীকার করেন। এক শুক্রবার মুয়াবিয়া নিহত খলিফা ওসমানের রক্তাপ্লুত জামা প্রদর্শন করিয়া আলীকে এই হত্যার ষড়-যন্ত্রের অংশীদার বলিয়া অভিযোগ করেন। এইভাবে উমাইয়াগণ আলীর উত্তরাধিকারের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে।

তবে অন্যান্য বিষয়েও সংঘর্ষ চলিতে থাকে। আলীর খেলাফত পর্যন্ত মুসলমানগণ এক বিরাট সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। অশিক্ষিত, নিরস্ত্র কিন্তু উৎসাহী আরব মুসলমান এবং সিরিয়া ইরাকের সুশিক্ষিত ও সভ্য লোকদের সহিত সংমিশ্রণের ফলে মুসলমানদের মধ্যে বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এত অধিক ধন-সম্পদ এবং এত ব্যাপক শিক্ষা-দীক্ষা দেখিয়া তাহারা চমৎকৃত হইয়া যায়। অধিকন্তু, ব্যবহারিক অর্থে এই বিশাল নতুন সাম্রাজ্য শাসন করিবার জন্য বিজিত লোকদের সাহায্য তাহাদের প্রয়োজন হয়। অতএব, আরবদের বাহ্যিক গৃহযুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে সাবেক বাইজান্টাইন ও পারস্যবাসীদের আওতাধীন এলাকাগুলির মধ্যেও ঘটে। গ্রীস-রোমান সংস্কৃতির বাহক সিরিয়া আধিপত্য লাভ করিবে, নাকি পারস্য-সংস্কৃতির বাহক ইরাক আধিপত্য অর্জন করিবে? স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মুসলিম আরব সাম্রাজ্যের কেন্দ্র মদীনা ইতিমধ্যেই ইহার প্রাধান্য হারাইয়া ফেলিয়াছে।

দুই বাহিনী—আলী তাঁহার ইরাকীদের লইয়া এবং মুয়াবিয়া তাঁহার সিরিয়দের লইয়া, ৬৫৭ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে ইউফ্রেটিস নদীর পাড়ে সিফ্‌ফিন নামক স্থানে মিলিত হয়। বর্শার অগ্রভাগে পবিত্র কোরান ঝুলাইয়া সিরিয়গণ চূড়ান্ত ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পায় এবং সন্ধির প্রস্তাব করে। আলীর শৌর্যবীর্য ও ধর্মপরায়ণতা তাঁহার রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিকে ঢাকিয়া ফেলে বলিয়া তিনি কোরানের ভিত্তিতে সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

মধ্যস্থতাকারীগণ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বিলম্ব করেন। ইতিমধ্যে আলীর অনুসারীদের এক বিরাট অংশ সন্ধির প্রস্তাব গ্রহণ করায় আলীর উপর বিরক্ত হইয়া পড়েন। "আল্লাহ্ ছাড়া কোন মধ্যস্থতাকারী নাই" এই জিগির তুলিয়া তাহারা দল ত্যাগ করে। আলী এইসব খারেজীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন এবং ৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে নাহরাওয়ান নদীর পাড়ে তাহাদিগকে পরাজিত করেন।

মধ্যস্থতার সভায় কি হইয়াছিল তাহা সঠিক বলা দুষ্কর। তবে তাহাতে বিভিন্ন অভিযোগ এবং প্রত্যাভিযোগ উত্থাপিত হয়। ঘটনা যাহাই হউক, সর্বস্বীকৃত খলিফা আলী সজ্ঞানে বা ভুলক্রমে মধ্যস্থতা মানিয়া লইয়া খেলাফতের স্বীয় অধিকারকে বিঘ্নিত করেন। নিছক একজন গভর্ণর মুয়াবিয়া খেলাফতে তাঁহার আইনানুগ দাবীর ভাণ করিয়া জয় লাভ করেন। মধ্যস্থতাকারীগণ উভয়কেই 'ক্ষমতাচ্যুত' করেন। ইহার অর্থ প্রকৃতপক্ষে তাহারা আলীকেই ক্ষমতাচ্যুত করেন, কারণ মুয়াবিয়া তখন খলিফা ছিলেন না, তবে তাহারা একজন নতুন খলিফা নির্বাচিত করিবার পন্থা সম্পর্কেও প্রস্তাব করেন নাই। ৬৬০ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে মুয়াবিয়া স্বয়ং জেরুজালেমে নিজেকে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করেন। প্রথমবারের মত ইসলামে দুইজন খলিফার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। ৬৬১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মসজিদে যাইবার সময় আলী একজন খারেজীর আক্রমণে আহত হন এবং দুইদিন পর পরলোক গমন করেন।

আলীর হতাশ অনুসারীগণ তাঁহার জৈষ্ঠ্য পুত্র হাসানকে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করেন। তবে হাসান সমাগত অনিবার্য সংঘর্ষের আশঙ্কায় বিচলিত হন। এই সময় মুয়াবিয়া অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে প্রস্তাব করেন যে,

হাসান অবসর গ্রহণ করিয়া মদীনার নিকটবর্তী তাঁহার আবাসগৃহে চলিয়া যাইতে রাজী হইলে তিনি তাঁহাকে একটি রাজকীয় ভাতা ও নিরাপত্তা প্রদান করিবেন। হাসান তাহাই করেন। অতঃপর মুয়াবিয়া দামেস্কে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়া ইসলামের অবিসংবাদিত খলিফায় পরিণত হন।

এইভাবে সনাতন খলিফাদের যুগ শেষ হয়। এই যুগটিকে খাঁটি ধর্মতন্ত্রের যুগ হিসাবে মান্য করা হয়; যখন আল্লাহর আইনই ছিল দেশের আইন এবং সুন্নাহ বা 'রসুলে (সঃ) আদর্শ' ছিল একমাত্র পথ যাহাকে প্রত্যেকে অনুসরণ করিতে সচেষ্ট হয়। বিংশ শতাব্দীর ধর্মীয় মনোভাবাপন্ন প্রায় সব মুসলমান সর্বদা কার্যক্ষেত্রে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হিসাবে এই যুগের কথা উল্লেখ করে এবং এই যুগের আদর্শ ফিরিয়া পাইতে চায়। ইসলামের কোন কোন ইউরোপীয় ঐতিহাসিক এই যুগকে 'প্রজাতান্ত্রিক' ও 'গণতান্ত্রিক' উভয়ভাবে উল্লেখ করেন। প্রজাতান্ত্রিক এই ভাবে বলা যায় যে, একমাত্র আলী ব্যতীত কখনও পারিবারিক বংশে রূপান্তরিত করিবার প্রচেষ্টা হয় নাই। গণতান্ত্রিক ইহা নিশ্চয়ই ছিল না। বড় জোর ইহাকে একটি স্বল্পলোকশাসিত রাজ্য (Oligarchy) বলা যায়। নীতিগতভাবে খেলাফতে কোরাইশদের নিরঙ্কুশ অধিকার ছিল, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে গোত্রের মধ্যে বিদ্যমান একটি অতি ক্ষুদ্র ও শক্তিশালী দলের দ্বারা ইহা পরিচালিত হইত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উমাইয়া বংশ ঃ ৬৬১—৭৫০

সুফিয়ান শাখা

মুয়াবিয়া ১ম (৬৬১—৬৮০)
ইয়াজিদ ১ম (৬৮০—৬৮৩)
মুয়াবিয়া ২য় (৬৮৩)

মারওয়ান শাখা

মারওয়ান ১ম (৬৮৩—৬৮৫)
আবদ আল-মালিক (৬৮৫—৭০৫)
ওয়ালিদ ১ম (৭০৫—৭১৫)
সুলায়মান (৭১৫—৭১৭)
ওমর ২য় (৭১৭—৭২০)
ইয়াজিদ ২য় (৭২০—৭২৪)
হিশাম (৭২৪—৭৪৩)
ওয়ালিদ ২য় (৭৪৩—৭৪৪)
ইয়াজিদ ৩য় (৭৪৪)
ইব্রাহীম (৭৪৪)
মারওয়ান ২য় (৭৪৪—৭৫০)

য়ার খেলাফতের পদে প্রতিষ্ঠা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামী বিশ্বে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। মদীনা যুগের 'প্রজাতন্ত্র' পরিত্যাগ করিয়া নিজ বংশকে তিনি বাইজান্টাইন ও পারস্য ধাঁচে গঠন করেন। তবে ঐতিহ্যবাদীদিগকে দেখাইবার জন্য এবং জনসমক্ষে উপস্থিত হইবার রীতি প্রচলিত রাখিবার জন্য মুয়াবিয়া তাঁহার পুত্র ইয়াজিদকে আরবের

বিভিন্ন গোত্রের নিকট হাজির করেন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকার করিবার সুযোগ দান করেন। কিন্তু এই রীতি শীঘ্রই পরিত্যাগ করা হয়। ফলে জৈষ্ঠ্য পুত্র বা পরিবারের মধ্যে যিনি সর্বশক্তিশালী তিনিই উত্তরাধিকারীরূপে পরিগণিত হন। এতদসত্ত্বেও কোন খলিফাই অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন না এবং উমাইয়া বংশ মোটের উপর দৃঢ়ভিত্তিক ছিল না। উমাইয়া খলিফাদের তালিকা দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে একজন খলিফার রাজত্বকাল ছিল গড়ে মাত্র ছয় বৎসর। মাত্র চারিজন দশ বৎসরের অধিক রাজত্ব করেন। পরবর্তীদের মধ্যে তিনজন এক বৎসরও স্থায়ী হন নাই।

উমাইয়াদের সম্পর্কে আমরা যেসব তথ্য লাভ করি সেগুলি আসে প্রায় সম্পূর্ণভাবে আব্বাসীয় ঐতিহাসিকদের নিকট হইতে, তাঁহারা সেই বংশের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনয়ন করেন এবং ইহার শাসকদিগকে আমোদপ্রিয় ও মন্তাসক্ত, এবং জোরপূর্বক খেলাফত দখলকারী হিসাবে চিহ্নিত করেন। এই বর্ণনা ইহাদের অনেকের ক্ষেত্রে সত্য হইতে পারে তবে ইহাও সত্য যে তাহাদের সবাই মদ্যাসক্ত ও আমোদপ্রিয় ছিলেন না। এমন কি তাহাদের অনেকে সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করিবার জন্য এবং ইহার সীমান্ত বৃদ্ধি করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। উমাইয়া খলিফাগণ এক বিশাল সাম্রাজ্যের মুখোমুখি হন, যাহার মধ্যে ধর্ম ও কৃষ্টির পরস্পর বিরোধী উপাদান বিদ্যমান ছিল। তাঁহারা শাসনকার্যের ব্যাপারেও বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন। এইসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উমাইয়াগণের কৃতিত্ব একেবারে তুচ্ছ নহে।

খ্রীস্টান ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রত্যেকে ৩০০ বৎসরের কঠোর সংগ্রামের পর কনস্টানটাইনের নেতৃত্বে 'খ্রীস্টান' রাষ্ট্র এবং অশোকের নেতৃত্বে 'বৌদ্ধ' বৌদ্ধ রাষ্ট্র স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সংগ্রামশীল বিজয়মুখী ইসলামের ক্ষেত্রে এই প্রথা প্রযোজ্য নহে। রসুলের (সঃ) জীবদ্দশায় লোকজন বিভিন্ন কারণে এবং কোন কোন সময় পরস্পর বিরোধী উদ্দেশ্যে ইসলামে যোগদান করে। অনেকে সৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া ইসলামে দীক্ষিত হন। তাঁহারা বিশ্বাসীদের মূল খুঁটিতে পরিণত হন এবং সময়ের সাথে সাথে তাহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। তাহারা ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষণ

করিবার জন্য অতন্দ্রপ্রহরী হিসাবে কাজ করেন। প্রথমদিকে খারেজীগণ এই দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাঁহারা হযরত মুহম্মদের (সঃ) বিঘোষিত নীতিকে রক্ষা করিবার জন্য আলীর পক্ষ অবলম্বন করেন।

অনেকেই নিছক সুযোগ সুবিধার জন্য ইসলামের বাণী গ্রহণ করেন। উমাইয়া বংশের সুফিয়ানের নেতৃত্বাধীন মক্কাবাসীগণ নিশ্চয়ই এই দলের অন্তর্ভুক্ত। হযরত মুহম্মদের (সঃ) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিরর্থক দেখিয়া তাহারা তাঁহার পক্ষাবলম্বন করেন এবং নতুন আন্দোলনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক নিয়ন্ত্রণ করেন। তাঁহারা ইসলামের আইন মানিয়া চলেন এবং রীতিনীতি পালন করেন। কিন্তু তাহাদের বিশ্বাসের দৃঢ় ভিত্তি ছিল না বলিয়া তাঁহারা ইসলামের জন্য তাঁহাদের স্বীয় উন্নতি বিসর্জন দেওয়ার চিন্তা করিতেন না।

আবার অনেকে এরূপও ছিলেন যাহাদিগকে জোরপূর্বক ইসলামের আওতায় আনা হয়। ইহাদের অনেকেই ছিল বেদুইন আরবের গোত্রগুলির লোক। ইহাদিগকে হযরত মুহম্মদ (সঃ) পরাজিত করেন কিন্তু পুনরায় আবু বকরকে ইহাদিকে জয় করিতে হয়। তাহারা যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তিতে আগ্রহী ছিল। বিদেশীদের সহিত তাহাদিগকে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখিতে পারিলেই শুধু তাহারা মদীনার আধিপত্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিত না। উমাইয়াগণ তাহাদের পূর্বসূরীদের ন্যায় গোত্রীয় লোকদিগকে রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধে ব্যাপৃত রাখে এবং তাহাদের সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধেও ইহাদিগকে ব্যবহার করে। খাঁটি ইসলামপন্থীগণ উমাইয়াদিগকে ঘৃণা করেন এবং তাহাদিগকে ইসলামী উম্মার কলঙ্ক বলিয়া মনে করেন। এইসব ওলামাগণ ইসলামের পবিত্রতা রক্ষার নিমিত্ত উমাইয়াদিগকে ধ্বংস করিবার সমস্ত সুযোগের সদ্ব্যবহার করেন। অপরদিকে সরকারের পূর্ণনিয়ন্ত্রণাধিকার ছিল উমাইয়াদের হাতে। ফলে খেলাফতের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে প্রত্যেকটি যুদ্ধে তাহারা জয় লাভ করিতে সক্ষম হয়।

বাইজান্টিয়ামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

আরবদের জন্য তখনও বিজয়ের অসম্পূর্ণ কাজ ছিল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য। ইহার ধনসম্পদ ইসলামের যোদ্ধাদিগকে অনুপ্রাণিত করে। সিরিয়ার গভর্ণর থাকাকালে মুয়াবিয়া বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে জলে ও

স্থলে বিজয় লাভ করেন। কিন্তু বোধহয় ওসমান হত্যার দ্বারা সৃষ্ট গৃহ-যুদ্ধের ফলে তিনি এই বিজয়ের ফলভোগ করিতে পারেন নাই। আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় মুয়াবিয়া সম্রাট তৃতীয় কন্সটান্সকে (৬৪২—৬৬৮) কর প্রদান করিয়াও শান্তি কিনিতে সম্মতি প্রদান করেন।

খলিফা হিসাবে তাঁহার অবস্থান দৃঢ় করিবার পরই মুয়াবিয়া বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে উস্কানীমূলক কাজ আরম্ভ করেন। ৬৬৮ সালের শীতকালে তাঁহার একজন সেনাপতি পরে মুয়াবিয়ার পুত্র ইয়াজিদ কর্তৃক সাহায্যপুষ্ট হইয়া কনস্টান্টিনোপ্‌ল্‌ হইতে বসফরাসের অপর পাড়ে কালসিডনে (আধুনিক কাদিকয়) পৌঁছেন। পরবর্তী বসন্তে তাহারা রাজধানী অবরোধ করে। তবে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্ভেদ্য প্রমাণিত হওয়ায় এবং সম্রাট চতুর্থ কন্সটান্টাইন আরবদের বিরুদ্ধে যথেষ্ট উৎসাহী বলিয়া প্রতীয়মান হওয়ায় সফলতা অর্জন সম্ভব হয় নাই। অবরোধ তুলিয়া লওয়া হয় কিন্তু এই অভিযান খলিফার নিকট রাজনৈতিকভাবে অর্থবহ হইয়া উঠে। ইয়াজিদকে এই অবরোধের নায়ক বলিয়া স্বীকার করা হয়। ফলে খেলাফতের উত্তরাধিকারী হিসাবে ইয়াজিদের নাম ঘোষণা করিতে মুয়াবিয়ার পক্ষে সুবিধা হয়।

তবে উমাইয়াগণ বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য সম্পর্কে তাহাদের উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করে নাই। সমুদ্রপথে কয়েকটি যুদ্ধ ছাড়াও এশিয়া মাইনরের সীমান্তে আক্রমণ পরিচালনা করা আরবদের একটি নিয়মিত গ্রীষ্মকালীন কার্যে পরিণত হয়।

কনস্টান্টিনোপলের উপর দ্বিতীয় আক্রমণ আসে খলিফা সুলায়মানের (৭১৫—৭১৭) রাজত্বকালে। তাঁহার ভ্রাতা মাসলামা বসফরাসের উভয় পাড় অধিকার করেন এবং ৭১৬ সালের আগস্ট হইতে ৭১৭ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজধানী অবরোধ করিয়া রাখেন। এই যুদ্ধের বিবরণ বিস্তৃত। এই বিবরণে আরবগণ কর্তৃক নাপথা এবং অবরোধের জন্য বিশেষ ধরনের গোলন্দাজ বাহিনী ব্যবহার করিবার কথা উল্লেখ আছে। ইহা ছাড়াও তাহারা বসফরাসের উপর শিকল টাঙ্গাইয়া যোগাযোগের ব্যবস্থাও সহজ করিয়াছিল। আরবদের বিরুদ্ধে বাইজান্টাইনগণ কর্তৃক ব্যবহৃত 'গ্রীক ফায়ার' বা গ্রীক আগুনের বিষয়ও এই বিবরণে উল্লেখ আছে। শেষ পর্যন্ত

ম'রাশের অধিবাসী একজন সিরিয়ান এবং এক নতুন বংশের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট লিউ রাজধানী রক্ষা করেন। আরব শিবিরের দুর্ভিক্ষ ও রোগের প্রাদুর্ভাব এবং অত্যধিক কনকনে শীতের দ্বারা তিনি সাহায্য লাভ করেন। তবে মাসলামা কিছুতেই হাল ছাড়িতে প্রস্তুত ছিলেন না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নতুন খলিফা দ্বিতীয় ওমরের আদেশে তিনি অবরোধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

অনেক বৎসর পর ৭৮২ সালে আব্বাসীয় খলিফা মাহ্‌দীর সময় আরবগণ পুনরায় কনস্টান্টিনোপল অধিকারের চেষ্টা করে। এই সময় বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভের উদ্দেশ্যে সম্রাজ্ঞী আইরীণ অতি দ্রুত খলিফাকে 'কর' প্রদান করিতে সম্মত হন। এই সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আরবগণ কখনও এশিয়া মাইনরে আধিপত্য লাভে সক্ষম হয় নাই। বিভিন্ন উপায়ে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ১৪৫৩ সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং শেষ পর্যন্ত ইহা ওসমানীয় সুলতান মুহম্মদ 'দিগ্বিজয়ীর' দ্বারা নিশ্চিহ্ন হয়।

উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনে সাম্রাজ্য বিস্তার

৬৭০ খ্রীস্টাব্দে আরবগণ তিউনিশিয়ায় কায়রোয়ান নামক সামরিক নগরী নির্মাণ করিয়া ইহাকে উত্তর আফ্রিকা বা আরবদের কথিত ইফরিকিয়া বিজয়ের ঘাটি হিসাবে ব্যবহার করে। ৩০ বৎসর ধরিয়া আরবগণ বাইজান্টাইনদিগকে এই অঞ্চল হইতে বহিষ্কার করিতে চেষ্টা করে। সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে মুসলমানগণ কর্তৃক কার্থেজ অধিকারের সাথে সাথে বাইজান্টাইন শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ৭০৮ খ্রীস্টাব্দে নিযুক্ত গভর্নর মুসার নেতৃত্বে মিসর হইতে আটলান্টিক পর্যন্ত সমগ্র উত্তর আফ্রিকা আরব শাসনের আওতাধীনে আসে এবং পূর্বের ন্যায় মিসর হইতে নিয়ন্ত্রিত না হইয়া সরাসরি দামেস্ক হইতে নিয়ন্ত্রিত হইতে থাকে।

উত্তর আফ্রিকার বার্বারগণ হেমিটিক (Hamitic) নামে পরিচিত শাখার লোক এবং খুব সম্ভবতঃ তাহারা সেমিটিক জাতীয়। তাহাদের মধ্যে উপকূলীয় শহরের অধিবাসীবৃন্দ খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করে এবং প্রথম দিকে অনেক খ্রীস্টান পণ্ডিতের জন্ম দেয়। এইসব পণ্ডিতের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন সেন্ট অগাস্টাইন। বার্বার গোত্রগুলির মধ্যে উপরের দিকে

বাসকারী সংখ্যাগুরু লোকজনদের নিকট খ্রীস্টান ধর্ম তেমন গুরুত্ব লাভ করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বার্বারগণ মুসলিম আরবদের অনুপ্রবেশে বাধা প্রদান করিলেও শেষ পর্যন্ত তাহারা ইসলামের অনুগামী হইয়া যায় এবং আরও বিজয়ের জন্য তাহারা আরব বাহিনীগুলির সঙ্গে যোগদান করে।

৭১১ খ্রীস্টাব্দে মুসার একজন বার্বার সহকারী তারিক একটি সম্পূর্ণ বার্বার আক্রমণকারী বাহিনীর নেতৃত্বে স্পেনে প্রবেশ করেন। তারিক একটি বিশাল পাহাড়ের নিকটে তাহার কেন্দ্র স্থাপন করেন। 'জাবাল-আল-তারিক' বা তারিকের পাহাড় যাহা বর্তমানে জিব্রাল্টার নামে খ্যাত এখনও তাঁহার নাম বহন করিতেছে। তাঁহার অভিযানের ফলে সেদেশের অতি গোলযোগপূর্ণ অবস্থা প্রকাশ পায়। ৭১১ সালের বসন্তে লুণ্ঠনাক্রমণ হিসাবে সুচিত অভিযানের দ্বারাই গ্রীষ্মকালের শেষ ভাগে স্পেনের অর্ধেক বিজিত হয়।

স্বীয় ভৃত্যের নয়নাভিরাম কৃতকার্যতায় ঈর্ষান্বিত হইয়া মুসা ১০,০০০ আরব সিরিয় সেনাবাহিনী লইয়া স্পেনে প্রবেশ করেন এবং তারিক কর্তৃক পাশ-কাটাইয়া যাওয়া কিছু সংখ্যক নগরী তিনি জয় করেন। টলেডোতে তিনি তারিকের সহিত মিলিত হইবার পর তাহাকে তিরস্কার করেন এবং বিনা অনুমতিতে কাজ করিবার অপরাধে তাহাকে বন্দী করেন। তাহার পর স্পেনে মুসলমানদের অগ্রগতি দেশ বিজয়ের পরিবর্তে বিজয়ী বাহিনীর কুচকাওয়াজের রূপ পরিগ্রহ করে। ৭১৩ সালে মুসার সেনাবাহিনী বিস্কে উপসাগরে পৌঁছে।

খলিফা প্রথম ওয়ালিদের আদেশক্রমে মুসা তাঁহার পুত্র আবদ্ আল-আজীজকে বিজিত রাজ্যের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং তারিকসহ দামেস্ক অভিমুখে ফিরিয়া যান। শত শত বন্দী, ভিসিগথিক রাজপুত্র, দাসী, ক্রীতদাস এবং বিপুল যুদ্ধলব্ধ ধনসম্পত্তি লইয়া ইহা ছিল একটি সগৌরব শোভাযাত্রা। মুসা দামেস্কে প্রত্যাবর্তনের পর খলিফা সুলায়মান সিংহাসনে আরোহন করেন এবং তারিকের সঙ্গে মুসা যেরূপ ব্যবহার করেন তিনিও মুসার সঙ্গে অনুরূপ ব্যবহার করেন। 'অবাধ্যতার' জন্য তিনি মুসাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। তাঁহার নিকট হইতে ধন-সম্পদ

কাড়িয়া লন। কথিত আছে যে মূসা হেজাযের এক অখ্যাত কোণে দরিদ্র ভিক্ষুক অবস্থায় মারা যান।

ইতিমধ্যে মুসলমানগণ স্পেন বিজয় সমাপ্ত করেন এবং ইহাকে আল-আন্দালুস (বোধহয় 'ভ্যাণ্ডালদের দেশ') নামে অভিহিত করেন। ৭১৮ খ্রীস্টাব্দে পর্যন্ত মুসলমানগণ পিরেনীজ পর্বত অতিক্রম করিয়া ফ্রান্সের গ্রাম এবং গীর্জাগুলিতে আক্রমণ চালায়। শেষ পর্যন্ত ৭৩২ সালে হযরত মুহম্মদের (সঃ) মৃত্যু শতবার্ষিকীতে আবদ-আল-রহমানের নেতৃত্বাধীন মুসলিম বাহিনীর প্রসিদ্ধ টুর্সের যুদ্ধে চার্লস মার্টেল দ্বারা পরাজিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে মুসলমানদের আক্রমণসমূহ অব্যাহত থাকিলেও এবং এভিগনন ও লিয়ন্স-এর ন্যায় বিভিন্ন ফরাসী শহরসমূহ মুসলমানদের দখলে থাকিলেও মুসলমানদিগকে পশ্চিমে ইউরোপের নিরাপত্তার পথে চিরস্থায়ী হুমকি বলিয়া মনে করার পর্ব শেষ হয়।

প্রায় ৮০০ বৎসর পর্যন্ত মুসলমানগণ স্পেনে অবস্থান করে। ৭৫৫ খ্রীস্টাব্দে দামেস্ক হইতে বহিষ্কৃত উমাইয়াগণ করডোবায় রাজধানী স্থাপন করিয়া স্পেনে একটি প্রতিদ্বন্দ্বী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করে। বহু শতাব্দী যাবত স্পেনের মধ্য দিয়া ইসলামী ভাবধারা পাশ্চাত্যে প্রবাহিত হয়। আরবগণ কর্তৃক বিজিত দেশগুলির মধ্যে স্পেনই একমাত্র দেশ যাহার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান হয় নাই। আবার ইহাই একমাত্র দেশ যাহা খ্রীস্টানগণ কর্তৃক পুনঃবিজিত হয় এবং যাহার মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব অবলুপ্ত। স্পেনের ইসলামের কাহিনী, অধিকাংশই বার্বার ও সিরিয় (মুর) কার্যকলাপের বিবরণ এবং হৃদয়গ্রাহী—যাহা এই গ্রন্থের আওতার বাহিরে।

এশিয়ায় অগ্রগতি

বাইজান্টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এবং উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন বিজয় ছাড়াও উমাইয়াগণ অন্ততঃ কিছুকালের জন্য ইরাক ও ইরানের বিদ্রোহী অধিবাসীদিগকে শান্ত রাখিতে সক্ষম হয়। আধুনিক উজবেকিস্তানের সিরদরিয়া (জাক্সারটাস) নদীর অপর তীরেও তাহারা একটি ঘাটি লাভ করে এবং তুর্কিস্তানীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করেন। এই অভিযান আবদ-

আল-মালিকের খেলাফতের সময় আরম্ভ হয় এবং প্রথম ওয়ালিদের রাজত্বকালে শেষ হয়। এই অভিযানগুলির মূল উদ্যোক্তা ছিলেন মক্কার নিকটবর্তী তায়েফের জনৈক স্কুল শিক্ষক হাজ্জাজ-ইবনে-ইউসুফ। পারস্য ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে রক্তপিপাসু অত্যাচারী হিসাবে এবং আরবগণ তাঁহাকে ইসলামের রক্ষাকারী হিসাবে অভিহিত করেন। তিনি ছিলেন নির্ভীক, নিষ্ঠুর এবং উমাইয়াদের অন্ধ অনুগত। তিনি নয় বৎসর মক্কা শাসন করেন এবং সিংহাসনের একজন প্রতিদ্বন্দ্বীকে তিনি ধ্বংস করেন। প্রাচ্যের শাসনকর্তা হিসাবে তিনি অনেক 'কর্তনোপযোগী মস্তক' অবলোকন করেন এবং সমস্ত বিবরণ অনুযায়ী তিনি ১২০,০০০ শিরোচ্ছেদ করেন।

ইরানকে শান্ত করিবার জন্য তিনি কয়েক সহস্র আরববাহিনী কোতাই-বার নেতৃত্বে প্রেরণ করেন, যিনি মার্ভ ও বল্‌খ্‌ (আধুনিক আফগা-নিস্তানে) অধিকার করিয়া আমুদরিয়া (গ্রীক, 'অক্সাস' আরবী, 'জাই-হান') অতিক্রম করেন। ৭০৫ ও ৭১২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে অনেকগুলি অভিযানে বোখারা ও সমরখন্দ এবং খারিজিম (খিভা) অধিকার করেন। এইগুলি আধুনিক উজবেকিস্তানে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে অবস্থিত। পরে তিনি উত্তরে শিরদরিয়া (গ্রীক, 'জাক্সারটাস' আরবী, 'সাইহান) নদী অতিক্রম করিয়া তুর্কী-বান্ধ শক্তিশালী অবস্থানগুলিতে হাজির হন এবং তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করেন।

আরেকজন সেনাপতি, মুহম্মদ আল-সাগাফী (মুহম্মদ-বিন কাশেম) দক্ষিণে ভারতবর্ষ অভিমুখে অগ্রসর হন এবং ৭১০ ও ৭১২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মাকরান, বেলুচিস্তান, হায়দরাবাদ দখল করেন এবং উত্তরে সিন্ধু নদ ধরিয়া পাঞ্জাবের মূলতানে উপস্থিত হন। ভারতবর্ষের এই অংশকে ক্রমে হিন্দু ধর্মীয় আনুগত্য হইতে কাড়িয়া লওয়া হয় এবং পরে এইগুলি মুসলমান এলাকায় পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালে ইহা মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের মূল এলাকায় রূপান্তরিত হয়।

উমাইয়াদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আবুবকর কর্তৃক সূচিত প্রায় একটানা বিস্তৃতির পরিসমাপ্তি ঘটে। এই বিস্তৃতির ফল হইল আমুদরিয়া হইতে সুদান পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য। এই কৃতিত্ব বিশেষভাবে উল্লেখ-

যোগ্য। তবে বিশাল আকার ধারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে এই সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হইতে আরম্ভ করে। আব্বাসীরগণ ক্ষমতায় আসিবার সময় পর্যন্ত এই বিশাল সাম্রাজ্য বিভক্ত হইয়া যায়। এক শতাব্দীর মধ্যে ইহা আরও খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া যায়। যাহা পিছনে ফেলিয়া আসে তাহা একটি সংযুক্ত ইসলামী সাম্রাজ্যের স্বপ্ন মাত্র।

সপ্তম অধ্যায়

উমাইয়াদের সময় আভ্যন্তরীণ উন্নতি

প্রায় নিরবচ্ছিন্ন বিস্তৃতির যুদ্ধ এবং অগাধ যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বেদুইন গোত্রগুলিকে একাধারে ব্যস্ত ও সুখী রাখে। তবে অষ্টম শতাব্দীর মধ্য-ভাগ পর্যন্ত এইসব গোত্র তাহাদের তেজস্বিতা নিঃশেষ করিয়া ফেলে। তাহাদের একটি বড় অংশ নিজেদের অর্জিত সম্পদ উপভোগ করিবার জন্ত মরুভূমির পুরাতন আবাসভূমিতে ফিরিয়া যায়। অবশিষ্টাংশ বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন কোণে ছড়াইয়া পড়ে এবং বসতি এলাকার সাধারণ লোকজনদের সঙ্গে মিশিয়া যায়।

এতদসত্ত্বেও শাসক বংশ অনেকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হয়, অবশ্য এই-গুলির কোনটিই এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনসংক্রান্ত সমস্যা নহে। আরবগণ যেহেতু সাধারণভাবে কৃষিকার্যকে মর্যাদাহীন মনে করিত এবং আবাসিক জীবনের বিড়ম্বনার সঙ্গে সামান্ত সম্পর্ক রাখিত তাই মুয়াবিয়া' এবং তাহার উত্তরাধিকারীগণ শাসনকার্যের জন্ত বিজিত জাতিগুলির মধ্যে বিশেষতঃ পারস্তবাসী ও গ্রীকদের সাহায্য নিতে বাধ্য হন। উদা-হরণস্বরূপ বলা হইয়া থাকে যে, এই বংশের তিনজন কর্ম্মিৎকর্মা খলিফাদের মধ্যে খলিফা হিশাম (৭২৪—৭৪৩) সাসানীয় রাজাদের রাজনৈতিক কর্মপন্থা পাহলভী ভাষা (মধ্য পারস্ত) হইতে অনুবাদ করিয়া লন।

শাসন ব্যবস্থা

সাম্রাজ্য পাঁচটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল: (১) কুফা—যাহা ইরাক, ইরান, ও পূর্বাঞ্চলীয় এলাকার ঘাটি হিসাবে কাজ করে; (২) হিজাজ, আরব উপদ্বীপের জন্ত; (৩) জজিরা, সিরিয়া ও উত্তরাঞ্চলের জন্ত; (৪) মিসর এবং (৫) ইফরিকিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেনের জন্ত। প্রত্যেক প্রদেশে

একজন প্রতিনিধি থাকেন, যাঁহাকে 'আমীর' বা 'সাহেব' বলা হয় যিনি খলিফার দ্বারা নিযুক্ত হন। প্রদেশের সমস্ত কাজের কর্তৃত্ব থাকে প্রতিনিধির হাতে। তিনি বিভিন্ন এজেণ্ট ও বিচারক নিযুক্ত করেন এবং প্রদেশের রাজস্ব ও শাসনব্যবস্থার জন্য খলিফার নিকট দায়ী থাকেন। প্রদেশের উদ্বৃত্ত খাজনা তিনি রাজধানী দামেস্কে প্রেরণ করেন। খলিফা প্রায়ই তাঁহার নিজস্ব কর আদায়কারী প্রেরণ করেন, কিন্তু উমাইয়া খেলাফতের শেষের দিকে খলিফাগণ এত দুর্বল ছিলেন যে, রাজ-প্রতিনিধিগণই কার্যতঃ শাসক হইয়া যান। প্রতিনিধিগণ বিশাল ধন-সম্পদ আয়ত্ত করেন। একমাত্র প্রতি শুক্রবার জুম্মার খোতবায় খলিফার নাম বিশেষভাবে পাঠ করিবার মাধ্যমেই প্রকাশ পায় যে, তাঁহারা খলিফার অধীনস্থ লোক।

বিচারকগণ শুধু মুসলমানদের জন্য বিচারে বসেন। অমুসলিমগণের জন্য তাহাদের ধর্মীয় আইন অনুযায়ী পৃথক বিচারের ব্যবস্থা ছিল। বিচারকগণ ধর্মীয় দাতব্য প্রতিষ্ঠানসমূহ বা ওয়াক্‌ফও পরিচালনা করেন। এইসব প্রতিষ্ঠানে মুসলমানগণ অর্থ সাহায্য করেন। তাহা ছাড়া এতিমদের জায়গা-সম্পত্তিও তাঁহারা পরিচালনা করেন।

অনেক যুগ ধরিয়া উমাইয়াগণ বাইজাণ্টাইন ও পারস্য মুদ্রা ব্যবহার করে। যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যাইত বলিয়া তাহারা বোধহয় এই মুদ্রা ব্যবহার করিত। অধিকন্তু তাহারা যুদ্ধবিগ্রহে অতি ব্যস্ত থাকেন বলিয়া এইসব বিষয়ের প্রতি নজর দিতে পারেন নাই। প্রাথমিক খলিফাগণ নিশ্চয়ই ইসলামের ভাবমূর্তি ভঙ্গ করিতে এবং মুদ্রার উপর কোন ছাপ অঙ্কিত করিতে ইতস্ততঃ করেন। আবদ-আল-মালিকই (৬৮৫—৭০৫) প্রথম খলিফা যিনি নতুন মুদ্রা তৈয়ার করেন—যাহা তাঁহার নিজস্ব ছাপ এবং পবিত্র কোরানের বাণী বহন করে। সাসানীয় রাজা খসরু আনুশিরের রাজত্বকালে পারস্যে তুলনামূলকভাবে সরল করপ্রথা ছিল। সভাসদ, নাইট সম্প্রদায়, রাজলিপিকার এবং রাজার চাকর-বাকরের জন্য করপ্রথা রহিত ছিল। পূর্বোল্লিখিতগণ ছাড়া সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত লোককে মাথাপিছু একটি করিয়া কর প্রদান করিতে হইত। কৃষক ও ব্যবসায়ী তাহাদের আয়ের একটি নির্দিষ্ট শতাংশ নগদে বা দ্রব্য মূল্যে প্রদান করিত। প্রাথমিক খলিফাগণও এইভাবে পারস্যের করপ্রথার

একটি মুসলিম সংস্করণ চালু করেন। সাধারণতঃ পারস্যের অভিজাত শ্রেণীর ন্যায় আরব মুসলমানদিগকেও কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। অমুসলিমগণ অথবা 'মহাগ্রন্থের জাতিগুলি' নিয়মিত জিজিয়া কর প্রদান করে। কৃষকদের মর্যাদা, যাহারা উমাইয়াদের সময় ছিল প্রায় সম্পূর্ণভাবে অনারব (ওমর আরবদিগকে ভূমি ক্রয় করিতে বারণ করেন), মোটেই পরিবর্তিত হয় নাই। তাহারা সেই পারস্য বা বাইজান্টাইন এজেণ্টদের নিকট যে কর প্রদান করিত এখনও সেই একই কর প্রদান করে। ফলে আরবগণ এবং তদনুরূপ ইসলামও বাইজান্টাইন এবং পারস্য সাম্রাজ্যে প্রচলিত ভূমি ভোগ-দখলের শর্ত পরিবর্তন করে নাই এবং আধুনিক সময় পর্যন্ত ইহা মূলতঃ ঐরকমই থাকে।

তবে আরবগণ যেরূপ সহজ মনে করিয়াছিল জমি ভোগ-দখলের শর্ত অনুরূপ সহজ থাকে নাই। প্রথমতঃ আরবের বাহিরে আরবদের ভূমির মালিকানা নিষিদ্ধ করিবার আইনটি ছিল একাধারে অবাস্তব এবং অজনপ্রিয়। ওসমানের পরিবারস্থ লোকজন ভূমি ক্রয় করিতে আরম্ভ করিলে তিনি অন্যভাবে বিষয়টি চিন্তা করেন। এই নীতি এমন প্রবলভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকে যে উমাইয়াদের সময় আরবগণ শুধু নিজেরাই জমি ক্রয় করে নাই বরং সরকারের নিকট হইতে জনগণের জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে 'ইজারা' নেয়। নিজেরা আরব এবং মুসলমান বিধায় নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির জন্য তাহাদিগকে কোন কর প্রদান করিতে হইত না।

দ্বিতীয়তঃ প্রাথমিক যুগের আরব নেতৃবৃন্দ দুইটি সমস্যায় পতিত হয়। একটি হইল সমস্ত জাতীয়তা পরিহার করিয়া সমগ্র মুসলমানদিগকে এক সমাজভুক্ত করিবার ইসলামী দাবী এবং অপরটি হইল তাঁহাদের নিজস্ব জাতীয়তাবাদের অনুভূতির দাবী। তাঁহারা মনস্থির করিতে অপারগ হন যে সমস্ত মুসলমানদিগকে কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দিবেন, নাকি শুধু আরব মুসলমানদিগকে এই সুবিধা প্রদান করিবেন। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে ওমর অন্ধদেশহিতৈষণার পথ গ্রহণ করেন। প্রথম যুগের উমাইয়াগণ আরবগণের উচ্চ পদমর্যাদার নীতিতে বিশ্বাস করেন এবং তাহাদের জন্য বিশেষ সুযোগসুবিধা সংরক্ষণের চেষ্টা করেন। যতদিন অগ্রগামী মুসলিম বাহিনীগুলি রাজধানীতে লুণ্ঠিত সম্পদ প্রেরণ করিতে

থাকে ততদিন কে কর প্রদান করিল বা কে অব্যাহতি পাইল, তাহাতে কোন খোঁজখবর ছিল না। কিছু কিছু ত্যাগ করিবার মত যথেষ্ট সম্পদ শাসকশ্রেণীর নিকট তখন ছিল। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর প্রথম কয়েক দশকে বিত্ততি শিথিল হইয়া আসার ফলে অর্থনৈতিক অবস্থা স্থিতিশীলতায় পদার্পণ করিলে সরকার ইহার প্রতিক্রিয়া অনুভব করিতে আরম্ভ করে।

উমাইয়াদের মধ্যে অত্যন্ত ধার্মিক খলিফা দ্বিতীয় ওমর (৭১৭–৭২০) বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ তাঁহাকে খলিফা নিযুক্ত করিয়াছেন। একজন খলিফার প্রধান দায়িত্ব হইল জনগণকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা, কর আদায় করা নহে। ফলে তিনি সমস্ত মুসলমানদিগকে কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দান করেন। তবে জিজিয়া কর কিছু দিনের জন্য অপরিবর্তনীয় অবস্থায় থাকে। এই দোদুল্যমান অবস্থা অমুসলিম ও অনারব ভদ্রসম্প্রদায়কে একটি নিদারুণ অর্থনৈতিক অবস্থায় নিক্ষেপ করে কারণ তাহারা জানে না এক খলিফা হইতে অন্য খলিফার কর প্রথা কিরূপ হইবে। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিশেষতঃ ইরানে অসন্তোষ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়, যাহা উমাইয়াদের পতনে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

জীবন ও অবকাশ

'মরুভূমির কঠোর ও শুষ্ক জীবন হইতে বাহির হইয়া বাইজান্টাইন ও পারস্য নগর সমূহের কেন্দ্রের চাকচিক্য ও আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে আগমন, দারিদ্রের তাঁবু হইতে ভোগবিলাসের কোলে পতন; বিশাল সম্পদ এবং অনেক ক্রীতদাস-দাসীর মালিকানা—এই সমস্ত কিছু আরবদের আচার-ব্যবহার ও রীতিনীতিতে একটি ছাপ রাখিয়া যায়। এই সমৃদ্ধিশালী আরবদের চরিত্রগঠনের পথে হযরত মুহম্মদ (সঃ) এবং খোলাফায়ে রাশেদীন কর্তৃক অনুসৃত ইসলামের অনাড়ম্বর শিক্ষা ছিল অতি স্বল্প পরিসরময়। সুতরাং তাহারা এই সমস্ত গুণের প্রতি মৌখিক সৌজন্য প্রকাশ করিয়া নিজেদিগকে সন্তুষ্ট রাখেন এবং পুণ্যকাজের বাহ্যিক রীতিনীতি পালন করতঃ তাঁহারা নিজদিগকে সদ্য প্রাপ্ত সম্ভোগের সাথে গা ভাসাইয়া দেন। ওসমানও এই উত্তম জীবনের প্রতি অমনযোগী ছিলেন না। অতএব ওসমান হইতে আরম্ভ করিয়া উমাইয়া খলিফা এবং তাহাদের

প্রতিনিধিরা যেন দশম পোপ লিওর (১৫১৩—১৫২১) সেই প্রসিদ্ধ বাক্যটি পুনরাবৃত্ত করিতেছেন, যাহাতে বলা হইয়াছে, 'আল্লাহ আমাদিগকে এই সাম্রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, চল আমরা ইহা উপভোগ করি।'

আবুল ফারায় আল-ইসফাহানী (৮৯৭—৯৬৭) নিজেকে শেষ উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ানের বংশধর বলিয়া দাবী করেন। তিনি কিতাব আল-আঘানী (গানের গ্রন্থ) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটি 'সর্বাধিক বিক্রিত' পুস্তকের সম্মান লাভ করে। লেখক এই গ্রন্থ রচনায় যেরূপ আনন্দ লাভ করেন পাঠকগণও ইহা পাঠ করিতে অনুরূপ আনন্দ লাভ করেন। অতি পরিশ্রম করিয়া তিনি উমাইয়া ও আব্বাসীয় যুগের আরবদের বিভিন্ন ঘটনাবলী, গান, গল্প, কবিতা, খেলাধূলা, অবসর বিনোদন, কৌতুক ইত্যাদি বহু কিছু সংগ্রহ করেন যাহা শ্রোতাদিগকে আনন্দ দান করে। তিনি ছিলেন নৃতত্ত্ববিদ। সাহিত্য ও সঙ্গীত সংগ্রহকারী এবং একজন সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষক। বিখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন এই গ্রন্থকে 'আরবদের সামাজিক বিবরণ' বলিয়া বিবেচনা করেন।

খলিফা বা সেনাপতি যেই হউক না কেন, কেহই ইস্‌ফাহানীর নিরীক্ষা হইতে বাঁচিতে পারেন নাই। মুয়াবিয়া কিভাবে গল্প ও কবিতা শুনিয়া এবং গোলাপী শরবত পান করিয়া সন্ধ্যাবেলায় চিত্তবিনোদনে মগ্ন থাকিতেন তিনি তাহার চিত্র অঙ্কণ করেন। অন্যান্যদের মত খলিফাদের মদ্য পান করিবার অভ্যাসের কথাও বর্ণনা করেন। কথিত আছে যে, ইয়াজিদ প্রত্যহ; প্রথম ওয়ালিদ প্রত্যেক দিন; হিশাম প্রত্যেক শুক্রবার নামাজের পর, আবদ আল-মালিক মাসে একবার মদ্য পান করিতেন। দ্বিতীয় ওয়ালিদ, মদের জালায় সাঁতার কাটিতেন এবং প্রত্যেকবারে এক ঢোক পান করিতেন।

ধনী আরবগণ শিকার এবং ঘোড়দৌড় ভালবাসিতেন, কারণ উভয় খেলাই আরবদের দেশীয়। প্রথম ইয়াজিদের শিকারী কুকুর ছিল। এইগুলির পায়ে সোনালী বলয় ছিল এবং প্রত্যেক কুকুরের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এক একটি বিশেষ রক্ষক নিযুক্ত ছিল। অপেক্ষাকৃত কম ধনীগণ মোরগের লড়াই এবং পাশাখেলা উপভোগ করিতেন।

দাবাখেলা ভারতবর্ষ হইতে এবং অক্ষখেলা (Back garmen) ইরান

হইতে আরবে আসে। অক্ষখেলায় (ফার্সী, নার্দ, আরবী, তাওলা) আধুনিক আরবগণ পারস্যভাষায় গণনা করিতেন। পরে উভয় খেলাই ইউরোপে চালু করা হয়, যেখানে 'রুক' হইল ফার্সী রুখ্ (Rokh) এবং চেকমেট (cheakmate) হইল ফার্সী শাহ্‌মত (রাজা পরাজিত)। যেভাবেই হউক ফার্সী ফিল (হাতী) আরবী আল-ফীল এবং স্পেনীয় এলালফীল (elalfil) ইংরেজীতে বিশপ নাম ধারণ করে, আবার ফার্সী উজীর ইংরেজীতে কুইন নাম ধারণ করেন।

কিতাব আল-আঘানীর গ্রন্থকারের সরবরাহকৃত অতি চমৎকার তথ্য হইল পবিত্র নগরী মক্কা ও মদীনার অবসর বিনোদন, আমোদ-প্রমোদ ও পাপ-কার্যের কেন্দ্রস্থলে রূপান্তর লাভ। অতি মূল্যবান ভাতাপ্রাপ্ত আরবদের এক বিরাট অংশ জীবন উপভোগ করিবার জন্য আরবের মধ্য শহরে তাহাদের 'জন্মভূমিতে' যান। সেখানে থাকিত ক্লাব, মদ্যশালা, অপকীর্তির গৃহসমূহ ও চমৎকার সেলুন এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ হইতে আগত বেলীনৃত্য পরিবেশক, আদি সঙ্গীতজ্ঞ এবং গায়িকার দল। অসংখ্য ক্রীত-দাসী প্রভুদের সেবায় নিয়োজিত থাকিত। প্রভুরা কুশানে হেলান দিয়া রূপালী বা সোনালী পাত্র হইতে মদ পান করিত। এই সমস্ত অনুষ্ঠিত হইত কা'বা এবং রসুলের (সঃ) মাজারের অতি সন্নিকটে।

ইমাম হোসেনের কন্যা এবং রসুলের (সঃ) নাতনী সুকায়নার (অনারবদের সকিনা) ন্যায় মহিলার গৃহও মদিনার এক আকর্ষণীয় কেন্দ্র ছিল।* তাহার অনিন্দ্যসুন্দর রূপ অনেক স্বামীকে আকর্ষণ করে এবং সবাই তাঁহার ইচ্ছা ও মোহিনীশক্তির বশীভূত হয়। তাঁহার বুদ্ধিমত্তার ও বাস্তব কৌতুক ছিল

* মূলত: এই উক্তি ভিত্তিহীন। কিতাবুল আঘানী একটি রসাত্মক গ্রন্থ। এরূপ গ্রন্থের তথ্য ইতিহাসের তত্ত্ব হইতে পারে না। সৈয়দা সকিনার ব্যাপারে ঐতিহাসিক আমীর আলী বলেন: "প্রথম যুগের হাশেমীগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন শহীদে কারবালা হোসাইনের কন্যা আস-সৈয়দা সুকাইয়না বা সকিনা যাঁহাকে 'যশ, সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা ও সৎগুণাবলীর দিক দিয়া তাহার সমকালীন মহিলাদের মধ্যে সর্বপ্রথমা হিসাবে বিবেচনা করা হইত। তাঁহার বাসগৃহ ছিল কবি, ফকিহ্ (আইন শাস্ত্রবিদ), এবং সর্বস্তরের জ্ঞানী ও ধার্মিক লোকদের আশ্রয়স্থল। তাহার বাসগৃহের সভাগুলি ছিল প্রদীপ্ত ও প্রফুল্ল এবং সর্বদা তাঁহার বুদ্ধিমত্তায় প্রাণোজ্জ্বল"—আমীর আলী, হিস্টরী অব দি সারাসিন্‌স। পৃঃ ২০১-২০২ দ্রষ্টব্য —অনুবাদক।

শহরে আলোচনার বস্তু। তিনি ছিলেন সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক (এই পেশাকে রসুল (সঃ) নিষেধ করিয়াছেন) এবং ফ্যাসানের প্রবক্তা। তাঁহার কেশের বাহার সাম্রাজ্যের সমস্ত মহিলাদের জন্য অনুকরণীয় ছিল।

মক্কার নিকটবর্তী তায়েফের আকর্ষণ ছিল অন্যতম। সেখানে নবীর (সঃ) একজন অনুসারীর কন্যা' এবং প্রথম খলিফা আবুবকরের নাতনী আয়েশা বাস করিতেন। তিনি সুকাইয়নার ন্যায় অত বিবাহ করেন নাই কিন্তু স্বীয় সৌন্দর্য প্রদর্শন করিবার জন্য তিনি পর্দা দিতে অস্বীকার করেন।**

হাজার হাজার হজ্জযাত্রী এই দুই নগরীতে হজ্জের সময় আসিতেন এবং আরাম-আয়েশ উপভোগ করিতেন। অবশ্য এমন অনেকেও ছিলেন যাহারা এইগুলিকে অপছন্দ করিতেন।

খেলাফতের প্রতিদ্বন্দ্বী

চাকচিক্যময় অবসর বিনোদন ও পরম সুখের নীচে লুকায়িত থাকে সমস্যা। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে উমাইয়াগণ দুইটি প্রাথমিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। একটি হইল খেলাফতের উত্তরাধিকারের চিরন্তন প্রশ্ন। এই প্রশ্নে বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা গোলযোগের সৃষ্টি হয়। আলীর মৃত্যু এবং পরে মুয়াবিয়ার খেলাফতের গদীতে আরোহণের দ্বারা সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের মধ্যে এই সমস্যার সমাধান হইয়া যায় যে, একমাত্র কোরাইশ বংশের লোকেরাই এই উচ্চপদের আশা করিতে পারে। খারেজীদের মতানুসারে যে কোন লোক বংশ মর্যাদার সমর্থন ছাড়াই একমাত্র খাটি ধর্মীয় নৈতিকগুণাবলীর দ্বারা খলিফা হইবার উপযুক্ত—এই নীতি পরিত্যক্ত হয়। আইনানুগ পন্থীদের (legitimist) মতানুসারে খেলাফত একমাত্র আলীর বংশধরদেরই প্রাপ্য—এই যুক্তিবাদীদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা কোরাইশদের দাবী সমর্থনের মাধ্যমেও এই সমস্যার সমাধান হয় নাই কারণ কোরাইশদের মধ্যেও অনেক প্রতিদ্বন্দ্বী

** লেখক যে প্রকারের পর্দার কথা বলিতে চান সেরূপ পর্দা তখনও মুসলিম সমাজে চালু হয় নাই। মহিলাদের পৃথকভাবে থাকিবার প্রথা পারস্যে প্রচলিত ছিল অনেক প্রাচীনকাল হইতে। উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় ওয়ালিদের রাজত্বকালে মুসলমানদের মধ্যে ইহার প্রচলন হয়।—অনুবাদক।

বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহারা প্রত্যেকে নিজেকে সর্বোত্তম বিবেচনা করিতেন। কোরাইশ গোত্রগুলির মধ্যে যাহারা ক্ষমতার বাহিরে, তাহাদের বিবেচনায় ও খেলাফতের জন্য উমাইয়াগণ মোটেই উপযুক্ত নহেন। এই উমাইয়াগণই হযরত মুহম্মদকে (সঃ) মক্কা হইতে বহিষ্কার করেন, ইহারাই তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং ইঁহারাই ইসলাম গ্রহণ করেন শেষ অবলম্বন হিসাবে।

এইসব সমস্যার মধ্যে উমাইয়াদের সামনে আরেকটি সমস্যা দেখা দেয়, তাহা হইল স্থানীয় আরব গোত্রসমূহের বিদ্রোহ। ইসলামের প্রতি আনুগত্যের দ্বারা গোত্রপ্রীতি সাময়িকভাবে রহিত করা হইয়াছিল, যদিও ওসমানের মাধ্যমে পুনরায় ইহা মাথাচাড়া দিয়া উঠে এবং উমাইয়াদের সময় পুরাপুরিভাবে আত্মপ্রকাশ করে। নতুন সমাজ এই গোত্র-আনুগত্য উত্তর আরব ও দক্ষিণ আরবদের মধ্যে এক তিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বীতার রূপ গ্রহণ করে। উত্তর আরবদিগকে সাধারণতঃ কায়সীয় এবং দক্ষিণ আরবদিগকে সাধারণতঃ কালবীয় বা ইয়ামানীয় বলা হয়। এই দুই পক্ষের সংঘর্ষ হয় অতি দীর্ঘ ও তিক্ত যাহা উমাইয়া বংশের পতনের একটি কারণ হিসাবে পরিগণিত হয়। এই বংশের সুফীয়ানীগণ দক্ষিণ আরবদের সহায়তায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, পক্ষান্তরে প্রথম মারওয়ান তাঁহার আধিপত্য বিস্তার করেন উত্তর আরবদের সহায়তায়। পরবর্তী উমাইয়া খলিফাগণ তাঁহাদের মাতার বংশ অনুসারে উত্তর আরব বা দক্ষিণ আরবদের পৃষ্ঠপোষকতা করেন, ফলে তাঁহারা এক বিশাল সাম্রাজ্যের নেতা হইবার পরিবর্তে পারিবারিক কোন্দলের শিকারে পরিণত হন।

কন্যা ফাতিমার মাধ্যমে খেলাফতের মালিক রসুলের (সঃ) বংশধরগণ ও তাঁহার সমর্থকগণ এই দাবী আলীর মৃত্যুর পরও পরিত্যাগ করে নাই। ফলে হাসান ও হোসাইন উমাইয়া-প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্ভাব্য কেন্দ্রস্থলে পরিণত হন। জ্যৈষ্ঠভ্রাতা হাসান সাম্রাজ্যের দাবীর চাইতে হেরেম রক্ষা করিতে অধিক উদ্যোগী বলিয়া মনে হয়। তাই বার্ষিক এক লক্ষ দিরহাম ভাতা গ্রহণ করিয়া মদীনার নিকটবর্তী এক ভিলায় অবসর জীবন যাপন করিবার জন্য মুয়াবিয়া তাঁহাকে রাজী করাইতে সক্ষম হন। কথিত আছে যে, তিনি প্রায় একশত বিবাহ করিয়া তালাক দেন এবং যদ্বারা তিনি মিত্‌-লাক বা 'তালাকদানকারী' উপাধি অর্জন করেন। কথিত আছে যে, ৬৬৯

খ্রীস্টাব্দে সম্ভবতঃ অন্তঃপুরের কোন্দলে তাঁহাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হয়। তবে শীয়াগণ বিশ্বাস করে যে, মুয়াবিয়া তাঁহাকে হত্যা করিয়াছেন। এই হিসাবে তিনি একজন ইমাম ও শহীদ।

কনিষ্ঠভ্রাতা হোসাইন ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। পারস্য উপসাগরের উপরে অবস্থিত কুফা নগরীতে একত্রিত বিরোধী দলের তিনি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদান করেন। ৬৮০ খ্রীস্টাব্দে ইয়াজিদ খলিফা হইলে হোসাইন তাহাকে স্বীকৃতি প্রদান করিতে অস্বীকার করেন এবং গোপনে মদীনা ত্যাগ করিয়া কুফায় তাঁহার অনুসারীদের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এইসব অনুসারীগণ ইতিমধ্যে ইয়াজিদকে খলিফা বলিয়া স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে। হোসাইনের দুর্ভাগ্য, ষড়যন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং তাঁহার পরিবারপরিজনের ক্ষুদ্র দলটি আধুনিক বাগদাদের দক্ষিণে কারবালা নামক এক মরুস্থানে হঠাৎ আক্রান্ত হয়। তথায় প্রায় সমস্ত পুরুষদিগকে হত্যা করা হয়; হোসাইনের শিরচ্ছেদ করা হয়; মহিলা ও ছেলেমেয়েদেরকে বন্দী করা হয়।

খেলাফত লাভ করিবার জন্য আলীর সমর্থকদের বিভিন্ন অকৃতকার্য রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে ইহাই সর্বশেষ। কারবালার ঘটনাকে অন্য যে কোন অবস্থায় খুব সম্ভবতঃ আরেকটি রাজনৈতিক ব্যর্থতা হিসাবে চিহ্নিত করা হইত। বস্তুতঃ সে সময় এই ঘটনাটি তেমন কোন চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে নাই। তবে ইসলামের পরবর্তী ইতিহাসে কারবালার এই হঠাৎ আক্রমণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করে। মৃত আলী ও হোসাইন প্রতিষ্ঠিত খেলাফতের নিকট তাঁহাদের জীবিত সত্ত্বার চাইতে সমধিক ভয়াবহ শত্রু হিসাবে প্রতীয়মান হন। হোসাইন শহীদদের নেতায় পরিণত হন এবং দশই মুহররম (৬৮০) তাঁহার মৃত্যুবার্ষিকী খেলাফতের বিরোধীদের মহাসম্মেলনের উপলক্ষে পরিণত হয়। এই ঘটনা উপলক্ষে আয়োজিত ধর্মীয় শোভাযাত্রা মেসোপটেমিয়ার দেবতা তাম্‌মুজ (Tammuz)-এর মৃত্যু উপলক্ষে আয়োজিত শোভাযাত্রা ও আত্মহত্যাকে স্মরণ করাইয়া দেয়। একটি আন্দোলন ও তিনটি শহীদ লইয়া আলীর সমর্থকগণ ইসলামের মূলকেন্দ্র হইতে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করতঃ আদর্শ ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন সম্বলিত একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক সম্প্রদায় গঠন করে।

আলীর বংশ খেলাফতের একমাত্র দাবীদার নহে। স্মরণ রাখিতে হইবে যে আলীর সঙ্গে খেলাফত লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন জুবায়ের। তিনি এই প্রচেষ্টায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁহার পুত্র আবদুল্লাহ (হযরত মুহম্মদের (সঃ) স্ত্রী আয়েশার ভ্রাতুষ্পুত্র) প্রথমে হোসাইনের পক্ষ অবলম্বন করেন। হোসাইনের বিয়োগান্ত মৃত্যুর পর তিনি নিজেই খেলাফত দাবী করেন।

৬৮৩ খ্রীস্টাব্দে আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে ইয়াজিদ মদীনা ও মক্কায় একটি অভিযান প্রেরণ করেন। এই দুই শহরে আবদুল্লাহর শক্তিশালী সমর্থক ছিল। মক্কা অবরোধ করিয়া বোমা* বর্ষণ করা হয়, ফলে কা'বা ভস্মীভূত হয় এবং কৃষ্ণপাথর ভাঙ্গিয়া তিন টুকরা হইয়া যায়। ইতিমধ্যে ইয়াজিদ মারা যান এবং অভিযান কোন সফলতা লাভ করিতে ব্যর্থ হয়। হেজাজ, ইরাক ও মিসরে আবদুল্লাহ খলিফা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। রক্তক্ষয়ী বিবাদে পরিশ্রান্ত জনসাধারণের নিকট আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের ছিলেন জনসমর্থনহীন উমাইয়াগণ ও চরমপন্থী আলীর বংশের মধ্যে সমঝোতার মাধ্যম। অধিকন্তু ইয়াজিদের মৃত্যুর পর উমাইয়াদের মধ্যে গৃহবিবাদ আরম্ভ হয়। আবদুল্লাহ তাঁহার রাজধানী মক্কা হইতে দামেস্কে স্থানান্তর করিতে রাজী হইলে তিনি সিরিয়াতেও জনস্বীকৃতি লাভ করিতেন। তবে তিনি মুসলমানদের যে দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাহা মক্কা ও মদীনাকে ইসলামের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কেন্দ্র হিসাবে দেখিতে চান বলিয়া দামেস্কের ন্যায় একটি অনারব শহরে রাজধানী স্থানান্তর করিতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না।

ইতিমধ্যে উমাইয়াদের মারওয়ানী শাখার প্রতিষ্ঠাতা মারওয়ান দক্ষিণ আরবদের সমর্থন লাভ করিয়া দামেস্কে ক্ষমতায় আসেন এবং উত্তর আরবদিগকে পরাজিত করেন। এই উত্তর আরব অধিবাসীরা ৬৮৪ খ্রীস্টাব্দে মারয্ রাবিত নামক স্থানে আবদুল্লাহকে সমর্থন করিয়াছিল। তবে আবদুল্লাহ ৬৯২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত হেজাজে খলিফা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। অতঃপর দুষ্টমতি হাজ্জাজ মক্কার দ্বিতীয় অবরোধের সময় তাহাকে পরাজিত করেন। হাজ্জাজ আবদুল্লাহর মস্তক দামেস্কে প্রেরণ করেন। আবদুল্লাহর মৃত্যুর

* বোমা বর্ষণ বলিতে পাথুরে বোমাকে বুঝায়। ইহা মানজানিক নামক এক প্রকার হাতিয়ার হইতে নিক্ষেপ করা হয়।—অনুবাদক।

সাথে মুসলমানদের পুরাতন-পন্থীদের প্রভাব শেষ হয় এবং তদ্সঙ্গে 'ইসলামের জন্মভূমি' আরব উপদ্বীপের প্রভাবও সমাপ্ত হয়।

আরব বনাম অনারব মুসলমান

নবগঠিত সাম্রাজ্যের মুসলিম সমাজের সর্বনিম্নে বিরাজ করে ক্রীতদাসগণ —সাদা, কাল ও হলদে। এইসব ক্রীতদাসগুলিকে তুর্কীস্তান হইতে মধ্য আফ্রিকা এবং ইরান হইতে স্পেন ও ফ্রান্সের বিস্তৃত ভূ-খণ্ড হইতে আনা' হয়। ইসলাম দাসপ্রথা বিলুপ্ত করে নাই। ইসলামী আইনে যদিও অন্য একজন মুসলমানকে দাস করা নিষেধ কিন্তু কার্যতঃ যেসব ক্রীতদাস ইসলাম গ্রহণ করে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয় না। ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক উল্লেখিত ক্রীতদাসদের সংখ্যা হইতে বিচার করিয়া কিছু বাড়াবাড়ি বাদ দিলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে যে, মুসলমান সমাজ কিয়দংশে দাস অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল ছিল। সেনাবাহিনীতে একজন ভাড়াটিয়া সৈন্যের পরিচর্চার জন্যও ক্রীতদাস রাখা হইত বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

দাস ব্যবসা ছিল বেশ সচল ও লাভজনক। ইহা উনবিংশ শতাব্দী এবং আরবের কোন কোন অংশে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। মুসলমানগণ ও ক্রীতদাসদের মধ্যে আইনসম্মত বিবাহ নিষিদ্ধ কিন্তু উপপত্নী রাখার অনুমতি রহিয়াছে এবং ইহা অত্যন্ত জনপ্রিয়। এইসব ক্ষেত্রে জন্মলাভ করা ছেলেমেয়ের মালিক হয় প্রভু এবং এইগুলিকে স্বাধীন বিবেচনা করা হয়। তবে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, দাস মুক্ত করাকে ইসলামে পরবর্তী জীবনে পুরস্কারের জন্য পুণ্যের কাজ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। ধার্মিক লোকগণ প্রায়ই তাঁহাদের ক্রীতদাস মুক্ত করিতেন।

ক্রীতদাসদের পর উপরের সারিতে থাকে জিম্মিগণ বা ঐশী বাণী প্রাপ্ত ধর্মগুলির সদস্যবৃন্দ যথা ইহুদী, খ্রীস্টান ও সাবিয়ান। ইহাদের সম্পর্কে কোরান শরীফের প্রথম দিকে উল্লেখ রহিয়াছে। পরে আরব নেতৃবৃন্দ দেখিলেন 'মহাগ্রন্থের অধিকারী' নয় এরূপ সবাইকে হত্যা করা সম্ভব নহে। তাই তাঁহারা ইরানের জরথুস্ত্র এবং উত্তর আফ্রিকার বার্বারদিগকেও 'মহাগ্রন্থের অধিকারী'দের সুযোগ দান করেন। একজন জিম্মিকে যেহেতু মুসলিম

সেনাবাহিনীতে যোগদান করিতে দেওয়া হয় না কারণ সেনাবাহিনী ইসলাম প্রচারের জন্য যুদ্ধ করে, তাই জিজিয়া কর প্রদান করে। জিম্মিকে তাহার নিজস্ব ধর্মীয় বিচারালয়ে বিচার করা হয় এবং স্বীয় ধর্ম পালন করিতে দেওয়া হয়। কোন কোন সময় জিম্মিকে উচ্চপদেও নিয়োগ করা হয়। কিন্তু ঐগুলি নিয়ম নহে, ব্যতিক্রম মাত্র। তবে সাধারণতঃ অমুসলিম হইল তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক, যাহার কাপড়-চোপড়, কেশ বিন্যাস, ঘোড়ায় চড়ার পদ্ধতি এবং সরকারী অফিসে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ থাকে। মুসলিম বিচারালয়ে তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয় না। দ্বিতীয় ওমরের ন্যায় ধার্মিক খলিফাগণও অত্যন্ত কঠোর আইন-কানুন চাপাইয়া দিয়া এমন কি, অত্যাচার করিয়া জিম্মিদের ধর্মান্তর করিতে চেষ্টা করেন। কালক্রমে এইসব অপমান হইতে পরিত্রাণের আশায় অনেক লোক মুসলমান হইয়া যায়।

জিম্মিদের উপরের সারিতে থাকে অনারব মুসলমানগণ—যাহাদিগকে মাওয়ালি বা বন্ধু বলা হয়। এই সারির লোক এবং আরব মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান মর্যাদাই আসলে যত অসন্তোষ এবং বিদ্রোহের কারণ। অনারব মুসলমানদের প্রথম ধাক্কা নামিয়া আসে পারস্যবাসীদের উপর, কারণ মাওয়ালীদের মধ্যে তাহারা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী। অনারবের আরবী শব্দ আজম। ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক ব্যবহৃত 'আজমী' দ্বারা প্রায় সর্বস্থলেই একজন পারস্যবাসীকে বুঝায়। আরবদের মধ্যে ইরানের আরেক নাম 'আজমদের দেশ' বলে প্রচলিত, যাহা আজও ব্যবহৃত হয়।

স্বীয় বিশ্বাসে, জোরজবরদস্তিতে বা প্রয়োজনে ইসলামে গ্রহণকারী এইসব লোক স্বভাবতঃই পবিত্র কোরানের সমাজ শ্রেণীমূলক বক্তব্যের উপর বেশী আস্থা স্থাপন করিয়াছিল। অপরদিকে আরবগণ প্রথম ওমরের নেতৃত্বে পবিত্র কোরানকে আরও সীমাবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী হইতে ব্যাখ্যা করিতে থাকে। উমাইয়া সমাজের ভিত্তি ছিল আরবদের আধিপত্যের উপর। তাই নতুন ধনাঢ্যগণ নবদীক্ষিতদের সহিত তাহাদের নতুন সুবিধাদি ভাগাভাগি করিতে মোটেই রাজী ছিল না। আরবগণ সামরিক ব্যাপার ব্যতীত কোন কিছুই নবদীক্ষিতদের সহায়তা ছাড়া পরিচালনা করিতে পারিত না— এই ধারণা তাহাদের মধ্যে একটি হীনমন্যতার সৃষ্টি করে। এই হীনমন্যতাকে

তাহারা আরব জাতীয় প্রাধান্ত যারা পোষাইয়া লইতে এবং বিজিত লোক-দের উপর চাপাইয়া দিতে চেষ্টা করে। অনারবদের উপর বিরাট করের বোঝা চাপাইয়া দেওয়া হয়। আরবদের সঙ্গে তাহাদের বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়। অনেক উপায়ে তাহাদিগকে অপমানিত করা হয় এবং তাহা-দিগকে আরবদের 'মক্কেল' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে সবচাইতে অন্ধ দেশহিতৈষী ছিলেন বোধ-হয় আবদ আল-মালিক. যিনি তাঁহার ভৃত্য ইরানের শাসনকর্তা হাজ্জাজের প্রত্যক্ষ সহায়তায় আদেশ জারী করেন যে, অতঃপর শাসনকার্যের সমস্ত নথিপত্র পারস্ত ও গ্রীক ভাষার পরিবর্তে আরবীতে লিখিতে হইবে। তিনি আরবী অক্ষরযুক্ত নতুন মুদ্রা চালু করেন এবং জনসাধারণকে চিঠিপত্র আরবী ভাষায় লিখিতে বাধ্য করেন। কথিত আছে যে, পারস্ত ভাষায় লিখিবার অপরাধে হাজ্জাজ হাজার হাজার লোককে হত্যা করেন। আঘানীতে আমরা দেখি, কোন পারস্তবাসী তাহার নিজস্ব দেশের প্রশংসা করিলে খলিফা তাহার উপর অত্যাচার করেন। হিষ্ট্রি অব বোখারার গ্রন্থকার বর্ণনা করেন, যেসব পারস্তবাসী আরবীভাষায় নামাজ পড়িবার জন্ত অতি অল্প আরবী জানিত তাহাদিগকে এক লাইনে দাঁড় করাইয়া নামাজের শব্দ-গুলি একজন আরবকে দিয়া উচ্চারণ করানো হইত। ইহাতে এই ইঙ্গিত বহন করে যে প্রাথমিক যুগে নবদীক্ষিতদিগকে তাহাদের নিজস্ব ভাষায় নামাজ পড়িতে দেওয়া হইত।

অবশ্য এইসব অপমানে সমস্ত মাওয়ালী, বিশেষতঃ পারস্তবাসীগণ খুবই বিক্ষুব্ধ হয়। ফলে উমাইয়াদের বিরুদ্ধে যেকোন আন্দোলনকে সে শীয়া হউক, বা খারেজী বা যাহাই হউক না কেন, তাহারা সমর্থন জ্ঞাপন করে। হাজ্জাজের কঠোর হস্ত কয়েক বৎসরের জন্ত শান্তিরক্ষা করিলেও পরিণামে উমাইয়া বংশ অনেক সমস্তার সম্মুখীন হয়।

৭৪০ খ্রীস্টাব্দের দিকে নবীর সং, চাচা আব্বাসের বংশধর আব্বাসীয় খেলাফতে তাহাদের অধিকার দাবী করে। শীঘ্রই শীয়া, পারস্তবাসী এবং অন্তান্ত যাহারা কোন না কোন কারণে উমাইয়াদের প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল তাহারা সবাই আব্বাসীয় পতাকাতলে সমবেত হয়। ৭৪৭ খ্রীস্টাব্দে খ্যাতনামা পারস্ত যুবক আবু মুসলিম খোরাসানী আব্বাসীয়দের কৃষ্ণপতাকা

উত্তোলন করেন। রসুলুল্লাহর (সঃ) পতাকার রঙও ছিল কৃষ্ণবর্ণ। পারস্য-বাসীদের দ্বারা গঠিত একটি সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে খোরাসানী, খোরাসানের রাজধানী মার্ভ অধিকার করেন। দুই বৎসর পর ইরাক অধিকার করা হয় এবং ৭৪৯ খ্রীস্টাব্দে ৩০শে অক্টোবর বৃহস্পতিবার আব্বাসের তৃতীয় দৌহিত্র আবুল আব্বাসকে কুফায় খলিফা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। শেষ উমাইয়া খলিফা দ্বিতীয় মারওয়ান ৭৫০ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে জাব নদীর তীরে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধে মিলিত হন এবং শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। ঐ বৎসর এপ্রিল মাসে দামেস্কের পতন হয়।

উমাইয়া বংশের সদস্যবৃন্দ এবং তাহাদের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদিগকে খুঁজিয়া বাহির করতঃ হত্যা করা হয়। তবে অন্ততঃ একজন যুবরাজ, হিশামের দৌহিত্র আবদ-আল-রহমান পালাইয়া যান এবং অনেক লোমহর্ষক অভিজ্ঞতার পর স্পেনে উপনীত হন। এখানে করডোবায় রাজধানী স্থাপন করিয়া তিনি স্পেনে উমাইয়া খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন।

আব্বাসীয়দের ক্ষমতাদখল এক নবযুগের সূচনা করে। প্রথম ওমরের সম্মিলিত আরব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার স্বপ্ন ব্যর্থ হয়। আব্বাসীয়দের জয় লাভের ফলে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়। ক্ষমতার ভারসাম্য সিরিয়া হইতে ইরানে চলিয়া যায়। নতুন রাজধানী হয় ইরানের সীমান্তে অবস্থিত কুফায়। অনারবগণ স্বাধীনতার স্বাদ লাভ করে এবং নতুন সরকারে পারস্যবাসীগণ প্রধান প্রধান পদ অধিকার করে। আরব আধিপত্যের ভাবধারা আরবদের সহিত মরুভূমিতে চলিয়া যায় এবং বিংশ শতাব্দীর আরও ব্যাপক 'প্যান-আরব' ভূমিকার পূর্বে ইহা আর শোনা যায় নাই। আরবগণ চলিয়া গেলেও ইসলাম রহিয়া গেল এবং ইসলামের ছদ্মবেশে অনেক ভাবধারা ও কর্মপদ্ধতির অগ্রগতি চলিতে থাকে এবং ইহা কখনও পারস্য, কখনও ওসমানীয় এবং কখনও ভারতীয়।

অষ্টম অধ্যায়

আব্বাসীয় সরকার ও সমাজ

আব্বাসীয় খেলাফতের ইতিহাসকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমটি ৭৫০ খ্রীস্টাব্দ হইতে ৮৪২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং দ্বিতীয়টি ৮৪২ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১২৫৮ খ্রীস্টাব্দে মোঙ্গল হালাকু কর্তৃক বাগদাদ ধ্বংস পর্যন্ত। আব্বাসীয় শাখায় সর্বশ্রেষ্ঠদের মধ্যে দুইজন হারুণ-আল-রশীদ ও মামুন প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত। অন্য ছয়জন খলিফা রশীদ ও মামুনের ন্যায় তেমন বিখ্যাত না হইলেও তাঁহাদের সাম্রাজ্যের ভাগ্যনিয়ন্তা ছিলেন এবং রাষ্ট্রের কার্যাবলীতে স্ব স্ব কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ক্ষমতার দিক হইতে মূলতঃ আব্বাসীয় বংশ ৮৪২ খ্রীস্টাব্দে শেষ হয়। ইহার পর খলিফাগণ নামে মাত্র ক্ষমতায় ছিলেন, যাহাদের সাম্রাজ্যের উপর কোন আধিপত্য ছিল না এবং প্রাসাদের উপরও কোন কর্তৃত্ব ছিল না। এই সমস্ত খলিফাদের মধ্যে অনেকে এমন অধঃপতিত ছিলেন যে, রাজধানী বাগদাদ নগরীতেও তাঁহারা শক্তিশালী ওমরাদের হাতে প্রায় বন্দী দশায় বসবাস করিতেন। এই সব ক্ষমতাবান লোক কিছু কিছু পারস্যবাসী ছিল, কিন্তু অধিকাংশই ছিল তুর্কী, যাঁহারা ইচ্ছা অনুযায়ী খলিফাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করিত কিংবা সিংহাসনে বসাইত এবং জীবনের প্রত্যেক কর্মই তাঁহাদের আদেশানুযায়ী করান হইত। বাগদাদের বাহিরে এবং রাজধানীর আরও দূরে সাম্রাজ্য এমনভাবে বিভক্ত ছিল যে কখনও কখনও দুর্বল খলিফাগণ তো দূরের কথা, খলিফাদের শাসনকারী ক্ষমতাবান লোকদেরও কোন আধিপত্য থাকিত না। ঐ সমস্ত জায়গায় বাগদাদের পূর্ব ও পশ্চিমে অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল—সেইগুলি খলিফাদের অবস্থিতির প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রের ন্যায় কাজ করিতেছিল।

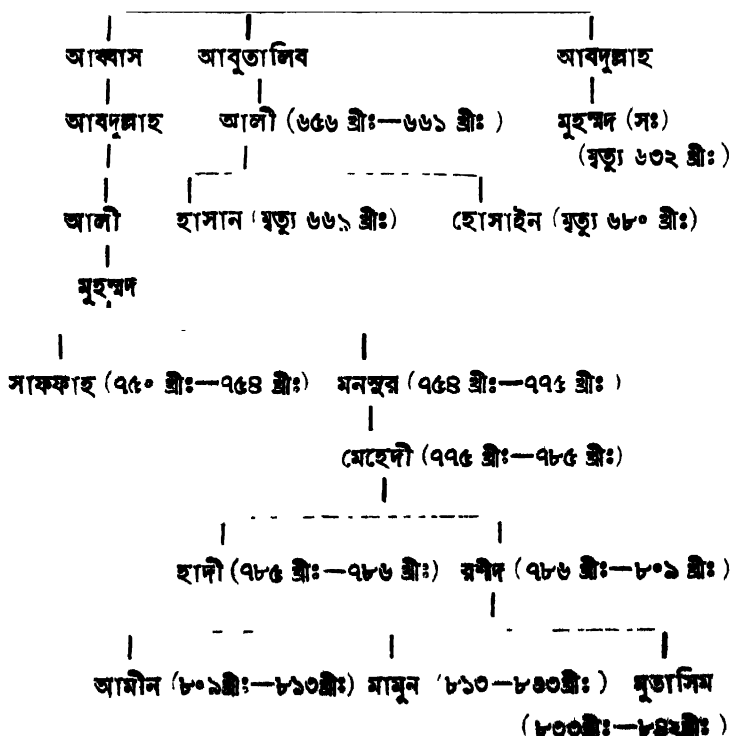
খলিফা হিসাবে নাম ঘোষণা হইবার পর আবুল আব্বাস কুফার

মসজিদে একটি উদ্বোধনী বক্তৃতা প্রদান করেন এবং সেই অনুষ্ঠানে তিনি আল-সাফ্‌ফাহ উপাধি ধারণ করেন, যাহার সর্বজন স্বীকৃত অনুবাদ হইল 'রক্তপত্র'। ইহার দ্বারা তিনি দুইটি রীতির সূচনা করেন। পরবর্তী প্রত্যেক আব্বাসীয় খলিফাও এক একটি উপাধি ধারণ করেন যথা মনসুর, মেহেদী, রশীদ প্রভৃতি। বস্তুতঃ খলিফাগণ তাঁহাদের উপাধি দ্বারাই প্রধানতঃ পরিচিত। দ্বিতীয় রীতি হইল এই যে, খলিফার পার্শ্বে জল্লাদের দণ্ডায়মান থাকা।

প্রাথমিক আব্বাসীয়গণ এবং হযরত মুহম্মদ (সঃ) ও কোরাইশ বংশের সহিত তাঁহাদের সম্পর্ক

হাশিম [কোরাইশ বংশের হাশেমীয় শাখার পূর্বপুরুষগণ]

আবদ-আল-মুত্তালিব



রাখিতে হইবে যে, আব্বাসীয়গণ মূলতঃ ক্ষমতায় আসেন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড দল যথা শীয়া, খারেজী রক্ষণশীল ধর্মপন্থী, পারস্যবাসীর এবং অন্যান্যদের বিক্ষোভকে ব্যবহার করিয়া। প্রত্যেক দলের নিকট আব্বাসীয়গণ ন্যায্য কাজের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন, ফলে প্রত্যেক দল স্ব স্ব উদ্দেশ্য হাসিল করিবার জন্য তাহাদিগকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিতে সাহায্য করে। ঝুঁকি ছিল প্রবল, কিন্তু তাহাদের পদক্ষেপে কোন বাধাই রাখা হয় নাই।

নতুন খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সাফফাহ এবং আব্বাসীয় বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বিবেচনাহীন মনসুর উমাইয়া বিরোধীদের হাত হইতে নিজদিগকে মুক্ত করিতে সচেষ্ট হন। এক অভিনব পদ্ধতিতে তাহারা এক দল হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য অন্য কোন দলের পক্ষাবলম্বন করেন। আব্বাসীয়দের এই সমস্ত বন্ধুদের শেষ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হইলেন প্রসিদ্ধ আবু মুসলিম খোরাসানী। এই উল্লেখযোগ্য পারস্যবাসীর প্রকৃত নাম বেহরাদান। বাহ্যতঃ তিনি মুসলমান কিন্তু জরথুস্ত্র হিসাবে তাঁহাকে অভিযুক্ত করা হয়। যাহাই হউক, তিনি আব্বাসীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের পক্ষাবলম্বনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তাই তাহাদের কৃষ্ণ পতাকা উত্তোলন করেন। তাঁহার সৈন্যগণ কালো উর্দী পরিধান করে বলিয়া ব্ল্যাক-শার্ট হিসাবে পরিচিত হয়। ঐতিহাসিকগণ একমত যে, সফলতার জন্য আব্বাসীয়গণ আবু মুসলিম ও তাঁহার পারস্য সৈন্যদের নিকট অনেকাংশে ঋণী। খুব সম্ভবতঃ আব্বাসীয়দের দ্বারা উমাইয়াদিগকে ধ্বংস করিবার পর তিনি তাহাদের কবল মুক্ত হইতে চাহেন। মোটামুটিভাবে আব্বাসীয়দেরও অনুরূপ একটি পরিকল্পনা ছিল। উমাইয়াদিগকে পরাজিত করিবার জন্য আবু মুসলিমকে ব্যবহার করিয়া তাহারাও তাঁহার কবল মুক্ত হইতে চাহেন। স্বীয় পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য আব্বাসীয়গণ অপেক্ষাকৃত দ্রুততার সহিত অগ্রসর হয়। ৭৫৪ খ্রীস্টাব্দে মনসুর তাঁহার প্রাসাদে আবু মুসলিমকে এক ভোজে নিমন্ত্রণ করেন এবং সেইখানে তাঁহাকে হত্যা করেন। এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিক্রিয়া ইরানে বিশেষতঃ খোরাসানে এমন প্রবলভাবে দেখা দেয় যে, ইহা দমন করিবার জন্য আব্বাসীয়দের প্রায় এক শতাব্দী সময় লাগে।

আব্বাসীয়গণ কর্তৃক রক্ষণশীল জনসাধারণের সমর্থন লাভের এক গুরুত্বপূর্ণ কারণ হইল উমাইয়াদের তথাকথিত ধর্ম বিমুখতা। উমাইয়াদের পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে আব্বাসীয়গণ একটি খাঁটি ধর্মীয় রাষ্ট্র গঠনের প্রতিশ্রুতি দান করে। এই প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য তাঁহারা অগ্রসর হন। সঠিকভাবে বলিতে গেলে, আব্বাসীয়গণ তাঁহাদের উমাইয়া সমগোত্রীয়দের চাইতে কোন অংশে কম জাগতিক ছিলেন না, তবে তাঁহারা ধার্মিকতার ভাণ করিতে জানিতেন। তাঁহারা ধর্মীয় নেতাদের মতামতকে সম্মান প্রদর্শন করেন, জনসাধারণের উপর ইসলাম চাপাইয়া দেন, নিজেরা ধর্ম মতাবলম্বী হন এবং ইসলামে সর্ব প্রথম তাঁহারাই একটি অনুসন্ধিৎসু সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ধার্মিকতার প্রতীক হিসাবে আব্বাসীয় খলিফাগণ কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে এবং জুমআর নামাজে রসুলুল্লাহর (সঃ) জামা পরিধান করিতেন। আব্বাসীয় খলিফাগণ রাজনৈতিকভাবে যতই দুর্বল হউন না কেন, ধর্মীয় ভাণে তাঁহারা গোঁড়া ধার্মিকতার লক্ষণ হিসাবে মুতাসিম হইতে আরম্ভ করিয়া অন্যান্য খলিফাগণ তাঁহাদের নামের শেষে আল্লাহ শব্দ যুক্ত করেন, যথা আল-মুতাসিম বি-আল্লাহ (বিল্লাহ উচ্চারিত)।

উমাইয়াদের ক্ষমতা আব্বাসীয়দের নিকট হস্তান্তরের সময় ইরানের গ্রামাঞ্চলে জনসাধারণের এক বিরাট অংশ তখনও অমুসলিম ছিল। উমাইয়াগণ আরব প্রাধান্যে বিশ্বাস করেন এবং তাঁহাদের নীতি উচ্চ শ্রেণীর পারস্যবাসীদের স্বার্থের সংঘাতে পতিত হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে কিছু ব্যতিক্রমও ছিল। মোটামুটিভাবে জনসাধারণ ছিল বিচ্ছিন্ন। তবে, আব্বাসীয়গণ আরব প্রাধান্য পরিত্যাগ করিয়া ধর্মের উপর জোর দেন। এবং জনসাধারণের উপর ইহা চাপাইয়া দিতে আরম্ভ করেন। যেসমস্ত দল আব্বাসীয়দিগকে ক্ষমতায় আসিতে সহায়তা করিয়াছিল তাহারা তাহাঁদের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়া সবাই প্রতিষ্ঠিত-সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করিতে থাকে। এইসব দলের মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালী এবং সংখ্যাগুরু ছিল পারস্যবাসীগণ—যাহারা উমাইয়াদের ন্যায় আব্বাসীয়দেরও বিরুদ্ধ দলে পরিণত হয়। পারস্য বিরোধিতার রূপ তিনটি—ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক। কিন্তু তাহাদের কেন্দ্রীয় উদ্দেশ্য অপরিবর্তনীয় থাকে, তাহা হইল, আরব শাসন হইতে মুক্তি লাভ।

পারস্য বিরোধিতার প্রথমরূপ হইল ধর্মীয়। অব্বাসীয়দের ধর্মনীতি যেহেতু জনসাধারণের জীবন ও আচার ব্যবহার পদ্ধতিকে বিচলিত করিয়া তোলে, তাই সাধারণ মানুষ তাহাদের একমাত্র উপকরণ লইয়া ইহার প্রতিবাদ করে। তাহারা বিভিন্ন ধর্মীয় বিদ্রোহে লিপ্ত হয়। আবু মুসলিমের হত্যার পর মাগীয় ধর্মাবলম্বী সিন্‌বাদ নামক তাঁহার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ৭৫৫ খ্রীস্টাব্দে কা'বা ধ্বংস করিতে অগ্রসর হন। অতি স্বল্প আয়াসে খলিফা, তাঁহাকে ধ্বংস করেন। তবে ৭৬৭ সালে অসতাডসিস (Ostadsis) নামক আরেকজন নিজেকে নবী বলিয়া দাবী করেন এবং আবু মুসলিমের পুনরাবির্ভাব বলিয়া ঘোষণা করেন। অসতাডসিসের পর আরও একজন নবীর উদয় হয়। তাহাদের সবাই হতাশাগ্রস্থ ও ক্রুদ্ধ জনসাধারণের মধ্যে ত্বরিৎ সমর্থক লাভ করে বলিয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে অনেকগুলি সশস্ত্র বিদ্রোহ পরিচালনা করিতে সক্ষম হয়। নবীদের মধ্যে সবচাইতে প্রসিদ্ধ ছিলেন মুকান্না বা খোরাসানের পর্দাবৃত নবী যিনি ৭৭৬ সালে খলিফার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তাঁহার সহস্রাধিক অনুসারী সাদা বস্ত্র পরিধান করিত এবং তাহাদিগকে 'শ্বেত-জামা' বলা হইত। তাহাদের কাজ ছিল কাফেলা লুঠ, মসজিদ ধ্বংস এবং যাহারা আজান দেয় বা আজানের জবাব দেয় তাহাদিগকে হত্যা করা। মুকান্না দাবী করেন যে, আবু মুসলিম একজন দেবতা ছিলেন এবং তাঁহার মধ্যে পুনরাবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহার বিদ্রোহ এমন ধ্বংসাত্মক ছিল যে, খলিফা মেহদীকে তাঁহার বিরুদ্ধে অনেকগুলি অভিযান প্রেরণ করিতে হয়। প্রায় মুসলিম ঐতিহাসিক পর্দাবৃত নবীর উপর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা আলোচনা করেন।[১]

পর্দাবৃত নবীর বিদ্রোহকে অদ্ভুত ও বিভ্রান্তিকর ধরা হইলেও বাবক খোররামদীনের বিদ্রোহ ছিল সুবিস্তৃত ও ভয়াবহ। আবু মুসলিমের হত্যার

১। মিশৌরীর সেন্টলুই ও কেনসাস সিটিতে "দি বেইলড্ প্রফেট অব খোরাসান" (খোরাসানের পর্দাবৃত নবী) নামে একটি ভ্রাতৃবৎ সংগঠন আছে, তাহারা বিশ্বাস করে যে, "পর্দাবৃত নবী" ছিলেন খোরাসানের নেভার, নেভারল্যাণ্ডের পৌরাণিক ব্যক্তি। বোধহয় এই প্রতিষ্ঠান ইহার নামকরণ করিয়াছে টমাস মুরের "লাল রুখ" কাহিনী হইতে যাহার নায়ক খোরাসানের পর্দাবৃত নবী।

ষাট বৎসর পরে বাবক তাঁহার অনুসারীদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য এই ঘটনাকেই ব্যবহার করেন। বাবকের ধর্ম ছিল জরথুস্ত্র ও মায্দাকীয় ধর্মের সংমিশ্রণ, যাহাকে বলা হয় খোররামদীন, 'উত্তম ধর্ম'। তাঁহার অনুসারীদিগকে বলা হয় 'উত্তম ধর্মের অনুসারী' এবং তাহাদের উর্দীর জন্য তাহারা রেড শার্ট বা 'লাল-জামা' নামে সুপরিচিত। তাঁহার আন্দোলনও ছিল ইসলাম বিরোধী এবং বিশ বৎসরেরও অধিককাল পর্যন্ত তিনি খলিফা মামুন ও মু'তাসিম-এর শরীরের বিষফোঁড়া হিসাবে অবস্থান করেন।

সম্ভবতঃ বাবক মূলতঃ আজারবাইযানের একজন মেষপালক। খলিফাগণ তাঁহার বিরুদ্ধে অনেকগুলি অভিযান পরিচালনা করেন। শেষ পর্যন্ত ৮৩৭ খ্রীস্টাব্দে আফশীন নামক মুতাসিমের একজন পারস্যবাসী সেনাপতি বাবককে বন্দী করিয়া আব্বাসীয়দের আবাসস্থল সামাররায় আনয়ন করেন। একটি হস্তীর পিঠে চড়াইয়া বাবককে নগর প্রদক্ষিণ করা হয়। খলিফা তাহার শিরোচ্ছেদের আদেশ প্রদান করেন। এক হাত কাটিয়া ফেলিবার পর বাবক সেই হাত দ্বারা তাঁহার মুখ মর্দন করেন। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে, রক্তশূন্যতার দরুণ তাহার চেহারা বিবর্ণ হইয়া যাইবে। দর্শকগণকে তাঁহার সেই অবস্থা দেখাইতে তিনি নারাজ। ইহাতে তাহারা মনে করিবে যে ভয়ে তাঁহার চেহারা বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ফেলা হয়।[১]

আব্বাসীয় ক্ষমতার বিরুদ্ধে পারস্যবাসীদের বিদ্রোহের দ্বিতীয় স্বরূপ ছিল রাজনৈতিক। বাবকের বন্দীকারী পারস্য সেনাপতি আফশীন ছিলেন এই দলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। একজন পারস্য অভিজাত হিসাবে তিনি ছিলেন আরব বিরোধী কিন্তু গণবিদ্রোহ তিনি পছন্দ করিতেন না। উচ্চশ্রেণীর পারস্যবাসীগণ জনসাধারণের মতামতকে আমল দিতেন না। তাঁহারা মনে

১। অদৃষ্টের পরিহাস অনতিবিলম্বে ধর্মত্যাগের অভিযোগে স্বয়ং আফশীনেরও বিচার করা হয়। এবং তাহাকে হত্যা করা হয়। বিচারালয়ে তাহাকে দুইজন ইমামকে মারিবার অভিযোগে, তাহার গৃহে জরথুস্ত্র ধর্মগ্রন্থ সসম্মানে রাখিবার অভিযোগে এবং খতনাহীন থাকিবার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। এইসমস্ত অভিযোগ তিনি স্বীকার করেন।

করেন যে ভিতরে থাকিয়া ধূর্ততার সহিত এবং রাজনৈতিক আধিপত্যের মাধ্যমে তাঁহারা তাঁহাদের আরব বিরোধী উদ্দেশ্য হাসিল করিতে পারিবেন। বাবকের বিদ্রোহের ন্যায় বিভিন্ন গণবিদ্রোহ পারস্য অভিজাতদের মূল আন্দোলনকে নস্যাৎ করিয়া দিবে মাত্র।

স্বীয় পরিকল্পনায় অভিজাতগণ বেশ কৃতকার্য হন এবং আব্বাসীয় সরকার ও সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করিতে সক্ষম হন। আব্বাসীয়গণ পারস্য অনুকরণ এত ব্যাপকভাবে করেন যে প্রথমে তাঁহাদিগকে অনেকে 'আরব রক্তের সাসানীয় রাজন্যবর্গ' বলিয়া উল্লেখ করেন, ইহা উমাইয়াদের সম্পূর্ণ বিরোধী। কেহ যদি মনে করেন যে পারস্যবাসীগণ ক্ষমতা ও দায়িত্বপূর্ণ পদ গ্রহণ করিয়াছেন এবং পারস্য সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার এমনকি কাপড়-চোপড়ও রেওয়াজে পরিণত হইয়াছে তবে এই বক্তব্য কিছু বাড়াবাড়ি হইবে না। শুরুতেই সাফফাহ প্রধান উজীরের পদ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রধান উজীর সমস্ত ব্যাপারে খলিফার নামে কাজ করিতেন এবং কার্যতঃ তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। আব্বাসীয়দের এক অনুশাসন বাক্য প্রচলিত আছে, যে ব্যক্তি উজীরকে মান্য করে সে খলিফাকে মান্য করে এবং যে ব্যক্তি খলিফাকে মান্য করে সে আল্লাহকে মান্য করে।

প্রধান উজীরের পদের প্রথম অধিকারী ছিলেন খালেদ ইবনে-বারমাক। তিনি এক উল্লেখযোগ্য পরিবারের কর্তা ছিলেন, যে পরিবার অর্ধশতাব্দীরও অধিক কাল প্রধান উজীরের পদে বহাল থাকে। খালেদ বাল্খে বসবাসকারী একজন পারস্যবাসী। তাঁহার পিতা ছিলেন এক বৌদ্ধ মন্দিরের পুরোহিত বা বারমাক। একজন পারস্যবাসী ও শীয়া হওয়া সত্ত্বেও খালেদ তাঁহার পুত্র ইয়াহইয়া, এবং প্রপৌত্র ফজল ও জাফর প্রথম পাঁচজন খলিফার অধীনে পর পর উজীর হন। বারমাকীয়দের ক্ষমতা, বদান্যতা, সম্পদ ও লোভনীয় জীবিকা আরব্য রজনীর গল্পসমূহের অংশবিশেষ। সামরিক ও বেসামরিক কার্যাবলীর দায়িত্ব থাকে তাঁহাদের হাতে। তাঁহারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী শাসনকর্তা ও সেনাপতিদের নিযুক্ত ও বরখাস্ত করেন। এমন কি খলিফার গৃহাধ্যক্ষের প্রার্থীগণকেও তাঁহাদের সম্মতি আদায় করিতে হয়। কথিত আছে যে, হারুন আল-রশিদ তাঁহাদের সম্মতি ছাড়া

খাজাঞ্চিখানা হইতে টাকা উঠাইতে পারিতেন না। তবে হারুনের মেজাজের একজন খলিফা কাহারও সঙ্গে ক্ষমতা বণ্টন করিতে পারে না। হারুন, তাঁহার ভগ্নী আব্বাসা এবং ইয়াহ্ইয়ার পুত্র জাফর এক সঙ্গে বড় হইয়াছেন এবং পরস্পর পরস্পরের ঘনিষ্ঠ ও সহচর ছিলেন। তাহা সত্ত্বেও বারমাকীয়দের ক্ষমতা ও তাহাদের শীয়া ধর্ম, এতদসঙ্গে আব্বাসা ও জাফরকে কেন্দ্র করিয়া এক সম্ভাব্য অপবাদ তাঁহাদের পরিবারের ধ্বংস আনয়ন করে। জাফরকে হত্যা করা হয় এবং ইয়াহইয়া ও ফজল বন্দী অবস্থায় মারা যান। তবে ইহা দ্বারা উজীর পদের বিলোপ বা পারস্য প্রভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে নাই।

আব্বাসীয় ক্ষমতার প্রতি পারস্য বিরোধিতার তৃতীয় স্বরূপ ছিল সাহিত্যিক। ইহাকে শো'বিয়া আন্দোলন বলা হয়। ইহা উমাইয়া বংশের সময় আরবদের জাতীয় প্রাধান্যকে প্রতিহত করিবার জন্য অনারব মুসলমানগণ (পারস্য ও অপারস্য) কর্তৃক পরিচালিত হয়। এই আন্দোলনের অধিকাংশ উদ্যোক্তা ছিলেন সরকারী অফিস সমূহের অনারব সেক্রেটারীগণ। লেখনীর মাধ্যমে তাহারা একদিকে আরবদের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালায়, অন্যদিকে নিজেদের জাতীয়তাকে অনুপ্রাণিত করিয়া কৃতিত্ব প্রকাশ করে।

আব্বাসীয়দের শাসনামলে শো'বিয়া একটি পারস্য সাহিত্যিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। যাহার উদ্দেশ্য ছিল মৌলিক রচনা, ফার্সী গ্রন্থসমূহের অনুবাদের মাধ্যমে পারস্য সংস্কৃতির বিশেষ গুণের পুনর্জাগরণ এবং পারস্য সামাজিক কাঠামো ও ঐতিহ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। তাহারা ছিল সাহিত্য সমালোচকদের অগ্র সৈনিক যাহারা ধর্ম ও নৈতিকতার সন্দিগ্ধতার ভাব উৎসাহিত করে এবং ধর্মচ্যুতিকে আশ্রয় দান করে। কোন সন্দেহ নাই যে ইহাদের কেহ কেহ অতি ধূর্তভাবে ইসলাম বিরোধী ছিল। তাহাদের দুইজন সদস্য সাহিত্য প্রতিভা ইবনে মুকাফফা এবং অন্ধ কবি বশর ইবনে বরদ্‌কে যথাক্রমে খলিফা মনসুর ও মেহদী ধর্মচ্যুতির অপরাধে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।

সরকার ও প্রশাসন

আল-সাফফাহ বা মনসুর কেহই কুফায় নিরাপদ বোধ করেন নাই। আল-সাফফাহ নিকটবর্তী হাশিমিয়ার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন এবং মনসুর টাইগ্রীস নদীর তীরে বাগদাদ নামক এক ক্ষুদ্র পারস্য গ্রামে রাজধানী স্থাপন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই নগর অসংখ্য পার্ক, সুন্দর বাগান, প্রশস্ত রাজপ্রাসাদ, শত সহস্র মসজিদ ও সরকারী মানাগারের জন্য প্রসিদ্ধ। ক্ষমতা, জ্ঞান, বাণিজ্য ও অবসর বিনোদন এবং সহস্র ও একরাত্রির শাহারযাদের কাহিনীর দৃশ্যাবলীর কেন্দ্র হিসাবে বাগদাদ বিশ্ববিখ্যাত হইয়া উঠে। রাজ্যের সব রাস্তা বাগদাদ অভিমুখী এবং এইসব রাস্তায় সমসাময়িক বিশ্বের সমস্ত অঞ্চলের লোকজন পরিদৃশ্যমান। নগরটি ছিল সমৃদ্ধিশালী ও জাঁকালো এবং খলিফা ও উজীরগণ কল্পনাতীত অংকের টাকাপয়সা খরচ করিতেন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, হারুন আল-রশীদের স্ত্রী জোবায়দা স্বর্ণের পাত্রে ছাড়া খাদ্য পরিবেশন করিতেন না এবং অতি মূল্যবান প্রস্তরখচিত জুতা না হইলে পরিধান করিতেন না। একবার মক্কার হজ্জ যাত্রায় তিনি ত্রিশ লক্ষ দিনার খরচ করেন। ভাবী উত্তরাধিকারী মামুন ও তাহার নববধূ পুরানের বিবাহের দিন বর-বধূ অলঙ্কারখচিত সোনালী আরামকেদারায় উপবিষ্ট থাকাকালীন সময়ে এক সহস্র মানানসই মুক্তা তাহাদের উপর বর্ষণ করা হইয়াছিল। একসঙ্গে অনেকগুলি ক্রীতদাসী উপহার প্রদান এবং কবি, ভাঁড় ও অন্যান্য তোষামোদকারীকে সহস্র সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা বিতরণ ছিল অতি মামুলি ব্যাপার।

কামাসক্ত কবি এবং হারুনের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবু নোয়াস ঠিকই গাহিয়াছেন ঃ

> "যৌবন এবং আমি, আমরা দৌড়িলাম
> প্রমোদের এক দুঃসাহসিক দৌড়
> পাপের কোন খতিয়ান নাই
> কিন্তু শীঘ্রই আমি ইহার পরিমাপ করিলাম।"

বন্ধু এই গান গাহিবার সময় হারুন খুব সম্ভবতঃ উপস্থিত ছিলেন ঃ

> "এস সোলাইমান, আমার নিকট গান কর
> এবং তাড়াতাড়ি আমার জন্য শরাব আন।

দেখ, ইতিমধ্যে প্রাতঃকাল সমুপস্থিত
পরিষ্কার সোনালী জোৎস্নায়।
মিটমিট করিয়া বোতল ঘুরিতে ঘুরিতে,
আমাকে এক পেয়ালা দাও যাহাতে ডুবিয়া যাইতে পারি
আকাশ কোণে, তা যত উচ্চই হোক
মুয়াজ্জিনকে আযানের সুর ধ্বনিতে দাও।

হারুনের আরেক সমালোচক-কবি ছিলেন আবু আল-আতাহিয়া, যিনি চকচকে সমস্ত কিছুতে ধ্বংস অবলোকন করেন এবং খলিফাকে সতর্ক করেন ঃ

"যত ইচ্ছা নিরাপদে বাস করুন ;
প্রাসাদের উচ্চতা যথেষ্ট নিরাপদ।
দিন রাত্রির মুখে ভাসিয়া
মঙ্গলকে অমঙ্গলের চেয়ে আরামপ্রদ লাগে।
কিন্তু যখন তোমার নিঃশ্বাস বন্ধ হইতে আরম্ভ করে
তোমার ফুসফুসের সম্পূর্ণ বিপরীতে,
তখন নিশ্চিত জানিয়া রাখ প্রিয়,
তোমার জীবন অলস জিহ্বার ন্যায় অথর্ব।" [১]

খলিফার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রার্থী বিদেশী সম্মানিত অতিথিবৃন্দ বিভিন্ন কক্ষের সম্পদ ও সৌন্দর্যে এতই হতবাক হইয়া যান যে তাহারা প্রায়ই গৃহাধ্যক্ষের দফতরকে দরবারকক্ষ বলিয়া ভ্রম করিতেন। এই পরিবেশে প্রাথমিক আব্বাসীয়গণ তাঁহাদের বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করেন।

একটি পরিষদের দ্বারা দেশ শাসিত হয়, যাহার সভাপতি ছিলেন প্রধান উজীর। পরিষদের সদস্যবর্গ ছিলেন বিভিন্ন প্রশাসনিক বিভাগের কর্মকর্তাগণ যাহাদিগকে কখনও কখনও উজীরও বলা হয়, প্রধান বিচারক, এবং সেনাবাহিনীর প্রধান। প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলির মধ্যে একটি হইল রাজস্ব বিভাগ। রাজ্য জয় হইতে যেহেতু কোন যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি ছিল না, তাই বিজিত দেশ হইতেই রাষ্ট্রকে রাজস্ব আদায় করিতে হইত।

১। এই কবিতাগুলি "এনথলজী অব ইসলামিক লিটারেচার"-এ পাওয়া যায়। সম্পাদক, জেমস্ ক্রিটজেক পৃঃ ৮৬—৮৮

নীতিগতভাবে সমস্ত জমির মালিক মুসলমান সম্প্রদায় বা উম্মা। কিন্তু কার্যতঃ ছয় প্রকার জমি ছিল। (১) যেসব জমি খলিফার ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল। তিনি ধর্মীয় জাকাত ও উশর ছাড়া রাষ্ট্রকে অন্য কোন কর প্রদান করিতেন না। (২) যেসব জমি সৈন্যদিগকে তাহাদের সামরিক কার্যের জন্য দেওয়া হয়। এইগুলি হইতে রাষ্ট্র কর লাভ করে। (৩) খলিফার অধীনস্থ পতিত জমি—যেগুলিকে খলিফা যাহাকে ইচ্ছা দান করিতে পারেন। (৪) যেসব জমি মালিককে তাড়াইয়া দিয়া মুসলমানদিগকে দেওয়া হইয়াছে। তাহারা কোন কর প্রদান করে না, শুধু জাকাত দেয়। (৫) যে সব জমির আসল মালিক ফিরিয়া আসিয়াছে বা তাড়াইয়া দেওয়া হয় নাই। ইসলাম গ্রহণ করিবার পরও তাহাদিগকে ভূমি কর প্রদান করিতে হইত। (৬) যে সব জমির মালিক ও রাষ্ট্রের মধ্যে বিশেষ চুক্তির মাধ্যমে কোন সম্পর্ক রহিয়াছে—ইহারা একটি নির্ধারিত অঙ্ক প্রদান করে।

ব্যবসার লভ্যাংশের উপরও একটি বিশেষ কর ছিল কিন্তু ইহার পরিমান নির্ধারণ করা দুষ্কর। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সম্পদের 'এক তৃতীয়াংশ' সরকারের নিকট চলিয়া যায় বলিয়া ব্যবসায়ীগণ অনুযোগ করিত। রাজস্বের অন্যান্য উৎসের মধ্যে ছিল অমুসলিমদের নিকট হইতে আদায়কৃত মাথা পিছু কর (জিজিয়া), বা শাস্তি কর এবং কখনও কখনও যুদ্ধলব্ধ সম্পদ। বল প্রয়োগের রীতি ছিল চিরাচরিত। এই কাজের জন্য একটি "বাজেয়াফতি সংস্থা" বিদ্যমান ছিল। খলিফা হইতে অধঃস্তন প্রত্যেক কর্মকর্তা তাহার নীচের পদাধিকারী কোন অভিযোগে বা অন্য কোন কারণে পদচ্যুত হইলে তাহার সম্পত্তি বাজেয়াফত করা হইত। নীতিগতভাবে সরকারী খাজাঞ্চীখানার বা বায়ত-আল-মালের দুইটি হিসাব থাকে—একটি খলিফার জন্য এবং অপরটি রাষ্ট্রের জন্য। কিন্তু কার্যতঃ উভয়ের উপরই খলিফার আধিপত্য ছিল। নীতিগতভাবে মুসলমানদের নিকট হইতে আদায়কৃত সমস্ত কর মুসলমান দরিদ্র, এতিম, আগন্তুক ও যুদ্ধের জন্য খরচ করিবার কথা। সংগৃহীত তথ্য হইতে দেখা যায়, প্রথম আব্বাসীয় খলিফা মৃত্যুর সময় চারিটি জামা ও পাঁচটি পাজামা রাখিয়া যান, কিন্তু দ্বিতীয় খলিফা মনসুর মৃত্যুর সময় ৬,০০,০০০ দিনার রাখিয়া যান। আব্বাসীয় যুগের প্রথম দিকে বাজেট ছিল সমতাপ্রাপ্ত, কিন্তু ৯০৮ সালে এরূপ ছিল না। সরকের

সঙ্গে সঙ্গে ইহা আরও খারাপ হইয়া যায়।

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যয়-খাতের দুইটি ছিল রাজপ্রাসাদ এবং রাজকীয় দেহরক্ষীর জন্য খরচ। খলিফার শোচনীয় অবস্থা দৃষ্ট হয় এইভাবে যে, ৮৬৭ সালে দেহরক্ষীর খরচ ছিল বিশ কোটি দিনার, যা সমগ্র সাম্রাজ্যের বার্ষিক ভূমি করের দ্বিগুণ। বাকী অর্থ ধনী নাগরিকদিগকে বহন করিতে হইত। ব্যয়খাতের অন্যান্যগুলি হইল পবিত্র নগরীগুলির রক্ষণাবেক্ষণ, সীমান্ত চৌকি, হাশেমীয় শাখার সদস্যদের ভাতা এবং আমলাদের বেতন।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ছিল ডাক ব্যবস্থা বা বারিদ। এই ব্যবস্থা উমাইয়াগণ সাসানীয়দের নিকট হইতে লাভ করে। জনগণের জন্য ইয়াহইয়া বারমাকী ইহাকে বৃহত্তর রূপ দান করেন। বিভিন্ন প্রশস্ত সড়ক সাম্রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রগুলিকে সংযুক্ত করিত। বিভিন্ন সরাইখানা সড়কগুলির উপর নির্মিত হইত। এই কারণে সমগ্র সাম্রাজ্যের জন্য বাগদাদে একটি ডাক সময়সূচী নির্বাচিত রাখা হইত। বর্তমানের ন্যায় তখনও এই বিভাগ আভ্যন্তরীণ ও বিদেশী গুপ্তচর বৃত্তির জন্য ব্যবসায়ী, ভ্রমণকারী ও ভ্রাম্যমান দোকান প্রভৃতিকে ব্যবহার করিত। সম্ভবতঃ একমাত্র পার্থক্য ছিল এই যে, আব্বাসীয় গুপ্তচর প্রধান তাঁহার অধীনে অনেক বৃদ্ধ মহিলাকে ব্যবহার করিতেন, যাহা তাহাদের পূর্ববর্তীরা করিতেন না।

প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগগুলি ছিল অডিট, বিচারালয় ও পুলিশ। পুলিশ বিভাগের কর্মকর্তাদের মধ্যে একজন ছিলেন মুহতাসিব—যিনি গণ-নৈতিকতা ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনের দায়িত্বে নিযুক্ত। বিচারালয়গুলি ছিল রাজধানীর প্রধান বিচারকের তত্ত্বাবধানে। যাঁহার প্রতিনিধি প্রত্যেক শহরে ছিলেন। তাঁহাকে কাজী বলা হইত। কাজী ইসলামী ধর্মীয় আইন, শরিয়তে অভিজ্ঞ এবং স্থানীয় বিচারালয়গুলির সভাপতিত্ব করেন। ধর্মীয় দানছত্র, এতিম ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের সম্পত্তি নিষ্পত্তি করা, বিবাহ ও তালাক এবং উত্তরাধিকারও তাঁহার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিচার বিভাগের আওতায় একটি পর্যবেক্ষণ সংস্থাও ছিল যাহা বিভিন্ন কাজের মধ্যে কর্মকর্তাদের অত্যাচার, কর সংক্রান্ত অভিযোগ, বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত কার্যকরী করা এবং সরকারী এবাদতখানার রক্ষণাবেক্ষণ করিত।

উমাইয়াদের ন্যায় আব্বাসীয়গণও চিরাচরিত উত্তরাধিকারের সমস্যার সম্মুখীন হয়। উমাইয়াদের ন্যায় খলিফা কর্তৃক উত্তরাধিকারী নিযুক্তির প্রথা চলিতে থাকে। কিন্তু ইহা আব্বাসীয়দিগকে উমাইয়াদের মতই তেমন কোন সাহায্য করে নাই। অত্যন্ত গুরুতর ঘটনা সংঘটিত হয় হারুন আল-রশীদের মৃত্যুর পর। তিনি তাঁহার উভয় পুত্রকে বয়স অনুপাতে উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনয়ন দান করেন—প্রথমে আমীন এবং তারপর মামুন। মামুন—যাঁহার মাতা ও স্ত্রী উভয়েই পারস্যবাসী—পারস্যবাসীদের পূর্ণ সমর্থনে খেলাফত দাবী করেন। তিনি বাগদাদ অভিমুখে অভিযান করেন এবং স্বীয় ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া খলিফা হন। তবে চারি বৎসর পর তিনি শীয়াদের সবুজ পতাকা উত্তোলন করেন এবং অষ্টম শীয়া-ইমাম আলী আল রেজাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনীত করেন। এই ঘটনা বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করে। তাঁহাকে রাজধানী ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয় এবং দুই বৎসরের সংগ্রামের পর তিনি তাঁহার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেন। তিনি খেলাফত পুনরায় লাভ করেন। কথিত আছে যে তিনি খোরাসানে ইমাম রেজার মৃত্যু দণ্ডাদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। অতঃপর ইমামের মৃত্যুতে সংঘটিত বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য তিনি তাঁহার বিশ্বাসী সেনাপতি তাহেরকে খোরাসনে প্রেরণ করেন। তাহের তাহার জন্মভূমি খোরাসানে যাইয়া পূর্বাঞ্চলের প্রথম স্বাধীন ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ও জুমা নামাজ হইতে খলিফার নাম প্রত্যাহার করেন।

বাণিজ্য শিল্প ও কৃষি

আরবগণ ব্যবসার তুলনায় কৃষিকার্যকে অবজ্ঞা করিত। রসুলুল্লাহ (সঃ) স্বয়ং একজন কৃতকার্য ব্যবসায়ী ছিলেন। ইসলাম সর্বদাই ব্যবসায়ীদিগকে শ্রদ্ধা করে। বাগদাদ, বসরা, সিরিয়া, আলেকজান্দ্রিয়া ও কায়রোকে কেন্দ্র করিয়া সাম্রাজ্যের ভিতরে ও বাহিরে বেশ তৎপরতার সহিত ব্যবসা-বাণিজ্য চলে। বাগদাদের ঘাটে চীনা জাহাজগুলির আনাগোণা ছিল অতি সাধারণ দৃশ্য। এক অংশ হইতে আরেক অংশে উৎপন্ন দ্রব্য বণ্টন করিবার জন্য সাম্রাজ্যের চারিদিকে প্রশস্ত রাস্তাঘাট ছিল। কায়েরোর সাদা চাউল, লিনেন কাপড়, পশম, মদ, কিংখাব, মুক্তা, কাঁচ,

ধাতবদ্রব্য, ফল, সুগন্ধী, মার্বেল, কার্পেট, টেবিল, কুশান, ভাজা করিবার পাত্র, ষ্টেগামলা, ঔষধ এবং অন্যান্য অসংখ্য দ্রব্যাদি বহন করিয়া শহরে আনিত। একমাত্র দক্ষিণ ইউরোপ ব্যতীত বিশ্বের সমস্ত অংশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ছিল অতি জঁাকালো ও লাভজনক। চীনে মুসলমানগণ একটি ব্যবসায়ী কলোনী স্থাপন করিয়া সেখান হইতে চীনাপত্র ও পশমী কাপড় আমদানী করিত। ভারতবর্ষ হইতে তাহারা মসলা ও রং আমদানী করিত। রাশিয়ার সহিত তাহারা উলের ব্যবসা করিত এবং আফ্রিকার সঙ্গে হাতীর দঁাতের ব্যবসা করিত। রাশিয়া ও জার্মানীতে আব্বাসীয় মুদ্রা আবিষ্কার একটি আন্তর্জাতিক ব্যবসার সাক্ষ্য বহন করে।

এমন একটি লাভজনক বাণিজ্যের সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলিবার জন্য শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন করিতে হয়। বাহরাইনের মুক্তা, ইয়েমেনের ইস্পাত-তরবারি, শিরাজের মদ, কাশানের টালি এবং ইরানের কম্বল ছিল বিশ্ব বিখ্যাত। চীনাদের নিকট হইতে কাগজ প্রস্তুত শিক্ষা করিয়া ইরান, ইরাক ও মিশরে আব্বাসীয়গণ অনেকগুলি কাগজের কল চালু করে। তবে সমগ্র সাম্রাজ্যের অর্থনীতি ছিল সামগ্রিকভাবে কৃষিভিত্তিক। প্রাথমিক আব্বাসীয় খলিফাগণ এবং বিশেষতঃ বারমাকীয়গণ ইরাক, খোরাসান এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে বাঁধ, খাল ও পানি সরবরাহের কূপসমূহ নির্মাণ করেন। তৎকালে সমগ্র এলাকা বর্তমানের চাইতে অধিক উর্বর ছিল। ইহা এখনকার তুলনায় অধিক গম, চাউল, খেজুর, সুতা, ফল, সুপারী, কমলা, তরমুজ ও তরি-তরকারী উৎপন্ন করিত এবং বণ্টন করিত। উপরন্তু সাম্রাজ্যের অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসা হিসাবে ক্রীতদাস প্রথা তো ছিলই।

বৈদেশিক সম্পর্ক

আব্বাসীয়রা যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় তখন আরবদের রাজ্য জয়ের উৎসাহ নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে এবং আরব যোদ্ধাগণ হয় মরুভূমিতে ফিরিয়া গিয়াছে অথবা সাধারণ জনস্রোতের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভূখণ্ডের সঙ্গে আব্বাসীয়গণ অতি অল্পই যোগ করিতে সক্ষম হয়। বাগদাদে অবস্থানকারী দেহরক্ষীগণ ছাড়া তাহারা কোন স্থিতিশীল সেনাবাহিনীও রাখে নাই। ফলে তাহাদের অধিকাংশ বিদেশী সম্পর্ক

নির্ভর করে প্রতিনিধিদল প্রেরণ এবং উপঢৌকন দেওয়া ও নেওয়ার উপর।

তবে এই সাধারণ অবস্থার একটি ব্যতিক্রম হইল বাইজান্টিয়ামের সঙ্গে তাহাদের সম্পর্ক। কনস্টান্টিনোপলের সম্পদ রাশি তখনও হাতছানি দিতেছিল এবং এশিয়া মাইনর বিজয় একটি চ্যালেঞ্জে পরিণত হইয়াছিল। আব্বাসীয় ও উমাইয়াদের গৃহযুদ্ধের সুযোগ লইয়া সম্রাট পঞ্চম কনস্টান্টাইন (৭৪১—৭৭৫) আরব আক্রমণকারীদিগকে এশিয়া মাইনরের সর্ব দক্ষিণ সীমান্তে হটাইয়া দেয়। ৭৮২ খ্রীস্টাব্দে মেহদী তাঁহার পুত্র হারুনের অধীনে একটি অভিযান প্রেরণ করেন যাহা বসফরাস পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সম্রাজ্ঞী আইরীন শান্তি ভিক্ষা করিলে শান্তি স্থাপন করা হয়। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য তখন উমাইয়া ও আব্বাসীয় উভয় আরব শক্তির পক্ষে বিশেষ আকর্ষণীয় ছিল কিন্তু আক্রমণ প্রতিহত করিবার মত শক্তি তাঁহাদের ছিল বলিয়া আরবগণ শান্তির মাশুল আদায় করিয়াও শান্তি স্থাপন করিয়া খুশী হয়। অপরদিকে বাইজান্টাইনদেরও নিঃশ্বাস ফেলিবার সুযোগ হয়।

পরে সম্রাট প্রথম নাইসফরাস (৮০২—৮১১) চুক্তি ভঙ্গ করেন। এই খবর শুনিয়া হারুন এতই রাগান্বিত হন যে তিনি একখানা পত্র লেখেন। এই পত্রখানা এত প্রসিদ্ধ যে প্রত্যেক ইউরোপীয় ঐতিহাসিকই তাহা হইতে উদ্ধৃতি দেন। "বিশ্বাসীদের অধিনায়ক হারুনের নিকট হইতে একজন রোমান কুলাঙ্গার নাইসফরাসের নিকট...।" হারুন একটি অভিযান প্রেরণ করেন। তাহারা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর আদায় করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করে। এশিয়া মাইনর অধিকার করা আরবদের ভাগ্যে ছিল না। কিন্তু তুর্কীদের মাধ্যমে ইসলাম ইহা জয় করে।

ইউরোপীয় লেখকগণ প্রমাণ করেন যে হারুন আল-রশীদ ও শার্লেমেন সমসাময়িক ছিলেন। শার্লেমেনের প্রতিনিধিবৃন্দ 'পারস্যের সম্রাট আরনের' নিকট হইতে উপঢৌকন আনয়ন করেন। তবে মুসলিম ঐতিহাসিকবৃন্দ এই সম্পর্কের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। খুব সম্ভবতঃ স্পেনের উমাইয়া খেলাফতের বিরুদ্ধে আব্বাসীয় খলিফা শার্লেমেনের বন্ধুত্ব কামনা করেন। বাগদাদ ও কনস্টান্টিনোপলের মধ্যে বিবাদমান অবস্থা শার্লেমেনকে উপকৃত করে। তবে উপঢৌকন বিনিময় ব্যতীত আর কোন লাভ ইহাতে হয় নাই।

আব্বাসীয় সমাজ

আব্বাসীয় যুগের অতি গুরুত্বপূর্ণ উত্তরণের মধ্যে একটি হইল এই যে আরব স্বাতন্ত্র্যনীতি পরিহার করিয়া সমাজ আন্তর্জাতিক হইয়া উঠে। সাম্রাজ্যের বিশালত্ব, ক্রীতদাস-দাসী প্রথার কল্যাণে আরব, পারস্যবাসী, সিরিয়', মিসরীয়, বার্বার তুর্কী ও ভারতীয়গণ একে অন্যের মধ্যে সংমিশ্রিত হইয়া যায়। এই সংমিশ্রণ বিশেষভাবে কার্যকরী হয় শহরের কেন্দ্রগুলিতে। আধুনীর গ্রন্থকারের ন্যায় মুসলিম লেখক প্রধানতঃ খলিফা ও উচ্চশ্রেণীর লোকদের জীবন ও অবসর বিনোদনের কথা বর্ণনা করেন। সাধারণ মানুষ সম্পর্কে আমরা এতটুকু জানি যে অসংখ্য সরকারী স্নানাগার ব্যবহার করিবার যথেষ্ট সুযোগ তাহাদের ছিল। আধুনিক যুগের ন্যায় ছোট ছোট শহর এবং বড় বড় গ্রামগুলিতে এই ধরনের সুযোগ ছিল। নবাগতের জন্য হোটেলের সুবন্দোবস্ত ছিল এবং অত্যন্ত দরিদ্র হইলে তাহারা সর্বদা মসজিদে নিদ্রা যাইতে পারিত। ক্রীতদাসী ব্যতীত অন্যান্য মহিলাগণ পৃথক জীবন যাপন করিত এবং তাহাদের কাজ ছিল গৃহস্থালী ও শিশুদের লালন-পালন করা। ক্রীতদাসীগণ গান ও নৃত্য পরিবেশন করিয়া পুরুষদের চিত্তবিনোদন করিত। চারিজন আইনানুগ স্ত্রী পর্যন্তই সিদ্ধ ছিল। সমাজে ক্রীতদাস প্রথা চালু থাকায় দরুণ আমরা অনুমান করিতে পারি যে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পুরুষগণ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিত এবং চারিজন স্ত্রী না হইলেও কমপক্ষে অর্ধ-ডজন ক্রীতদাসী উপপত্নী রাখিত। মধ্যপ্রাচ্যে কখনও চেয়ার-টেবিল ব্যবহৃত হয় নাই। উচ্চশ্রেণীর লোকজন মাদুরাবৃত কেদারা ও কুশানে বসিত এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকজন মাদুরের উপর বসিত। বৃহৎ গোলাকার তাম্রনির্মিত পাত্রে খাদ্য পরিবেশন করা হইত। যেসব পরিবারে মাথাপিছু বাসন যোগাইতে পারিত না তাহারা একটি সাধারণ পাত্রের চতুর্দিকে বসিয়া আহার করিত।

জনগণের এক বিরাট অংশ, বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে এবং নিম্নশ্রেণীতে, মুসলমান হয় নাই। প্রাথমিক আব্বাসীয় যুগে অমুসলিমদের বৃহদাংশ ছিল অগ্নিপূজক তারপরই নেসতোরিয় খ্রীস্টান, ইহুদীদের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। আব্বাসীয়গণ ধার্মিকতার ভাণ করিত এবং মুসলমান ধর্মতত্ত্ববিদদিগকে খুশী করিবার জন্য অমুসলিমদের উপর অত্যাচার করিত। খলিফাগণ,

যথা হারুন আল-রশীদ, মুতাওয়াক্কিল ও অন্যান্যগণ এই ব্যাপারে বিশেষ কঠোর ছিলেন। জিম্মিগণ কোন উপসনালয় নির্মাণ করিতে পারিত না। আরব বিজয়ের পর যেগুলি নির্মাণ করা হইয়াছিল ঐগুলিকেও আদেশ-ক্রমে ধ্বংস করা হয়। তাহাদিগকে বিশেষ পোশাক পরিধান করিতে হইত এবং কাহারো কাহারো মাথার অগ্রভাগে ছাপ মারিয়া দেওয়া হইত। তাহাদের ঘর মুসলমানদের ঘরের চাইতে উঁচু করিতে পারিত না, এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাহাদের কোন সাক্ষ্য বিচারালয়ে গ্রাহ্য হইত না। রাজধানী হইতে দূরে স্থানীয় শাসনকর্তার দরবারে জিম্মিগণকে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া জিজিয়া কর দিতে হইত। রসিদের পরিবর্তে তাহাদিগকে একটি ছাপ দেওয়া হইত, যাহা তাহারা গলায় ঝুলাইয়া রাখিত। এইসব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামে দীক্ষা গ্রহণের সংখ্যা বাড়িয়া যায়। এতদসত্ত্বেও ইসলামে সহিষ্ণুতা ছিল। অনেক খ্রীস্টান ও ইহুদী ব্যবসায়ী, দরবারে চিকিৎসক, দার্শনিক এবং উজীর হিসাবে ও উচ্চপদের অধিকারী ছিলেন। তবে কোন জরথুস্ত্রকে কোন অনুষ্ঠানে এইভাবে সম্মানিত করা হইয়াছিল বা সহিষ্ণুতা দেখানো হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই। অতএব সহজেই অনুমেয় যে অত্যাচারের প্রচণ্ড ধাক্কা বহন করিতে হইয়াছিল সমস্ত জরথুস্ত্র এবং নিম্নশ্রেণীর খ্রীস্টান ও ইহুদীদিগকে। উমাইয়াদের প্রচারিত আরব প্রাধান্য ইরান ও সিরিয়ার অভিজাতবর্গ এবং বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। অপরদিকে আব্বাসীয়দের ধর্মীয় উৎসাহ গ্রাম্য জনসাধারণের অধিকাংশকে উত্যক্ত করিয়া তোলে। বোধহয় তাহাদেরই ক্রন্দন আধানীর গ্রন্থকার লিপিবদ্ধ করিয়াছেন :

> "আহ্, উমাইয়াদের অত্যাচার যদি ফিরিয়া আসিত
> আহ্, আব্বাসীয়দের বিচার যদি নরকে যাইত।"

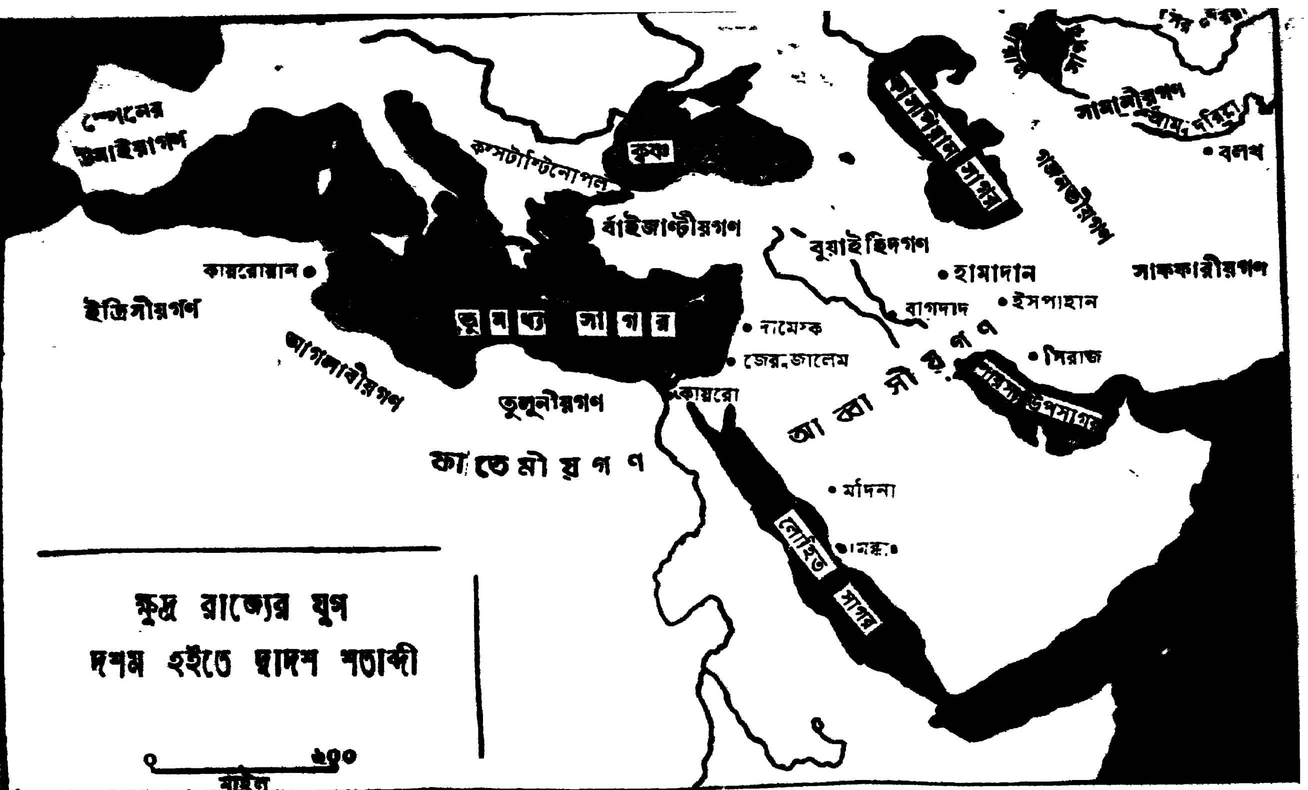
নবম অধ্যায়

ক্ষুদ্র রাজ্যের যুগ

আব্বাসীয় সাম্রাজ্যের সৌধ নির্মিত হয় প্রচারণা ও শূন্য প্রতিশ্রুতির ইট দ্বারা, কিন্তু ইহার পায়ের তলায় মাটি ছিল না। সমাজের বিভিন্ন অংশে যাহারা আব্বাসীয় ক্ষমতারোহণের উপর আশা রাখিয়াছিল এখন অসন্তুষ্ট বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে।

অবজ্ঞা করিবার ফলে আরবগণ অসন্তুষ্ট হয়, সিরিয়াবাসীগণ অসন্তুষ্ট হয় ক্ষমতা হারাইয়া, শীয়াগণ প্রতারণার জন্য, পারস্যবাসীগণ উত্তরাধিকার হারাইয়া এবং অমুসলিমগণ অসন্তুষ্ট হয় অপমানের জ্বালায়, খারেজীগণ প্রায় নাস্তিক হইয়া উঠে এবং সর্বদা সরকারী প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতায় লিপ্ত থাকে। প্রায় এক শতাব্দীর 'মধু চন্দ্রিমায়,' খলিফাগণ তাঁহাদের বিপুল সম্পদ ও ক্ষমতা সাম্রাজ্যকে অখণ্ড রাখিবার জন্য ব্যয় করেন নাই, এক জাতি গঠনের কথা বাদই দেওয়া গেল। অধিকাংশ জনহিতকর কাজের কৃতিত্ব বারমাকীর ও অন্যান্য উজীরদেরই প্রাপ্য। 'সোনালী যুগ' খলিফাদের সজ্ঞান প্রচেষ্টার চাইতে বরং স্বাভাবিক ঐতিহাসিক ক্রমগতিতে আসিয়াছে। তবে কিছু ব্যতিক্রমও ছিলেন, যেমন মামুন। কিন্তু মোটের উপর খলিফাগণ মত্ত থাকেন ক্ষমতা ও উপভোগে এবং নিজদিগকে তাঁহারা ঘাতক ও দেহরক্ষীদের দ্বারা আবৃত রাখেন।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে খলিফাগণ আরও নিরাপত্তার অভাব বোধ করেন। তাঁহাদের খোরাসানী দেহরক্ষীগণ নিস্তেজ হইয়া যায়, বা বিরক্ত হইয়া পদত্যাগ করে। তখনও আত্মকলহে লিপ্ত উত্তর ও দক্ষিণ আরবগণ পারস্যবাসীদের অবধারিত দুরভিসন্ধি ও কুমন্ত্রণা হইতে খলিফাকে উদ্ধার করিতে তেমন উৎসাহী হইয়া উঠে নাই। স্বীয় নিরাপত্তার জন্য মু'তাসিম (৮৩৩—৮৪২) দেহরক্ষী হিসাবে তুর্কীদের আনয়ন করেন। তুর্কীগণ



ক্ষুদ্র রাজ্যের যুগ
দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী
০ ৫০০
মাইল
স্পেনের
উমাইয়াগণ
কস্টান্টিনোপল
কৃষ্ণ
কাস্পিয়ান সাগর
সামানীয়গণ
আমু দরিয়া
বলখ
গজনভীয়গণ
বাইজান্টীয়গণ
বুয়াইহিদগণ
হামাদান
সাফফারীয়গণ
কায়রোয়ান
ইদ্রিসীয়গণ
ভূমধ্য সাগর
বাগদাদ
ইসপাহান
দামেস্ক
আগলাবীয়গণ
জেরুজালেম
সিরাজ
কায়রো
তুলুনীয়গণ
আরব
পারস্য উপসাগর
ফাতেমীয়গণ
মদিনা
লোহিত সাগর

যেমন সাহসী ও অনুগত তেমনি বর্বর ও অশিক্ষিত। আরব ও পারস্যবাসীগণ একে অপরকে ধ্বংস করিবার উপায় হিসাবে ইহাদিগকে ব্যবহার করিবে খলিফা এই আশা করেন। মুতাসিমের মাতা একজন তুর্কী ক্রীতদাসী হইবার ফলেও এই ব্যবস্থার উদ্ভব হইতে পারে।

যাহাই হউক, দেহরক্ষী হিসাবে খোরাসানীদের স্থলাভিষিক্ত তুর্কীগণ ভয়াবহ প্রাণীতে পরিণত হয়। কয়েক বৎসরের মধ্যে তাহাদের গুণ্ডামী ও ব্যভিচার বাগদাদে এমন ত্রাসের সৃষ্টি করে যে খলিফা নিকটবর্তী সামাররায় তাঁহার রাজধানী স্থানান্তর করিতে বাধ্য হন এবং তাঁহার সঙ্গে দেহরক্ষীদিগকেও লইয়া যান। পঞ্চাশ বৎসর অতিক্রম হইবার পূর্বে খলিফাগণ বাগদাদে ফিরিয়া যান নাই। কিন্তু রাজধানী সামাররায় থাকুক বা বাগদাদে থাকুক, অসুবিধাটা থাকিয়াই যায়।

তুর্কীগণ খলিফার কার্যে যোগদান করিবার কয়েক বৎসর পর তাহারা রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। ৮৬১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তুর্কীগণ নিজেদেরকে এইরূপ শক্তিশালী মনে করে যে, তাহারা মুতাওয়াক্কিলকে হত্যা করিয়া তাঁহার পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করে। তখন হইতে ৯৪১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তুর্কীগণ খলিফাদের মনোনীত ও পদচ্যুত করিত এবং অবশিষ্ট সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসক হইয়া উঠিয়াছিল। শীঘ্রই তাহাদের নেতা আমীর-আল উমারা (প্রধান সেনাপতি) উপাধি লইয়া প্রধান উজীর হন এবং হতভাগ্য খলিফাদিগকে তাঁহাদের অর্থহীন মর্যাদা নিয়াও থাকিতে দেন নাই। তাঁহাদের তিনজনকে অন্ধ করিয়া ফেলা হয় এবং পরে তাঁহাদিগকে বাগদাদের রাস্তায় ভিক্ষা করিতে দেখা যায়। বাগদাদের এই অবস্থায় আঞ্চলিক শাসনকর্তাগণ সাম্রাজ্যের প্রায় সমগ্র অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করিয়া রাজধানীর আধিপত্য হইতে স্বাধীন হইয়া যায়।

পশ্চিমের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য

আব্বাসীয় আধিপত্য হইতে যেসব এলাকা পৃথক হইয়া যায় তাহাদের মধ্যে প্রথম হইল স্পেন। উমাইয়াদের পতনের ছয় বৎসর পর তাহাদের এক যুবরাজ, আবদ্-আল-রহমান, সুদূর আন্দালুসিয়ায় একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। স্পেন এই গ্রন্থের আলোচনা বহির্ভূত হইলেও

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, করডোবায় রাজধানী স্থাপন করিয়া উমাইয়াগণ তথায় একটি শক্তিশালী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন। কেন্দ্রীভূত শক্তি হিসাবে অথবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য হিসাবে মুসলমানগণ স্পেনে ১৬০৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অবস্থান করে। অতঃপর তৃতীয় ফিলিপ তাহাদিগকে চিরতরে বহিষ্কার করেন। স্পেনে খেলাফতের প্রধান অবদান হইল, ইহা মুসলিম দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও স্থাপত্যশিল্পের ইউরোপে প্রবেশের প্রধান পথ হিসাবে কাজ করে।

উত্তর আফ্রিকায় ইমাম হাসানের একজন প্রপৌত্র ইদ্রিস ইবনে আবদুল্লাহ এক শীয়া বিদ্রোহে জড়িত হইয়া পলায়ন করেন এবং মরক্কোর ফেজ নামক স্থানে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। এই ক্ষুদ্র রাজ্য ৭৮৮ হইতে ৯৭৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং প্রথম রাষ্ট্রের গৌরব অর্জন করে।

আরেকটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে খলিফা হারুন কর্তৃক নিযুক্ত একজন শাসনকর্তা ইব্রাহীম ইবনে আল-আঘলবের নামানুসারে পরিচিত আঘলাবীয় ৮০০-৮০৯ খ্রীঃ। তিনি তিউনিসিয়ায় একটি স্বাধীন সুন্নী রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার সমউৎসাহী একজন উত্তরাধিকারী একটি নৌবহর নির্মাণ করেন এবং মাল্টা ও সিসিলি অধিকার করিয়া ইটালীর উপকূলে লুণ্ঠনাক্রমণ করেন।

মিসরে দুইটি স্বল্প স্থিতিশীল ক্ষুদ্র রাজ্য একের পর এক স্থাপিত হয় উভয়টিই তুর্কী। প্রথমটি তুলুণীয়গণ ৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে একজন ক্রীতদাসের পুত্র আহমদ ইবনে তুলুন ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। শাসনকর্তাকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহাকে মিসরে পাঠান হইয়াছিল। তিনি গোলযোগের সুযোগ লইয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। পরে তিনি সিরিয়ার কর্তৃত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ তেমন শক্তিশালী ছিলেন না ফলে ৯০৫ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ এই বংশ নেতৃত্ব হারাইয়া ফেলে। দ্বিতীয় বংশ ইখ্‌শিদীয়গণ ৯৩৫ হইতে ৯৬৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মিসর শাসন করেন। হামদানীয়গণ কর্তৃক পরাজিত হওয়া পর্যন্ত তাঁহারাও কিছু দিনের জন্য সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন শাসন করেন। শেষোক্তটি ছিল আর এক ক্ষুদ্র বংশ যাহা উত্তর সিরিয়ায় পতাকা উত্তোলন করে এবং আলেপ্পো ও মোসুলে কেন্দ্র স্থাপন করে। তাহারা ৯২৯ হইতে ১০০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়

আম্বানীর গ্রন্থকার ইসফাহানী এবং মুতানাব্বী ও মাররী নামে দুইজন খ্যাতনামা কবির পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তাহারা খ্যাতি অর্জন করে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষুদ্র রাজ্য হইল ফাতেমীয় নামে পরিচিত শীয়া বংশ। পরবর্তীকালে এই বংশ একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ওবায়দুল্লাহ, যিনি ৯০৯ খ্রীস্টাব্দে আঘলাবীয় বংশের ধ্বংসস্তূপের উপর নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইরানের ইসমাইলী সম্প্রদায়ের নেতা আবদুল্লাহ ইবনে মাইমুনের একজন বংশধর।[১] মুসলিম বিশ্বের সমস্ত অংশে মিশনারী শাখা বিস্তারকারী ইসমাইলী শীয়াগণ তাহাদের মূলকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্ত উত্তর আফ্রিকাকে বাছিয়া নেন। ৯৬৯ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ তাঁহারা সমগ্র মিসরে আধিপত্য বিস্তার করেন। সেখানে তাঁহারা কায়রোকে রাজধানী হিসাবে বাছিয়া লইয়া খেলাফতের দাবী করেন। এইভাবে দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইসলামে তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বী খেলাফতের সৃষ্টি হয়—আব্বাসীয়, ফাতেমীয় ও স্পেনের উমাইয়াগণের।

অন্যান্য ইসলামী বংশসমূহের ন্যায় ফাতেমীয়গণ যত শীঘ্র ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করে এবং তত শীঘ্রই অধঃপতনের মুখে পতিত হয়। তাহাদের সৌভাগ্যবশতঃ তাহাদের পতন অন্য দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর পতনের সঙ্গে সংগঠিত হয় এবং ১১৭১ সালে ক্রুসেড-খ্যাত সালাদীন (সালাহ্ আল-দীন) কর্তৃক পরাজিত হওয়া পর্যন্ত তাহারা টিকিয়া থাকে।

শীয়া খেলাফত হিসাবে ফাতেমীয়গণ পারস্য ছাঁচে গঠিত, যদিও তাহাদের শাসন পদ্ধতি ছিল অনেকটা আব্বাসীয়দের ন্যায়। তাহাদের প্রধান কাজ ছিল ইসলামী মতবাদ প্রচার এবং শীয়া শক্তির বিস্তৃতি। ফাতেমীয়গণ ৯৭২ খ্রীস্টাব্দে প্রসিদ্ধ আজহার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে। সমগ্র ফাতেমীয় যুগে ইহা ছিল একটি শীয়া শিক্ষাকেন্দ্র। পরে সুন্নীগণ আজহার অধিকার করে। বিশ্বের সর্ব প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ইহা আজও বিদ্যমান।

পূর্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য

বাগদাদের কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পূর্বে, পশ্চিমের অনেক

১। নীচে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১৭১ (মূল গ্রন্থ)

পরে আরম্ভ হয়। খোরাসানের এক পারস্য ক্রীতদাসের পুত্র তাহেরই প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি মামুনের একজন বিশ্বাসী সেনাপতি ছিলেন। অষ্টম শীয়া ইমাম রেজার হত্যাকে কেন্দ্র করিয়া সংঘটিত বিদ্রোহ দমনের জন্য তাঁহাকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া সেখানে পাঠান হয়।[১] খোরাসানে পৌঁছিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাহের শুক্রবারের নামাজে খলিফার নাম বাদ দেন—যাহাকে স্বাধীনতার নিশ্চিত চিহ্ন হিসাবে ধরা যাইতে পারে। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ নিশাপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া ৮৭২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ৫২ বৎসর রাজত্ব করেন।

প্রথম সচেতন পারস্য ক্ষুদ্র রাজ্য হইল ইয়াকুব সাফফার (তাম্রকার) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সাফফারীয় রাজত্ব (৮৬৭—৯০৩)। তাঁহার কার্যাবলীর কেন্দ্রস্থল ছিল পূর্ব ইরানের সিস্তান, যদিও কোন এক সময় তিনি সমগ্র ইরানের উপর কর্তৃত্ব করেন। খলিফা মু'তামিদের (৮৭০—৯০৩) বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম এক অভিযান (অকৃতকার্য) পরিচালনা করেন। তিনি সমস্ত সরকারী চিঠিপত্রে পারস্য ভাষা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং পারস্য সাহিত্যের তিনি একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

দ্বিতীয় পারস্য ক্ষুদ্র রাজ্য, সামানীয়গণ (৮৭৪—৯৯৯)। ইহারা সামান নামক একজন পারস্য অভিজাতের বংশধর বলিয়া দাবী করে। মধ্য ও উত্তর ইরানে এবং ট্রান্সঅক্সিয়ানার বিশাল ভূখণ্ডে তাহাদের আধিপত্য ছিল এবং তাহাদের রাজধানী ছিল বোখারায়। সামানীয়দের হাতে পারস্য সাহিত্য ইহার স্বকীয় রূপ ধারণ করে। তাহাদের দরবারে রাজী, আভিসেনা, রুদাকী, বালামী ও অন্যান্যদের ন্যায় বিখ্যাত পারস্য বৈজ্ঞানিকগণ স্থান লাভ করেন।

৮৩০ খ্রীস্টাব্দে বাগদাদ অভিমুখে প্রবাহিত তুর্কীদের ক্ষুদ্র স্রোত বৃহদাকার ধারণ করে এবং শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহাদের কেহ কেহ পূর্বদিকে নিজস্ব রাজত্ব স্থাপন করে। ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হইল গজনভীয়গণ (৯৬২—১১৮৬)। ইহার প্রতিষ্ঠাতা আলপতিগীন সামানীয়দের একজন ক্রীতদাস ছিলেন এবং কালক্রমে আধুনিক আফগানিস্তান ও পাঞ্জাবের এলাকাভুক্ত অঞ্চলে এক রাজত্ব গড়িয়া তোলেন।

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ৮৫ (মূল গ্রন্থ)।

গজনভীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন মাহমুদ (৯৯৯—১০৩০) যিনি সুলতান উপাধি ধারণ করেন। তিনি পশ্চিম ইরান হইতে উত্তর ভারত এবং ট্রান্সঅক্সিয়ানার সীমান্ত পর্যন্ত সুবিস্তৃত অঞ্চলের সর্বজন স্বীকৃত শাসক ছিলেন। ইরানে রাজ্য প্রতিষ্ঠাকারী অনেক তুর্কী যোদ্ধাদের মধ্যে গজনভীগণ ছিলেন প্রথম। যদিও তাহারা তুর্কী কিন্তু কালক্রমে সবাই পারস্যবাসী হইয়া যান এবং শিল্পকলা ও সাহিত্যে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হন। সুবিখ্যাত ফেরদৌসী তাঁহার প্রসিদ্ধ শাহনামা (নৃপতিদের গ্রন্থ) মাহমুদের নামে উৎসর্গ করেন।

পূর্বাঞ্চলে গজনভীদের সমসাময়িক ছিলেন উত্তর ইরানের বুয়ীদগণ। তাহাদের আদি আবাসভূমি কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ উপকূলে অবস্থিত দায়লামান পার্বত্য অঞ্চল। দক্ষিণ অভিমুখে বাহির হইয়া ইসফাহান ও সিরাজ অধিকারের পর তাহাদের নেতা আহমদ ৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে অবরুদ্ধ খলিফা মুসতাকফী কর্তৃক বাগদাদে আমন্ত্রিত হন। খলিফা তাঁহার তুর্কী দেহরক্ষীগণের অবরোধ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে চান। আহমদ আমীর আল-উমারা উপাধি ধারণ করেন এবং তাঁহার নাম শুক্রবারের খুতবায় পাঠ করা হয় ও মুদ্রায় ছাপা হয়।

খলিফা সুন্নী তুর্কীদের চাইতে পারস্য শীয়াদের হাতে তেমন আরামে ছিলেন না। নতুন দৃঢ়-মানব খলিফা মুসতাকফীকে অন্ধ করিয়া মু'তীকে (৯৪৬—৯৭৪) নিযুক্ত করেন। অদৃষ্টের পরিহাস তাহার নামের অর্থ 'অনুগত'। তাহারা শীয়া আচরণ চালু করেন। এক শতাব্দীরও অধিক কালের (৯৪৫—১০৫৫) শাসন আমলে তাঁহারা শিরাজ হইতে শাসন পরিচালনা করেন, বাগদাদ হইতে নহে—যাহা ইতিমধ্যে ইহার সৌন্দর্য হারাইয়া ফেলে। প্রাক্ত উৎপত্তির উপর জোর দিবার জন্য তাহারা শাহানশাহ (নৃপতিদের রাজা) উপাধি চালু করেন। সালজুক নামক একটি নতুন ও আরও উল্লেখযোগ্য দল বুয়ীদগণের স্থলাভিষিক্ত হয়।

তুর্কীদের এই নতুন দল মধ্য এশিয়ার কিরঘিজ তুর্কীদের গজ বংশের অন্তর্ভুক্ত। খুব সম্ভবতঃ তাহারা পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলিতে মিশনারীদল প্রেরণকারী নেসতোরীয় খ্রীস্টানদের দ্বারা প্রভাবান্বিত।[১] তবে মধ্যপ্রাচ্যের

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ৯ (মূল গ্রন্থ)।

ইতিহাসে তাহারা খাঁটি সুন্নী মুসলমান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তাহাদের যুদ্ধংদেহী ও আগ্রাসনী স্বভাব, তৎসঙ্গে বিবাদী ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির দুর্বলতার ফলে তাহারা দক্ষিণে ও পশ্চিমে রাজ্য বিস্তার করিতে সক্ষম হয়। ১০৩৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তাহারা খোরাসান, রায় ও মধ্য ইরান অধিকার করে। ১৮ বৎসর পর (১০৫৫) তাহাদের নেতা তুঘরিল বাগদাদে প্রবেশ করেন এবং খলিফা কায়েম (১০৩১—১০৭৫) কর্তৃক আমীর আল-উমারা নিযুক্ত হন। এই রীতিটি ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই একঘেয়ে হইয়া উঠিয়াছে।

অধিকাংশ ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির প্রাথমিক শাসকবৃন্দ যুগপৎ আগ্রাসনী ও গঠনমূলক প্রকৃতির ছিলেন। সালজুকদের শাসকবৃন্দ ছিলেন তঘুরিল, তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র আলপ আরসালান এবং আলপ আরসালানের পুত্র জালাল আল-দীন মালেক শাহ। অর্ধ শতাব্দী কালের মধ্যে (১০৩৬—১০৯২) এই তিনজন তাঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে পরাজিত করেন এবং ক্রীড়নক খলিফার নামে দেশ শাসন করেন। তবে সালজুকগণ সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করিতে ব্যর্থ হয় বলিয়া তিনভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। একটি ইরানের সালজুক নামে পরিচিত—রাজধানী মারাঘেহ্ (১০২৭—১১৯৪), আরেকটি এশিয়া মাইনরের সালজুক নামে পরিচিত রাজধানী কোনিয়া (১০৭১—১২৯৯); এবং তৃতীয়টি সিরিয়ার সালজুক নামে পরিচিত তাহাদের রাজধানী আলেপ্পো (১০৯৪—১১১৭)। ইহাদের মধ্যে পারস্য সালজুকগণ তাহাদের প্রসিদ্ধ পারস্য উজীর নিজাম আল-মুলকের মাধ্যমে বিখ্যাত হইয়া উঠে। এই উজীর আলপ আরসালান ও মালেক-শাহের অধীনে চল্লিশ বৎসরেরও অধিককাল কাজ করেন। বিভিন্ন নগরে তিনি উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠা করেন। তন্মধ্যে সর্বপ্রসিদ্ধ হইল বাগদাদের নিজামিয়া। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় পারস্যবাসী জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতজ্ঞ ওমর খৈয়াম বর্ষপঞ্জী সংশোধন করেন। ওমর খৈয়াম তাঁহার রুবাইয়াতের জন্য বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ইহার ফলশ্রুতি হইল 'জালালী' পঞ্জিকা—যাহা বর্তমানে ইরানে চালু আছে। নিজাম আল-মুলক নিজে একজন বিদ্বানলোক ছিলেন এবং তাঁহার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'সিয়াসতনামা' (শাসনালেখ্য)। এই গ্রন্থ তিনি মালেকশাহের পথপ্রদর্শনের জন্য লিখেন [illegible]।

১১৯৪ খ্রীস্টাব্দে ইরানের সালজুকজগণ খারজমের তুর্কীগণের দ্বারা পরাজিত হয়। এই তুর্কীগণ স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমে শীয়া ছিল। তাহাদের বংশ খারজমশাহ্ নামে পরিচিত। ইহাদের এক যুবরাজ আলা আল দীন মুহম্মদ (১২০০—১২২০) বাগদাদের সুন্নী খেলাফত বিলুপ্ত করিতে মনস্থ করেন। বৃদ্ধ ও অনস্তোপায় খলিফা নাসির নতুন 'তুর্কী' দলের অভিযানের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার শত্রু খারজমশাহের বিরুদ্ধে তুর্কীদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই ব্যাপারে তিনি আশাতিরিক্ত ফল লাভ করেন। এই নতুন বংশ চেঙ্গিস খানের অধীনস্থ মোঙ্গল বলিয়া প্রমাণিত হয়।[১]

প্রায় ৩০০ বৎসর স্থায়ী ক্ষুদ্র রাজ্যের যুগে ফিরিয়া তাকাইলে দেখা যায় মোটের উপর বংশগত ও ধর্মীয় কারণে পশ্চিমাঞ্চলের ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। আঘলাবীর ও তুলুনীয়দের ন্যায় কেহ কেহ নিজস্ব খ্যাতি ও উচ্চাকাঙ্খার বশে কাজ করে। অপর দিকে অন্যান্যরা প্রধানতঃ ফাতেমীয়গণ ধর্মীয় কারণে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তবে পূর্বাঞ্চলে ধর্ম কোন বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে নাই। সেখানে ব্যক্তিগত আকাঙ্খা ছাড়াও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল পারস্য পৃষ্ঠপোষকতা। পারস্যবাসীগণ সচেতন ভাবে ছিল আরব বিরোধী এবং পারস্য আধিপত্য পুনর্বহাল করিতে তাহারা যথেষ্ট চেষ্টা করে। ফারটাইল ক্রিসেণ্ট, মিসর ও উত্তর আফ্রিকার জনগণ, আংশিকভাবে সেমিটিক উৎপত্তি এবং আংশিকভাবে আরব আক্রমণের সময় বিজিত জাতি ছিল বিধায় আরবীকে তাহাদের কথ্য ও লেখ্য ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে। সত্য বলিতে কি, সেখানেও কিছু কিছু বাধাবিপত্তি ছিল, কিন্তু ঐগুলি তেমন শক্তিশালী ছিল না। তবে পূর্বাঞ্চলে পারস্যবাসীগণ আরবীকরণের চাপ প্রতিহত করে এবং আরবী বলিতে অস্বীকার করে। ইরানী মালভূমিতে বিক্ষিপ্ত তুর্কী বংশ সমূহের কোন কোন সুপ্রতিষ্ঠিত অংশ আরবীর চাইতে ফার্সী বলিতেই শিখে। বাগদাদের কেন্দ্রে অবস্থিতির ফলে এবং বুদ্ধিজীবীদের আকর্ষণের ফলে প্রায় মোঙ্গল যুগের আগমন পর্যন্ত আরবী ভাষা পাঠক্রমে মাধ্যম হিসাবে চালু থাকে। কিন্তু ফার্সী সর্বদা মুখের ভাষা হিসাবে বিরাজ করে। ৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে সাফফারীদের সময় হইতে

১। নীচে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১১০ (মূল গ্রন্থ)।

এই ভাষা এমন কি তুর্কী ক্ষুদ্র রাজ্য সমূহেরও প্রশাসনের ভাষায় রূপান্তরিত হয়।

প্রশ্ন করা যাইতে পারে, 'আব্বাসীয় খলিফাগণ তাহা হইলে এত-দিন কিভাবে টিকিয়া থাকিলেন ?' প্রকৃতপক্ষে, অন্ততঃ ৮৫০ হইতে ১২২৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কোন না কোন শক্তিশালী লোক বা 'যুবরাজ' একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে খেলাফতকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাঁচাইয়া রাখে। ইহার প্রধান কারণ এই পদের মর্যাদা এবং মুসলিম জনগণের অন্তরে ইহার সুউচ্চ আসন। খলিফার নিকট হইতে 'অভিষেক' গ্রহণ করা এইসব যুবরাজের একটি রীতিতে পরিণত হয়। সম্ভবতঃ জনসাধারণকে বিশেষতঃ ধর্মীয় নেতাদিগকে দেখাইবার জন্যই এই অভিষেক লওয়া হইত। খলিফাগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে এইসব নিযুক্তিপত্র প্রদান করিতেন। অতি অল্প—কয়েকজনের মধ্যে যাহারা এরূপ সরকারী 'নিয়োগপত্র' পান নাই তাঁহাদের মধ্যে একজন ছিলেন ইয়াকুব সাফফার। হিস্ট্রী অব সিস্তানের (সিস্তানের ইতিহাস) অজ্ঞাত-নামা গ্রন্থকার বর্ণনা করেন যে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ইয়াকুবকে খলিফার অনু-মতিপত্র আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি হ্যাঁসূচক উত্তর প্রদান করেন। তিনি অতঃপর তাহাদিগকে উহা দেখিতে আমন্ত্রণ জানান। তাহাদের সকলে একত্রিত হইলে তিনি তাহার সহকারীকে সেই 'অনুমতিপত্র' আনিতে আদেশ করেন। আমন্ত্রিতদের ত্রাসের মধ্যে সেই সহকারী একটি কুশান লইয়া প্রবেশ করেন এবং সেই কুশানের উপর ছিল একটি খোলা তরবারী। ইয়াকুব কয়েকবার সাংঘাতিকভাবে সেই তরবারী ঘুরাইয়া ধর্মীয় নেতা-দিগকে জিজ্ঞাসা করেন আল-সাফফাহের (আব্বাসীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা) নিকট এরূপ একটি তরবারী ছাড়া অন্য কোন অনুমতিপত্র ছিল কি না। একত্রিত জমায়েত ভয়ে এবং যুক্তির জোরে বাক্যহীন হইয়া পড়েন। ইহা দেখিয়া ইয়াকুব বলিলেন, 'এখন আপনারা যখন অনুমতিপত্র দেখি-লেন তখন বাড়ী যাইতে পারেন।'

খলিফাদিগকে বাঁচিতে দেওয়ার আরেকটি কারণ হইল আইনানুগতার চিন্তা। অধিকাংশ সুন্নী দল বিশ্বাস করেন যে খলিফা কোরাইশ বংশোদ্ভূত হওয়া উচিত। বিবদমান যুবরাজগণ এইরূপ কোন দাবী সম্ভবতঃ উত্থাপন

করিতে পারেন নাই। বিবাহের মাধ্যমে তাহাদের কেহ কেহ আব্বাসের পরিবারের সহিত নিজদিগকে সংযুক্ত করিতে চেষ্টা করেন। এমন কি শীয়াগণও—যাহারা আব্বাসীয়দিগকে আইনানুগ খলিফা বলিয়া বিশ্বাস করেন না—জনতার ভাবাবেগকে ভয় করিতেন। ফাতেমীয়গণ ১০৫৮ খ্রীস্টাব্দে বাগদাদ অধিকার করেন এবং কায়েমকে আলীর বংশের সপক্ষে খেলাফতের দাবী প্রত্যাহার করিতে বাধ্য করেন। সালজুক তুঘরিল বন্দী খলিফাকে এই অবস্থা হইতে রক্ষা করেন। খলিফাকে হুমকি প্রদর্শনকারী আরেকজন শীয়া ছিলেন মুহম্মদ খারজমশাহ্। তিনি চেঙ্গিস খান কর্তৃক ধ্বংস হইবার পর আর কোন সুযোগ লাভ করেন নাই।

এইভাবে আব্বাসীয় বংশ বাগদাদ ধ্বংসের পরও ১৫১৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত টিকিয়া থাকে। সেই সময় ওসমানীয় সুলতান সেলিম মামলুক-দিগকে পরাজিত করিয়া এই প্রহসনের সমাপ্তি ঘটান এবং খলিফাকে বন্দী করেন।

দশম অধ্যায়

ধর্ম, আইন ও নীতিশাস্ত্র

সাংস্কৃতিক দিক হইতে বলিতে গেলে, ফারটাইল ক্রিসেণ্ট ও ইরানে আরব বিজয় ছিল বাইজাণ্টাইন ও পারস্য সাম্রাজ্যদ্বয়ের অগ্রগামী সভ্যতাগুলির উপর অসভ্যতার আক্রমণ। এ পর্যন্ত জরীপকৃত ইতিহাসে এই সাংস্কৃতিক আন্দোলনের চারিটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্তর উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম দুইটি ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হইয়াছে।[১]

১। 'নেতৃস্থানীয় খলিফাদের' যুগ:[২] প্রধান কার্যক্রম ছিল সামরিক বিজয়গুলির স্থিতিশীলতা আনয়ন করা এবং মরুভূমি হইতে আমদানীকৃত সরল ধর্ম প্রচার করা।

২। উমাইয়া যুগ: তখনও প্রাচীন বেদুইন সংস্কৃতি ঘেষা এবং গৃহ যুদ্ধে ভারাক্রান্ত। তাহা সত্ত্বেও ইহা ধর্মকে বাইজাণ্টাইন এবং পারস্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে আনয়ন করে ও ইসলামী সম্প্রদায়ের মনে ধর্ম ও আচরণ সম্পর্কিত অনেক প্রশ্ন উত্থাপন করে।

৩। প্রাথমিক আব্বাসীয়দের অনুকরণের যুগ: যখন অনৈসলামিক বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখাগুলি সংগ্রহ করা হয় এবং সুশৃঙ্খলভাবে আরবীতে অনুবাদ করা হয়।

৪। আব্বাসীয়দের পতন ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উত্থানের সময় সৃজনশীলতার যুগ: যখন মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদ, বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ও অন্যান্যরা তাহাদের করায়ত্ব জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া মৌলিক গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন।

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ৪৮ ও ৬৪ (মূল পুস্তক)।

২। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ প্রথম চারি খলিফার ব্যাপারে সর্বদা 'রাশেদীন' বিশেষণটি ব্যবহার করেন।

ইসলামী সংস্কৃতির উপর অনুবাদ বা অনুকরণের যুগের প্রভাবের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়োজন। কারণ ইহা ব্যতীত অসংখ্য মুসলিম পণ্ডিতদের সৃজনশীল অবদান সম্ভব হইত না। অধিকন্তু, ইহা মধ্যপ্রাচ্যের ছাত্রদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে এই সংস্কৃতি মিসরীয়, গ্রীক, পারস্য, সিরীয়, ভারতীয় ও চীনা উপাদানের সংমিশ্রণ, যাহা আরব উপদ্বীপ হইতে নীত মৌলিক সরল ধর্ম হইতে বহু দূরে। তবে, এই আদি সরল ধর্মকে কখনও ত্যাগ করা হয় নাই। সমস্ত জ্ঞান, পরস্পরবিরোধী মনে হইলেও মূল ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

স্মরণ করা যাইতে পারে যে উমাইয়া বংশীয় আবদ আল-মালিক সাসানীয় শাসন পদ্ধতিকে আরবীতে অনুবাদের আদেশ প্রদান করেন। আরব শাসকবৃন্দ নিজেদের সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন উপাদান হইতে সাহায্য অনুসন্ধান করে। প্রাথমিক আব্বাসীয়দের রাজত্বকালে বিশেষতঃ হারুন আল-রশীদ ও মামুনের সময় ব্যাপকভাবে অনুবাদ করা হয়। শেষোক্ত-জনই 'বায়ত আল-হিকমা' (জ্ঞান ভবন) প্রতিষ্ঠা করেন যাহার প্রধান কাজ ছিল বিশ্বের সমগ্র অঞ্চলের গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করা ও অনুবাদ করা। প্রাথমিক আব্বাসীয়দের একটি গৌরবপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল তাহারা যদিও নিষ্ফল উপভোগে বিরাট অর্থের অপচয়ে লিপ্ত ছিলেন, তবু বুদ্ধিজীবী-দিগকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানেও কখনও পিছপাও হন নাই। কোন কোন খলিফা তাহাদের শত্রু বাইজান্টিয়ামের সম্রাটদের নিকট গ্রন্থ চাহিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই। প্রামাণ্য নথিপত্রে দেখা যায় ঃ অনুবাদ সংস্থার সদস্যবৃন্দ ছিলেন বিশ্বের ইতিহাসে সর্বোচ্চ বেতনধারী বুদ্ধিজীবীদের অন্তর্ভুক্ত।

তাঁহারা নির্বিচারে সমস্ত প্রকারের কার্যাবলী অনুবাদ করেন—গ্রীক পাহলভী, লাতিন, সংস্কৃত, চীনা, সিরিয়াক, নাবাতিয়ান ও অন্যান্য সব ভাষা হইতে এইসব অনুবাদ করা হয়। অসংখ্য অনুবাদের তালিকা দেখিলে সহজেই ধারণা করা যায় যে, তাহারা গ্রীক হইতে অনুবাদ করেন দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, ও সাহিত্য ; সংস্কৃত হইতে অংক, চিকিৎসা-শাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা এবং নাবাতিয়ান হইতে কৃষিকার্য ও যাদুবিদ্যার গ্রন্থ।

বস্তুতঃ সমস্ত অনুবাদকেরাই ছিলেন অনারব এবং কেউ কেউ ছিলেন

অমুসলিম। অতি গুরুত্বপূর্ণ অনুবাদকের মধ্যে তিনজন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তি ইসলামী সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটি বিশেষ অবদান রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা হইলেন ইবনে মুকাফফা (মৃত্যু ৭৫৭ খ্রীঃ)—একজন জরথুস্ত্র; হুনায়েন ইবনে ইসহাক (৮০৯—৮৭৩ খ্রীঃ) একজন খ্রীস্টান এবং সবিত ইবনে কুররাহ (মৃত্যু ৯০১ খ্রীঃ)—একজন সাবিয়ান।

ইবনে মুকাফফার প্রকৃত নাম রুজবেহ, পার্সী, কিন্তু তিনি তাঁহার অপমানসূচক আরবী ডাক নামেই অধিক পরিচিত, যাহার অর্থ 'কুঞ্চিত' ব্যক্তির পুত্র, কারণ তাঁহার পিতার হাত উৎপীড়নে কোঁকড়াইয়া গিয়াছিল। ইসলাম ধর্মে তাঁহার দীক্ষা ঐকান্তিক কিনা তাহা সন্দেহজনক। কোন এক সময় তিনি শেষ উমাইয়া খলিফার দরবারে সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করেন এবং আব্বাসীয়দের সময়ও সেই কাজ অব্যাহত থাকে, যদিও তাহা স্বল্পকালীন। তাহার অনবদ্য অনুবাদগুলির মধ্যে একটি হইল খোদাইনামাহ্ (প্রভুদের গ্রন্থ)। ইহাকে 'সিয়ার আলমুলকু আল-আজম' (ইরানের রাজন্যবর্গের গুণাবলী) নামে তিনি আরবীতে অনুবাদ করেন। পরবর্তী মুসলিম ঐতিহাসিকদের জন্য ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে ইহা একটি আদর্শে পরিণত হয়। তবে, তাঁহার অনুবাদগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হইল প্রাচীন বিশুদ্ধ সংস্কৃত, পঞ্চতন্ত্র যাহাকে 'বিদপাইয়ের গল্প' নামে পাহলভী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। রুজবেহ ইহাকে 'কালিলা ওয়া দিমনা' নামে আরবীতে অনুবাদ করেন। ইহা একটি আনন্দদায়ক কাহিনী, যাহাতে পশুরাও মানবরূপ ধারণ করিয়া সব রকমের দার্শনিক ও নৈতিক ভাবধারা আলোচনা করিয়াছে। প্রত্যেক ভাবধারা এক একটি উপদেশপূর্ণ গল্পের সাহায্যে উত্থাপন করা হইয়াছে এবং তাহাতে আরও অধিক সংখ্যক পশুর চরিত্র সংযোজন করা হইয়াছে। ইহা বিশ্বের অনেক জাতির সাহিত্যের ক্লাসিকে পরিণত হয়। মূল সংস্কৃত ও পাহলভী ভাষার অনুবাদগুলি এখন নষ্ট হইবার ফলে এই অসাধারণ গুণী অনুবাদক রুজবেহ্-এর প্রতি ঋণ আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

'কালিলা ওয়া দিমনা' গ্রন্থটি আরবী রচনায় পারস্য রীতি প্রচলন করে। নতুন নতুন উপমা, ব্যঙ্গ ও গল্প অতি সাধারণ ও পরিচিত শব্দের মাধ্যমে ইহাতে প্রকাশ করা হয়। ইহা আরবী ভাষাকে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত

করে যাহা মাত্র কিছুদিন পূর্ব পর্যন্তও একটি আদর্শ হিসাবে প্রচলিত ছিল। ইবনে মুকাফফা একজন শোয়াবিয়া নেতা।[১] কথিত আছে যে, তিনি তাঁহার আরবীকে কোরানের চেয়েও উত্তম বলিয়া দাবী করিতেন। অন্তরে তিনি জরথুস্ত্র ছিলেন বলিয়া সন্দেহ করা হয়, যাহা সম্ভবতঃ সঠিক। দ্বিতীয় আব্বাসীয় খলিফা মনসুরের আদেশে তাঁহাকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়।

দ্বিতীয় প্রসিদ্ধ অনুবাদক হইলেন হুনায়ন ইবনে-ইসহাক। তিনি একজন নেসতোরীয় খ্রীস্টান। চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁহার প্রশিক্ষণ ছিল। কিন্তু অনুবাদক হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নেসতোরীয় খ্রীস্টান হিসাবে তাঁহার মাতৃভাষা ছিল সিরিয়াক। তাই তিনি আরবী ভাল জানিতেন না। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই পরবর্তীকালে প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। তিনি যাহা আরবীতে অনুবাদ করিতেন মামুন সেই গ্রন্থের সমপরিমাণ ওজনের স্বর্ণ তাঁহাকে প্রদান করিতেন। তাঁহার অনূদিতগুলির মধ্যে রহিয়াছে গ্যালেন হিপোক্রেটস্, প্লাটোর রিপাবলিক, এ্যারিষ্টোটলের 'ক্যাটেগরিয়া' ও অন্যান্য গ্রন্থ।

চারিজন খলিফার অধীনে তিনি চাকুরী করেন। তিনি মোতাওয়াক্কিলের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসাবেও কাজ করেন। তিনি কখনও মুসলমান হন নাই এবং বোধহয় চোখ ঠারিয়া বলিতেন, তাঁহার পূর্বপুরুষেরা যেখানে আছেন তিনিও সেখানে থাকিতে চানঃ সে স্বর্গে হোক বা নরকে।

অনুবাদকের ক্ষেত্রে তৃতীয় জ্যোতিষ্ক ছিলেন সাবিত ইবনে কোররাহ নামক একজন সাবিয়ান (৮৩৬-৮৯১)।[২] তিনি নক্ষত্র উপাসক সাবিয়ানদের অন্তর্গত ছিলেন এবং স্বধর্মের সহচরগণসহ তৎকালে পরিচিত প্রায় সমস্ত অঙ্কশাস্ত্র ও জোতিষশাস্ত্রের গ্রন্থসমূহ গ্রীক হইতে অনুবাদ করেন। তাহার অনূদিতগুলির মধ্যে রহিয়াছে আর্কিমেডিসের রচনাবলী, পারগার এ্যাপোলোনিয়াস, ইউক্লিড ও অন্যান্য। তিনি একটি অনুবাদক সংস্থা স্থাপন করেন যাহার প্রায় সদস্যই ছিলেন হুনায়নের ন্যায় তাঁহার স্বীয় পরিবারের লোক।

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ৮২ (মূল গ্রন্থ)।
২। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১০ (মূল গ্রন্থ)।

আনুমানিক দ্বিতীয় পুরুষে এই পরিবার ইসলাম গ্রহণ করে। হুনাইনের পরিবারের বেলায়ও একই ঘটনা ঘটিয়াছিল।

ধর্মতত্ত্ব ও ধর্ম

ইসলামের সাধারণ ধর্মমত আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নাই এবং হযরত মুহম্মদ (সঃ) তাঁহার বার্তাবাহকসহ কিছু রীতি ও আচার ব্যবহারের আইন মরুভূমির জীবনের জন্য যথেষ্টই মনে হয়। এমন একটি ধর্ম যাহা একটি বিশাল সাম্রাজ্যের সূচনা করিয়াছে, অন্যান্য ধর্মীয় মতবাদ সমূহের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়া জীবন এবং পরকাল সংক্রান্ত বিভিন্ন জটিলতার আবর্তে পড়িয়া নিরাবরণ হইয়া পড়ে। তদুপরি এই যুগের বিক্ষুব্ধ ইতিহাস এবং ইহ'র রক্তারক্তি, গৃহযুদ্ধসমূহ, গুপ্তহত্যা, উত্তরাধিকার লইয়া বিবাদ, উমাইয়াদের পার্থিব মনোভাব এবং অন্যান্য সমস্যা এমন কতকগুলি ধর্মতাত্ত্বিক প্রশ্নের অবতারণা করে যাহা ইসলামের নতুন ধর্মীয় সমাজকে রীতিমত কাঁপাইয়া তোলে।

প্রথম শ্রেণীতে যাহারা সুস্পষ্ট মতামত গ্রহণ করিয়া নিজদিগকে মূল দল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লয়, তাহারা হইল খারেজীগণ। এইসব দলত্যাগীগণ পবিত্র কোরানের ব্যাখ্যায় অত্যন্ত উদার এবং খেলাফতের প্রশ্নে আপোষহীন। তাহাদের মতে, যুগের প্রধান সমস্যা এই খেলাফত সমস্ত মুসলমানদের জন্য উন্মুক্ত, তা তাহারা যে জাতিরই হউক না কেন। তাহারা জোর দিয়া বলে, "এমনকি একজন ক্রীতদাসও খলিফা হইতে পারে," তবে তাহাকে ন্যায়বান, চরিত্রবান এবং সুকর্মা হইতে হইবে। তাহারা 'পুণ্য কাজে মুক্তি' মতবাদ চালু করে এবং ক্রমশঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, যে কোন লোক উত্তম কার্যের জন্য পরিত্রাণ পাইতে পারে—সে যে ধর্মাবলম্বীই হউক না কেন। খারেজীগণ তাহাদের এই মতাদর্শের বিরোধী লোকদের বিরুদ্ধে সর্বদা খড়্গ হস্ত থাকে এবং তাহাদিগকে হত্যা করে। দশম শতাব্দী পর্যন্ত তাহারা নাস্তিক হইয়া উঠে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গ কর্তৃক বাগদাদের প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে নিযুক্ত হয়। সাফফারীয় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ইয়াকুবের সেনাবাহিনীতে খারেজীদের এক বিরাট অংশ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ধর্মতাত্ত্বিক বিতর্কের অপর পক্ষে ছিল আরেক শ্রেণী. যাহারা পাপ স্বীকারকে মুক্তির পথ বলিয়া বিশ্বাস করে। মানুষের কার্যাবলীর ব্যাপারে তাহারা মনুষ্য সিদ্ধান্তের বিলুপ্তিতে বিশ্বাসী এবং সিদ্ধান্তকে আল্লাহর উপর ছাড়িয়া দেওয়ার পক্ষপাতি। এইজন্য তাহারা মুরজীর নামে পরিচিত। ইহা ইসলামের বাস্তবতা ও উমাইয়াদের পার্থিব কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয় সাধনের একটি প্রচেষ্টা মাত্র। তাহারা বলে কোন লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষার কথা স্বীকার করিলেই—যেমন উমাইয়াগণ নিশ্চয়ই পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছে—সে একজন খাঁটি মুসলমান, তাহার কার্যাবলী যেরূপই হউক না কেন। এই দুই মতামতের মাঝখানে আসে মুতা-যিলাদের মতামত। এই মতবাদ কিছুকালের জন্য একটি প্রধান ধর্মীয় চিন্তাধারার প্রতিষ্ঠান হিসাবে চালু ছিল। তাহারা বিশ্বাস করে কোন মুসলমান গুরুতর কোন পাপ করিলে সে নিজেকে মূল সম্প্রদায় উম্মা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে, কিন্তু কাফের হইয়া যায় না। তাহারা স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিতে বিশ্বাস করে যে মতবাদ কাদেরীয়গণ প্রচার করে। জাবরীয়গণ আবার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিতে বিশ্বাস করে না। এবং পবিত্র কোরানের অদৃষ্টবাদীমূলক বাণীগুলির অনুকরণ করে।

তবে মুতাযিলাদের প্রধান অনুরাগ ছিল গ্রীক যুক্তিবাদের দ্বারা মুসলিম মানসে উদ্ভূত প্রশ্নাবলীর প্রতি। এইগুলির একটি হইল আল্লাহর নাম লইয়া বিতর্ক। চিরাচরিত মতানুসারে আল্লাহর নাম ৯৯টি। মুতা-যিলা যুক্তিবাদীদের মতানুযায়ী এইসব মনুষ্যগুণাবলী সদৃশ নামের মর্মার্থ অস্বাস্থ্যকর। তদুপরি তাহারা বিশ্বাস করে যে এই ধরনের নাম যুক্তির দিক হইতে পবিত্র কোরানে ব্যর্থহীন ভাষায় বিঘোষিত আল্লাহর একত্ববাদের পরিপন্থী। ফলে তাহারা আল্লাহর নামকে ঐশী গুণাবলী হইতে পৃথক মনে করে এবং আল্লাহর একত্ব রক্ষা করিবার জন্য বলে যে, আল্লাহর সত্তা এবং তাঁহার গুণাবলীর ধারণা পরস্পরবিরোধী নহে। তাঁহাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সৃষ্টি হয় কোরানকে কেন্দ্র করিয়া। রক্ষণশীল মত হইল পবিত্র কোরান আল্লাহর সৃষ্টিহীন বাণী এবং তাহার সঙ্গে সম্পৃক্ত। যুক্তিবাদী মুতাযিলাগণ ইহা গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহারা ঘোষণা করে যে, কোরানকে সৃষ্টি করা হইয়াছে,

তাই চিরঞ্জীব নহে। কোরান সৃষ্টি বলিয়া শিক্ষা দিবার অভিযোগে এবং মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তিতে বিশ্বাস করিবার অপরাধে উমাইয়া খলিফা হিশাম (৭২৪—৭৪৩) এইসব যুক্তিবাদী কয়েকজনকে কঠোর শাস্তি প্রদান করেন।

আব্বাসীয়দের রাজত্বকালে মুতাযিলাগণ শক্তিশালী হয় এবং খলিফা মা'মুন তাহাদের সঙ্গে যোগ দেন। তাহাদের প্রভাবে পবিত্র কোরানকে সৃষ্টি হিসাবে বিশ্বাস করা অপরিহার্য বলিয়া তিনি একটি বিশেষ হুকুম জারি করেন। ইহাতে রক্ষণশীলদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কিন্তু মুতাযিলাগণ পূর্ণ প্রভাব বজায় রাখে। এই সমস্ত স্বাধীন চিন্তার পুরোধাগণ মা'মুন ও তাঁহার দুইজন উত্তরাধিকারীকে একটি অনুসন্ধান সংস্থা গঠন করিয়া এই নতুন মতবাদ যাহারা সমর্থন করে না তাহাদিগকে অত্যাচার করিতে প্ররোচনা দান করে।

তবে, দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে রক্ষণশীলগণ এককালের প্রসিদ্ধ মুতাযেলী আবুল হাসান আলী আল-আশা'রীকে তাহাদের সমর্থক হিসাবে লাভ করে। তিনি মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতার মতবাদ প্রত্যাখ্যান করেন এবং তৎপরিবর্তে দাবী করেন যে, মানুষের নানা কর্মধারার মধ্যে বাঞ্ছনীয় স্বাধীনতা রহিয়াছে। অতএব মানুষ তাহার কার্যাবলীর জন্য দায়ী। আল্লাহ এবং তাঁহার নামের ব্যাপারে তিনি বলেন যে আল্লাহর প্রত্যেক নামের এক একটি অর্থ আছে যাহা মানুষের সহিত প্রযোজ্য নামের অর্থ হইতে পৃথক। ফলে আল্লাহর জ্ঞানকে মানুষের জ্ঞান হইতে পৃথক করা হয়। কারণ এই দুইটি গুণ দুইটি সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন জাতীয়।

গ্রীক ও অন্যান্য পদ্ধতির চিন্তাধারাও ইসলামে বলবৎ থাকে। আশারী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চিন্তাধারায় ইসলাম ও উপরোক্ত চিন্তাধারাগুলির মধ্যে একটি সমঝোতা আনয়নের প্রচেষ্টা চলে। এই কাজ সম্পন্ন করেন মুসলমান রক্ষণশীলদের অনুকূলে বিশ্ব বিখ্যাত ধর্মতত্ত্ববিদ আবু হামিদ আল-গাজ্জালী (১০৫৮—১১১১ খ্রীঃ)। তিনি খোরাসানের তুস নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং একটি চমকপ্রদ জীবনযাপনের পর তাঁহার জন্ম ভূমিতেই পরলোকগমন করেন। তিনি প্রত্যেক দর্শন ও ধর্মমত পাঠ করেন এবং পর্যায়ক্রমে অনেকগুলির শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার স্বরচিত জীবনচরিত সেন্ট অগাস্টাইনের

বীকারোক্তির সমগোত্রীয়। বাগদাদের নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গাজ্জালী ইসলামতত্ত্ব শিক্ষাদান করিবার পর ইহা ত্যাগ করিয়া তিনি কিছুদিন চিন্তার রাজ্যে চলিয়া যান। তাঁহার প্রসিদ্ধ 'ধর্ম-বিজ্ঞানের পুনর্জন্ম' নামক গ্রন্থে তিনি ইসলাম, গ্রীক যুক্তিবাদ ও পারস্য মরমীবাদকে একই সূত্রে গ্রথিত করিতে চেষ্টা করেন। গাজ্জালীর মতানুসারে জ্ঞান দুই প্রকারের— (ক) যে জ্ঞান ধর্মতত্ত্বের সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং (খ) যে জ্ঞান ধর্মতত্ত্বের সহিত সম্পর্কযুক্ত নহে। শেষোক্ত জ্ঞানের মধ্যে চিকিৎসাবিদ্যা, অংকশাস্ত্র ও শিল্প অধ্যয়নে তিনি উৎসাহ দান করেন। এবং কবিতা ও ইতিহাস পাঠের অনুমতি দান করেন। তাঁহার কার্যাবলী লাতিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং সেণ্ট থমাস একুইনাসের উপর তাঁহার প্রভাব পড়িয়াছে বলিয়া মনে করা হয়। সেণ্ট থমাসও খ্রীস্টান ঐশীবাণীর সঙ্গে গ্রীক যুক্তিবাদের সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করেন। অথচ মধ্যযুগীয় থমাসবাদ প্রটেস্ট্যাণ্ট সংস্কার ও পরবর্তী দার্শনিক চিন্তাধারার দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে গাজ্জালী ও অন্যান্যরা মুসলিম রক্ষণশীলতাকে মধ্যযুগের যে গৃহে স্থাপন করিয়াছেন তাহা অধিককালই রহিয়া গিয়াছে। এই অর্থে 'মধ্যযুগীয় ইসলামের পরিসমাপ্তি'র ব্যাপারে কথা বলা সঠিক নহে, কারণ ইসলামের তথাকথিত মধ্যযুগীয় পাণ্ডিত্য বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত কোন হুমকিরই সম্মুখীন হয় নাই বরং অপরিবর্তিত থাকে।

শীয়া মতবাদ

এই পর্যন্ত আলোচিত ধর্মতাত্ত্বিক আন্দোলনসমূহ ইসলামে স্থায়ী কোন ভাঙ্গন সৃষ্টি করে নাই। যে আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ইসলামকে স্থায়ীভাবে দুইটি দলে বিভক্ত করিয়া ফেলে তাহা হইল শীয়া মতবাদ। স্মরণ করা যাইতে পারে যে আলীর সমর্থকগণ (শীয়া) খেলাফতের প্রশ্নে দলবদ্ধ হইয়া দাঁড়ান।[১] রাজনীতি বা যুদ্ধের দ্বারা দাবী প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যর্থ হইয়া শীয়াগণ সংখ্যাগুরুদের দল হইতে চিরতরে পৃথক হইয়া যায় এবং ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, সরকার ও নীতিশাস্ত্র সম্বলিত পৃথক একটি ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করে। ধর্মতঃ শীয়ামতবাদে জরথুস্ত্র, নেসতোরীয় ও অন্যান্য মতবাদগুলির

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ৬০ (মূল গ্রন্থ)।

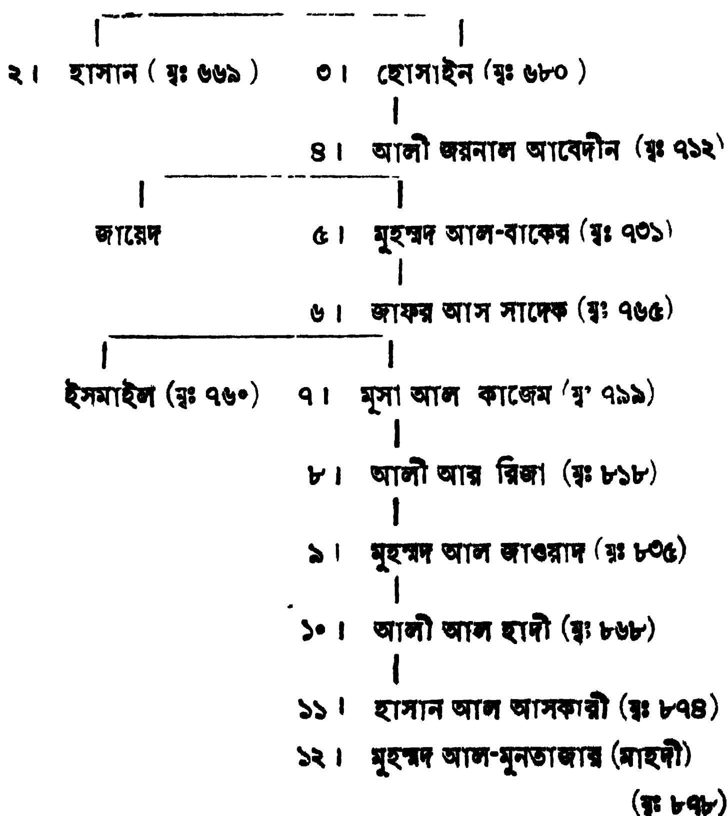
প্রতিধ্বনি জোরালোভাবে শোনা যায়। ইহা ইসলামে রহস্যবাদ, যাজক-তন্ত্র, প্রায়শ্চিত্ততন্ত্র, বর্ণবাদ ইত্যাদি আমদানী করে, যেগুলির অধি-কাংশ সুন্নীরা বর্জন করিয়াছে। সুন্নীগণ কোরানকে দুর্লঙ্ঘ্য মনে করে, অথচ শীয়াগণ দুর্লঙ্ঘ্য মনে করে মানুষকে। তিনি হইলেন ইমাম—যিনি নিষ্পাপ এবং যাঁহাকে তাহারা মানব-প্রভু মনে করে। কারবালায় তৃতীয় ইমাম হোসাইনের শাহাদতের ফলে শীয়াগণ তাহাদের ধর্মীয় অনুভূতি লইয়া শোভাযাত্রা সহকারে সমস্ত প্রকারের আত্মহুতি, সম্ভোগ, খেলাধুলা ও কবিতা ইত্যাদি দ্বারা মৃত্যুকে পৃথিবীর সমস্ত পাপের প্রতিনিধিরূপে অঙ্কিত করিয়া রাস্তায় বাহির হইবার সুযোগ লাভ করে।

প্রথম ইমাম এবং রসুলুল্লাহর (সঃ) প্রকৃত উত্তরাধিকারী আলী হযরত মুহম্মদ (সঃ) হইতে বার্তাবাহকের আলো লাভ করেন এবং তিনি ইহা তাঁহার বংশধর উত্তরাধিকারীদের নিকট হস্তান্তর করেন বলিয়া শীয়ারা দাবী করে। ইহা শীয়াদিগকে এই দাবী করিবার সুযোগ দান করে যে মুহম্মদই সং সত্যিকারের শেষ নবী, যাঁহার বার্তা আলীর মাধ্যমে তাঁহার বংশধরদের মধ্যে চিরস্থায়ী করা হইয়াছে। ইহাকে তাহারা এমনভাবে বিশ্বাস করে যে, তাহারা ইসলামের সাক্ষ্য, "আমি বিশ্বাস করি যে আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নাই, এবং হযরত মুহম্মদ (সঃ) আল্লাহর বার্তা বাহক," এই স্বীকারোক্তিতে সন্তুষ্ট নহে। ইহার সঙ্গে তাহারা সর্বদা একটি তৃতীয় বাক্য যোগ করে, "আমি বিশ্বাস করি যে আলী আল্লাহর প্রতিনিধি (ওয়ালী)"।

ইমামতের এই মতবাদ শীয়াদের রাজনৈতিক মতবাদের গূঢ়তত্ত্ব হিসাবে কাজ করে। শীয়াগণের মতবাদ সম্পূর্ণভাবে ধর্মতাত্ত্বিক। সুন্নী বা শীয়া কোন মুসলমান সন্দেহ উত্থাপন করে না যে আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে হযরত মুহম্মদ (সঃ) ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান। শীয়াদের মতানুসারে যেহেতু তাঁহার পারলৌকিক ও ইহলৌকিক সমস্ত ক্ষমতা আলীর নিকট এবং পরে উত্তরাধিকারী সূত্রে অন্যান্য ইমামদের নিকট হস্তান্তরিত হইয়াছে, অতএব ইমামই আইন অনুযায়ী সরকারের মালিক। ইমাম বা তাঁহার প্রতিনিধিদের অধীনে নয় এরূপ সুন্নী খলিফাগণসহ সমস্ত সরকার ক্ষমতার

জোর দখলকারী। ফলে ইসলামের প্রথম তিন খলিফা, আবুবকর, ওমর ও ওসমানকে শীয়াগণ ক্ষমতার 'জোর দখলকারী' বিবেচনা করে।

শীয়াগণ প্রত্যাবর্তনের মতবাদে বিশ্বাস করে। জরথুস্ত্রদের ত্রাণকারীর প্রত্যাবর্তন, ইহুদী ধর্মের মছিহ্-এর আগমন এবং খ্রীস্টান ধর্মে যীশুর 'দ্বিতীয় আগমন'-এর সঙ্গে ইহার প্রভূত মিল রহিয়াছে। অধিকাংশ শীয়া বিশ্বাস করে যে, ইমাম বার জন ছিলেন এবং ইহাও বিশ্বাস করে যে দ্বাদশ ইমাম, মাহদী (মসিয়াহ্) লুক্কায়িত রহিয়াছেন এবং শেষ পর্যন্ত তিনি পুনরায় আগমন করিয়া সমস্ত পৃথিবীকে শীয়া ইসলামের আওতাভুক্ত করিবেন। নিম্নে বার জন ইমামের নাম দেওয়া গেল।



শীয়াদের আরেক ভাগকে জায়দী বলা হয়। কারণ তাহারা হোসইনের পৌত্র জায়েদ পর্যন্ত আসিয়া থামিয়া যায় এবং তাঁহাকে তাহাদের নেতা মনে করে। তাহারা প্রত্যাবর্তনের মতবাদে বিশ্বাস করে না এবং সুন্নীদের সহিত তাহাদের অনেকাংশে মিল রহিয়াছে।

শীয়াদের আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দল হইল ইসমাইলীগণ বা সপ্তমীগণ। ষষ্ঠ ইমামের দুই ছেলে ছিল, ইসমাইল ও মূসা। তিনি প্রথমে ইসমাইলকে ইমাম নিযুক্ত করেন কিন্তু ইসমাইলের মদ্যপানের অভ্যাস দেখিয়া তিনি পরে ইমামতি মূসাকে দান করেন। ইসমাইল তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে পরলোকগমন করেন। তাহা সত্ত্বেও এই দল ইসমাইলকে সপ্তম ইমাম মনে করে। তাহারা সাত 'নম্বরের' উপর 'গুপ্ত অজ্ঞাত রহস্যের' প্রবর্তন করে। সমগ্র ইসলামে তাহাদেরই সুপ্রতিষ্ঠিত মিশনারী কার্যাবলীর একজন নেতা ফাতেমীয় খেলাফত প্রতিষ্ঠা করেন।[১]

আরেকটি সুপরিচিত শাখাকে এ্যাসাসিন বা আত্‌তায়ী (আরবী 'হাশিশীন') বলা হয়। কারণ, হত্যাযজ্ঞের কাজে বাহির হইবার পূর্বে তাহারা তাহাদের স্বেচ্ছাসেবকদিগকে হাশীশ (গাঁজা জাতীয়) ধূমপান করাইত। তাহাদের প্রতিষ্ঠাতা হাসান আল-সাব্‌বাহ্ (মৃঃ ১১২৪ খ্রীঃ) কাজভীনের উত্তর-পশ্চিমে আল-বুরজ্ পর্বতের সুউচ্চ ও দুর্গম দুর্গ—আলামুতে তাহার প্রধান ঘাটি স্থাপন করেন। হাসান আল-সাব্বাহর কার্যাবলী মূলতঃ রাজনৈতিক এবং বাহ্যতঃ সুন্নী বিরোধী। বস্তুতঃ সুন্নীদের সমর্থনকারীদিগকেও তাহারা বাধা প্রদান করে। নিজাম আল-মূলক ছিলেন একজন খাঁটি সুন্নী এবং তিনি অনেকগুলি নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। এগুলিতে অন্যান্য বিদ্যা ও শাস্ত্রগুলির সঙ্গে আশারী মতবাদও শিক্ষা দেওয়া হইত। স্বভাবতঃই তিনি এ্যাসাসিনদের লক্ষ্যে পরিণত হন এবং আত্‌তায়ী ঘাতকের হাতে নিহত হন। আলামুতের বিরুদ্ধে অনেকগুলি অভিযানই ব্যর্থ হয় এবং শেষ পর্যন্ত বাগদাদ ধ্বংসকারী মোঙ্গলদের হাতে আলামুত বিজিত ও বিধ্বস্ত হয়।[২]

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ৯২ (মূল গ্রন্থ)।
২। নীচে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১৩১ (মূল গ্রন্থ)।

সূফী মতবাদ

সুফীবাদ বা ইসলামী অতীন্দ্রিয়বাদ ধর্মের ক্ষেত্রে আরও একটি সম্প্রসারণ। ইহার অনুসারীগণ কম্বলের তৈয়ারী জামা (সুফ) পরিধান করে বলিয়া ইহাকে এই নামে অভিহিত করা হয়। সুফীবাদ আরবী-ভাষী লোকদের মধ্যে জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সর্বপ্রথম মুসলিম অতীন্দ্রিয়-বাদীদের মধ্যে একজন ছিলেন কুফার প্রসিদ্ধ মহিলা রাবিয়া (মৃত্যু ৮০১ খ্রীস্টাব্দ)। ইসলামী ধর্মীয় ইতিহাসের কিছু সংখ্যক পণ্ডিতদের মতানুসারে সুফীবাদ হইল 'ধর্মীয় ক্ষেত্রে পারস্য মনোভাবের সর্বোচ্চ প্রকাশ'। বিখ্যাত অতীন্দ্রিয়বাদী গাজ্জালী, আত্তার, রুমী, হাফেজ প্রমুখ এই দাবীর সত্যতা বহন করেন। বস্তুতঃ প্রত্যেক ধর্ম ইহার নিজস্ব আকারের অতীন্দ্রিয়বাদ সৃষ্টি করে। ইসলামে, সুফীবাদ আশারী ধর্মতত্ত্বের আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টির বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়াও বটে। সুফীদের মতানুসারে পৃথিবী আল্লাহর অভিব্যক্তি এবং আল্লাহর গুণাবলী ও মানুষের মধ্যে একটি সত্যিকার সাদৃশ্য রহিয়াছে। খ্রীস্টানদের সন্ন্যাস প্রথা এবং বাইবেলের অতীন্দ্রিয়বাদী প্রকৃতি সুফীদিগকে আকৃষ্ট করে। রুমী বলেন, "যীশুর আশ্রম হইল অতীন্দ্রিয়বাদী লোকদের স্থান।" হাফেজের নিকট 'গীর্জা' আনন্দ ও উন্মুক্ততায় পরিপূর্ণ; অপরদিকে 'মসজিদ' অন্ধকার ও কঠোর। সুফীগণ বিশ্বাস করেন যে রক্ষণশীলতা ইসলামকে একটি কুঠরীতে আবদ্ধ করিয়াছে। সুফীগণ সেই কুঠরী (কিস্‌র) ভাঙ্গিয়াছে। এই কাজটি পাপ হইলেও প্রয়োজনীয়।

সুফীগণ প্রথম যুগের খ্রীস্টানদের মত নিজদিগকে 'সঠিক পথের লোক' বলিয়া অভিহিত করে। এই ভাবধারা মূর্ত হইয়াছে এই দাবীর মধ্যে যে মানুষের আত্মাকে তাহার সৃষ্টিকর্তা হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে এবং আল্লাহতে প্রত্যাবর্তনের জন্য ইহাতে কামনা বিদ্যমান রহিয়াছে, যাহাতে ইহা পুনরায় আল্লাহর মধ্যে বিলীন হইতে পারে। 'পাখীদের কথোপ-কথন' নামক অনিন্দ্য রূপক গল্পে, আত্তার পাখীদের (মানবকুল) গল্প বর্ণনা করেন। পাখীগণ 'কাফ' পর্বতের অপর পারে বসবাসকারী তাহাদের রাজা 'সি মোরগের' (আল্লাহ) অনুসন্ধান করিতে গেল। তাহাদিগকে সাতটি উপত্যকা (শর্ত) অতিক্রম করিতে হয়ঃ (১) অনুসন্ধান, (২) প্রেম,

(৩) বোধশক্তি, (৪) বিচ্ছিন্ন করণ, (৫) ভাবসম্মিলন, (৬) বিস্ময়, (৭) মিলন এবং লীন। রাজার অনুসন্ধানে বহির্গত হাজার হাজার পাখীদের মধ্যে মাত্র ৩০টি পাখী, ফার্সী ভাষায় 'সি' (৩০) 'মোরগ' (পাখী) গন্তব্যস্থলে পৌঁছিল। অবশিষ্টগুলি পথিমধ্যে ধ্বংস হইয়া গেল এবং অনেকগুলি নিজেদিগকে বাঁচাইবার জন্য একে অন্যকে হত্যাও করিল। দুর্দশাগ্রস্ত ৩০টি পাখী যাহারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছিল, রাজার উজীর তাহাদিগকে কঠোরভাবে পরীক্ষা করিলেন। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর প্রবেশ দ্বার খোলা হইল এবং পর্দা সরান হইল। তাহারা প্রবেশ করিয়া শান্তি লাভ করিল। কিন্তু একে অপরের দিকে তাকাইয়া তাহারা বুঝিল যে, তাহারাই 'সি' মোরগ (আল্লাহ্) এবং সি মোরগ তাহারা ৩০টি পাখী ছাড়া আর কেহ নহে। বহির্দুনিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর তাহারা নিজেদিগকে আদি অস্তিত্বে দেখিতে পাইল।

খোরাসানের জালাল-উদ্দীন রুমীকে (১২০৭—১২৭৩ খ্রীঃ) অতীন্দ্রিয়বাদীদের রাজা বলা হয়। তিনি এশিয়া মাইনরের কোনিয়ায় বাস করেন ও পরলোক গমন করেন। অতএব তাঁহার নাম রুমী (রোমান)। তাঁহার কবিতার গ্রন্থ মসনভী, দৈনন্দিন জীবন হইতে গৃহীত ঘটনাবলীতে পূর্ণ, যাহাতে আল্লাহর সঙ্গে মিলনের পথ প্রদর্শন করা হইয়াছে। একটি খাঁটি ও মার্জিত অন্তরে আল্লাহর সৌন্দর্য অধিক পরিষ্কারভাবে অভিব্যক্ত হইতে পারে। তিনি মৌলভীদের (তুর্কী, মেভ্লেভী) রীতি প্রতিষ্ঠা করেন। সঙ্গীতের তালে নৃত্য করে বলিয়া তাহারা 'নৃত্যরত দরবেশ' নামে পরিচিত।

শিরাজের হাফেজ, অতীন্দ্রিয়বাদী হিসাবে রুমীর চাইতে আরও অধিক আনন্দিত ও প্রফুল্ল। তিনি মদ, গোলাপ ও প্রেমকে রূপক হিসাবে ব্যবহার করেন, যাহা পারলৌকিক অতি উচ্চমানের আনন্দদায়ক মদের ন্যায়, উপভোগ্যও, তিক্তও। তিনি 'মাগীয়দের মন্দিরে প্রভুর আলো' দেখিতে পান এবং 'শরাবের পেয়ালায় (তাঁহার) প্রিয়ার চেহারা দর্শন' করেন। সমস্ত সুফীদের ন্যায় তিনি মনের উপর অন্তরের আধিপত্যে বিশ্বাস করেন। "প্রেমের মঞ্চ পাণ্ডিত্যের মঞ্চের চাইতে অনেক উপরে। যে সে-প্রেমের চৌকাঠ চুম্বন করিতে পারে সে তাহার জীবন বিপদাপন্ন করিতে প্রস্তুত।"

তবে গাজ্জালীই (১০৫৮—১১১১ খ্রীঃ) একমাত্র মনীষী যিনি সুফীবাদকে

পরীক্ষা করেন এবং পরে একজন ধর্মতত্ত্ববিদ-এ পরিণত হন। তিনিই সুফী-বাদকে রক্ষণশীলদের সমাজে গ্রহণযোগ্য করিয়া তোলেন। ফলে সুফী-গণ কখনও ইসলামী সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। শীয়া এবং সুন্নী উভয়ের মধ্যে সুফী রহিয়াছে এবং এইসব সুফীর আলাদা আলাদা পদ-মর্যাদাও রহিয়াছে। এইসব পদের একটি হইল বেকতাশী, যাহার মধ্যে সমস্ত ওসমানীয় সুলতানগণ অন্তর্ভুক্ত। আরেকটি হইল কিজিলবাস বা 'লাল মস্তক' যাহার নেতৃত্ব করেন ইরানের সাফাভীয় শাহগণ।[১] তবে অধিকাংশ সুফী পদের সঙ্গে রাজনীতি বা যুদ্ধের কোন সম্পর্ক নাই।

আইন

ধর্ম বা আইন এই দুইটির কোন্‌টি ইসলামে অধিক গুরুত্বপূর্ণ তাহা বলা দুষ্কর। মুসলমানগণ মোটের উপর ধর্মের চাইতে আইনের শ্রেণীবিন্যাসে অধিক সময় ও চিন্তা ব্যয় করে। আইন ও ধর্ম একই মুদ্রার দুই পিঠ। আইন আল্লাহর ইচ্ছা এবং ইসলাম হইল উহার প্রতি আনুগত্যের মাধ্যম। মুসলমানদের বিশ্বাস ইহুদী ও খ্রীস্টানগণ আল্লাহর আইনকে দূষিত ও জটিল করিয়াছে এবং আল্লাহ্ হযরত মুহম্মদকে (সঃ) প্রেরণ করিয়াছেন সেই দ্বিধা অপসারণের জন্য। মধ্যযুগে ইহুদী ধর্ম, খ্রীস্টান ধর্ম ও ইসলাম ইতিহাসের অন্য কোন যুগের তুলনায় অধিকতর একে অপরের নিকটবর্তী ছিল। বিশ্বের শাসনকর্তা আল্লাহর আনুগত্যের দাবী করে এবং মানুষকে আইন প্রদান করে—এই হিসাবে আল্লাহ সম্পর্কে তিনটি ধর্মের ধারণাই এক। ইহুদী ধর্মে আল্লাহ ইহা প্রদান করেন মূসা ও ধর্মযাজকদিগকে, খ্রীস্টান ধর্মে প্রদান করেন খ্রীস্টের গীর্জাকে, ইসলাম প্রদান করেন হযরত মুহম্মদকে (সঃ) এবং বিশ্বাসীদের সম্প্রদায়, উম্মাকে।

ইসলামী আইনের অতি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হইল পবিত্র কোরান। কিন্তু বিস্তৃত সম্প্রদায় শীঘ্রই আবিষ্কার করিল, কোরানের দ্বারা সকল মীমাংসা সম্পন্ন করা দুঃসাধ্য। অধিকন্তু রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিতর্কগুলি মুসলমান-দিগকে জিজ্ঞাসা করিতে বাধ্য করিল—এইসব ব্যাপারে হযরত মুহম্মদ (সঃ) হইলে কি করিতেন? অথবা রসুলুল্লাহ (সঃ) কি করিয়াছেন? প্রারম্ভিক

১। নীচে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১৬৩ (মূল গ্রন্থ)।

বৎসরগুলিতে অনেকেই ছিলেন, যাহারা তাঁহাকে জানিতেন এবং তাহারা সেই ভিত্তিতে তাঁহার কর্মপন্থা (সুন্নাহ) বর্ণনা (হাদ্দাসা) করেন। এইভাবে কোন জটিল সিদ্ধান্ত করিতে কোন ধর্মীয় বা নৈতিক বিতর্কের সমাধান করিতে, কোন জটিল আইনসংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করিতে, কোন নতুন আদর্শ উত্থাপন করিতে এবং হাজারো কাজ সমাধা করিতে হাদিস বা রসুলের (সঃ) কর্মপন্থা ব্যবহৃত হইত। অতি গভীর ও আইন সংক্রান্ত প্রশ্ন হইতে শুরু করিয়া তিনি যেভাবে দাঁত পরিষ্কার করিতেন বা তরমুজ খাইতেন সমস্ত ব্যাপারে তাঁহার কর্মপন্থ দৃষ্টান্ত হইয়া যায়।

মুসলমানগণ সময়ের দিক দিয়া হযরত মুহম্মদের (সঃ) নিকট হইতে যতদূর সরিয়া গিযাছে হাদীসের সংখ্যাও তত বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রায় ৬০০,০০০ হাদীস চালু হয়। হাদীস, জ্ঞান-বিজ্ঞানের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ শাখায় পরিণত হয় এবং মুসলিম 'ইতিহাস-সংকলন' বিদ্যার পথিকৃৎ হইয়া উঠে। প্রত্যেক হাদীসের দুইটি অংশ আছে ঃ একটি বক্তা বা বক্তার ক্রমধারা (ইসনদ) এবং একটি মূল বচন (মতন)। নিম্নে বোখারীর সংকলন হইতে লওয়া হাদীসটি হইল ইহার যথার্থ উদাহরণ ঃ

> আবদুল্লাহ ইবনে আল-আসওয়াদ আমাকে বলিয়াছেন ; আল-ফজল ইবনে আল-আলা আমাদিগকে ইসমাইল ইবনে উমাইয়া, ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাইফীর বরাত দিয়া বলিয়াছেন যে তিনি ইবনে আব্বাসের আযাদকৃত আবু মা'বাদকে বলিতে শুনিয়াছেন, "আমি ইবনে আব্বাসকে বলিতে শুনিয়াছি ঃ 'যখন হযরত মুহম্মদ (সঃ), তাঁহার উপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হউক, মু'য়াদকে ইয়েমেনে পাঠান, তিনি তাহাকে বলিলেন ..।[১]

বিশ্বাসযোগ্যতার দিক হইতে হাদীস তিন প্রকারের আছে ঃ খাঁটি, মোটামুটি খাঁটি ও দুর্বল। পরীক্ষা করিবার ভিত্তি হইল বক্তার ক্রমধারায়

১। ইংরেজীতে Said Mu'adh to Yaman [illegible]। [illegible] Sent Mu'adh to Yaman হবে।—অনুবাদক।

বিশ্বাসযোগ্যতার উপর, মূল বচনের প্রকৃতির উপর নহে। নীতি হইল, এই ক্রমধারা নির্ভরযোগ্য হইলে মূল বচন সত্য।

ছয়টি খাঁটি হাদীস-সংকলন রহিয়াছে কিন্তু সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হইল বোখারার অধিবাসী মুহম্মদ ইবনে-ইসমাইল-আল বোখারীর (৮১০—৮৭০ খ্রীঃ) সংকলন। ১৬ বৎসরে তিনি যে ছয় লক্ষ হাদীস সংগ্রহ করেন তন্মধ্যে প্রায় সাড়ে সাত হাজার হাদীস খাঁটি বক্তার বলিয়া বাছিয়া লন। এইসব সংকলনের স্থান কোরানের পরেই এবং ইহাদের প্রামাণিকতা প্রশ্নাতীত। কোরান ও হাদীস আল্লাহর আইন, শরিয়তের সমষ্টি—যাহা পরে ইসলামী আইনশাস্ত্রের ভিত্তিমূল হইয়া দাঁড়ায়।

তবে ইসলাম খুব দ্রুত প্রসার লাভ করে বলিয়া বিভিন্ন বেসামরিক, অপরাধমূলক ও রাজস্বসংক্রান্ত সমস্যার উদ্ভব হয়—যাহা দেশ ভেদে বিভিন্ন প্রকারের এবং বহুবিধ সমস্যার সৃষ্টি করে। ঐসব সমস্যা সমাধানের জন্য আরও দুইটি আদর্শ যোগ করা হয়। একটি হইল 'কিয়াস' বা সাদৃশ্য: ইহা ব্যবহৃত হয় যখন কোন সমস্যাকে কোরান ও হাদীসের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত আদর্শ দ্বারা সমাধান করা যায় না। অন্যটি হইল 'ইজমা' বা জাতির সমষ্টিগত মত—যাহা উত্তম পন্থা ও প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবার জন্য একটি চমৎকার উপাদানে পরিণত হয়। বিচারকগণ নিজস্ব বিচার বা রায়ের আশ্রয়ও নিতে পারেন, কিন্তু ইহা কখনও নির্ভরযোগ্য অনুমোদন লাভ করে নাই। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইজমা বা কিয়াস প্রযোজ্য হইবে তখনই শুধু যখন পবিত্র কোরান ও হাদীস হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যাইবে না।

আইনের প্রতিষ্ঠান সমূহ

কোরান ও হাদীসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা এবং স্থান-কালের বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় সাতটি আইনের প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়, তন্মধ্যে চারিটি সুন্নীদের মধ্যে এবং তিনটি শীয়াদের মধ্যে।

১। হানাফী প্রতিষ্ঠান (সুন্নী): ইহার নামকরণ হয় ইমাম আবু হানিফার নামে। তিনি প্রায় ৬৯৯ খ্রীস্টাব্দে ইরানে জন্মগ্রহণ করেন এবং একজন কাপড়ের ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি উমাইয়াদের বিরোধী ছিলেন

এবং পরে আববাসীয়দেরও বিরোধী হইয়া পড়েন। তাঁহাকে বন্দী করা হয় এবং ৭৬৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি জেলখানায় মারা যান। তিনি কোন গ্রন্থ নিজে লিপিবদ্ধ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার ছাত্রদের দ্বারা প্রচারিত মতাদর্শ বিশ্বের সুন্নী মুসলমানদের অর্ধেকেরও অধিক লোক অনুসরণ করে। তিনি সাদৃশ্য বা কিয়াস ও সমতার আদর্শের উপর জোর দেন—যাহা 'প্রাকৃতিক আইনের' উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত। ইসলামের আইন প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে তাঁহারটি সব চাইতে সহিষ্ণু। কথিত আছে যে তিনি মনে করিতেন কোরানকে অন্যান্য দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করা উচিত এবং নামাজ আরবী ভাষা ছাড়া অন্যান্য ভাষাতেও পরিচালনা করা যায়। ওসমানীয় তুর্কীগণ হানাফী ব্যবস্থা অনুসরণ করে, এবং ইহা ভারতবর্ষ, আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ায়ও প্রচলিত।

২। মালেকী প্রতিষ্ঠান (সুন্নী): এই প্রতিষ্ঠান মদীনার মালীক ইবনে আনাস (৭১৫—৭৯৫ খ্রীঃ) প্রতিষ্ঠা করেন। প্রায় ১৭০০ আইনানুগ হাদীসের দ্বারা সম্বলিত তাঁহার গ্রন্থ প্রথমবারের মত জাতির সমষ্টিগত মতের (ইজমা) আদর্শ চালু করে। ইহা হানাফী প্রতিষ্ঠানের চেয়েও অধিক রক্ষণশীল এবং মিসর বহির্ভূত উত্তর-আফ্রিকার মুসলমানগণ ইহার অনুসরণ করে।

৩। শাফেয়ী প্রতিষ্ঠান (সুন্নী): রক্ষণশীল মালেকী এবং উদার পন্থী হানাফীদের মধ্যবর্তী। ইহার প্রতিষ্ঠাতা মুহম্মদ ইবনে ইদ্রীস আল শাফেয়ী একজন কোরাইশ বংশধর। তিনি প্রায়ই বাগদাদ ও কায়রোতে বসবাস করিতেন। তিনি দুই চরমপন্থীদের মধ্যে একটি যোগসূত্র রক্ষা করেন—এবং সমস্ত প্রতিষ্ঠানকেই প্রভাবান্বিত করিতে সক্ষম হন বলিয়া ধারণা করা হয়। তিনি 'আইনের উৎস সমূহ' নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন—যাহা হাদীসের সমালোচনামূলক ব্যাখ্যাবলীর উপর রচিত। তাহার নীতি ইন্দোনেশিয়া, মিসর, পূর্ব-আফ্রিকা ও লেবাননে অনুসরণ করা হয়।

৪। হাম্বালী প্রতিষ্ঠান (সুন্নী): এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ ইবনে হাম্বল (৭৮০—৮৫৫ খ্রীঃ)। তিনি ইসলামী মৌলিকতাবাদের পুরোধা ছিলেন। তিনি জাতির সমষ্টিগত মত (ইজমা) সাদৃশ্য (কিয়াস) নিজস্ব

রায় এবং কোরান ও হাদীসের অক্ষর বহির্ভূত যে কোন প্রত্যাখ্যান করেন। মামুনের প্রতিষ্ঠিত অনুসন্ধান সংস্থার দ্বারা তিনি ধৃত হন এবং তাঁহার দুই উত্তরাধিকারীদের আমলেও জেলে থাকেন। ইবনে হাম্বলকে বেত্রাঘাত করা হয়, শিকলাবদ্ধ করা হয় ও বন্দী করা হয়। কিন্তু তিনি কিছুতেই তাঁহার মত পরিবর্তন করেন নাই। জনপ্রিয় হইবার পক্ষে অতি রক্ষণশীল এই রীতির অনুসারী মাত্র ত্রিশ লক্ষ—তাহারা হইল আরবের ওয়াহাবীদের একটা অংশ।

৫।' জাফরী প্রতিষ্ঠান (শীয়া) ঃ ইমামী প্রতিষ্ঠান নামেও পরিচিত। ইহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন ও ধর্মব্যবস্থা। ইহা কিয়াস, ইজমা ও রায় প্রত্যাখ্যান করে। সুন্নীগণ বিশ্বাস করে যে তাহাদের চারিটি প্রতিষ্ঠান আইন সম্পর্কে যাহা প্রায়োজন তাহা ব্যক্ত করিয়াছে—অতএব নতুন কোন মত বা পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই। তবে জাফরীগণ বিশ্বাস করে যে লুক্কায়িত ইমামই সত্যিকারের রাষ্ট্র প্রধান। তাহার অবর্তমানে তিনি তাহার মুখপাত্রগণের দ্বারা শাসন করেন—যাহাদিগকে 'মুজ্‌তাহিদ' বলা হয়। অর্থাৎ তাহারা ইমামের আদর্শ ব্যাখ্যাকারী। সাধারণতঃ একসঙ্গে তিনজন বা চারিজন মুজতাহিদ থাকেন। তাহাদিগকে বাছিয়া লওয়া হয় না বরং শুধুমাত্র সম্প্রদায়ের সবাই তাহাদেরকে জ্ঞানী, ধার্মিক ও ফতওয়া জারী করিবার মত গুণের অধিকারী হিসাবে স্বীকার করিয়া লয়। ফতওয়া বিশ্বাসীদের নিকট অবশ্য পালনীয়। সমস্ত শীয়া দ্বাদশ পন্থীগণ এই প্রতিষ্ঠানের অনুসরণ করে। ইসলামে শীয়া মতবাদীরা যেহেতু সংখ্যালঘু, অনেকদিন যাবত সুন্নীগণ ইহার অনুসারীদিগকে জ্বালাতন করিয়া আসিয়াছে। তাই ইমামী প্রতিষ্ঠান ইহার অনুসারীদের ধর্ম মত লুক্কায়িত রাখিতে অনুমতি দান করে, অবশ্য যদি সে মনে করে যে ধর্ম মত প্রকাশ করিলে তাহার জীবনাশঙ্কা রহিয়াছে। ইহাকে 'তাকিয়া' বলে।

বিবাহের ব্যাপারে, ইমামী প্রতিষ্ঠান কয়েকদিন হইতে ৯৯ বৎসর পর্যন্ত সময়ের জন্য সাময়িক আইনানুগ বিবাহের (মোতা) অনুমতি দান করে। এই সব মিলনের সন্তান-সন্ততির মালিক পিতা এবং এই সব সন্তান স্থায়ী বিবাহের সন্তানদের সমান অংশ লাভ করে না।

৬। ইসমাইলী প্রতিষ্ঠান (শীয়া): ষষ্ঠ ইমামের পুত্র ইসমাইলের নামে ইহার নামকরণ হয়। এই প্রতিষ্ঠান ও জাফরীদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, ইহাতে ইমামের শুধু একজন মুখপাত্র থাকে, যাহার মধ্যে ইমামের 'আত্মা' বাস করে। এবং যাহার মধ্যে ইমামের 'আলো' বিচ্ছুরিত হয়। ফলে ইহা নেতার ন্যায় উদার এবং রক্ষণশীল। এই পদ বংশানুক্রমিক, ইহার অতি প্রসিদ্ধ নেতা আখাগান (১৮৭৭—১৯৫৭ খ্রী), যিনি তাঁহার বংশক্রম হাসান সাব্বাহ-এর সঙ্গে যোগ করেন। তিনি তাঁহার পৌত্র করিম খানকে নতুন নেতা হিসাবে নিযুক্ত করেন। ইসমাইলীগণ ভারতবর্ষ, ইরান ও পূর্ব-আফ্রিকায় ইতঃস্তত ছড়াইয়া আছে।

৭। জায়দী প্রতিষ্ঠান (শীয়া)। চতুর্থ ইমামের পুত্র জায়দের নামে ইহার নামকরণ করা হয়। ইহা লুক্কায়িত ইমামে বিশ্বাস করে না এবং সুন্নী ইসলামের অতি নিকটবর্তী। ইহারা ইয়েমেনে সংখ্যাগুরু।

নীতি শাস্ত্র

নীতিশাস্ত্র আইনের শরিয়ত) সাহত সম্পর্কযুক্ত এবং শরিয়ত মুসলমানদের জীবনের প্রত্যেক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। যেসব নীতিগুলি শরিয়ত নিয়ন্ত্রণ করে না তাহা মানুষের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয় যাহাতে সে তাহার সমাজের রীতি অনুসারে ইহার কর্মপন্থা স্থির করিতে পারে। মুসলমানদের সমস্ত কাজ ৫টি শ্রেণীর যে কোন একটিতে পড়ে :—

১। বাধ্যতামূলক (ওয়াজিব): এইসব কাজ সম্পন্নকারী বেহেশতে পুরস্কার প্রাপ্ত হয়। এবং এইগুলির অবহেলাকারী দোজখের শাস্তিভোগ করে।

২। প্রশংসনীয় (মোস্তাহাব): যেসব কাজ করিতে সুপারিশ করা হইয়াছে। করিলে পুরস্কৃত করা হয় কিন্তু না করিলে কোন শাস্তি দেওয়া হয় না।

৩। অনুমোদিত (মোবাহ্): যে সব কাজ আইনগত ভাবে নিরপেক্ষ, যেগুলি করিলে পুরস্কৃত করা হয়। না করিলে শাস্তিও প্রদান করা হয় না।

৪। ভৎর্সনাপূর্ণ (মাকরূহ্): এই জাতীয় কাজগুলি অনুমোদন করা হয় না, কিন্তু নিষিদ্ধও নহে। না করাটা প্রশংসনীয় কিন্তু করিলে শাস্তি প্রদান করা হয় না।

৫। নিষিদ্ধ (হারাম): সেই সব কাজ যাহা করিলে শাস্তি প্রদান করা হয়।

ইসলামে কিছু সংখ্যক নীতিবিদ মনে করেন, একই কাজ উপরোল্লিখিত শ্রেণীগুলির একাধিকেও পড়িতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, ইসলামী সমাজের মধ্যে মিথ্যা বলা ও লোক হত্যা করা নিষিদ্ধ, এবং তবুও অবস্থাভেদে এইগুলি ক্রমবর্ধমান হারে অনুমোদিত শ্রেণীভুক্ত হয় এবং শেষ প্রান্তে কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধে, এইগুলি বাধ্যতামূলক কর্তব্যে পরিণত হয়।

একাদশ অধ্যায়

দর্শন, বিজ্ঞান ও মানবিক বিদ্যা

প্রথম যুগের মুসলমানদের মতে দর্শন একটি 'বিদেশী বিজ্ঞান', তাই ইসলামী ধর্মতত্ত্বের প্রতি ইহা একটি হুমকি স্বরূপ। তবে মুসলমানগণ এই হুমকির মোকাবিলা করিতে বাধ্য হয়, কারণ গ্রীক দর্শনের সহিত সুপরিচিত অনেক নব-মুসলিম ইসলামকে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করার সূত্রপাত করে। মুতাযিলাদের ন্যায় এই ধরনের চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হইয়াছে। মুসলমানদিগকে যে বিষয়টি অধিকতর অনুরাগী করে তাহা হইল শরিয়ত, যাহা একটি রাষ্ট্র ব্যতীত কার্যকরী করা যায় না এবং রাষ্ট্রকেও আবার একটি খলিফা ছাড়া অখণ্ড রাখা যায় না। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই খেলাফতই নতুন সমাজের প্রধান সমস্যা। কারণ খলিফাগণ যতই দুর্বল হইতে থাকেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী খলিফাদের উদয় হইতে থাকে, ততই এই সমস্যা আরও জটিল হইতে থাকে। ফলে মুসলিম দার্শনিকগণ রাজনৈতিক দর্শনের অনুরক্ত হইয়া পড়েন। সত্য কথা বলিতে কি, তাঁহারা দর্শনের অন্যান্য শাখা-প্রশাখা লইয়া আলোচনা করিলেও তাঁহাদের প্রধান সমস্যা ছিল সরকার। তাঁহাদের নিকট অন্যান্য কার্যাবলীর চেয়ে প্লেটোর 'রিপাবলিক' ও অ্যারিস্টোটলের 'পলিটিক্স' অধিকতর আগ্রহের বিষয় ছিল। এমন কি ইসলামী ধর্মতত্ত্বও প্রকৃতি এবং বহিঃপ্রকাশের দিক দিয়া রাজনৈতিক।

মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের পরবর্তী শতাব্দীগুলি এবং সমসাময়িক যুগ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করিবার জন্য এখানে বলা উচিত যে, মুসলিম রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক দর্শন চারিটি ধারা হইতে গৃহীত। একটি হইল কোরান এবং ইহাতে সন্নিহিত 'রাজনৈতিক ধর্মতত্ত্ব'। দ্বিতীয়

হইল মুসলিম রাজনৈতিক দার্শনিকদের অবদান। তৃতীয়টি হইল যুবরাজদের পথনির্দেশের জন্য লিখিত উপদেশ, যাহাকে "ব্যবহারিক বিধান" বলা যাইতে পারে—যাহা উপরোল্লিখিত দুইটি ধারাকে সন্নিবেশিত করিতেও পারে—আবার নাও করিতে পারে। সর্বশেষ ধারা হইল ইরানী-তুর্কী নীতি-মালা—যেগুলি মোটামুটি প্রকৃতিগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ। পরবর্তী যুগসমূহের মুসলিম সরকারগুলি উপরে বর্ণিত ধারাসমূহের দুইটি বা তিনটি বা চারিটির বিভিন্ন ধরনের সংযোগের প্রকাশ। কোরান এবং ইহার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ধর্মতত্ত্ব-রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হইয়াছে।[১] নিম্নে মুসলিম রাজনৈতিক দর্শন এবং ব্যবহারিক বিধানের উপর একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও কয়েকটি কথা সন্নিবেশিত হইল।

নবম শতাব্দীর শেষার্ধে জীবিত ইয়াকুব ইবনে ইসহাক আলকিন্দি ছিলেন আরবদের মধ্যে প্রথম দার্শনিক। সমগ্র মধ্য যুগ এবং আধুনিক যুগের প্রথম দিকে তিনিই একমাত্র মনীষী ছিলেন বলিয়া তিনি "আরব-দের দার্শনিক" উপাধি অর্জন করেন। তবে দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার অধিকাংশ পুস্তকাবলী হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া তাঁহার সম্পর্কে বেশী কিছু বলা যায় না। শুধু এইটুকু বলা যায় যে, তিনি প্লেটো ও অ্যারিস-টোটলের মতামতের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন।

ইসলামের প্রধান রাজনৈতিক দার্শনিকদের একজন ছিলেন ট্রান্সঅক্সিয়া-নার এক তুর্কী আবু নাসর আল ফারাবী (৮৭০—৯৫০ খ্রীঃ) যিনি 'দ্বিতীয় শিক্ষকের' খ্যাতি অর্জন করেন, যেখানে অ্যারিসটোটল হইলেন প্রথম। জ্ঞানী মুসলিমদের মধ্যে গ্রীক দর্শনের হস্তক্ষেপজনিত দ্বিধাকে তিনি সমাধান করিতে চেষ্টা করেন।[২] গ্রীক চিন্তাধারার কয়েকটি দিক ইসলামের সঙ্গে আপোষপূর্ণ, কিন্তু অন্যান্যগুলির সঙ্গে নহে। রাজা হইবার জন্য গ্রীক দর্শন যেখানে একজন দার্শনিকের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত, সেইখানে ইসলাম একজন নবী পাইয়াছে। গ্রীকদের নিকট আইন হইল মানুষেরই সৃষ্টি, অথচ মুসলমানদের নিকট আইন হইল আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট।

'আদর্শ নগরীর অধিবাসীদের মতামত' (Opinions of the Citizen of

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃ : ৪২–৪৩ (মূল গ্রন্থ)।
২। উপরে দ্রষ্টব্য পৃ : ৯৮ (মূল গ্রন্থ)।

the Virtuous City) নামক গ্রন্থে, ফারাবী দার্শনিক ও রসুলের সমস্যাকে উভয়ের সংযুক্তির দ্বারা সমাধান করেন। একমাত্র উদ্ভাবনশীল (রসুলের কার্যাবলী) ও জ্ঞানী (দার্শনিকের কার্যাবলী) রসুল-দার্শনিকই রাষ্ট্র গঠন করিতে ও আইন জারী করিতে সক্ষম।

ফারাবীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন বোখারার একজন পারস্যবাসী আবু আলী হোসাইন ইবনে সীনা (৯৮০—১০৩৭ খ্রীঃ)। আভিসিনা নামে পশ্চিমী সাধারণ্যে পরিচিত এই লোকটি নিঃসন্দেহে সর্বকালের মহাজ্ঞানীদের একজন। তিনি ফারাবীর কার্যাবলীর সহিত সুপরিচিত ছিলেন এবং তাঁহার নিকট ঋণের কথা স্বীকার করেন। 'শাফা' নামক তাঁহার বিশ্বকোষরূপী গ্রন্থে তিনি তাঁহার সময় পর্যন্ত গ্রীক দর্শন নামে পরিচিত সমস্ত কিছু প্রচুর টীকা সহকারে সংগ্রহ ও শ্রেণীবদ্ধ করেন। রাজনৈতিক দর্শনে তিনি ছিলেন সংযোজনকারী। তিনি ইসলামের আদর্শ রাষ্ট্র ও প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করেন। নবী হওয়া সর্বোচ্চ মানবিক জ্ঞানের ফলশ্রুতি বলিয়া তিনি ফারাবীর যুক্তিকে সংযত করেন। নবুয়তের কাজ হইল আইন জারী করা যাহা মানুষ পালন করে। তবে ফারাবীর সঙ্গে তিনি একমত হন যে নবীর অবর্তমানেও একটি উত্তম সমাজ গঠন করা সম্ভব।

এই সব মনীষী এবং তাঁহাদের সমসাময়িক যাঁহারা তাহাদিগকে অনুসরণ করেন, সবাই তাঁহাদের সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। স্মরণ করা যাইতে পারে যে, এই যুগের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বাস্তবতা হইল খেলাফতের পতন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উত্থান। বিশেষতঃ শীয়া প্ররোচনামূলক রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ফাতেমীয়গণ ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ ও আগ্রাসী। এক শতাব্দীর উমাইয়া ও আব্বাসীয় ক্ষমতা ও প্রাচুর্যের মধ্যে কায়রো হইতে ট্রান্সঅক্সিয়ানা পর্যন্ত সমগ্র সাম্রাজ্যে বৃহৎ নগরীসমূহ গজাইয়া উঠে। এই সমস্ত শহরে কেন্দ্রস্থলগুলির বণিক, কারিগর ও নব্যব্যবসায়ীগণ ছিল ধনী, বিশ্বজনীন এবং নতুন নতুন ভাবধারায় বিমোহিত। সচরাচর জনসাধারণই দুর্বল খলিফাদের অমিতব্যয়িতার আঘাত সহ্য করিত এবং তাহারা ছিল খুবই অসুখী, এইটাই সাধারণ নিয়ম।

সাধারণতঃ শীয়াগণের, বিশেষতঃ ইসমাইলীদের, একটি সুপরিচালিত মিশনারী প্রতিষ্ঠান ছিল যদ্বারা তাহারা জনসাধারণকে তাহাদের দুঃখ-দুর্দশার জন্য খলিফার বিরুদ্ধে উৎসাহ প্রদান করিত। অধিকন্তু বুদ্ধিজীবীদের সংস্পর্শে আসিবার জন্য তাহারা শহরের কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে এবং রক্ষণশীল সুন্নীদের বিরুদ্ধে তাহারা ইসলামের সঙ্গে হেলেনীয় ও পারস্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণের ব্যাপারে উৎসাহ দান করে। ফাতেমীয়গণ কার্যতঃ বাগদাদ দখলই করিয়াছিল। সুন্নীদের পক্ষাবলম্বনকারী, সেলজুক নেতা তুঘরীলের ক্ষমতা যদি না থাকিত, তবে মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস হয়ত অন্যরূপ হইত।[১] ফারাবী শীয়া হামদানীয়দের অধীনে আলেপ্পোতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আবিসিনা বোধহয় একজন শীয়া ছিলেন এবং এক ইসমাইলী পরিবারে লালিতপালিত হইয়াছিলেন।

দর্শনের ক্ষেত্রে ইসলামকে ধর্মনিরপেক্ষ করিবার যে কাজ ফারাবী ও আবিসিনা আরম্ভ করেন তাহা "নিখাদ ভ্রাতৃত্ব" (Brother of Sincerety) নামে উন্নতিশীল এক অধঃগোপনীয় সমাজের দ্বারা অব্যাহত রাখা হয়। অধিকাংশ ইসমাইলীদের দ্বারা উৎসাহিত এইসব দার্শনিক "শিক্ষা ক্লাব সমূহ" শহরের কেন্দ্রস্থলগুলিতে স্থাপন করা হয় এবং এতদ্বারা সরকারের বিরুদ্ধে আধা-রাজনৈতিক কার্যাবলী চালু রাখা হয়।

ধর্ম নিরপেক্ষ করণের ধারার মধ্যে আবিসিনা একটি সমাজতান্ত্রিক আকৃতি উদ্বোধন করেন। তাঁহার পরিকল্পনার মধ্যে তিনি পুরাতন পারস্য নীতির সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস অন্তর্ভুক্ত করেন। সমাজকে তিনি পেশা অনুসারে ভাগ করেন, যথা শাসক, প্রশাসক, কারিগর, কৃষক ইত্যাদি। ইহা আরবগণ কর্তৃক অনুসৃত বংশানুক্রমিক ভিত্তিতে সমাজের বিভক্তি করণের বিরোধী। এই স্থলে জোর দিয়া বলিতে হইবে যে, ফারাবী ও আবিসিনা উভয়েই বিশ্বাসী মুসলমান, যাঁহারা গ্রীক চিন্তাধারা এবং সুফীবাদের দ্বারাও প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে তাঁহাদের ধর্মের একটি যুক্তিপূর্ণ ভিত্তি এবং একটি রাজনৈতিক দর্শন খুঁজিয়া লইতে হইয়াছিল যাহা 'আইনানুগ' শাসক বলিয়া ঘোষিত হইতে উৎসুক এবং খলিফার

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ৯৩ (মূল গ্রন্থ)।

চেয়ে শক্তিশালী লোকদের প্রতি লক্ষ্য রাখিবে। আবিসিনা কর্তৃক পুনঃপ্রবর্তিত সামাজিক প্রথা ক্ষমতাশালী লোকদিগকে আইনানুগত্যের সুযোগ প্রদান করে যাহারা রসুলুল্লাহ (সঃ) এর অতি দূর সম্পর্কের আত্মীয় না হইয়াও শাসনকার্যকে তাঁহাদের পেশা বিবেচনা করিতে পারে।

আবিসিনার মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসর পরে যুবরাজদিগকে শাসন প্রণালী শিক্ষা দেওয়ার বিষয়ে অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এইসব গ্রন্থকে সাধারণতঃ 'ব্যবহারিক বিধান' বা 'যুবরাজদের দর্পণ' নামে উল্লেখ করা হয়। এইগুলির মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ হইল প্রায় ১০৮২ খ্রীস্টাব্দের জিয়ারিদ ক্ষুদ্র রাজ্যের জন্য লিখিত গ্রন্থ 'কাবুসনামা' এবং তন্ন্যন ১০৯২ খ্রীস্টাব্দের সেলজুকদের[১] জন্য লিখিত 'সিয়াসতনামা'। এই সমস্ত গ্রন্থে সাসানীয় রাজাদের নিকট হইতে গৃহীত ঘটনাবলী, বাণী ও উদাহরণের মাধ্যমে শাসন পরিচালনার কায়দা শিক্ষা দেওয়া হয়। এই গ্রন্থগুলিকে মুসলিম রাজনৈতিক দর্শন গঠনের ব্যাপারে আরেকটি প্রভাব বলিয়া বিবেচনা করা হয়, যাহা গ্রীকও নহে ইসলামীও নহে। উদাহরণ স্বরূপ 'কাবুসনামার' আমরা দেখিতে পাই যে, রাজার দায়িত্ব হইল কৃষিকার্যের উন্নতি সাধন করা। কারণ, "উত্তম সরকার রক্ষা করা হয় সেনাবাহিনী দ্বারা, সেনাবাহিনী পালন করা হয় স্বর্ণমুদ্রার দ্বারা; স্বর্ণমুদ্রা আহরণ করা হয় ভূস্বামীদের (দেহকান) কর দ্বারা; এবং ভূমি-খামারগুলি রক্ষা পায় কৃষকদের প্রতি ন্যায়বিচার ও সদাচারণের মাধ্যমে।"

স্বভাবতঃই ফারাবী ও আবিসিনার উপসংহার রক্ষণশীলদের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না। উভয়ে মনে করেন নবুয়ত ঐশী বাণীর মাধ্যমে আল্লাহর একটি বিশেষ দান নয় বরং একটি স্বাভাবিক অবস্থা যাহা চিন্তাশক্তি অথবা 'কার্যকরী বুদ্ধিমত্তার' মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব। তাঁহাদের মতানুসারে কোন রসুল বা ইসলামী ঐশীবাণী ছাড়াই "আদর্শ নগরী" প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। সেলজুকদের ক্ষমতার দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়া রক্ষণশীলগণ এইসব ধর্মবিরোধী মতামতের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান এবং শাফেয়ীগণ ইসমাইলীদের ন্যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহও খুলিয়া বসে।

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ৯৩ (মূল গ্রন্থ)।

রক্ষণশীল ধর্মতত্ত্ববিদদের অতি ক্ষমতাশালী পৃষ্ঠপোষক নিজামুল মুল্‌ক প্রশাসনের সমস্ত বিভাগে রক্ষণশীল বেসামরিক প্রশাসক নিয়োগ করেন। প্রশাসনিক যন্ত্রের প্রত্যেক ধারায় এবং সমাজে মুসলিম শরিয়ত কার্যকরী করিবার জন্য এই রক্ষণশীল আমলাগণ বেশ গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হন। সুন্নী রক্ষণশীলদের সমর্থনে তাঁহার কার্যকলাপের জন্যই নিজামুল মুল্‌ক শীয়া ইসমাইলীয় দলের অন্তর্ভুক্ত এ্যাসাসীনদের নিযুক্ত ঘাতকের দ্বারাই নিহত হন।

তবে রক্ষণশীলগণ দার্শনিকদের প্রভাবও দূর করিতে পারে নাই, অবস্থার বাস্তবতাও দূর করিতে পারে নাই। এমন কি নিজামুল মুল্‌ক তাঁহার গ্রন্থে অমুসলিম পারস্য ঐতিহ্য ও নীতিশাস্ত্র সন্নিবেশিত করেন। গাজ্জালী যিনি সেলজুকদের আমলে নিজামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করেন, উম্মার ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বলেন, খেলাফতের পদের জন্য ধার্মিকতাই একমাত্র প্রয়োজনীয় যোগ্যতা। ফলে, খলিফার পক্ষে শাসনকারী সুলতানের হাতে আইনগতভাবেই ক্ষমতা ন্যস্ত করা যায়। গাজ্জালীর মতানুসারে, খলিফার নাম শুক্রবারের খোতবায় উল্লেখ এবং মুদ্রায় খোদাই, উম্মার ঐক্যের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

ইবনে তায়মিয়্যা (১২৬৩—১৩২৮ খ্রীঃ) মৌলিক ভাববাদী হাম্বালী প্রতিষ্ঠানের লোক ছিলেন। তিনি মামলুকদের সময় ধর্মচর্চা করেন, যখন কোন খলিফাই ছিলেন না। তিনি আরও মারাত্মক আপোষ-মীমাংসা উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলের শক্তি রাখেন, তিনিই আইনানুগ শাসক, তবে তিনি যদি শরিয়ত পালন করেন। তাঁহার নিকট "সুলতান, সেনাবাহিনী ও অর্থ ছাড়া ধর্ম যেমন নিষ্ফল; ধর্ম ছাড়া সুলতান, সেনাবাহিনী ও অর্থ তেমনি নিষ্ফল।" ইহা হইতে মাত্র একটি সংক্ষিপ্ত পদক্ষেপ হইল এই দাবী যে, একজন সুলতান (খলিফা নহে) আল্লাহর ক্ষমতা বলেই শাসন করে। ওসমানীয়গণ সেই সংক্ষিপ্ত পদক্ষেপই গ্রহণ করে।

বিজ্ঞান ও মানবিকতা

মধ্যযুগের ঐতিহ্য অনুযায়ী মুসলিম বিদ্বানদের জ্ঞানের এক বিস্তৃত

পরিসর ছিল। একজন দার্শনিকের পক্ষে বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ হওয়া, গণিত শাস্ত্রের সমীকরণগুলির সমাধানে সক্ষম হওয়া এবং সঙ্গীত ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপর (শুধু কয়েকটি নাম করিলে) জ্ঞানগর্ভ সমীক্ষা রচনা করা ছিল অতি সাধারণ ব্যাপার। তাঁহাদের কয়েকজন, যথা ওমর খাইয়াম অবসর বিনোদনের জন্য কবিতা লেখেন। মুসলমানগণের মতে বিজ্ঞান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—"ধর্মীয় বিজ্ঞান" ও "শারীরিক বিজ্ঞান"। মানবিকতাকে সাধারণতঃ এবাদিয়্যাত বলা হয়। পদ্য ও গদ্য অন্তর্ভুক্ত এইগুলির অধিকাংশই ছিল নৈতিক গল্প। এই দুই শ্রেণীর মাঝামাঝিতে ছিল ভূগোল ও ইতিহাস।

চিকিৎসাবিদ্যা

প্রথম যুগের ইসলামের ইতিহাসে চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ন্ত্রিত হয় পারস্য খ্রীস্টানদের দ্বারা। আরব অধিকারের সময় ইরানের গুণ্ডিশাপুরে অবস্থিত সাসানীয় চিকিৎসা কেন্দ্র ও হাসপাতালটি চালু ছিল। বাগদাদে হারুন কর্তৃক নির্মিত হাসপাতালটি পারস্য ধাঁচে তৈয়ারী এবং ইহা পারস্য নাম "বিমারীস্তান" হিসাবে পরিচিত। চিকিৎসাবিদ এবং ঔষধবিজ্ঞানী উভয়কেই বিশেষ পরীক্ষা পাশ করিতে হইত। এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, চিকিৎসাবিদগণ শপথ গ্রহণের মাধ্যমে আবদ্ধ থাকিতেন। গুণ্ডিশাপুর হাসপাতালের অধ্যক্ষ ছিলেন জিব্রীল ইবনে বখতিশু নামে একজন খ্রীস্টান। তিনি এবং তাঁহার পরিবারের অন্যান্য আব্বাসীয়দের রাজ-চিকিৎসক হিসাবে কাজ করেন। গ্রীক ও পারস্য চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থের আরবী অনুবাদকারী এবং অন্যান্য বিখ্যাত চিকিৎসাবিদদের মধ্যে হুনাইন ইবনে ইসহাক (৮০৯—৮৭৩ খ্রীঃ), ইউহান্না ইবনে মাসাওয়েহ (৭৭৭—৮৫৭) নামক চক্ষু চিকিৎসাবিদ ও তাবারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তবে চিকিৎসাশাস্ত্রে অতি মৌলিক কাজ করেন দুইজন পারস্যবাসী—রাযী ও আবিসিনা। মুহাম্মদ ইবনে জাকারিয়া আল রাযী (৮৬৫—৯২৫ খ্রীঃ) আধুনিক ইরানের রাজধানী তেহরানের নিকটবর্তী রায় নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থানের নামানুসারে তাঁহার নাম হয় 'রাজী'। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি সাসানীয় ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায়

অতিবাহিত করেন এবং কিছুকালের জন্য বাগদাদের প্রধান চিকিৎসক নিযুক্ত হন। তিনি একজন অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থকার। প্রধান গ্রন্থ 'আল-হাভী' সহ (চিকিৎসাবিদ্যায় ব্যাপক গ্রন্থ) লাতিন ভাষায় এবং পরে ফরাসী, জার্মান ও ইংরেজী ভাষায় অনূদিত হয়। শল্যচিকিৎসায় তিনি সূতার পলিতা (Seton) আবিষ্কার করেন এবং মূত্রগ্রন্থির পাথর, গুটি-বসন্ত ও হাম রোগের উপর গবেষণা করেন। দর্শনের গ্রন্থসমূহে তিনি যুক্তিবাদের সপক্ষে ওকালতী করেন বলিয়া রক্ষণশীলদের কোপানলে পতিত হন এবং স্বীয় দর্শন ও ব্যক্তিগত আচরণের জন্য তাঁহাকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়।

আবিসিনা, যিনি দার্শনিক ও একজন বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ, তিনিও গণিতশাস্ত্র, শিল্পকলা ও সঙ্গীত সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন। অতি অল্প-সংখ্যক উল্লেখযোগ্য মুসলিম বিদ্বানদের মধ্যে যাঁহারা আংশিক আত্ম-জীবনচরিত রাখিয়া গিয়াছেন তিনি তাঁহাদের মধ্যে একজন। দশ বৎসর বয়সে তিনি কোরান আয়ত্ব করেন এবং সাহিত্যেও পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ১৬ বৎসর বয়সে তিনি একজন পুরাদস্তুর চিকিৎসাবিদ হইয়া উঠেন এবং সাসানীয় বাদশাহের চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে তলব করা হয়। সেখানে তাঁহাকে বাদশাহের বিশাল গ্রন্থাগারের প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় এবং 'পরবর্তী আঠার মাস' তিনি অধ্যয়নে অতিবাহিত করেন। ১৮ বৎসর বয়সে তিনি "এইসব বিজ্ঞান আয়ত্ব করেন," অর্থাৎ দর্শন, তর্কশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি। এই মনীষী দাবী করেন যে, চিকিৎসা-বিদ্যা কোন "জটিল বিজ্ঞান নহে" এবং চিকিৎসাবিদ্যার উপর তাঁহার প্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ 'কানুন' রচনা করেন। ইহা চিকিৎসাবিদ্যার উপর অন্যান্য কার্যাবলীর স্থলাভিষিক্ত হয় এবং সপ্তদশ শতাব্দীতেও বেশ কিছুকাল পর্যন্ত ইউরোপের বিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। তিনি ছোঁয়াচের উপর এবং পানি ও মাটির দ্বারা রোগ বিস্তারের বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করেন। মেটিরিয়া মেডিকার উপর তিনি এক খণ্ড গ্রন্থ রচনা করেন যাহাতে শত শত ঔষধের শ্রেণীবিন্যাস করেন ও সেইগুলি সম্পর্কে অভিমত প্রকাশ করেন।

তাঁহার জীবন বিশৃঙ্খলার ভিতর অতিবাহিত হয়, কারণ তাঁহাকে রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে যাইতে বাধ্য করা হয়। যুদ্ধযাত্রা ব্যতীত তিনি

কখনও ইরান ত্যাগ করেন নাই। রক্ষণশীল মনোভাবের অভাবের ফলেও তিনি অভিযুক্ত হন। রাবীর তুলনায় তিনি নিজের পক্ষ সমর্থন করিতে যথেষ্ট সময় লইয়াছিলেন। ফলে আবিসিনা নিম্নলিখিত কবিতা রচনা করেন :

"তোমরা চিৎকার কর যে আমি স্বধর্ম ত্যাগ করিয়াছি
এবং আমাকে অঙ্গুলি নির্দেশ কর ; তবুও আমি বলি
আমার ন্যায় একজন লোকের অবিশ্বাস
আকাশের স্তম্ভগুলিকে কাঁপাইয়া দিত।
রসুলুল্লাহর নামে আদায়কৃত সমস্ত মানুষের নামাজ
আমার নামাজ—তবুও আমারগুলি অনবদ্য :
আমার কোন সুচিন্তিত মত নাই, কোন কাজই
আমি নিয়ন্ত্রিত করি না।
কিন্তু আমার আত্মা পার্থক্য বলিয়া দেয়,
তাহা হইলে এই কি সেই ব্যক্তি যাহাকে তোমরা
কাফের বল ?
বলিয়া যাও, দাম্বী সাব্যস্তকারীগণ, কিন্তু ভালভাবে
বিবেচনা কর :
আমি যদি তাহার নিকট হইতে ফিরিয়া থাকি, যিনি
আমার জন্মকে গুণান্বিত করিয়াছেন,
তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবীতে কোন খাঁটি মুসলমানই
থাকিবে না।"[১]

তিনি সেখানে ১০৩৭ হামাদানে পরলোকগমন করেন এবং খ্রীস্টাব্দে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়।

গণিতশাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র

গণিত এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের ক্ষেত্রে মুসলমানগণ গ্রীক ও ভারতীয় সূত্র হইতে তথ্য আহরণ করেন। গণিতশাস্ত্রে মুসলমানদের অতি গুরুত্বপূর্ণ

১। ফার্সী হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক অনূদিত এবং জন লেওইন কর্তৃক কবিতা আকারে রূপান্তরিত।

অবদান হইল 'আরবী সংখ্যা'—যাহা তাহারা ভারতীয়দের নিকট হইতে শিক্ষালাভ করিয়াছে। অবশ্য এইগুলি আয়ত্ত করিতে তাহাদের বেশ সময় লাগিয়াছিল। জ্যোতিষশাস্ত্রের ক্ষেত্রে বড় বড় মনীষীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইলেন মুহাম্মদ আল-খারাজামী, যাঁহার গ্রন্থ অনুবাদের মাধ্যমে ইউরোপে আরবী সংখ্যা ও বীজগণিতের প্রবর্তন হয়। অঙ্কের 'এলেগরিজম' নামকরণ হয় তাঁহারই নামানুসারে। জ্যোতিষশাস্ত্র ও গণিতশাস্ত্রে আরেকজন পণ্ডিত আবুরায়হান আল-বিরুনী (৯৭৩—১০৪৮ খ্রীঃ)। তিনি গজনভী রাজ্যের নৃপতিদের জন্য কাজ করিতেন। পৃথিবীর নিজস্ব অক্ষপথে আবর্তনের ভিত্তিতে তিনি মধ্যপ্রাচ্যের অনেক শহরের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ নিরূপণ করেন। দিনপঞ্জী সংস্কারে ওমর খাইয়ামের বিরাট অবদান ইতিমধ্যেই উল্লেখ করা হইয়াছে।[১] বাগদাদের ধ্বংসকারী হালাকু আজার বাইজানে একটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। এইখানে প্রসিদ্ধ জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ খোরাসানের নাসির আল-দীন তুসী জটিল জ্যোতিষশাস্ত্রীয় যন্ত্রসমূহ আবিষ্কার করেন, যথা আর্মিলারী চক্র (armillery sphere) সরলোন্নত উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র (mural quadrant) অয়নান্তকালীন আর্মিল (solstitide armil)। তাঁহার জ্যোতিষশাস্ত্রীয় তালিকাসমূহ (Tables) অনেক শতাব্দী পর্যন্ত আদর্শ হিসাবে কাজ করে। বিভিন্ন কেন্দ্রে বহু মানমন্দিরসমূহ ছিল। অধিকাংশ মুসলিম জ্যোতিষী সেই যুগে ধারণা করেন যে পৃথিবী গোল এবং আশ্চর্যজনকভাবে তাঁহারা পৃথিবীর আকার ও ব্যাস পরিমাপ করেন যাহা নির্ভুল প্রমাণিত হইয়াছে।

মুসলিম পণ্ডিতবর্গ রসায়নবিদ্যা (আলকিমিয়া), পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা এবং উদ্ভিদবিদ্যায়ও উৎসাহী ছিলেন। পরীক্ষার জন্য তাঁহাদের ল্যাবরেটরী ছিল। গুরুত্বপূর্ণ রসায়নবিদদের একজন ছিলেন জাবির ইবনে-হাইয়ান (মধ্যযুগীয় ইউরোপীয়দের নিকট তিনি 'গেবীর' নামে পরিচিত)। তিনি পদার্থকে উত্তাপ দ্বারা চূর্ণ ও লঘুকরণের প্রক্রিয়া বর্ণনা করেন এবং বাষ্প পরিস্রুতকরণ, তরলকরণ ও বাঁধনের নিয়ম জানিতেন। মধ্যযুগীয় মুসলিম বৈজ্ঞানিকদের নিকট ইউরোপীয়দের

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ৯৪ (মূল গ্রন্থ)।

অংশের পরিমাণ পাওয়া যায় রসায়নবিদ্যা, সুরাসার, রসাঞ্জন (antimony) ও অন্যান্যগুলির আরবী মূল শব্দের মধ্যে।

ভূগোল

বিজয় ও বাণিজ্যের মাধ্যমেই মুসলমানেরা পৃথিবী সম্পর্কে অবহিত হয়। আব্বাসীয় যুগে অনেক ভূপর্যটক, ব্যবসায়ী, বৈজ্ঞানিক ও ভূগোলবিদের উদ্ভব হয়, যাঁহারা তাঁহাদের পর্যবেক্ষণসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁহারা টলেমীর প্রভাবেই ছিলেন, কিন্তু ভ্রমণের পর তাঁহারা ভিন্নরূপ লক্ষ্য করেন। ফলে ভারতবর্ষ, সিংহল, চীন ও রাশিয়া সম্পর্কে তাঁহারা একগাদা বৃত্তান্তমূলক উপাদান তৈয়ার করিতে সক্ষম হন। খারাজমী পৃথিবীর একটি মানচিত্র অঙ্কন করেন, যাহা চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত চালু ছিল।

ইবনে খোরদাদবেহ অনুমান ৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিম ইরানের পোস্ট মাস্টার ছিলেন। তাঁহার নাম প্রমাণ করে যে, তাঁহার পিতা একজন জরথুস্ত্র ছিলেন। "সড়ক ও দেশসমূহ" নামক গ্রন্থে তিনি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সেই যুগের চারিটি প্রধান বাণিজ্যিক পথ বিশদভাবে বর্ণনা করেন। একটি স্পেন হইতে দক্ষিণ ইউরোপ ও এশিয়া মাইনর হইয়া কাস্পিয়ান সাগর পর্যন্ত। আরেকটি সিরিয়া ও ইরানের মধ্য দিয়া উত্তর আফ্রিকাকে ভারতবর্ষের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়াছিল। তৃতীয়টি পূর্ব ভূমধ্যসাগরের কোল ঘেঁষিয়া পারস্য উপসাগর পর্যন্ত। চতুর্থটি একটি সমুদ্রপথ, লোহিত সাগর ও ভারত মহাসাগরের মধ্য দিয়া সিংহল ও চীন পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নবম শতাব্দীতে বিখ্যাত খোরাসানের ইয়াকুবী ৮৯১ খ্রীস্টাব্দে "দেশসমূহের গ্রন্থ" নামক একটি পুস্তক রচনা করেন, যাহা ভূ-সংস্থান ও বিশেষতঃ অর্থনৈতিক ভূগোল আলোচনা করে।

সেই যুগের অন্য দুইজন ভূগোলবিদ ছিলেন পার্সিপোলিসের ইসতাখরী (আনুমানিক ৯৫০ খ্রীস্টাব্দ) এবং জেরুজালেমের মুকাদ্দাসী (আনুমানিক ৯৮০ খ্রীস্টাব্দ)। প্রথমোক্ত ব্যক্তি সম্ভবতঃ পৃথিবীর প্রথম রঙীন মানচিত্র তৈয়ার করেন। শেষোক্ত ব্যক্তি অধিকাংশ মুসলিম বিশ্বে বিশ বৎসরের ও অধিককাল ভ্রমণ করিয়া তাঁহার মৌলিক ভৌগোলিক পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ

করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে সিসিলিতে বসবাসকারী একজন সমধিক প্রসিদ্ধ ভূগোলবিদ ছিলেন ইদ্রিসী (মৃত্যু ১১৬৬ খ্রীঃ) যিনি তাঁহার পূর্বের মুসলমান ভূগোলবিদদের অবদানের সার রচনা করেন। পৃথিবী একটি গোলক বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস এবং তাহার মানচিত্রসমূহ উল্লেখযোগ্য ভাবে নির্ভুল। তাঁহার মতানুসারে চীন ও রাশিয়ার উত্তরের দেশসমূহ গগ্ ও ম্যাগগ্‌দের দেশ। তাঁহার মানচিত্র আধুনিক মানচিত্রের উল্টা, অর্থাৎ উত্তর নীচের দিকে ও দক্ষিণ উপরের দিকে। এই ভূগোলের বৃত্তান্তে গ্রীক ক্রীতদাস ইয়াকুতের (রুবি) (১১৭৯—১২২৯ খ্রীঃ) নাম উল্লেখ না করিয়া উপসংহারে আসা উচিত নহে। তিনি স্বাধীন হইবার পর পাণ্ডুলিপি-সমূহ লিখিয়া ও বিক্রয় করিয়া তাঁহার ভরণপোষণের অর্থ যোগাড় করিতেন এবং যেখানে খুশী বিচরণ করিতেন। তাঁহার প্রচুর নোটসমূহের দ্বারা "নগরসমূহের অভিধান" নামক একখানা মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয় যাহাতে নামগুলি বর্ণানুক্রমে সাজানো।

ইতিহাস

ইসলাম একটি প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ধর্ম এবং প্রত্যাদেশের সহিত জড়িত রহিয়াছে সময়, স্থান, ব্যক্তি ও ঘটনা—যাহার সব কিছুই ইতিহাসের উপাদান সৃষ্টি করে। অন্যান্য প্রত্যাদেশপ্রাপ্ত ধর্মগুলির ন্যায় ইসলামেও ইতিহাস 'উম্মার' সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে সংযুক্ত একটি ঐশী পরিকল্পনা। তদুপরি ইহুদী-খ্রীস্টান ঐতিহ্য অনুযায়ী শেষ নবী হইবার ব্যাপারে হযরত মুহম্মদের (সঃ) যে দাবী উহাতে ওল্ড ও নিউ টেস্টামেন্টের নবীদের জীবনী সম্পর্কে জ্ঞান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। বোধহয় একদিকে দেশজয় লইয়া ব্যস্ততা, অপর দিকে যোগ্য ব্যক্তির অভাবের দরুণ আব্বাসীয় যুগ পর্যন্ত ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার কাজ বন্ধ ছিল। তবে উমাইয়া যুগে ইতিহাস রচনার জন্য বেশ কিছু উপাদান তৈয়ার করা হয়।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে রুজবেহ্ (ইবনে মুকাফ্‌ফা)[১] কর্তৃক পারস্য নৃপতিদের উপর লিখিত গ্রন্থের আরবী অনুবাদ ইতিহাস এবং অন্যান্য সাহিত্য কর্মের আদর্শ হইয়া উঠে। তবে এই ছাঁচ হইতে দুই প্রকারের

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ৯৭ (মূল গ্রন্থ)।

পার্থক্য সৃষ্টি হয়। একটি হইল বিষয় বস্তুতে। মুসলিম ঐতিহাসিকগণ মোটের উপর শুধু বাইবেলের বর্ণনায় এবং ইসলামের ধর্মীয় রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উপর আগ্রহী হন। তাঁহারা চীন রোম বা যেসব জাতির কথা বাইবেলের ইতিহাসে উল্লেখ নাই ঐসব দেশের ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন না। এমনকি তাহাদের 'বিশ্বের' ইতিহাসগুলিতে, যেগুলি সাধারণতঃ পৃথিবীর সৃষ্টির আদি হইতে আরম্ভ হয় এবং গ্রন্থাকারের সময় পর্যন্ত আসিয়া শেষ হয়, সেইগুলিতেও তাঁহারা অবাইবেলীয় এবং অনৈসলামিক কার্যাবলী বাদ দেন। এই ক্ষেত্রেও তাহারা একই ঢালাও ছাঁচ হইতে বাহিরে যান নাই। পারস্য আদর্শ হইতে দ্বিতীয় ব্যতিক্রম এই যে, হাদীস বিজ্ঞান শিক্ষালাভ করিবার ফলে, তাঁহারা বক্তার ক্রমধারা হইতে সরাসরি উদ্ধৃত বচন লইয়া ধারাবাহিকভাবে ইতিহাস রচনা করেন।

আরব, পারস্যবাসী, সুন্নী ও শীয়া ইত্যাদি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন ইতিহাস রচনাকারীর সংখ্যা এত অধিক যে, তাহা উল্লেখ করা যায় না। ইহাদের এক বিরাট অংশ তাহাদের লিখিত পূর্ব ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন যাহা সাধারণতঃ আদম হইতে আরম্ভ করিয়া লেখকের সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। পরবর্তীকালে ক্ষুদ্র রাজ্যের যুগে ইতিহাস রচনা প্রাধান্য লাভ করে—যাহা পূর্ববর্তী রীতি ও অভ্যাস হইতে পৃথক। ইহা পরবর্তী যুগের জন্য স্থানীয় ঐতিহাসিক উপাদানের এক সম্পদ রাখিয়া যায়। তবে বর্ণনানুক্রমিক রচনার ধারা শেষ হইয়া যায় নাই। এমনকি বিংশ শতাব্দীতেও বহু 'ইতিহাসের' গ্রন্থ প্রকাশিত হয় যাহা আদম হইতে আরম্ভকৃত।

আরব বিজয়ের উপর আলোচনাকারী দুইজন ঐতিহাসিকের একজন হইলেন মিসরীয়, ইবনে আবদ আল হাকিম (মৃতু ৮৭০ খ্রীস্টাব্দ), যিনি মিসর বিজয়ের ইতিহাস বর্ণনা করেন। অন্যজন হইলেন পারস্যবাসী ইবনে ইয়াহ্‌ইয়া আল-বালাজুরী (মৃত্যু ৮৯২ খ্রীস্টাব্দ) যিনি আরব বিজয়ের একটি ব্যাপক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন। দুই জন অতিগুরুত্বপূর্ণ বিশ্ববিখ্যাত ইতিহাস লেখকের মধ্যে একজন হইলেন কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ উপকূলের তাবারিস্তান প্রদেশের মুহাম্মদ আল-তারাবী (৮৩৮—৯২৩ খ্রীঃ)। কোরানের উপর একটি আদর্শ আলোচনা ছাড়াও তিনি "নবী ও রাজন্যবর্গের ইতিহাস" রচনা করেন। এই আলোচনায় তিনি তাঁহার সংগৃহীত

উপাদানগুলি সতর্কতার সঙ্গে বক্তাদের লাইনসহ পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে ৯১৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সজ্জিত করিয়া পরিবেশন করেন। এই গ্রন্থ পরবর্তী ঐতিহাসিকদের জন্য আদর্শে পরিণত হয়।

ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ হিসাবে সমান খ্যাতি অর্জনকারী আরেকজন হইলেন বাগদাদের ভূপর্যটক আবুল হাসান আলী আল-মাসুদী (মৃত্যু ৯৫৬ খ্রীঃ)। গুটিকয়েকের মধ্যে তিনিও একজন যিনি বর্ণনানুক্রমিক ধারা হইতে পৃথকভাবে ইতিহাস রচনা করেন। তাঁহাদের প্রসিদ্ধগ্রন্থ "সোনালী চারণ ক্ষেত্র ও স্বর্ণের খনি" সভ্যতার একটি সমকালীন ইতিহাস। তিনি ভারতীয়, পারস্যবাসী, রোমান ও অন্যান্য পৌত্তলিকদের সম্পর্কে লিখিয়া প্রচলিত রীতিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তদুপরি তাঁহার গ্রন্থ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীপূর্ণ—যেগুলি নিঃসন্দেহে তিনি পর্যটনের সময় সংগ্রহ করিয়াছেন।

সাহিত্য

সাহিত্যের ক্ষেত্রে রসুল হযরত মুহম্মদ (সঃ) কবি ও কবিতা অপছন্দ করিতেন, কিন্তু কাহিনী বলায় তাঁহার কোন আপত্তি ছিল না। অথচ দেখা গেল শতাব্দীর পর শতাব্দী তাঁহার অনুসারীগণ খুব বেশী উপাখ্যান সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু পৃথিবীর অন্য যেকোন সাহিত্যের লেখকের চেয়ে হয়ত অনেক বেশী কবিতা রচনা করিয়াছেন।

ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, সাসানীয় যুগের পারস্য সাহিত্যের অলঙ্কার ও ভাব প্রকাশের মার্জিত কৌশল আরবী ভাষাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। শোয়াবিয়াদের মৌলিক ও অনুবাদ, উভয় প্রকারের রচনাবলী সম্পর্কে ইতিমধ্যেই আলোচনা করা হইয়াছে।[১] এইগুলি পরে 'মাক্যমা'' (গুচ্ছ) নামক এক প্রকারের রচনা শৈলীর রূপ ধারণ করে যাহা মার্জিত ও সূক্ষ্ম উপায়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সমালোচনা করে। বসরায় হারীরীর 'মাকামাত' (১০৫৪—১১২২ খ্রীঃ) এই প্রকৃতির অতি প্রসিদ্ধ গল্পগুচ্ছ।

'গানের গ্রন্থ' (কিতাবুল আঘানী) ছাড়া গদ্যে তেমন গুরুগম্ভীর সাহিত্য

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ৮১ (মূল গ্রন্থ)।

রচনা আর নাই। তবে হাস্কা ধরনের রচনার মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ হইল, 'এক সহস্র ও এক রজনী'। ফার্সী মূল গ্রন্থ 'হাজার আফসানাহ' (এক সহস্র গল্প) হইতে জনৈক জাহাসিয়া (মৃত্যু ৯৭২ খ্রীস্টাব্দ) ইহা প্রস্তুত করেন। মূল পটভূমি এবং শহরযাদসহ একই নায়ক ও একই নায়িকা ব্যবহার করিয়া অনুবাদক তাঁহার নিজস্ব কয়েকটি গল্প ইহাতে যোগ করেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বিভিন্ন লেখক এই গ্রন্থ নকল করিবার সময় বিশ্বের সমগ্র অংশ হইতে আরও গল্পসমূহ যোগ করেন, কিন্তু পটভূমিকা অক্ষুণ্ণ রাখেন। মিসরের মামলুক যুগের শেষ ভাগে ইহা বর্তমান আকার ধারণ করে এবং ইংরাজীতে 'আরব্য রজনী' নামে পরিচিত হয়। সম্ভবতঃ ইহা পৃথিবীর অধিকাংশ ভাষায় অনূদিত সাহিত্য কর্ম।

প্রাক-ইসলামী আরবী কবিতার প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু ইতিমধ্যে আলোচিত হইয়াছে।[১] তাহাতে দেখা যায় যে উমাইয়াগণ, আরবী কবিতার প্রাক-ইসলামী বিষয়বস্তুকে বিস্মৃতি হইতে রক্ষা করিয়াছে। আরবী ও পারস্য কবিগণ কর্তৃক পুনঃ পুনঃ গীত মরু প্রেমের গল্পসমূহের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ একটি হইল লায়লা ও মজনুর প্রেমের গল্প।

আব্বাসীয় যুগে পারস্য প্রভাব প্রবেশ করে। যদিও আরবী কবিতার প্রধান ধারার খুব বেশী পরিবর্তন হয় নাই। তবুও এই যুগে পারস্য রচনাশৈলী প্রাধান্য বিস্তার করে। পাঠক ইতিমধ্যেই খোরাবিয়া কবি বাশশার ইবনে-বুরদ, ধর্মনিরপেক্ষ কবি আবু নোয়াস এবং গুরুগম্ভীর আরবী কবি আবু আল-আতাহিয়্যার সঙ্গে পরিচিত হইয়াছেন।[২]

ক্ষুদ্র রাজ্যের যুগে পারস্য ভাষার পুনরুত্থান হয়। ইতিপূর্বে দেখান হইয়াছে যে, দেশপ্রেমিক সাফফারীয় ও সাসানীয়গণ সাহিত্যিক ও প্রশাসনিক ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে ফার্সী ভাষা ব্যবহার করে। এমন কি তুর্কী রাজ্যগুলিকেও ফার্সী ভাষা প্রভাবান্বিত করে ও এই ভাষাকে তাহাদের চিঠিপত্রাদিতে ব্যবহার করা হয় বলিয়া তুর্কীগণ ইহার পৃষ্ঠপোষক হইয়া উঠে। এই ভাষা 'নতুন ফার্সী' নামে পরিচিত হইয়া উঠে যাহা পাহলভী বা মধ্য ফার্সী হইতে পৃথক।

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ৮২ (মূল গ্রন্থ)।
২। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ৮৩ (মূল গ্রন্থ)।

সুফীবাদের আলোচনায় রুমী, আত্তার, হাফিজ ও অন্যান্য অনেক ফার্সী কবির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। ইরানের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের কবি হইলেন আবুল কাশেম ফেরদৌসী যিনি পৌরাণিক যুগ হইতে আরব বিজয় পর্যন্ত ইরানের ইতিহাস কবিতাকারে লিপিবদ্ধ করেন। 'শাহনামা' বা 'নৃপতিদের গ্রন্থ' ফার্সী সাহিত্যে অতি চমৎকার কবিতাগুলির মধ্যে অন্যতম। আরেকজন কবি নিজামী লায়লা-মজনুর প্রেমের কাহিনী রচনা করেন। আর যে তিনটি প্রেমের কাহিনী কবিগণ পুনঃ পুনঃ গাহিয়াছেন তাহা হইল জোসেফ (ইউসুফ) ও জোলেখা, ভিস ও রামীন, এবং ফরহাদ (এক প্রস্তর কর্তনকারী) ও শিরী (এক সম্রাজ্ঞী)। ফার্সী সাহিত্যের এই ক্ষুদ্র আলোচনায় কবিদের নগরী শিরাজের আরেক জ্যোতিষ্কের নাম উল্লেখ করিতে হয়, তিনি হইলেন সা'দী। তাঁহার গুলিস্তান নামে গদ্যে ও পদ্যে লিখিত ছোট গল্পের সংকলন প্রত্যেক পারস্য বিদ্যালয়ে একটি পাঠ্যপুস্তক।

এখানে উল্লেখ্য যে, কবিগণ খলিফা ও যুবরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন, কারণ তাঁহারা বিজ্ঞান বা সাহিত্যের চেয়ে তোষামোদে অধিক আগ্রহী ছিলেন। ফলে ফার্সী ও আরবী কবিতার অনেক বাগাড়ম্বর এবং তোষামোদ সম্বলিত শব্দের সুকৌশল বিন্যাস দেখিতে পাওয়া যায়। কবিগণ তাঁহাদের জীবিকার জন্য এইসব করিতে বাধ্য হন এবং ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন বেশ ধনী হইয়া উঠেন। প্রত্যেক কবি এক একজন পৃষ্ঠপোষক খোঁজেন বলিয়া প্রত্যেক যুবরাজের নিজস্ব এক একটি কবি-বন্ধুর দল ছিল। ক্ষুদ্র রাজ্যের যুগে কিছু সংখ্যক যুবরাজ কয়েকজন যোগ্য কবি আকর্ষণ করার ব্যাপারে একে অপরের প্রতি অহংকারের দৃষ্টিতে দেখেন। কবিতা রচনা করা একটি জীবিকার উপায় হইয়া দাঁড়ায় এবং প্রত্যেক উপলক্ষ—জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, যুদ্ধ, বিজয়, একটি প্রাসাদ নির্মাণ বা একটি সাফল্যজনক শিকার—কবিতার এক লোভনীয় বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। উপযুক্ত পংক্তির জন্য কবি নিযুক্ত করা অভিজাতদের রীতিতে পরিণত হয়। কখনও কখনও কবিগণ একই কবিতা একাধিক পৃষ্ঠপোষকের নিকট প্রেরণ করেন এবং প্রত্যেকের নিকট হইতে আলাদা আলাদা পারিতোষিক আদায় করেন। যদি সঠিক পারিশ্রমিক

বা উপযুক্ত উপহার না আসে তবে কবি সেই পৃষ্ঠপোষককে ব্যঙ্গ করিয়া বেকুফ বানান এবং সর্বদা চমৎকার কবিত্বপূর্ণ উপায়ে তাঁহার দোষ বর্ণনা করেন। কবিদের শব্দের ক্ষমতা কখনও কখনও যুবরাজদের হাতের তরবারীর চেয়ে সুতীক্ষ্ণ প্রমাণিত হইয়াছে। এতদসত্ত্বেও এই কবিগণের কেউ কেউ এতগুলি মধুর তোষামোদে এবং কখনও কখনও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাত্মক কবিতা রচনা করা সত্ত্বেও তাঁহাদের নিজস্ব সময়ে কিছু সংখ্যক চিরস্থায়ী কবিতাও রচনা করিয়াছেন যেগুলি পাঠকের আত্মাকে অভিজ্ঞতার উচ্চমার্গে পৌঁছাইয়া দেয়।

স্থাপত্য শিল্প ও শিল্পকলা

আধুনিক মধ্যপ্রাচ্যের কোন কোন শিল্পী "মুসলিম শিল্পকলা" কথাটি বিভ্রান্তিকর বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। কারণ ধর্মীয় দিক হইতে ইসলাম কতক শিল্পকলা নিষিদ্ধ করে এবং অন্য কতকগুলির প্রতি ভ্রূকুঞ্চিত করে। ইহা যেরূপ সত্য তেমনি ইহাও সত্য যে হযরত মুহম্মদ (সঃ) কবিতা চর্চা অপছন্দ করিয়াছিলেন এবং মদ খাওয়া নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইসলামের অনুসারীগণ যেমন এইগুলি হইতে বিরত থাকে নাই তেমনি শিল্পকলা থেকেও হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকে নাই। গোত্রীয় সঙ্গীতের সম্পদ, যেগুলিকে পরে গান রচয়িতা ও গায়কগণ তাঁহাদের গ্রন্থে সংযোজন করেন—এইগুলি ছাড়া আরবগণ শিল্পকলায় অধিক কিছু আনয়ন করে নাই। কিন্তু বাইজেন্টি-য়ামের খ্রীস্টান এবং ইরানের জরথুস্ত্রগণের ধর্মীয় শিল্পকলার সংস্পর্শে আসিয়া আরবগণ বেশীদিন নিষ্প্রাণ থাকিতে পারে নাই। ফলে ইসলামের ধর্মীয় গণ্ডির বাহিরে শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধিত হয়, যদিও ইহা কখনও ইস-লামের ধর্মীয় সমর্থন লাভ করে নাই।

উপরোল্লিখিত শিল্পকলাসমূহের মধ্যে স্থাপত্যশিল্প একটি সম্ভাব্য ব্যতি-ক্রম, কারণ ইসলামে মসজিদের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে এবং এই প্রয়ো-জনীয়তা অদ্ভুত ধরনের। অতএব নব্য মুসলমানদের শিল্পজ্ঞানকে মসজিদ নির্মাণে নিয়োজিত করা হয়। ইসলামী স্থাপত্য শিল্পের প্রয়োজনীয়তা অতি অল্প ও সাধারণ। অজু করিবার জন্য মসজিদের বাহিরে একটি ফোয়ারা বা কূপ নির্মাণ করা হয়। ফলে, রাস্তা হইতে একটি মসজিদের স্বাভাবিক

প্রবেশ যায় দালানের ভিতরে নহে বরং কুয়া ও ফোয়ারাযুক্ত একটি প্রশস্ত আঙ্গিনায়। তাহা ছাড়া মুসলমানগণের প্রয়োজন হয় একটি উঁচু জায়গার, যেখান হইতে মুয়াজ্জিন নামাজের জন্য আহ্বান করিতে পারে (আযান দিতে পারে)। ইহার জন্য তাহারা মসজিদের সংলগ্ন লম্বা, গোলাকৃতি বা চতুষ্কোণ থাম নির্মাণ করে। হিব্রু 'মিনোরা' শব্দ হইতে ইহাকে 'মিনার' বলা হয়।

মসজিদের ভিতরের অংশের জন্য ইসলামের দুইটি চাহিদা রহিয়াছে। একটি হইল মক্কার দিকে লক্ষ্য যাহাকে কিবলাহ্ বলা হয়। মসজিদ এমনভাবে নির্মাণ করিতে হয় যাহাতে নামাজী মক্কার (কা'বা) দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িতে পারে। ইহা যেহেতু সঠিক হইতে হইবে তাই 'মিহ্-রাব' নামে একটি নামাজের কুলুঙ্গী নির্মাণ করা চিরাচরিত নিয়ম হইয়া যায়। মিহ্রাব শব্দটি ফার্সী 'মিহ্‌রা'ভেহ্' হইতে গৃহীত। ইহার অর্থ কুলুঙ্গী বা মিথ্‌রা'র (মিত্রের) গম্বুজ। মসজিদের মিহ্‌রাব আকারে ও নামে ইহার হুবহু অনুকরণ। আরেকটি চাহিদা হইল একটি উচ্চ বেদী— মিম্বার বা একটি সিঁড়িজাতীয় গাঁথনি, প্রায়ই 'বহনযোগ্য' যাহার সর্বোচ্চ সিঁড়িতে বসিয়া ধর্মীয় নেতা উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন।

উমাইয়া ও আব্বাসীয়া যুগে নির্মিত অধিকাংশ মসজিদ ও প্রাসাদ ধ্বংশ হইয়া গিয়াছে। উমাইয়া স্থাপত্যশিল্পের সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণগুলির মধ্যে যেগুলি, এখনও টিকিয়া আছে সেগুলি দামেস্কের উমাইয়া মসজিদ এবং জেরুজালেমের 'প্রস্তরের গম্বুজ' (Dome of the Rock)। আব্বাসীয় ইমারতগুলির মধ্যে সামারার মসজিদের ধ্বংশাবশেষ এবং অন্যূন ৭৬০ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত ইসফাহানের অপেক্ষাকৃত উত্তম উপায়ে রক্ষিত জুমা মসজিদ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। ইতিহাসবিদদের মতে সাধারণতঃ উমাইয়া স্থাপত্যশিল্পে বাইজেনণ্টাইন প্রভাব এবং আব্বাসীয় স্থাপত্যশিল্পে পারস্য প্রভাব দৃষ্ট হয়। সাসানীয়গণ ডিম্বাকার ও অঙ্গহীন গম্বুজ এবং খিলান ও ঘূর্ণায়মান বুরুজ আবিষ্কার করে। মুসলমানগণ সেইগুলি অনুকরণ করে।

প্রাণীর ছবি আঁকার বিরুদ্ধে নিষেধজ্ঞার ফলে মসজিদগুলি রঙীন টালি দ্বারা অলংকৃত হয়। যেগুলি ইরানের কাশান শহরের নামানুসারে 'কাশি' নামে পরিচিত হয়। টালির উপর কারুকার্য কখনও কখনও অতি সুন্দর জ্যামিতিক বা ফুলের নক্সায় করা হয়। প্রতিভাশালী শিল্পীগণ লিজ্জিগকে

ক্যালিগ্রাফীর (অতি সুন্দর হস্তলিপি) মাধ্যমে প্রকাশ করে। ইহা মসজিদকে অলংকৃত করিবার জন্য ধর্মীয় বিধিসম্মত উপায়ে কোরান বা কোরানের বাক্যকে টালির উপর খোদাই করিবার এক প্রকারের শিল্প। ইসলাম যদিও প্রাণীর ছবি নিষিদ্ধ করিয়াছে কিন্তু খলিফাগণ শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করেন এবং খলিফ মুতাসিম সামারার অবস্থিত তাঁহার প্রাসাদের দেয়ালসমূহ নগ্ন ছবি দ্বারা অলংকৃত করেন। ক্ষুদ্র রাজ্যের যুগে শিল্পীগণ গ্রন্থসমূহে চিত্র সংযোজন করেন। ফেরদৌসীর 'নৃপতিদের গ্রন্থ'—ইহার উপাখ্যান ও গল্প সহকারে শিল্পাভিব্যক্তির জন্য খুবই উর্বর। ইহাই ছিল ক্ষুদ্রাকৃতি শিল্পকলার প্রারম্ভ, যাহার জন্য পারস্যবাসীগণ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে।

কোরান তেলাওয়াতই একমাত্র সঙ্গীতের শাখা যাহা ইসলামের অনুমোদন লাভ করে। তবে ইহা এতই ঢালাও ছাঁচের যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ইহার কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। বিদ্বান ব্যক্তিগণ গ্রীকদের অনুকরণে সঙ্গীত তত্ত্বের উপর লিখিয়াছেন, কিন্তু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে উন্নতি খুব কমই হইয়াছে। সঙ্গীত রচয়িতা ছিল, গায়ক ছিল, যন্ত্রসঙ্গীতজ্ঞ ছিল এবং নৃত্যশিল্পী ছিল। কিন্তু পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ইহাদের সবাইকে ব্যবহার করা হইত আনন্দ উৎসবের জন্য।[১]

পূর্বোল্লেখিত সংস্কৃতির জরিপে যাহা প্রকাশ পায় তাহাতে বিস্ময়কর ব্যাপার হইল এই যে, সর্বাধিক সৃষ্টিধর্মী কার্যকলাপ সাধিত হইত ক্ষুদ্র রাজ্যের যুগে (আনুমানিক ৯০০—১২০০ খ্রীঃ), যখন খলিফাগণ ছিলেন দুর্বল এবং যুবরাজগণ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। যুদ্ধবিগ্রহ সত্ত্বেও এই সময়ে উন্নতি অব্যাহত থাকিবার কারণসমূহ খুঁজিয়া বাহির করা দুরূহ ব্যাপার নহে। প্রথমতঃ আরব বিজয় পরিশ্রান্ত সমাজগুলির উপশম হিসাবে কাজ করে, যেগুলি কিছুকালের জন্য অলস হইয়া পড়িয়াছিল। আরবগণ কর্তৃক আনীত ধর্ম চিন্তাশক্তির উদ্ভবের জন্য কোন নতুন উত্তেজক পদার্থ হিসাবেও কাজ করে নাই যাহা মধ্যপ্রাচ্যে প্রচলিত ধর্মে ছিল না; অথবা আরবী ভাষাতেও সংস্কৃতি প্রকাশের জন্য এমন কোন লুক্কায়িত শক্তি ছিল না যাহা অন্যত্র তাহার পাওয়া যাইত না। তবে এই কথা সত্য যে ইসলামও আরবী পুনঃজাগরণের

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ৭২ (মূল গ্রন্থ)।

হাতিয়ার হইয়া দাঁড়ায় এবং সেই পর্যায়ে নিজেরাও নতুন ভাব লাভ করে এবং সমৃদ্ধশালী হয়। মধ্যপ্রাচ্যের লোকজন যেস্থানে পড়িয়াছিল সেস্থান হইতে তাহারা পুনরায় যাত্রা শুরু করে এবং অস্থিরতা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ সত্ত্বেও তাহাদের যাত্রা অব্যাহত থাকে। কারণ তাহাদের অলসতা বিজয়ের মাধ্যমে ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছিল এবং জীবনীশক্তি পুনরুত্থিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয়তঃ বাগদাদের কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতা সৃষ্টিধর্মী কার্যকলাপে একটি পরোক্ষ সাহায্য হিসাবে কাজ করে। আমরা পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি, আব্বাসীয়গণ ধর্মীয় মতবাদ বজায় রাখিতে ব্যস্ত ছিল এবং তাহারা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য অত্যাচার ও অনুসন্ধিৎসা ত্যাগ করে নাই। খলিফাদের দুর্বলতা দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদিগকে তাঁহাদের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিতে সাহায্য করিয়াছে, যাহার অভাবে তাঁহারা সৃষ্টিধর্মী হইতে পারিতেন না। স্বাধীন যুবরাজগণ হয় ধর্মীয় মতবাদ বুঝিতেন না অথবা পরোয়া করিতেন না। তাঁহারা বুদ্ধিজীবীদিগকে পৃষ্ঠপোষকতার ব্যাপারে একে অপরের সহিত প্রতিযোগিতা করেন, অথচ ঐসব বুদ্ধিজীবীদিগকে বাগদাদে ধর্মীয় মহাপুরুষগণ অবিরত ধর্মহীনতার জন্য দোষী সাব্যস্ত করিতে থাকেন। এইসব সৃষ্টিকে কোন শক্তিশালী খেলাফত অনুমতি দিতেন কিনা সন্দেহ, এবং ইহা প্রতীয়মান হয় এইরূপে যে, সেলজুকগণ যখন রক্ষণশীলদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং গাজ্জালী তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন, পাণ্ডিত্য এবং সৃজনীশক্তি তখন নিস্তেজ হইতে আরম্ভ করে। রক্ষণশীল ইসলামের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে 'মধ্যযুগ' আরম্ভ হয়। ইহার 'নবজাগরণ' আরম্ভ হয় বোধ হয় বিংশ শতাব্দীর প্রথম যুগে এবং 'সংস্কার' এখনও আরম্ভ হয় নাই।

একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী

Andrae, Tor, Mahammed : The Man and His Faith. New York : Harper and Brothers, 1960.

Arberry, A. J, The Holy Koran : An Introduction with Selection. New York : The Macmillan Company, 1953.

Aronold, Sir Thomas, and Alfred Guillaume, eds., The Legacy of Islam. London : Oxford University Press, 1931.

Browne, E. G., Arabian Medicine. Cambridge, England : Cambridge University Press, 1921.

Cragg, Kenneth, The Call of the Minaret. New York : Oxford University Press, 1956.

Creswell, K. A. C., Early Muslim Architecture : Umayyads, Early Abbasids and Tulunids (2 vols), Oxford : Clarendon Press, 1932-1940.

Donaldson, Dwight M, The Shi'ite Religion : A History of Islam in Persia and Irak. London : Lazac, 1933.

Faris, Nabih A., Arab Heritage. Princeton, N. J. : princeton University Press, 1944.

Gibb, H. A. R., Arabic Literature : An Introduction. London : Oxford University Press, 1962.

Mohammedanism, An Historical Survey. London : Oxford University Press, 1946.

Hitti, Philip K., History of the Arabs (7th ed.). New York : The Macmillan Company, 1961.

Jeffery, Arthur, The Qur'an as Scripture. New York : R. F. Moore, 1952.

Jurji, Edward, The Middle. East : Its Religion and Culture. Philadelphia : Westminster Press, 1956.

Khadduri, Majid, War and Peace in the Law of Islam. Baltimore : Johns Hopkins Press, 1955.

Le Strange, Guy, Baghdad During the Abbasid Caliphate. London : Oxford University Press 1924,

Lewis, Berard, The Arabs in History. London : Hutchinson's University Library, 1950.

Morgan, Kenneth W., ed., Islam—The Straight Path. New York : The Ronald Press, 1958.

Nicholson, Reynold A., A Literary History of the Arabs. Cambridge, England Cambridge University Press, 1962.

Pope, Arthur Upham, An Introduction to Persian Art Since the Seventh Century A. D. New York : Charles Scribner's sons, 1931.

Robinson, J. Stewart, ed., The Traditional Near East. Englewood Cliffs. N J. : Prentice Hall, 1960.

Rosenthal, E I. J., Political Thought in Medieval Islam. Cambridge, England : Cambridge University Press, 1962.

Von Grunebaum, Gustav E , ed., Unity and Variety in Muslim Civilization. Chicago : University of Chicago Press, 1955.

Watt, W. Montgomery, Muhammad, Prophet and Statesmen. London : Oxford University Press. 1961

দ্বিতীয় খণ্ড

ইসলামী সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারীগণ

দ্বাদশ অধ্যায়

আত্মরক্ষায় ইসলাম

ইসলাম ও খ্রীস্টান এবং বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্যের একটি হইল এই যে, মুসলিম সাম্রাজ্য বিজয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রায় এক হাজার বৎসর পর্যন্ত ইহা জীবনীশক্তি আহরণ করে যুদ্ধ ও রাজ্য বিস্তৃতির মধ্য হইতে। অন্য দুইটি প্রধান ধর্মের বেলায় এরূপ ঘটে নাই। সঠিকভাবে বলিতে গেলে খ্রীস্টান ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মই শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী হইয়া উঠে এবং যুদ্ধে লিপ্ত হয়; কিন্তু এতদসত্ত্বেও প্রথম ৩০০ বৎসর পর্যন্ত উভয় ধর্মই সংখ্যালঘু ধর্ম হিসাবে টিকিয়া থাকে। উভয় ধর্মেরই অনুসারীগণ অত্যাচারিত হয়। ইহার অনপনেয় চিহ্ন প্রত্যেকটির মধ্যে থাকিয়া যায়। পক্ষান্তরে ইসলামের অনুসারীগণ অত্যাচারিত হয় নাই এবং সংখ্যালঘু সমাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করে নাই। বরং অন্যান্য সমাজের উপর বিজয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করে। এইসব ঘটনা তাহাদের সমাজে অনপনেয় চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে।

কোন কোন ঐতিহাসিক, অধিকাংশ ইউরোপীয়ান বা ইউরোপীয় মধ্যপ্রাচ্যের, ইসলামী আন্দোলনকে "ধর্ম", "সাম্রাজ্য" ও "সংস্কৃতি" এই তিনটি পৃথক সত্বায় ভাগ করিয়া বলিতে চায় যে, "ইসলাম ধর্ম" সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির উপর নির্ভরশীল ছিল। এই কথা বলিলে যুগের সমগ্র ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়। সঠিকভাবে বলিতে গেলে ঐতিহাসিকদের উদ্দেশ্য মহৎ। শতাব্দীর পর শতাব্দীকাল ধরিয়া ইসলাম ও উহার রসুল (সঃ)কে পাশ্চাত্যের লোকেরা হীনচিত্রে চিত্রিত করিয়াছে। আধুনিক পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকদের ভাবধারা হইল ঐগুলির সংশোধন করা এবং অসত্যকে সত্যায়িত করা। তাহাদের মতে যেহেতু রাজ্য জয়ের মাধ্যমে একটি ধর্ম প্রচার করা হইয়াছে— এই উক্তি ভ্রান্ত, তাই তাহারা বলিতে চেষ্টা করেন যে, ইসলামে দেশ

বিজয়ের যুদ্ধগুলি "ইসলামী ধর্মের" প্রচারের জন্য নহে, বরং একটি "ইসলামী সাম্রাজ্য" প্রতিষ্ঠার জন্য।

মুসলমানগণ, সে ধর্মতত্ত্ববিদই হউক বা ঐতিহাসিকই হউক, এই মত গ্রহণ করেন না। তাহাদের মতানুসারে সাম্রাজ্য ও ধর্ম এক কথা। রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধগুলি আল্লার আদেশে সংঘটিত হয় এবং সেনাবাহিনী তাহার জন্য যুদ্ধ করে। প্রথম যুগের মুসলমান লেখকগণ এবং পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ রসুলুল্লাহ (সঃ) যেসব যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সবিস্তারে এবং যথেষ্ট গর্বের সহিত বর্ণনা করেন। তরবারী হাতে হযরত মুহম্মদের (সঃ) ছবি একজন মুসলমানের কাছে মোটেই অসঙ্গত নহে, অথচ যীশুখ্রীস্ট বা বুদ্ধের তরবারী আন্দোলিত কোন ছবি যোদ্ধাবেশে সজ্জিত একজন খ্রীস্টান বা বৌদ্ধকে মর্মাহত করিবে।

বদরের যুদ্ধ (৬২৪ খ্রীঃ) হইতে, যাহাতে হযরত মুহম্মদ (সঃ) স্বয়ং অংশ গ্রহণ করেন, একাদশ শতাব্দীর শেষ বৎসরগুলি পর্যন্ত ইসলামের সেনাবাহিনী কোন বড় আকারের পরাজয়ের সম্মুখীন হয় নাই এবং ইসলামের অগ্রগতি কার্যকরীভাবে প্রতিহত হয় নাই। আরবদের উপর আধিপত্য বিস্তারকারী সেলজুক ও অন্যান্য তুর্কী বংশসমূহ খাটি মুসলমান হিসাবে আগমন করে এবং আল্লাহর খলিফার অধীনে রক্ষণশীল ও উম্মার ঐক্য শক্তিশালী করিতে সাহায্য করে। প্রত্যেক বিজয় তাহাদিগকে একই অনুভূতি প্রদান করে যে আল্লাহ তাহাদের সঙ্গে আছেন। অতএব তাহাদের অগ্রাভিযান অপ্রতিরোধ্য। এশিয়া মাইনরের প্রাচীর তাহাদের অতিক্রমের পক্ষে অতি উঁচু মনে হইলেও তাহারা কখনও ইহার আশা ত্যাগ করে নাই। ১০৭১ খ্রীস্টাব্দে সেলজুকগণ বাইজেন্টাইনদিগকে মানিকার্তের যুদ্ধে পরাজিত করিয়া এশিয়া মাইনরে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার পর তাহাদের আশা আরো দৃঢ় হয়। শেষ নবী মুহম্মদ (সঃ) ইসলামকে যেরূপ শেষ ধর্ম বলিয়া ঘোষণা করেন, অনুরূপভাবে খলিফারা মনে করেন, তাঁহাদের অধীনস্থ ইসলামী সাম্রাজ্যই হইবে প্রথম যে সমগ্র পৃথিবীকে আল্লাহ ও তাঁহার রসুলের আয়ত্বাধীনে আনয়ন করিবে।

স্টান্টিনোপল

সেলজুকগণ

আর্মেনিয়া

এডেসা

অ্যান্টিওক

ইউফ্রেটিস

দামেস্ক

জেরুজালেম

কায়রো

ফাতেমীয়গণ

নীলনদ

ক্রুসেড রাষ্ট্রসমূহ

আনুমানিক ১১৪০ খ্রীঃ

০ ১৫০ ৩০০

মাইল

ক্রুসেডসমূহ

এইরূপ একটি মানসিক ও ধর্মীয় মনোভাবের উপর প্রথম আক্রমণ আসে ইউরোপ হইতে ক্রুসেডের আকারে। ইউরোপীয়গণ ইসলামের সেনাবাহিনীকে তাহাদের স্বীয় ভূমিতে পরাজিত করিয়া ফারটাইল ক্রিসেণ্টের মুসলমানদের মনে এমন একটি মর্মদহনের সৃষ্টি করে যে আজও উহা আক্ষেপ ও বিরক্তিকর মানসিকতার সৃষ্টি করে। আসল ব্যাপার হইল, ইসলামের ইতিহাসে ক্রুসেডগুলি একটি অপস্রয়মান অধ্যায় মাত্র। ঐগুলি ক্ষণিকের জন্য ইসলামের অগ্রগতি ব্যাহত করিলেও পরে তাহা ওসমানীয়দের দ্বারা পুনরায় আরম্ভ হয়। তাহা সত্ত্বেও অধিকাংশ আরবী ভাষী মুসলমানদের মনে ক্রুসেডগুলি ইসলামী সমাজের বুকে একটি কলঙ্কের ন্যায় বিদ্যমান।

ক্রুসেডগুলি ইউরোপের ইতিহাসে প্রবেশ করে মধ্যপ্রাচ্যের ধর্মযুদ্ধগুলির সঙ্গে। স্বভাবতঃই এইগুলি এই দুই অঞ্চলকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। বিভিন্ন কারণে ক্রুসেডগুলি সংঘটিত হয়। প্রথমতঃ এইগুলিকে মুসলিম মধ্যপ্রাচ্যের ক্রমাগত আগ্রাসনের বিরুদ্ধে খ্রীস্টান-পাশ্চাত্যের একটি প্রতিক্রিয়া হিসাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সিরিয়ার সুন্নী সেলজুক ও মিসরের শীয়া ফাতেমীয়দের মধ্যে অবিরত যুদ্ধবিগ্রহের ফলে খ্রীস্টান তীর্থ যাত্রীদের প্যালেস্টাইনে তাহাদের পবিত্র স্থানগুলি পরিদর্শন করা খুবই বিপজ্জনক হইয়া পড়ে। তৃতীয়তঃ ফাতেমীয় খলিফা হাকীম কর্তৃক খ্রীস্টানদের পবিত্র সমাধির গীর্জা ধ্বংস হইবার ফলে ইউরোপে ধর্মীয় বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। চতুর্থতঃ এশিয়া মাইনরে সেলজুকদের ক্রমবর্ধমান শক্তিবৃদ্ধির ফলে প্রাচ্যের সঙ্গে জেনোয়া, পিশা ও ভেনিশের লাভবান ব্যবসা হুমকীর সম্মুখীন হয়। এই ব্যবসাকেন্দ্রগুলি তাহাদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ক্রুসেডারদিগকে সাহায্য করে। পঞ্চমতঃ ইতিমধ্যেই ইউরোপে ইসলামের দুর্বলতার লক্ষণ প্রকটিত হইয়া পড়ে। ১০৫০ খ্রীস্টাব্দে ক্যাস্টিল ও আরবগণ স্পেনের মুসলমানদের নিকট হইতে 'আন্দালুসিয়া' কাড়িয়া লয়। ১০৬০ খ্রীস্টাব্দে নরমানগণ সিসিলি অধিকার করে। ১০৮০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মুসলমানদের হাতে ভূমধ্যসাগরের ক্ষমতা বলিতে কিছুই থাকে নাই। তদুপরি মুসলমানদের দুর্বলতা ও অন্তর্বিরোধের

কথা খ্রীস্টান তীর্থযাত্রীদের দ্বারা পরিবেশিত হইয়া সমগ্র ইউরোপে ছড়াইয়া পড়ে। ষষ্ঠতঃ ক্রুসেডারদের মধ্যে প্রকৃত ধর্মীয় উদ্দেশ্য ছিল। তাহারা খ্রীস্টের জন্মভূমিকে মুক্ত করিতে এবং "অবিশ্বাসীদিগকে" ধর্মান্তর করিতে ইচ্ছুক ছিল। তাহারা এই কাজটি তরবারী দ্বারা করিতেছে এইরূপ ধারণা শুধু মাত্র এ্যাসিসির সেন্ট ফ্রান্সিসের ন্যায় গুটিকতক ব্যক্তির বিবেককে আহত করিয়াছিল। সপ্তমতঃ অনেক ভূমিহীন নাইট, যুবরাজ ও অভিজাত ভূমির মালিকানা লাভ করিতে আগ্রহান্বিত ছিলেন। অষ্টমতঃ এমন অনেকেই ছিল যাহারা পৃথিবী দেখিবার জন্য এই দুঃসাহসিক কাজে নামিয়াছিল। এই দুঃসাহসিকতার পিছনে সম্ভবতঃ প্রাচ্যের রূপকথার ন্যায় সম্পদের কিছু অংশ লাভের আকাঙ্খাও থাকিতে পারে। নবমতঃ জনসাধারণের অনেকেই অত্যাচারিত ও বিরক্ত বলিয়া কিছুটা পরিবর্তনের আশায় এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে। সর্বশেষ কারণ হইল, এশিয়া মাইনরের সেলজুকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সম্রাট এলেক্সিয়াস কমেনাস ১০৯৪ খ্রীস্টাব্দে রোমের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এই সাহায্য প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে ১০৯৫ খ্রীস্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় আরবান তাঁহার প্রসিদ্ধ 'অস্ত্রধারণ বার্তা' ঘোষণা করেন এবং অধিকাংশ ইউরোপ এই আহ্বানে এমনভাবে সাড়া দেয় যেন তাহারা এইরূপ একটি আদেশের অপেক্ষায় ছিল।

প্রথম ক্রুসেডটি ছিল সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ। এই যুদ্ধে বইলনের গডফ্রে, লরাইনের বল্ডউইন এবং তুলুসের রেমণ্ডের নেতৃত্বাধীনে প্রায় ১৫০,০০০ লোক (সবাই সৈন্য নহে) কন্সটান্টিনোপলে একত্রিত হয়। ১০৯৭ খ্রীস্টাব্দের বসন্তকালে তাহারা দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হয় এবং নিকাইয়া, ইস্কিশেহর ও তারসুস অধিকার করে। সেখান হইতে বল্ডউইনের নেতৃত্বে একটি বাহিনী আর্মেনিয়া দখল করে, অপরদিকে আরেক বাহিনী এন্টিওক দখল করিয়া ভূমধ্যসাগরের উপকুল অবরোধ করিয়া কোন গুরুতর বাধা ছাড়াই দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। ১০৯৯ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই জুলাই ক্রুসেডারগণ জেরুজালেম জবর দখল করে এবং মুসলমান ও খ্রীস্টান উভয়কে সমভাবে হত্যা করে। গডফ্রে জেরুজালেমের রাজা হন। উত্তরে এন্টিওক ও পূর্বে এডেসা পর্যন্ত উপকুলবর্তী অন্যান্য অঞ্চলগুলিকে ইউরোপীয় সামন্ত প্রথায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে পরিণত করা হয়।

বিজয় লাভ করিবার পর অধিকাংশ ক্রুসেডারগণ স্বদেশে ফিরিয়া যায়। যাহারা থাকিয়া যায় তাহারা ইউরোপের নাইটদের দ্বারা শক্তিশালী হইয়া এবং বাণিজ্যনগরীগুলির নৌবহরের সতর্কতায় প্রায় ৫০ বৎসর অপেক্ষাকৃত শান্তিতে বাস করে। ক্রুসেডারগণ কখনও জর্দান নদীর পূর্বে তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হয় নাই। তাহারা দক্ষিণে আকাবা হইতে উত্তর পূর্বে টাইগ্রীসের উজান পর্যন্ত যাইতে সক্ষম হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য দ্বারা বিভক্ত একটি অঞ্চলে ইতিমধ্যে কয়েকটি নতুন রাজ্য 'সৃষ্টি এই এলাকার সাধারণ চিত্রকে তেমন পরিবর্তন করে নাই। সময়ের বিবর্তনে খ্রীস্টান রাজ্যগুলি তাহাদের মুসলিম প্রতিবেশীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ করে। কখনও কখনও মুসলমান ও খ্রীস্টানগণ তাহাদের স্বধর্মীয়দের বিরুদ্ধে একে অপরের সাহায্য পর্যন্ত প্রার্থনা করে।

ইতিমধ্যে ফারটাইল ক্রিসেন্টের মুসলমানদের ভিতর ইমাম আল-দ্বীন জঙ্গী নামক জনৈক ক্রীতদাসের মাধ্যমে এক নতুন তারকার উদয় হয়। তিনি ১১২৭ খ্রীস্টাব্দে ক্ষণস্থায়ী জঙ্গী বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ১১৪৭ খ্রীস্টাব্দে ক্রুসেডারদের হাত হইতে অতি সহজেই তিনি এডেসা অধিকার করেন। তাহার সুযোগ্য পুত্র মাহমুদ দামেস্ক ও আলেপ্পো অধিকার করেন এবং তাঁহার কুর্দিশ ক্রীতদাস শিরকোহ্‌ টলটলায়মান মিসরের ফাতেমীয়দের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। ১১৭১ খ্রীস্টাব্দে এই কুর্দের ভ্রাতুষ্পুত্র, সালাহ্‌ উদ্‌দীন ইউসুফ ইবনে আইয়ুব (সালাদ্দিন) নামে একজন যুবক জুম্মার নামাজের খোৎবা হইতে ফাতেমীয় খলিফার নাম প্রত্যাহার করেন মাত্র, এবং উহাই ছিল ফাতেমীয়দের পরিসমাপ্তি। একজন খাঁটি সুন্নী হিসাবে তিনি আব্বাসীয় খলিফার নাম পুনর্বহাল করেন—যিনি সালাহউদ্‌দীনের অবস্থিতি সম্ভবতঃ জানিতেনও না এবং তাহাকে খুব কমই গ্রাহ্য করিতেন। ১১৭৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি মিসরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং আইয়ুবী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১১৮৭ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই হিত্তিনের যুদ্ধে তিনি ক্রুসেডারদিগকে পরাজিত করিয়া খ্যাতি অর্জন করেন এবং শীঘ্রই জেরুজালেম, এন্টিওক, ত্রিপলি ও টায়ার পুনর্দখল করেন।

জেরুজালেমের পতন তৃতীয় ক্রুসেডের (১১৮৯—১১৯২ খ্রীঃ) সূচনা করে।

জার্মানীর ফ্রেডরিক বারবারোসা, ইংল্যাণ্ডের রিচার্ড দিলায়ন হার্টেড এবং ফ্রান্সের ফিলিপ অগাস্টাস—এই তিনজন মহাপ্রতাপশালী ইউরোপীয় সম্রাটের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার ফলে এই ক্রুসেডে কৃতিত্বের চাইতে খ্যাতিই অর্জিত হয় বেশী। দুই বৎসর অবরোধের পর তাঁহারা এ্যাকর অধিকার করেন এবং ১১৯১ খ্রীস্টাব্দে সন্ধি স্থাপন করেন। এই ঘটনার পরেই সালাহুউদ্দীন পরলোকগমন করেন এবং তাঁহার রাজ্য তাঁহার পরিবারের লোকদের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়, যাহারা এই সমস্ত বংশের গতানুগতিক ধারায় নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়। ক্রুসেডারগণ এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে এবং ১২২৯ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তাহারা জেরুজালেম এবং অন্যান্য উপকূলীয় শহরগুলি দখল করে।

আইয়ুবীদের দুর্বলতা আরেকটি ক্ষুদ্র রাজ্যের উত্থানের পথ সুগম করে। আইবাক নামক এক ক্রীতদাস কায়রোতে এই কাজ সম্পন্ন করিয়া ১২৫২ খ্রীস্টাব্দে মিসরের মামলুক (ক্রীতদাস) বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। চতুর্থ দাস-রাজা বাইবার্স (১২৬০—১২৭৭ খ্রীঃ) এক নাগাড়ে অনেকগুলি অভিযান পরিচালনা করেন এবং প্যালেস্টাইনে অনেকগুলি নগরী অধিকার করেন ও উত্তরে এণ্টিওক দখল করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ এই চাপ বলবৎ রাখেন এবং ১২৯১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শেষ ক্রুসেডারদিগকেও বিতাড়িত করেন।

প্রায় ২০০ বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী ক্রুসেডগুলি মধ্যপ্রাচ্যের ঐতিহাসে একটি অধ্যায় মাত্র। উহারা ক্ষুদ্র রাজ্যের যুগের ধারা পরিবর্তন করে নাই। যুদ্ধের সময়ের চাইতে শান্তির সময়ই ছিল অধিক, এবং শান্তির সময় খ্রীস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে যথেষ্ট সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ধর্মহীন মুসলমানদের উপর নিশ্চিত শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব লইয়া আগত ক্রুসেডারগণ শীঘ্রই তাহাদের মনোভাব পরিবর্তন করিতে বাধ্য হয়। ফ্রাংকগণ শীঘ্রই মুসলমানদের অতি উচ্চ সংস্কৃতি স্বীকার করিতে বাধ্য হয় এবং একমাত্র ধর্ম ব্যতীত উহাদের সবগুলিই তাহারা অনুকরণ করে। মুসলমানেরা ইহাদিগকে ফ্রাংকো নামে অভিহিত করিত।

এইসব নবনব রুচি লইয়া ক্রুসেডারগণ স্বদেশে ফিরিয়া গেলে ব্যবসায়ীগণ এই অবস্থার সদ্ব্যবহার করে এবং শীঘ্রই ইউরোপের বাজারগুলিতে

চিনি, মরিচ, লবঙ্গ, আদা, কম্বল, চিত্রিত পর্দা, মসলিন, ভেলভেট, সাটিন, আয়না, জপমালা ও বিভিন্ন প্রকারের সুগন্ধি দ্রব্যের জন্য বিদেশ হইতে আনীত বাণিজ্য-সম্ভার প্রদর্শন আরম্ভ করে। যুদ্ধকলায় ফ্রাংকগণ মুসলমানদের নিকট হইতে বার্তাবাহী কপোতের ব্যবহার শিক্ষা করে এবং মুসলমানগণ ফ্রাংকদের নিকট হইতে গুলতির ব্যবহার ও ভারী বর্ম পরিধান শিক্ষা করে।

দুইশত বৎসরেরর ক্ষণবিরতির যুদ্ধবিগ্রহ উভয় পক্ষে অসদিচ্ছার বীজ বপন করে এবং যুদ্ধের প্রচারণা অব্যাহত থাকে। ইউরোপে ইসলাম সম্পর্কে অনেক অপতথ্য পরিবেশন এই সময়ে আরম্ভ হয়। এবং তাহা সত্ত্বেও অনেক সৎলোকও ছিলেন। তাঁহারা পাণ্ডুলিপি অনুবাদ করেন। মুসলিম চিকিৎসকগণ পীড়িত ফ্রাংকদের চিকিৎসা করিতে যাইয়া চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে তাহাদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধারণায় সর্বদা বিস্মিত হন। এ্যাসিসির সেণ্ট ফ্রান্সিস ও রেমণ্ডনালের ন্যায় লোকও মুসলমানদিগের সঙ্গে যুদ্ধের চাইতে ভালবাসায় মিলিত হইবার নীতিতে বিশ্বাস করেন। অনেক আন্তঃধর্মীয় বিবাহও সংঘটিত হয়। লেবানন, সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের বহু সংখ্যক নীল-চক্ষু বিশিষ্ট কালোকেশী মহিলা এই বিবাহের সাক্ষ্য বহন করিতেছে।

মোঙ্গলগণ

পশ্চিম মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমানগণ যখন ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত তখন পূর্বাঞ্চলের মুসলমানগণ আরেকটি নতুন শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়। ইহা ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত যেকোন ঘটনার চেয়ে অধিক ধ্বংসাত্মক ও নিষ্ঠুর। বহির্মোঙ্গলিয়ার উচ্চ ভূমিতে বৈকাল হ্রদের চতুষ্পার্শে অবস্থানকারী মোঙ্গলগণ চীনের বিশাল প্রাচীর অতিক্রম করিয়া সেই সভ্যতাকে পরাভূত করে এবং পশ্চিমাঞ্চলের খারিজমের মুসলিম ক্ষুদ্র রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে আসিয়া উপস্থিত হয়। আরবী ও ফার্সী উভয় ভাষাতেই মুসলিম ঐতিহাসিকগণ সম্পূর্ণ বাছবিচার ছাড়া তুর্কী, তুর্কমান, তাতার ও মোঙ্গল শব্দ ব্যবহার করেন। উপরোল্লিখিত সবাই যেহেতু একে অপরের সহিত ভাষাগতভাবে সম্পর্কযুক্ত সেহেতু মনে হয় ইসলামের

আবির্ভাবের অনেক আগে হইতে কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পার্শ্বে তুর্কীগণ বাস করিত। পূর্ব পার্শ্বের গুরুত্বপূর্ণ গোত্রগুলির মধ্যে ছিল উজবেক ও তুর্কমানগণ এবং পশ্চিম পার্শ্বের সুপরিচিতদের মধ্যে ছিল খাযার ও বুলগারগণ। উদাহরণ স্বরূপ, সেলজুকগণ ছিল তুর্কমান। এশিয়া মাইনরের সেলজুকগণ কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম অঞ্চলের তুর্কীদের সহিত মিলিত হয়। তবে, মোঙ্গলগণ সম্পূর্ণ নবাগত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইহারা এই অঞ্চলে আগমন করে। মোঙ্গল নেতা চেঙ্গিস খানের মহাপ্রতাপ ও খ্যাতির ফলে অনেক তুর্কীও নিজেদিগকে মোঙ্গলদের সঙ্গে এবং শেষ পর্যন্ত চেঙ্গিস খানের সঙ্গে সংযুক্ত করিতে চেষ্টা করে।

তেমুচীন, ১১৫৫ হইতে ১১৬২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বহির্মোঙ্গলিয়ার বসবাসকারী মোঙ্গলদের এক ক্ষুদ্র দলপতির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। পরে তিনি চেঙ্গিস খান উপাধি গ্রহণ করেন। সাহসিকতা ও ধূর্ততার দ্বারা তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং বিভিন্ন গোত্রগুলিকে একত্রিত করিয়া চীনের বিশাল প্রাচীর অতিক্রম করেন। সভ্য চীনগণ উত্তরের এইসব লুণ্ঠনকারীদের বিরুদ্ধে এই প্রাচীর নির্মাণ করিয়াছিল। চেঙ্গিস খান চীনে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই কারণে যেসব সভ্যতা তিনি জয় করিয়াছিলেন সেগুলি আর ধ্বংস করেন নাই। চীন সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁহার শাসন পশ্চিমে তিব্বত ও সিনকিয়াং পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। উহাই ছিল চীনের স্বাভাবিক সীমান্ত। এই বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী চেঙ্গিসের পশ্চিমাঞ্চলে সশস্ত্র অভিযানের কোন উদ্দেশ্য ছিল কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়।

কেন্দ্রস্থল হইতে পশ্চিমাঞ্চলের দিকে তিনি কেন অগ্রসর হইবার আদেশ দেন তাহা এখনও সম্পূর্ণ নিশ্চিত করিয়া বলা যায় না। একটি তথ্য অনুসারে জানা যায় আব্বাসীয় খলিফা নাসির খারিজমের বিরুদ্ধে তাঁহার সাহায্য কামনা করেন।[১] আধুনিক গবেষকেরা এই তথ্যের উপর সন্দেহ পোষণ করেন এবং ইহাকে প্রধান কারণ হিসাবে গণ্য করা যায় না বলিয়া মতামত প্রকাশ করেন। আরেক তথ্য অনুসারে

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১৩ (মূল গ্রন্থ)।

জানা যায়, চেঙ্গিস খান পশ্চিমাঞ্চলে একটি বাণিজ্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন এবং তথায় (খারিজম) শাহের এক শ্যালক ও উতরারের সীমান্ত শহরের গভর্ণর সেই ব্যবসায়ীদিগকে হত্যা করেন এবং তাহাদের সম্পদশালী বাণিজ্য-সম্ভার বাজেয়াপ্ত করেন। এই কার্য এবং দোষী-দিগকে হস্তান্তর করিতে খারিজমের মুহাম্মদ শাহের অনিচ্ছা মহাপ্রতাপশালী খানকে এমন রাগান্বিত করে যে তিনি গোত্রীয় দলপতিদের একটি সভা আহ্বান করেন এবং সেই সভা খারিজমের রাজ্য আক্রমণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই কারণটি তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাও সম্ভব যে একটি বসতিপূর্ণ ও সভ্য চীনের সম্রাট হিসাবে চেঙ্গিসের পক্ষে তাঁহার অস্থির ও যোদ্ধা মোঙ্গল গোত্রীয় লোকদিগকে শায়েস্তা করিয়া রাখা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় এবং তাহাদিগকে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখিতে হয়। ইহাই ছিল তাহাদের একমাত্র পেশা যাহা তাহারা পছন্দ করিত।

যেভাবেই হউক, ১২১৯ খ্রীস্টাব্দে সিনকিয়াং-এ এই তুষার স্রোত আরম্ভ হয় এবং ১২২৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ইহার প্রাথমিক আক্রোশ শেষ হইলে দেখা যায় মোঙ্গলগণ ইরানী মালভূমি পদানত করিয়া উকরাইনের কিয়েব অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে। ইহার পশ্চাতে মালভূমির অনেকগুলি নগরী, যথা বলখ, বোখারা, সমরখন্দ, মার্ভ, হ্যারাত, নিশাপুর ও রায় লুণ্ঠন করিয়া জ্বালাইয়া দেওয়া হয় এবং অধিকাংশ অধিবাসীদিগকে হত্যা করা হয়। এই সমস্ত নগরীর কোন একটিও ইহার আক্রমণপূর্ব আকারে পুনঃনির্মিত হয় নাই। পাঁচ লক্ষ জনসাধারণসহ রায় নগরীকে (প্রাচীন র‍্যাজেস) প্রকৃত অর্থে মাটির সঙ্গে মিশাইয়া দেওয়া হয়। তেহরানের দক্ষিণে এই নামের একটি গ্রাম ছাড়া সেই মহানগরীর আজ কিছুই অবশিষ্ট নাই। একজন প্রত্যক্ষদর্শী এই নারকীয় কাণ্ড বর্ণনা করিবার ভাষা খুঁজিয়া না পাইয়া মোঙ্গল আক্রমণ সম্পর্কে লেখেন ঃ "তাহারা আসিল, লুণ্ঠন করিল, জ্বালাইয়া দিল এবং প্রস্থান করিল।" এইরূপ একটি ধ্বংসের পর পারস্যবাসীগণ যে পুনরায় উত্থিত হইয়া তাহাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য চালু করিতে ও মোঙ্গলদিগকে নিজেদের মধ্যে আত্মসাৎ করিয়া লইতে সক্ষম হইল তাহা ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতানুসারে পারস্যবাসীদের মধ্যে ধৈর্য, দৃঢ়তা ও অনুশীলনের গুণসম্পন্ন সুফীবাদের প্রসার না হইলে তাহারা এই নির্মম নিষ্ঠুরতা সহ্য করিতে পারিত না। ইহাও সত্য হইতে পারে যে, এই হত্যাকাণ্ড আত্মত্যাগ প্রত্যাকর্ষণের প্রেরণাযুক্ত সুফীবাদের অভ্যাস বাড়াইয়া দেয় বলিয়া পরবর্তী পারস্যবাসীগণ রাজনৈতিক ক্ষমতার তোয়াক্কা না করিয়া বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন মনোভাব লইয়া বসবাস করে।

ভিস্টুলা হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত বিশ্বে অশ্রুতপূর্ব এক বিশাল সাম্রাজ্য জয় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া চেঙ্গিস খান ১২২৭ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন। চেঙ্গিস খান সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সমরনায়কদের মধ্যে অন্যতম—ইহাতে সম্ভবতঃ কোন সন্দেহ নাই। কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে তাঁহার সেনাবাহিনীর ঐক্য রক্ষা করা হইত। সম্পূর্ণ সেনাবিভাগ পুরোপুরি ঘোড়-সওয়ার বাহিনী দ্বারা সংগঠিত বলিয়া ইহা ছিল অত্যন্ত গতিশীল। প্রত্যেক সৈনিকের নিকট একটি এবং কখনও দুইটি অতিরিক্ত ঘোড়া থাকিত। একজন মোঙ্গল হিসাবে তিনি হঠাৎ আক্রমণ ও কৃত্রিম পশ্চাদপসারণের কৌশল সুনিপুণভাবে রপ্ত করেন। সম্ভবতঃ চীনাদের নিকট হইতে তিনি বিস্ফোরক দ্রব্যের ব্যবহার শিক্ষা করেন এবং শত্রুদের প্রতিরক্ষা ঘাঁটিসমূহ ধ্বংস করিবার জন্য তিনি একটি ধ্বংসকারী বাহিনী প্রতিষ্ঠা করেন। প্রত্যেক আক্রমণের পূর্বে তিনি নগরগুলিকে সাধারণতঃ আত্মসমর্পণ করিতে আদেশ দিতেন। যুদ্ধ ছাড়া কোন নগরী আত্মসমর্পণ করিলে সমস্ত সম্পত্তির এক দশমাংশ বাজেয়াপ্ত করা হইত এবং নাগরিকদের এক দশমাংশকে ক্রীতদাসে পরিণত করা হইত। অবশিষ্টগুলিকে মোঙ্গল শাসনকর্তার দয়ার উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইত। কোন নগরী বাধা প্রদান করিলে লুণ্ঠন ও হত্যা আরও অধিক ব্যাপক আকার ধারণ করিত। পারস্যবাসী একজন ঐতিহাসিক, যিনি পক্ষপাতিত্বের দোষে দুষ্ট বলিয়া বুঝা যায়; নিম্ন বর্ণিত কথাগুলি চেঙ্গিস খানের বক্তব্য বলিয়া উল্লেখ করেন: "সর্বোত্তম আনন্দ হইল আমার শত্রুদের জয় করা, তাহাদের পশ্চাদধাবন করা, তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা, তাহাদের আত্মীয়-স্বজনদের ক্রন্দন দৃশ্য দর্শন করা, তাহাদের ঘোড়ায় চড়া এবং তাহাদের কন্যা ও স্ত্রী হস্তগত করা।"

চেঙ্গিস খানের মৃত্যুর পর তাঁহার সাম্রাজ্য তিন ভাগে বিভক্ত হয়। প্রথমটি পিকিং-এ রাজধানী লইয়া মূল এলাকা, যাহার শাসকের উপাধি ছিল খাকান। সমস্ত সাম্রাজ্যের উপর তাহার নাম মাত্র ক্ষমতা ছিল। দ্বিতীয়টি ছিল রাশিয়ায় এবং রাজধানী ছিল ভলগা নদী তীরে অবস্থিত কাজান-এ। রাশিয়ার ইতিহাসে মোঙ্গলগণ "সোনালী বাহিনী" নামে পরিচিত। তৃতীয়টি ছিল ইরানে এবং রাজধানী ছিল আজার বাইজানের মারাঘেহ নগরী। পারস্যের ইতিহাসে মোঙ্গলগণ "ইলখান" নামে পরিচিত।

ইলখান বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন চেঙ্গিস খানের পৌত্র। হলাগু (হালাকু) চেঙ্গিসের মৃত্যুর পর তাহার সেনাপতিগণ যেসব এলাকা জয় করেন তিনি ১২৫২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ঐগুলিকে একত্রিত করিবার জন্য বাহির হন। অতি দৃঢ় মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিহতকারী ছিল এ্যাসাসীনগণ, যাহাদিগকে পূর্ববর্তী মোঙ্গল আক্রমণের স্রোত গ্রাস করে নাই। ১২৩৮ খ্রীস্টাব্দে আলামুতের এ্যাসাসীনদের প্রধান ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের রাজাদের নিকট দূত প্রেরণ করেন এবং মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে সাহায্য প্রার্থনা করেন। উভয়ের নিকট হইতে তিনি নৈরাশ্যজনক জবাব লাভ করেন। তবে ১২৫৬ খ্রীস্টাব্দে চেঙ্গিস খানের পৌত্র হালাকু এ্যাসাসীনদের সুদৃঢ় ঘাঁটিসমূহ ধ্বংস করেন এবং তাহাদের প্রসিদ্ধ পার্বত্য দুর্গ আলামুত অধিকার করেন। দুই বৎসর পর হালাকু ও মোঙ্গলগণ বাগদাদের সিংহদ্বারে উপস্থিত হন। দুর্বল ও অবরুদ্ধ খলিফা মুতাসিমের পক্ষে দয়া ভিক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করণীয় ছিল না। তাহার পূর্বপুরুষগণ এই শক্তিশালী লোকদিগকে সম্মান দান করিয়া নিজেদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু পৌত্তলিক হালাকু এই সব বিবেচনা গ্রাহ্য করেন নাই। খলিফার হত্যা "বিশ্বের স্বাভাবিক রীতিকে বিপদগ্রস্ত" করিবে—এইসব সতর্ক বাণীতেও তিনি বিচলিত হন নাই। খলিফা ও তাঁহার সভাসদকে হত্যা করা হয় এবং নগরী লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। প্রাক্তন নগরীসমূহের ধ্বংসের তুলনায় বাগদাদের ধ্বংস কোন অংশে কম হয় নাই।

এইভাবে আব্বাসীয়দের রাজত্বের অবসান হয়। তাঁহাদের পাঁইত্রিশ জন

১৪—

খলিফা ছিলেন, তন্মধ্যে আটজন প্রকৃত অর্থে শাসন করেন এবং অবশিষ্টদের মধ্যে অধিকাংশ ৫০৮ বৎসর পর্যন্ত ক্রীড়নক হিসাবে রাজত্ব করেন। মধ্যপ্রাচ্যের কোন কোন ঐতিহাসিক বাগদাদের পতনের বৈশিষ্ট্যকে অতিরঞ্জিত করিয়াছেন, যেমন কিছু সংখ্যক ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ২০০ বৎসর পর কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের ব্যাপারে বলিয়াছেন: উভয় নগরই অধঃপতনমুখী ছিল এবং এগুলির পতন পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন সাধন করে নাই।

হালাকু সিরিয়া অভিমুখে অগ্রসর হন কিন্তু মামলুকগণ কর্তৃক বাধা প্রাপ্ত হন। ইহারা মিসরকে মোঙ্গল ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ইলখানী ভূখণ্ড ককেসাস হইতে ভারত মহাসাগর এবং ইউফ্রেটিস হইতে আমু দরিয়া পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। চেঙ্গিস খানের পরবর্তী বংশধরগণ সভ্যতা ও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। পারস্যবাসীগণ, যাহারা তুর্কী রাজ্যগুলিকে প্রভাবান্বিত করে, মোঙ্গলদিগকে সরকার ও সংস্কৃতির কৌশল শিক্ষা দিতে আরম্ভ করে। প্রশাসনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে ইলখানীগণ নিজেদিগকে পারস্যবাসীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত রাখে। এক বিশাল সাম্রাজ্যের অংশ হিসাবে ইরানকে চীনের সহিত বাণিজ্য পথ দ্বারা সম্পূর্ণ যুক্ত রাখা হয়—যাহাতে সর্বদা যোগাযোগ সহজ হয়। মোঙ্গলগণ কর্তৃক আরোপিত শান্তির দ্বারা ঐসব বাণিজ্য পথগুলিকে উন্মুক্ত ও নিরাপদ রাখা হয়। ইরান ও চীনের মধ্যে বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক মত বিনিময় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যুগের ক্ষুদ্রাকৃতির পারস্য শিল্পকলার মধ্যে চীনা প্রভাব স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। ১২৭২ খ্রীস্টাব্দে ইরানের মধ্য দিয়া পিকিং-এ ভ্রমণ করিবার কালে মার্কোপোলো তাব্রিজের উন্নতশীল শিল্পসমূহ, কাশানের সিল্ক ও কেরমানের কাপড়ের বুটির কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

মোঙ্গলগণ ছিল মূলতঃ পৌত্তলিক। কিছুকালের জন্য ইরানের ইলখানগণ খ্রীস্টান ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে ইতস্ততঃ দোলায়মান থাকে। ১২৪৫ খ্রীস্টাব্দে ফ্রান্সিসকান জাঁ প্ল্যানো ডি ক্যাপরিনির অধীনে পোপ চতুর্থ ইনোসেন্ট সুদূর মোঙ্গলিয়ার কারাকোরামে ধর্মীয় সংস্থা স্থাপন করিবার জন্য একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। প্রকৃতপক্ষে ইলখানী যুগ হইতে

আজ পর্যন্ত ইরান বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশসমূহের দৃষ্টি রাজনৈতিক, ধর্মীয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক উদ্দেশ্যে ক্রমাগত নিজের দিকে আকর্ষণ করে।

ইলখানী রাজাদের আনুগত্য লাভের প্রতিযোগিতায় খ্রীস্টান ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ইসলামই বিজয়ী হয়। গাজান খান (১২৯৫—১৩০৪ খ্রীঃ) একজন খাঁটি মুসলমানে পরিণত হন এবং চীনের খাকানদের সঙ্গে তাঁহার সম্পর্ক ছিন্ন করেন। মহাপ্রতাপশালী ইলখানদের মধ্যে তিনি অন্যতম। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরানে তিনিই শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার শাসনামলে লাঞ্ছিত ও পদদলিত কৃষক সমাজ উন্নতি লাভ করিতে আরম্ভ করে। গাজান খান একটি সমতাভিত্তিক করপ্রথা প্রতিষ্ঠা করেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের আচরণ-বিধি ঘোষণা করেন এবং আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করেন। গাজান ছিলেন শীয়া প্রভাব যুক্ত একজন মুসলমান। তিনি অনেক মোঙ্গলকে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে বাধ্য করেন এবং একজন নব্য মুসলমানের উৎসাহ লইয়া শুধু "পৌত্তলিকদের" মন্দিরগুলিই বিধ্বস্ত করেন নাই বরং খ্রীস্টান ও ইহুদীদের উপাসনালয়গুলিও ধ্বংস করেন। শীয়া দরবেশ প্রথা শক্তিশালী করিবার জন্য তিনি অনেক কিছু করেন যাহা ইরানের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনকে প্রভাবান্বিত করে। এই প্রভাবের মধ্য হইতে সাফাভীয় বংশের অভ্যুত্থান ঘটে।

মোঙ্গলদের দ্বারা সংঘটিত এইরূপ একটি ভয়াবহ ধ্বংস সাধনের পর ইরানে কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগ অবশিষ্ট থাকাটা আশ্চর্যের বিষয়। তবুও মোঙ্গল আক্রমণের মনোমুগ্ধকর ফলাফল হইল ইহা পারস্যের ইতিহাসের অত্যন্ত সাংস্কৃতিক সৃজনশীল যুগগুলির মধ্যে একটি যুগের সৃষ্টি করিল। পারস্যবাসীদের জন্য ইহা একটি কৃতিত্বের বিষয় যে, তাহারা শুধুমাত্র নিজেদের সংস্কৃতি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে নাই বরং মোঙ্গলদিগকেও সভ্য করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং তাহাদিগকে নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে ব্যবহার করিতে পারিয়াছে। পারস্যবাসীদের বাঁচিয়া থাকিবার সংগ্রাম ছিল সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং ইহা তিন প্রকারে পরিচালিত হয়।

প্রথমতঃ পারস্যবাসীগণ আরবদের মত মোঙ্গলদিগকেও প্রভাবান্বিত করে

এবং তাহাদিগকে পারস্য সংস্কৃতির সহিত একাত্ম করিয়া ফেলে। উমাইয়া ও আব্বাসীয় রাজত্বকালে পারস্যবাসীগণ রাজনৈতিক বিদ্রোহ সংঘটিত করে, ধর্মীয় উত্থানে ইন্ধন জোগায়, প্রতিদ্বন্দ্বী আরবদলগুলিতে যোগদান করে এবং তাহাদের উদ্দেশ্য হাসিল করিবার জন্য এগুলিকে ব্যবহার করে। তবে মোঙ্গল আমলে সম্মিলিত বিদ্রোহ বা উত্থানের কোন চিহ্ন ছিল না এবং ব্যক্তিগত সাহসিকতারও কোন বহিঃপ্রকাশ ছিল না। বাস্তবিকপক্ষে, তখন সর্বত্র নির্বিরোধ আনুগত্যের লক্ষণই বিরাজমান ছিল। পারস্যবাসী-গণ ব্যক্তিগতভাবে বোধহয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাহাদের মেধা ও ধূর্ত-তার মাধ্যমে মোঙ্গলদের আস্থা অর্জন করে এবং তাহাদিগকে নিজেদের রাজনৈতিক আধিপত্যের পরিবর্তে ইরানের সাংস্কৃতিক পুনর্জন্মের কাজে ব্যবহার করে।

মোঙ্গলদিগকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এইভাবে জয় করিবার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার সর্বোত্তম দুইটি উদাহরণ সৃষ্টি করেন নাসির আল-দীন তুসী ও রশীদ আল-দীন ফজলুল্লাহ। প্রথমোক্ত ব্যক্তি হালাকুর সংস্পর্শে এবং শেষোক্ত ব্যক্তি গাজানের সংস্পর্শে আসেন। শ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ ও বৈজ্ঞানিক নাসির আল-দীন হালাকু খানের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি মোঙ্গল বিজয়ীকে বাগদাদ অধিকার করিবার পরামর্শ দান করেন কিন্তু গ্রন্থাগার রক্ষা করিয়া গ্রন্থগুলিকে ইরানের ইলখানী রাজধানী মারাঘেহ-এ লইয়া আসিতে সম্মত করান। তিনি হালাকুকে একটি মানমন্দির নির্মাণ করিতেও উৎসাহ প্রদান করেন, যাহা পরে চীনা ও পারস্যবাসী উভয়ের জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। রশীদ আল-দীন ছিলেন গাজান খানের দরবারের একজন দার্শনিক, ঐতিহাসিক ও চিকিৎ-সক। পরে তিনি তাঁহার উজীর পদে উন্নীত হন। উপরোল্লেখিত উভয় ব্যক্তিকে এবং সম্ভবতঃ আরও অনেককেই পরবর্তীকালে হত্যা করা হয়। কিন্তু তাহারা জীবনে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার সদ্ব্যবহার করিতে শিখিয়া-ছিলেন এবং চির বিশ্রামে অবসর গ্রহণ করেন। পারস্যবাসীগণ যদিও আক্রমণ হইতে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে নাই, কিন্তু তাহারা নিজেদের ব্যক্তিগত ও সাংস্কৃতিক গর্ব বজায় রাখে। ইহা নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে মোঙ্গলিয়ায় অবস্থিত তাহাদের বংশই খোরাসান হইতে ইরানের

এই বিরাট ব্যবধানের জন্যই মোঙ্গলদিগকে সংমিশ্রিত করা সহজ হইয়াছিল। অলস জীবন যাপনে অনভিজ্ঞতার দরুণ মোঙ্গলদের তাহাদের বিজিত লোক ছাড়া অন্য কারও নিকট হইতে শিক্ষা লাভের সুযোগ ছিল না।

মোঙ্গল যুগে বাঁচিবার জন্য পারস্যবাসীগণ কর্তৃক ব্যবহৃত দ্বিতীয় পন্থা ছিল শৈল্পিক সৃজনশীলতা। আরব আক্রমণের প্রথম ধাক্কা পারস্যবাসীদের শৈল্পিক সজীবতাকে শ্বাসরুদ্ধ করে। পারস্যবাসীদের আকাঙ্খিত গুণগুলিকে ইসলাম ধ্বংস করিয়া দেয় এবং ইহার কঠোর প্রতিমূর্তি ধ্বংস সাধনের নীতিতে চিত্রকলা নিষিদ্ধ করে এবং শিল্পকলাবিদদিগকে কঠিন গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে। স্বীয় পারিপার্শ্বিকতা হইতে শিল্পীকে বিমুখ করিয়া নির্জনতার মধ্যে নিক্ষেপ করা হয়। পরে সে নিজেকে জ্যামিতিক রেখাচিত্রে ও ক্যালিগ্রাফির মাধ্যমে বস্তু নিরপেক্ষ শিল্পকলায় প্রকাশ করে। কিন্তু সর্বদা সে তাহার ক্যানভাসের উপর বা কম্বলের উপর একটি বন্ধনী সৃষ্টি করে এবং পূর্বের ন্যায় নিজেকে কেন্দ্রীয় মেডালিয়নে আবদ্ধ করিয়া রাখে। মোঙ্গলগণ বিভিন্ন গুণাবলী ধ্বংস করিয়াছে কিন্তু নিজস্ব কোন ধর্মীয় মতামত না থাকায় তাহারা কোন বিধিনিষেধ আরোপ করে নাই। শিল্পী চিত্রকলা বা তাহার ইচ্ছানুযায়ী যে কোন আকারে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারিত। বস্তুতঃ একদা বর্বর মোঙ্গলদের ক্ষমতায় পারস্য সংস্কৃতিকে ইসলামের গণ্ডিভূত প্রভাব হইতে মুক্ত করে এবং ইরানকে এশিয়া ও ইউরোপের সংস্কৃতির সংস্পর্শে আনয়ন করে। বিখ্যাত পারস্য ক্ষুদ্রাকৃতি চিত্র চীনা ও পারস্য চিত্রের একটি সংমিশ্রণ। কপিকারক কর্তৃক দেওয়া গ্রন্থে শিল্পী যে কোন ঘটনায় যে কোন চিত্র অঙ্কন করিতে পারিত। পারস্যবাসী শিল্পী ক্ষুদ্রাকৃতির চিত্রের চতুর্দিকে বন্ধনী অঙ্কন করিত, কিন্তু বন্ধনীর ভিতরের চিত্র কোন কোন স্থানে বন্ধনীর বাহিরেও চলিয়া যাইত এবং উহা যাহা শিল্পী যত্রতত্র ঘুরিবার স্বাধীনতা প্রকাশ করিত।

মোঙ্গল আক্রমণের ধাক্কা সামলাইবার জন্য পারস্যবাসী কর্তৃক ব্যবহৃত তৃতীয় পন্থা ছিল সুফীবাদ, যদ্বারা সে তাহার চতুষ্পার্শ্বে ভাঙ্গিয়া পড়া বাস্তব পৃথিবীর বৈশিষ্ট্যকে তুচ্ছজ্ঞান করে। মোঙ্গল আধিপত্যের ভয়াবহতা এড়াইবার জন্য পারস্যবাসীর জীবনে সুফীবাদ একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে, এবং সর্বোত্তম সৃজনশীল পারস্য প্রতিভার বিকাশেও সহায়ক

করে। সুফীবাদ জীবনের ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতি সম্পর্কে পারস্যবাসীদের সচেতনতার বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়া—যে সচেতনতা মোঙ্গল ধ্বংসলীলার দ্বারা আরও প্রকট হয়—ফলে অতিন্দ্রীয় অভিজ্ঞতা, অর্থাৎ আল্লাহর সঙ্গে আত্মার সম্মিলন, আত্মাকে মুক্ত করিবার একটি পন্থায় পরিণত হয়। সর্বশ্রেষ্ঠ পারস্য কবি ও লেখকদের মধ্যে এই যুগের বেশ কিছু সংখ্যক মনীষী ছিলেন, যথা—রুমী, হাফেজ সাদী ও অন্যান্যগণ।[১] ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর পশ্চিমা অতিন্দ্রীয়বাদী, সমগ্র পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী স্বভাবের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, তিনি এই ক্ষণস্থায়ী বিশ্বের কোন কিছুই উপভোগ করিতে পারেন না এবং তাই সন্ন্যাসীতে পরিণত হন। অপরদিকে পারস্যবাসী মোটামুটিভাবে পৃথিবীকে অস্বীকার করেন আবার তৎসঙ্গে যাহা তাহার নাগালের মধ্যে উহা তিনি উপভোগ করেন।

ক্রুসেডারগণের বহিষ্কার ও মোঙ্গলদের সংমিশ্রণের যুগ শেষ হইলে দেখা যায় মধ্যপ্রাচ্যে এমন এক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে যাহা দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে আব্বাসীয়দের পতনের সময় হইতে রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। এই অবস্থা কোন নতুন কিছু নয় কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের জন্য সম্পূর্ণ ঐতিহ্যবাহী।

প্রথমতঃ টাইগ্রীস, শাত-আল-আরব ও পারস্য উপসাগরের সাধারণ রেখা বরাবর ইরান ফারটাইল ক্রিসেন্ট হইতে পৃথক হইয়া যায়। সাসানীর শাসনের সময় এইরূপই ছিল। এই নদীগুলির উভয় পাড়ের লোকদের ইতিহাস, সংস্কৃতি এক হইলেও কোন অংশই অপর অংশের ভাগ্যের অংশীদার হয় নাই। এই প্রক্রিয়া নবম শতাব্দীর শেষ যুগগুলিতে আরম্ভ হয় এবং পরবর্তীকালে আরও জোরদার হয়। ক্রুসেডারদের সময় সিরিয়ার সেলজুকগণ বারবার তাহাদের স্বগোত্রীয় ইরানের সেলজুকদের সাহায্য প্রার্থনা করে। কিন্তু এই প্রার্থনা তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নাই। অনুরূপভাবে পূর্বাঞ্চলের পারস্যবাসী ও তুর্কী উভয়েই মোঙ্গলদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে ফারটাইল ক্রিসেন্টের শক্তিবর্গ তাহাদের সাহায্যে আগাইয়া আসে নাই। ইসলামের আগমনের পূর্বেকার সেই ভাগাভাগী মোঙ্গলদের আগমনের পরেও চলিতে থাকে। বাহ্যতঃ একই ধর্মাবলম্বী লোকদের মধ্যে

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১০২ (মূল গ্রন্থ)।

মুসলিম বিশ্বে যেরূপ পার্থক্য, অনুরূপ পার্থক্য অন্ত কোন ধর্মাবলম্বী লোকদের মধ্যে দেখা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ ইলখানী আমলে ও পরে নামাজ ও কোরান তেলাওয়াত ব্যতীত প্রত্যেক ক্ষেত্রে ফার্সী ভাষা আরবী ভাষার স্থলাভিষিক্ত হয়। কিভাবে সাফাভীয় ও সাসানীয়গণ ফার্সী ভাষার পুনর্জাগরণ আরম্ভ করে তাহা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্যের যুগে ফার্সী ভাষা অধিকতরভাবে ব্যবহৃত হইতে থাকে। কিন্তু তবুও বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ তাঁহাদের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী আরবীতেই লিপিবদ্ধ করেন। তবে মোজলদের আগমনের পর ফার্সী ভাষা প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্বকীয়তা লাভ করে। কাব্যিক, দার্শনিক অথবা বৈজ্ঞানিক সমস্ত রচনা ফার্সী ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়। তবে পারস্যবাসীদের বিরাট সংখ্যাগুরু লোকজন তাহাদের নামাজ ও কোরান তেলাওয়াত না বুঝিয়াই আরবী ভাষায় করে। ফলে ইলখান হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত ইরানের ইতিহাস একটি স্বাধীন ইতিহাস। ইহাসহ মধ্যপ্রাচ্যের বাকী অংশ জরীপ করা ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের ন্যায়ই সমস্তাপূর্ণ।

এই ব্যাপারে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ইরানের জন্ত মোজল আক্রমণের একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া রহিয়াছে। এই আক্রমণ ছিল ক্ষতিকারক। কারণ ইহা ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও রাজনৈতিক বশুতা এমন প্রকটভাবে সৃষ্টি করে যে ইহার ফলে রাজনৈতিক জাতীয় ঐক্যের উৎকর্ষ বাধাগ্রস্ত হয়। আইনহীনতার মধ্যে পারস্ত আইন শুধু নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। যে কোন বিষয়ে, বিশেষতঃ রাজনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করিতে সে অস্বীকার করে। শ্রেষ্ঠ কবি সাদী (মৃত্যু ১২৯২ খ্রীঃ) লেখেন : "স্বদেশ প্রেম সম্পর্কে বলা বেশ ভাল, কিন্তু মাতৃভূমির জন্ত প্রাণ বিসর্জন দেওয়া বোকামী।" অপরদিকে মোজল আক্রমণ একটি আশীর্বাদ স্বরূপ, কারণ ইহা পারস্যবাসীদিগকে আত্মার দিক দিয়া মুক্তি প্রদান করে এবং এক ধরনের সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপন করে। কোন প্রকার ধর্মীয় আইনের ক্ষেত্রে যেমন তাহাদের কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না, ঠিক তেমনি আরবদের হীনমন্যতাবোধও তাহাদের ভিতর ছিল না। একটি নতুন সাংস্কৃতিক "জাতীয়তাবাদ" পুরাতন

রাজনৈতিক আধিপত্যের সংঘাতের ফলাভিষিক্ত হয়। একবার সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠিত হইবার পর দেড় শতাব্দীর মধ্যে সাফাভীয় বংশ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে রাজনৈতিক ঐক্য আসে।

তৃতীয়তঃ ক্রুসেডারগণের পর ফারটাইল ক্রিসেন্ট, আরব এবং মিসরও অতীতের গতানুগতিক অবস্থায় নামিয়া আসে। আব্বাসীয়দের ক্ষমতা লাভের পর গুরুত্বহীন আরব উপদ্বীপ অনেক দিন হইতে কোণঠাসা হইয়া পড়ে। ইহার অধিবাসীগণ তাহাদের ঐতিহ্যবাহী মরুজীবন হইতে যেভাবে বাহির হইয়া আসিয়াছিল ঠিক অনুরূপভাবে সেই জীবনে ফিরিয়া যায়। ফারটাইল ক্রিসেন্ট ও মিসরের সম্পর্কও এমন এক ধাপে নামিয়া আসে যাহা প্রাচীন মধ্যপ্রাচ্যের শিক্ষার্থীদের সুপরিচিত। যে ভাবেই হউক, মিসর ও ফারটাইল ক্রিসেন্ট সমপর্যায়ে কখনও থাকিতে পারে নাই এবং তাহারা এখনও পারিতেছে না। হয় একটি অপরটিকে শাসন করিতে চায় অথবা উভয়েই একটি তৃতীয় শক্তির দ্বারা শাসিত হয়। ক্রুসেডের সমাপ্তির পর মামলুকদের অধীনস্থ মিসরই ফারটাইল ক্রিসেন্ট শাসন করে।

যাহা হউক, বাগদাদের পতনের পর হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগ পর্যন্ত মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস কোন আরবীভাষী অথবা ফার্সীভাষী লোকদের ইতিহাস নহে। ইহার প্রধান নায়ক ছিল মূলতঃ তুর্কীগণ। ইহারা হইল ওসমানীয় তুর্কীগণ, যাহারা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ফলা-ভিষিক্ত হয়; এবং ইরানের পারস্য-তুর্কীগণ যাহারা সাফাভীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। ইরানের উন্নতি কিভাবে মোঙ্গলদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের দ্বারা বাধাগ্রস্থ হয় তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। অতএব, ওসমানীয়গণ নতুনভাবে উহা আরম্ভ করে এবং উহাদের প্রতিই আমরা এখন নজর দিব।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ওসমানীয় সুলতানাত

'ওসমান ১ম (১২৯৯—১৩২৬) মুরাদ ১ম (১৩৬০—১৩৮৯)

ওরহান (১৩২৬—১৩৬০) বায়েজীদ ইলদেরীম (১৩৮৯—১৪০২)

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, মুসলিম খিলাফত ও বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যের মধ্যে সংঘটিত প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক যুদ্ধে তুর্কী সৈন্যগণ ইসলামের একটি কার্যকরী অগ্রসেনাবাহিনী বলিয়া প্রমাণ করিয়াছে। তাহারাই ১০৭১ খ্রীস্টাব্দে আর্মেনিয়ার ভ্যান হ্রদের উত্তরে মাজিকার্তের যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া রোমান সম্রাট ডায়জিনাস্‌কে বন্দী করে। এই বিজয় মুসলমানদের জন্য এশিয়া মাইনরের পথ উন্মুক্ত করে এবং তুর্কী গোত্রগুলিকে পশ্চিমে সুদূর স্মার্ণা পর্যন্ত অগ্রসর হইতে সহায়তা করে। এই কাজ সম্পন্নকারী সেলজুক তুর্কীগণ শেষ পর্যন্ত ইরানে বসবাসকারী তাহাদের আত্মীয়স্বজন হইতে পৃথক হইয়া যায় এবং এশিয়া মাইনরের সেলজুক অথবা মুসলমানদের ভাষায় "রুম"-এর নামানুসারে 'রুমের সেলজুক' হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এক নাগাড়ে অনেকগুলি যুদ্ধের দ্বারা সেলজুকগণ এশিয়া মাইনরের অধিকাংশ এলাকা অধিকার করে এবং ১৩০২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাস্তবে অথবা নামে শাসন কার্য চালাইয়া যায়। এই যুগের অধিকাংশ সময় তাহাদের রাজধানী ছিল কোনিয়া (আইকানিয়াম)। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এবং চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তুর্কীদের অনেকগুলি নৃপতি ছিলেন যাহারা মুসলিম বুদ্ধিজীবীদিগকে তাহাদের রাজধানীর প্রতি প্রলুব্ধ করেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট নিরাপত্তা প্রদান করেন। ৩০০ বৎসরের সেলজুক শাসনের দ্বারা সংঘটিত একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হইল এশিয়া মাইনরের এক বিরাট অংশের তুর্কীরূপ পরিগ্রহণ। পশ্চিমে কাম্পিয়ানের তুর্কীদের আগমনের প্রভাবে

কিছু সংখ্যক যাযাবর তুর্কী এশিয়া মাইনরের গ্রামগুলিতে স্থায়ী কৃষি-জীবীতে পরিণত হয়।

কিছু ব্যতিক্রমসহ ইসলামের সংস্পর্শে আগমনকারী তুর্কী গোত্রসমূহ সুন্নী মতামত গ্রহণ করে এবং ইহার নিয়মপ্রণালী ও বিধিনিষেধের প্রতি অন্ধবিশ্বাস স্থাপন করে। ইসলামের সঙ্গে তাহাদের সংযোগ ছিল যৌক্তিকতার চাইতে ভাবাবেগপূর্ণ। যুক্তিবাদের চাইতে আনুগত্যের অনুভূতিই ছিল এক্ষেত্রে অতি প্রবল। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহাদের মধ্যে সুফী ধ্যানধারণার দ্রুত প্রসার তেমন আশ্চর্যজনক নহে, কারণ সুফীবাদ আনুগত্যের উপর জোর দেয় এবং খোদা প্রেমের উচ্চ প্রশংসা করে। সুফীবাদ, যাহা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বিশেষের প্রচেষ্টার দ্বারা আরম্ভ হয় তাহাই তুর্কী গোত্রসমূহের মধ্যে একটি সামাজিক রূপ পরিগ্রহ করে। প্রধানতঃ খোদাপ্রেমের অভ্যাস করিবার জন্য সুফীবাদের অনুসারীগণ নিজেদিগকে ভ্রাতৃত্বসংঘে সংগঠিত করে। এইরূপ ভ্রাতৃত্বসংঘ সুন্নী ও শীয়া উভয়ের মধ্যে গড়িয়া উঠে এবং তরিকা নামে খ্যাত হয়। তুর্কীদের নিকট কোন জটিল ভাবধারার প্রতি আনুগত্যের চাইতে নেতার প্রতি ব্যক্তি বিশেষের আনুগত্যই অধিক গ্রহণযোগ্য ছিল।

এই তরিকাগুলি, পরে দরবেশ উপাধি লাভ করে, একদিকে তুর্কীদিগকে একতাবোধ ও আত্মীয়তার মনোভাব দান করে; আর অন্যদিকে তাহারা নিজেদিগকে কতকগুলি অপরিচিত লোকদের মধ্যে দেখিতে পায়। এই তরিকাগুলির মধ্যে তাহারা তাহাদের গোত্রীয় ঐতিহ্য, যথা কঠোর শৃঙ্খলা, নেতার প্রতি আনুগত্য ও দুর্যোগে সহিষ্ণুতা ইত্যাদি প্রচলন করে। ইহাতে প্রত্যেক তরিকার একটি নেতা থাকেন, যিনি তাঁহার আত্মার অন্তর্দৃষ্টি, শৃঙ্খলা, ধার্মিকতা ও মহৎ গুণাবলীর দ্বারা এই পদে উন্নীত হন। প্রত্যেক তরিকার খান্‌কাহ্‌ নামে এক একটি কেন্দ্রস্থল থাকে এবং প্রত্যেক কেন্দ্রস্থলের একজন নেতা থাকেন, যাঁহাকে শেখ (আরবী) দাদা (তুর্কী) অথবা পীর (ফার্সী) বলা হয়। ভাষান্তরে এগুলির প্রত্যেকটির অর্থ "বয়োজ্যেষ্ঠ"। নবাগত বা মুরীদ মস্তক মুণ্ডন এবং "আলোক প্রাপ্ত" বলিয়া স্বীকৃতি না পাওয়া পর্যন্ত একটি কঠোর

আত্মসংযম, পাঠাভ্যাস, নামাজ ও রাত্রির এবাদতের মধ্যে জীবন-যাপন করে। ধর্মীয় অনুশীলনীর জন্য তাহারা হল্‌কা বা বৃত্তাকারে উপবেশন করে এবং ভাবাবেগে নিস্তেজ না হওয়া পর্যন্ত কোরানের একটি বাক্য বিকির বা জোরে জোরে পাঠ করে। কোন কোন তরিকায় সঙ্গীতের প্রচলনও রহিয়াছে। সুফী কবিতাবলী গাহিতে গাহিতে ধর্মীয় উল্লাসে দরবেশগণ নাচিতে আরম্ভ করে ও নিজেদিগকে আল্লার মধ্যে হারাইয়া ফেলে। "আলোক প্রাপ্তির" পর কেউ কেউ চুল বড় হইতে দেয় এবং ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করে।

এই তরিকাগুলির সঙ্গে জড়িত থাকে "সহভ্রাতাগণ" যাহাদের "আখী" নামে একটি সংগঠন থাকে, যাহা অনেকটা 'অর্থনৈতিক সংস্থার' ন্যায়। তাহারা পীর বা বয়োজ্যেষ্ঠের নেতৃত্ব গ্রহণ করে, উক্ত তরিকতের প্রচলিত কার্যক্রম ও প্রচারিত উপদেশাবলী পালন করে; যদিও তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত। এই শ্রেণীর সঙ্গে জড়িত আরেক দল 'সহচর' হইল যোদ্ধাদল বা গাজী। তাহাদের উদ্দেশ্য হইল "কাফের" বা অমুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা এবং যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি ও ক্রীতদাস লাভ করা। জৈন-বৌদ্ধদের চিন্তাশীল শ্রেণীর শৃঙ্খলা যেরূপ জাপানের সামুরাই যোদ্ধাদলের উৎপত্তিতে উৎসাহ দান করে, প্রায় তদ্রূপ সুফী শ্রেণীগুলির কঠোর আত্মসংযম গাজী যোদ্ধার সৃষ্টি করে, যাহারা নেতার ইচ্ছাকে যেরূপ অন্ধভাবে পালন করে সেইরূপ একান্তভাবে "ফতোয়া" নামক একগুচ্ছ আইনের অনুসরণ করে। এইসব তরিকার লোকজনকে তাহাদের পাগড়ীতে পরিহিত একটি বিশেষ ব্যাজ অথবা একটি বিশেষ ধরণের কাপড় পরিধানের দ্বারা চেনা যায়। একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের অনুপস্থিতিতে এইসব তরিকা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদান করে এবং ধর্মীয় সন্তুষ্টি ও উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে সহায়তা করে। এইসব তরিকায় ধর্ম, বাণিজ্য ও যুদ্ধ একত্রে সন্নিবেশিত হয়। ইহারা আইন ও নেতার প্রতি আনুগত্যে বাধা এক শ্রেণীর সমাজ প্রতিষ্ঠিত করে। তুরস্কের ওসমানীয় বংশ এবং ইরানের সাফাভীয় বংশ উভয়ের প্রতিষ্ঠাতা সুফী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। প্রথমোক্তটি সুন্নী এবং পরবর্তীটি শীয়া। বাইজেন্টাইনের স্ক্রীটেরা (Skritoi) নামক একটি দল দ্বারা এইসব গাজী

যোদ্ধাগণ প্রভাবিত কিনা তাহা সঠিক বলা যায় না। তবে ইহা ঠিক যে মোঙ্গলদের আগমন এবং তাহাদের পরবর্তী বসতি স্থাপন, গাজী ঐতিহ্যকে শক্তিশালী করিয়াছে।

ওসমানীয়দের উৎপত্তি কিংবদন্তীর সহিত মিশ্রিত। তাহারা মধ্য এশিয়ার উঘুজ তুর্কী বংশোদ্ভূত। ১২৫১ খ্রীস্টাব্দে মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে কোনিয়ার সুলতানকে সাহায্য দানের পুরস্কার হিসাবে জনৈক ইরতোগ্রীলকে উত্তর পশ্চিমে আনাতোলিয়ায় একটি জায়গীর প্রদান করা হয়। তাহার পুত্র ওসমান ইসলামের জন্য যুদ্ধকারী একজন গাজী নেতা। পরবর্তীকালে ইউরোপের ভাগ্যের প্রতি হুমকি স্বরূপ এই ঘটনাবলী যখন এশিয়া মাইনরে চলিতেছিল তখন ১২৫০ খ্রীস্টাব্দে স্বয়ং ইউরোপে হলি রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডরিক প্রাণত্যাগ করেন। মুরদিগকে স্পেন হইতে বহিষ্কার করা হয়। তৃতীয় হেনরী ইংল্যাণ্ডে রাজত্ব করেন, মস্কোর রাজন্যবর্গ মোঙ্গল আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ করেন এবং জেরুজালেম হইতে ক্রুসেডারগণ বিতাড়িত হয়।

আনুমানিক ১৩০০ খ্রীস্টাব্দে ওসমান তাঁহার কার্যাবলী আরম্ভ করেন এবং ২৬ বৎসরের মধ্যে এশিয়া মাইনরের আধুনিক ইস্‌কি শিহর অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া তোলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি নিজেকে কোনিয়ার সুলতান হইতে স্বাধীন একজন আমীর বলিয়া ঘোষণা করেন। অনুরূপ ছোট ছোট গাজী ক্ষুদ্র রাজ্য একইভাবে গড়িয়া উঠে, কিন্তু প্রথম বা দ্বিতীয় পুরুষে ঐগুলির শক্তি নিঃশেষ হইয়া যায়। তবে ওসমানের বংশ ছিল একটি ব্যতিক্রম। তাহার বংশধরদের মধ্যে সাঁইত্রিশ জন সুলতান ৬২২ বৎসর পর্যন্ত বিশ্বের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যগুলির অন্যতম একটি সাম্রাজ্যে রাজত্ব করে। তাঁহার বংশধরগণ কখনও তাহাকে ভুলে নাই। তাহারা গর্বভরে নিজেদিগকে 'ওসমানীয়' বলিয়া অভিহিত করে। অতএব আরবী উচ্চারণ 'ওসমান' থেকে ল্যাটিন অটোম্যান নামের উৎপত্তি হয়—এবং প্রত্যেকে সিংহাসনে আরোহণের পর ক্ষমতার প্রতীক হিসাবে, ওসমানের তরবারী স্বীয় কটিতে ঝুলান।

এই ধরনের সুদীর্ঘকাল ক্ষমতাসীন থাকিবার কারণ সম্পর্কে যে কোন লোকের মনে কৌতূহল জাগে। কিন্তু তাহার কার্য-কারণ বিবেচনা করিতে গিয়া, তাহারা ইতিহাসের এমন একটি অমোঘ বৈচিত্র্যের সম্মুখীন হয়

যাহার কোন সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। একটি কারণ নিশ্চয়ই এই যে 'আখীদের' মধ্যে যোদ্ধা 'গাজীগণ' একটি অর্থনৈতিক ভিত্তি লাভ করে। তাহারা এই শ্রেণীর ধর্মীয় অংশের লোকজনসহ এই সংঘবদ্ধ দলের অন্তর্ভুক্ত, এবং একে অপরের প্রতিও প্রত্যেক নেতার প্রতি অনুগত। প্রায়ই উল্লেখিত আরেকটি কারণ হইল ইসলামী বিশ্বের বিশৃঙ্খল অবস্থা এবং বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের ভগ্নপ্রায় অবস্থা। এই দুর্বলতা যদিও ওসমানীয়দের ক্ষমতারোহণে সহায়তা করিয়াছে, তবুও ওসমানীয় বিজয়গুলি খুবই সহজ ছিল বলিয়া মনে করা যায় না। বুরসা নগরী প্রায় ৯ বৎসর পর্যন্ত অবরুদ্ধ ছিল। তবে ওসমানীয়দের একটি অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, ২০০ বৎসরের মধ্যে ওসমানের বংশধরদের একের পর এক আট পুরুষ ছিলেন স্থির সিদ্ধান্তের অধিকারী, উত্তম প্রশাসক এবং স্ব স্ব অধিকারের বলে নেতৃস্থানীয়। এই গুণাবলী তাহাদের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। যখন সুলতানগণের মধ্যে দুর্বলতার লক্ষণ প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে তখন সাম্রাজ্য এত বৃহৎ আকার ধারণ করিয়াছে যে ইহা খণ্ড-বিখণ্ড হইতে আরও ২০০ বৎসর অতিবাহিত হয়। এই শেষ বৎসরগুলিতে "ইউরোপের রুগ্ন মানুষটিকে" ইউরোপের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলির স্বার্থেই জীবিত রাখা হয় বলিয়া মনে করা হয়।

গুরুত্বপূর্ণ বুরসা নগরটি ১৩২৬ খ্রীস্টাব্দে পিতা ওসমানের মৃত্যুর সময় ওরহান অধিকার করেন। এই নগরটিতে ওরহান তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন এবং রাজ্যের বিস্তৃতির প্রতি মনোযোগী হন। গাজী ভ্রাতৃত্ব কোন জাতীয় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নহে বরং আনুগত্য ও কার্যাবলীর উপর ভিত্তি করিয়া ইহা রচিত। ফলে নবাগত সবাইকেই তাহারা গ্রহণ করে। তবে শর্ত হইল, তাহাদিগকে মুসলমান হইতে হইবে এবং নেতার প্রতি অনুগত থাকিতে হইবে। উক্ত দর্শনীয় বিজয় লাভের পর অন্যান্য গাজী দলগুলিও ওরহানের সঙ্গে যোগদান করে এবং উত্তরোত্তর তাহার শক্তি বৃদ্ধি করে। তদুপরি ওরহান সম্পূর্ণ বিবেচিত ভাবে পরাজিত শত্রুকে ধ্বংস করা বা ইসলাম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিবার প্রচলিত ঐতিহ্যকে পরিবর্তন করেন। "মহাগ্রন্থের জাতি" হিসাবে এবং চিরাচরিত মাথাপিছু কর প্রদান করিয়া খ্রীস্টান ও ইহুদীদিগকে বসবাস করিতে দেওয়ায় মুসলমান ঐতিহ্যকে তিনি

গ্রহণ করেন। এই নীতি ধ্বংসের চেয়ে অধিক স্থিতিশীলতা আনয়ন করে এবং শহর এলাকার স্থায় গ্রাম্য এলাকাগুলিও নতুন নিরাপত্তা লাভ করে—যেগুলি দুর্বল বাইজেন্টাইন বা যুদ্ধরত দলগুলির অধীনে অতি শোচনীয় অবস্থায় ছিল।

১৩৬০ খ্রীস্টাব্দে ওরহান পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে ওরহান এক উল্লেখযোগ্য আকারে রাজ্য বিস্তার করেন, তন্মধ্যে বুরসা, ইজনিক (নিকোশিয়া), ইজমিদ (নিকোমেডিয়া) ও বারজামার (পারগামাম) স্থায় সমৃদ্ধশালী নগরীগুলি ছিল অন্যতম। অন্যূন তিনটি ঘটনা তাহাকে সহায়তা প্রদান করে। একটি হইল দুইজন প্রতিদ্বন্দ্বী বাইজেন্টাইনের মধ্যে শত্রুতা। ইহারা হইলেন জন ক্যান্টাকুজেমাস এবং জন পেলিওলোগাস। প্রথমোক্ত ব্যক্তির সঙ্গে যোগদান করিয়া ওরহান ইউরোপে প্রবেশের সুযোগ লাভ করেন। অতঃপর তিনি লুণ্ঠন কার্যের জন্য অস্থির গাজীদিগকে থ্রেস ও কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে ছাড়িয়া দেন। ক্যান্টাকুজেমাসের কন্যা থিওডোরাকেও ওরহান বিবাহ করেন। দ্বিতীয় সাহায্য হইল ব্ল্যাক ডেথ্‌ নামক এক ধরনের ওলাউঠা রোগ—যাহা ১৩৪৭ খ্রীস্টাব্দে আরম্ভ হয় এবং যাহা সমগ্র বলকানে ছড়াইয়া পড়ে ও প্রত্যেক কিছুকে ধ্বংস করে। ওসমানীয়দের অগ্রগতি প্রতিরোধ করিবার জন্য কোন ক্রুসেডারদের আগমনের সম্ভাবনা থাকিলেও ব্ল্যাক ডেথ্‌ উহাকে প্রতিরোধ করে। তৃতীয় সাহায্য হইল ১৩৫৪ খ্রীস্টাব্দের ভূমিকম্প—যাহা মার্মারা সাগরের ইউরোপীয় পারে আঘাত হানে এবং গ্যালিপুলি ধ্বংস করে।

১৩৬০ খ্রীস্টাব্দে প্রথম মুরাদ তাঁহার পিতার উত্তরাধিকারী হন। দুই বৎসর পর ইদির্ন (আদ্রিয়ানোপল) তাঁহার করতলগত হয় ও এক শতাব্দী পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত রাষ্ট্রের রাজধানী থাকে। ওরহানের এই উচ্চাভিলাষী অশিক্ষিত পুত্রটি, তাঁহার আদেশাবলী দস্তখত করিতেন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তিনটি আঙুলের ছাপমোহর দ্বারা, তিনি বিদ্যাশিক্ষা পছন্দ করিতেন এবং বিভিন্ন বিদ্যালয় ও লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করেন। পশ্চিমে তিনি বলকান পর্যন্তও অগ্রসর হন। তিনি খুবই চালাক ছিলেন। তিনি খ্রীস্টান রাজ্যগুলির একজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া তাঁহাকে আরেকজনের বিরুদ্ধে লাগাইয়া দিতেন এবং শেষ পর্যন্ত তাহাদের সবাইকে ধ্বংস করিতেন। তিনি বুল-

গেরিয়া, ম্যাসেডোনিয়া ও সার্বিয়ার কিয়দংশ জয় করেন। এশিয়া মাইনরে তিনি শক্তির মহত্তা দেখাইয়া কূটনীতি প্রয়োগ করেন এবং আংকারা অধিকার করেন। তাঁহার সময় সংঘটিত সর্ববৃহৎ যুদ্ধ ছিল সম্ভবতঃ কোসে-ভোর (১৩৮৯ খ্রীঃ) যুদ্ধ, যদ্বারা সার্বিয়া বিজিত হয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউ-রোপের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়। মুরাদ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন এবং তাঁহার উত্তরাধিকারী প্রথম বায়েজীদ তাঁহার অর্ধ সমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করেন।

বায়েজীদ (১৩৮৯—১৪০২ খ্রীঃ) ছিলেন প্রথম ওসমানীয় যিনি সম্রাটের বেশ ধারণ করেন। তদুপরি তিনি ছিলেন চতুর, নিষ্ঠুর, দাম্ভিক ও উচ্চা-কাঙ্খী। তাঁহার প্রাথমিক কার্যাবলীর একটি ছিল নিজেকে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহার ভ্রাতা ইয়াকুবকে গলা টিপিয়া হত্যা করা। ধর্মীয় নেতাদিগকে তিনি এই কাজ কোরানের মাধ্যমে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করিতে বাধ্য করেন। এই রীতি ওসমানীয়দের মধ্যে প্রায় তিন শতাব্দী পর্যন্ত ক্রমশঃ একটি সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়। তাহার নিষ্ঠুরতা ও দ্রুত কার্য সমাধার জন্য তাঁহার অধীনস্থ লোকজন তাঁহাকে ইলদেরীম (বজ্রাঘাত) নামে অভিহিত করেন।

তাঁহার সময় কনস্ট্যান্টিনোপল স্থলভাগে সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হয়, কিন্তু সমুদ্রের দিক হইতে এই নগরী অবরোধ করিবার মত যথেষ্ট নৌশক্তি ওসমানীয়দের ছিল না। তাঁহার সঙ্গে যোগাযোগকারী নাবিক গাজীদের সহায়তায় বায়েজীদ ১৩৯০ খ্রীস্টাব্দে একটি নৌবাহিনী গঠনের কাজ আরম্ভ করেন। ১৩৯৬ খ্রীস্টাব্দে মধ্যে তাঁহার নৌবাহিনী আড্রিয়াটিকের উপ-কূলভাগে আক্রমণ আরম্ভ করে এবং তাঁহার সেনাবাহিনী স্থলভাগে নিকোপোলিসের দিকে অগ্রসর হয়। এই সব বিজয় হাঙ্গেরীর রাজা সিজি-সমণ্ডকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে এবং তিনি ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স জার্মানী ও ইউরোপের অন্যান্য অংশের নাইটদিগকে মিলিত করিয়া একটি ক্রুসেডের আয়োজন করেন। প্রসিদ্ধ নিকোপোলিসের (১৩৯৬ খ্রীঃ) যুদ্ধে ইউরোপীয়-গণ পরাজিত হয় এবং তাহাদের শত শত অভিজাতবর্গ বায়েজীদের করায়ত্ত-লগত হয়। "ক্রুসেড" আয়োজনের ইহাই বোধহয় শেষ প্রচেষ্টা; কিন্তু ওসমানীয়দের অগ্রগতি রোধ করিবার শেষ প্রচেষ্টা নহে। তবে বিজয়ী সুলতান তাঁহার অভিযান ইউরোপের পশ্চিম দিকে পরিচালনা না করিয়া

দক্ষিণে গ্রীসের দিকে পরিচালনা করেন।

যাহা হউক, বায়েজীদের অন্তর গ্রীসের চেয়ে এশিয়া মাইনরেই বেশী নিবদ্ধ ছিল। তিনি একটি মুসলিম রাষ্ট্রের সর্বজন স্বীকৃত শাসক হইতে চাহেন। তিনি এবং তাঁহার পিতা নিজেদিগকে "সুলতান" উপাধিতে পরিচয় প্রদান করিলেও তিনি কায়রোর ক্রীড়নক খলিফার সরকারী অনুমোদন প্রত্যাশা করেন। বাগদাদের পতনের পর মামলুক শাসকগণ তাহাদের ক্ষমতাকে বাহ্যতঃ সম্মান দান করিবার জন্য হালাকুর সৈন্যদের হাত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত ও পলাতক আব্বাসীয় পরিবারের একজন সদস্যকে লইয়া যান এবং খলিফা বলিয়া ঘোষণা করেন। তবে এশিয়া মাইনর জয় করা ছিল গাজী ঐতিহ্যের বিরোধী। গাজীগণ তাহাদের মুসলিম ভাইদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটা অপছন্দ করিতেন, বিশেষতঃ ভ্রাতৃসংঘগুলির অধীন গাজীদের বিরুদ্ধে। মুরাদ আংকারা অভিমুখে অগ্রসর হন—অধিকাংশ ক্ষেত্রে কুটনীতির দ্বারা, কিন্তু বায়েজীদের অত ধৈর্য ছিল না। মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য তিনি খ্রীস্টান ভাড়াটিয়া সৈন্য আনিতে বাধ্য হন, যাহা এশিয়া মাইনরের গাজী রাষ্ট্রগুলিকে শত্রুভাবাপন্ন করিয়া তোলে। বায়জীদের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য তাহাদের কেউ কেউ মিসরের মামলুকদের শরণাপন্ন হয় এবং অন্যান্যরা এক নতুন বিজয়ী তৈমুরের সাহায্য প্রার্থনা করে। পূর্বের দিগন্তে তখন তৈমুরের অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল।

মামলুকগণ

এই অদ্ভুত এবং অতুলনীয় ধনতন্ত্রী রাষ্ট্র পরিচালকমণ্ডলী ছিল কতিপয় দাসসমষ্টি যাঁহারা ১২৫০ হইতে ১৫১৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মিসরে রাজত্ব করেন। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে মাত্র কয়েকজন শাসক মিসরের লোকদের জন্য শান্তির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। অন্যথায় মামলুক আধিপত্য দেশের জন্য ধ্বংস ও জনসাধারণের জন্য দুঃখদুর্দশাই আনয়ন করিয়াছে। বস্তুতঃ মিসরের জনসাধারণের ইতিহাস বোধহয় সুদীর্ঘকালের পরাধীনতার ইতিহাস। ফেরাউনদের পতনের পর হইতে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মিসর পরস্পর বিরোধী এবং সর্বদাই শত্রুভাবাপন্ন জাতি দ্বারা শাসিত হইয়াছে। এইগুলির মধ্যে মামলুকগণ ছিল সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট।

মামলুকগণের কোন বংশ ছিল না। কারণ তাহাদের মধ্যে কোন পুত্র পিতার উত্তরাধিকারী হইয়াছে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। ইহা ছিল ক্রীতদাসের কতিপয় লোক দ্বারা শাসিত একটি রাষ্ট্র—যাহাতে গড়ে এক একটি রাজত্বকাল ছিল অনধিক পাঁচ বৎসর। শক্তিশালী কোন শাসকের মৃত্যুতে (প্রায়ই সংঘর্ষমূলক) বাকী ক্রীতদাসগণ সর্বোচ্চ ক্ষমতার জন্ম একে অপরের সহিত যুদ্ধ করিত। ক্ষমতায় সমাসীন থাকিবার জন্ম দাস সুলতান আমীরদিগকে জমি ও সুবিধাদি দান করেন। এই আমীরগণও ছিলেন দাস এবং নিজেরাও দাস রাখিতেন।

মামলুক সুলতানগণ সাধারণতঃ দুইটি শাখায় বিভক্ত। একটিকে বলা হয় বাহ্‌রী (সমুদ্র) যাহারা ১২৫০—১৩৯০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেন। ইহারা ছিলেন অধিকাংশ তুর্কী ও মোঙ্গল ক্রীতদাস। অন্যটি ছিল বুর্জী (দুর্গ) ১৩৮২ হইতে ১৫১৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত যাহাদের শাসন বাহরীদের শাসনকে কিঞ্চিৎ ছাড়াইয়া গিয়াছে। তাহারা ছিলেন অধিকাংশই সার্কাশিয়ান ক্রীতদাস, মাত্র দুইজন ছিলেন গ্রীক ক্রীতদাস। প্রত্যেক মামলুক জানিতেন যে সুলতান হিসাবে তাঁহার জীবন খুবই সংক্ষিপ্ত। অতএব তিনি অপব্যয়ের মাধ্যমে বিলাসবহুল জীবনযাপন করিতেন এবং যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন। মামলুক যুগ নির্মিত এবং এখনও বিদ্যমান কতিপয় অতি মনোমুগ্ধকর ইমারত প্রমাণ করে যে অন্ততঃপক্ষে ইহাদের কয়েকজন উন্নত জীবনের প্রত্যাশী ছিলেন।

মামলুক সুলতানগণের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ দুইজন ছিলেন বইবার্স (১২৬০—১২৭৭ খ্রীঃ) ও কালাউন (১২৭৯—১২৯০ খ্রীঃ)। বাইবার্স মোঙ্গল হালাকুর অগ্রগতি প্রতিহত করেন এবং ক্রুসেডারদিগকে একটি শোচনীয় আঘাত প্রদান করেন। কালাউন সিরিয়া শাসন করেন এবং কায়রোতে সে যুগের একটি অত্যাধুনিক হাসপাতাল নির্মাণ করেন। ইহা একটি অদ্ভুত ব্যতিক্রম যে, এতসব রক্তক্ষয় ও গোলযোগের মধ্যে মিসর সমগ্র ইসলামী বিশ্বে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। কায়রো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একটি সমৃদ্ধশালী বাণিজ্য কেন্দ্রস্থলেও পরিণত হয়, যাহা লোহিত সাগরে পণ্য-সামগ্রী আনয়ন করে এবং সেখান হইতে উটের কাফেলায় ভূমধ্যসাগরে লইয়া যায়। এই ক্রীতদাস

সুলতানগণ আরবী শিখিবার কষ্ট স্বীকার করে নাই, তাহাদের মধ্যে কয়েকজন বাহ্যতঃ সাহিত্য ও শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধনের নিমিত্ত উৎসাহ প্রদান করেন। সম্ভবতঃ তাঁহারা নিজেদের স্মৃতি রক্ষা করিবার জন্য সমাধি ও মসজিদ নির্মাণে ব্যস্ত হন এবং এইভাবে ইসলামী বিশ্বে স্থাপত্য শিল্পের উন্নতিতে তাঁহাদের অবদান রাখিয়া যান। এই সমাধিগুলির মধ্যে অতি মনোমুগ্ধকর হইল কায়েত্‌বে কর্তৃক নির্মিত ভাস্কর্য—যিনি ১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

সম্মান বৃদ্ধির জন্য এবং অন্ততঃপক্ষে, তাঁহার শাসন ক্ষমতাকে আইনানুগ করিবার জন্য, বাইবার্স নিহত আব্বাসীয় খলিফার একজন চাচাকে হস্তগত করেন, যিনি মোঙ্গলদের হাতে নিশ্চিত মৃত্যু হইতে বাঁচিয়া যান। বাইবার্স তাঁহাকে বিরাট জাঁকজমকের সঙ্গে খলিফা আল-মুসতানসির নামে অভিষিক্ত করেন। পরে তিনি নতুন খলিফাকে লইয়া বাগদাদ জয় করিতে বাহির হন। মুসতানসির মোঙ্গলদের হাতে নিহত হন। অকুতোভয় বাইবার্স আব্বাসীয় বংশের আরেকজন সদস্য লাভ করেন এবং তাঁহাকে খলিফা আল-হাকিম নামে অভিষিক্ত করেন। হাকিম ও তাঁহার বংশধরগণ কায়রোতে মামলুকদের ক্রীড়নক হিসাবে অবস্থান করেন। তাঁহাদের কাজ ছিল ধর্মীয় দানসমূহ পরিচালনা করা এবং প্রত্যেক উত্তরাধিকারী মামলুক সুলতানদের অভিষেক করা। এই 'খলিফাদের' একজন প্রথম বায়েজীদকে সুলতানের ক্ষমতায় অভিষিক্ত করেন।

তৈমুর

তৈমুর ১৩৩৬ খ্রীস্টাব্দে ট্রান্সক্সিয়ানায় জন্মগ্রহণ করেন। পূর্ববর্তী কোন এক যুদ্ধে তাঁহার এক পা তীরের আঘাতে বিদ্ধ হয় এবং তিনি খোঁড়া (ফার্সী, লঙ্গ) হইয়া যান বলিয়া তিনি তৈমুর লঙ্গ নামে পরিচিত হন, যাহা ইউরোপীয় ইতিহাসে তামারলেন হইয়া যায়। তিনি ছিলেন দুঃসাহসিক অভিযাত্রীদের মধ্যে অন্যতম—যাহারা দাম্ভিক নৃপতিদিগকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিতে আনন্দ লাভ করেন। তিনি যুদ্ধ করেন ও ধ্বংস করেন এবং কদাচ পরাজিত হন। স্থিতিশীল সাম্রাজ্যের কথা দূরে থাক, একটি বংশ প্রতিষ্ঠা করিবার কোন পরিকল্পনাও তাঁহার ছিল কিনা সন্দেহের বিষয়। অধিকাংশ পরবর্তী মোঙ্গল সম্রাটদের ন্যায় মনুষ্যজীবনের

প্রতি তাঁহার বিশেষ কোন শ্রদ্ধা ছিল না। কেউ কেউ ছিল অন্যান্যদের চেয়েও অধিক শোচনীয়। তৈমুর মানুষের মাথা দিয়া পিরামিড নির্মাণ করিতে পছন্দ করিতেন—ইহা এক প্রকারের অভ্যাস যাহা তাঁহার অনুসারীদের মধ্যে কেউ কেউ অনুসরণ করে। এতদসত্ত্বেও তিনি ছিলেন শিল্পকলা ও সাহিত্যের একজন পৃষ্ঠপোষক এবং কোন কোন সময় তাঁহার শত্রুদের প্রতিও তিনি মহত্ব প্রদর্শন করেন। সম্ভবতঃ তাঁহার একটি মাত্র ভালবাসার বস্তু ছিল, তাহা সমরকন্দ নগরী। অন্যত্র প্রত্যেক স্থানের ধ্বংস সাধন করিয়া তিনি সমরকন্দ ও প্রতিবেশী বোখারা নির্মাণ করেন। সমরকন্দে এখনও তাঁহার সমাধি বিদ্যমান কিন্তু আর কিছুই অক্ষত নাই।

চেঙ্গিস খান এবং বহু সংখ্যক তুর্কী সেনাপতিদের তুলনায় তৈমুর ছিলেন শিক্ষিত এবং সাহিত্যে তাঁহার অতি সুন্দর জ্ঞান ছিল। দুই খণ্ড স্বরচিত জীবনচরিত তাঁহার কৃতিত্ব বহন করে। সম্পূর্ণ গ্রন্থ রচয়িতার বিষয়ে সন্দেহ থাকিলেও এই দুই খণ্ড গ্রন্থে তাঁহার চরিত্র ও তাঁহার রাজত্ব বিষয় বিবৃত হইয়াছে। নিজের সম্পর্কে তিনি লিখেন ঃ "আমার জীবনের দ্বাদশ বৎসর হইতে আমি বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করি, সমস্যাসমূহের মোকাবিলা করি, দুঃসাহসিক কার্য সমাধা করি ও বহু সেনাবাহিনীকে পরাজিত করি। বিপদের সময় আমি আমার নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া শেষ পর্যন্ত আমি বহু রাজ্য ও সাম্রাজ্য ধ্বংস করি এবং আমার নামের গৌরব প্রতিষ্ঠা করি।"

তৈমুর সোনালী বাহিনীর বিরুদ্ধে মস্কোর যুবরাজদের দুঃসাহসিক কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করেন। ১৩৮৮—১৩৯১ খ্রীস্টাব্দে তিনি উত্তরে সোনালী বাহিনী লিথুয়ানিয়ান ও মস্কোবাসীদের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি মস্কোর উপকণ্ঠে উপনীত হন এবং ভ্যাসিলির (১৩৮৯—১৪২৫খ্রী) নিকট হইতে কর আদায় করেন। এই লোকটি সোনালী বাহিনীকে পর্যুদস্তকারী প্রথম মস্কোবাসী যুবরাজ দিমিত্রি দনস্কয়-এর পুত্র। সেখান হইতে তিনি ইরাক গমন করিয়া বাগদাদ ধ্বংস করেন এবং মিসরের মামলুকদের নিকট হইতে সমগ্র সিরিয়া ছিনাইয়া লন। অতঃপর তিনি গাজীদিগকে বায়েজীদের বিরুদ্ধে সহায়তা করিবার মত অবস্থায় উপনীত হন।

তৈমুরের শেষ অভিযান ছিল বায়েজীদের বিরুদ্ধে। সম্ভবতঃ ইহাই তাঁহার সর্ববৃহৎ অভিযান। কারণ মধ্য এশিয়া ও ভারতবর্ষ হইতে ইহাদে

ও সিরিয়ার অন্য কোথাও তৈমুর ওসমানীয়দের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত এরূপ কোন রাষ্ট্রের মোকাবিলা করেন নাই। ১৪০২ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জুলাই সেই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বায়েজীদ পরাজিত ও বন্দী হন। তৈমুর সমগ্র এশিয়া মাইনর পদানত করেন এবং পশ্চিমে স্মার্ণা পর্যন্ত অগ্রসর হন। অতঃপর পাছে পালাইয়া যায় সেইজন্য তাঁহার বন্দী বায়েজীদকে একটি লৌহ নির্মিত খাঁচায় করিয়া তিনি সমরকন্দ গমন করেন। পথিমধ্যে বায়েজীদ প্রাণত্যাগ করেন। মৃতদেহ সমরকন্দে পৌঁছিয়াছিল কিনা জানা যায় নাই।

এশিয়া মাইনর ও বলকানে ওসমানীয় তুর্কীদের প্রতিষ্ঠা লাভ ছিল ইউরোপের রাজন্যবর্গ ও ব্যবসায়ীদের জন্য একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক হুমকি স্বরূপ। প্রথম হইতে পূর্বাঞ্চলে ওসমানীয়দের শত্রুদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ ওসমানীয়দের অগ্রগতি রোধ করিতে চেষ্টা করে। ক্যাস্টিলের তৃতীয় হেনরী (১৩৯০—১৪০৬ খ্রীঃ) ওসমানীয়দের অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য এবং তৎসঙ্গে স্পেনের খ্যাতি ছড়াইবার জন্য তৈমুরের নিকট প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। তৈমুর বাণিজ্য সম্পর্কের প্রস্তাব সমেত ইংল্যাণ্ডের চতুর্থ হেনরীর (১৩৯৯—১৪৬১) নিকটও একটি পত্র প্রেরণ করেন। এই পত্র ও হেনরীর উত্তর আদান-প্রদান করেন "আর্চ-বিশপ জন" নামক একজন ইংরেজ ধর্মযাজক, যিনি তাব্রিজে বাস করিতে-ছিলেন।

ইরানে আগত ইউরোপীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে বোধ হয় অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন রায় গঞ্জালেস ডি ক্ল্যাভিজো—যিনি তৈমুরের দূতের সঙ্গে সমরকন্দ প্রত্যাবর্তনের পথে ভ্রমণ করেন। এই ব্যক্তি তাহার অভিজ্ঞতাসমূহ লিপি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ১৪০৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি স্পেন হইতে বাহির হন এবং লোমহর্ষক অভিজ্ঞতাসমূহের পর তাব্রিজে পৌঁছেন। চিরাচরিত কাফেলার পথ ধরিয়া তিনি তেহরান, নিশাপুর, মাশহাদ ও অতঃপর সমরকন্দে গমন করেন, যাহা তাঁহার কাছে "সেভীলের চেয়েও বড়" বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

এই প্রতিনিধি ও তাঁহার দলবল সমরকন্দে তৈমুরের অতিথি হিসাবে বাস করেন। ব্যাবিলন, মিসর ও চীন হইতে আগত অন্যান্য প্রতিনিধি দলও তথায় ছিল। ক্ল্যাভিজো কর্তৃক পুনঃপুনঃ উল্লেখিত খাদ্য তালিকার একটি ছিল ঘোড়ার মাংস, যাহা তুর্কমানদের অতি সুস্বাদু খাদ্য ছিল।

ঘোড়ার মাংস ভক্ষণ ইসলামে নিষিদ্ধ হইলেও মধ্য এশিয়ার তুর্কীগণ আজীবনের এই অভ্যাসটি ত্যাগ করিতে সক্ষম হয় নাই। ক্ল্যাভিজো সমরকন্দের সুন্দর উদ্যানসমূহের ও শহরতলীর কথা বর্ণনা করেন, বাজারের বাণিজ্য সম্ভারের ভূয়সী প্রশংসা করেন—যাহার মধ্যে রহিয়াছে রাশিয়ার লিলেন কাপড় ও চামড়া, চীনের সিল্ক ও কস্তুরী এবং ভারতবর্ষের মসলা। ক্ল্যাভিজো যেইভাবে আসিয়াছিলেন সেইভাবেই স্পেনে ফিরিয়া যান এবং ১৪০৬ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে মার্চ তৃতীয় হেনরীর দরবারে হাজির হন, কিন্তু ততদিনে তৈমুর পরলোকগমন করেন।

আংকারার যুদ্ধের পূর্বে তৈমুর যখন সিরিয়ায় ছিলেন তিনি উত্তর আফ্রিকার প্রসিদ্ধ মুসলিম ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইতিহাসের বিষয়বস্তুর চাইতে তাঁহার ইতিহাসের ভূমিকা অনেক বেশী প্রসিদ্ধ। সুদীর্ঘ ভূমিকা, বা মুকাদ্দিমা পাশ্চাত্যের ৫০০ বৎসরের সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস বিবৃত করে। তিনি ইতিহাসে সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়সমূহ আলোচনা করেন। গবেষণায় তাঁহার ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া-বিজ্ঞান ও ব্যাখ্যা তাঁহাকে বিশ্বের সর্বোচ্চ ঐতিহাসিকদের সঙ্গে স্থান দিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর ইংরেজ ঐতিহাসিক আর্নল্ড টয়েনবী বিশ্বাস করেন যে, ইবনে খালদুনের ভূমিকা "এই পর্যন্ত সৃষ্ট যেকোন সময় বা স্থানের যেকোন চিন্তাবিদের কার্যের চাইতে শ্রেষ্ঠ।"

ইবনে খালদুন মামলুক সুলতান ফারাজের অধীনে চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন, যিনি তৈমুর কর্তৃক পরাজিত হইয়া শান্তির সন্ধানে ছিলেন। তৈমুর কৌশলী ও বিদ্বান ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ নষ্ট করিতেন না। তিনি ইবনে খালদুনের সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাৎ করেন। এই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এইসব সাক্ষাৎকার লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন, যাহাতে তৈমুরকে উত্তর আফ্রিকা সম্পর্কে মোটামুটি বিজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করা হয়। পরে তিনি ইবনে খালদুনকে মিসর ও উত্তর আফ্রিকা সম্পর্কে একটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লিখিত রিপোর্ট প্রস্তুত করিতে বলেন। ইবনে খালদুন রিপোর্ট প্রস্তুত করেন কিন্তু তিনি দিগ্বিজয়ীর নিকট তাঁহার ইতিহাসের দর্শন ব্যাখ্যা করিতে উদ্গ্রীব হইয়া পড়েন, যাহা "আসাবিয়া" মতবাদকে কেন্দ্র করিয়া গঠিত। এই মতবাদকে কেউ কেউ "জাতীয়তাবাদ" নামে

অভিহিত করেন, কেউ কেউ "দলীয় একাত্মতা" নামে আবার কেউ কেউ "সামাজিক একাত্মতা" নামে অভিহিত করেন। শাসনকারী লোকদের এই একাত্মতার জোরে সভ্যতাসমূহের উত্থান পতন হয়। কোন সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন করিতে দলীয় একাত্মতা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তবে এই সভ্যতাই আবার একাত্মতাকে দুর্বল করিবার মূলে কাজ করে যাহা সেই সভ্যতার পতনের কারণ হইয়া পড়ে।

ইবনে খালদুন সম্ভবতঃ মনে করেন যে, প্রাচীন তুর্কীদের মধ্যে যেহেতু "সামাজিক একাত্মতা" বিদ্যমান ছিল, সেহেতু ইসলামী সাম্রাজ্য পুনর্গঠন করিতে তৈমুরই ছিলেন সর্বোত্তম। কিন্তু তৈমুর ইহাতে কোন আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই, যদিও তিনি ঐতিহাসিককে তাঁহার ভাষণ দিতে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন।

ইবনে খালদুন নিশ্চয়ই খুবই নিরাশ হন যখন তিনি লক্ষ্য করেন যে, তৈমুর ঐতিহাসিকের "দলীয় একাত্মতার" নীতির চাইতে তাহার খচ্চরের প্রতিই অধিক আগ্রহী। তাঁহাদের শেষ সাক্ষাৎকারে তৈমুর ইবনে খালদুনের খচ্চরের প্রশংসা করেন বলিয়া ঐতিহাসিক অতি ক্ষিপ্রতার সঙ্গে উহা দিগ্বিজয়ীকে উপহার প্রদান করেন। ইবনে খালদুন মিসর ত্যাগ করিয়া সিরিয়া গমন করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কিন্তু এখন তাঁহাকে তৈমুরের সঙ্গে যাইতে কিছুটা আগ্রহান্বিত মনে হয়। বোধহয়, দিগ্বিজয়ীকে তাঁহার প্রিয় নীতিতে উদ্‌গ্রীব করিতে তখনও তিনি আশাবাদী ছিলেন। বস্তুতঃ ইবনে খালদুন বলেন যে কায়রো যাইতে তাঁহার কোন ইচ্ছাই নাই। এতদ্‌সত্ত্বেও তৈমুর তাঁহাকে বিদায় করেন।

আংকারার যুদ্ধের তিন বৎসর পর ১৪০৫ খ্রীস্টাব্দে তৈমুর প্রাণত্যাগ করেন। বায়েজীদের মুসলিম বিশ্ব শাসন করিবার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া খান-খান হইয়া যায় এবং মনে হয় ওসমানের বংশ অতর্কিতে শেষ হইয়া গেল। তবে, তৈমুরের পুত্রগণ এশিয়া মাইনর শাসন করিতে ব্যর্থ হন। বায়েজীদের অনেকগুলি পুত্র একে অপরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়। কিছু সংখ্যক গাজী আমীর স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং অন্যরা বায়েজীদের বিবাদমান পুত্রগণকে সমর্থন করেন। অবশেষে মুহাম্মদ যুদ্ধ জয় করিয়া সিংহাসন লাভ করেন এবং ওসমানের বংশ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন।

তৈমুরের বংশধরগণ ছিলেন তাঁহার ব্যতিক্রম। তাঁহারা নিজেদিগকে দেশ জয়ের যুদ্ধে জড়িত করেন নাই, কিন্তু তাঁহার ন্যায় তাঁহারা ছিলেন অকৃতকার্য প্রশাসক। তাঁহার পুত্র শাহ্রুখ ছিলেন খোরাসানের একজন উত্তম ও গুণী শাসক। একজন পৌত্র ইব্রাহীম শিরাজে সাহিত্যে উৎসাহ দান করেন। আরেকজন পৌত্র হাসাইন হিরাতে বিদ্যাশিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং জামী ও মীরখন্দের ন্যায় বিদ্বান ব্যক্তিদের সঙ্গে ইসলাম ও সাহিত্য আলোচনা করেন। আরেকজন পৌত্র উলুঘ বেগ যিনি সমরকন্দে শাসন কার্য পরিচালনা করিতেন, তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ, যাঁহার জ্যোতিষশাস্ত্রীয় নক্শাগুলি ১৬৫০ খ্রীস্টাব্দে লাতিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং অত্যন্ত সঠিক ও এই ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান পাশ্চাত্যের নিকট অমূল্য বলিয়া বিবেচিত হয়।

তাহা সত্ত্বেও তৈমুরের মৃত্যু দেড়শত বৎসরের জন্য সামন্ত যুদ্ধের সূচনা করে এবং ইরানের জাগরণ ব্যাহত করে। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তর ইরানে দুইটি তুর্কী দলের আবির্ভাব হয়। একটি হইল কারা কয়ুনলু (Qara Qoyunlu) বা কৃষ্ণমেষ পালক (Black sheepmen (১৩৭৮—১৪৬৯ খ্রীঃ) যাহাদের ভূখণ্ড তৈমুর কর্তৃক বিজিত হয় এবং তাহারা তাঁহার নিকট কর দিতে বাধ্য হয়। তবে বিজয়ীর মৃত্যুর পর তাহারা হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া নিজেদিগকে তাব্রিজে প্রতিষ্ঠিত করে এবং বাগদাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। আরেকটি হইল আক কুনলু (Aq Qyunlu) বা শ্বেত মেষপালক (white sheepmen) (১৩৭৪—১৫০২ খ্রীঃ) যাহাদের শ্রেষ্ঠ নেতা উজুন (লম্বা) হাসান (১৪৫৩—১৪৭৮ খ্রীঃ) একটি রাজ্য গঠন করেন। ততদিনে কনস্ট্যান্টিনোপোলের পতন হয় এবং ইউরোপ পূর্বের চেয়ে আরও অধিক তুর্কী ভয়ে ভীত হয়। তাহারা তখনও ওসমানীয়দিগকে পূর্বদিক হইতে আক্রমণ করিতে পারে এমন একটি বন্ধুরাষ্ট্রের খোঁজ করিতে থাকে। তৈমুরের সাহায্য লইয়া ইউরোপীয়গণ যাহা করিতে চাহিয়াছিল তাহাই তাহারা উজুন হাসানের সাহায্যে লাভ করিতে চেষ্টা করে। এই ব্যাপারে ভেনিস আগাইয়া আসে এবং উজুন হাসানের নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন ক্যাটারিনো জেনো যাহার শাশুড়ী ছিলেন উজুন হাসানের স্ত্রী থিওডোরার বোন।

উজুন হাসান জেনোকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন এবং ১৪৭৮ খ্রীস্টাব্দে ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে শত্রুতা আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হয় নাই। দ্রুত যোগাযোগের অভাবে এবং অস্থির অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক হইতে ওসমানীয়দের উপর কোন সংঘবদ্ধ চাপ সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নাই। এই প্রতিনিধি দল প্রেরণের একমাত্র লাভ হইল এই যে বহুসংখ্যক পারস্য ধাতু কারিগর ভেনিসে বসতি স্থাপন করে এবং তাহাদের শিল্পের নিদর্শন তৈয়ার করে। পরে নুরেমবার্গ অ্যাস্‌বার্গের ন্যায় কেন্দ্রসমূহে এই নমুনাগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং সমগ্র ইউরোপের স্বর্ণ ও রৌপ্যকারগণ এইগুলি নকল করে।

চতুর্দশ অধ্যায়

ওসমানীয় সাম্রাজ্য

মুহাম্মদ ১ম (১৪১২—১৪২১)	সেলিম ১ম (১৫১২—১৫২০)
মুরাদ ২য় (১৪২১—১৪৫১)	সোলাইমান (১৫২০—১৫৬৬)
মুহাম্মদ ২য় (১৪৫১—১৪৮১)	সেলিম ২য় (১৫৬৬—১৫৭৪)
বায়েজীদ ২য় (১৪৮১—১৫১২)	মুরাদ ৩য় (১৫৭৪—১৫৯৫)
	আহমদ ১ম (১৫৯৫—১৬০৩)

বায়েজীদের[১] বন্দী হওয়া মৃত্যুবরণ, তাঁহার পুত্রদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের সূচনা করে এবং এশিয়া মাইনরে ওসমানীয় আধিপত্যের অবসানের আশঙ্কা প্রতীয়মান হয়। দশ বৎসর পর্যন্ত বায়েজীদের চারি পুত্রের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে। পুত্রগণ হইলেন মুসা, ঈসা, মুহাম্মদ ও সোলাইমান। এশিয়া মাইনরের গাজী আমীরগণ কোন এক পক্ষ অবলম্বন করে অথবা তাহাদের স্বাধীন পথে চলিতে থাকে। সংঘর্ষের প্রথম দিকে ঈসাকে সরাইয়া ফেলা হয়। কিছুকালের জন্য মনে হইল সোলাইমানই জয়ী হইতেছেন, কারণ রাজধানী ইদীর্নের সভাসদবৃন্দ, তাঁহাকে সমর্থন করেন। তবে মুসা ও মুহাম্মদ তাঁহার নেতৃত্ব মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন। তাঁহারা একত্রিত হইয়া সোলাইমানকে হত্যা করেন। জীবিত দুই ভ্রাতা অতঃপর একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ইহা ছিল একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ। শেষ পর্যন্ত ওসমানীয় শক্তির মৌলিক ভিত্তিসমূহের প্রতি যিনি সমধিক আস্থাশীল ছিলেন তিনিই জয়ী হন। মুসা ছিলেন বিপ্লবাত্মক আদর্শে বিশ্বাসী। তিনি বাহর আল-দীন সিমাওনার প্রভাবে আসেন এবং তাঁহাকে ইউরোপে প্রধান কাজী নিযুক্ত করেন। সিমাওনা ম্যানিকায়ান সমন্বয়বাদের প্রভাবে

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১৪২ (মূল গ্রন্থ)।

আসেন এবং ইহুদী, খ্রীস্টান ও ইসলাম ধর্মের সমন্বয়ে একটি একক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পান। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে মুসা জনসাধারণের জন্ত কল্যাণকর মতাদর্শ পোষণ করিতেন। সম্ভবতঃ বায়েজীদ স্বয়ং তাঁহার সাম্রাজ্যের ধর্মগুলি ও জাতীয়তাসমূহ একত্রিত করিবার চিন্তা করিয়াছিলেন এবং এই সমন্বয়ের প্রতীক হিসাবে তাঁহার পুত্রদের নামকরণ করেন : মুসা (মোজেজ—ইহুদীধর্ম), ঈশা (জেসাস—খ্রীস্টান ধর্ম), মুহাম্মদ (ইসলাম), কাসিমীর (বলকান), ইয়তোঘরিল (তুর্কী)। এই ধরনের ভাব অধিকাংশ তুর্কীর জন্ত ছিল অত্যন্ত দুর্বোধ্য। তদুপরি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণী, যাহারা জায়গীর ও সম্পদের অধিকারী ছিলেন, তাঁহারা জনসাধারণের জন্ত মুসার কল্পিত ত্যাগ স্বীকার করার পক্ষপাতি ছিলেন না।

অপরদিকে মুহাম্মদের সবকিছুই ছিল তুর্কীদের পছন্দসই। তিনি গাজী ঐতিহ্য ও যুদ্ধের গুণাবলী পুনর্জীবিত করেন, যেগুলি মূলতঃ ওসমানীয়দের শক্তির উৎস ছিল। শক্তিশালী গাজী ও সামন্ত প্রভুদের সাহায্যে মুহাম্মদ ১৪১৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতাকে পরাজিত করেন এবং ইদীর্ণে ওসমানীয়দের সুলতান হিসাবে অভিষিক্ত হন। তৈমুরের আগমন ওসমানীয়দের অগ্রগতিতে একটি বিরক্তিকর বিরতি বলিয়াই প্রমাণিত হয়। তৈমুর ওসমানীয় সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করেন নাই। মুহাম্মদ ক্ষমতায় আসিতেই ইহাকে ব্যবহার করেন। ওসমানীয় সুলতানাত একটি সামরিক রাষ্ট্র হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল এবং মুহাম্মদ সেই ঐতিহ্যকে শক্তিশালী করেন।

ওসমানীয় সেনাবাহিনী

সিংহাসন লাভ করিয়াই মুহাম্মদের কাজ সম্পূর্ণ হইল না। এশিয়া মাইনরের তুর্কীগণ কোন কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনতা স্বীকার করিতে রাজী ছিল না। গাজী আমীরগণ প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ তাহাদের নিজেদের স্বাধীন কর্মধারা বজায় রাখিতে উদ্‌গ্রীব ছিল। আর অন্তদিকে মুসলিম ভাইদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে ঘৃণা করিত। ওরহান কর্তৃক গঠিত জান-নিসারী বাহিনী এবং পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত সেনাবাহিনী যদি না থাকিত তবে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাই সম্ভবপর হইত না।

ওসমানীয় সেনাবাহিনীর অন্তঃস্থলে ছিল জান-নিসারী বাহিনী (তুর্কী, "ইয়ুনী সেরী" নতুন সেনাবাহিনী)। ইহা অতি গুরুত্বপূর্ণ যোদ্ধাশক্তিতে পরিণত হয় এবং সাম্রাজ্যের শত্রুদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। ইতি-মধ্যেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, গাজীগণ ঐসব নবাগত যাহারা তাহাদিগকে সমর্থন করিয়াছে এবং ইসলাম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদেরকে নিজ দলভুক্ত করিয়া লইয়াছে। যুদ্ধবন্দীদিগকে তাহারা ক্রীতদাস হিসাবে গ্রহণ করে এবং তাহাদিগকে ইসলাম ধর্ম এবং সামরিক বৃত্তি গ্রহণ করিতে বাধ্য করে। ওরহান এই নিয়মের প্রসার বৃদ্ধি করেন এবং পরে ধর্মীয় নেতাদের অনুমতিক্রমে রাজত্বের খ্রীস্টান জনগণকে তাহাদের পুত্রদের এক শতাংশ কর হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য করেন। ইহাদিগকে শৈশব হইতেই তাহাদের খ্রীস্টান পিতামাতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক করা হইত এবং মুসলমান হিসাবে লালন-পালন করা হইত। তাহাদিগকে বিবাহ করিতে দেওয়া হইত না এবং তাহারা শুধুমাত্র সুলতানের প্রতি অনুগত থাকিত। ইহাদের মধ্য হইতে সুযোগ্যদেরকে রাজদরবারের বালকভৃত্য হিসাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হইত এবং প্রশাসনিক উচ্চশিক্ষা দেওয়া হইত। বাকীগুলিকে জান-নিসারী বাহিনীতে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হইত। এই বাহিনীকেই ইউরোপের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সুশিক্ষিত নিয়মিত সেনাবাহিনী বলা যায়। সুলতানের ক্রীতদাস হিসাবে ইহার তাঁহার নিজস্ব হুকুমবরদার ছিল এবং ধর্মীয় নেতাদের কোন উল্লেখ ছাড়াই তিনি যেভাবে ইচ্ছা ইহা-দিগকে কাজে লাগাইতে পারিতেন।

স্বয়ং সুলতানের ন্যায় ইহাদের সবাইকে বক্‌তাশী দরবেশ তরিকায় দীক্ষিত করা হইত। তাহাদের উর্দীও ছিল বক্‌তাশীদের ন্যায়। তাহাদের শিরস্ত্রাণ ছিল সাদা পশু-লোমশ বস্ত্রের, যাহার উপর হইতে একখণ্ড সাদা কাপড় কাঁধের উপর ঝুলানো থাকিত। এই কাপড়খণ্ডের উপর একটি চামচ আঁকা থাকিত ; যদ্বারা বুঝানো হইত যে তাহাদের জীবিকা সুলতান হইতে আসে। প্রত্যেকে নিজ নিজ খাদ্যবহন করিবার থলিকে খুবই মূল্যবান মনে করিত, এবং শত্রুর নিকট ইহা হারানোকে খুবই অপমানজনক মনে করা হইত। তাহাদের অধিনায়ককে বলা হইত 'আগা'।

জান-নিসারী সর্বদাই ছিল পদাতিক বাহিনী এবং ইহাদের সহায়তার

থাকিত আযাব নামে একটি অনিয়মিত পদাতিক বাহিনী। ঘোড়-সওয়ার বাহিনী তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল সিপাহী, যাহাদিগকে সামন্ত প্রভুগণ সরবরাহ করিত। সামন্ত প্রভুগণকে কোন যোগ্য কাজের জন্য অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের জন্য জমি প্রদান করা হইত। দ্বিতীয়ভাগে ছিল আকিঞ্জী নামক রিজার্ভ ঘোড়-সওয়ার বাহিনী, যাহাদিগকে যুদ্ধের সময় তলব করা হইত এবং ইহাদের কর্তব্য ছিল অগ্রে গমন করা' এবং শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করা'। প্রত্যেক ঘোড়-সওয়ারকে দুইটি ঘোড়া' প্রদান করা হইত। তৃতীয় ভাগে ছিল রাজকীয় ঘোড়-সওয়ার বাহিনী যাহা সর্বদা সুলতানকে ঘিরিয়া থাকিত। সাধারণতঃ পদাতিক, ঘোড়-সওয়ার ও গোলন্দাজ বাহিনীতে ১২ জন অধিনায়ক থাকিত যাহারা 'বীরুন আঘালেরী' (বহির্পার্শ্বের অধিনায়ক) নামে একটি পরিষদ গঠন করিত। অপরদিকে যেসব অফিসারগণ দরবার রক্ষা করিত তাহাদিগকে বলা হইত 'আন্দেরুণ আঘালেরী' (অন্দর অধিনায়ক)। সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির সাথে সাথে দুইজন প্রধান সেনাপতি (বেলারবে) নিযুক্ত করা হয়, একজন ইউরোপের জন্য এবং আরেকজন এশিয়ার জন্য। পদাতিক বাহিনীর অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল তীর-ধনুক, ছোরা, রাইফেল এবং মুখোমুখি যুদ্ধের জন্য একটি ছোট তরবারি। ঘোড়-সওয়ার বাহিনী বর্শা ও লাঠি বহন করিত।

এই শক্তিশালী যুদ্ধযন্ত্রের সাহায্যে মুহাম্মদ এশিয়া মাইনরের স্বাধীন তুর্কী নেতাদিগকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্যকে পুনরায় একত্রীভূত করেন। ১৪২১ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু তাহার উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় মুরাদ ইদার্ণে আসিয়া ক্ষমতা হাতে না নেওয়া পর্যন্ত তাঁহার মৃত্যু সংবাদ গোপন রাখা হয়। মুরাদ কনস্ট্যান্টিনোপল অবরোধ করেন। কিন্তু এশিয়া মাইনরে বিদ্রোহের দরুণ তাঁহার পরিকল্পনা প্রত্যাহার করেন। তাঁহার পূর্ববর্তীদের সঙ্গে তুলনায় এবং তাঁহার পুত্রের ব্যতিক্রমে, দ্বিতীয় মুরাদ ছিলেন একজন শান্তিপ্রিয় সুলতান। তাঁহার পুত্রের পক্ষে তিনি দুইবার পদত্যাগ করেন কিন্তু জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহাকে ক্ষমতায় ফিরিয়া আসিতে হয়। তুর্কী ভাষার উৎকর্ষ ও তাঁহার পুত্রদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য তিনি যথেষ্ট সময় ব্যয় করেন।

তুর্কী ভাষা 'আলতাইক' ভাষাগোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম বিশ্বে যোগ-

দানের সময় তুর্কীরা নিজেদের সঙ্গে কোন লিখিত গ্রন্থ আনয়ন করেন নাই। তাহারা তুর্কী ভাষায় কথা বলিত কিন্তু যোগাযোগের ভাষা ছিল ফার্সী এবং প্রায় সমস্ত তুর্কী রাজ্যের শাসকগণ ছিলেন দ্বি-ভাষী। সেলজুকগণ এশিয়া মাইনরে আসিবার সময় নিজেদের সঙ্গে একটি তুর্কী ব্যাকরণ আনয়ন করে, যাহা ১০৭৪ খ্রীস্টাব্দে জনৈক মুহাম্মদ কাশ্‌কাই প্রণয়ন করেন। তবে সেলজুকগণও ফার্সী ভাষায় তাহাদের দলিলপত্র লিপিবদ্ধ করে এবং এই ভাষাকে সাংস্কৃতিক ভাষা বলিয়া মনে করে। মোঙ্গলগণ কর্তৃক ইরান ধ্বংস হইবার পর এশিয়া মাইনরের ওঘুজ তুর্কীগণ অন্যান্যদের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে এবং ক্রমশঃ তাহারা তাহাদের নিজস্ব একটি লিখিত ভাষার প্রবর্তন করে। ইহাতে আরবী ও ফার্সী হইতে ধার করা অনেক শব্দ রহিয়াছে। পারস্যের সুফী কবি রুমী, যিনি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কোনিয়ায় তাহার আবাস নির্মাণ করেন—সম্পূর্ণ ফার্সী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু তাহার পুত্র, সুলতান ভেলেদ একজন কবি, তুর্কী ও ফার্সী উভয় ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন।

মুরাদ তাঁহার ওসমানীয় পূর্ব পুরুষদের ইতিহাস তুর্কী ভাষায় লিখিতে উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি স্বয়ং একজন কবি ছিলেন এবং তুর্কী ও ফার্সী উভয় ভাষায় কবিতা লিখিতেন। সমগ্র পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে আরবী ছিল ধর্মীয় ভাষা, ফার্সী ছিল কবিতার ভাষা। অধিকন্তু ইহা যোগাযোগের ভাষাও ছিল। তুর্কী ছিল জনগণের সাধারণ ভাষা ও সামরিক আদেশের ভাষা।

মুহাম্মদ ৩০ বৎসর রাজত্ব করেন এবং প্রায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধে লিপ্ত থাকেন। তিনি একটি প্রসিদ্ধ বিজয় ও দুইটি পরাজয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তবে, তিনি তাঁহার একটি প্রসিদ্ধ বিজয়ের জন্য সুপরিচিত। কনস্ট্যান্টিনোপল অধিকার করিবার জন্য তাঁহাকে ফাতিহ্ (বিজয়ী) উপাধি দেওয়া হয়। সুলতান হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই নগরী অধিকার করিবার প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। অবরোধ আরম্ভ হয় ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দের ৬ই এপ্রিল এবং ইহা ৫৩ দিন স্থায়ী হয়। নগরের দেওয়ালে বিরাট বিরাট পাথরের গোলা নিক্ষেপ করা হয়। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। সোনালী শৃঙ্গের (Golden Horn) প্রবেশদ্বার রুদ্ধ ছিল,

ফলে তুর্কীগণ ইহাতে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয় নাই। ৯০৮ খ্রীস্টাব্দে কিয়েভের ভ্যারানজিয়ানগণ কর্তৃক অনুসৃত পন্থা অবলম্বন করিয়া মুহাম্মদ ৭০টি জাহাজকে চর্বিযুক্ত সড়কে পাহাড়ের উপর টানিয়া তুলিতে আদেশ দেন এবং বেড়ীর পশ্চাৎভাগে শৃংগের (Horn) উপর ছাড়িয়া দেন। এই ধরনের ঘটনা নগরের অধিবাসীবৃন্দ আশা করে নাই। ১৪৫৩ খ্রীস্টাব্দে ২৯শে মে তুর্কী বাহিনী দেওয়ালের একটি স্থান ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। সম্রাট প্যালিওলোগস, যিনি পোপের সাহায্য পাইলে ক্যাথলিক হইয়া যাইতে সম্মত হইয়া নাগরিকদের বিরাগ ভাজন হন, তিনি নিহত হন এবং ঐদিন অপরাহ্ণে মুহাম্মদ নগরে প্রবেশ করেন। নগরে প্রবেশ করিয়া তিনি সরাসরি হ্যাজিয়া সফিয়া নামক বিরাট গীর্জায় গমন করেন এবং ইহাকে মসজিদে রূপান্তরিত করিতে আদেশ প্রদান করেন।

মুহাম্মদ নিশ্চয়ই কনস্ট্যাণ্টিনোপলে তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কারণ চিরাচরিত ধ্বংস সাধন তিনি বেশীদিন স্থায়ী হইতে দেন নাই। কথিত আছে যে, তিনি একটি সৈন্যকে হ্যাজিয়া সফিয়' হইতে একটি মোজাইক পাথর সরাইয়া ফেলিতে দেখেন এবং তাহাকে এই বলিয়া হত্যা করেন যে, "আমি বন্দী ও অস্থাবর সম্পত্তিগুলি আমার অনুসারীদিগকে দিয়াছি, কিন্তু ইমারতগুলি আমার।" অধিকাংশ গীর্জাগুলিকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। তিনি নগরে তুর্কী ও খ্রীস্টানদিগকে বসতি স্থাপন করিতে দেন। অর্থোডক্স চার্চের ধর্মযাজকের মৃত্যু হইলে তিনি একটি নতুন ধর্মযাজক নির্বাচন করিতে আদেশ দান করেন এবং বাইজেণ্টাইন সম্রাটদের রীতি অনুসারে তিনি তাহাকে একটি সোনার 'ক্রুশ' দান করেন। পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, বাগদাদের পতনের ন্যায় কনস্ট্যাণ্টিনোপলের পতন ছিল একটি চরম আঘাত। তুর্কীগণ অনুভব করে যে, ইহা তাহাদিগকে দখল করিতে হইবে। তবে ইহা কেবল এই জন্য নহে যে, ইহা তাহাদের বাণিজ্যিক, সামরিক অথবা রাজনৈতিক স্বার্থের দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল। পর্বতে আরোহণ করিবার সুপরিজ্ঞাত কারণের ন্যায়, ওসমানীয়দিগকে এই নগরী অধিকার করিতে হইয়াছিল কারণ ইহা সেখানে অবস্থিত ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের অভাবে এই নগরী এমন জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল যে, সুলতান ইহাকে পুনর্বার বসতিপূর্ণ করিতে বাধ্য হন।

ইহার পতনে প্রাচ্যে খ্রীস্টান শক্তির একটি প্রতীক ব্যতীত কার্যতঃ ইউরোপ আর কিছুই হারায় নাই। পক্ষান্তরে তুর্কীগণ একটি সুন্দর ও প্রসিদ্ধ রাজধানী লাভ করে। রাশিয়ার মস্কোর নৃপতিগণ কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের ফলে সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা অধিক লাভবান হন। তৃতীয় আইভান (১৪৬২—১৫০৫ খ্রীঃ) শেষ বাইজেন্টাইন সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্রী সফিকে বিবাহ করেন। সম্রাট ছিলেন পোপের প্রহরী। ফলে আইভান বাইজেন্টাইন সম্রাটদের শিখা তাঁহার বর্মে স্থাপন করেন। তাঁহার পৌত্র আইভান দি টাব্রিব্‌ল্ (১৫৩৩—১৫৮৪ খ্রীঃ) বাইজেন্টাইন সম্রাটদের উত্তরাধিকারী হিসাবে জার উপাধি গ্রহণ করেন। রাশিয়ান অরথোডক্স চার্চের ভাষায় মস্কো তৃতীয় রোমে পরিণত হয় যাহা কখনও ধ্বংস হইবার নহে।

মুহাম্মদ ইউরোপে তাঁহার বিজয়াভিযান অব্যাহত রাখেন; বসনিয়া, হার্জেগোভিনা ও ওয়ালাচিয়া অধিকার করেন এবং ক্রিমিয়ার তাতার খানকে পরাজিত করেন। এশিয়া মাইনরে তিনি তাঁহার চিরস্থায়ী শত্রু কারামানের খানদিগকে ধ্বংস করেন এবং শ্বেত মেষচালকদের (white sheepmen) আশা-আকাঙ্খা নির্মূল করিয়া দেন।[১] কৃষ্ণ সাগর একটি তুর্কী হ্রদে পরিণত হয়। তিনি একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করেন এবং ১৪৭০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য অর্জন করেন। ভেনিসকে শান্তিচুক্তি করিতে বাধ্য করা হয়। বেলগ্রেড অথবা রুড্‌স্ অধিকার করিবার ব্যর্থতার মধ্যে তাঁহার দুইটি দুর্ভাগ্য নিহিত। ১৪৮১ খ্রীস্টাব্দে তিনি পরলোকগমন করেন।

অতঃপর পরিচিত ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং সুলতানের মৃত্যুর পর যে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হয় উহাতে জনসাধারণ দ্বিতীয় বায়েজীদকে সমর্থন করে। তিনি সুলতান হন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ও ভ্রাতা জেম, পোপ অষ্টম ইনোসেন্ট ও ফ্রান্সের রাজা সপ্তম চার্লসের সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু সিংহাসন লাভে ব্যর্থ হন এবং ১৪৯৫ খ্রীস্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। ওসমানীয় মাপকাঠিতে বায়েজীদ কোন যোদ্ধাব্যক্তি ছিলেন না, যদিও জেম যতদিন ইউরোপের দরবারগুলিতে সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিলেন ততদিন বায়েজীদের কার্যাবলী বিঘ্নিত হইতেছিল। তবে জেমের মৃত্যুর

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১৪৪ (বর্ল গ্রন্থ)।

পর ওসমানীয়গণ নাভারিনায় একটি বিরাট নৌযুদ্ধে ভেনিসীয়দিগকে পরাজিত করে এবং ভূমধ্যসাগরে তাহাদের আধিপত্যের আশা নির্মূল করিয়া দেয়। মিসরের মামলুকগণ এবং ইরানের[১] সাফাভীয় বংশের প্রতিষ্ঠাতা উদীয়মান ইসমাইলের সঙ্গে আরও ভয়াবহভাবে বায়েজীদ সীমান্ত সংঘর্ষে লিপ্ত হন। তবে উভয় সমস্যাই বায়েজীদের উত্তরাধিকারীর হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

রুগ্ন বায়েজীদ তাঁহার তিন পুত্রের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহারা তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহার সঙ্গে এবং একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। জান-নিসারীগণ সিংহাসনের সত্যিকারের শক্তিতে পরিণত হয় এবং পুত্রদের মধ্যে যোদ্ধা সেলিমের পক্ষাবলম্বন করে। সেলিম ১৫১২ খ্রীস্টাব্দে সুলতান হন। যোদ্ধা হিসাবে তাঁহার ডাকনাম ছিল ইয়াভূজ (অনমনীয়) এবং তাঁহার আট বৎসরের সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালে তিনি অন্য যে কোন সুলতানের চেয়ে অধিক ভূখণ্ড অধিকার করেন। বিদ্বান ব্যক্তিদের সাহচর্যে তিনি সুখী হইতেন। তিনি স্বয়ং তিনটি ভাষায় কবিতা লিখেন। তিনি তাঁহার অধীনস্থ লোকদের নিকট ভীতিপ্রদ ছিলেন এবং অনেক উজীর'ক তিনি বরখাস্ত করেন। ফলে "আপনি সুলতান সেলিমের উজীর হন"—এই উক্তিটিকে কোন প্রশংসাসূচক উক্তি বলিয়া বিবেচনা করা হইত না।

ইরানের শাহ ইসমাইলের কার্যকলাপ, এশিয়া মাইনরের অনেক শীয়াকে ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে ব্যবহার এবং মামলুকদের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপন সেলিমকে তাঁহার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য করে। ১৫১৪ খ্রীস্টাব্দে আগস্ট মাসে তিনি ইসমাইলকে পরাজিত করেন কিন্তু ইহার ফলাফল চূড়ান্তরূপ লাভ করে নাই। যাহা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং ওসমানীয়দিগকে ভূখণ্ড ও মর্যাদা দান করে, তাহা হইল দুই বৎসর পর মারজে দাবিক-এ মিসরের মামলুকদের উপর তাঁহার জয় লাভ।

পূর্বাঞ্চলে সেলিমের যুদ্ধের জন্য রাজ্য জয়ে মনস্থির করা ছাড়াও অন্যান্য কারণ ছিল। মামলুক সুলতান কানসাওয়াহ আল-ঘুরী শাহ ইসমাইলের সঙ্গে আঁতাত স্থাপন করেন। অতএব ঘুরীর সেলিমের সঙ্গে যুদ্ধ করা

১। নীচে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১৬৩ (মূল গ্রন্থ)।

ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ১৫১৬ খ্রীস্টাব্দে ২৪শে আগস্ট আলেপ্পোর উত্তরে মারজেদাবিক নামক স্থানে একটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মামলুকগণ পরাজিত হন এবং সমগ্র সিরিয়া ওসমানীয়দের করতলগত হয়। আলেপ্পো, দামেস্ক, বৈরুত ও জেরুজালেমের ন্যায় শহরগুলিতে তুর্কীগণ মামলুকদের অত্যাচারের হাত হইতে মুক্তিদাতা হিসাবে প্রবেশ করে। দক্ষিণ দিকে সেলিম তাঁহার বিজয়াভিযান অব্যাহত রাখেন এবং ১৫১৭ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারীতে নতুন মামলুক সুলতান তুমানের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং কায়রোর বাহিরে তাঁহাকে পরাজিত করেন। সমগ্র মিসর এবং আরবের পবিত্র নগরগুলি অতঃপর তাঁহার করতলগত হয়। ওসমানীয়-গণ তাহাদের নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপখাইবার ন্যায় বিরাট সাম্রাজ্যসহ বাইজেন্টাইন সম্রাট ও আব্বাসীয় খলিফাদের উত্তরাধিকারী হয়। সেলিম, শেষ ক্রীড়নক খলিফা মুতাওয়াক্কিলকে তাঁহার সঙ্গে কনস্ট্যান্টিনোপল লইয়া যান এবং পরে তাঁহাকে কায়রোতে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দান করেন। সেখানে তিনি পরলোকগমন করেন। শেষ খলিফার "ক্ষমতা" ওসমানীয় সুলতানদের হাতে ন্যস্ত করিবার বিষয়টি সত্য হইলেও তাঁহারা এই উপাধি গ্রহণ করিতে তেমন তাড়াহুড়া করেন নাই। তাঁহাদের অধীনস্থ লোকজন ওসমানীয় সুলতানদিগকে খলিফা হিসাবে অভিহিত করেন এবং সুলতানগণও ইহাতে কোন আপত্তি করেন নাই। ক্রমশঃ প্রত্যেকে ইহাকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করে। যতদূর জানা যায়, ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দে তুর্কী ও রুশদের মধ্যে স্বাক্ষরিত কুচুক কাইনারজীর সন্ধিতে সর্বপ্রথম প্রশাসনিকভাবে এই উপাধির উল্লেখ করা হয়।

সেলিমের একমাত্র পুত্র সোলাইমান ১৫২০ খ্রীস্টাব্দে সুলতান হন এবং ৪৬ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার সময় ওসমানীয় সাম্রাজ্য ইহার ক্ষমতা ও গৌরবের উচ্চশিখরে আরোহণ করে এবং ইউরোপীয়গণ তাঁহাকে "ঐশ্বর্য-শালী' নামে সম্বোধন করে। ওসমানীয় ইতিহাসে তিনি কানুনী (আইন-দাতা) হিসাবে পরিচিত। সোলাইমান তাঁহার প্রপিতামহ বিজয়ী মুহাম্মদের কর্মসূচী বাস্তবায়িত করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এবং বেলগ্রেড ও রড্‌স্ অধিকার করিতে মনস্থ করেন। ইউরোপ তখন মুহাম্মদের সময় হইতে অধিক শক্তিশালী, কিন্তু সোলাইমানের সমসাময়িক পঞ্চম চার্লস, প্রথম

ফ্রান্সিস ও অষ্টম হেনরী একে অপরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত এবং সংস্কার আন্দোলন লইয়া এত ব্যস্ত যে সোলাইমানের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার মত কোন সময় তাঁহাদের নাই। ১৫২১ খ্রীস্টাব্দের ৮ই আগস্ট বেলগ্রেডের পতন হয়। পরবর্তী বৎসর সোলাইমান সুদৃঢ় দ্বীপ রড্‌স আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধ উভয় পক্ষের জন্য ছিল রক্তক্ষয়ী। সোলাইমান অঙ্গীকার করেন যে আত্ম-সমর্পনের পর নাইটগণের মধ্যে যাঁহারা দেশত্যাগ করিতে চান তাঁহাদিগকে তাঁহাদের অস্থাবর সম্পত্তিসহ নিরাপদে যাইতে দেওয়া হইবে, আর যাঁহারা স্বদেশে থাকিবেন তাঁহারা ধর্মীয় স্বাধীনতা লাভ করিবেন এবং পাঁচ বৎসরের জন্য কর প্রদানে অব্যাহতি পাইবেন। একমাত্র ইহার পরই সেই দ্বীপ আত্মসমর্পণ করে। সোলাইমান উভয় অঙ্গীকারই রক্ষা করেন।

চারি বৎসর পর সোলাইমান ১০০,০০০ সৈন্য লইয়া ভিয়েনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। কর্মহীনতার ফলে জান-নিসারীগণ অস্থির হইয়া পড়িয়াছিল। ১৫২৬ খ্রীস্টাব্দে ৩১শে আগস্ট হাঙ্গেরীর মোহাক্‌স্‌ নামক স্থানে সুলতান একটি প্রধান যুদ্ধে জয় লাভ করার ফলে তিনি দানিয়ুব নদীর উভয় তীরে অবস্থিত বুদা ও পেষ্ট অধিকার করিতে সক্ষম হন। তবে ভিয়েনা অধিকার করিবার মত যথেষ্ট সৈন্য তাঁহার নিকট ছিল না, তাই তিনি ইস্তাম্বুলে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন।[১] ১৫২৯ খ্রীস্টাব্দে সোলাইমান পুনরায় চেষ্টা করেন, কিন্তু বৃষ্টির দরুণ তাঁহার যাত্রা ব্যাহত হয় এবং সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে তিনি ভিয়েনা পৌঁছেন। ১২ই অক্টোবর ওসমানীয়গণ ভিয়েনার প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলে এবং একটি প্রবল আক্রমণ পরিচালনা করে। কিন্তু সেই আক্রমণ প্রতিহত করা হয়। সমাগত শীতকালের দরুণ জান-নিসারীগণ যুদ্ধ অব্যাহত রাখিতে অনাগ্রহী হইয়া পড়ে। যুদ্ধক্ষেত্রে একটি পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ওসমানীয়গণ ১৫ই অক্টোবর ফিরিয়া যায়। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে কার্ডিন্যাণ্ড যেহেতু ভিয়েনায় ছিলেন না তাই সুলতান এই নগরী অধিকার করিবার সমস্ত আগ্রহ হারাইয়া ফেলেন। ইহাই ছিল ইউরোপে ওসমানীয়দের সর্বশেষ অগ্রগতি। ইউরোপীয়গণ যে একটি ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইয়াছে তাহা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল

১। ওসমানীয়গণ কর্তৃক কনস্টান্টিনোপল অধিকারের কিছুদিন পরেই তাঁহারা ইহার নাম পরিবর্তন করেন। কখনো কখনো ইহাকে ইস্তাম্বুল নামেও উল্লেখ করা হয়।

ছিলা সন্দেহ, কারণ তাহারা তখনও নিজেদের মধ্যে বিবাদে লিপ্ত ছিল। লুথার "তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে" এই শিরোনামে একখানা নৈরাশ্য-জনক প্রচারপত্র রচনা করেন। কিন্তু বাহ্যত: তিনি মনে করেন যে রোম তুর্কীদের চাইতে অধিক ভয়াবহ। প্রায় একই দৃষ্টিভঙ্গিতে সেলিমের সম-কালীন ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রধান ধর্মীয় নেতা একটি বক্তব্য জারী করেন যে, "সত্তরজন খ্রীস্টান হত্যা করিবার চেয়ে একজন বিপথগামী পারস্যবাসীকে (শীয়া) হত্যা করা অধিক পুণ্যের কাজ।"

ওসমানীয় ইতিহাসে সোলাইমানের শাসন ছিল সবচাইতে গৌরবপূর্ণ। ইহার স্থিতিশীলতা ইহাকে স্থায়ীত্ব ও ঔজ্জ্বল্যের বৈশিষ্ট্য দান করে। ইস্তাম্বুলে রাজকীয় প্রাসাদের প্রবেশদ্বারকে বলা হইত আলীকাপু বা মহান দরবার[১] এবং কক্ষগুলি সর্বদা দপ্তর প্রধান, গার্ড, সিপাহী ও জান-নিসারীগণ দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিত। সোলাইমানের আয় তাঁহার সম-কালীন ইউরোপীয়দের চাইতে অনেক বেশী হইলেও তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থের অধিকারী বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার আয়ের উৎস ছিল ধর্মীয় আইনের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত। এইগুলি হইল মুসলমানদের নিকট হইতে যাকাত, অমুসলমানদের নিকট হইতে জিজিয়া এবং বিজিত রাজ্যের খাজনা। এই সব কর আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক, খনি ও বাজার হইতে সংগ্রহকৃত কর এবং জরিমানা ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের অর্থ দ্বারা বর্ধিত হয়। তাঁহার বার্ষিক আয় দশ হইতে বার মিলিয়ান দুকাত (প্রায় ১০,০০০,০০০ ডলার) বলিয়া ভেনিসীয় পর্যটকগণ অনুমান করেন।

ওসমানীয় সুলতানগণ বিরাট হেরেম (অন্তঃপুর) পোষণ করিতেন। হেরেমের প্রায় সবাই খ্রীস্টান ক্রীতদাসী। এইগুলিকে খোজারা পাহারা দিত। খোজাগণের কর্তাকে বলা হয় "কিজলার আগাচী" (মহিলা সংস্থার কর্তা)। সোলাইমানের হেরেমে প্রায় ৩০০ মহিলা ছিল। রীতি অনুযায়ী বালিকাগুলি প্রত্যেক দিন সারি বাধিয়া দাঁড়াইত এবং সুলতান তাহাদিগকে পরিদর্শন করিয়া যাহাকে ইচ্ছা তাঁহার রুমাল প্রদান করিতেন। ২৫ বৎসর বয়সে যে মেয়েগুলি সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে

১। ওসমানীয় সরকারকে পোর্ট বা সাবলাইম পোর্ট (দরবার বা মহান দরবার) বলা ইউরোপীয়দের একটি রীতিতে পরিণত হয়।

ব্যর্থ হইত সেগুলিকে সাধারণতঃ মহান দরবারের সিপাহীদের নিকট বিবাহ দেওয়া হইত।

ইউরোপীয় পর্যটকদের লিখিত পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী দেখা যায়, বাণিজ্য পথগুলি উত্তমরূপে সংস্কার করিয়া রাখা হয় এবং রাস্তার ধারে সরাই-খানা থাকে। বড় বড় শহরগুলিতে পুরুষ ও স্ত্রী লোকদের জন্য পৃথক সাধারণ স্নানাগার থাকে এবং মাত্র চারি শার (প্রায় এক সেণ্ট) খরচ করিলে যেকোন তুর্কী স্নানাগারে এক ঘণ্টা কাটাইতে পারিত। তখনকার দিনে বর্তমানের ন্যায় সাধারণ লোকদের খাদ্য ছিল কাল রুটি, ভাত, ফল এবং কোন কোন সময় মাংস। ইসলামী আইনে নিষিদ্ধ বলিয়া কোন গৃহে তেমন মদ্যপান ছিল না, কিন্তু অনেক পানশালা ছিল যেগুলি খুব সম্ভবতঃ অমুসলিমগণ পরিচালনা করিত, যেখানে "তুর্কীগণ প্রবেশ করিয়া সারাদিন মদ পান করে"। ওসমানীয়দের মধ্যে তাস খেলা অপরিচিত ছিল বলিয়া জানা যায়, কিন্তু ইহা অত্যন্ত সন্দেহজনক, কারণ একই সময়ে ইরানে এই খেলা খুবই সুপরিচিত ছিল। ইউরোপীয় পর্যটকগণ নগর পাহারার কাজে খুবই মুগ্ধ হয় এবং কেউ কেউ বলেন যে ইউরোপের যে কোন রাজধানীর চেয়ে ইস্তাম্বুল নিরাপদ।

সোলাইমানের রাজত্বকাল হইতে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়। তিনি যদিও ক্ষমতাশীল ছিলেন কিন্তু তিনি তাঁহার পরিষদদের লোভ বা তাঁহার নিজস্ব দপ্তর প্রধানদের উচ্চাকাঙ্খা দমন করিতে পারেন নাই। জান-নিসারী বাহিনী অত্যন্ত বড় আকার ধারণ করে, ফলে ইহা সুসংহত রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তাহারা অধিক সংখ্যায় রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যাপারে অংশগ্রহণ করিতে আরম্ভ করে। পুরাতন গাজী গুণাবলী অতীতের ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। সোলাইমান স্বয়ং গুণ অনুযায়ী পদোন্নতির বহুকালের ঐতিহ্য ভঙ্গ করিয়া তাঁহার ঘনিষ্ঠ সহচর ইব্রাহীমকে প্রধান উজির পদে উন্নীত করেন। ঘটনাচক্রে ইব্রাহীম ছিলেন একজন যোগ্য প্রশাসক। কিন্তু পরবর্তীকালে যোগ্যতায় প্রতি দৃকপাত না করিয়া সুলতানের প্রিয়পাত্রদিগকে নিযুক্ত করা একটা রীতিতে পরিণত হয়।

দিওয়ানের (পরিষদ) সভাগুলিতে সভাপতিত্ব করাও সুলতানের

একটি রেওয়াজ ছিল। সোলাইমান এই গুরুত্বপূর্ণ কাজটি তাঁহার প্রধান উজীরের হাতে ন্যস্ত করেন এবং এই সময়গুলি তাঁহার প্রিয়তমা খোর-রমের (ইউরোপীয়দের "রোক্সলানা") সঙ্গে কাটান। খোররম ছিল একটি রুশ ক্রীতদাসী, যে পরে সুলতানের আইনানুগ স্ত্রীতে পরিণত হয়। এই স্ত্রীলোকটি তাঁহার পুত্রদের স্বপক্ষে রাষ্ট্রীয় কার্যে হস্তক্ষেপ করেন এবং সোলাইমানকে অপর এক স্ত্রীলোক দ্বারা তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের হত্যার আদেশ দিতে বাধ্য করেন। পরে সুলতান তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বায়েজীদকে হত্যার আদেশ দান করেন। শেষ পর্যন্ত সিংহাসনের জন্য একমাত্র জীবিত পুত্র সেলিম ছিলেন চরিত্রহীন ও মদ্যপ। সেলিমের সংক্ষিপ্ত আট বৎসরের রাজত্ব সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করিতে ব্যর্থ হয়। তাহার পর অধিকাংশ সুলতানগণ দরবার কক্ষের চাইতে হেরেমকে অধিক ভালবাসেন। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ভিত্তি ছিল সম্রাটের পুরাপুরি ক্ষমতার আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাম্রাজ্যের গৌরব ছিল সর্বপ্রধান শাসকের যোগ্যতা, সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রতিফলন মাত্র। এই ধরনের একটি সাম্রাজ্য অনাগ্রহী ও দুর্বল সম্রাটের অধীনে বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে না।

পঞ্চদশ অধ্যায়

ওসমানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সংস্কৃতি

ওসমানীয় সাম্রাজ্য ছিল প্রথমতঃ একটি সামরিক শিবির (উর্দু)। যুদ্ধ ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সুলতান সেনাবাহিনীর সঙ্গে গমন করিতেন এবং জান-নিসারী হিসাবে তিনি তাঁহার বেতন গ্রহণ করিতেন, তালিকায় তাঁহার নামও থাকিত সর্বাগ্রে। "যুবরাজ্যের দর্পনে"[1] লিখিত একটি পুরাতন বিধি ওসমানীয় পরিষদবর্গ পুনঃপুন আবৃত্তি করিতেন: 'সেনাবাহিনী ছাড়া কোন সরকার হয় না, অর্থ ছাড়া সেনাবাহিনী হয় না, প্রজাসাধারণ ছাড়া অর্থ সমাগম হয় না।" খাঁটি মোঙ্গল প্রথানুযায়ী সামরিক সেনানিবাসের সর্বাধিনায়ক ছিলেন সুলতান। তবে মোঙ্গলদের তুলনায় ওসমানীয়গণ ছিলেন সুন্নী মুসলমান, এবং তাই তাহাদের সরকার ছিল ধর্মভিত্তিক। ইহার অর্থ এই যে আল্লাহর আইন অনুযায়ী সুলতানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল। ওসমানীয় সাম্রাজ্য ইসলামের উন্নতির জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল। ইহা ছিল ইসলামের দেশ এবং ইসলামের জন্যই সৈন্যগণ যুদ্ধ করিত। এমন কি রাজধানীকে কখনও কখনও ইসলাম্বুলও বলা হইত। স্বভাবতঃই ইহা সুলতানের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া দেয়। তিনি ইহা দেশের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা, শেখ উল-ইসলামের সঙ্গে যুগ্মভাবে ভোগ করিতেন। একজন সর্বোচ্চ সম্রাট ও একজন সর্বোচ্চ আল্লাহর প্রতিনিধির মধ্যে সমতা রক্ষা করা খুবই নাজুক ব্যাপার। ইহা সর্বদাই দোদুল্যমান ছিল। নিরাপদে বলা যায় যে, সমস্ত ওসমানীয় বিধি-নিষেধ ও আইন-কানুন ছিল এই দুইয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করিবার প্রচেষ্টা মাত্র।

ইতিমধ্যেই আব্বাসীয় যুগে এবং ক্ষুদ্র রাজ্যের সময় এই নাজুক সমতা

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১১৩ (মূল গ্রন্থ)।

মূল্যায়নের ব্যাপারে অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রকৃত অবস্থা এবং গাজ্জালী ও ইবনে তাইমিয়্যার ন্যায় মনীষীদের লেখার জোরে, শরীয়তকে[১] সঙ্গে রাখিয়া যে কোন লোক যথেষ্ট শক্তিধর হইলে আইনানুগভাবে মুসলমানদিগকে শাসন করিতে পারে। বাদশাহের ঐশী অধিকারে বিশ্বাসের ব্যাপারে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন জালাল আল-দ্বীন দাওয়ানী (১৪২৭—১৫০১ খ্রীঃ), যিনি তাঁহার আখলাক-ই-জালালীতে (জালালী ন্যায় শাস্ত্র) লিখিয়াছেন ঃ "সুলতান একজন ব্যক্তি যিনি ঐশী সমর্থনের দ্বারা গৌরবান্বিত···সার্বভৌমত্ব···আল্লাহর দান এবং তাঁহার (সুলতানের) ঐশী অধিকার তাহার কার্যাবলী দ্বারা বিঘ্নিত হইবে না।" শরীয়ত ত্যাগ না করিয়া ওসমানীয় সুলতানগণ যতদূর সম্ভব তাঁহাদের বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহারা নিশ্চয়ই 'পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি' রসুলুল্লাহর 'উত্তরাধিকারী' 'মুসলমানদের ধর্মগুরু' 'বিশ্বের আশ্রয়' 'আল্লাহর ছায়া' এবং অতি বিনয়ের সঙ্গে 'দুই হেরেম শরীফের নফর' (অর্থাৎ মক্কা ও মদীনা)—উপাধিসমূহ ব্যবহার করেন।

ওসমানীয়গণ ধর্মতন্ত্র ও সার্বভৌম রাজতন্ত্রের মধ্যে সমতা বজায় রাখিতে চেষ্টা করেন প্রথমতঃ ইরানী-তুর্কী ঐতিহ্য ব্যবহার করিয়া, যাহা সুলতানকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে। তবে, ইহা একমাত্র উলামাদের (ধর্মীয় নেতাগণ) সম্মতিতে করা যাইত। উলামাগণ শরীয়তে এই ধরনের আইন আছে কিনা দেখিতেন। গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, সুলতানগণ ক্রীতদাস সম্পর্কীয় আইনসমূহ নিজেদের সুবিধানুযায়ী ব্যবহার করিতেন। যেহেতু শরীয়তের গণ্ডির ভিতরে ছাড়া স্বাধীন মুসলমানদের উপর তাঁহাদের কোন আধিপত্য ছিল না, তাই সুলতানগণ প্রশাসনিক পদগুলি পূরণ করিতেন ক্রীতদাসের দ্বারা, যাহাদের উপর শরীয়তের উল্লেখ ছাড়াই তাঁহাদের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল। ফলে পাশাপাশিভাবে দুইটি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। একটিকে সাধারণতঃ বলা হয় "মুসলিম প্রতিষ্ঠান" এবং অপরটিকে বলা হয় "প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান।" স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এরূপ বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে গঠিত এবং বহু শতাব্দী পর্যন্ত স্থিতিশীল একটি বিশাল সাম্রাজ্যে বিধি-নিষেধসমূহ বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তিত হইয়াছে। উপরোল্লিখিত

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১১১ (মূল গ্রন্থ)।

শ্রেণীবিন্যাসকে অতি কঠোরভাবে লওয়া উচিত নহে, তবে ওসমানীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানের জন্য এইগুলি একটি কার্যোপযোগী পথনির্দেশক।

মুসলিম প্রতিষ্ঠান

ইহার সদস্য লওয়া হইত স্বাধীন মুসলিম জনগণ হইতে। তাঁহারা মাদ্রাসা নামক এক প্রকারের বিশেষ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। এই ধরনের বিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচীতে ইসলাম ধর্ম, ইসলামী শিক্ষা এবং বিশেষ ভাবে ইসলামী আইন অন্তর্ভুক্ত ছিল। এইসব বিদ্যালয় হইতে বাহির হইয়া আসিত ভবিষ্যৎ ধর্মপ্রচারক, মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন, দরবেশ, নিম্ন ও উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কোরান পাঠক, কাজী ও মুফ্‌তীগণ। মতবাদ অনুযায়ী ইসলামে যেহেতু কোন ধর্মযাজক বা পুরোহিত নাই, উপরোল্লিখিত পদসমূহের খ্রীস্টান নাম হইবে সাধারণতঃ ধর্মযাজক। পুরোহিত, সন্ন্যাসী, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও আইনজ্ঞ। সমস্ত বিদ্যার্থীগণ শরীয়ত পাঠ করে এবং কিছু সংখ্যক দরবেশের সম্ভাব্য ব্যতিক্রম ছাড়া ইহাতে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করে এবং ইহার উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে বিশ্বাস করে।

উপরোল্লিখিতদের মধ্যে যাহারা প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্পর্শে আসেন এবং কখনও কখনও বিবাদে উপনীত হন তাঁহারা হইলেন আইনজ্ঞগণ যাহাদিগকে কাজী বা মুফ্‌তী বলা হয়। সর্বনিম্ন হইতে সর্বোচ্চ ওসমানীয় বিচারালয়সমূহ এইসব লোক দ্বারা পরিচালিত। প্রশাসনিক সংগঠনের ন্যায়, বিচারের ক্ষেত্রেও ওসমানীয়দের দুইজন প্রধান বিচারপতি ছিলেন, একজন আনাতোলিয়ার এশিয়া মাইনর) জন্য এবং একজন রুমেলীয় (ইউরোপ) জন্য। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সামরিক প্রকৃতি অনুযায়ী প্রত্যেক প্রধান বিচারপতিকে বলা হইত কাজী আসকার (সেনাবাহিনীর বিচারক)। এই বিশাল ধর্মীয় সংগঠনের চূড়ায় ছিলেন শেখ উল-ইসলাম, যিনি সুলতান ও তাঁহার প্রধান উপদেষ্টার ন্যায় শরীয়তের খুঁটিনাটি বিষয়ের সঙ্গে জড়িত থাকিতেন। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এইসব লোকজন কখনও কখনও খুবই শক্তিশালী ছিলেন।

এই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আরোপিত দায়িত্বসমূহের মধ্যে একটি ছিল ওয়াক্‌ফ বা ধর্মীয় সম্পত্তিসমূহের পরিচালনা। ইহার নিকট বদান্যতা ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ধর্মীয় লোকদের দান করা জমি অন্যান্য সম্পত্তির তহবিল খরচ ও পরিচালনা করিবার সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত ছিল। তবে, ছোট শহরের মুফ্‌তী হইতে শেখ উল-ইসলাম পর্যন্ত সমস্ত বিচারকদের প্রধান কর্তব্য ছিল প্রত্যেক মামলা পাঠ করা, শরীয়তের সঙ্গে সম্পর্ক নিরূপণ করা এবং একটি মতামত বা ফতওয়া জারী করা। কোন মতামত জারী করিলেই মামলাটি নিষ্পত্তি হইত। অবশ্য শেখ উল-ইসলামের ফতওয়ার জাতীয় গুরুত্ব ছিল। কমপক্ষে এগার জন সুলতান ফতওয়ার দ্বারা ক্ষমতাচ্যুত হন। শেখ উল-ইসলাম প্রত্যেক ব্যাপারে সুলতানের নির্দেশের উপর ভেটো প্রদান করিতে পারিতেন। তিনি সাধারণতঃ "অলুর" (হইতে পারে) অথবা "ওলমাজ" (হইতে পারে না) বলিতেন এবং সুলতানকে তাহা পালন করিতে হইত। কার্যক্ষেত্রে এই ধরনের একটি ব্যবস্থা সুলতানের ক্ষমতা এবং শেখ উল-ইসলামের সাহসের উপর নির্ভর করিত। কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতাগণ সাহসিকতা ও ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, যথা ভয়াবহ সুলতান সেলিম যখন আরবী শিক্ষা করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী খ্রীস্টানদিগকে হত্যা করিতে আদেশ দেন, তখন শেখ উল-ইসলাম এই আদেশের বিরুদ্ধে ভেটো প্রয়োগ করেন। আবার কখনও কখনও এইসব নেতা সুলতানের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করেন, যথা—একজন নতুন সুলতানের ক্ষমতায় আরোহণের সময় পিতৃহত্যার ব্যাপারে ধর্মীয় অনুমোদন লাভ। এই মুসলিম প্রতিষ্ঠানের সদস্যদিগকে বলা হইত উলামা বা বিদ্বান লোক। শ্রেণীগতভাবে ইঁহারা ছিলেন অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রায় সর্বদাই ছিলেন যেকোন পরিবর্তনের বিরোধী।

প্রশাসনের প্রতিষ্ঠান

মুসলিম প্রতিষ্ঠানের সমান্তরালে ছিল প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান। এই দলে ছিলেন সুলতান ও তাঁহার বংশ, প্রধান উজীর ও সরকারের কর্মকর্তাগণ, দরবারের সদস্যগণ এবং নিয়মিত সেনাবাহিনী। সুলতান ও তাঁহার

সন্তানগণ ব্যতীত সাধারণতঃ প্রত্যেকেই ছিলেন মূলতঃ খ্রীস্টান ও ক্রীতদাস। প্রধান উজীরের ন্যায় উচ্চপদে উন্নীত হইবার ফলেও কোন ব্যক্তির ক্রীতদাস-মর্যাদার পরিবর্তন হইত না। এই ক্রীতদাসের অধিকাংশকে লওয়া হইয়াছে দেভ্‌শিরমেহ্ বা কর হিসাবে খ্রীস্টান বালক গ্রহণ করিবার নীতির মাধ্যমে। ইহাদের অধিকাংশকে জান-নিসারী হিসাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎসম্পন্নগুলিকে দরবারে সভা-ভৃত্য হিসাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং প্রশাসনের ক্ষেত্রে তাহারা কঠিন প্রশিক্ষণ লাভ করে। ২৫ বৎসর বয়সে ইহাদিগকে প্রদেশগুলিতে প্রেরণ করা হয় ক্ষুদ্র কর্মকর্তা হিসাবে। কেউ কেউ প্রধান উজীরের ন্যায় উচ্চপদেও উন্নতি লাভ করে। বস্তুতঃ মুসলিম প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ ব্যতীত সাম্রাজ্যের সমস্ত কর্মকর্তাগণই ক্রীতদাস। দেভ্‌শিরমেহ-এর মাধ্যমে আনা সমস্ত বালকদিগকে মুসলিম শিক্ষা দান করা হয় এবং ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। জান-নিসারীগণ ছাড়া প্রশাসনের সমস্ত কর্মকর্তাদিগকে বিবাহ করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। মুসলমান হিসাবে জন্মলাভ করিবার ফলে তাহাদের সন্তান-সন্ততি ক্রীতদাস থাকিত না। তাহারা যেহেতু স্বাধীন তাই প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানে তাহারা কোন পদ গ্রহণ করিতে পারিত না। ক্রীতদাস হিসাবে প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানের সদস্যবৃন্দ সুলতানের সরাসরি কর্তৃত্বাধীনে ছিলেন, শরীয়তের অধীনে নহে। এইভাবে সেনাবাহিনী ও প্রশাসনের উপর সুলতানের সম্পূর্ণ আধিপত্য ছিল এবং উলামাদের কোন হস্তক্ষেপ এখানে চলিত না।

প্রশাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থা ছিল দিওয়ান বা পরিষদ, যাহার সভাপতিত্ব করিতেন সুলতান। স্বাভাবিক সদস্যবর্গ ছিলেন প্রধান উজীর, রুমেলী ও আনাতোলিয়ার বেলারবেগণ (অধিনায়কগণ), দুই জন কাজী আসকর, দুইজন দফতরদার (খাজাঞ্চি), এবং দুই জন নিশাঞ্জী চ্যান্সেলর)। এই উজীরদের প্রত্যেকের প্রদেশ, গ্রাম ও নগর পর্যায়ে স্ব স্ব নিযুক্ত ব্যক্তি-বর্গ ছিল। পরে নৌবাহিনীর অধিনায়ক (কাপুদান পাশা) এবং জান-নিসারীদের অধিনায়কও (আগা) পরিষদের সদস্য হন। সমগ্র বেসামরিক প্রশাসনের সৃষ্টি হয় সেনাবাহিনীর সহায়তার জন্য। যুদ্ধের সময় প্রাদেশিক গভর্ণরগণ তাহাদের নির্ধারিত সৈন্যসহ নিয়মিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগদান করিতেন।

স্বভাবতঃই প্রশাসনিক যন্ত্র ও মুসলিম প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত বিদ্যমান ছিল। শরীয়ত যেহেতু একটি বিশাল ও সমস্যাসম্বলিত সাম্রাজ্যের সমস্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে ভবিষ্যবাণী করে নাই এবং ইহাকে সম্প্রসারণও করা যায় না, তাই নতুন সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান কমপক্ষে অন্য তিনটি উপায় বাহির করিয়া লয়। এইগুলি হইল আদত, উরফ ও কানুন। আদত হইল প্রত্যেক সম্প্রদায়ের রীতি, যাহা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। উরফ হইল অধর্মীয় আইন যাহা সুলতানের ইচ্ছা অথবা সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের বিচারের রায় হইতে উদ্ভূত। শরীয়তে কোন সমস্যার সমাধান না পাইলে সাধারণতঃ উরফ ব্যবহার করা হয়। কানুন হইল সুলতানের। দাপ্তরিক রায় যাহা আদত, উরফ ও অন্যান্য কানুনের অগ্রভাগে ব্যবহৃত হয়। উলামাগণ এই তিনটির বিরুদ্ধে ছিলেন, কারণ এইগুলি শরীয়ত হইতে উৎপন্ন নহে। তদুপরি, এই উপায়গুলি সুলতানকে আরও অধিক ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে, যাহার ফলে তিনি শরীয়তের বিরুদ্ধে কাজ করিতে আরও অধিকভাবে প্রলুব্ধ হন। উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারের যুগে সুলতান ও প্রশাসনিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে উলামা ও সংবিধানিকগণ বন্ধুভাবাপন্ন হইয়া যান, যদিও আদর্শগতভাবে তাঁহারা ছিলেন পরস্পর বিরোধী।

অমুসলিমগণ

একটি মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবে ওসমানীয়গণ প্রথমদিকেই বাধ্যতামূলকভাবে ইসলামে দীক্ষা দেওয়ার গাজী নিয়ম ত্যাগ করে এবং তৎপরিবর্তে "মহাগ্রন্থের লোকদের" ক্ষেত্রে ইসলাম প্রদত্ত সহিষ্ণুতার নীতি গ্রহণ করে। তুর্কীগণ অমুসলিম ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলিকে 'মিল্লাত' নামে উল্লেখ করে এবং সমগ্র ব্যবস্থাটি মিল্লাত প্রথা নামে পরিচিত হয়। ওসমানীয়দের খ্রিস্টান প্রজাগণ যেহেতু প্রায় সবাই ছিল অর্থোডক্স চার্চের (Orothodox Church) সদস্য এবং যাবতীয় ধর্মীয় সংগঠনের অধিকারী, তাই ওসমানীয়গণ ইহাদের প্রত্যেকটিকে এক একটি পৃথক মিল্লাত মনে করিত। প্রত্যেক মিল্লাত, সে আর্মেনিয়াল হউক বা সিরিয়ান বা গ্রীক অথবা সার্বিয়ান অর্থোডক্স, অথবা ইহুদী হউক, এইগুলি ইহাদের স্ব স্ব ধর্মীয় সংগঠনের আওতাভুক্ত

ছিল এবং ইহাদের আইনের অধীনে ছিল। ইহার দুইটি ফলাফল ছিল। একটি হইল এই যে, এই সব ধর্মীয় সম্প্রদায়, এই প্রথার দ্বারা সাম্রাজ্য বহির্ভূত অধিকাংশ খ্রীস্টানদের চেয়ে তুলনামূলকভাবে স্বাধীন ছিল। ধর্মীয় সংস্থা হিসাবে তাহারা উন্নতিশীল ও শক্তিশালী হইয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ এইসব মিল্লাতের উচ্চশ্রেণীর সদস্যবৃন্দ, যাহারা সুবিধাভোগী মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তাঁহারা উলামাদের ন্যায় প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া পড়েন এবং সাম্রাজ্যের যে কোন পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন। একমাত্র ওসমানীয় ব্যাপারে ইউরোপীয় জাতিসমূহের হস্তক্ষেপের পর এবং তাহাদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির পিছনে খ্রীস্টান সংখ্যালঘুদিগকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিবার দ্বারাই ওসমানীয়গণ এইসব মিল্লাত সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া পড়ে এবং পূর্বের ন্যায় সহিষ্ণুতা প্রদর্শন পরিত্যাগ করে। মিল্লাত প্রথা প্রবর্তনকে এইরূপ মনে করা উচিত নহে যে আইনের চোখে অমুসলিমগণ মুসলিমদের সমপর্যায়ভুক্ত। কালক্রমে সমস্ত অমুসলিমদিগকে রায়ত (প্রজা) বলিয়া উল্লেখ করা হয়, অপরদিকে মুসলমানগণকে বলা হয় সাম্রাজ্যের তাবা (অনুসারী)।

আরবীভাষী অঞ্চলসমূহ

মোটের উপর তুর্কীগণ উপনিবেশ স্থাপনকারী ছিল না এবং সিরিয়া ও মিসরকে তাহারা নিশ্চয়ই উপনিবেশে পরিণত করিতে চাহে নাই। আরবীভাষী লোকজন ছিল সাম্রাজ্যের সর্ববৃহৎ স্বতন্ত্র অংশ। আরবগণ তাহাদের স্বধর্ম মতাবলম্বী হওয়ার কারণেই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, তুর্কীগণ ফার্টাইল ক্রিসেন্ট ও মিসরকে ইস্তাম্বুলের সরাসরি প্রশাসনিক আওতায় আনয়ন করে নাই। এতদঞ্চলে বিজয়ী সুলতান সেলিম ও পরবর্তী সুলতানগণের অধীনে স্থানীয় আমীরগণ শাসনকার্য পরিচালনা করিতে থাকেন। তাঁহারা মহামান্য দরবারের নিকট কর প্রদান করিতেন মাত্র। ওসমানীয়গণ, বিভিন্ন কার্যাবলীর উপর নজর রাখিবার জন্য একজন গভর্ণর জেনারেল পাঠাইতেন মাত্র। প্রায় ৪০০ বৎসর পর্যন্ত ওসমানীয় শাসন সিরিয়াকে এমন এক শান্তভাব প্রদান করে যাহা এই দেশ উমাইয়া শাসনের পর আর লাভ করে নাই।

আরবীভাষী মুসলমানগণ কখনও ক্রীতদাস ছিল না এবং তাহারা মুসলিম প্রতিষ্ঠানে অতি উচ্চ আসন লাভ করে। বস্তুতঃ ওসমানীয়গণ আরবদের সঙ্গে আনাতোলিয়ার তুর্কীদের চাইতে অধিক ভাল ব্যবহার করে। আনাতোলিয়ার তুর্কীদিগকে তাহারা বলিত "ইশেক তুর্ক" বা তুর্কীর গর্দভ। ৪০০ বৎসরের ওসমানীয় শাসন আরব উন্নতিকে ব্যাহত করিয়াছে—এই মর্মে আধুনিক আরবদের প্রচারিত অলৌকিক কাহিনী কোন প্রমাণ দ্বারা সমর্থন করা যায় না। তুর্কীগণ আরবদের ভাষা এবং আরবদের প্রতিষ্ঠিত আইনকে সম্মান করিয়াছে। নিশ্চয়ই এইসব ব্যাপারে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে আরবগণ তুলনামূলকভাবে কোন কোন তুর্কীদের চাইতেও স্বাধীন ছিল। আরবীভাষী লোকজন সমধিক উন্নতি লাভ করিতে অপারগ হইবার জন্য সম্পূর্ণভাবে ওসমানীয়দিগকে দায়ী করা যায় না।

মিসরের অসহনীয় অবস্থার জন্য ওসমানীয়গণ দায়ী নহে। কারণ তাহাদের স্থানীয় শাসকদিগকে বহাল রাখিবার নীতির ফলে মিসরে ঘৃণিত মামলুকগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে। ওসমানীয়গণ কর ছাড়া আর কোন বিষয়ে তেমন আগ্রহী ছিল না। অতএব, পুরাতন মামলুক সুলতানগণ শেখ আল-বালাদ (প্রদেশের কর্তা) আমীর আল-হজ্জ (হজ্জের নেতা) হিসাবে বহাল থাকেন। শেষোক্তটি ছিলেন মূলতঃ সামরিক অধিনায়ক। এই উভয় কর্মকর্তাদের নিযুক্তির সময় ইস্তাম্বুলের দিওয়ানের সম্মতির প্রয়োজন হইত। এই স্থানীয় কর্মকর্তাগণ এবং তাহাদের সহকারীবৃন্দ পূর্বের ন্যায় সম্পত্তি ক্রোক করিত এবং দেশকে লুণ্ঠন করিত। তুর্কী গভর্ণর জেনারেল পাশা) ছিলেন অসহায়। কোন কোন পাশা যাহারা স্থানীয় আমীরদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না—তাহারাও লুটতরাজে অংশ গ্রহণ করিত। মামলুক আমীরদের ইচ্ছানুযায়ী পাশাদিগকে বহিষ্কার করা হইত। ২৫০ বৎসরের সরাসরি ওসমানীয় শাসনে ১০০ জনেরও অধিক পাশা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রায়ই স্থানীয় আমীরের একজন প্রতিনিধি গাধায় সওয়ার হইয়া দুর্গে অবস্থিত পাশার আবাসস্থলে আসিয়া কর্কশ স্বরে বলিতেন, "ওহে পাশা, নীচে অবতরণ কর" এবং ইহাই সাধারণতঃ তল্পিতল্পা গুটাইয়া ইস্তাম্বুলে ফিরিয়া যাইবার জন্য পাশার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।

মামলুক আমীরগণ এতই শক্তিশালী হইয়া পড়েন যে, ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে মামলুক আলী বে মক্কা অধিকার করিয়া নিজেকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন। নেপোলিয়নের আগমন ও মুহাম্মদ আলীর উত্থান পর্যন্ত মামলুকগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে।[১]

সাংস্কৃতিক জীবন

সর্বোতভাবে তুর্কীগণ ছিল সৈনিক; বিশেষভাবে ইসলামের সৈনিক, যাহার উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম ধর্ম প্রচার করা এবং ইহার ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। এই হিসাবে তাহারা অনুভব করে যে তাহাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হইল বিচারক হিসাবে শরীয়তকে তুলিয়া ধরা এবং প্রশাসক হিসাবে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা। তুর্কীদের সম্পদের মধ্যে ছিল কৃষক হিসাবে বা জমিদার হিসাবে জমির মালিকানা, অথবা চাকুরী হইতে প্রাপ্ত বেতন। সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনার ভার অন্যান্য লাভজনক দায়িত্বগুলি ছাড়িয়া দেওয়া হয় খ্রীস্টান ও ইহুদীদের হাতে।

ইসলাম এই সৈন্যদের নিকট অনেকাংশে ঋণী এবং তুর্কীগণ এই দৃশ্যে অবতরণ না করিলে ধর্মের কি অবস্থা হইত তাহা কল্পনাও করা যায় না। সেলজুক তুর্কীগণ শীয়া ফাতেমীয় ও খ্রীস্টান ক্রুসেডারদের হাত হইতে আব্বাসীয়দিগকে রক্ষা করিয়াছে। তাহারাই এশিয়া মাইনরে সর্বপ্রথম ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করে এবং ইসলামের পতাকা সুদূর ভিয়েনার সিংহদ্বার পর্যন্ত বহন করে।

সৈন্য হিসাবে তুর্কীগণের মধ্যে সম্ভবতঃ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মৌলিকতার অভাব ছিল, কিন্তু তাহারা শিক্ষাদীক্ষার প্রশংসাকারী ও পৃষ্ঠপোষক ছিল। তাহাদের মধ্যে ইসলাম ও শরীয়ত যেহেতু আরবী ভাষায় প্রবর্তন করা হয়, তাহারা এই ভাষাকে "পবিত্র" বলিয়া মনে করিতে থাকে এবং ইহাকে ধর্মীয় ও আইনের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করিতে থাকে। অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে, তা সাহিত্য হউক বা শিল্পকলা,

১। নীচে দ্রষ্টব্য পৃঃ ২১১ (মূল পুস্তক)।

দর্শন অথবা অতীন্দ্রিয়বাদ, তাহাদের অতি প্রিয় ভাষা ছিল ফার্সী। পারস্য লোকগাঁথা তাহারা এমনভাবে আরম্ভ করে যে তাহাদের প্রধান শত্রু ইরানের সাফাভীয়দের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সুলতানগণ সাফাভী-দিগকে কুলাঙ্গার "তুরানীয়ানদের" সঙ্গে তুলনা করে, যাহারা ছিল সর্বজন স্বীকৃত তুর্কী পূর্বপুরুষগণ।

তুর্কীগণ শিক্ষার অনেক শাখায় ব্যুৎপত্তি অর্জন করে। মোল্লা খসরু ছিলেন বিজয়ী মুহাম্মদের শাসনামলের একজন মহামান্য আইন শাস্ত্রবিদ। তাঁহার রচনাবলী আদর্শে পরিণত হয়। মহামহিমান্বিত সোলাইমানের রাজত্বকালে ইবনে কামালকে ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করা হইত। সম্ভবতঃ যুদ্ধের প্রয়োজনে, তুর্কীগণ বহু সংখ্যক প্রসিদ্ধ চিকিৎসক সৃষ্টি করে। তাঁহারা মধ্য ইউরোপে শৈল্য চিকিৎসা ও চক্ষু চিকিৎসাবিদ্যায় প্রসিদ্ধ ছিলেন। চিকিৎসাবিদ্যায় তাহারা তুর্কীভাষা ব্যবহার করিত, অথচ ইতিহাসশাস্ত্রে জনপ্রিয় ভাষা ছিল ফার্সী। তুর্কী ইতিহাস রচনা আরম্ভ হয় সরকারী ঘটনাবলী লইয়া—অভিযান ও বিজয়-সমূহের বর্ণনা যাহার অন্তর্ভুক্ত। অধিকাংশ ঐতিহাসিক, তাহাদের আব্বাসীয় পূর্বসূরীদের অনুকরণে ব্যাপক ইতিহাস রচনা করেন। তবে কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক জীবনচরিতের উপর প্রবন্ধ, শাসন পদ্ধতি, প্রাসাদের জীবন এবং এমনকি সাম্রাজ্যের পতনের কারণের উপর গ্রন্থ রচনা করেন।

সাহিত্য ক্ষেত্রে তুর্কীগণ রচনাশৈলী ও ভাষা উভয় প্রকারে পারস্য-দিগকে এমনভাবে অনুকরণ করে যে, একজন লেখক যেমন বলিয়াছেন : "তুর্কী সাহিত্য ইসলামী ইরানের ভাবধারার সত্যিকারের অভিভাবক হইয়া উঠে।" ফজুলী (মৃত্যু ১৫৫৩ খ্রীঃ) ও আহমদ নাদিমের (মৃত্যু ১৭৩০ খ্রীঃ) ন্যায় মেধাবী কবিও ছিলেন যাঁহারা তুর্কী ভাষায় লিখেন। যাহারা সর্বদা কফি হাউসে গমন করিত তাহারা পেশাগত ও ভ্রমণশীল গল্পকার মেদ্দাহ (Meddah)-এর গল্প শ্রবণ করিত। তিনি কথ্যভাষায় কবিতার দ্বারা অলঙ্কৃত গল্পের মাধ্যমে শ্রোতাদিগকে মোহিত করিতেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের প্রভাব এবং জনসাধারণের আকর্ষণ লাভ করিবার জন্য লোকগণ প্রচলিত ফার্সী-তুর্কীর পরিবর্তে সহজ তুর্কী ভাষা ব্যবহার করিতে বাধ্য হন।

শিল্পকলার ক্ষেত্রে যেটাকে সম্ভবতঃ একমাত্র খাঁটি "তুর্কী" হিসাবে চেনা যায় তাহা হইল স্থাপত্য শিল্পের মধ্যে। প্রাথমিক ওসমানীয় ইমারতসমূহ ছিল অধিকাংশ সেলজুক নমুনার, যেখানে পারস্য কারুকার্যে ঢাকা অসংখ্য ক্ষুদ্র গম্বুজ ব্যবহার করা হয়। কনস্ট্যাণ্টিনোপল বিজয়ের পর ওসমানীয়গণ শুধু মসজিদই নির্মাণ করে নাই, বরং প্রাসাদ এবং সরাইখানাসমূহও নির্মাণ করে। এই সব কিছুর মধ্যে, বিশেষতঃ মসজিদগুলির মধ্যে বাইজেন্টাইন স্থাপত্য ও পারস্য কারুকার্যময় নক্সা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা ইহার নিজস্ব একটি নমুনা ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করিয়াছে। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ স্থাপত্য শিল্পী ছিলেন সিনান নামে একজন ক্রীতদাস—যিনি মহামহিমান্বিত সোলাইমানের রাজত্বকালে জীপনযাপন করেন। এই মেধাবী লোকটির নির্মিত সৌধরাজির মধ্যে রহিয়াছে মসজিদ, বিদ্যালয়, রাজপ্রাসাদ, হাসপাতাল ও সরকারী স্নানাগারসমূহ। কিন্তু তাহার অতি প্রসিদ্ধ ভবনাদির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইল সোলাইমানিয়া মসজিদ। ইস্তাম্বুলের সেণ্ট সোফিয়া গীর্জার সন্নিকটে নির্মিত এই মসজিদটি ইহার পূর্বসূরী বাইজেন্টাইন সৌধটিকে নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছে।

ওসমানীয়দের পতন

ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে যে মহামহিমান্বিত সোলাইমানের রাজত্বের শেষভাগে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের সূত্রপাত হয়। সামরিক সংগঠন হিসাবে ওসমানীয় রাষ্ট্রের সজীবতা নির্ভর করে যুদ্ধবিগ্রহের উপর এবং ইহার অর্থনীতির ভিত্তি ছিল লুঠ ও বিজিত জাতিসমূহের কর প্রদানের উপর। ইউরোপ ও এশিয়া উভয় মহাদেশের অন্যান্য জাতি-সমূহের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে এবং বিশাল সাম্রাজ্যের সীমান্তবর্তী দেশগুলির সুদীর্ঘ দূরত্বের কারণে সামরিক বিজয় ব্যয়সাপেক্ষ ও দুরূহ হইয়া পড়ে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে দেশ বিজয় এক রকম বন্ধ হইয়া যায় এবং প্রতিরক্ষামূলক কর্তব্য পালন করিতে করিতে সৈন্যবাহিনী অস্থির হইয়া উঠে। সমগ্র সরকারী যন্ত্র ক্রমশঃ কঠোর পরিশ্রমে থামিয়া যায়। ভাঙ্গনের প্রক্রিয়াতে প্রায় ৩০০ বৎসর লাগে। কিন্তু ইহার চিহ্ন ইতিমধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রকাশ পায়।

সুলতান সর্বোচ্চ শাসক ছিলেন বলিয়া দিওয়ানের সভাসমূহে সভাপতিত্ব করিতেন এবং স্বয়ং অভিযানসমূহ পরিচালনা করিতেন। তবে, সোলাই-মান এই কর্তব্য প্রধান উজীরের উপর ন্যস্ত করেন। কিছুদিনের জন্য দিওয়ান কক্ষে একটি মার্বেল পাথরের জাফরি নির্মাণ করিয়া সুলতানের স্বয়ং অংশ গ্রহণের কাহিনী প্রচলিত রাখা হয়। সুলতান সেই জাফরির পিছনে থাকিয়া সবকিছু শুনিতেছেন বলিয়া বিশ্বাস করা হইত। পরবর্তী-কালে সুলতান এইসব ভনিতা করা নিষ্প্রয়োজন মনে করেন এবং কি ঘটিতেছে তাহা খোঁজ নেওয়াও অপ্রয়োজনীয় মনে করিতে থাকেন। বহু বৎসরের চাকুরী ও যোগ্যতার মাধ্যমে উচ্চপদে উন্নতি প্রদান করিবার প্রতিষ্ঠিত নিয়মও সোলাইমান ভঙ্গ করেন। তিনি তাঁহার বন্ধু ইব্রাহীমকে দরবারের ভৃত্যের পদ হইতে প্রধান উজীরের পদে উন্নীত করেন।

তদুপরি, দেশ বিজয় বন্ধ হওয়ার ফলে, সেই উৎস হইতে আয় তিরোহিত হইলে, সুলতান সর্বোচ্চ অর্থ প্রদানকারীর নিকট পদ বিক্রয় করিয়া দরবারের বিপুল খরচ জোগাইতে চেষ্টা করেন। ইহা ছিল দেভ্‌শিরমেহ্ হইতে কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ দিবার প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম। 'বে'লারবে', প্রাদেশিক অধিনায়ক, ধনী ব্যক্তিবর্গ ও দলগুলি জনগণের স্বার্থের বিনিময়ে বিভিন্ন পদ ক্রয়-বিক্রয় করেন। শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের কোন আইন না থাকিবার ফলে কোন কোন সময় সুযোগ্য যুবরাজদিগকে বাদ দেওয়া হয়। এমনকি যুবরাজদের বিদ্যাশিক্ষাও রহিত করা হয়। তাহারা হেরেমে লালিত-পালিত হয় এবং সহচর হিসাবে লাভ করে নিরক্ষর খোজা ও মহিলাদিগকে। তৃতীয় মুরাদ ছাড়া অন্যান্যদের সম্পর্কে এইটুকু বলা যায় যে, তাঁহারা পরস্পরের তুলনায় মন্দ ছিলেন না।

এই নিয়মের ফলে যেসব প্রধান উজীর সুলতানের নামে শাসন করেন, তাঁহারা চরিত্রহীন হইয়া পড়েন। অর্থ দ্বারা ক্রয় করিয়া এই পদে উন্নতি লাভ করিবার ফলে প্রধান উজীর স্বাধীন মতামতের অধিকারী ছিলেন না। তিনি সাধারণতঃ হেরেমের মহিলা, খোজা, সেনাবাহিনী, উলামা অথবা এই জাতীয় সকলের নিকট ঋণী থাকিতেন, যাহারা নিজেদের স্বার্থে তাহার দ্বারা জনসাধারণকে শোষণ করিতে চাহিত। যেহেতু তাঁহার জীবন ছিল সুলতানের হাতে, যিনি আবার এক শ্রেণীর

স্বার্থপরায়ণ দলের দ্বারা প্রভাবান্বিত ছিলেন, সেহেতু দলের সঙ্গে লুঠতরাজে লিপ্ত থাকাই প্রধান উজীরের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ ছিল। আবার ইহাও বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে কিছুসংখ্যক সাহসী ও সুযোগ্য প্রধান উজীর না থাকিলে সাম্রাজ্য যতদিন টিকিয়া ছিল ততদিনও টিকিতে পারিত না।

শক্তিশালী প্রধান উজীরদের মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন কপ্রুলুগণ (Koprulu)—যাহারা আব্বাসীয় যুগের বারমাকীয়দের ন্যায় একটি পরিবার হিসাবে প্রায় ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন। মুহাম্মদ কপ্রুলুকে চতুর্থ মুহাম্মদের (১৬৪৮—১৬৮৭ খ্রীঃ) মাতা, স্বীয় পুত্রকে প্রচলিত হত্যাকাণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। কথিত আছে যে, পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রধান উজীর হিসাবে তিনি ৩০,০০০ লোককে হত্যা করেন, যাহারা মুসলিম ও প্রশাসক উভয় প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিল। তিনি ওসমানীয়দের সামরিক প্রতিভা পুনরুজ্জীবিত করিতে চেষ্টা করেন এবং সামরিক অভিযানসমূহ গঠন করেন। তাঁহার পুত্র আহমদ ১৬৭৬ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যু পর্যন্ত প্রধান উজীর হিসাবে অতি সম্মানের সহিত কাজ করেন। ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দে সুলতান দ্বিতীয় সোলাইমান আহমদের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা মুস্তাফা কপ্রুলুকে নিযুক্ত করেন। কিন্তু এইসব কঠোর প্রধান উজীরগণ যত যোগ্যই হউন, তাঁহাদের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য এবং আগমন করিতেন দীর্ঘ ব্যবধানে। তাঁহারা শুধুমাত্র সাম্রাজ্যের পরিধি দীর্ঘ করিতে পারিতেন, ইহার রোগ সারাইতে সক্ষম ছিলেন না।

পতনের কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে সেনাবাহিনীর দোষ সর্বাগ্রে ধরা পড়ে, কারণ সাম্রাজ্যের ক্ষমতা ও দুর্বলতা ছিল ইহার সামরিক শক্তির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। সেনাবাহিনীর অন্তরাত্মা জান-নিসারীগণ বিবাহের অনুমতি লাভ করিয়া দুর্বল হইয়া পড়ে। ইহার দ্বারা সৈন্যগণ তাহাদের প্রাথমিক আনুগত্য সুলতানকে না দিয়া তাহার পরিবারকে প্রদান করে, যাহার সবটুকু বিবাহের পূর্বে সুলতানেরা পাইতেন। তৃতীয় মুরাদের সময় এই সংগঠনের সদস্যদের পুত্রদিগকেও বাহিনীতে তালিকাভুক্ত করিবার অনুমতি দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে প্রয়োজনের খাতিরে বেকার মুসলমানদিগকে ভর্তি করা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে দেভ্‌শিরমেহ্‌ প্রথা

ত্যাগ করা হয়। এবং জান-নিসারীগণ পার্শ্ব ব্যবসায় নিযুক্ত হইয়া পড়ে। তাহারা যেহেতু আর ক্রীতদাস ছিল না, তাই তাহারা একটি শক্তিশালী গোষ্ঠীতে পরিণত হয়, যাহাদের উপর সুলতানের আধিপত্য লোপ পায়। সংখ্যায় তাহারা বৃদ্ধি লাভ করে এবং দেশের অর্থনীতির উপর এক বিরাট বোঝা হইয়া দাঁড়ায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জান-নিসারীদের বেতনের টিকিট প্রকাশ্য বাজারে ক্রয়-বিক্রয় হয়। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের দিকে তাহাদিগকে বিলুপ্ত করিবার সময় দেখা যায় তালিকাভুক্ত ১৫০,০০০-এর মধ্যে মাত্র ২'০০০-এর সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল।

সেনাবাহিনীর অপর গুরুত্বপূর্ণ শাখা, সিপাহীগণ, যাহারা ছিল সামন্ত অশ্বারোহী বাহিনী, তাহারাও তেমন ফলপ্রসূ বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। তৃতীয় মুরাদের সময় সামন্ত প্রভু ও দরবারের সদস্যগণ তাহাদের চাকর, ক্রীতদাস, খোজা ও অন্যান্যদিগকে সিপাহীর তালিকাভুক্ত করিয়া তাহাদের বেতন পকেটস্থ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত একটি শক্তিশালী বাহিনী হিসাবে ওসমানীয় অশ্বারোহী বাহিনীর শক্তি বিলীন হইয়া যায়।

সরাসরি করপ্রথার পরিবর্তে জেলার কর সর্বোচ্চ মূল্য প্রদানকারীর নিকট বিক্রয় করিবার প্রথা চালু করা হয়। কর তেমন উচ্চ ছিল না কিন্তু আদায় করিবার পন্থা ছিল জনগণের নিকট অত্যাচারমূলক। এক এক জেলার কর বাজারে বিক্রয় হইত এবং ক্রেতাকে গ্রামবাসীর খরচায় তাহার লাভ আদায় করিতে হইত। প্রশাসনের পদসমূহ যেহেতু উপঢৌকনের সাহায্যে লাভ করা যাইত, সেহেতু প্রত্যেককে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করিতে হইত, যাহাতে সে তাহার উপরওয়ালাকে এবং এইভাবে সুলতানকে পর্যন্ত অর্থের এক ভাগ প্রদান করিতে পারে।

উলামা, শাসকশ্রেণী, মিল্লাতের নেতা ও ব্যবসায়ীগণ (যাহারা অধিকাংশই ছিল খ্রীস্টান) সবাই এই কাজে জড়িত ছিল ও সমভাবে প্রতিক্রিয়াশীল ছিল বলিয়া অবস্থার পরিবর্তনের বিরোধী ছিল। তাহারা এই প্রথা পছন্দ করিত কারণ ইহা তাহাদিগকে সুবিধাদি প্রদান করিয়াছে এবং ইহার উপরে কোন শক্তিশালী লোক তাহারা চাইত না। এই প্রথার প্রচলন চাহিত তাহাদের নিজস্ব উপকারার্থে, জনগণের জন্য নহে। এই প্রথা বিপদগ্রস্ত হইলে তাহারা সর্বদা একত্র হইয়া ইহাকে রক্ষা করিতে

সচেষ্ট হয়। কিন্তু একবার বিপদ কাটিয়া গেলে তাহারা তাহাদের লুঠের কাজ চালাইয়া যায়।

ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের ক্রমাবনতি বর্ণনা করিবার সময় আরও দুইটি কারণ অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে। একটি হইল অর্থনৈতিক। আমেরিকার নতুন বিশ্ব আবিষ্কার ও ইউরোপের ব্যবসানীতির বহিঃপ্রকাশের ফলে বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি পরিবর্তিত হইয়া যায়। ভূমধ্যসাগরীয় ব্যবসা গুরুত্বহীন হইয়া পড়ে এবং সমুদ্র পথ স্থল পথের স্থান দখল করে। ইহা ওসমানীয় অর্থনীতিতে মর্মাঘাত হানে বলিয়া পুঁজি খাটাইবার আর কোন উৎসাহ দেখা যায় না।

দ্বিতীয় কারণ এই যে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পতন এবং সামগ্রিকভাবে স্বাধীন জাতিসমূহের মহাদেশ হিসাবে ইউরোপের উত্থান, একই সময় সংঘটিত হয়। ইউরোপীয় ব্যবসায়ী ও দুঃসাহসিক লোকজন বাজার ও কাঁচামালের খোঁজে চতুর্দিকে যাইতে আরম্ভ করে এবং এই প্রক্রিয়ায় ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ন্যায় একটি পতনোন্মুখ বিশাল প্রতিমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বাধ্য। রাশিয়া, অস্ট্রিয়া, জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড ওসমানীয়দের ক্ষতির বিনিময়ে বিস্তৃতি লাভ করে। মূলতঃ সমগ্র ইউরোপের অংশগ্রহণে স্বাক্ষরিত ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দের কার্লোভিজের (Karlowitz) চুক্তি হইল ইউরোপে ওসমানীয় আধিপত্যের পরিসমাপ্তি এবং মধ্যপ্রাচ্যে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের সূচনা।

ষোড়শ অধ্যায়

ইরানের সাফাভীয়গণ

ইসমাইল ১ম (১৫০০—১৫২৪)	সোলাইমান (১৬৬৭—১৬৯৪)
তাহ্মাসপ ১ম (১৫২৪—১৫৭৬)	হোসাইন (১৬৯৪—১৭২২)
ইসমাইল ২য় (১৫৭৬—১৫৭৮)	তাহ্মাসপ ২য় (১৭২২—১৭৩১)
খোদা বান্দেহ্ (১৫৭৮—১৫৮৭)	আব্বাস ৩য় (১৭৩১—১৭৩৬)
আব্বাস ১ম (১৫৮৭—১৬২৯)	নাদের শাহ আফসার (১৭৩৬—১৭৪৭)
সাফি (১৬২৯—১৬৪২)	করিম খান জান্দ (১৭৪৭—১৭৭৯)
আব্বাস ২য় (১৬৪২—১৬৬৭)	

সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগের মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র এক হাজার বৎসর পরের মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্র হইতে তেমন ভিন্ন রকমের নহে। সপ্তম শতাব্দীতে এই এলাকায় দুইটি শক্তির আধিপত্য ছিল। বাইজেণ্টাইন সাম্রাজ্যের কর্তৃত্ব ছিল এশিয়া মাইনর, অধিকাংশ ফার্টাইল ক্রিসেণ্ট, মিসর ও উত্তর আফ্রিকার উপর এবং তাহারা শাসন করিত কনস্ট্যান্টিনোপল হইতে। ইরানের সাসানীয়গণ শাসন করিত টাইগ্রীস হইতে সিন্ধু নদী পর্যন্ত এবং পারস্য উপসাগর হইতে ককেসাস ও আরাল নদী পর্যন্ত এই সমগ্র এলাকা। এই দুইটি সাম্রাজ্য একে অপরের সহিত প্রতি-নিরত যুদ্ধ করিতে করিতে নিজেদিগকে এমন দুর্বল করিয়া ফেলে যে শেষ পর্যন্ত তাহারা মরুভূমির আরবদের সহজ শিকারে পরিণত হয়। এক হাজার বৎসর পর আমরা মধ্যপ্রাচ্যকে পুনরায় পূর্বের ন্যায় দুইটি শক্তির দ্বারা একই এলাকায় কর্তৃত্ব করিতে দেখি : এশিয়া মাইনরে ওসমানীয়গণ এবং ইরানে সাফাভীয়গণ। এই দুই সাম্রাজ্য উহাদের পূর্বসূরীদের ন্যায় নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করিতে করিতে অচলাবস্থায় পতিত হয়। খুব স্বভাবতঃই সিদ্ধান্তে আসা যায়, যেমন কেউ কেউ সিদ্ধান্তে উপনীত

হইয়াছেন যে, বাইজেন্টাইন ও সাসানীয়গণ যেরূপ নিজেদিগকে দুর্বল করিতে করিতে আরবদের হাতে পতিত হয়, অনুরূপভাবে ওসমানীয় ও পারস্যবাসীগণও নিজেদিগকে দুর্বল করিতে করিতে ইউরোপীয়দের হাতে পতিত হয়। এই ধরনের সিদ্ধান্ত সঠিক কিনা তাহা নির্ণয় করিতে যে সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন তাহা এই আলোচনার আওতার বাহিরে। তবে এই প্রশ্ন অত্যন্ত জটিল।

মোঙ্গল আক্রমণের ফলে পারস্যবাসীগণ রাজনৈতিক কার্যাবলী ত্যাগ করে এবং নিজেদিগকে সুফীবাদে নিমজ্জিত করিয়া অতীন্দ্রিয়বাদে তাহাদের সময় ব্যয় করে। তাহারা তাহাদের ভাষা ও সংস্কৃতি সজীব রাখে। নিজেরা রাজনৈতিক ও বংশানুক্রমিক কার্যাবলীতে উৎসাহিত না হইলেও যাহারা এই সবের মধ্যে ছিল তাহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মোঙ্গল ও বিভিন্ন তুর্কী বংশের মধ্যে যাহারা ইরানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গঠন করিয়াছে তাহারা পারস্যবাসীদের সংস্কৃতি গ্রহণ করে এবং স্বল্প ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বত্র ফার্সী ভাষা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রচলন করে।

মোঙ্গল আক্রমণের পর হইতে ১৫০২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইরানে কোন একক ও শক্তিশালী সরকার ছিল না। ইলখানগণ খ্রীস্টান ও ইসলামের মধ্যে কোন্‌টি গ্রহণ করিবে ইতস্ততঃ করিতে করিতে শেষ পর্যন্ত শেষোক্তটি গ্রহণ করে এবং আনাতোলিয়ার তুর্কীদের ন্যায় নিজেদিগকে সুফী ভাবধারার সঙ্গে সংযুক্ত করে। গাজান খান ধর্মের দ্বন্দ্বটির সমাধান করেন এবং নিজে মুসলমান হইয়া যান। তিনি শেখ সাফি জিলানী (মৃত্যু ১৩৩৪ খ্রীঃ) নামে একজন সুফীর প্রভাবে আসেন, যিনি কাস্পিয়ান সাগরের সন্নিকটে রান্ত নামক প্রাদেশিক রাজধানীতে একটি শাখা গঠন করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর দিকে সুফীদের সাফি শাখা শীয়া দলের সঙ্গে মিলিত হয়। সুন্নীদের ন্যায় ইহাদের মধ্যেও অনেক ভদ্রলোক ছিল, যাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত হইয়া যায় এবং অনেক সৈনিকও ছিল যাহারা অস্ত্রের জোরে শীয়া মতবাদ প্রচার করিবার জন্য উৎসাহী হয়। সাফাভীয়দের সামরিক অনুসারীগণ লাল শিরস্ত্রাণ পরিধান করিত এবং তাহাদিগকে "লাল মস্তক" বা কিজিলবাস বলা হইত।

কিজিলবাসের সদস্যগণ তাহাদের নেতার প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্যের

জন্য সুপরিচিত ছিল। এই নেতৃত্বপদটি উত্তম শীয়া ঐতিহ্য অনুসারে ছিল বংশানুক্রমিক। তাহারা প্রতিনিয়ত সুন্নী গাজী রাষ্ট্রগুলির সহিত এবং পরে এশিয়া মাইনরে ক্ষমতাসীন ওসমানীয়দের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিত। এশিয়া মাইনরে বহু সংখ্যক শীয়া সমর্থক ছিল যাহারা ওসমানীয়দের দেহে কাঁটার ন্যায় বিরাজ করিত। সাফির সরাসরি বংশধর ইসমাইল, বাল্য বয়সে ইরানে ছিলেন এবং তথায় তাঁহার পিতা শেখ হায়দর ছিলেন এই শাখার নেতা। তিনি ১৪৯০ খ্রীস্টাব্দে নিহত হন। পিতার অনুসারীদিগকে লইয়া ইসমাইল ১৫০০ খ্রীস্টাব্দে আরদাবিল গমন করেন। তিনি তখন ১৩ বৎসর বয়স্ক। দুই বৎসরের মধ্যে এই উল্লেখযোগ্য বালক সমগ্র শীরভান, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান জয় করেন এবং নিজেকে শাহ্ বলিয়া ঘোষণা করেন।

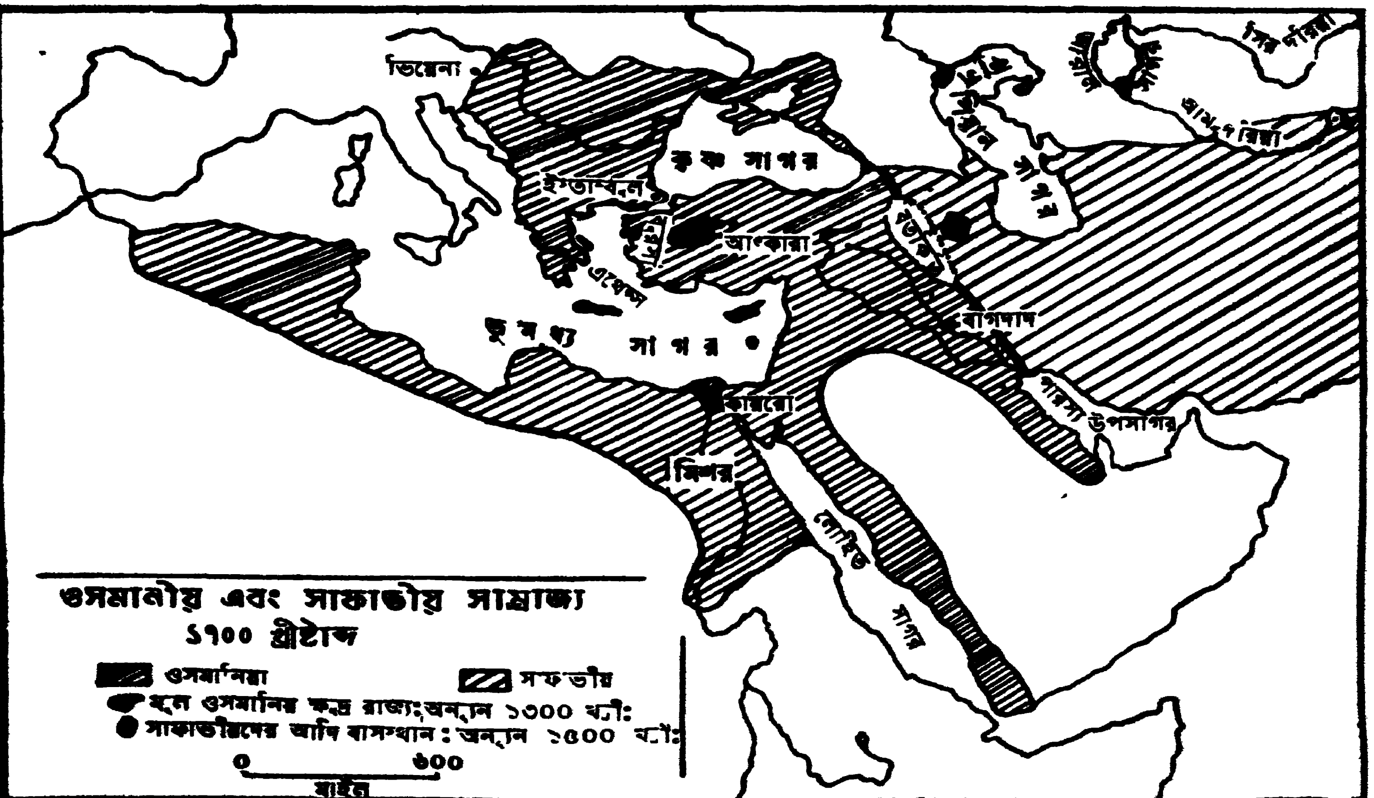
সাফাভীয়গণ পিতার দিক হইতে সৈয়দ (রসুলুল্লাহর বংশধর) এবং মাতার দিক হইতে সাসানীয় সম্রাটদের বংশধর বলিয়া দাবী করে। এই দাবীর কোনটাই তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক নহে। সম্ভবতঃ তাহারা আজারবাইজানের তুর্কী বা কুর্দিশ গোত্রের সদস্য এবং তাহাদের প্রাথমিক অনুসারীগণ ছিল তুর্কমান। ইসমাইলের মাতৃভাষা ছিল তুর্কী এবং তিনি সেই ভাষাতেই কবিতা লিখেন। বস্তুতঃ ওসমানীয়গণ যখন ফার্সীভাষা ব্যবহার করিয়া গৌরব বোধ করিত, ঠিক তখনই ইসমাইলের দরবারে তুর্কীভাষা ব্যবহৃত হইত। তবে সাফাভীয়গণ অতি দ্রুত পারস্যবাসী হইয়া যায় এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজ্যের নেতাদের ন্যায় পারস্যবাসীদের পদবী ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে এবং বহির্বিশ্বের নিকট পারস্যবাসী হিসাবে পরিচিত হয়।

ইসমাইল সমগ্র ইরান জয় করেন এবং তাহাদিগকে শীয়া হইতে বাধ্য করেন। তিনি সুন্নীদের ঘোর শত্রু ছিলেন এবং এশিয়া মাইনরের শীয়াদিগকে ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে প্ররোচণা প্রদান করেন। শীয়া মতবাদ ইরানের রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হয় এবং ইহা ওসমানীয়দের, বিশেষতঃ সুলতান সেলিমের উচ্চাকাঙ্খাকে বিঘ্নিত করে, যিনি মুসলিম বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি হইতে চাহিয়াছিলেন। তদুপরি শীয়া মতবাদ ইরানকে ওসমানীয়দের গ্রাস হইতে রক্ষা করে। সাফাভীয়গণ তুর্কী

হইলেও তাহারা নিজেদিগকে পারস্যবাসী হিসাবে পরিচয় দেয় এবং সাফাভীয় বংশ নিশ্চয়ই পারস্যে জাতীয় স্বাধীনতা আনয়ন করে।

যাহাই হউক ২০ বৎসর বয়সে শাহ ইসমাইল অধিকাংশ ইরানের অধিকর্তা হন এবং এশিয়া মাইনরের সুন্নীদের বিরুদ্ধে অনেকগুলি বিদ্রোহের সূচনা করেন। দ্বিতীয় বায়েজীদ ও প্রথম সেলিম ছিলেন শাহ ইসমাইলের সমসাময়িক। প্রথম সেলিম, যিনি ইসমাইলকে সন্দেহের চোখে দেখিতেন, একটি আপোষমূলক পন্থা অবলম্বন করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মোটের উপর ওসমানীয় সুলতান ইরান অধিকার করিতে আগ্রহী ছিলেন না এবং ইসমাইল তাঁহার অভিযানসমূহ পূর্বদিকে পরিচালনা করিলে এবং এশিয়া মাইনরকে একাকী ছাড়িয়া দিলেই বায়েজীদ সন্তুষ্ট হন।

ফার্সী ও তুর্কী উভয় ভাষায় লিখিত কমপক্ষে দুইটি পত্রে বায়েজীদ ইসমাইলকে তাঁহার বিজয়সমূহের জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং "পিতৃসুলভ" উপদেশ প্রদান করেন। সুন্নীদের কবর ও মসজিদসমূহ ধ্বংস এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য ধর্মকে ব্যবহার করিতে তিনি ইসমাইলকে নিষেধ করেন। তিনি ইহাও ইঙ্গিত দেন যে ইসমাইল তাঁহার অবস্থাকে অত্যন্ত সঙ্গীন করিয়া তুলিবেন কারণ, "পারস্যবাসীগণ এমন এক জাতি যাহারা এমন কোন বাদশাহকে মান্য করিবে না যে তাহাদের একজন নহে।" তবে ইসমাইল সুন্নীদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ইহার প্রত্যুত্তর দেন। বায়েজীদ ওসমানীয় প্রজাদিগকে ইরান যাইতে নিষেধ করেন, কিন্তু ইরানের কোন পর্যটককে অত্যাচার করেন নাই। ইতিমধ্যে শাহ ইসমাইল উজবেকদের উপর একটি উল্লেখযোগ্য বিজয় লাভ করেন এবং তাহাদের নেতা শায়বাক খানকে বন্দী করেন। ইসমাইলের প্রতি সুফী যোদ্ধাদের অন্ধ ধর্মীয় আনুগত্য এত প্রবল ছিল যে, শাহের আদেশে কিজিলবাস সত্যসত্যই বন্দীর কাঁচা মাংস ভক্ষণ করে। ইসমাইল শায়বাকের মাথার খুলি সোনায় মোড়াইবার আদেশ দেন এবং সমগ্র জীবন ইহাকে মদের পানপাত্র হিসাবে ব্যবহার করেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীর শরীরের ছাল বানাইতে আদেশ দেন এবং ভিতরে ঘাস ভরিয়া বায়েজীদের নিকট প্রেরণ করেন। বায়েজীদের পুত্র সেলিম পিতার ন্যায় তেমন আপোষ মনোভাবাপন্ন ছিলেন না। তিনি


ভিয়েনা
কৃষ্ণ সাগর
ইস্তাম্বুল
আংকারা
এথেন্স
ভূমধ্য সাগর
বাগদাদ
কায়রো
মিশর
লোহিত সাগর
পারস্য উপসাগর
কাস্পিয়ান সাগর
আমুদরিয়া
সিরদরিয়া
ওসমানীয় এবং সাফাভীয় সাম্রাজ্য
১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ
ওসমানিয়া
সফভীয়
মূল ওসমানির ক্ষুদ্র রাজ্য: অন্যূন ১৩০০ খ্রী:
সাফাভীদের আদি বাসস্থান: অন্যূন ১৫০০ খ্রী:
০ ৬০০
মাইল

ইসমাইলের প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন এবং অনেক পারস্য ও তুর্কী ঐতিহাসিক ইহাকে উভয়ের মধ্যে যুদ্ধের তাৎক্ষণিক কারণ বলিয়া বিবেচনা করেন। বস্তুতঃ ইসমাইলের ক্রমবর্ধমান শক্তি বিশেষতঃ সেখানে বসবাসকারী বিপুল সংখ্যক শীয়া সমর্থক এশিয়া মাইনরের ওপর ছিল সরাসরি হুমকি স্বরূপ। তদুপরি সুন্নী প্রাচীনপন্থীদের রক্ষক হিসাবে ওসমানীয়গণ চুপ করিয়া থাকিতে পারে না।

সেলিম সুলতান হইবার পর ইসমাইল তাঁহাকে অভিনন্দন জানাইয়া কোন পত্র প্রেরণ করেন নাই, বরং সুন্নীদের সম্পত্তি ধ্বংসের কাজ অব্যাহত রাখেন। সুন্নী প্রাচীনপন্থীদের রক্ষাকর্তা হিসাবে ইসমাইলের বিরুদ্ধে একটি অভিযান প্রেরণ করা ছাড়া সেলিমের গত্যন্তর ছিল না। সেলিমকে অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হইতে হয় এবং ইসমাইল পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করিয়া ওসমানীয়দিগকে ইরানের অভ্যন্তরে আনিতে চেষ্টা করেন। ওসমানীয় সৈন্যগণ পূর্বাঞ্চলীয় অভিযানে সন্তুষ্ট ছিল না। বোধ-হয় গরম, দুর্গম পার্বত্য এলাকা এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অনীহা —এইসব কারণেই তাহারা অসন্তুষ্ট ছিল। এমন কি জান-নিসারীগণও ইহাতে অসন্তুষ্ট ছিল। তবে সুলতান তাঁহার সিদ্ধান্তে অবিচল থাকেন এবং স্বীয় রাজ্যে শীয়াদিগকে পাইলেই হত্যা করেন। অনুমান করা যায় যে, তিনি প্রায় ৪০,০০০ শীয়া সুফীদিগকে ধ্বংস করেন। প্রথম যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় ১৫১৪ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে আগস্ট উর্মিয়া (রেজাইয়া) হ্রদের পশ্চিমে কলদ্রান নামক স্থানে। ওসমানীয়গণ নিশ্চয়ই জয় লাভ করে, তবে ইহা কোন চূড়ান্ত বিজয় নহে। সেলিম কিছুকালের জন্য তাব্রিজ আয়ত্বাধীন রাখেন। ২৮ বৎসর বয়স্ক শাহ ইসমাইল এই পরাজয়ে কিছুটা হতাশ হইয়া পড়েন এবং মদপানে আসক্ত হইয়া পড়েন। মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে কলদ্রানের যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ইহা ২০০ বৎসরের দুই নায়ক, ওসমানীয় ও পারস্য-বাসীর মধ্যে প্রথম যুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ ইহা সাফাভীয়দিগকে আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রের গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞান দান করে। তুর্কী ও পারস্য উভয় ঐতিহাসিক-দের বাড়াবাড়ির ফলে এই যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী সৈন্যদের সংখ্যা নিরূপণ করা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। তবে সঠিকভাবে এতটুকু বলা যায় যে ওসমানীয়দের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী ছাড়াও তাহাদের সাজ

বন্দুক ও সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ গোলন্দাজ বাহিনী ছিল। সাফাভীর বাহিনী ছিল সম্পূর্ণভাবে বর্শা, ধনুক ও তরবারি দ্বারা সজ্জিত কিজিলবাস অশ্বারোহী বাহিনী। তাহারা সবাই ছিল শাহ ইসমাইলের ধর্মীয়—উৎসর্গকৃত লোক-জন যাহারা মহিলাদের উৎসাহে সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করে। বাহ্যতঃ মহিলাগণ তাহাদের সঙ্গেই ছিল। কিন্তু তাহারা দেখিল কামানের সম্মুখে ধর্মান্ধ সাহসের কোনই মূল্য নাই। এই তুর্কী গোলন্দাজ বাহিনীই কলদ্রনের যুদ্ধে এবং দুই বৎসর পর মামলুকদের বিরুদ্ধে মার্জ-দাবিকে ওসমানীয়দিগকে বিজয় প্রদান করে। সাফাভীয়গণ আগ্নেয়াস্ত্র খরিদ করে এবং পরবর্তী বৎসরগুলিতে কলদ্রনের পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে সক্ষম হয়।

শাহ ইসমাইল মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। কলদ্রনের পরাজয় সত্ত্বেও তিনি দুইটি আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া একটি সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। প্রথমতঃ ইহা শীয়া এবং দ্বিতীয়তঃ ইহা পারস্যবাসী। শাহ ইসমাইল ও তাঁহার পুত্র শাহ তাহ্‌মাসপ প্রথমোক্তটিতে অধিক আগ্রহী ছিলেন, অপরদিকে শাহ আব্বাস ও পরবর্তী সাফাভীয়গণ শেষোক্ত-টির অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

সমগ্র ইরানের একচ্ছত্র অধিপতি হইবার পর শাহ্ ইসমাইল ও তাঁহার কিজিলবাস শিষ্যগণ তরবারির মুখে লোকদিগকে শীয়া মতবাদে দীক্ষা দেন এবং শীয়া মতবাদের ভিত্তিতে একটি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র গঠন করেন। যুদ্ধবিগ্রহ রক্তপাতে পরিশ্রান্ত পারস্যবাসীগণ তেমন বাধাবিঘ্ন ছাড়াই সাফাভীয় প্রভুত্ব ও শীয়া মতবাদ গ্রহণ করে। শীয়া মতবাদ ইরানের শীয়া তুর্কীদিগকে এশিয়া মাইনরের সুন্নী তুর্কীগণ হইতে পৃথক করিয়া ফেলে এবং এই ব্যবধান আজ পর্যন্তও ঘুচে নাই। ইরান এবং পূর্বাঞ্চলে শীয়া আধিপত্য ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সুন্নীদিগকেও মধ্য এশিয়ার সুন্নীগণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে এবং ওসমানীয় সুলতানদের খলিফা হিসাবে একটি সম্মিলিত ইসলামী বিশ্ব শাসন করিবার আশা ব্যাহত করে।

১৫২৪ খ্রীস্টাব্দে শাহ ইসমাইলের মৃত্যু হইতে ১৫৮৭ খ্রীস্টাব্দে মহান শাহ্ আব্বাসের সিংহাসনারোহণ পর্যন্ত সাফাভীয়গণ প্রথম শাহ তাহ্‌মা-স্প, দ্বিতীয় ইসমাইল ও মোহাম্মদ খোদা বান্দেহ্ এই তিনজন শাহের

অধীনে পূর্বদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং পারস্য উপসাগর হইতে কাস্পিয়ান সাগরের উত্তর তীর এবং টাইগ্রীস নদী হইতে ট্রান্সক্সিয়ানা পর্যন্ত বিস্তৃত একটি সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলে। তাহারা ওসমানীয়দের হাত হইতে নিজেদের এলাকা মুক্ত রাখে, তাব্রিজ পুনর্দখল করে এবং দক্ষিণে বাগদাদ ও উত্তরে আর্মেনিয়া লইয়া ওসমানীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে কখনও পরাজিত হয় এবং কখনও জয় লাভ করে। শাহকে একচ্ছত্র নেতা মানিয়া একটি শীয়া ধর্মীয় রাষ্ট্র গঠন করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য। এই রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড ছিল কিজিলবাসের যোদ্ধাশ্রেণী। সমগ্র দেশ কতকগুলি জেলায় বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক জেলাকে একজন কিজিলবাসের অধীনে ন্যস্ত করা হয়,—যিনি ইহাকে জায়গীর হিসাবে শাসন করেন। বিনিময়ে তিনি যুদ্ধের সময় শাহকে সৈন্য সরবরাহ করেন এবং রাজস্বের একাংশ প্রদান করেন। ইহা ছাড়া তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। এই কিজিলবাস সামন্ত প্রভুদের দ্বারাই সমগ্র দেশকে শীয়া মতবাদ গ্রহণ করিতে বাধ্য করা হয়। শহরে ও গ্রামে দেশের সর্বত্র প্রথম তিন খলিফা অর্থাৎ আবুবকর, ওমর ও ওসমানকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য জনসাধারণের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়। যাহারা অস্বীকার করে তাহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করা হয়।

পূর্বাঞ্চলে সাফাভীয়গণ এক বিরাট এলাকা শাসন করে। তাহাদের রাজধানী তাব্রিজ নিরাপত্তার দিক হইতে ওসমানীয় সীমান্তের অতি নিকট-বর্তী বিধায় শাহ্ তাহ্মাসপ উত্তর-মধ্য ইরানের কাজভীন নামক শহরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। কিজিলবাস নেতৃবৃন্দ এমন ধনী ও শক্তি-শালী হইয়া উঠেন যে তাঁহারা উত্তরাধিকারের প্রশ্নেও হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা করেন। এই প্রশ্ন সাধারণতঃ সমগ্র ইসলামী বিশ্বে আরব, ওসমানীয় অথবা পারস্যবাসীদের মধ্যে অত্যন্ত প্রকট ও গুরুতর হইয়া উঠে। কিজিলবাসগণ উত্তরাধিকারের ব্যাপারে একে অপরের সহিত যুদ্ধ করেন এবং ক্রমশঃ কিজি-লবাস শ্রেণীর "পরম খাঁটি নেতা" শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। রাশি-য়ার বয়ারদের ন্যায় কিজিলবাস নেতৃবৃন্দ একজন একনায়কত্বের অধিকারী শাহের কেন্দ্রীভূত সরকারের চেয়ে, তাঁহাদের নিজেদের কিছু সংখ্যক নেতার সম্মিলিত ক্ষমতা অধিকতর পছন্দ করিতেন। নবম শতাব্দীর অতীন্দ্রিয়বাদী

শাহ্ মোহাম্মদ খোদা বান্দেহ-এর সময় তাঁহারা বিশেষ সমস্যা হইয়া দাঁড়ায় এবং শাহকে একটি দুর্বল উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিতে প্রভাবান্বিত করেন। তাঁহাদের পরিকল্পনার সাফল্য সুনিশ্চিত করিবার জন্য তাহারা শাহের ভাবী উত্তরাধিকারী ও তাঁহার মাতাসহ অধিকাংশ সাকাঙ্ক্ষীর যুবরাজকে হত্যা করে।

যাহা হউক, ভাবী উত্তরাধিকারী যুবরাজের এক কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে উদ্ধার করা হয় এবং গোপনে তাঁহাকে খোরাসানে লইয়া যাওয়া হয়। কয়েক বৎসর পর এই যুবরাজ অনুগত কিজিলবাসদের সহায়তায় বিবাদমান নেতাদিগকে পরাজিত করেন এবং শাহ্ আব্বাস (১৫৮৭ খ্রীঃ) নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। শাহ্ আব্বাসের সময় ইরান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ক্ষমতার শীর্ষস্থানে আরোহণ করে। এক সহস্র বৎসরের ব্যবধানে অবিকল সাসানীয়দের ন্যায় সুবিস্তৃত এক ভূখণ্ডকে পুনরায় ইরান বলা হয়। এই কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই কারণেই পারস্যবাসীগণ শাহ্ আব্বাসকে গর্ব ও ভক্তি সহকারে স্মরণ করে এবং তাহাকে "মহান" উপাধিতে ভূষিত করে। শাহ্ আব্বাসের সৌভাগ্যবশতঃ এমন এক সময় তিনি রাজত্ব করেন যখন ওসমানীয়দের অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। তিনি কমপক্ষে পাঁচজন সুলতানের সমসাময়িক ছিলেন। উত্তরে রাশিয়া তখন ভয়াবহ আইভানের মৃত্যুর পর "গোলযোগের সময়ে" নিপতিত। শাহ্ আব্বাসের সমসাময়িক ছিলেন ভয়াবহ আইভান, বরিস গডিওনভ্ ও মাইকেল—ইহাদের ভিতর শেষোক্ত জন ছিলেন রোমানভদের লাইনের প্রথম। ফলে শাহ্ আব্বাস ওসমানীয় ও মস্কোবাসী উভয়ের ক্ষতির বিনিময়ে তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন এবং অতি অল্প আয়াসে উত্তরে ট্রান্সক্সিয়ানায় এবং ভারতবর্ষের সিন্ধু মালভূমিতে অনুপ্রবেশ করেন।

ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে শাহ্ আব্বাসের প্রথম কার্যাবলীর মধ্যে একটি হইল, কিজিলবাস সামন্ত প্রভুদের ক্ষমতা হ্রাস করা। তাহাদের প্রতি তাঁহার শত্রুতার কারণ দুই প্রকার: প্রথমতঃ ব্যক্তিগত কারণ, তাহারা তাঁহার মাতা ও ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছিল; দ্বিতীয়তঃ রাজনৈতিক কারণ; তাহারা একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের চেয়ে কিছু সংখ্যক লোকের

সম্মিলিত শাসন কামনা করিত। তিনি নির্দয়ভাবে তাহাদিগকে হত্যা করেন। এতকিছুর পরও তিনি কিজিলবাস বাহিনী প্রতিপালন করেন, কিন্তু তাহাদের হাতিয়ার ছিল চিরাচরিত পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র। তাহাদের সম্মান ক্ষুণ্ন করিবার জন্য তিনি দুইটি বাহিনী গঠন করেন, একটি হইল জর্জিয়া ও আর্মেনিয়ার অধিকাংশ খ্রীস্টান প্রজাদিগকে লইয়া এবং অপরটি হইল পারস্যবাসীদিগকে লইয়া। এই দুইটি বাহিনীকে তিনি আধুনিক বন্দুক ও গোলন্দাজ বাহিনী দ্বারা সুসজ্জিত করেন।

কিজিলবাসদিগকে ধ্বংস করিবার ফলে মোস্তাসুফীবাদও দুর্বল হইয়া পড়ে। শাহ আব্বাস তাঁহার পূর্বপুরুষদের ন্যায় ধর্মান্ধ শীয়া ছিলেন না। শাহ্ তাহ্মাসপ যেখানে খ্রীস্টানদিগকে তাঁহার দরবারে প্রবেশ করিতে দিতেন না; পাছে "কাফের" হিসাবে তাহারা ইহাকে অপবিত্র করিয়া দেয়; সেখানে শাহ আব্বাস বিদেশীদিগকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিবার জন্য এবং তাঁহার খ্রীস্টান প্রজাদের প্রতি সদয় হইবার জন্য সীমা অতিক্রম করিয়া যান। পরবর্তীকালে নিঃসন্দেহে বুঝা যাইবে যে, খ্রীস্টান জাতি-সমূহের সহিত কার্যকলাপে তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রণোদিত ছিলেন; কিন্তু এতদ্ সত্ত্বেও তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা মানসিক ঔদার্য ছাড়া করিতে পারিতেন না।

তাঁহার নতুন রাজধানী ইসফাহানে তিনি বহুসংখ্যক আর্মেনিয়ানকে তাহাদের আবাসভূমি জোলফা হইতে আনয়ন করেন। ইসফাহানের জায়ানদেহ্ রুদ নদীর অপর তীরে তিনি নতুন জোল্ফা শহর নির্মাণ করেন এবং আর্মেনিয়ানদিগকে সেখানে বসবাস করিতে দেন। আরও অনেক আর্মেনিয়ান স্বেচ্ছায় সমগ্র ইরানে আসিয়া বসবাস করে। এশিয়া মাইনরের আর্মেনিয়ানদিগকে তাঁহার অধীনস্থ করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে জামিন হিসাবে সম্ভবতঃ শাহ আব্বাস এইসব আর্মেনিয়ানদিগকে আনয়ন করেন। তাহা সত্ত্বেও ইরানে আগমনের পর আর্মেনিয়ানদিগকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় এবং তাহাদের মুসলিম প্রতিবেশীদের উপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিতে দেওয়া হয়। তাহারা তাহাদের নিজস্ব বাড়ীর মালিক হইতে পারিত, ঘোড়ায় চড়িতে পারিত এবং যে কোন প্রকারের কাপড় পরিধান করিতে পারিত। ইহা এমন সুবিধা যাহা শাহ আব্বাসের

পূর্বে এবং পরে আধুনিক যুগ পর্যন্ত অমুসলিমগণ উপভোগ করিতে পারে নাই। ইরানের ব্যবসার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানীযোগ্য কাপড় সিল্ক, শাহের একচেটিয়া হইয়া যায় এবং আর্মেনিয়ান ব্যবসায়ীগণ ইহা তাঁহার জন্য পরিচালনা করে। খ্রীস্টানদের সঙ্গে সদয় হইয়া এবং ক্যাথলিক মিশনগুলিকে ইরানে বাস করিবার অনুমতি দান করিয়া, তিনি ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে ইউরোপের বন্ধুত্ব প্রত্যাশা করেন, পারস্য উপসাগরে অনেকগুলি ইউরোপীয় জাহাজের অবস্থানের সুযোগ গ্রহণ করিতে চান এবং ওসমানীয়দের নিকট হইতে ব্যবসা ছিনাইয়া লইতে আশা করেন। বস্তুতঃ চাতুরীমূলক মন্তব্য ও ইঙ্গিতের দ্বারা তিনি রোমের কিছুসংখ্যক খ্রীস্টান পাদ্রীকে বিশ্বাস করাইতে সক্ষম হন যে তিনি খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করিতে একরূপ প্রস্তুত। এক সময় তিনি এমন কি ইহা জানাইয়াও দেন যে তাঁহার রাজ্যের যেকোন মুসলমান ইচ্ছা করিলে খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করিতে পারে।

শাহ আব্বাস অবশ্য একজন শীয়া মুসলমান ছিলেন এবং ওসমানীয়দের সুন্নী মতের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইরানের শীয়া মতবাদ সুদৃঢ় করিবার নীতি চালাইয়া যান। কয়েক বৎসরের মধ্যে পারস্যবাসীদের জাতীয়তাবাদ ধর্মীয় ভাব ধারণ করে এবং শীয়া মতবাদ ও পারস্য জাতীয়তাবাদ এক এবং অভিন্ন হইয়া উঠে।

শাহ আব্বাস মাশ্‌হাদে অষ্টম ইমাম আলী আল-রিযার কবরের উপর একটি অতি সুন্দর সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন এবং এই সৌধের নির্মাণ কাজ শেষ হইলে ইসফাহান হইতে পদব্রজে সেখানে তীর্থগমন করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেন। পরবর্তীকালে মাশহাদে তীর্থযাত্রা মক্কা ও হোসাইনের কবর কারবালায় তীর্থযাত্রার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে। যে ব্যক্তি মাশহাদে গমন করে তাহাকে "মাশহাদী" উপাধি দেওয়া হয় এবং মক্কা গমনকারী হাজী ও কারবালায় গমনকারী কারবালী-এর ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ হইয়া যায়। প্রথম ইমাম আলীর প্রতি তাঁহাদের আনুগত্য প্রদর্শন করিবার জন্য সাফাভীয় শাহগণ নিজদেরকে 'আলীর চৌকাঠের কুকুর' (dog of the threshold of Ali) হিসাবে উল্লেখ করেন।

বাণিজ্য ও শিল্প পুনরুজ্জীবনের জন্য শাহ আব্বাস অনেকগুলি কার্যক্রম

অবলম্বন করেন। বাণিজ্য পথের উভয় পার্শ্বে তিনি বহু সরাইখানা ও অতিথিশালা নির্মাণ করেন। দেশের সর্বাঞ্চলের অসৎ সরকারী কর্মকর্তাদের সহিত তাঁহার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত কঠোর এবং এই জন্যই তিনি যে সাধারণ লোকের নিকট খুবই জনপ্রিয় ছিলেন এই কথা এক প্রকার নিঃসন্দেহে বলা যায়। জনসাধারণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য ছদ্মবেশে জনগণের মধ্যে তাঁহার বিচরণ করিবার অভ্যাস অনেকগুলি গল্পের সূত্রপাত করিয়াছে, যেগুলি আজও পারস্যে দাদীআম্মাগণ তাহাদের দৌহিত্রদিগকে শোনায়। তাঁহার যুগের অন্যান্য সম্রাটদের ন্যায় তিনিও অত্যাচারী ছিলেন এবং বহু লোককে তাঁহার আদেশে হত্যা করা হয়। তাঁহার পাঁচ পুত্র ছিল। ইহাদের মধ্যে দুইজন স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেন, অবশিষ্ট তিনজনের একজনকে হত্যা করা হয় এবং দুইজনকে তাঁহার আদেশে অন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। পুত্রদের বিরুদ্ধে প্রায় সবগুলি অপরাধই ছিল ভিত্তিহীন। ১৬২৯ খ্রীস্টাব্দে শাহ আব্বাসের মৃত্যু হইলে তাঁহার সমসাময়িক ভয়াবহ আইভানের ন্যায় তাঁহার কোন উপযুক্ত উত্তরাধিকারীই অবশিষ্ট ছিল না, কারণ তিনি তাহাদের সবাইকেই হত্যা করেন।

সুন্নী ধর্মতন্ত্রের ন্যায় শীয়া ধর্মতন্ত্রও উলামাদের দ্বারা সাহায্যপুষ্ট হয়। ওসমানীয়দের শেখ উল-ইসলামের সমপর্যায়ে সাফাভীয়দের ছিল মোল্লা-বাশী যিনি সমস্ত উলামাদের প্রধান ছিলেন। তিনি অপর তিনজন বা চারিজনের ন্যায় মুজতাহিদ ছিলেন; অর্থাৎ লুক্কায়িত ইমামের প্রতিনিধি হিসাবে যে কোন বিষয়ে তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিবার অধিকার ছিল। লুক্কায়িত ইমামই ছিলেন সত্যিকারের রাষ্ট্রপ্রধান। এইভাবে শীয়াগণ সুন্নীদের মত নিজেদিগকে শরীয়তের দ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে নাই, যদিও ইহা তাহাদিগকে কোন অংশে কম রক্ষণশীল করে নাই। উলামা-দিগকে আইন ও ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখিবার ব্যাপারে শাহ্ আব্বাস যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন এবং তাঁহাদিগকে তাঁহার রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিক কার্যাবলীতে হস্তক্ষেপ করিতে দেন নাই। বিদেশী দূতগণ আগমন করিলে দূতদের সম্মানে আয়োজিত অভ্যর্থনায় সাধারণতঃ উলামাগণ উপস্থিত থাকিতেন না। কখনও কখনও তাঁহারা এইসব অভ্যর্থনায় উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু সাধারণতঃ মদ্য পরিবেশন অথবা অতিথিদের

চিত্তবিনোদনের জন্য সঙ্গীত পরিবেশন আরম্ভ হইবার পূর্বে তাঁহারা ভোজ-সভা ত্যাগ করিতেন। কিন্তু শাহ্ আব্বাসের বংশধরগণ উলামাদের নিকট ক্ষমতা হারাইয়া ফেলেন। শাহ সুলতান হোসাইন ধর্মের দিক হইতে এমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিলেন যে উলামাদের উপদেশ ব্যতীত তিনি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন না। এই দুর্বল ও মতামতহীন শাহ আফগানদের নিকট তাঁহার সাম্রাজ্যের অধিকাংশ এলাকা হারাইয়া ফেলেন। দ্বিতীয় তাহ্মাসপও তেমন উত্তম ছিলেন না। সৌভাগ্যের সৈনিক নামে পরিচিত "ইরানের নেপোলিয়ন" শাহ্ নাদিরের উত্থান না হইলে সমগ্র সাম্রাজ্যই বিলুপ্ত হইয়া যাইত। নাদিরের কৃতিত্ব অধিককাল স্থায়ী না থাকিলেও ইহা এমন সময় আত্মপ্রকাশ করে যখন ইহা ইরানকে অবিচ্ছিন্ন স্থিতি-শীলতা দান করে এবং একটি শক্তিশালী সরকারসহ অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত টিকিয়া থাকিতে সহায়তা করে।

নাদির ছিলেন একজন তুর্কী এবং আফশার গোত্রের সহিত সম্পর্কযুক্ত। আফশার সাফাভীদের প্রতি অনুগত একটি তুর্কী গোত্র। ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং সাফাভীয় সেনাবাহিনীতে তিনি একজন অফিসার ছিলেন। সাফাভীদের দুর্বলতার ফলে ওসমানীয়গণ সুন্নী আফগানদের দ্বারা ইরান আক্রমণ করাইতে উৎসাহিত হয়। তাহাদের সাফল্য প্রসিদ্ধ পিটারের অধীনস্থ রুশ ও তৃতীয় আহমদের অধীনস্থ ওসমানীয়দের ক্ষুধা নিবৃত্ত করে। ১৭২৫ খ্রীস্টাব্দে পিটারের মৃত্যুর ফলে রুশগণ তাহাদের পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে, কিন্তু ওসমানীয়গণ তাহাদের শত্রুতা অব্যাহত রাখে এবং প্রথম মাহমুদই ১৭৩১ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় শাহ তাহ্মাসপকে পরাজিত করেন। ১৭৩২ খ্রীস্টাব্দে শান্তি চুক্তির মাধ্যমে ইরান ককেসাসে পাঁচটি নগর ত্যাগ করে।

এই সমস্ত ঘটনায় নাদির সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাই শাহের বিরুদ্ধে তিনি একটি বিদ্রোহ পরিচালনা করেন এবং শাহের শিশুপুত্র তৃতীয় আব্বাসকে শাহ হিসাবে এবং রাজপ্রতিনিধি হিসাবে মনোনীত করেন। তিনি অতঃপর চুক্তিভঙ্গ করেন এবং ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। ১৭৩৬ খ্রীস্টাব্দে শিশু শাহ মৃত্যুবরণ করেন এবং নাদির স্বয়ং ক্ষমতা দখল না করিয়া বিভিন্ন গোত্রের নেতৃবৃন্দ এবং জনগণের প্রতিনিধিদিগকে

একত্রিত করেন, যাহাতে তাঁহারা তাঁহাকে শাহ হইবার জন্ত অনুরোধ করিতে পারেন।

আজারবাইজানের দাস্ত-এ-মোঘাঁ-এ এই বিরাট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আর্মেনিয়ান ক্যাথলিকাস নামক একজন প্রত্যক্ষদর্শী এই সম্মেলনের বিশদ বর্ণনা দান করেন। তাঁহাকে এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। তাঁহার ধারণা অনুসারে এক সহস্র প্রতিনিধি ইহাতে অংশ গ্রহণ করে। নাদের ঘোষণা করেন যে তিনি দেশকে বিদেশী আক্রমণকারীদের হাত হইতে মুক্ত করিয়াছেন, তিনি "বৃদ্ধ ও পরিশ্রান্ত" হইবার দরুণ খোরাসানে অবসর বিনোদন করিতে চান। তিনি তখন ৪৮ বৎসর বয়স্ক। শাহ হইবার জন্ত একজন উপযুক্ত ব্যক্তি নির্বাচিত করা তখন প্রতিনিধিদের জন্ত কর্তব্য হইয়া পড়ে। পরদিন প্রতিনিধিদল তাঁহার তাঁবুর সম্মুখে একত্রিত হন এবং বলেন যে তাঁহারা বিষয়টি আলোচনা করিয়াছেন এবং তাঁহার চেয়ে উপযুক্ত কোন ব্যক্তি তাঁহারা লাভ করিতে পারেন নাই। নাদির অতঃপর এইরূপ একটি দৃশ্যের অবতারণা করিবার মুখ্য উদ্দেশ্যে আসেন। তিনি বলেন যে, তিনটি শর্তসাপেক্ষে তিনি সিংহাসন গ্রহণ করিতে পারেন ঃ

১। সাফাভীয় বংশের কোন সদস্যকে সাহায্য না করিবার স্বপক্ষে তাঁহাদিগকে রাজী হইতে হইবে।

২। তাঁহার পুত্রকে আইনানুগ উত্তরাধিকারী হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে।

৩। প্রথম তিন খলিফাকে তাঁহারা অভিশাপ দিবে না এবং সুন্নীদিগকে অত্যাচার করিবে না।

এই শর্তগুলি গ্রহণ করা হয় এবং ১৭৩৬ খ্রীস্টাব্দের ৮ই মার্চ তিনি শাহ হিসাবে অভিষিক্ত হন।

নাদির শাহ শীয়াও ছিলেন না সুন্নীও ছিলেন না, বরং একজন স্বাধীন মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শীয়া উলামাদের ক্ষমতা খর্ব করা এবং নিজেকে অন্ততঃপক্ষে সাময়িকভাবে হইলেও পূর্বদিকে তাঁহার ব্যস্ত থাকাকালীন সময়ে ওসমানীয়দের হাত হইতে রক্ষা করা। ১৭৩৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষের মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা

করেন। তিনি গজনী, কাবুল ও লাহোর অধিকার করেন। ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দের ২০শে মার্চ, তিনি ভারতবর্ষের মুহাম্মদ শাহকে পরাজিত করেন এবং দিল্লীতে প্রবেশ করেন। এই অভিযানে তিনি দুইটি মূল্যবান সিংহাসন, তন্মধ্যে একটি প্রসিদ্ধ ময়ূর সিংহাসন ছাড়াও তাঁহার সঙ্গে করিয়া প্রসিদ্ধ মুক্তা কোহ্-এ-নূর এবং আরও অনেক ধনসম্পদ আনয়ন করেন, যাহার ফলে তিন বৎসরের জন্য তিনি পারস্যবাসীদিগকে কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দিতে সক্ষম হন। রুশ ও ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে তিনি সাফল্যজনক অভিযান পরিচালনা করেন, কিন্তু এইগুলি বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই। কারণ তাঁহার চরিত্র পরিবর্তন হইয়া যায়, তিনি সন্দেহ পরায়ণ ও নিষ্ঠুর হইয়া যান। স্বীয় পুত্রকে তিনি অন্ধ করিয়া ফেলেন। ১৭৪৭ খ্রীস্টাব্দের ২০শে জুন তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন।

অদৃষ্টের পরিহাস তাঁহার গুপ্তহত্যার কারণ তাঁহার চরিত্রহীনতা নহে, কিন্তু তাঁহার ধর্ম। নাদির শাহ্ ছিলেন একজন স্বাধীন মতাবলম্বী। তিনি সমস্ত ধর্মকে একত্রীভূত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি পুরাতন ও নতুন টেস্টামেণ্টদ্বয়কে ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করিবার আদেশ প্রদান করেন। পবিত্র কোরানকেও তিনি ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করান। সমস্ত ধর্মের প্রতিনিধিদিগকে তিনি ইরানে একত্রিত করেন এবং তাহাদিগকে বলেন যে, খোদা যদি এক হইয়া থাকেন তবে ধর্মও একটি থাকা উচিত। তিনি স্বয়ং মুহম্মদ (সঃ) ও আলীর সমকক্ষ বলিয়া দাবী করিবার ফলে শীয়া ও অন্যান্য মুসলমানদের বিরাগভাজন হন। তিনি বলেন "তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁহাদের যুদ্ধের সাফল্যের ফলে এবং যুদ্ধের দ্বারা আমি এই পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছি।"[১] ইসলামকে একত্রীভূত করিতে তিনি আগ্রহী হন। এই উদ্দেশ্য হাসিল করিবার জন্য ওসমানীয় সুলতান প্রথম মাহমুদের নিকট একটি পাঁচ ধারার প্রস্তাব প্রেরণ করেন :

১। শীয়া মতবাদকে সরকারীভাবে ইসলামের পঞ্চম চিন্তাধারার পীঠস্থান বলিয়া স্বীকার করা হউক ;[২]

২। মক্কায় শীয়াদের বিশেষ স্থান দেওয়া হউক ;

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ৯৫ (মূল গ্রন্থ)।

২। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১০৫ (মূল গ্রন্থ)।

৩। প্রত্যেক বৎসর ইরান হইতে হজ্বের জন্য একজন বিশেষ নেতা, আমীর আল-হাজ্ব প্রেরণ করা উচিত ;

৪। ওসমানীয় ও পারস্যবাসীগণের মধ্যে যুদ্ধবন্দী বিনিময় করা উচিত ;

৫। ওসমানীয় ও পারস্যবাসীগণের মধ্যে দূত বিনিময় করা উচিত।

নাজাফের শীয়া নেতৃবৃন্দ এই খবরে বিচলিত হইয়া পড়েন। তাহারা এই ব্যবস্থাগুলির বিরোধিতা করেন এবং নাদির শাহের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ পরিচালনা করেন যাহা তাঁহার গুপ্তহত্যায় পরিসমাপ্তি প্রাপ্ত হয়। নাদির শাহের ব্যর্থতা প্রমাণ করে যে, পারস্যবাসীগণ শীয়া মতবাদের প্রতি কত-দূর গভীরভাবে আস্থাশীল ছিল।

নাদির শাহের মৃত্যু আরও বিশৃঙ্খলা ও যুদ্ধবিগ্রহের সূচনা করে। একটি সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য মনে হইল করিম খান জান্দ-এর নেতৃত্বে শিরাজের একটি পারস্য বংশ এই অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু তাহার অসময়ে মৃত্যুর ফলে উত্তরের তুর্কী কাজার বংশের আগা মুহাম্মদ ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দে ক্ষমতা হস্তগত করিবার সুযোগ লাভ করেন। কাজার শাসনামলের ইরানের ইতিহাস মধ্যপ্রাচ্যে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের অন্তর্ভুক্ত। ইহা পরে আলোচনা করা হইবে।

সপ্তদশ অধ্যায়

দুই শতাব্দীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক

মোঙ্গল আক্রমণ ও বাগদাদের পতন ইরানের স্বতন্ত্রতাকে খতম করে এবং ইহাকে ধর্মযাজক, ব্যবসায়ী, কুটনীতিবিদ ও দুঃসাহসিক কার্যের নায়ক—এইসব ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে আনয়ন করে। ক্রুসেডারগণ ইরান ও পশ্চিমের বাকী মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য সম্পর্কে সজাগ হয় এবং তাহারা ইরানের শাসকদিগকে সিরিয়ার বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করিতে সচেষ্ট হয়। ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য ইউরোপীয়গণ ইলখান ও তিমুরীয়দের নিকট ধর্ণা দেয়। এই সম্পর্ক উভয়পক্ষের জন্য লাভজনক হয় এবং মহান শাহ আব্বাস ইহাকে আরও সুদৃঢ় করেন।

ইহার অর্থ এই নহে যে ইউরোপীয় দেশসমূহ ও ওসমানীয়দের মধ্যে কোন বাণিজ্যিক বা কুটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। ইউরোপের অনেক দেশ ওসমানীয়দের সঙ্গে ব্যবসা করিবার জন্য একে অপরের প্রতি ঈর্ষান্বিত ছিল। তবে তুর্কীগণ আরও শত্রুভাবাপন্ন হইলে এবং পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির স্বাধীনতা বিপন্ন করিলে, এই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। শান্তির সময় তথায় কুটনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকিত এবং দূত বিনিময় হইত। প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ চলা সত্ত্বেও ভেনিস দীর্ঘকাল ওসমানীয়দের সঙ্গে ব্যবসা চালাইয়া যায়। তবে এইসব সম্পর্ক হয়ত যুদ্ধের ফলে বিনষ্ট হইত অথবা সর্বদাই বিনষ্ট হইবার উপক্রম হইত। সাধারণতঃ যেসব দেশের বিরুদ্ধে সুলতান বিবাদ আরম্ভ করেন, সেসব দেশের দূতদিগকে বন্দী করা হয়। তদুপরি ওসমানীয়গণ সর্বদাই সজাগ ছিল যে, ইসলাম প্রচার ও বিস্তার লাভের জন্য তাহারা আল্লাহর নিকট হইতে আদিষ্ট হইয়াছে। ফলে, যে সম্পর্কই থাকুক না কেন, উহা খুবই শোচনীয় ছিল এবং পারস্পারিক চুক্তি দ্বারা সেই সম্পর্ক দৃঢ়বদ্ধ ছিল না।

তবে ইরানের ক্ষেত্রে অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাফাভীয়গণ অত্যন্ত ধর্মান্ধ অবস্থায়ও কখনও ধারণা করিত না যে, তাহারা কাফেরদিগকে দীক্ষিত করিবার জন্য আল্লাহর নিকট হইতে আদিষ্ট হইয়াছে। পক্ষান্তরে তাহারা আদিষ্ট হইবার বিষয় অনুভব করিলেও মনে করিত যে ইহা সুন্নীদিগকে দীক্ষিত বা ধ্বংস করিবার জন্য। বিপথগামী ওসমানীয়দিগকে তাহারা বা কাফের খ্রীস্টানেরা—যে-ই ধ্বংস করুক না কেন, তাতে কিছুই আসিত যাইত না। ইউরোপীয়দের উদ্দেশ্যও যেহেতু ওসমানীয় শক্তিকে ধ্বংস করা ছিল, সেহেতু পারস্যে ইউরোপীয়গণ একে অপরের প্রতি সমতার ভিত্তিতে অগ্রসর হইত। ইরান ইউরোপীয়দের নিকট প্রয়োজনীয় ছিল, বা অন্ততঃপক্ষে তাহারা প্রয়োজনীয় মনে করিত—ওসমানীয়দের চাপ প্রতিরোধ করিবার জন্য। ইউরোপ পারস্যবাসীদের নিকট প্রয়োজনীয় ছিল ওসমানীয়দিগকে যুদ্ধে ব্যস্ত রাখিবার জন্য এবং আরও গুরুত্ব সহকারে মধ্যপ্রাচ্যের ব্যবসা একচেটিয়া করিবার জন্য।

ইসলামের উপর পৌত্তলিক মোঙ্গলদের চমকপ্রদ বিজয় ইউরোপীয়-দিগকে মোঙ্গলদের সহিত একটি সমঝোতায় উপনীত হইতে উৎসাহ প্রদান করে, যাহাতে তাহারা একদিকে ইসলামের অভিযানমূলক স্বভাবের মোকাবিলা করিতে পারে ও অপরদিকে মোঙ্গলদিগকে খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত করিতে পারে। পোপ চতুর্থ ইনোসেণ্ট মোঙ্গলদের নিকট দুইটি দূত প্রেরণ করেন। এইগুলির একটিতে নেতৃত্ব প্রদান করেন ইটালীয়ান পাদ্রী জীওভ্যানী ডি পিয়ানো কার্পিনী। ১২৪৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি মোঙ্গলীয়া পৌঁছেন এবং ওগতাই তাঁহার পিতা চেঙ্গিস খানের উত্তরাধিকারী নির্বা-চনের সময় তিনি তথায় উপস্থিত ছিলেন। ফ্রান্সের রাজা সেণ্ট লুই (১২২৬—১২৭০ খ্রীঃ) মোঙ্গলদের সহিত বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন এবং তাহাদের নিকট একটি দূতদল প্রেরণ করেন।

আব্বাসীয়দের পতনের পর ইউরোপীয়গণ ইরানে অভিনন্দিত হইয়াছে বলিয়া অনুভব করে এবং ব্যাপক সংখ্যায় ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে তথায় আগমন করে। ইহাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন মার্কো পোলো (১২৫৪—১৩২৪ খ্রীঃ) যাহার দুঃসাহসিক কার্যাবলীর লিপিবদ্ধ রূপ অনেক ইউরোপীয়দের পূর্বদিকে ভ্রমণ করিবার আগ্রহ উজ্জীবিত

করিবার জন্ম যথেষ্ট কাজে আসিয়াছে। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সাংগঠনিক বৎসরগুলিতে ইউরোপীয়গণ এই নতুন শক্রর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করে এবং ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করা অধিক পছন্দ করে। গাজান খানের (১২৯৫—১৩০৪ খ্রীঃ) রাজত্বকালে অবরুদ্ধ কনস্ট্যান্টিনোপলের তুলনায় ইরানই এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেনের কেন্দ্র হিসাবে বিরাজ করে। তাব্রিজ ছিল তখন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা কেন্দ্র।

তৈমুরের দরবারে ক্যাস্টিলের স্পেনীয় শাসকদের প্রেরিত দূতদের কথা ইতিমধ্যে আলোচনা করা হইয়াছে।[১] আংকারার বায়েজীদের বিরুদ্ধে তৈমুরের একটি অভিযান পরিচালনার প্রাক্কালে তাহারা আগমন করে। তাহারা সেই যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করে এবং বিজয়ী আমীরের সঙ্গে পরে সমরকন্দ গমন করে। ইহা এবং অন্যান্য দূতদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা সেই যুগের মধ্যপ্রাচ্যের জীবন ও সংস্কৃতি পাঠ করিবার পক্ষে অতি চমৎকার উপাদান।

সাফাভীয় নীতির ভিত্তি ছিল ওসমানীয়দের প্রতি শক্রতার উপর। ইরানে জাতীয় চেতনা দুর্বল হইয়া পড়ে বিশেষতঃ মোঙ্গলদের ধ্বংস কার্য দ্বারা। তখন হইতে জনসাধারণ ধর্মের প্রতি অধিক অনুরক্ত হইয়া পড়ে। সাফাভীয়গণ এই ভাবধারাকে ব্যবহার করে এবং শীয়া মতবাদকে নতুন প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করে। সাফাভীয়গণ ইরানকে বাকী মুসলিম বিশ্ব হইতে পৃথক করিয়া ফেলে এবং ইউরোপীয়দের বন্ধুত্ব লাভ করে। শাহ আব্বাস বিশেষভাবে খ্রীস্টান আর্মেনিয়ানদের সহায়তা করে, যাহাদিগকে তিনি ইসফাহানে আনয়ন করেন। তিনি তাহাদের জন্ম গীর্জা নির্মাণ করেন এবং তাহাদিগকে বাণিজ্যিক সুবিধাদি ও ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করেন। তাহাদিগকে আমদানী ও রপ্তানী কর প্রদান হইতে অব্যাহতি দেওয়া হয়। পর্তুগীজ, স্পেনীয়, ডাচ, ইংরেজ, রুশ, ফরাসী ও ভারতীয় ব্যবসায়ীগণ ইরানে ব্যবসা করে। এমন কি ওসমানীয় ব্যবসায়ীগণ শান্তির সময় ইরানে বাণিজ্যিক কাজকারবার করাটাকে লাভজনক বিবেচনা করিত।

অর্থনৈতিক দিক হইতে পারস্যবাসীদের জন্ম ইহা ছিল সুসময়, কারণ

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১৪২ (মূল গ্রন্থ)

বাণিজ্যিক পথ ভূমধ্যসাগর হইতে সরিয়া যায়। ইউরোপীয়গণ অন্যান্য পথের সন্ধানে ছিল। পর্তুগালের নাবিক, হেনরী মুসলমানদের নিকট হইতে পশ্চিম আফ্রিকার বাণিজ্য অধিকার করিবার জন্য এবং ভারতবর্ষের সহিত ব্যবসা খুলিবার জন্য অন্তরীপের (কেপ) পথ ব্যবহার করে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পর্তুগীজগণ ভারতবর্ষ হইতে মসলা আমদানী আরম্ভ করে এবং নিজদিগকে পারস্য উপসাগরে প্রতিষ্ঠিত করে।

১৫০৭ খ্রীস্টাব্দে শাহ ইসমাইলের রাজত্বকালে এডমিরাল আলবুকার্কের অধীনে পর্তুগীজ নৌবহর পারস্য উপসাগরের হরমুজে অবতরণ করে। তাহারা হরমুজ, বাহ্‌রাইন ও মস্কটে বাণিজ্য ঘাঁটি স্থাপন করে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে হরমুজ ছিল বিশ্বের অতি প্রসিদ্ধ রাজ্যগুলির মধ্যে অন্যতম। মিলটন তাঁহার 'প্যারাডাইস লস্ট' নামক গ্রন্থে ইহার গৌরব লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। মিসরের মামলুকগণ এবং ভেনিসের ব্যবসায়ীগণ, যাহারা স্থলপথে ভূমধ্যসাগরের ব্যবসায়ে লাভবান হইয়াছিল, তাহারা এখন অবহেলিত হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহার ফলে সিনাই পর্বতের সেণ্ট ক্যাথারিন মঠের এ্যবটকে The Abbot of St, Catherine's Monastery at Mt. Sinai) রোমে পাঠানো হয়। মামলুকগণ ভেনিসসহ পারস্য উপসাগরে পর্তুগীজদিগকে ব্যবসা করিতে বারণ করিবার জন্য পোপকে রাজী করাইতে চেষ্টা করে। মামলুকগণ এইজন্য খ্রীস্টানদের পবিত্র স্থানগুলি ধ্বংস করিবার হুমকিও প্রদান করে।

প্রতিনিধিদল প্রেরণ বা হুমকির দ্বারা কোন ফল না হইলেও, কাহারও নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে আসা উচিত নহে যে, ল্যাভাঁর স্থলপথের ব্যবসা অকেজো হইয়া পড়িয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর অধিকাংশ সময়ে প্রাচ্যের সিল্ক, মসলা, রং ও ঔষধাদির প্রধান কাফেলার স্থান হিসাবে আলেপ্পো তখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসাকেন্দ্রের মর্যাদা লাভ করে। তবে ইহা বেশী দিন স্থায়ী হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং সমগ্র সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রধান বাণিজ্য পথ ছিল জলপথে এবং পূর্ব-ভূমধ্যসাগর একটি অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

শাহ ইসমাইলও পর্তুগীজদের হরমুজ অধিকারের বিরোধিতা করেন। কিন্তু এক বৎসরের সলাপরামর্শের পর ১৫০৮ খ্রীস্টাব্দে আলবুকার্কের সহিত

একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। পারস্য উপসাগরের পর্তুগীজ প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতি পারস্যের স্বীকৃতির বিনিময়ে পর্তুগীজগণ ইরানকে বাহ্‌রাইন দখল করিবার এবং বেলুচিস্তান ও মাকরানের উপকূলে জলদস্যুদিগকে দমন করিতে সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দান করে। তাহারা ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে একে অন্যকে সাহায্য করিতে রাজী হয়। ১৫৬১ ও ১৫৭৪ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগীজগণ যথাক্রমে প্রথমে শাহ্ তাহ্মাস্প্ ও দ্বিতীয় শাহ্ ইসমাইলের নিকট দূত ও উপঢৌকনাদি প্রেরণ করে। এই উভয় সম্রাটই ছিলেন ধর্মান্ধ মুসলমান এবং তাঁহারা "কাফেরদের" সঙ্গে কখনও ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক পছন্দ করিতেন না। তবে, ভাল সম্পর্ক ও ব্যবসা সমানে চলিতে থাকে।

স্পেন পর্তুগালকে গ্রাস করিবার পরও পারস্য উপসাগরে বাণিজ্য কুঠি ও কারখানাগুলির কাজ চালু থাকে। স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ (রাজত্বকাল ১৫৫৬–১৫৯৮ খ্রীঃ) ইরানে পিয়ার সায়মন মোর‍্যাল্‌স্-এর নেতৃত্বে একটি দূত দল প্রেরণ করেন। পিয়ার সায়মন ফার্সী জানিতেন। ফিলিপ তিনটি অনুরোধ জ্ঞাপন করেন ঃ (১) ইরান ক্যাথলিকদিগকে ধর্মীয় স্বাধীনতা দান করুক ; (২) ইরান স্পেনীয়দিগকে বিশেষ সুবিধাদি দান করুক ; (৩) ইরান ওসমানীয়দের সহিত কোন শান্তি চুক্তি সম্পাদন হইতে বিরত থাকুক। দৃশ্যতঃ এইসব অনুরোধ ছিল সাফাভীয় নীতির অনুকূলে। প্রত্যুত্তরে একই পাদ্রীসহ একটি পারস্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করা হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ 'বঁ ভয়েস' নামক সেই জাহাজটি পথিমধ্যে হারাইয়া যায়।

১৫৯৮ খ্রীস্টাব্দে দুইজন পর্তুগীজ পাদ্রী, একজন ফ্রান্সিসীয়, আলফন্সো করডেরো এবং আরেকজন ডোমেনিকান, নিকোলে ডি মেলো ইসফাহানে আসেন। শাহ্ আব্বাস তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। শেষোক্ত জনকে শাহ একটি মুক্তাখচিত ক্রুশ উপহার প্রদান করেন। একটি গীর্জা ও ধর্মীয় ভবন নির্মাণের জন্য এই পাদ্রীদেরকে জমিও বরাদ্দ করা হয় এবং অনেক বৎসর ধরিয়া তাঁহারা ধর্মীয় কাজ চালাইয়া যান। ইরানকে ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার জন্য স্পেন বিশেষভাবে উদগ্রীব ছিল এবং শাহ আব্বাস কামনা করিতেন যে স্পেন ওসমানীয়দিগকে সমুদ্র পথে ব্যতিব্যস্ত করুক। খ্রীস্টানদের বিবাদ-বিসম্বাদের মধ্যস্থতা করিবার

জন্যও তিনি ফিলিপকে অনুরোধ করেন। কিছু শর্ত সাপেক্ষে হরমুজের মাধ্যমে ইরানের সমস্ত সিল্ক রফতানী করিতেও তিনি রাজী ছিলেন।

ইংল্যাণ্ডের রাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে বৃটিশেরা দেখিল যে পর্তু-গীজ ও স্পেনীয়গণ অন্তরীপের (কেপ) পথ একচেটিয়া করিয়া ফেলিয়াছে; তাই তাহারা রাশিয়ার মধ্য দিয়া উত্তরের পথে বাণিজ্য প্রচেষ্টা চালায়। এই পথের সুবিধা ছিল এই যে ইহা তাহাদিগকে ইরানে লইয়া যাইবে এবং চীনের শীতল এলাকার পথও মুক্ত করিবে; যেখানে ইংরেজদের পশমী কাপড়ের উত্তম বাজার পাওয়া যাইবে বলিয়া তাহারা আশা করে। ভয়াবহ আইভানের দরবারের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া ১৫৫৩ খ্রীস্টাব্দে বৃটিশ মস্কভী কোম্পানী গঠন করে। ১৫৬১ খ্রীস্টাব্দে এই কোম্পানীর প্রতিনিধি এন্থনী জেংকিন্‌সন মস্কো, অষ্ট্রাখান ও কাস্পিয়ান সাগরের পথে সাফাভীর প্রথম শাহ তাহ্‌মাস্‌পের রাজধানী কাজভীনে গমন করেন। জেংকিন্‌সন শাহ কর্তৃক উত্তমরূপে সংবর্ধিত হন নাই, কারণ শাহ তাঁহার দরবারে কাফের-দিগকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতে ইতস্ততঃ করেন। আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হইল মস্কো হইতে কাস্পিয়ানের পথ ছিল দুর্যোগপূর্ণ ও ব্যয়সাপেক্ষ। এই জন্য কোম্পানী কোন লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। তদুপরি তাহারা আবিষ্কার করে যে মোগলগণ ইংরেজদের পশমী বস্ত্র ব্যবহার করিতে তেমন আগ্রহী নহে। ১৫৯১ খ্রীস্টাব্দের দিকে বৃটিশগণ অন্তরীপের পথ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে।

শাহ আব্বাসের সময় এন্থনী শার্লী ও তাঁহার ১৮ বৎসর বয়স্ক ভ্রাতা রবার্ট নামে দুইজন ইংরেজ যুবক ইরানে আসেন। তাঁহারা ছিলেন সাম-রিক প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী দুঃসাহসিক অভিযাত্রী, কোন ব্যব-সার সঙ্গে যাহাদের কোন সংস্রব ছিল না। শাহ্ আব্বাস তাঁহাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং নিঃসন্দেহে তাঁহাদের দ্বারা তাঁহার সেনাবাহিনীকে উন্নত করিবার ও ইউরোপীয়দের সহিত ঘনিষ্ট হইবার উপায় দেখিতে পান। শাহ কর্তৃক তাঁহারা সামরিক উপদেষ্টা হিসাবে নিযুক্ত হন এবং উভয়ে ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। রবার্ট শার্লী পারস্যের একজন খ্রীস্টান মেয়েকে বিবাহ করেন এবং সারাজীবন ইরানে অতিবাহিত করেন।

১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দে শাহ আব্বাস ইউরোপে একটি বিরাট প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। পারস্যের দূত হোসেন আলী বায়াত এন্থনী শার্লীর সমভিব্যাহারে রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, স্পেন ও ইংল্যাণ্ডের শাসকবৃন্দ এবং পোপের নিকট পত্র লইয়া যান। পত্রে শাহ এন্থনীকে একজন "প্রিয় ভ্রাতা" হিসাবে পরিচয় দেন, যিনি স্বেচ্ছায় ইরানে আগমন করেন এবং যাঁহার সঙ্গে "একই প্লেট হইতে আমরা আহার করি এবং একই পাত্র হইতে মদ পান করি।" সমগ্র দলের সঙ্গে একজন মোল্লা (শীয়া আলেম), দুইজন বা তিনজন ক্যাথলিক পাদ্রী, পাঁচজন দোভাষী, চৌদ্দজন চাকর, চারিজন দারোয়ান এবং বত্রিশটি উট বোঝাই উপঢৌকনসমূহও প্রেরণ করা হয়।

কাস্পিয়ান সাগর অভিমুখে ৫০০ মাইল ভ্রমণ করিতে এই দলের এক-মাস সময় অতিক্রান্ত হয় এবং আরও দুইমাস সময় লাগে সমুদ্র পার হইতে। রাশিয়ায় তাহারা বরিস গডিওনভের আতিথ্য গ্রহণ করে এবং ছয় মাসের দুরূহ অভিজ্ঞতার পর আর্চেঞ্জেলের পথে ইউরোপ গমন করে। ১৬০০ খ্রীস্টাব্দের শীতকালে তাহারা প্র্যাগ পৌঁছে এবং দ্বিতীয় রুডল্‌ফ কর্তৃক অভ্যর্থনা লাভ করে। রাজা ওসমানীয়দের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য শাহের প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং প্রতিনিধিদলকে আর বেশী দূর অগ্রসর না হইবার প্রস্তাব প্রদান করেন। এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া প্রতিনিধি দলটি ইটালী অভিমুখে রওয়ানা হয়। ভেনিস তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে রাজী ছিল না কারণ, ইতিমধ্যে ভেনিসীয়গণ ওসমানীয়দের সঙ্গে একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিল এবং তখন ইস্তাম্বুলের একটি প্রতিনিধিদলকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতেছিল। রোমে শার্লী ও বায়াতের মধ্যে মনো-মালিন্য হয় বলিয়া পোপ অষ্টম ক্লিমেণ্ট তাহাদিগকে পৃথকভাবে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। বাহ্যতঃ শার্লী পোপের নিকট প্রতিজ্ঞা করেন যে ককে-সাসের অর্থোডক্স খ্রীস্টানদিগকে রোমান ক্যাথলিক মতবাদের অনুসারী হইতে বাধ্য করিবার ব্যাপারে শাহ্ সহযোগিতা করিবেন।

বায়াত ও শার্লী তথায় আলাদা হইয়া যান। শার্লী স্পেন গমন করেন এবং সেখান হইতে ইংল্যাণ্ড গমন করেন এবং ইরানে আর কখনও ফিরিয়া আসেন নাই। বায়াত স্পেন গমন করেন এবং জাহাজে করিয়া ইরানে ফিরিবার

পরিকল্পনা করেন। তবে স্পেন ত্যাগের প্রাক্কালে একজন ধর্মান্ধ খ্রীস্টান এই মুসলিম মোল্লাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। আরও মারাত্মক হইল এই যে পারস্যবাসীদের মতানুসারে প্রতিনিধিদলের তিনজন সদস্য খ্রীস্টান হইয়া যায়। একজন ছিলেন প্রতিনিধির ভ্রাতুষ্পুত্র আলী কুলী যিনি রাজা ফিলিপকে ধর্মীয় পিতা মানিয়া খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাহার নাম দেওয়া হয় ডন ফিলিপ। দ্বিতীয় জন প্রতিনিধিদলের প্রধান সচিব উরুষ বে, যিনি রাণীকে ধর্মীয় মাতা হিসাবে গ্রহণ করিয়া খ্রীস্টান হন এবং পারস্যের ডন জুয়ান হিসাবে পরিচিত হন। তৃতীয়জন বুনিয়াদ বে, যিনি ডন দিয়াগো নামে খ্রীস্টান হন। প্রতিনিধি ও তাঁহার দলের অবশিষ্ট লোকের পরে কি হইল তাহা সুনিশ্চিত বলা যায় না। খুব সম্ভবতঃ এই ধরনের শোচনীয় কাজকারবারের জন্য তাঁহারা মৃত্যু অবধারিত দেখিয়া বুদ্ধিমানের ন্যায় শাহের নিকট ফিরিয়া না যাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে, একজন পারস্য ঐতিহাসিক বর্ণনা করেন যে ১৬১৩ খ্রীস্টাব্দে একটি পারস্য দূত একজন স্পেনীয় প্রতিনিধি সহকারে ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং সেই দূতকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হয়। পরে শাহ আব্বাস স্পেনীয়দিগকে এই বলিয়া তাঁহার কাজের ব্যাখ্যা প্রদান করেন যে পারস্য প্রতিনিধি "তাহার সহচরদের সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করিয়াছে যে তাহাদের অনেকেই খ্রীস্টান ধর্ম গ্রহণ করিতে রাজী হয় এবং তাহার (নিহত প্রতিনিধির) অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য ইউরোপে থাকিয়া যায় ....।"

প্রথম প্রতিনিধিদলের দ্বারা কোন ফল লাভে ব্যর্থ হইয়া শাহ্ আব্বাস ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে এন্থনীর ভ্রাতা রবার্ট শার্লীকে প্রেরণ করেন। প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইংল্যাণ্ড। ইটালীয়ান ও স্পেনীয়গণ, রবার্ট প্রতিনিধি দলের সহিত সৌহার্দমূলক ব্যবহার করে নাই। কারণ তাহারা বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় বৃটিশের প্রবেশ পছন্দ করে নাই। এই সমস্ত সরকার এন্থনী শার্লীকে তাহার ভ্রাতার জন্য সমস্যা সৃষ্টি করিতে নিযুক্ত করে। তবে বৃটিশ ইতিমধ্যেই ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দে ইংলিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী গঠন করিয়া ব্যবসা বিস্তারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং শাহ্ আব্বাসের আহ্বানে ব্যাপকভাবে সাড়া দেয়। ১৬১৬ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজদের জাহাজ পারস্য উপসাগরে আগমন করে এবং কোম্পানী ইসফাহানে তাহাদের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করে। ১৬২২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে একটি

ইঙ্গ-পারস্য বাহিনী পর্তুগীজ-স্পেনীয় ব্যবসায়ীদিগকে হরমুজ ও বাহ্‌রাইন হইতে এবং পরে মস্কট ও বসরা হইতেও বহিষ্কার করে। ইংরেজগণ লেভার ব্যবসায়েও অংশ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু তথায় ফরাসীদের অবস্থা সুদৃঢ় থাকার ফলে তাহারা বাগদাদে একটি শাখা স্থাপন করে। ইরানে বন্দরআব্বাস, হরমুজের স্থলাভিষিক্ত হয়। শাহ আব্বাস এই নতুন বন্দর নির্মাণ করেন এবং ইংরেজগণ তাহাদের অধিকাংশ ব্যবসা সেখানে চালাইয়া যায়। তাহাদের শাখাসমূহ ছিল ইসফাহান, শিরাজ, বসরা ও বাগদাদে।

ইতিমধ্যে ১৫৮১ খ্রীস্টাব্দে ডাচগণ মঞ্চে অবতরণ করে এবং ১৬০২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তাহাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিকে ইউনাইটেড ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামে একটি প্রতিষ্ঠানে একত্রীভূত করে। ১৬২৩ খ্রীস্টাব্দে ডাচগণ বন্দর আব্বাসেও একটি ব্যবসাকুঠি নির্মাণ করে। শাহের সঙ্গে তাহাদের ব্যবস্থা ছিল ডাচপণ্যসামগ্রীর বিনিময়ে পারস্যের কম্বল, পশমী কাপড়, সিল্ক ও বুটিদার কাপড় গ্রহণ করা। ইহা ইংরেজদের ব্যবসাকে ক্ষতিগ্রস্থ করে এবং ফলে ইংরেজ ও ডাচ ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। ১৬২৯ খ্রীস্টাব্দে শাহ আব্বাসের মৃত্যুর সময় ইসফাহান ও শিরাজের বাজারে অনেকগুলি বিদেশী পণ্যের গুদাম বিদ্যমান ছিল। শাহ সাফির (১৬২৯—১৬৩২ খ্রীঃ) রাজত্বকালে ডাচদের ব্যবসা ছিল সরগরম এবং পারস্য বাণিজ্যের প্রকৃত আধিপত্য ছিল ডাচদের হাতে। দ্বিতীয় শাহ আব্বাসের সিংহাসনারোহণের সময় ইরানের ব্যবসা ডাচদের একচেটিয়া আয়ত্বে থাকে। তাহারা আমদানী কর হইতে মুক্ত ছিল, তবে বিনিময়ে বাৎসরিক ৬০০ গাঁইট সিল্ক খরিদ করিতে হইত। সিল্ক ছাড়াও তাহারা পারস্য কম্বল, ফল ও মদ রপ্তানী করিত। তবে পারস্যের ব্যবসায়ীগণ ডাচদের সঙ্গে ব্যবসা করা পছন্দ করিত না। অভিযোগ ছিল এই যে, ডাচগণ সামান্য বিনিময়কারী এবং শিল্পকলায় অতীব পারদর্শী। পারস্য-বাসীগণ, ডাচদের মত পরিগ্রাস্ত ও সবজান্তা প্রতিযোগীদের সঙ্গে ব্যবসা করিতে নারাজ।

ইউরোপীয়দের প্রতি সাফাভীয়দের আতিথ্য জার্মানদিগকেও আকৃষ্ট করে। ১৫২৩ খ্রীস্টাব্দে শাহ ইসমাইল ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে পঞ্চম চার্লসের বন্ধুত্ব কামনা করেন। দুই বৎসর পর শেষ পর্যন্ত চার্লসের উত্তর ইরানে

পৌঁছিতে পৌঁছিতে শাহ্ ইসমাইল মারা যান। ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে জার্মানীর সম্রাট দ্বিতীয় রুডল্‌ফ্ (১৫৭৬–১৬১২ খ্রীঃ) এন্‌নী শালীকে আতিথ্য দান করেন এবং প্রত্যুত্তরে ইরানে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। জার্মান দূত দৃশ্যতঃ বরিস গডুনভকে স্বপক্ষে আনয়ন করেন এবং উভয় শাসকের পত্র লইয়া ইরান পৌঁছেন। পত্রগুলি যখন পৌঁছে তখন শাহ আব্বাস ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে একটি সাফল্যজনক অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে বরিস গডুনভ্ রাশিয়ায় আত্মকলহের গোলযোগে জড়াইয়া পড়েন এবং রাশিয়ার সঙ্গে জার্মান দূতের চুক্তি নিষ্ফল প্রমাণিত হয়।

সাফাভীয় সময়ে বিপুল সংখ্যক ইউরোপীয়ান ইরানে কাজ নেয় এবং মোটা অঙ্কের পারিশ্রমিক লাভ করে। ইউরোপীয়ানদিগকে আকর্ষণ করিবার নীতিতে শাহ্ আব্বাস বিদেশী প্রতিনিধিবৃন্দকে আপ্যায়নের ব্যাপারে দরাজদিল ছিলেন। তাহাদিগকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিবার জন্য প্রায়ই তিনি নগরের বাহিরে চলিয়া যাইতেন। অতিথিদিগকে পুরা সামরিক পোশাক ও বাজনার সহিত গার্ড অব অনার প্রদান করিয়া গ্রহণ করিতেন। অতিথিদের জন্য মদ ও বরফের পানি লইয়া ক্রীতদাসগণও নিকটেই থাকিত। ইউরোপীয়দিগের নিকট অমুসলিমদের প্রতি তাঁহার সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিবার জন্য, খ্রীস্টান, ইহুদী ও জরথুস্ত্র সম্প্রদায়গুলির নেতৃবৃন্দকেও অভ্যর্থনার নিমন্ত্রণ করা হইত। সবচাইতে অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল এই যে, বিদেশী অতিথিদিগকে আপ্যায়নের জন্য ২৫ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ দিয়া রাখা হয়। প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রমে, এইসব মহিলাদের সবাই পর্দাহীন থাকিত। পাদ্রীদের সহিত বন্ধুভাবাপন্ন হইবার জন্য শাহ আব্বাস স্বীয় নীতি হইতে এরূপ বিচ্যুত হইয়াছিলেন যে তাহারা মনে করিত, তিনি যেকোন সময় খ্রীস্টান হইয়া যাইতে পারেন এবং তাহাদিগকে নিরুৎসাহ হইতে হয়—এমন কিছুই শাহ করিতেন না। এক বৎসর রমজান মাসে খ্রীস্টমাস পড়িলে, শাহ তাঁহার নিয়মানুসারে ইসফাহানের আর্মেনীয় আবাসভূমিতে একটি অভ্যর্থনার জন্য গমন করেন। সেখানে তিনি মদ পান করেন এবং অতঃপর স্পেনীয় দূতের কানে কানে বলেন, "রোমে পোপের সাক্ষাৎ লাভ করিলে তাঁহাকে বলিবেন রমজান মাসে কাজী, মুফতী এবং সরকারী কর্মকর্তাদের সম্মুখে আমি কিভাবে

মদ পরিবেশন করিলাম। তাঁহাকে বলিবেন যে খ্রীস্টান না হইলেও আমি প্রশংসার যোগ্য।"

সামাজিক উপকরণসমূহ ছাড়াও ইউরোপীয়গণ বিশেষ বাণিজ্য সুযোগ লাভ করিত। সমস্ত প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও প্রশাসকদের নিকট কঠোর আদেশ থাকিত যে তাহারা যেন ফিরিঙ্গি (ইউরোপীয়) ব্যবসায়ীদের জন্য যাতায়াতের সুযোগসুবিধার নিশ্চয়তা বিধান করে। ইরানে থাকা-কালীন নিজেদের আইনের আওতায় পড়িবার সুবিধাও ইউরোপীয়দিগকে দেওয়া হয়। ইউরোপীয়দিগকে এই সমস্ত সুবিধা দিবার ব্যাপারে সাফাভীয়-গণ একা ছিল না। ওসমানীয়গণ এই ধরনের সুবিধা ফরাসীদিগকে প্রদান করে। সুলতান মহামহিমান্বিত সোলাইমানের প্রদত্ত এইসব সুযোগের দ্বারা ওসমানীয় সাম্রাজ্যে বসবাসকারী সমস্ত ফরাসীদিগের উপর ফরাসী রাজদূতের এখতিয়ার স্বীকার করা হয়। ইহা অবশ্যই উল্লেখ করা দরকার যে, এইসব সুবিধাদি দেওয়া হয় ভদ্রতার খাতিরে এবং সমতার ভিত্তিতে। তাহাদের মনে ইহা ছিল "মহাগ্রন্থের লোকদের" নিকট মিল্লাত প্রথার প্রয়োগ মাত্র। পরবর্তীকালে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ইহাকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। পরে 'শর্ত' (capitulation) নামে খ্যাত এই রীতি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় যুগ পর্যন্ত চালু থাকে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পারস্য উপসাগরের ব্যবসা শ্লথ হইতে থাকে। ইহার কারণ হইল ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ এশিয়ার আরও পূর্বে সবুজতর চারণ ভূমি ও সমধিক মুনাফা লাভ করে। তদুপরি ইরানে রাজ-নৈতিক অবস্থা জটিলতর হইতে থাকে এবং ক্রমশঃ দুর্বল সাফাভীয় শাহগণ শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করিতে ব্যর্থ হন। ১৭২২ খ্রীস্টাব্দে আফগানদের ইরান আক্রমণের ফলে সেই দেশে ডাচ ব্যবসা দুর্বল হইয়া পড়ে। নাদির শাহ ইংরেজদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না, কারণ তাহারা তাঁহাকে ওসমানীয় অভিযানে সাহায্য করে নাই, অথচ ডাচগণ করিয়াছিল। তবে তিনি বাদশাহ হইবার পর তাঁহার মনোভাব পরিবর্তন করেন এবং বৃটিশ-দের সঙ্গে নতুন কোন চুক্তি না করিয়া পুরাতনগুলি চালু করেন। করিম খান জান্দ ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে আমদানীকৃত মালপত্রের শুল্ক এবং বন্দরসমূহের

নিয়ন্ত্রণ লইয়া ইংরেজদের সঙ্গে সমস্যার সম্মুখীন হন। ফলে পারস্ত উপসাগরের বুশাহার বন্দর বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং বসরা একমাত্র বন্দর হইয়া দাঁড়ায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ নাগাদ একদিকে ইউরোপীয়গণ এবং অপরদিকে পারস্তবাসী ও ওসমানীয়দের মধ্যে সম্পর্কসমতার কোন চিহ্নও অবশিষ্ট থাকে নাই। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজগণ বসরার সোলাইমান পাশাকে তাঁহার পাশা পদ লাভ করিতে সহায়তা করে এবং ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে একইভাবে বুশাহার (বুশায়ার -এর ভাগ্য নিরূপণে সাহায্য করে। এইভাবে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের যুগ আরম্ভ হয়।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইউরোপীয়দের সহিত দুই শতাব্দীর সম্পর্ক ইরান বা ওসমানীয় সাম্রাজ্যে তেমন কোন সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নাই। তুর্কী ও পারস্তবাসী উভয়ে পাশ্চাত্যের নিকট হইতে সর্বাধুনিক কামান ও মর্টার বানাইবার কৌশল নকল করে। কিন্তু তাহাই সবকিছু বলিয়া মনে হয় সেই ১৪৮১ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বায়েজীদের রাজত্ব কালে স্পেনের ইহুদী বাস্তত্যাগীগণ একটি ছাপাখানা বসাইবার অনুমতি প্রার্থনা করে। কিন্তু সুলতান তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। পাছে কোরান ছাপানো হয় সেই ভয়ে শেখ উল-ইসলাম ইহার বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। পরে ১৪৯৩ খ্রীস্টাব্দে অবশ্য ইহুদীদিগকে একটি ছাপাখানা বসাইবার অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু শর্ত হইল তাহারা শুধু হিব্রু ভাষার ছাপার কাজ করিবে। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইহুদীদের স্থায় একই শর্ত মোতাবেক আর্মেনীয়দিগকে একটি ছাপাখানা স্থাপন করিতে অনুমতি দেওয়া হয়; ১৬২৭ খ্রীস্টাব্দে একই রকমের অনুমতি গ্রীকদিগকেও দেওয়া হয়। ১৭২১ খ্রীস্টাব্দের দিকে সুলতান যে কোন কিছু তুর্কী ভাষায় ছাপাইবার অনুমতি দান করেন। ইউরোপের অন্য সমস্ত কিছু নিষিদ্ধ করা হয়; এমন কি ঘড়িও নিষিদ্ধ করা হয়; কারণ ইহা মুয়াজ্জিনের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। মুয়াজ্জিন হইলেন যিনি লোকদিগকে নামাজের জন্য ডাকেন।

এইসব ব্যাপারে ওসমানীয়দের চাইতে পারস্তবাসীগণ আরও অধিক উদার হইলেও, এইক্ষেত্রে দর্শনীয় কিছুই নাই। শাহ আব্বাস একটি ছাপাখানা আমদানী করিলেও তিনি ইহা ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। শাহ মাফীর নিকট ইউরোপীয় কামান প্রস্তুতকারকগণ ছাড়াও

একজন ঘড়ি নির্মাতা, একজন স্বর্ণকার, একজন হীরা কর্তনকারী ও একজন শিল্পকলাবিদ ছিল। দ্বিতীয় শাহ্ আব্বাস ইংল্যাণ্ড হইতে লকার ও এঞ্জেল নামে দুইজন শিল্পকলাবিদ আনয়ন করেন এবং ইহাদের কল্যাণে সম্রাটের কিছু সংখ্যক আবক্ষ ছবি এখনও বর্তমান।

বুদ্ধিমত্তার ক্ষেত্রে তুর্কী ও ইরান উভয়েই পাশ্চাত্যের নিকট দুর্বোধ্য। আল্লাহ্‌র বিধানসম্বলিত ধর্ম হিসাবে ইসলাম নিজেকে শেষ ধর্ম, অতএব সম্পূর্ণ, বলিয়া বিশ্বাস করে। ফলে মুসলমানগণ শীয়া হউক বা সুন্নী হউক মনে করে না যে, খ্রীস্টান ধর্মের ন্যায় অসম্পূর্ণ ধর্মের নিকট হইতে কিছু শিক্ষা করিবার আছে। ওসমানীয় সাম্রাজ্যে শেখ উল-ইসলাম এবং অসংখ্য উলামাগণ ইউরোপীয়গণের সহিত কখনও কোন বুদ্ধিমত্তার সম্পর্ক স্থাপন করে নাই এবং করিতেও দেয় নাই। ইরানে শীয়া ধর্ম পারস্য পৃষ্ঠপোষকতার সহিত মিশ্রিত হইয়া যায় এবং এমন একটি ধর্মান্ধ ও গোঁড়া বেষ্টনী সৃষ্টি করে যে তেমন কোন কিছু ইহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে নাই। তদুপরি ইউরোপীয় বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁহারা মধ্যপ্রাচ্যে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন খ্রীস্টান পাদ্রী। ইহাদের মানসিকতা ছিল মোটের উপর মধ্যযুগীয় এবং তাঁহারা তৎকালে ইউরোপে সংগঠিত সংস্কার আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় নাই বরং তাহার বিরোধিতা করিয়াছেন। তাঁহাদের মুসলিম সহযোগীদের ন্যায় তাঁহারাও আবদ্ধ অন্তরের অধিকারী ছিলেন। ফলে মধ্যযুগীয় ইসলামকে তাঁহাদের দিবার মত কিছুই ছিল না। অতএব কোন পক্ষই অপর পক্ষের নিকটবর্তী হইবার আগ্রহ অনুভব করে নাই। মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপের মধ্যে অনুষ্ঠিত পরবর্তী সংঘাত ইসলামের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দের মাথার উপর দিয়া চলিয়া যায় এবং উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্বে এই ব্যাপারে তাহারা কোন প্রতিক্রিয়াই প্রদর্শন করে নাই।

অষ্টাদশ অধ্যায়

সাফাভীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও সংস্কৃতি

সাফাভীয় ধর্মীয়, সামাজিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ওসমানীয়দের ন্যায় ইসলামী ও তুর্কী। তবে পার্থক্য এই যে ইহারা শীয়া ও পারস্যবাসী। ওসমানীয়দের তুলনায় সাফাভীয়গণ কোন সশস্ত্র ছাউনী (যদিও তাহারা একটি সেনাবাহিনী পোষণ করিত), প্রতিষ্ঠা করে নাই এবং তাহাদের প্রতিষ্ঠানসমূহ সশস্ত্রবাহিনীর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না। ইরানে প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি সাফাভীয় প্রতিষ্ঠান যেহেতু প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত স্থায়ী হয়, তাই এইগুলি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। তুর্কী বিষয়ক দিকগুলি বিবেচনা করিলে দেখা যায় যে সাফাভীয়গণ নিজেরা তুর্কী হইবার ফলে বেলার বে, শেখ উল-ইসলাম প্রভৃতি একই নাম ব্যবহার করে, কিন্তু একই মর্যাদার জন্য নহে। সম্ভবতঃ ওসমানীয় অফিসারদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ ব্যক্তিবর্গের উপাধি সাফাভীয় সরকারী সংগঠনের সর্বনিম্ন ব্যক্তিদিগকে দেওয়া হয়। উদাহরণ স্বরূপ পারস্যবাসীদের মধ্যে সর্বনিম্ন প্রাদেশিক প্রশাসককে বলা হইত সুলতান। শেখ উল-ইসলাম ও বেলার বে সাফাভীয়দের মধ্যে ওসমানীয়দের ন্যায় অতি গুরুত্বপূর্ণ পদের নিকটও ছিল না।

ইসলামী শরীয়তের ব্যাপারে সাফাভীয় শাহগণ তুলনামূলকভাবে ওসমানীয় সুলতানদের চাইতে স্বাধীন ছিলেন। সুন্নীদের নিকট চারি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান শরীয়তকে নির্ধারিতভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।[১] চারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত সীমা হইতে বিচ্যুতি বা নতুন উদ্ভাবনকে সর্বদা বিরক্তির চোখে দেখা হয়। ওসমানীয় উলামাগণ ধর্মীয় আইনের

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১০৫ (মূল গ্রন্থ)।

হানাফী প্রতিষ্ঠানের উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন এবং সুলতান, ফতোয়া নামে প্রকাশিত ঐসব সিদ্ধান্তের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতেন। শীয়াগণ শরীয়তকে সমধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করিলেও সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসক, লুক্কায়িত ইমামের মুখপাত্র সময়ের প্রয়োজনে আইনকে ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। বিশ্বাস করা হইত যে, এইসব মুখপাত্র বা মুজতাহিদগণ ব্যাখ্যা দান করিবার জন্য লুক্কায়িত ইমাম কর্তৃক আদিষ্ট হইতেন। এই পন্থায় মুজতাহিদের মতামতকে ইমামের মতামত বলিয়া গণ্য করা হইত এবং ইহাকে বাধ্যতামূলক মনে করা হইত।

দুইটি বিষয় শীয়া সমাজকে অযথা কঠোরতা হইতে রক্ষা করিয়াছে। প্রথমতঃ সাধারণভাবে একই সময় তাহাদের মধ্যে দুইজন মুখপাত্র থাকিতেন। কখনও কখনও চারি বা পাঁচজনও হইতেন এবং এইসব লোকজন স্বভাবতঃই কোন বিশেষ মামলার ক্ষেত্রে সর্বদা একে অপরের সঙ্গে মতৈক্যে পৌঁছিতেন না। দ্বিতীয়তঃ এইসব মুখপাত্র নিযুক্তির ক্ষেত্রে কোন ধর্মযাজকমূলক সংগঠন ছিল না। যে কোন লোক মুজতাহিদ হইতে চাহিলে তাঁহাকে শীয়া ধর্মতত্ত্ব ও আইন পাঠ করিতে হইত, কিন্তু তাঁহাদের সবাই আকাঙ্খিত মর্যাদায় উঠিতে পারিতেন না। প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ছাড়াও তাঁহাদের পুণ্যবান, বিচারশক্তিসম্পন্ন ও সাধারণ বিবেচনার সুনাম থাকিতে হইত। সাধারণ অবস্থায় নিখুঁত সুনামের অধিকারী উলামাদের কোন লোককে বেসরকারী ও জনমতের ভিত্তিতে মুজতাহিদ বলিয়া বিবেচনা করা হইত। কোন কোন সময় শাহ অথবা সমাজের কোন উচ্চ কর্মকর্তা কোন লোককে বারবার এবং প্রকাশ্যে তাঁহার মতামত চাহিয়া সাহায্য করিতে পারিতেন এবং এইভাবে মুজতাহিদ হিসাবে তাঁহার সুনাম প্রতিষ্ঠা করিতেন। ফলে কোন শীয়া সমাজে মুজতাহিদগণ সম্মিলিত মতামত ব্যক্ত করিতে রাজী হইলে ইহার ফল খুবই অনমনীয় ও প্রতিক্রিয়াশীল হইতে পারিত। অপরদিকে কোন সুচতুর শাহ বা সরকার মুজতাহিদদিগকে একে অপরের বিরুদ্ধে লাগাইতে চাহিলে, অনেকগুলি সংযোজন বা বিচ্যুতি ঘটাইতে পারিলে তাহা করিতে পারিতেন। এইসব বিচ্যুতি শীয়া ও সুন্নী ইসলামে সমভাবে অভিসম্পাত যোগ্য।

সাফাভীয়দের যুগ হইতে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইরানে শাহ

ও শীয়া উলামাদের মধ্যে তিন ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। প্রথম পর্যায়ের শাহদের মধ্যে ছিলেন মহান শাহ্ আব্বাস (১৫৮৭—১৬২৯ খ্রীঃ) এবং নাসের আল-দীন শাহ্ কাজার (১৮৪৮—১৮৯৬ খ্রীঃ), যাঁহারা উলামাদের সঙ্গে মোটামুটি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। ইহাদের সময় এক প্রকারের পারস্পরিক বুঝাপড়ার মত অবস্থা বিদ্যমান ছিল যাহা নির্ভর করিত শক্তি ও কার্যক্ষমতার উপর। কোন কোন সময় তাঁহারা আলেম শ্রেণীকে বিভক্ত করিয়া তাঁহাদের স্বীয় ইচ্ছা চাপাইতে পারিতেন এবং কোন কোন সময় তাঁহারা উলামাগণ কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইতেন। দ্বিতীয় পর্যায়ের শাহদের মধ্যে ছিলেন নাদির শাহ্ (১৭৩৬—১৭৪৭ খ্রীঃ) এবং রেজা শাহ পাহলভী (১৯২৪—১৯৪১ খ্রীঃ), যাঁহারা উলামাদের উপর তাঁহাদের ইচ্ছা চাপাইয়া দেন এবং আলেমদের প্রভাব ধ্বংস করিয়া দেন। উভয় শাহই এমন ক্ষমতাশালী ছিলেন যে ধর্মীয় দানগুলিকে (ওয়াক্‌ফ) তাঁহারা সহজেই বাজেয়াফ্‌ত করিতে পারিতেন, যেগুলি ছিল বংশপরম্পরায় শীয়া ও সুন্নী উভয় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের আয়ের উৎস। উলামাগণ নাদির শাহকে যখন বলিলেন যে, এই ধরনের তহবিলগুলি ধর্মীয় স্কুল ও মসজিদের জন্য খরচ করা উচিত, যেখানে শাহের সাফল্যের জন্য দোয়া করা হয়। তখন তিনি সংক্ষিপ্তভাবে জবাব দিলেন যে, আপাতঃদৃষ্টিতে তাঁহাদের দোয়া নিষ্ফল প্রমাণিত হইয়াছে, কারণ বিগত ৫০ বৎসরে দেশ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, তাঁহার সৈনিকগণ যেহেতু এই ধ্বংস প্রতিরোধ করিয়াছে, তাই তাহারাই সত্যিকারের 'ধর্মের শিক্ত' এবং ওয়াকফগুলি হইতে তাহাদেরও অংশ পাওয়া উচিত।

তৃতীয় পর্যায়ে পরবর্তী সাফাভীয় শাহদের অধিকাংশ [যথা শাহ সুলতান হোসাইন (১৬৯৪—১৭২২ খ্রীঃ) হইতে কাজার যুগ পর্যন্ত] ছিল শীয়া উলামাদের আধিপত্যে।

ইহা খুবই স্বাভাবিক যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থার আওতাভুক্ত যে কোন সমাজ উলামাদের মতবাদ বা একনায়কের ইচ্ছায় অনমনীয় হইত অথবা প্রতিক্রিয়াশীল হইত। প্রথমোক্ত অবস্থায় সমাজের অপেক্ষাকৃত স্বাধীন হওয়াটাই স্বাভাবিক। কারণ দুইটি সমান শক্তি বিদ্যমান থাকিবার ফলে ঐগুলি একে অপরকে নিরপেক্ষ করিবে, যদ্বারা সাধারণ মানুষ উপকৃত

হইতে পারে। ইহার অতি প্রসিদ্ধ উদাহরণ হইল নাসের আল-দ্বীন কর্তৃক বৃটিশকে প্রদত্ত সুবিখ্যাত একচেটিয়া তামাকের ব্যবসা (১৮৯২ খ্রীঃ)। মুজতাহিদগণ ইহার বিরুদ্ধে একটি ফতোয়া জারী করেন। ধূমপানের বিরুদ্ধে এমন ব্যাপক একটি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয় যে স্বয়ং শাহ তাঁহার হুক্কার জন্য তামাক ক্রয় করিতে ব্যর্থ হন এবং সেই চুক্তি বাতিল করিতে বাধ্য হন।

তদুপরি, ইরানের শাহদের মধ্যে একমাত্র সাফাভীয়গণ মুর্শিদ-এ-কামিল বা অত্যন্ত খাঁটি নেতা (অর্থাৎ সুফী শ্রেণীর) হিসাবে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেন। রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর কথিত বংশধর হিসাবে এবং সুফী শ্রেণীর সত্যিকারের নেতা হিসাবে, তাঁহারা বিশেষ কিছু ধর্মীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সাফাভীয় শাহগণ, বিশেষতঃ প্রথম দিকের গুলি তাঁহাদের মধ্যে শুধু শাহ নহে বরং ধর্মীয় নেতৃত্বের সংমিশ্রণও ঘটাইয়াছিলেন। ফলে ধর্মীয় রাজনৈতিক উভয় ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল এবং তাঁহাদের মধ্যে উদার প্রকৃতির শাহগণ একটি স্বাধীন পথ অবলম্বন করেন। তাই সাফাভীয় সরকারী সংগঠন ওসমানীয়দের ন্যায় 'মুসলিম' ও 'শাসনকারী' প্রতিষ্ঠানে বিভক্ত ছিল না। একভাবে, সমস্ত ক্ষমতার মালিক ছিলেন ইমাম, যাঁহার মুখপাত্র ছিলেন মুজতাহিদগণ। তবে, প্রথমদিকের সাফাভীয় যুগে 'খাঁটি নেতা' হিসাবে শাহ ধর্মীয় ক্ষমতা গ্রহণ করেন এবং ইমামের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করেন। পরবর্তীকালে শাহের ক্ষমতা হ্রাস পাইলে মুজতাহিদগণ আরও ক্ষমতার অধিকারী হন। তদুপরি, ইরানে শাহের অধীনে বিচার ও ধর্মের সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল ধর্মীয় সংগঠনের উপরে, কিন্তু ওসমানীয়দের ব্যতিক্রমে সরকারের প্রশাসনিক পরিষদে ইহার কোন ভূমিকা ছিল না।

সাম্রাজ্যের সর্বপ্রধান শীয়া আলেম ছিলেন 'মোল্লাবাসী', যিনি অত্যন্ত বিদ্বান এবং শাহের 'ধর্মীয় উপদেষ্টা' হিসাবে কাজ করেন। তাঁহার কোন প্রশাসনিক বা বিচার বিভাগীয় কর্তব্য ছিল না। শাহের ক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের উপর তাঁহার প্রভাব ছিল পরোক্ষ।

সাম্রাজ্যের বিচার বিভাগীয় কার্যক্রম ছিল উলামাদের একচেটিয়া অধিকারভুক্ত, যাহা একটি 'বিচারের দিওয়ান' দ্বারা পরিচালিত হইত। সপ্তাহে চারিদিন ইহা মিলিত হইত এবং দুইজন সদস্য সমন্বয়ে ইহা গঠিত ছিল :

১। সদর-এ-খাস, যাঁহার উপর উত্তর অঞ্চলের এবং গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলির বিচারের দায়িত্ব ছিল।

২। সদর-এ-আম, যাঁহার উপর দেশের অবশিষ্ট অংশের বিচারের দায়িত্ব ছিল।

৩। ইসফাহানের কাজী, যিনি তাঁহার স্বীয় গৃহে বিচারালয় বসাইতেন।

৪। শেখ উল-ইসলাম, যাঁহার হাতে বিবাহ ও তালাকের মামলার দায়িত্ব ছিল।

৫। দারোগা, যিনি পুলিশের দায়িত্বে ছিলেন।

৬। সেনাবাহিনীর ধর্মীয় উপদেষ্টা, যিনি সৈন্যদের ধর্মীয় প্রয়োজনগুলির দেখাশুনা করিতেন এবং তাহাদের বেতনের রশিদে দস্তখত করিতেন।

উপরোল্লিখিত সবগুলি পদে শাহ্ই নিযুক্তি দান করিতেন। শুধু প্রথম দুইজন সদর ও মোল্লাবাসী খাজাঞ্চীখানা হইতে তাঁহাদের বেতন লইতেন। দিওয়ানের দায়িত্ব ছিল প্রদেশগুলিতে জজ, ধর্ম প্রচারক ও পুলিশ নিযুক্ত করা। ইহার সভাপতি থাকিতেন শাহ কর্তৃক নিযুক্ত ব্যক্তি—যাহাকে দিওয়ান বেগ বলা হইত। তিনি দিওয়ানের সিদ্ধান্তগুলি কার্যে পরিণত করিতেন। সপ্তাহে চারিদিন তিনি দিওয়ানের সভাপতিত্ব করিতেন এবং সপ্তাহে দুইদিন নিজ গৃহে অধর্মীয় উরফ্ মামলাগুলি নিষ্পত্তি করিতেন। তাঁহার একটি জায়গীর থাকিত এবং সমস্ত জরিমানার শতকরা ১০ ভাগ তিনি পাইতেন।

সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কার্যাবলী প্রধান উজীরের সাধারণ নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। তিনি শাহের ডান পার্শ্বে উপবেশন করিয়া আদেশগুলিতে দস্তখত করিতেন ও শাহের স্বপক্ষে কাজ করিতেন। তাঁহার কোন বেতন ছিল না। তাঁহার আয় ছিল জায়গীর ও উপঢৌকন সমূহ হইতে।

তাঁহার নীচে প্রশাসন দুইটি শাখায় বিভক্ত। একটির কাজ ছিল প্রদেশ সংক্রান্ত। প্রদেশগুলি চারিজন উচ্চশ্রেণীর কর্মকর্তা দ্বারা শাসিত হইত। সর্ব উপরে ছিলেন প্রাদেশিক গভর্ণর এবং তাহার নীচে ছিল জেলা নিয়ন্ত্রক, যিনি জেলা কমিশনার (খান) বলা হয়, এরূপ একজন কর্মকর্তার সাহায্যে কাজ করিতেন। তাহার কর্তৃত্বাধীন ছিল স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ যাঁহাদিগকে

সুলতান বলা হইত। এইসব কর্মকর্তাদের সবার পদ অনুযায়ী জায়গীর ছিল। তাঁহাদের কাজ ছিল কর আদায় করা, তাঁহাদের স্থানীয় সৈন্যদের বেতন দেওয়া এবং প্রত্যেক বৎসর একটি বিশেষ অঙ্কের অর্থ শাহের নিকট প্রেরণ করা। এই অর্থ ছাড়াও তাঁহারা শাহের নিকট উপঢৌকনসমূহ প্রেরণ করিতেন। এইসব কর্মকর্তাদের প্রত্যেকের শাহের সন্নিকটে কোন একজন থাকিতেন যিনি যথাযোগ্য উপহারের বিনিময়ে তাঁহার সম্পর্কে খুব প্রশংসা করিতেন এবং তাহাকে সুবিধাদি দানের ব্যবস্থা করিতেন।

প্রশাসনের দ্বিতীয় শাখার কর্তব্য ছিল সাম্রাজ্যের সেনাবাহিনীর, দরবার ও রাজস্বের তত্ত্বাবধান করা। প্রথম দিকের সাফাভীয়গণের প্রধান শক্তির উৎস ছিল কিজিলবাস গোত্রগুলি। সরকারের এইগুলির প্রতিনিধিত্ব করিতেন দুই ব্যক্তি। একজনকে বলা হইত প্রধান খলিফা, যিনি বিভিন্ন গোত্রের খলিফাদের (সুফী শ্রেণীর ধর্মীয় নেতা) সভাপতি। সুফীদের দৃষ্টিতে প্রধান খলিফা ছিলেন খাঁটি নেতা অর্থাৎ শাহের সহকারী। কিজিলবাসের দ্বিতীয় প্রতিনিধি ছিলেন কুরসীবাসী, যিনি ছিলেন গোত্রগুলির নিযুক্ত নেতা। তিনি যোদ্ধাদিগের বেতন প্রদান করিতেন। উভয় ব্যক্তি তাহাদের জায়গীর ছাড়াও বেতন পাইতেন।

শাহ আব্বাস কিজিলবাসদের ক্ষমতা ভাঙ্গিয়া দেন এবং আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সম্বলিত তিনটি সেনাবাহিনী শাখা গঠন করেন। একটি ছিল গোলন্দাজ বাহিনী, দ্বিতীয় ছিল রাইফেল বাহিনী, যাহাদিগকে গ্রামের ফার্সীভাষী জনসাধারণ হইতে বাছিয়া লওয়া হয় এবং তৃতীয়টি ছিল 'দাস' বাহিনী, যাহাদিগকে জর্জিয়ান, মারকাসিয়ান ও আর্মেনিয়ান হইতে বাছিয়া লওয়া হয়। সাধারণ অর্থে ইহারা সত্যই ক্রীতদাস ছিল কিনা তাহা সন্দেহজনক। তাহাদের প্রায় সবাই ছিল খ্রীস্টান। "শাহের ক্রীতদাস" হইবার ব্যাপারে তাহাদের ধর্মে কোন বাধা ছিল না এবং তাহারা ইহাতে গর্ব অনুভব করিত। এইসব বাহিনীর প্রত্যেকের নিজস্ব পদের অধিনায়ক থাকিতেন—যিনি শাহ্ ও প্রধান উজীরের নিকট দায়ী থাকিতেন। প্রত্যেক অধিনায়ক একটি জায়গীরের মাধ্যমে তাঁহার আয় লাভ করিতেন।

শাহের দরবারে অফিসারদের একটি বিশাল দল ছিল। প্রটোকল

প্রধান হইতে আরম্ভ করিয়া ব্যক্তিগত সচিব, চিকিৎসক ও জ্যোতিষী, দারোয়ান, খানসামা, আস্তাবল প্রধান এবং অন্যান্যদের সংখ্যা এত অধিক যে তাহাদের নাম উল্লেখ করা যায় না। প্রধান গৃহাধ্যক্ষ (chief chamberlain) ছিলেন শাহের হেরেমের দায়িত্বে। ওসমানীয়দের ন্যায় সাফাভীয়দের হেরেমেও সাধারণতঃ কৃষ্ণাঙ্গ খোজাদের দ্বারা সুরক্ষিত থাকিত। পারস্য মহিলাগণ ওসমানীয় সাম্রাজ্যে তাহাদের ভগ্নিদের চাইতে অধিক স্বাধীনতা ভোগ করিত বলিয়া মনে হয়। সাফাভীয়গণ তাঁহাদের স্ত্রীদিগকে যুদ্ধে লইয়া যাইত এবং মহিলাদের মধ্যে কেউ কেউ উত্তম তীরন্দাজ ছিল ও সত্যই যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিত। পরাজয়ের ক্ষেত্রে এবং সাধারণ অথবা দ্রুত পশ্চাদপসারণের সময় খোজাদের প্রতি সমস্ত মহিলাকে হত্যা করিবার নির্দেশ দওয়া হইত। কখনও কখনও বাজারে 'মহিলা দিবস' পালন করা হইত। দোকানদার ছাড়া কাহাকেও উহাতে প্রবেশ করিবার অধিকার দেওয়া হইত না। এইসব দিবসে হেরেমের মহিলাগণ শহরের মহিলাদের সহিত মিলিত হইত। শাহ আব্বাস কর্তৃক ইসফাহানের বীথিকা নির্মাণ শেষ হইলে তিনি বীথিকায় একটি মহিলাদের বৈকাল উদ্বোধন করেন। সেখানে মহিলাগণ বৃক্ষ সুশোভিত রাস্তায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ করে। মহিলাদিগকে একটি বিশেষ স্থানও দেওয়া হয় যেখান হইতে তাহারা মুহুর্মুহু বাজি পোড়ানো ও বাতি জ্বালানো অনুষ্ঠান উপভোগ করে। এইগুলি শাহদের অতিপ্রিয় চিত্তবিনোদনের খেলা। যে কেউ কল্পনা করিতে পারে যে, অতি নিভৃত ও আশ্রিত জীবনের অধিকারিণী এই মহিলাগণ কিরূপ আগ্রহ লইয়া এইসব অনুষ্ঠানের অপেক্ষায় থাকিত।

রাজস্ব এমন একজনের কতৃত্বাধীনে ছিল যিনি শাহের নিকট দায়ী থাকিতেন। শাহের ব্যয় এবং সরকারের ব্যয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। প্রত্যেক কিছুর মালিক ছিলেন শাহ। রাজস্ব বিভাগে একজন ছিলেন টাকশালের দায়িত্বে। রাজধানীতে সমগ্র দেশের জন্য রৌপ্য ও স্বর্ণমুদ্রা তৈয়ার হইত। তাম্রমুদ্রা স্থানীয়ভাবে তৈয়ার করা হইত এবং প্রত্যেক বৎসর ঐগুলি পরিবর্তন করা হইত।

রাজস্ব বিভাগের সঙ্গে আরেকজন কর্মকর্তা ছিলেন যিনি ন্যায্য মূল্যের দায়িত্বে ছিলেন। সাফাভীয় যুগ হইতে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইরানে

সুবিন্যস্ত সমাজ প্রথা বিদ্যমান ছিল। উত্তম প্রশাসকদের সময় সাধারণতঃ প্রতি তিন মাস অন্তর এবং কোন কোন সময় প্রায়ই দ্রব্যমূল্যের ভারপ্রাপ্ত অফিসার প্রত্যেক সমাজের নেতার (শ্বেতশ্মশ্রু) সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া মূল্য নির্ধারণ করিতেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরগুলি পর্যন্ত দোষী ব্যক্তিদিগকে কাষ্ঠখণ্ডে পদাদি আটকাইয়া বাজার প্রদক্ষিণ করানো হইত।

শাহ ও সরকারের প্রধান আয়ের উৎস ছিল প্রত্যেক প্রদেশ হইতে গৃহীত কর। ইহা নগদ ও উৎপন্ন দ্রব্য উভয় প্রকারে লওয়া হইত, যথা—সিল্ক, ঘোড়া, ক্রীতদাস, তৈল, মদ, চাউল প্রভৃতি। শাহের নিজস্ব ভূমি হইতেও আয় হইত। শাহ আব্বাস কর্তৃক কিজিলবাস শক্তি ধ্বংস করিবার পর এইসব সামন্ত প্রভুদের খাস জমিগুলি বাজেয়াফ্‌ত করা হয়, এবং ইহা হইতে উদ্ভূত আয় ছিল বেশ মোটা অংকের। রাজস্বের তৃতীয় উৎস ছিল আয়কর হইতে। সমস্ত গবাদি পশুর বার্ষিক কর ছিল অর্ধেক, সমস্ত সিল্ক ও সুতীবস্ত্রের কর ছিল এক-তৃতীয়াংশ, সেতু ও রাস্তার শুল্ক, অমুসলিমদের মাথাপিছু কর (জিজিয়া), আমদানী শুল্ক প্রভৃতি। আয়ের অতি মূল্যবান উৎস ছিল তামাক বিক্রয় ও চাষাবাদ। পর্তুগীজগণ ইরানে তামাকের প্রচলন করে এবং ইহা অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠে। শাহ আব্বাস নিজে ধূমপান পছন্দ করিতেন না এবং তাই কেউ তাঁহার সামনে এই কাজ করিতে সাহস করিত না। তবে তাঁহার মৃত্যুর পর ধূমপান একটি জাতীয় অভ্যাসে পরিণত হয়।

পঞ্চম আয়ের উৎস ছিল বিবিধ উপাদান হইতে, যথা, সম্পত্তি বাজেয়াফ্‌ত, বিদেশী প্রতিনিধি দলের নিকট হইতে উপঢৌকন এবং এই ধরনের আয় শাহের ভবনাদি নির্মাণের সময় মিস্ত্রীগণ কর্তৃক স্বল্প বেতন গ্রহণ করা একটি চিরাচরিত প্রথা ছিল। প্রত্যেক বৎসর সাম্রাজ্যের আয় ৭০০০,০০০ হইতে ৯০০০,০০০ তুমান বলিয়া অনুমান করা হয়। বাৎসরিক খরচের পরিমাণ জানা যায় নাই, কিন্তু ইহা আয়ের চেয়ে কম ছিল এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত সাফাভীয় রাজাদের তহবিল পরিপূর্ণ ছিল।

সাফাভীয়গণ কর্তৃক প্রচলিত রীতিগুলির মধ্যে একটি ছিল উপাধি দান করা—যথা 'সাম্রাজ্যের স্তম্ভ', 'রাজস্বের তত্ত্বাবধায়ক' এবং এই

ধরনের আরও অনেক। কোন কোন সময় এইসব উপাধিসমূহ হইতে বংশানুক্রমিক এবং কোন কোন সময় এইগুলি একজন হইতে লইয়া আরেক জনকে দেওয়া হইত। যেহেতু অধিকাংশ পদবীধারীগণ হইতেন রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবর্গ, সেহেতু ঐতিহাসিকগণ প্রায়ই পিতা হইতে পৌত্র বা এই ধরনের উপাধিপ্রাপ্ত অর্ধ ডজনের পার্থক্য নিরূপণ করিতে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া যান।

সাফাভীয়দের নিজস্ব ঐতিহাসিক ছিলেন। শাহ আব্বাসের রাজত্বের অতি গুরুত্বপূর্ণ উৎসগুলির মধ্যে একটি হইল 'আব্বাসের ইতিহাস' তবে এই ধরনের গ্রন্থসমূহ ইহাদের ওসমানীয় প্রতিলিপির ন্যায় শাহের কার্যকলাপের দৈনিক ঘটনাপঞ্জী বিশেষ। এইগুলিতে প্রায়ই শাহ ও তাঁহার নীতির অতিরঞ্জিত চিত্র তুলিয়া ধরা হয়। সৌভাগ্যবশতঃ অনেক ইউরোপীয় পর্যটকদের মধ্যে কেউ কেউ ইরান সফর করিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতার বিষয় লিপিবদ্ধ করেন এবং জনজীবন সম্পর্কে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেন, যাহাদের সঙ্গে তাঁহারা বসবাস করিয়াছেন। একমাত্র তাঁহাদের রিপোর্টের মাধ্যমেই সরকারী ঐতিহাসিকদের নির্মিত বেষ্টনীর মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব হয়।

অধিকাংশ লোক তাঁহাদের অবসর সময় কাটায় কফি হাউসে। শাহ আব্বাসের একজন সমসাময়িক ওসমানীয় সুলতান চতুর্থ মুরাদ সমস্ত কফি হাউসগুলি বন্ধ করিবার নির্দেশ দেন; অথচ শাহ আব্বাস ইরানে এইগুলিতে উৎসাহ প্রদান করেন। তিনি স্বয়ং প্রায়ই এইগুলিতে যাতায়াত করিতেন এবং অনেক সময় বিদেশী অভ্যাগতদিগকে এইগুলিতে লইয়া যাইতেন। এইসব কফি হাউসগুলি ছিল খবর আদান-প্রদানের কেন্দ্র। এইগুলিতে পর্যটকগণও আসিত, এবং তাহাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিত। দরবেশগণ আসিতেন যাঁহারা কিছু অর্থের জন্য শাহনামাহ হইতে ইরানের নায়কদের গল্প আবৃত্তির দ্বারা শ্রোতাদেরকে বিমোহিত করিতেন। সাফাভীয়-গণ প্রাক-ইসলামী যুগের অনেক অনুষ্ঠান পালনে উৎসাহ দান করিত, যথা বিষুব অয়ন সন্ধির সময়ে অনুষ্ঠানাদি, বসন্ত বিষুব (নওরোজ) যাহা নতুন বৎসর আনয়ন করে। তখনকার ন্যায় এখনও ইহা ইরানের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান। ইহা ছাড়া ছিল গোলাপ অনুষ্ঠান এবং পানির

অনুষ্ঠান ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদি যাহা সাধারণ মানুষকে তাহাদের ছকবাধা জীবনের ঘানি হইতে কিছুটা পরিত্রাণ লাভের সুযোগ দান করিত।

জনসাধারণ যেসব খেলাধূলায় অংশ গ্রহণ করিত সেগুলি হইল মোরগ নেকড়ে ও ষাঁড়ের লড়াই, তাসখেলা, দড়াবাজি খেলা, দড়ির উপর হাটিবার খেলা, পুতুল নাচ এবং শুধু অভিজাতদের জন্য ছিল পোলো খেলা। সাফাভীয় যুগের পূর্বে হইতেই শারীরিক ব্যায়াম ছিল ইরানে একটি সাধারণ অভ্যাস এবং আধুনিক কাল পর্যন্ত ইহা চালু রহিয়াছে। শারীরিক ব্যায়ামে যাহারা অবসর যাপন করিত তাহারা একটি ভ্রাতৃসংঘ গঠন করিত এবং বর্তমান যুগ পর্যন্ত এইসব ভ্রাতৃসংঘ চালু রহিয়াছে। তাহাদের কেন্দ্রকে বলা হইত 'শক্তির গৃহ' এবং বিশেষ পালনীয় বিধি সম্বলিত তাহাদের একটি শ্রেণী ছিল। বাদ্যের তালে তালে তাহারা ব্যায়াম করিত। সাধারণতঃ বাদক হইত মধুর স্বরের একজন লোক যে শাহ-নামা হইতে পারস্যের নায়কদের দুঃসাহসিক কার্যের গল্পসমূহ কবিতাকারে আবৃত্তি করিয়া শুনাইত।

ইসলাম এবং বিশেষতঃ শীয়া ইসলাম, ইহার অনুসারীদের জীবনে খুব বেশী অনুষ্ঠানের দিন আনয়ন করে নাই। হযরত মুহম্মদের (সঃ) ঐশী আদেশ লাভ ও কোরবানীর (ঈদ-উল-আযহা কোরানের দ্বারা অবশ্য পালনীয় এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে উদ্‌যাপিত) বার্ষিক অনুষ্ঠান ছাড়া বাকী-গুলি হইল শোকের অনুষ্ঠান। আলী ও হাসানের মৃত্যুর জন্য শোক দিবস ছিল এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিয়োগান্ত কারবালার ঘটনা, যেখানে হোসাইন তাঁহার জীবন বিসর্জন দেন। শীয়া মতবাদের প্রতি আগ্রহ প্রদর্শন স্বরূপ সাফাভীয়গণ এইসব দিবস পালনে উৎসাহ প্রদান করিত এবং জনসাধারণ মসজিদসমূহে ভীড় করিত এবং মোল্লাদের দ্বারা ঐসব গল্পসমূহের পুনরাবৃত্তি শুনিয়া ক্রন্দন করিত এবং অসংখ্য শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করিত।

দশম মুহরমের কারবালার ঘটনা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ (মুহরম মুসলিম চান্দ্রমাসিক পঞ্জিকার প্রথম মাস)। দেশের সর্বত্র ঐদিন শোভাযাত্রা থাকিত। নগরগুলিতে জেলাসমূহ হইতে আগত শোভাযাত্রার উৎকর্ষ লইয়া একে অপরের সহিত প্রতিযোগিতা করিত এবং কখনও কখনও এমন

কি একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করিত। এইসব শোভাযাত্রায় রক্তাপ্লুত শবাচ্ছাদানিতে মুড়িয়া মৃত দেহসমূহ ও হোসাইনের একটি মস্তকহীন দেহ লইয়া তাহারা রাস্তা প্রদক্ষিণ করিত। উমাইয়া খলিফা ইয়াযীদকে এই সব শোভাযাত্রায় মনুষ্যরূপে সাজানো হইত এবং ইহা সুন্নীদিগকে অভিশাপ দেওয়ার জন্য দর্শকদিগকে সুযোগ দান করিত। ইয়াযীদের সৈন্যগণ হঠাৎ আক্রমণ করিয়া হোসাইনকে হত্যা করিয়াছিল। প্রত্যেক শোভাযাত্রায় শত শত লোক অংশ গ্রহণ করিত। কেউ কেউ তাহাদের বক্ষ বিদীর্ণ করিত। আবার অনেকে একগুচ্ছ শিকল দিয়া নিজেদের উন্মুক্ত পীঠে আঘাত করিত। দশম দিবসে ধর্মীয় অনুভূতি চরম আকার ধারণ করিলে একটি নতুন দল শোভাযাত্রায় অবতীর্ণ হইত। এইসব লোক সাদা শবাচ্ছাদানিতে আবৃত থাকিত এবং প্রত্যেকে তাহার ডান হাতে একটি ছোট ছোরা ধরিয়া রাখিত আর বাম হাতে সে তাহার সঙ্গী কোমরবন্ধনী ধরিয়া রাখিত। তাহারা নিজেদের মস্তকে আঘাত করিতে করিতে রাস্তার এক পার্শ্ব দিয়া প্রদক্ষিণ করিত। সর্বদা তাহারা অন্ত্যেষ্টিকালের শোকসূচক গান করিত এবং সমবেত কণ্ঠে "ইয়া হোসাইন," "শাহ হোসাইন" বলিয়া ধ্বনি দিত।

সাফাভীয় যুগের শেষের দিকে "অনুরাগের খেলা" প্রচলিত হয়। ভ্রাম্যমান নায়কদের দল সম্পূর্ণ পোশাক-পরিচ্ছদ ও তুলি দ্বারা চেহারা সজ্জিত করিয়া কারবালার বিভিন্ন দৃশ্যের বাস্তব ও কল্পিত ঘটনাবলী গ্রামে ও শহরে চৌরাস্তাগুলিতে নাটকীয় আকারে প্রদর্শন করিত।

সাহিত্যিক ও বুদ্ধিমত্তার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা ছিল তুলনামূলকভাবে নির্জীব যুগ। আব্বাসীয় খলিফাদের সময় শীয়া মতবাদকে ধর্মবিরুদ্ধ মত বলিয়া বিবেচনা করা হয় এবং ফলে ইহা সব রকমের স্বাধীন চিন্তাবিদ-দিগকে প্রলুব্ধ করে। শীয়াদের মধ্যে সাধারণতঃ বাধাহীন বুদ্ধিবৃত্তিমূলক অনুসন্ধিৎসা দেখা যায়। তবে সাফাভীয়দের সময় শীয়া মতবাদ রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা লাভ করে এবং একটি অত্যন্ত কঠোর ও ধর্মান্ধ গোড়া ধর্মে পরিণত হয়। বুদ্ধিমত্তার দিক হইতে ইহা যে বন্ধ্যাযুগ ছিল তাহার প্রমাণ এই যে ১৫০০ খ্রীস্টাব্দের পরে ইরান মাত্র দুইজন উল্লেখযোগ্য দার্শনিক প্রস্তুত করিয়াছে। একজন শিরাজের মোল্লা সাদ্রা (মৃত্যু ১৬৪১ খ্রীঃ) এবং আরেক-জন সাবজাভারের হাজী মোল্লা হাদী।

একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী

Alderson, A. D., The Structure of the Ottoman Dynasty. Oxford : Clarendon press, 1956.

Arberry, A. J., Classical Persian Literature. London : George Allen of Unwin, Ltd. 1958.

Browne, E. G., A Literary History of persia. (4 vols.) Cambridge, England : Cambridge University press, 1964.

Bosworth, C. E., The Islamic Dynasties. Edinburgh : The University Press, 1967.

Eversley, G. J. S. and Chirol, Valentine, The Turkish Empire from 1288 to 1922. London : T. Fisher Unwin, 1923.

Fisher, Sydney Nettleton, The Foreign Relations of Turkey, 1481—1512. Urbana, Ill. : University of Illinois Press, 1948.

Hasluck, F. W., Christianity and Islam Under the Sultans. Oxford, England : Oxford University Press, 1929.

Howorth, H. H., History of Mongols (4 vols.) London : Longmans & Green, 1870—1927.

Kritzeck, James, ed., Anthology of Islamic Literature. New York : Holt, Rinehart & Winston, 1964.

Le Strange, Guy, Mesopotamia and Persia Under the Mongols in the 14th Century A.D. London : Royal Asiatic Society, 1903.

Lockart, Laurence, Nadir Shah—A Critical Study Based

Mainly Upon Contemporary Sources. London : Luzac, 1938.

Levy, Reuben, The Social Structure of Islam. Cambridge, England Cambridge University press, 1962.

Merriman, R. B., Suleiman the Magnificent, 1520-1566 Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1944.

Runçiman, Steven, A History of the Crusades (4 vols.). Cambridge, England : Cambridge University Press, 1951-58.

Spular, Bertold, The Muslim World, part II—The Mongol Period. Leiden, Netherlands : E. J. Brill, 1960.

Sykes, Sir percy, History of Persia (2 vols. 3rd ed.). London : Macmillan, 1951.

Wittek, paul, The Rise of the Ottoman Empire. London : Royal Asiatic Society, 1938.

Wright, walter, trans., Ottoman Statecraft Princeton, N. J. : princeton University Press, 1935.

তৃতীয় খণ্ড

সাম্রাজ্যবাদ ও জাগরণ

ঊনবিংশ অধ্যায়

ওসমানীয় সাম্রাজ্য লইয়া সংঘর্ষ

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইসলামী বিশ্ব মধ্য ইউরোপ হইতে মধ্য-এশিয়া এবং মরক্কো হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত এলাকায় বিস্তৃত ছিল। ৩০০ বৎসরেরও অধিক সময় পর্যন্ত ইহার ভাগ্য ছিল তুর্কী বংশোদ্ভূত লোক-দের হাতে। পশ্চিমে ইহার ভাগ্যনিয়ন্তা ছিল সাফাভীয়গণ এবং ভারতবর্ষে মোগলগণ। তুর্কী বংশ ছাড়াও, এই তিনটি সাম্রাজ্যের লোকদের মধ্যে অনেক মিল ছিল। তাহারা সবাই ছিল মুসলমান। আবৃত্তি করিত একই কোরান, নামাজ পড়িত কা'বার (মক্কার) দিকে মুখ করিয়া এবং তাহারা ইসলামের ধর্মীয় আইন অর্থাৎ শরীয়তকে মান্য করিত। তদুপরি তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকজন ফার্সী সাহিত্য পছন্দ করিত এবং প্রায়ই সেই ভাষায় চিঠিপত্রাদি আদান-প্রদান করিত; একজন 'সংস্কৃতিসম্পন্ন' লোকের মূল্যায়ন করা হইত পারস্য সাহিত্য, ইতিহাস, শিল্পকলা ও আচার-ব্যব-হারের মাপ কাঠিতে।

কিন্তু তবুও এই তিনটি সাম্রাজ্য কখনও একত্রিত যেমন হয় নাই, তেমনি পরিকল্পনায় সহযোগিতাও করে নাই। সুদূর ব্যবধান ও যোগাযোগের অভাবও এই জন্য কিয়দংশে দায়ী। তবে প্রধান কারণ হইল এই যে সাফা-ভীয় ইরান ছিল ধর্মের দিক হইতে শীয়া, এবং ইহার মধ্যবর্তী ভৌগলিক অবস্থান ওসমানীয় ও মোগলদের দুইটি সুন্নী সাম্রাজ্যকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখে। অপরদিকে ধর্মীয় পার্থক্য বাদ দিলে দেখা যায় ইরান ও ভারত-বর্ষের মধ্যে যথেষ্ট সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল এবং মধ্য এশিয়ার গোত্রসমূহের সাময়িক আক্রমণ ব্যতীত তাহাদের সীমান্তগুলি খুবই শান্তিপূর্ণ ছিল।

সাফাভীয় ও ওসমানীয় সাম্রাজ্যদ্বয়ের মধ্যে বিদ্যমান গোঁড়া ধর্মীয়

২০—

শক্রতা, দক্ষিণ মেসোপোটমিয়ার নজফ ও কারবালায় অবস্থিত শীয়া পবিত্র স্থানগুলির কর্তৃত্ব লইয়া এবং পূর্ব এশিয়া মাইনরের শীয়া বসতিগুলির বিবাদের দ্বারা আরও ঘোরতর আকার ধারণ করে। অর্থনৈতিক দিক দিয়া ওসমানীয় সাম্রাজ্য ইরান ও ভূমধ্যসাগরকে সংযুক্তকারী চিরাচরিত বাণিজ্যপথ দার্দানালিশ ও বসফরাস প্রণালীতে আড়াআড়িভাবে স্থাপিত। এই বাধা অতিক্রম করিবার জন্যই, সাফাভীয় শাহ্‌গণ ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে ইউরোপের বিভিন্ন নৃপতিদের সঙ্গে মিত্রতাসুলভ বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে চেষ্টা করে। ইহা যখন অসম্ভব বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তখন ব্যবসায়ী দলগুলি ভূমধ্যসাগর ও ক্রমশঃ লেবাননের মধ্য দিয়া এই বাধা অতিক্রম করে এবং পারস্য উপসাগরে বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করে। নিঃসন্দেহে ইউরোপীয় জাতিসমূহ এই প্রবল শক্রতার দ্বারা উপকৃত হয়, কারণ সমগ্র সপ্তদশ শতাব্দী এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর কিয়দংশে ওসমানীয় এবং পারস্যবাসীগণ ইউরোপের ব্যবসায়ী ও জাতিসমূহকে বিশেষ অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সুবিধাদি প্রদানের ব্যাপারে একে অপরের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়।

ওসমানীয় ও সাফাভীয়দের শক্রতা সৃষ্টির ব্যাপারে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার চেয়ে ভাষাগত পার্থক্যই বোধহয় অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আজারবাইজান ও উত্তর পশ্চিম ইরানের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসীগণ ছিল তুর্কীভাষী। অবিরাম যুদ্ধবিগ্রহ এবং ধর্মীয় গোঁড়ামী, জাতিদ্বয়কে বিভক্ত করিয়া রাখে এবং একটিকে 'পারস্যবাসী' আর অপরটিকে 'তুর্কী' বলিয়া চিহ্নিত করে। অমুসলিমদের বিরুদ্ধে ইসলামের সীমান্ত বিস্তৃতির কোন উদ্দেশ্য শীয়াদের থাকিলেও সাফাভীয়গণ উহাকে নিরুৎসাহ করে। তৎপরিবর্তে তাহারা সুন্নীদিগকে ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে। বিশেষতঃ ওসমানীয় সুন্নীদিগকে যেখানেই পাইত ধ্বংস করিত এবং শীয়াদিগকে ইমামত 'জবরদখলকারী'দিগকে (অর্থাৎ ইসলামের প্রথম তিন খলিফাকে) অভিশাপ দিতে বাধ্য করিত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন ইউরোপের অধিকাংশ দেশে সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নবজাগরণের সূচনা হয়, তখন ইসলামী বিশ্বে বন্ধ্যাবস্থা পরিলক্ষিত হয়। মোগল সাম্রাজ্য তখন পতনের সম্মুখীন এবং পাশ্চাত্যের ব্যবসায়ী দুঃসাহসিক অভিযাত্রীদের শিকারে পরিণত হইয়াছে।

সাফাভীয়গণ ধ্বংসের পথে এবং ওসমানীয়গণ যদিও সাম্রাজ্যের বৃহৎ আকারের দরুণ তখনও বেশ শক্তিশালী, কিন্তু পতনের দিক দিয়া সাফাভীয়-দের তেমন পশ্চাতে ছিল না।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের জন্য শুধু ইউরোপ দায়ী ছিল না। সাম্রাজ্য খণ্ড-বিখণ্ড হওয়া ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছিল এবং নিজেদের দুর্বলতার দরুণ সাম্রাজ্য এমনিতেই বিখণ্ডিত হইয়া যাইত। খণ্ড খণ্ড অংশগুলি কুড়াইয়া লইবার জন্য ইউরোপীয় দেশগুলি ঘটনাচক্রে সেখানে ছিল। ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকিলে ওসমানীয় সাম্রাজ্য পরবর্তী ২০০ বৎসর টিকিয়া থাকিতে পারিত না। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের কোন কোন বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ দেওয়ালের লেখন দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেউ তাঁহাদের প্রতি কর্ণপাত করেন নাই।

এই বিদ্বান লেখকদের মধ্যে একজন কোজী বে, যিনি সুলতান চতুর্থ মুরাদ ২১ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলে, ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অবস্থার উপর একটি রিপোর্ট লেখেন। সম্ভবতঃ অনেকগুলি অযোগ্য সুলতানদের তুলনামূলকভাবে যোগ্য এই সুলতান স্বয়ং অথবা তাঁহার বুদ্ধিমতী মাতা, এই ধরনের একটি রিপোর্ট লিখিতে আদেশ দেন। যাচাই হউক কোজীবে অস্বাভাবিক পরিষ্কার ভাষায় সাম্রাজ্যের অধঃপতন বর্ণনা করেন এবং 'বিসালাহ্' নামে পরিচিত তাঁহার রিপোর্টে ইহার কারণ ব্যাখ্যা করেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি উল্লেখ করেন যে, সুলতান নিজেকে 'অলক্ষ্যণীয়' করিয়া তুলিয়াছেন এবং হেরেম জীবনের মধ্যে ব্যস্ত রাখিয়াছেন। হেরেমের প্রভাবের ফলে "সুলতান স্বয়ং শাসন করেন না এবং প্রধান উজীরকেও এই কাজ করিতে দেওয়া হয় না; সত্যিকারভাবে ক্ষমতা রহিয়াছে নিগ্রো খোজা ও ক্রীতদাসীদের হাতে।" সাম্রাজ্যের অর্থ-নৈতিক পতনের কথাও তিনি উল্লেখ করেন এবং ইহার জন্য প্রধানতঃ করের বোঝা ও প্রশাসনের নীতিহীনতাকে দায়ী করেন। তিনি সিপাহী সংগঠনের সমালোচনা করেন। এই সৈন্যগুলিই সুলতান চতুর্থ মুরাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং জান-নিসারীগণ এই বিদ্রোহ দমনে সাহায্য করি-লেও কোজী বে তাহাদিগকে সমালোচনা হইতে রেহাই দেন নাই।

প্রায় ২৫ বৎসর পর সুলতান ইব্রাহীমের (১৬৪০—১৬৪৮ খ্রীঃ) রাজত্ব-কালে একজন অজ্ঞাত পরিচয় গ্রন্থকার 'নসিহতনামাহ্' বা 'উপদেশবাক্য' নামে একটি পুস্তক রচনা করেন। তিনি চরিত্রহীনতা এবং সর্বোচ্চ মূল্যদাতার নিকট কর আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করা সম্পর্কে অভিযোগ করেন। তাঁহার উপদেশ, সম্ভবতঃ সুলতানের প্রতি ছিল করের বোঝা হাল্কা করা এবং কৃষকদের মধ্যে কর্মকর্তা ও সেনাবাহিনীকে ছাড়িয়া না দিয়া তাহাদিগকে বেতন প্রদান করা। তাঁহার যুক্তি ছিল নির্ধারিত করপ্রথা প্রচলিত করা এবং পুণ্যবান মুসলমানদিগকে কর আদায়কারী হিসাবে নিযুক্ত করা।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ওসমানীয় সাম্রাজ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবী জ্যোতিষ্ক ছিলেন প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাজী খলিফা (১৬০৮—১৬৫৭ খ্রীঃ)। তাঁহার গ্রন্থসমূহের মধ্যে একটি গ্রন্থ 'দস্তুর আল আমাল' বা 'কাজকর্মের নীতি' অনেকাংশে পারস্যের 'যুবরাজ দর্পনের' ন্যায়।[১] তিনি পুরাতন আপ্তবাক্য পুনরুল্লেখ করেন, "রিজাল (কাজকর্মের) লোকজন ছাড়া রাষ্ট্র হয় না, মাল (সম্পদ) ছাড়া রিজাল হয় না এবং প্রজা ছাড়া মাল হয় না।" আবি সিনার ন্যায় তিনি রাষ্ট্রকে চারি স্তম্ভ বিশিষ্ট দলের সঙ্গে তুলনা করেন—উলামা, সেনাবাহিনী, ব্যবসায়ী ও কৃষক। তিনি দাবী করেন যে রাষ্ট্র রুগ্ন হইয়াছে এবং এই রোগের কারণ হিসাবে তিনি যেগুলিকে দায়ী করেন সেইগুলি হইল উচ্চ কর বোঝা, জনগণের প্রতি অত্যাচার এবং সর্বোচ্চ ডাককারীর নিকট বিভিন্ন পদ বিক্রয়।

এই পতনোন্মুখ অবস্থায়ই ওসমানীয়গণ ভিয়েনার বিরুদ্ধে তাহাদের শেষ অভিযান পরিচালনা করে। ভিয়েনা অনেকদিন যাবৎ তাহাদের কবল হইতে বাঁচিয়া থাকে। এই অভিযান চতুর্থ মুহাম্মদ ও তাঁহার অযোগ্য প্রিয়পাত্র প্রধান উজীর কারা মুস্তাফা কর্তৃক ১৬৮৩ খ্রীস্টাব্দে পরিচালিত হয়। জুলাই মাসের মধ্যভাগে কারা মুস্তাফা ভিয়েনা অবরোধ করেন এবং দুই মাস পর্যন্ত নগরীর উপর গোলা নিক্ষেপ করেন। কাউণ্টস্টার হেমবার্গ-এর সেনাপতিত্বে নগরীর প্রতিরক্ষা বাহিনীর অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করে বলিয়া কারা মুস্তাফা নগরীর আত্মসমর্পন আশা করিতেছিলেন। যদিও তিনি জানিতেন যে পোল্যাণ্ডের রাজা জন সোবিস্কি

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১২০ (মূল গ্রন্থ)।

৭০,০০০ সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইতেছেন তবুও কারা মুস্তাফা তাহাদের অগ্রগতি বন্ধ করিবার জন্য যেমন কিছু করেন নাই ঠিক তেমনি তাহাদের বিরুদ্ধে স্বীয় প্রতিরক্ষাব্যূহ রচনার ব্যাপারেও কিছু করেন নাই। সেই ভাগ্য নির্ধারনী যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৬৮৩ খ্রীস্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর। ওসমানীয় বাহিনী পরাজিত হয়, অষ্ট্রীয় ও পোলগণ তাহাদের বিজয় অব্যাহত রাখে। ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ওসমানীয়গণ অষ্ট্রীয়ানদের নিকট সমস্ত হাঙ্গেরী এবং ভেসোমিয়ানদের নিকট মোরিয়া, কোরিন্থ, ও এথেন্স হারাইয়া ফেলে। ওসমানীয়গণ মুহাম্মদকে তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় সোলাইমানের (১৬৮৭—১৬৯১ খ্রীঃ) স্বপক্ষে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করে। সোলাইমান ৪৫ বৎসরের মধ্যে খুব কম সময়ই হেরেম হইতে বাহির হইয়াছেন। ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে বেলগ্রেডের পতন হয়। বাধ্য হইয়া সোলাইমান আহম্মদের ভ্রাতা মুস্তাফা কপরুলকে প্রধান উজীরের পদ গ্রহণ করিবার জন্য আহ্বান করেন। কিছুকালের জন্য তিনি সীমান্তরেখা আঁকড়াইয়া থাকিতে সক্ষম হন কিন্তু ওসমানীয় সাম্রাজ্য ইতিমধ্যে ইহার প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং অবস্থার মোকাবিলা করিবার যোগ্যতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। চূড়ান্ত আঘাত করেন সেভয়ের রাজা ইউজীন ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে জেন্তার যুদ্ধে। দুই বৎসর পর কার্লোইজের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

কার্লোইজ ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা করে। ইহা হইল অনেকগুলি আদেশকৃত শান্তি চুক্তির মধ্যে একটি, যাহা তুর্কীগণ স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হয়। ইউরোপীয় কূটনীতিবিদগণ বুঝিতে পারিলেন যে অতঃপর তুর্কীগণ ইউরোপের অখণ্ডতার প্রতি হুমকি হইয়া দাঁড়াইবে না। অপরদিকে ওসমানীয়গণ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করিল যে তাহাদের সাম্রাজ্য ইউরোপীয় দেশগুলির কৃপার পাত্র হইয়া দাঁড়াইল। তদুপরি ওসমানীয়গণ উপলব্ধি করিতে বাধ্য হয় যে—উইরোপীয়গণ মনে করে যে সুলতান, খলিফা এমন একটি সাম্রাজ্য শাসন করেন যেখানে খ্রীস্টান 'সংখ্যালঘুদে'র সংখ্যা', মুসলিম 'সংখ্যাগুরু'র চেয়ে অনেক বেশী এবং এই ব্যতিক্রম তাহারা আর চলিতে দিতে রাজী নহে।

ইউরোপে ওসমানীয় তুর্কীর চিরাচরিত শত্রু ছিল অষ্ট্রীয়া, পোল্যাণ্ড ও ভেনিস। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে নগর রাষ্ট্রের কোন উল্লেখ ছিল না।

ভেনিস ছিল পতনোন্মুখ এবং শীঘ্রই ইহা প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। পোল্যাণ্ড ছিল চতুর্দিকে রাশিয়া, প্রুসিয়া ও অষ্ট্রীয়ার ন্যায় উদীয়মান শক্তিসমূহের দ্বারা বেষ্টিত। অষ্টাদশ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বে এই অসহায় দেশ ঐসব পরিবেষ্টিত দেশসমূহের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায় এবং ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে ইহা তাহার কাহিল স্বাধীনতা ফিরিয়া পায় নাই। সমগ্র অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে অষ্ট্রীয়া মোটামুটি শক্তিশালী ছিল কিন্তু ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ন্যায় ইহাও ছিল পতনোন্মুখ অষ্ট্রিয়া ছিল অনেকগুলি জাতি সমন্বয়ে গঠিত একটি দেশ ফলে ইহা অত্যন্ত বেসামাল হইয়া পড়ে এবং সর্বদা বিভক্ত হইবার উপক্রম হয়। রুশদের সংকল্প ও পদক্ষেপ না থাকিলে অষ্ট্রীয়া ইউরোপের দক্ষিণ পূর্ব অংশে ওসমানীয়দের বিরাট এলাকায় হুমকি দেওয়ার ন্যায় সাহস ও যোগ্যতা অর্জন করিতে পারিত না।

ওসমানীয়গণ রুশদের সম্পর্কে বেশী কিছু জানিত না। শুধু এতটুকু জানিত যে তাহারা ছিল তুর্কীদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় তাতারদের দাস। কৃষ্ণ সাগরের উত্তরে ওসমানীয় সুলতানগণ এক বিরাট এলাকার মালিক ছিল, যাহার ফলে এই সাগর সুলতানদের একটি নিজস্ব হ্রদে পরিণত হয়। ইহার উত্তরে তাহাদের নিকট আকর্ষণীয় কিছু ছিল না বলিয়া তাহারা রুশদের কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছিল।

তবে রুশ শাসকবর্গ ওসমানীয়দিগকে ভুলেন নাই। স্মরণ করা যাইতে পারে যে রুশ রাষ্ট্রের মূল ভিত্তিই ছিল বাইজেণ্টাইন প্রতিষ্ঠান ও নৈতিকতার উপর রচিত। রাশিয়ার আইন, স্থাপত্যশিল্প, বর্ণমালা ও ধর্ম লওয়া হয় বাইজান্টিয়ান হইতে। মোঙ্গল আধিপত্যের পূর্বে রুশ ব্যবসার অধিকাংশই ছিল দক্ষিণের সঙ্গে। রুশগণ তাহাদের মুসলিম শাসনাধীন স্বধর্মীয়দের সঙ্গে সর্বদা একাত্মতা বোধ করিত। মস্কোর রাজা তৃতীয় আইভান (১৪৬২—১৫০৫ খ্রীঃ) শেষ বাইজেণ্টাইন সম্রাটের এতিম ভাতুষ্পুত্রী সোফিয়া প্যালিওলোগাসকে বিবাহ করিলে তিনি অনুভব করেন যে, সোফিয়ার সঙ্গে তিনি বাইজেন্টিয়ামের ধর্মীয় ও পার্থিব ক্ষমতাকেও বিবাহ করিয়াছেন। ১৫৪৭ খ্রীস্টাব্দে সোফিয়ার পৌত্র ভয়াবহ আইভান যিনি নিজেকে বাইজেণ্টাইন সম্রাটদের উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করেন, 'সমস্ত রুশদের জার' বলিয়া

নিজেকে অভিষিক্ত করেন। রাশিয়ার গীর্জার নেতৃবৃন্দ এই নীতি উপস্থাপিত করেন যে ধর্মের বিরুদ্ধাচারণের দ্বারা রোমের 'পতন' এবং তুর্কীদের দ্বারা কনস্টান্টিনোপলের (দ্বিতীয় রোম) পতনের ফলে 'তৃতীয় রোম' মস্কো অতঃপর খ্রীস্টান ধর্মের রাজধানী হইল এবং সমস্ত খ্রীস্টান বিশেষতঃ অর্থোডক্সদের অভিভাবক হইল। রুশদের নিকট কনস্টান্টিনোপল ছিল সর্বদা 'জারগ্রাদ'। রুশদের জারের পক্ষে 'অবিশ্বাসী' মুসলমানদের নিকট হইতে জারগ্রাদ পুনরায় জয় এবং সমস্ত অর্থোডক্সদিগকে তুর্কী জোয়াল হইতে মুক্ত করিবার চাইতে উপযুক্ত আর কি হইতে পারে?

রুশদিগকে দক্ষিণ অভিমুখে পরিচালনা করিবার জন্য ধর্মীয় ও রাজকীয় ঐতিহ্য একমাত্র শক্তি নহে। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রজাসাধারণের এক বিরাট অংশ ছিল স্লাভ। রুশ রাষ্ট্র শক্তিশালী হইবার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী ক্ষমতাধীন অন্যান্য স্লাভদের প্রতি 'জ্যেষ্ঠভ্রাতা' সুলভ আচরণ করিতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে স্লাভবাদ রাশিয়ায় একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়তাবাদী মতবাদে পরিণত হয় এবং রুশ সাম্রাজ্যবাদের একটি অতি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হইয়া দাঁড়ায়। অতএব উদ্দেশ্য হিসাবে অর্থোডক্স মতবাদ ও স্লাভবাদ এবং উষ্ণ জলের বন্দরের আগ্রহ ও আকাঙ্খা লইয়া প্রসিদ্ধ পিটার হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেক রুশ জার বা রাষ্ট্রপ্রধান, পুঁজিবাদী বা কমিউনিষ্ট, কুটনীতি বা যুদ্ধের দ্বারা প্রণালী ও কনস্টান্টি-নোপলের উপর আধিপত্য লাভ করিতে চেষ্টা করে। ইহা তেমন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হইত না যদি না পশ্চিম ইউরোপীয় জাতিগুলি একাকী বা সম্মিলিত ভাবে রাশিয়ার প্রণালীর পথ বন্ধ করিত। অন্য যে কিছুর তুলনায় ইহাই ওসমানীয় সাম্রাজ্যের দীর্ঘজীবি হওয়ায় সাহায্য করিয়াছে এবং জীবিত রাখিয়াছে।

১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে নেপোলিয়ান রাশিয়ার প্রথম আলেকজাণ্ডারকে তিল-সিট প্রণালীতে অবাধ গতিবিধি প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে।

রাশিয়া কর্তৃক ইস্তাম্বুল অধিকারে বাধা প্রদান করিবার জন্য ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। হিটলার বিংশ শতাব্দীতে প্রণালী ও পারস্য উপসাগর এলাকায় সোভিয়েত রাশিয়ার দাবীকৃত 'আইনানুগ স্বার্থ' স্বীকার করিতে অস্বীকার করেন। ১৯৪৭

খ্রীস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান তুরস্ককে রক্ষা করিবার জন্য তথা-কথিত ট্রুম্যান মতবাদ (Truman Doctrin) জারী করেন এবং একই উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের শুভেচ্ছা লইয়া পাকিস্তান, ইরান, তুরস্ক ও গ্রেট ব্রিটনকে লইয়া সেন্ট্রাল ট্রিটি অরগানাইজেশন (CENTO) প্রতিষ্ঠা করেন। রাশিয়াকে ইস্তাম্বুল হস্তগত করা হইতে বিরত রাখিবার ব্যাপারে ইউরোপীয় জাতিসমূহের সাধারণ নিয়মে শুধু মাত্র একটি ব্যতিক্রম দেখা যায়। ইহা প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনের গোপন চুক্তিতে সংঘটিত হয়, যখন বিজয় লাভের পর যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি ভাগবাটোয়ার সময় ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী ও রাশিয়া, ইস্তাম্বুল ও প্রণালী সত্যি সত্যি রাশিয়াকে প্রদান করিতে সক্ষম হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যবাদের উল্লাসের কালে ইংল্যাণ্ড, জার্মানী ও ফ্রান্স রাশিয়ার সম্মুখে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অখণ্ড রক্ষার উপর জোর দেয় যদিও তাহারা স্বয়ং সেই অখণ্ডতা উত্তর আফ্রিকা ও ফারটাইল ক্রিসেণ্টে ভঙ্গ করে। তাহাদের এই কার্যের কারণ হইল তাহারা বিশ্বাস করে যে নীতিগতভাবে প্রণালী ও পারস্য উপসাগর এলাকা হইল 'অন্তস্থল' এবং যে-ই এই অঞ্চল শাসন করিবে সে-ই বিশ্বের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হইবে। রাশিয়াকে এই সুযোগ দিতে তাহারা নারাজ আবার অন্য কোন দেশ ইহা লাভ করুক তাহাও তাহারা চায় না। ফলে ইউরোপের কুটনীতিতে অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন হইল সেই অঞ্চলের সঠিক সম্পর্কের ভিত্তিতে কিভাবে সেই নাজুক অবস্থায় 'ক্ষমতার ভারসাম্য' রক্ষা করা যায়।

যাহা হউক, এই সব কিছুর অধিকাংশ সংঘটিত হয় সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর কিছু অংশে। ১৭০০ খ্রীস্টাব্দের দিকে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির সমস্যাবলী তাহাদিগকে রাশিয়ার প্রতি অধিক মনোযোগ প্রদানে বাধা দান করে। তদুপরি ওসমানীয় সাম্রাজ্য এত বিস্তৃত ছিল যে ইহার অস্তিত্ব অষ্ট্রীয়া বা রাশিয়া দ্বারা বিঘ্নিত হয় নাই। রাশিয়া ও অষ্ট্রীয়া কর্তৃক ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করা যে সম্ভব হয় নাই তাহা পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলির হস্তক্ষেপেদরুণ নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওসমানীয় সাম্রাজ্য বেশ শক্তিশালী এবং অষ্ট্রীয়া ও রাশিয়া তখনও শক্তিশালী হইয়া উঠে নাই। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের উপর আক্রমণের সময় প্রায়ই

রাশিয়া প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং অস্ট্রীয়া তাহা অনুসরণ করে মাত্র।

রাশিয়ার প্রসিদ্ধ পিটার, যিনি কৃষ্ণ সাগরে একটি ঘাঁটি প্রস্তুত করিবার আশা পোষণ করেন, ইতিমধ্যে কৃষ্ণ সাগরের আজভ অধিকার করেন। তবে তিনি সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই এবং ১৭১১ খ্রীস্টাব্দে তুর্কীদিগকে আক্রমণ করেন। তিনি স্বয়ং রাশিয়ার অপপ্রচারের শিকার হন এবং দৃশ্যতঃ বিশ্বাস করেন যে তিনি বেসারাবিয়ার অধিবাসীগণ কর্তৃক মুক্তিদাতা হিসাবে সম্বর্ধিত হইবেন। সামরিক কৌশলে কিছুটা অসাবধান হইবার ফলে প্রার্থ নদী পার হইবার পর তিনি রীতিমত অবরুদ্ধ হন। জীবন লইয়া ফিরিবার জন্য তাহাকে প্রাথের সন্ধি মানিয়া লইতে হয়; আজভ ত্যাগ করিতে হয় এবং কৃষ্ণ সাগরে একটি নৌবাহিনী মোতায়েন রাখিবার দাবী ছাড়িয়া দিতে হয়। তুর্কীগণ রুশদিগকে ধ্বংস করিবার একটি সুযোগ হারায়।

তবে ওসমানীয়গণ ভেনিসের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে এবং ১৭১৫ খ্রীস্টাব্দে মোরিয়া পুনরায় জয় করে। জনসাধারণ ভেনিসীয়দের দ্বারা এমন কঠোরভাবে শোষিত হয় যে তাহারা পুনরায় ওসমানীয়দের নিকট ফিরিয়া যাইতে আগ্রহী হয়। অস্ট্রীয়গণ তুর্কী বিজয়সমূহের দ্বারা আতঙ্কগ্রস্ত হয় এবং মহামান্য সুলতানের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি ভঙ্গ করে। রাজা ইউজ্রান ওসমানীয়দিগকে কয়েক দফা আঘাত করেন এবং তাহাদিগকে পিটারওয়া-দীনের যুদ্ধে পরাজিত করেন। ইটালীতে স্পেনীয় নীতিতে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ১৭১৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্যাসরোভীজের উদারমূলক শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ভেনিস হইতে জয় করা সমস্ত এলাকা অস্ট্রীয়া তাহার আয়ত্তে রাখে। ওসমানীয়গণ হাঙ্গেরীর বাকী অংশ এবং ওয়ালাচীয়া হারায়, কিন্তু ভেনিস হইতে জয় করা অংশ তাহাদিগকে রাখিবার অনুমতি দেওয়া হয়।

১৭৩৬ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়া ইরানের শক্তিশালী শাসক নাদির শাহের সহিত ওসমানীয়দের সম্পর্কের সুযোগ গ্রহণ করে এবং ক্রিমিয়া কৃষ্ণসাগরের বহু দুর্গ আক্রমণ করে। অস্ট্রীয়া এই গণ্ডগোলে অংশ করে কিন্তু অস্ট্রীয়াদিগকে পিছু হটানো এবং রুশদিগকে দূরে রাখিবার মত যথেষ্ট শক্তি ওসমানীয়দের ছিল। ফলে ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে বেলগ্রেড চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অস্ট্রীয়া

পরাজিত হয় কিন্তু রাশিয়া পুনরায় আজভ লাভ করে এবং তুর্কী জাহাজে করিয়া মালপত্র পার করিবার শর্তে কৃষ্ণ সাগরে ব্যবসা করিবার অধিকার ছাড়া বেশী কিছু পায় নাই।

বেলগ্রেডের চুক্তির পর ৩০ বৎসরের জন্য ওসমানীয়গণ একটি শান্তির যুগ উপভোগ করে। ১৭৪৭ খ্রীস্টাব্দে নাদির শাহ নিহত হন এবং ইউরোপীয় দেশগুলি অষ্ট্রীয় উত্তরাধিকারের যুদ্ধ (১৭৪০—১৭৪৮ খ্রীঃ) এবং সপ্ত বৎসরের যুদ্ধে (১৭৫৬—১৭৬৩ খ্রীঃ) জড়াইয়া পড়ে। ওসমানীয় সুলতান প্রথম মাহমুদ (১৭৩০—১৭৫৪ খ্রীঃ) তৃতীয় ওসমান (১৭৫৪—১৭৫৭ খ্রীঃ) এবং তৃতীয় মুস্তফা (১৭৫৭—১৭৭৩ খ্রীঃ) নিজদিগকে শক্তিশালী করিবার সুযোগ গ্রহণ করেন নাই। বস্তুতঃ সপ্ত বৎসরের যুদ্ধের সময় প্রুশিয়ার মহান ফ্রেডারিক সুলতানকে অষ্ট্রীয়া আক্রমণ করিবার উৎসাহ প্রদানের চেষ্টা করেন। সুদক্ষ প্রধান উজীর-দের মধ্যে সম্ভবতঃ শেষ উজীর রাগেব পাশা ১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে একটি মিত্রতার সন্ধির খসড়া রচনা করেন কিন্তু উলামাদের দ্বারা উৎসাহিত হইয়া সুলতান তৃতীয় মুস্তাফা ইহাতে জড়াইতে অস্বীকার করেন। এক বৎসর পর দ্বিতীয় ক্যাথারীন রাশিয়াও মহারাণী হন কিন্তু ওসমানীয়দের পক্ষে নিজদিগের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তখন অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে।

১৭৬১ খ্রীস্টাব্দে সুলতান ইউরোপীয় রাজনীতিতে জড়াইয়া পড়িতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন অথচ ইহা তখন হয়ত সুলতানের পক্ষে সুবিধাজনক হইত। সাত বৎসর পর উলামাদের সম্মতি লইয়া সুলতান রুশ আক্রমণ হইতে পোল্যাণ্ডের অখণ্ডতা রক্ষা করিবার জন্য অষ্ট্রীয়া, ফ্রান্স ও সুইডেনের সমন্বয়ে গঠিত 'সন্ধিসূত্রে' যোগদান করেন। শেষ পর্যন্ত যে শুধু পোল্যাণ্ড বিভক্ত হয় নাই তাহা নহে বরং যে দেশ কোন উপকার লাভ করে নাই তাহা হইল তুরস্ক।

সুলতান অতি সন্দেহের চোখে পোল্যাণ্ডের উপর রুশ মতলব লক্ষ্য করেন। বিখ্যাত ক্যাথারীনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়াকে ইউরোপের মধ্যে একটি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করা এবং ইউরোপীয় রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করা। এই লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে একটি পদক্ষেপ হিসাবে ক্যাথারীন পোল্যাণ্ডের উপর রুশ আধিপত্যে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৭৬৩ খ্রীস্টাব্দে পোল্যাণ্ডের সিংহাসন খালি

হয় এবং ইহা ক্যাথারীনকে রুশ হস্তক্ষেপের আকাঙ্খিত সুযোগ দান করে। ক্যাথারীনের কৌশলে এবং প্রুশিয়ার প্রসিদ্ধ ফ্রেডারিকের সহায়তায় কাউণ্ট স্ট্যানিসলাস পনিয়াটোভস্কি নামক ক্যাথারীনের একজন সাবেক প্রেমিককে রাজা মনোনীত করা হয়। রুশ সম্রাজ্ঞী বলিতেন, পনিয়াটোভস্কির অধিকার ছিল "অন্য যে কোন প্রার্থীর (রাজা হইবার জন্য) তুলনায় নগণ্য এবং তাই অধিক ভাবে রাশিয়ার নিকট কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।" পানিয়াটোভস্কি কৃতজ্ঞই ছিলেন এবং ক্যাথারীনও ফ্রেডারিককে পোল্যাণ্ড ভাগ করিবার ব্যাপারে সাহায্য করেন।

রাশিয়া ও প্রুশিয়ার বিরুদ্ধে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ সদস্য ফ্রান্সের পঞ্চদশ লুই সুলতান মুস্তাফাকে তাঁহার অপ্রস্তুত সেনাবাহিনীকে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত করিবার চেষ্টা করেন। স্বীয় বাহিনী প্রস্তুত না থাকিলেও ক্যাথারীন এই সুযোগকে অভ্যর্থনা জানান। তাঁহার বর্তমান প্রেমিক গ্রেগরী অরলভ একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেন যাহা দ্বারা রুশ নৌবহরকে ইউরোপ ঘুরাইয়া ভূমধ্যসাগরে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করা হয় এবং এই পরিকল্পনা অনুযায়ী গ্রীক অর্থোডক্স ও বলকান স্লাভদের তুর্কীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে বসন্তকালের প্রথম দিকে গ্রেগরীর ভ্রাতা আলেক্সি অরলভের অধীনে একটি রুশ স্কোয়াড্রন ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয় এবং তুরস্কের উপকূলে উপস্থিত হয়। তবে খ্রীস্টান জনগণের বিদ্রোহ সংঘটিত হয় নাই। এখানে উল্লেখ করা উচিত যে ওসমানীয় মিল্লাত প্রথার দ্বারা খ্রীস্টান জনগণ তুলনামূলকভাবে স্বায়ত্বশাসিত ছিল এবং রুশ আধিপত্যের বিনিময়ে তাহারা এই সুবিধা ত্যাগ করিতে রাজী ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে বলকানের জনসাধারণ ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে যখন বিদ্রোহ করে তাহা ছিল তখন তাহাদের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য, রুশদের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য নহে।

রুশগণ চিয়স ও চিসমে অভূতপূর্ব বিজয় লাভ করে এবং ওসমানীয় নৌবহরের দলশুদ্ধ ধ্বংস করিয়া দেয় কিন্তু নৌবহরের শক্তিবৃদ্ধি করিয়াও রুশগণ ইস্তাম্বুলে পৌঁছিতে সক্ষম হয় নাই। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দের দিকে ক্যাথারীনকে স্বীকার করিতে হয় যে "নৌবহর কিছুই করিতেছে না।" স্থল যুদ্ধ ছিল মন্থর এবং কালক্ষেপণকারী। রুশ অগ্রগতি এত মন্থর ছিল

যে প্রুশিয়ার ফ্রেডারিককে সকৌতুকে মন্তব্য করিতে শোনা যায় যে ইহা একটি "খোঁড়া ও কানার মধ্যে" অনুষ্ঠিত যুদ্ধ। তবে রুশ অগ্রগতি অষ্ট্রীয়ার বিপদের পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হয় এবং সে অনতিবিলম্বে সুলতানদের সঙ্গে একটি পারস্পরিক সহযোগিতার সন্ধি স্বাক্ষর করে। অতঃপর অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে যুদ্ধ এড়াইবার জন্য ক্যাথারীন ও ফ্রেডারিক ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে পোল্যাণ্ডের প্রথম বিভক্তির সময় অষ্ট্রীয়াকে অংশীদার করিতে সম্মত হন। পোল্যাণ্ডের বিভক্তির ফলে তুর্কীগণ তাহাদের প্রতিরক্ষা আরও সুদৃঢ় করে, কারণ তাহারা সঠিকভাবেই বিশ্বাস করে যে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ভাগ্য লইয়াও শক্তিবর্গ অনুরূপভাবে ছিনিমিনি খেলিবেই। যুদ্ধ চলিতে থাকে। ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সুলতান মুস্তাফার মৃত্যুর ফলে তুর্কীদের প্রতিরক্ষা দুর্বল হইয়া পড়ে। একই বৎসর পুগাচেভের নেতৃত্বে পরিচালিত ক্যাথারীনের বিরুদ্ধে একটি চাষী বিপ্লব ব্যাপক আকার ধারণ করে। উভয় পক্ষ সরাসরি আলাপ আলোচনা চালায় এবং ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে কুচুক কাইনারজি সন্ধি স্বাক্ষরিত করে।

এই প্রসিদ্ধ চুক্তির শর্তানুসারে ক্রিমিয়া স্বায়ত্বশাসন লাভ করে এবং রাশিয়া কার্চ এবং বাভা ও নাইপার নদীর মধ্যবর্তী এলাকা অধিকার করে এবং প্রণালীর মধ্য দিয়া যাতায়াতের অধিকারসহ কৃষ্ণ সাগরে স্বাধীন নৌচালনার সুবিধা লাভ করে। সুলতান মোলদাভিয়া, ওয়ালাচিয়া এবং গ্রীক দ্বীপসমূহ স্বীয় আওতাভুক্ত রাখেন কিন্তু তিনি ৪,৫০০,০০০ রুবল ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে বাধ্য হন।

এই চুক্তিটিকে বিশেষতঃ ইহার সপ্তম ও চতুর্দশ ধারার জন্য খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বলিয়া বিবেচনা করা হয়। চতুর্দশ ধারা অনুযায়ী ইস্তাম্বুলে রাশিয়াকে একটি সাধারণ গীর্জা নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয় যাহা "সর্বদা সেই (রুশ) সাম্রাজ্যের পাদরীবর্গের আশ্রয়ে থাকিবে......।" সপ্তম ধারা অনুযায়ী রাশিয়াকে কিছু অস্পষ্টভাবে বর্ণিত অধিকার প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে রুশগণ সুলতানের খ্রীস্টান প্রজাবৃন্দের রক্ষাকারী দাবী করিবার ব্যাপারে এই ধারাগুলি ব্যবহার করে। তবে এই দুইটি ধারা ব্যতীত চুক্তিতে তেমন আর নতুন কিছু ছিল না। বিদেশী দেশসমূহকে সন্ধি দ্বারা আত্মসমর্পনের সুবিধা প্রদান ওসমানীয় সাম্রাজ্যের একটি অভ্যাসে

পরিণত হয়।[১] এইসব সন্ধি ছিল প্রধানতঃ বাণিজ্যিক সুবিধাদির জন্য কিন্তু প্রায় সর্বদাই ইহাতে ধর্মের কথাও উল্লেখ করা হইত। এই ধরনের শেষ সন্ধি লাভ করে ফ্রান্স ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে যাহা দ্বারা সমস্ত রোমান ক্যাথলিকদিগকে ফরাসীদের আশ্রয়ে দেওয়া হয়। যদিও এই চুক্তিতে শুধু সাম্রাজ্যে বসবাসকারী বিদেশী রোমান ক্যাথলিকদিগকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় কিন্তু ফরাসীগণ এমনভাবে আচরণ করে যেন ওসমানীয় সাম্রাজ্যের রোমান ক্যাথলিক প্রজাবৃন্দেরও আশ্রয়দানকারী। তবে পূর্ববর্তী সন্ধি এবং কুচুক কাইনারজির চুক্তিমোতাবেক গৃহীত ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক সন্ধির মধ্যে পার্থক্য এই যে পূর্ববর্তী সন্ধিসমূহ স্বাধীন ভাবে প্রদান করেন সুলতান স্বয়ং এবং তাহা ব্যবসার সমৃদ্ধির জন্য অথবা ইরানের সাফাভীয়দের প্রদত্ত অনুরূপ সুবিধাদির সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য। কুচুক কাইনারজির চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত সন্ধি পরাজয়ের শাস্তি হিসাবে সুলতানের উপর চাপাইয়া দেওয়া হয়। যদিও "মহামান্য সুলতান খ্রীস্টান ধর্ম ও ইহার গীর্জাসমূহের প্রতিনিয়ত রক্ষা করিবার ওয়াদা প্রদান করেন…।" রাশিয়া বিজয়ী হিসাবে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য এই চুক্তিকে সুবিধাজনক কারণ হিসাবে ব্যবহার করিতে পারিত।

পরবর্তী যুগে সুলতানকে যখন শান্তিতে বসবাস করিতে দেওয়া হয় তখন ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাশিয়ার বৈদেশিক নীতিকে প্রভাবান্বিত করে। ক্যাথারীনের সর্বশেষ প্রেমিক পটেমকিন তাঁহার রাজকীয় প্রভুর সীমান্ত বৃদ্ধির পূর্বানুরাগ জানিতেন এবং 'গ্রীক পরিকল্পনা' নামে বিজয়ের কুখ্যাত পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই পরিকল্পা অনুসারে ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব হাতে লওয়া হয়। ইহার এক অংশকে বলা হইবে 'ড্যাসিয়ার রাজ্য' এবং ইহার রাজা হইবেন পটেমকিন আর প্রধান অংশ কনস্টান্টিনোপলকে রাজধানী রাখিয়া ক্যাথারীনের নবজাত কনিষ্ঠ পৌত্রের (১৭৭৯ খ্রীঃ) জন্য সংরক্ষিত রাখা হইবে। সেই পৌত্রের নাম যথার্থভাবে কনস্টাইন রাখিবার জন্য তিনি আদেশ প্রদান করেন। অষ্ট্রীয়া যে কুচুক কাইনারজির চুক্তি অনুযায়ী সুলতানের নিকট হইতে

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১৭৬ (মূল গ্রন্থ)।

'দালালী' হিসাবে বুকড়িয়া প্রদেশ লাভ করে, যাহাতে সে যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকে, সেও "গ্রীক পরিকল্পনায়" অংশ গ্রহণ করে। পুরস্কার হিসাবে অস্ট্রিয়ার দ্বিতীয় জোসেফকে সার্বিয়া, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা প্রদান করা হয়।

অভিলাষ কূটনীতি ও ষড়যন্ত্রের সমন্বয়ে গঠিত বহুদিনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মহড়ার পর ক্যাথারীন কুচুক কাইনারজির চুক্তি ভঙ্গ করিয়া ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে ক্রিমিয়া অধিকার করেন। তিন বৎসর পর তিনি তাঁহার বন্ধুদের মধ্যে অস্ট্রিয়ার সম্রাট জোসেফকেও ক্রিমিয়ার একটি চমৎকার অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করেন এই অধিকারের উৎসব পালন করিবার জন্য। পটেম্‌কিনের আয়োজিত স্থল ও নৌবাহিনীর মহড়ায় সুলতান প্রথম আব্দুল হামিদ (১৭৭৩—১৭৮৯ খ্রীঃ) শঙ্কিত হন এবং ১৭৮৭ খ্রীস্টাব্দে ওসমানীয় ও রুশ-অস্ট্রিয়ান আঁতাতের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হয়।

যথা নিয়মে রাশিয়া প্রস্তুত ছিল না কিন্তু তাহার সৌভাগ্যবশতঃ ওসমানীয়গণ আরও কম প্রস্তুত ছিল। প্রাথমিক রুশ-অস্ট্রিয়ান বিজয়গুলির দ্বারা ক্যাথারীন তাঁহার 'গ্রীক পরিকল্পনা' কার্যে পরিণত করিবার প্রচেষ্টায় উৎসাহ লাভ করেন। তিনি পুনরায় আশা করেন যে বলকান খ্রীস্টানগণ সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবে। এই যুদ্ধও ছিল দীর্ঘস্থায়ী এবং শেষ পর্যন্ত ফরাসী বিপ্লবের ন্যায় আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহ ক্যাথারীনকে 'গ্রীক পরিকল্পনা' ত্যাগ করিতে বাধ্য করে। সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফের মৃত্যু (১৭৯০ খ্রীঃ) আঁতাতকে দুর্বল করিয়া ফেলে। ইংল্যাণ্ড, প্রুশিয়া ও হল্যাণ্ডের চাপ সৃষ্টির ফলে অস্ট্রিয়ার নতুন সম্রাট লিউপোল্ডকে কোন লাভ ছাড়াই ১৭৯১ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট সুলতানের সঙ্গে সিস্তভার সন্ধি করিতে উদ্বুদ্ধ করে। কয়েক মাস পর (জানুয়ারী, ১৭৯২ খ্রীঃ) ক্যাথারীন জ্যাসীর সন্ধি করেন এবং তাঁহার সীমান্ত নাইস্টার নদী পর্যন্ত সম্প্রসারণ করেন এবং এইভাবে ক্রিমিয়ার অন্তর্ভুক্তি পাকাপোক্ত করেন।

ক্যাথারীন 'গ্রীক পরিকল্পনা' সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করেন নাই। তিনি ইহা তাঁহার ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দের ইচ্ছাপত্রে উল্লেখ করেন এবং ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দের অস্ট্রিয়ান-রুশ সন্ধিতে সন্নিবেশিত করেন। ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর ফলে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের জন্য একটি নতুন যুদ্ধ বাধাগ্রস্ত হয়।

বিংশ অধ্যায়

পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ ও ওসমানীয়গণ

পতনের প্রায় চূড়ান্ত অবস্থায় ওসমানীয় সাম্রাজ্য উনবিংশ শতাব্দীতে প্রবেশ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর সুদীর্ঘ অগ্নিপরীক্ষায় এই সাম্রাজ্য পরাজয়ের পর পরাজয় অবলোকন করে, এবং ইহা নেতৃবৃন্দের মধ্যে কোন প্রশংসনীয় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিতে ব্যর্থ হয়। নেতৃবৃন্দ কোন প্রতিকারমূলক পদক্ষেপও গ্রহণ করেন নাই বা এই ব্যাধির কারণও অনুসন্ধান করেন নাই। অধিকাংশ সুলতানের মনোভাব ছিল "স্বাভাবিক কার্যকলাপে" সীমাবদ্ধ। সুলতানের স্বাভাবিক কার্যকলাপের মধ্যে ছিল হেরেম জীবন এবং সেই ধরনের জীবিকার ব্যয়ভার পরিচালনার জন্য পদমর্যাদা বিক্রয়। স্বল্প কয়েকজন সুলতানের মধ্যে যাঁহারা সত্যিই সর্বদিক লক্ষ্য করিতেন তাঁহারা দেখেন যে পৃথিবী অতি দ্রুততার সহিত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী এত নতুন ও ব্যাপক যে অতি বিচক্ষণ সুলতানগণও ঐগুলি বুঝিতে পারেন না এবং তাঁহাদের মধ্যে সবচাইতে শক্তিশালীগণও ঐগুলির সঙ্গে তাল মিলাইয়া চলিতে পারেন না।

ওসমানীয় সাম্রাজ্য একটি সামরিক ছাউনী হিসাবে অবস্থান করে। এই ছাউনী সুসংগঠিত সৈন্য সরবরাহের দ্বারা শক্তিশালী। অর্থনৈতিক দিক দিয়া কৃষক, ব্যবসায়ী ও কারিগরগণের দ্বারা এই সমাজ লালিতপালিত যাহারা রাস্তাঘাটের নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনীর উপর নির্ভরশীল এবং শরীয়তের ব্যাখ্যাকারী ধর্মীয় সংগঠনের (উলামা) দ্বারা প্রতিপালিত। সাম্রাজ্য শাসিত হইত স্বয়ং সুলতানের প্রভুত্বে প্রতিষ্ঠিত নাগরিক বুর্জুয়াদের দ্বারা। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রশাসনের সংগঠন ও পন্থা উভয়টি নৈরাশ্যজনকভাবে কার্যহীন হইয়া পড়ে। ইউরোপে উদারতাবাদ, গণতন্ত্র,

শিল্পোন্নয়ন ও ধর্মনিরপেক্ষতার উৎকর্ষ সাধনের ফলে, সামন্তবাদের ধ্বংস সাধিত হয়, গীর্জার ক্ষমতা হ্রাস এবং সেনাবাহিনী জাতীয়করণ করা হয়। যদিও ওসমানীয়দের ধর্মীয় সামরিক ও সামন্ত প্রথা ইউরোপের ন্যায় ছিল না, তবুও ওসমানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ শতাব্দীর সমস্যাবলীর সহিত তাল মিলাইয়া চলিতে সক্ষম হয় নাই। শতাব্দীর সমস্যার মধ্যে ছিল পাশ্চাত্য জাতিসমূহের ক্ষমতা এবং তাহাদের আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্যবাদ, অতুর্কীদের জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম এবং উন্নতি ও পরিবর্তনের জন্য স্বয়ং তুর্কীদের অস্থির স্পৃহা।

সেকেলে হওয়া ছাড়াও ওসমানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ছিল দুর্নীতিপরায়ণ। সাম্রাজ্য ২৬টি ভেলায়েতে (প্রদেশ) বিভক্ত ছিল এবং এইগুলি প্রায় ১৬০টি লিভার সমষ্টি। ভেলায়েতের এবং প্রায়ই লিভার গভর্ণরকে বলা হইত পাশা এবং এই পদটিকে বলা হইত পাশলিক। একটি প্রাচীন বিস্মৃতিপ্রায় মঙ্গোলীয় রীতি অনুসারে ভেলায়েত পাশার পতাকায় তিনটি ঘোড়ার লেজ থাকিত এবং লিভাপাশার পতাকায় থাকিত দুইটি অথবা একটি ঘোড়ার লেজ, ইহা নির্ভর করিত লিভার আকার ও গুরুত্বের উপর।

পাশালিকগুলি বিক্রয় করা হইত এবং সর্বোচ্চ ডাককারীর নিকট এইগুলি যাইত। কৃষক ও প্রাদেশিক ব্যবসায়ীদের শ্রমের বিনিময়ে ভাগ্য গড়িবার ইহা ছিল সর্বোত্তম পন্থা। যতদিন পর্যন্ত পাশাগণ ইস্তাম্বুলের সিদ্ধান্তনুযায়ী অর্থ প্রেরণ করিতেন ততদিন সুলতান এই অর্থ আদায়ের সূত্র সম্পর্কে মোটেই চিন্তা করিতেন না। তাই সাম্রাজ্যের উচ্চাকাঙ্খী লোকদের জন্য পাশালিক ছিল ঈপ্সিত বস্তু। নগদ অর্থের বিনিময়ে ইহা লাভ করা যাইত এবং নগদ অর্থের অপ্রতুলতার ফলে ক্রেতাদের সংখ্যা সীমিত থাকিত। যাহারা সক্ষম হইত তাহারা গ্রীক, আর্মেনীয়ান অথবা ইহুদী মহাজনদের নিকট হইতে অর্থ ধার করিত এবং প্রকৃত অর্থে পাশালিককে উচ্চ সুদের বিনিময়ে বন্ধক দিত। অর্থ আদায় নিশ্চিত করিবার জন্য পাশার 'সেক্রেটারী' হিসাবে মহাজন তাহার এজেন্ট নিযুক্ত করিত। সেক্রেটারীগণ পাশাদের চাইতে অধিক নির্দয় হইত। তাঁহারা সুলতান, পাশা, মহাজন ও নিজেদের আয় নিশ্চিত করিবার জন্য অসহায় কৃষক ও ব্যবসায়ীদিগকে যথেষ্ট শোষণ করিত।

জনসাধারণের জীবনমরণ পাশাদের হাতে থাকিলেও এবং সুলতানের অনুকরণে পাশাগণ দরবার ও হেরেম রাখিলেও তাঁহারা সর্বশক্তিমান ছিলেন না। কিছু সংখ্যক স্থানীয়, ক্ষমতাশালী লোকজনও ছিল যাহারা প্রায়ই পাশাদিগকে অমান্য করিত, এবং এই দুইজনের মধ্যে সংঘর্ষে অধিবাসীগণ আরও অধিক কষ্টভোগ করিত। আনাতোলিয়ায় দেওয়ার বে' (উপত্যকার প্রভু) নামে পরিচিত অনেক বংশানুক্রমিক যুদ্ধনেতা ছিল, যাহারা সম্ভবতঃ গাজী নেতাদের বংশধর ছিল এবং যাহারা ওসমানীয় শক্তির নেতৃস্থানীয় মহলের অনুগত ছিল, তাহারা এখন কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাহাদের পুরাতন স্বাধীনতা পুনর্জীবিত করিতে চেষ্টা করে।

দেয়ার বে'র চাইতে আরও অধিক কুখ্যাত ছিল গ্রীক ফ্যানারিয়টগণ। মিল্লাত প্রথায় ইস্তাম্বুলের গ্রীক অর্থোডক্স প্যাট্রিয়ার্ক ছিলেন সাম্রাজ্যের সমস্ত অর্থোডক্স খ্রীস্টানদের প্রধান। প্যাট্রিয়ার্কের অফিসগুলি গোল্ডেন হর্ণের পারে বাতিঘরের (ফ্যানার) নিকটে অবস্থানের ফলে ইহার সদস্যদিগকে ফ্যানারিয়ট বলা হইত। ইহারা সবাই ছিল গ্রীক। ইহারা সাম্রাজ্যের অ-গ্রীক লোকজন যথা রুমানিয়ান, সার্বিয়ান, বুলগেরিয়ান ও অন্যান্য অর্থোডক্সদিগকে শোষণ করিত। পরে, সমস্ত কর্মকর্তাদের মুসলমান জাতিভুক্ত হইবার পূর্বশর্ত শিথিল করা হইলে এইসব ফ্যানারিয়টগণ সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক কার্যাবলীতে দোভাষীর কাজ করে। এই সব পদে বহাল থাকাকালে তাহারা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে এবং নিজেদের জন্য ও তাহাদের গ্রীক পৃষ্ঠপোষকদের জন্য প্রচুর অর্থ সমাগম করে। এই সমস্ত কার্যাবলী দেশের অর্থনীতিকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে। কাফেলার পথগুলি নিরাপদ ছিল না, রাস্তা ও সেতুগুলি মেরামত হইত না এবং স্থানীয় যুদ্ধ ও রাহাজানিসমূহ দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যকে সম্পূর্ণ বিকল করিয়া ফেলে।

সাম্রাজ্যের অর্থনীতির পক্ষে আভ্যন্তরীণ অচলাবস্থার চাইতেও অধিক মারাত্মক ছিল ইউরোপের ঘটনাবলী। বাণিজ্যিক পথগুলি পরিবর্তন হইয়া যায়। নতুন সামুদ্রিক পথ আবিষ্কার ও জাহাজ নির্মাণে উন্নতির ফলে ভূমধ্যসাগরে সচল ইউরোপীয় বাণিজ্য কয়েক যুগের জন্য পারস্য উপসাগরে এবং পরে পূর্ব এশিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। ইউরোপের ক্রমবর্ধমান

শিল্পকেন্দ্র স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে ওসমানীয়দের হস্তনির্মিত দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা কমিয়া যায়। তদুপরি, নতুন বিশ্ব হইতে রৌপ্য ও স্বর্ণ চলিয়া যাইবার ফলে অর্থনীতির কেন্দ্র ভূমধ্যসাগরের উপকূলীয় শহরগুলি হইতে পশ্চিম ইউরোপে স্থানান্তরিত হয়। এইসব কিছুতে ওসমানীয় ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং দুর্নীতিমুক্ত হইলেও সাম্রাজ্যের ব্যবসায়ীগণ পাশ্চাত্যে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন সংস্থা ও চুক্তি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হইত না।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানসমূহের অচলাবস্থা, সেনাবাহিনীর দুর্বলতা ও রুশদের হাতে পরাজয়, দুর্নীতি ও অসদুপায় বৃদ্ধি এবং ব্যবসার স্থান পরিবর্তনের ফলে এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যাহাতে পুঁজি বিনিয়োগের উৎসাহ তিরোহিত হইয়া যায়। যাহাদের নিকট অর্থ ছিল তাহারা বিনিয়োগ করিতে হয়ত জানিত না অথবা ভয় করিত কিংবা তেমন আগ্রহান্বিত ছিল না।

তবে সরকারের সংগঠন অপরিবর্তনীয় থাকে। সুলতান, উজীর, বুর্জুয়া, উলামা ও মহাজনগণ তাঁহাদের অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের পদমর্যাদায় যতবেশী সম্ভব অর্থ সমাগম করিতেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ওসমানীয় সুলতান জান-নিসারীদের উপর নির্ভর করিতে পারিতেন না কারণ তাহাদের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তেমনি একগুয়েমীও সুতীব্র হইয়া উঠিয়াছিল। এই একদা কার্যকরী শক্তি যাহা সুলতানের ক্ষমতা রক্ষা করিত তাহা প্রতিক্রিয়াশীল উলামাদের হাতের ক্রীড়নক হইয়া যায় এবং যেসব সুলতান পূর্বাবস্থা পরিবর্তনের সাহস করিতেন তাঁহাদের বিপক্ষে দাঁড়ায়। উনবিংশ শতাব্দীতে মিসর বিদ্রোহ করে, আরবের ওয়াহাবীগণ খলিফার ধর্মীয় ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করে, লেবাননের দ্রুজেজ (দুজি) মেরোনাইটগণ স্বায়ত্ত-শাসিত সরকার গঠন করে, বলকানের জাতীয় শ্রেণীসমূহ স্বাধীনতার জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করে এবং বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরিত স্বয়ং পাশাগণও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধাচারণ করিয়া বসে।

এইসব সত্ত্বেও "ইউরোপের রুগ্ন লোকটি" আরও এক শতাব্দী পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকে। কথিত আছে যে রাশিয়ার প্রথম নিকোলাস ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে এই নামে সম্বোধন করেন। বস্তুতঃ ওসমানের বংশ রোমানদের

চেয়ে কয়েক বৎসর অধিক জীবিত থাকে। সমসাময়িক পর্যবেক্ষকদের মতানুসারে মনে হয়, সাম্রাজ্য আর একদিনও টিকিতে পারিত না, কিন্তু ইতিহাসের ধারা অনুযায়ী সাম্রাজ্য যে এতদিন টিকিয়াছিল তাহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। বহু শতাব্দী ধরিয়া এমন এক প্রথা গড়িয়া উঠে যাহাতে প্রধান সেনাপতি হিসাবে সুলতান উপকৃত হন এবং যাহাদিগকে তিনি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন তাহারাও উপকৃত হয়। যতদিন পর্যন্ত সুলতান শক্তিশালী ছিলেন ততদিন সমাজের এক অংশ হইতে অন্য অংশে তাঁহার কৃপা পরিবর্তন করিতেন এবং পরিণামে সবাই শান্তিতে অপেক্ষাকৃত নিরাপদে ও সন্তুষ্ট থাকিত।

কিন্তু দুই শতাব্দীতে যখন সুলতানাতের ক্ষমতা নিম্নস্তরে নামিয়া যায় তখনও এই প্রথা নষ্ট হয় নাই। তৎপরিবর্তে ইহা থাকিয়া তো যায়ই বরং এমন গুটিকতকের শাসনের উপকারে আসে যেখানে সচরাচর সুলতান ছিলেন একজন সদস্যমাত্র। সুবিধাভোগীদের শ্রেণীবিন্যাস নির্ধারিত হইয়া যায়। এই শ্রেণী বিন্যাসে সুলতান ছিলেন হেরেমের মহিলাদের প্রভাবাধীন। মহিলাগণ ছিলেন আবার শক্তিশালী ও উচ্চাকাঙ্খী খোজাদের করতলগত। তাহা ছাড়া ছিলেন সামরিক অধিনায়কগণ, উলামাগণ, পাশাগণ, মহাজনগণ এবং বিভিন্ন অমুসলিম মিল্লাতসমূহের প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ। ইহারা এই প্রথার দ্বারা তাঁহাদের অধীনস্থ মুসলমান ও অমুসলিম সব জনগণকে শোষণ করিয়া মুনাফা নিতেন। একে অপরের বিরুদ্ধে প্রায়ই নিষ্ঠুর যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ছিল তাহাদের প্রতিযোগিতার অংশ বিশেষ। কিন্তু কখনও বহিরাগত কোন শক্তি বা সংস্কারের জন্য আভ্যন্তরীণ কোন সদিচ্ছার দ্বারা এই প্রথা হুমকির সম্মুখীন হইলে তাহারা সবাই এক দলভুক্ত হইয়া যাইতেন এবং হুমকির মোকাবিলা করিবার জন্য একে অপরকে সমর্থন করিতেন। বিপদ কাটিয়া যাওয়া মাত্রই তাহারা পুনরায় ইহার সঙ্গ লইতেন এবং একে অপরের বিরুদ্ধেও দাঁড়াইতেন।

এতদ্‌সত্ত্বেও স্বীয় ভার ও দুর্নীতির ফলেই ওসমানীয় ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িত, যদি না ইউরোপীয় জাতিগুলি কখনও একাকী এবং প্রায়ই সম্মিলিতভাবে এই নড়বড়ে সাম্রাজ্যকে বাঁচাইয়া রাখিবার জন্য যথেষ্ট রক্ত সঞ্চালন করিত। ইউরোপীয় ইতিহাসে "প্রাচ্য প্রশ্ন" (The Eastern Question)

বলিতে যাহা বুঝায় তাহার মূল হইল এই রুগ্ন লোকটি মৃত্যুর পর ইহাকে ভাগবাটোয়ারা করিয়া লইবার ব্যাপারে পাশ্চাত্যের অক্ষমতা। ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে কেহই অন্যান্য শক্তিগুলিকে পরাজিত করিয়া এই সাম্রাজ্যের মালীক হইবার মত যথেষ্ট ক্ষমতাশালী ছিল না। ইতিমধ্যে প্রত্যেকটি শক্তি ভীত ছিল পাছে অন্য কোন শক্তি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। নির্দয়, ষড়যন্ত্র, গোপন চুক্তি, প্রতারণা এবং যুদ্ধ এই সমস্ত ছিল কুটনৈতিক যুদ্ধের অংশবিশেষ। যখনই কোন দেশ বা কয়েকটি দেশের সমষ্টি প্রাধান্য লাভ করে তখন অবশিষ্ট দেশগুলি "ভারসাম্য" ফিরিয়া আসা পর্যন্ত ওসমানীয়দের সাহায্যে আগাইয়া আসে। যখন ইহা পরিষ্কার হইয়া যায় যে ইউরোপীয় ভারসাম্য রক্ষা করিবার জন্য এই সাম্রাজ্যকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে তখন গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স এবং পরে জার্মানীর ন্যায় কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ শোষণের ক্ষেত্রে ওসমানীয়দের গুটিকতকের শাসনে অংশ গ্রহণ করে এবং এই ব্যবস্থাকে দীর্ঘজীবি করে। কিন্তু ইহা কার্যকরী হইবার পক্ষে অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী যেমন ছিল খুবই বেসামাল এবং ঠিক তেমনি রাশিয়া বাস্তব হইবার পক্ষে ছিল খুবই মেসিয়ানিক প্রভাবযুক্ত। বস্তুতঃ প্রথম মহাযুদ্ধের পরেও ইউরোপীয় শক্তিগুলি ওসমানীয়দিগকে জীবিত রাখিতে চেষ্টা করে এবং তাহারা সফলতাও লাভ করিত যদি না তুর্কীগণ স্বয়ং সহজমরণ প্রণালী ব্যবহার করিয়া মৃত্যুদেহকে কবর দিত।

ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ব্যাপারে জড়িত ইউরোপীয় বৃহৎ শক্তিবর্গের মধ্যে ছিল ছয়টিঃ অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী, রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী ও ইটালী। অষ্ট্রীয়া ও রাশিয়া প্রধানতঃ ওসমানীয়দের ইউরোপীয় এলাকাগুলির ব্যাপারে আগ্রহী ছিল। ফলে তাহাদের আগ্রহ প্রায়ই সংঘর্ষে পরিণত হইত। চতুর্দশ শতাব্দী হইতে হাপ্‌সবার্গগণ ওসমানীয় চাপের মুখে ছিল এবং তাই তাহারা অনুভব করে যে ভূখণ্ড বাছিয়া লইবার ব্যাপারে তাহাদেরই প্রথম সুযোগ লাভ করা উচিত। আরও বিশেষভাবে তাহারা দানিয়ুব এবং এড্রিয়াটিক ও এ্যাজিয়ান সাগরের মোহনার কর্তৃত্ব দাবী করে। তবে তাহাদের কিছু সমস্যা ছিল, যেগুলি ছিল ওসমানীয়দের ন্যায়ই। অষ্ট্রীয়ান ও হাঙ্গেরীয়ান শাসকশ্রেণী ছিল জার্মান ও ম্যাগিয়ার গোষ্ঠীভুক্ত, অথচ যাহাদিগকে তাহারা শাসন করিত তাহারা ছিল অধিকাংশই

স্লাভ। শাসকশ্রেণীর ধর্ম ছিল রোমান ক্যাথলিকবাদী। অথচ প্রজাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল অর্থোডক্স ধর্মাবলম্বী। ওসমানীয়দের ন্যায় অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয়ানগণ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন শ্রেণীকে এক জাতিভুক্ত করিতে সক্ষম হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ উদীয়মান জাতীয়তাবাদের চেতনায় স্বাধীনতার আন্দোলনকে উৎসাহ দান করে এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয়ান সাম্রাজ্যকে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

অপরদিকে রুশগণ ছিল অধিকংশের সমজাতীয়। তাহাদের জাতীয়তাবাদের চেতনা সীমান্ত ছাড়াইয়া যায় এবং ওসমানীয় অথবা অস্ট্রিয়ানদের অধীনস্থ বলকানের স্লাভদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়। তদুপরি একমাত্র স্বাধীন অর্থোডক্স দেশ হিসাবে রুশগণ ইতিমধ্যেই সুলতানের অধীনস্থ অর্থোডক্স প্রজাসাধারণের নিরাপত্তা দাবী করিয়াছে—ইহা এমন একটি দাবী যাহা হাপ্সবার্গগণ কর্তৃক অপছন্দনীয় হয়, কারণ তাহারাও অর্থোডক্স লোকদিগকে শাসন করিত। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে রুশগণ প্রবল চাপ অনুভব করে, কারণ ওসমানীয়গণ দক্ষিণ রাশিয়ার প্রধান নদীগুলির শাখাসমূহ শাসন করিত। তাহারা সর্বদা উষ্ণ জলের বন্দরের প্রয়োজনীয়তার উপর ভিত্তি করিয়া তাহাদের বিস্তৃতির প্রচেষ্টাকে যুক্তিযুক্ত করে। এইসব উদ্দেশ্য লইয়া তাহারা অস্ট্রিয়ানদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওসমানীয়দিগকে ধ্বংস করিবার জন্য ইহাদের কোন একটিই একাকী তেমন শক্তিশালী ছিল না, আবার এই ব্যাপারে এই উভয় দেশের সম্মিলনও সম্ভবপর ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ওসমানীয়দের সঙ্গে লড়াই করিবার জন্য রাশিয়া যথেষ্ট শক্তিশালী হইয়া উঠিলে বৃটিশ ও ফরাসীগণ তুর্কীদের ভাগ্যের ব্যাপারে আগ্রহী হইয়া উঠে এবং তাহাদের স্বপক্ষে হস্তক্ষেপ করে।

দক্ষিণ পূর্ব-ইউরোপে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রধান স্বার্থ ছিল অর্থনৈতিক, এবং ইউরোপের ভারসাম্য রক্ষা করা। ভূখণ্ডের উপর কোন উদ্দেশ্য তাহাদের থাকিলেও উহা তেমন মুখ্য ছিল না। তাহাদের ভূখণ্ডজনিত উদ্দেশ্য নিহিত ছিল ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অধীনস্থ আফ্রিকা ও এশিয়ান রাজ্যগুলির উপর। গ্রেট বৃটেনের রাজকীয় নীতি নিমিত ছিল ভারতবর্ষের নিরাপত্তা এবং ইহার দিকে পরিচালিত প্রধান পথগুলির উপর। মধ্যপ্রাচ্যে

ইহার অর্থ হইল পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগর এবং এইগুলির চতুর্দিকের স্থানগুলির।

ফ্রান্স প্রধানতঃ আগ্রহী ছিল উত্তর-আফ্রিকা ও লেবাননের উপর। লেবাননের সীমান্ত যেহেতু সর্বদা সন্দেহজনক ছিল তাই সে এবং গ্রেট বৃটেন সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। অন্যথায় ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট অংশে ফ্রান্সের স্বার্থ ছিল অর্থনৈতিক ও ধর্মীয়। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি স্থাপনকারী প্রথম দেশসমূহের মধ্যে সে ছিল একটি এবং কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এই চুক্তি অনেকবার পুনঃস্থাপিত করা হয়। ফরাসী ব্যবসায়ী শিল্পপতি ও মহাজনগণ ওসমানীয় সাম্রাজ্যে ব্যাপক হারে টাকা খাটায়। ধর্মীয় ক্ষেত্রে, সুলতানের অর্থোডক্স প্রজাদের ব্যাপারে রুশেরা যেমন আগ্রহী ছিল তেমনি ফরাসীগণও রোমান ক্যাথলিক প্রজাদের ব্যাপারে অনুরূপ আগ্রহী ছিল। প্যালেস্টাইনের খ্রীস্টান পবিত্র স্থানগুলির উপর যেহেতু অর্থোডক্স ও রোমান ক্যাথলিক উভয়ে কর্তৃত্ব দাবী করে তাই রাশিয়া ও ফ্রান্স সংঘর্ষে লিপ্ত হয়।

জার্মানী ও ইটালী ছিল এই দৃশ্যে নবাগত। জার্মানীর স্বার্থ ছিল প্রধানতঃ অর্থনৈতিক এবং রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ডের পরিকল্পনায় বাধা প্রদান করিবার জন্য সুলতানের উপর প্রাধান্য বিস্তার করা। ইটালীর ভূমিকা ছিল বৈশিষ্ট্যহীন, কিন্তু অন্যান্যরা যখন অন্যত্র ব্যস্ত সে তখন লিবিয়ার উপর কর্তৃত্ব লাভ করে।

তবে ইউরোপীয় শক্তিসমূহের একে অপরের সহিত এবং ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সহিত সম্পর্ক কোন যুক্তিসঙ্গত রূপ অনুসরণ করে না। ইহা সুবিধাবাদের দ্বারা পরিচালিত। ফ্রান্স ও অষ্ট্রীয়া যেরূপ একনিষ্ঠভাবে গ্রেট বৃটেন ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে একত্রিত হয় অনুরূপভাবে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া ও অষ্ট্রীয়ার বিরুদ্ধে একত্রিত হয়।

ওসমানীয় সাম্রাজ্যের নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যে দুইটি শিক্ষা লাভ করে। প্রথমতঃ সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা, যাহা একটি পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে। সমস্ত তুর্কীগণ যে সংস্কারের বিষয়ে একমত হয় তাহা হইল সামরিক ক্ষেত্রে, যদিও জোড়াতালি ও অযোগ্যতা তাহাদিগকে এই বিষয়ে প্রবলভাবে বাধা দান করে। দ্বিতীয় শিক্ষা হইল, তাহারা হৃদয়ঙ্গম করে যে এক

ইউরোপীয় জাতিকে অপর একটির বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেওয়া যায়। অতঃপর ওসমানীয়গণ ইসলামের ঐতিহ্য অনুসারে সমস্ত অমুসলিমদিগকে "দুর্বল" এবং শক্তিশালী শত্রু বলিয়া বিবেচনা করে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের দিকে, দুইটি ইউরোপীয় দেশ যুদ্ধে লিপ্ত হইলে ওসমানীয় সাম্রাজ্যে বসবাসকারী তাহাদের প্রজাসাধারণ একে অপরের সহিত সহযোগিতা করে, কারণ ওসমানীয়দিগকে তাহারা আরও ভয়াবহ শত্রু বলিয়া মনে করে। ইহা লক্ষ্য করিয়া ওসমানীয়গণ বুঝিতে পারিল যে, তুর্কীদের সহিত শত্রুতা করিবার ব্যাপারে সমস্ত ইউরোপীয়গণ একমত। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় বিবাদগুলি তুরস্কে অবস্থানকারী তাহাদের জাতিগুলির মধ্যে বিস্তার লাভ করে এবং ওসমানীয়গণ হৃদয়ঙ্গম করে যে, তাহারা একটিকে অপরটির বিরুদ্ধে লেলাইতে পারে। শতাব্দীর শেষের দিকে সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের মাধ্যমে ওসমানীয়গণ এই বিদ্যায় সুনিপুণ হইয়া উঠে। তবে মোটের উপর তুর্কীগণ কোন সুদূর প্রসারী নীতি গ্রহণ করে নাই বরং একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ না করিয়া সাধারণতঃ সমস্যাবিশেষে কর্মপন্থা গ্রহণ করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সংঘটিত ফরাসী বিপ্লব ছিল ওসমানীয় সুলতানদের জন্য সাময়িক বিরতি। পরবর্তীকালে তাহারা ইহার দ্বারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়, কিন্তু সাময়িকভাবে ইহা ইউরোপীয়দিগকে এমনভাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়া রাখে যে তাহারা ওসমানীয়দের প্রতি কোন নজর দেওয়ারও অবকাশ পায় নাই। তবে নেপোলিয়নের আবির্ভাবে সমগ্র অবস্থার পরিবর্তন হয় কারণ তিনি তাহার বিশ্বজনীন পরিকল্পনায় ওসমানীয়দিগকে এবং এমনকি পারস্যবাসীদিগকেও জড়িত করেন। ১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে নেপোলিয়ান মিসর আক্রমণ করিলে ওসমানীয়গণ ফরাসীদের সহিত তাহাদের সুদীর্ঘ বন্ধুত্ব ছিন্ন করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন মুখোমুখী সংঘর্ষ হয় নাই, কারণ, নেপোলিয়নের আক্রমণ বৃটিশ কর্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। নেপোলিয়ন তাঁহার সৈন্যদিগকে ত্যাগ করিয়া ফ্রান্সে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন।

নেপোলিয়ন যে বৎসর মিসর আক্রমণ করেন সেই বৎসর ২৭ বৎসর বয়স্ক দ্বিতীয় সেলিম সুলতান হন (১৭৯৯—১৮০৭ খ্রীঃ)। তুলনামূলকভাবে

বলিতে গেলে তিনি অপেক্ষাকৃত শিক্ষিতদের মধ্যে একজন এবং সাম্রাজ্যের শক্তি পুনর্জীবিত করিবার জন্য তিনি কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। কিছু সংখ্যক যুবককে লেখাপড়া ও দেখাশোনা করিবার জন্য তিনি ইউরোপে প্রেরণ করেন, ছাপাখানা পুনরায় চালু করেন এবং সমস্ত কিছুর চেয়ে জরুরী সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠন করিতে চেষ্টা করেন। জান-নিসারীদিগকে স্পর্শ করিতে সাহসী না হইয়া তিনি নতুন উর্দি (সামরিক পোশাক) ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া একটি নতুন বাহিনী গঠন করিতে চেষ্টা করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল জান-নিসারীদিগকে এই বাহিনীর চাল-চলন অনুকরণ করিতে উৎসাহ দান করা, কিন্তু তাহারা তা প্রত্যাখ্যান করে বলিয়া তেমন কিছু ফল লাভ করা সম্ভব হয় নাই।

ইতিমধ্যে ইউরোপ ইহার প্রায়ই পরিবর্তনশীল সন্ধি পুনস্থাপনের যুগে প্রবেশ করে। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে রাশিয়া, গ্রেট বৃটেন ও অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরীর মিত্র জোটে যোগদান করে এবং সুলতানও এই জোটে যোগদান করুন তাহা দাবী করে। এই দাবী ওসমানীয়দিগকে ফ্রান্সের আরও ঘনিষ্ঠতায় ঠেলিয়া দেয়; কিন্তু নিজেকে কোন পক্ষের অন্তর্ভুক্ত না করিবার মত যথেষ্ট বুদ্ধি সেলিমের ছিল। তবে স্বীয় সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে ফরাসী অফিসার ও কারিগরদিগকে আনয়ন করিবার জন্য তিনি এই বন্ধুত্বকে ব্যবহার করেন। ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরে অস্টারলিজে নেপোলিয়নের বিজয়ের পর সুলতান ফরাসীদের আরও ঘনিষ্ঠ হন এবং রাশিয়ার স্বার্থের ব্যাপারে বৈরীভাবাপন্ন হন। ইহার ফলে রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ড উভয়ের রুদ্ররোষ তাঁহার উপর পতিত হয়। উভয়েই ১৮০৬ খ্রীস্টাব্দে সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং সত্য সত্যই একটি ক্ষুদ্র কিন্তু অকেজো নৌবহর প্রণালীতে প্রেরণ করে।

এই গোলযোগের মধ্য দিয়া দুইটি ঘটনা ওসমানীয় ইতিহাসের মোড় পরিবর্তন করিয়া দেয়। একটি হইল এই যে জান-নিসারীগণ তাহাদের সুরুয়ার কেতলী উল্টাইয়া দেয়, যাহা হইল বিদ্রোহের আলামত, এবং ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে সুলতানের পদচ্যুতি ঘোষণা করিয়া একটি ফতোয়া জারী করিবার জন্য শেখ উল-ইসলামকে সম্মত করে এবং তদ্‌স্থলে সুলতানের বিনয় চাচাত ভাই চতুর্থ মুস্তফাকে সিংহাসনে বসায়। আরেকটি ঘটনা

হইল রাশিয়ার প্রথম আলেকজাণ্ডার ও নেপোলিয়ন ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে তিলসিটে মিলিত হন এবং একটি বন্ধুত্বের চুক্তি স্বাক্ষর করেন। প্রণালীতে রাশিয়ার অবাধগতি প্রদানের ব্যাপারে নেপোলিয়ন সম্মত না হইলেও এই ধরনের বন্ধুত্ব ছিল ওসমানীয়দের জন্য একটি আঘাত স্বরূপ।

দানিউবের ওসমানীয় সেনাবাহিনী রাশিয়ার সহিত যুদ্ধের এই সাময়িক বিরতির সুযোগ গ্রহণ করে এবং মুস্তফাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিতীয় মাহমুদের (১৮০৭—১৮৩৯ খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণের ব্যাপারে সাহায্য করে। দ্বিতীয় মাহমুদ ছিলেন ওসমানের বংশের একমাত্র জীবিত পুরুষ উত্তরাধিকারী। তদুপরি তিনিই ছিলেন ওসমানীয় সাম্রাজ্যের শেষ কর্মক্ষম ও ক্ষমতাশালী শাসক। সাম্রাজ্যের অনেক সুদূর প্রসারী সংস্কারের উদ্বোধনকারী হিসাবে তিনি খ্যাত।

১৮০৯ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়া পুনরায় তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করে। এই সময় নেপোলিয়ন তাহাকে বিরত করিবার জন্য কিছুই করেন নাই। রুশগণ তাহাদের চিরাচরিত মন্থর অগ্রগতি আরম্ভ করে, কিন্তু ১৮১১ খ্রীস্টাব্দের দিকে ইউরোপের অবস্থার অবনতি ঘটে। পাছে ফ্রান্স ও তুরস্ক উভয় শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হয় সেই ভয়ে প্রথম আলেকজাণ্ডার শান্তি স্থাপন করিতে আগ্রহী হন। অপরদিকে নেপোলিয়ন যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার জন্য মাহমুদকে সম্মত করাইতে চেষ্টা করেন। পরাজয়ে ক্লান্ত এবং ফরাসী দুমুখো নীতিতে বিরক্ত মাহমুদ রাশিয়াকে প্রাথ নদী বরাবর বেসারাবিয়া ছাড়িয়া দিয়া বুখারেস্টের চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এক মাস পর নেপোলিয়ন রাশিয়া আক্রমণ করেন। তুর্কীগণ যদি ঘটনাপ্রবাহ জানিত তবে নেপোলিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া তাহাদের সাম্রাজ্যের এক বিরাট অংশ পুনরায় লাভ করিতে সক্ষম হইত। যে পরিণতি নেপোলিয়নের ঘটে তাহা সম্ভবতঃ ঘটিত না। ঘটনা যাহা ঘটিয়াছিল রাশিয়ার নিকট ভূখণ্ড ত্যাগ করিবার অপরাধে দ্বিতীয় মাহমুদ স্বীয় প্রতিনিধিদিগকে হত্যা করেন। তিন বৎসর পর প্রথম আলেকজাণ্ডার, যিনি নেপোলিয়নের মৃত্যুর পর ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তার আসনে অধিষ্ঠিত, কনস্ট্যান্টিনোপল জয় করিয়া প্রসিদ্ধ পিটারের স্বপ্ন পূরণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। তিনি তাঁহার প্রিয় পরিকল্পনা "পবিত্র বন্ধুত্বকে" (Holy Alliance)

শক্তিশালী করিবার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি মেটারনিখের প্রভাবেও উদ্বুদ্ধ হন, যিনি "আইনানুগতার" নীতিতে অবিচল থাকেন। এই নীতি ফরাসী বিপ্লব কর্তৃক বিঘোষিত প্রজাতান্ত্রিক মতামতের বিরুদ্ধে সুলতানসহ প্রত্যেক স্বেচ্ছাচারীর স্বীয় ক্ষমতা ধারণ করিবার অধিকারকে তুলিয়া ধরে।

প্রথম আলেকজাণ্ডার মেটারনিখের উপদেশে কর্ণপাত করেন কিন্তু গ্রীকগণ করে নাই। ১৮২১ খ্রীস্টাব্দে তাহারা তাহাদের "আইনানুগ" প্রভু ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং প্রায় ৩০,০০০ তুর্কীকে হত্যা করে। ওসমানীয়গণ ইস্তাম্বুলের গ্রীকদিগকে হত্যা করিয়া ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। সমগ্র ইউরোপ জাগ্রত হয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাহা উল্লেখিত হত্যাকাণ্ডের দ্বারা নহে, বরং এইজন্য যে গণতন্ত্রের জন্মভূমি গ্রীস তাহার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এক শতাব্দী পর ইহুদীবাদের ব্যাপারে যাহা হইয়াছিল, এই ক্ষেত্রেও ইউরোপীয় উদারপন্থীগণ, পৌরাণিক পণ্ডিতবর্গ এবং গণতন্ত্র অভিলাষীগণ "ফিলহেলেন" (Philhellene) সমিতিসমূহ গঠন করে, গ্রীক বিদ্রোহীদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে এবং স্ব স্ব সরকারগুলিকে গ্রীকদের স্বপক্ষে সুলতানের বিরোধিতা করিবার জন্য উৎসাহিত করে। ১৮২২ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারী গ্রীক "জাতীয় পরিষদের" (National Assembly) সভা বসে এবং ইহার স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

সুলতান তাঁহার স্বল্প সাজসরঞ্জাম বিশিষ্ট সেনাবাহিনী ও বিদ্রোহাত্মক জান-নিসারীদিগকে লইয়া এই বিদ্রোহের মোকাবিলা করিতে ব্যর্থ হন এবং ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহার নামেমাত্র অনুগত মিসরের মুহাম্মদ আলীকে এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করেন। মুহাম্মদ আলী যিনি এই ধরনের একটি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন, অতএব তিনি গ্রীকদিগকে দমন করিবার জন্য তাঁহার পুত্র ইব্রাহীমকে প্রেরণ করেন। ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে ইব্রাহীম ম্যাভারিনোয় অবতরণ করেন এবং এক নাগাড়ে অনেকগুলি সফল অভিযানের পর এথেন্স অধিকার করিতে সক্ষম হন। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ বিদ্রোহ প্রায় ধ্বংস হইয়া যায় এবং গ্রীক স্বাধীনতাকে একটি মৃত বিষয়ে পরিণত হয়।

এইসব কিছু চলাকালীন সুলতান নিশ্চয়ই এই বিষয়ে আক্ষেপ করিতে

ছিলেন যে তাঁহার মিসরীয় ভৃত্যের ইউরোপীয় শিক্ষিত সেনাবাহিনীই এই কাজ সমাধা করিল অথচ জান-নিসারীগণ স্বীয় দেশে বেকার বসিয়া রহিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জান-নিসারী বাহিনী ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পক্ষে এক বিরাট বোঝা হইয়া দাঁড়ায়। সময়ের অগ্রগতিতে ইহা সুলতানাতের প্রগতির পথে এক জগদ্দল পাথর ও হুমকিতে পরিণত হয়। জান-নিসারী বাহিনী এত শক্তিশালী, দুর্নীতিপরায়ণ ও অলস হইয়া উঠে যে তাহারা নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী সুলতানদিগকে পদচ্যুত ও সিংহাসনে আরোহণ করায়, প্রধান উজীরদিগকে হত্যা করে এবং সংস্কারের প্রত্যেক প্রচেষ্টায় বাধা প্রদান করে। তাহাদিগকে কাবু করিবার এক ব্যর্থ প্রচেষ্টায় সুলতান সেলিম প্রাণ হারান। তবে মাহমুদ এই গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার পূর্বে ইহার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া তিনি একটি নতুন গোলন্দাজ বাহিনী গঠন করেন এবং ইহাদের হাজার হাজার সৈন্যকে ইস্তাম্বুলে আনয়ন করেন। অতঃপর তিনি জান-নিসারীদিগকে ইউরোপীয় ধরনের সামরিক কুচকাওয়াজ গ্রহণ করিতে আদেশ দান করেন। জান-নিসারীগণ তাহাদের নিজস্ব কুচকাওয়াজ ত্যাগ করিতে অস্বীকার করতঃ রাজপ্রাসাদের দিকে ধাবমান হয়, যাহার ফলে তাহাদিগকে অসংখ্য গুলীর আঘাতে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলা হয়। তাহারা তাহাদের ব্যারাকে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাহাদের প্রায় সবাই ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত গোলন্দাজ বাহিনী ব্যারাকগুলির উপর গোলা নিক্ষেপ করে। সাম্রাজ্যের প্রত্যেকটি নগরীতে তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করা হয় এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হয়। অতঃপর এই বাহিনীর বিলুপ্তি ঘোষণা করিয়া সুলতান একটি আদেশ জারী করেন। এই ঘটনার গুরুত্বকে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ইতিহাসে অতিরঞ্জিত করা যায় না, কারণ ইহা শুধু সামরিক সংগঠনের পথই উন্মুক্ত করে নাই বরং অন্যান্য সংস্কারের দ্বারও খুলিয়া দেয়। জান-নিসারীদের উপর নির্ভরশীল সাম্রাজ্যের প্রতিক্রিয়াশীলগণ অতঃপর অকেজো হইয়া পড়েন।

মাহমুদের প্রশংসা ম্লান হইয়া যায় যখন স্মরণ করা হয় যে গ্রীক ঘটনা তখনও শেষ হয় নাই। রাশিয়ার প্রথম নিকোলিস (১৮২৫—১৮৫৫ খ্রীঃ), যাহার নিকট "আইনানুগতায়" ব্যাপারে মেটারনিকের বুদ্ধিমত্তা ছিল না, গ্রীক বিদ্রোহকে রুশ সুবিধানুযায়ী ঘুরাইয়া দিতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন।

বৃটিশ ও ফরাসীগণ গ্রীকদের স্বপক্ষে জনমতের প্রবল চাপে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হয়। এই জনমত ইংল্যাণ্ডের লর্ড বায়রন এবং ফ্রান্সের চ্যাটুব্রাণ্ডের দ্বারা ব্যক্ত করা হয়। তাঁহারা ইহাও আশঙ্কা করেন যে রাশিয়া ইহাকে ওসমানীয় সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবার একটি ছল হিসাবেও ব্যবহার করিতে পারে। অতএব গ্রেট বৃটন, ফ্রান্স ও রাশিয়া এই তিন শক্তিধর সম্মিলিতভাবে গ্রীকদের সঙ্গে আপোস করিবার জন্য সুলতানকে অনুরোধ করে। ইহা মাহমুদ অস্বীকার করেন, যাহার ফলে এই তিনটি ইউরোপীয় শক্তির সংযুক্ত নৌবহর ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দের ২০শে অক্টোবর ন্যাভারিনোয় ওসমানীয় নৌবহর ধ্বংস করে এবং ইব্রাহীমকে পশ্চাদপসারণ করিতে বাধ্য করে।

সুলতান ক্ষতিপূরণ দাবী করেন এবং রাশিয়া ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে একক-ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। চিরাচরিতভাবে রুশগণ ছিল মন্থরগতিসম্পন্ন, কিন্তু জান-নিসারীদিগকে ধ্বংস করিবার পর একটি নতুন বাহিনী গঠন করিবার মত যথেষ্ট সময় ওসমানীয়গণ লাভ করে নাই। এক বৎসর পর ইদির্ন (আদ্রিয়ানোপল) অধিকার করিয়া রুশগণ ইস্তাম্বুলের আশঙ্কাজনক নিকটে অগ্রসর হয়। ইউরোপীয় শক্তিবর্গ হস্তক্ষেপ করে এবং মাহমুদকে শান্তির প্রস্তাব করিতে প্রবল চাপ প্রদান করে। আদ্রিয়ানোপলের চুক্তির দ্বারা (১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৮২৯ খ্রীঃ) "তিন শক্তির" নিশ্চয়তায় সুলতান গ্রীসের স্বাধীনতা স্বীকার করেন, সার্বিয়াকে স্বায়ত্বশাসন প্রদান করেন এবং দানিয়ুবের মোহনা রাশিয়াকে প্রদান করেন।

আদ্রিয়ানোপলের চুক্তির পর প্রায় সিকি শতাব্দী পর্যন্ত সুলতানের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে মিসরের মুহাম্মদ আলী পাশার সহিত আভ্যন্তরীণ গোল-যোগের প্রতি অথবা সংস্কারের প্রচেষ্টার প্রতি। এই উভয় বিষয়ই পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে। সুলতান তাঁহার ইউরোপীয় প্রতিবেশীদের সহিত তুলনামূলকভাবে শান্তিতেই দিন যাপন করেন। ইতিমধ্যে ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে ইউরোপ একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লবের গোলযোগে নিপতিত হয়, যাহার প্রতিক্রিয়া মধ্যপ্রাচ্যেও সংক্রামিত হয়। একই বৎসর মার্কস ও এঙ্গেলস্ কমিউনিষ্ট গঠনতন্ত্র প্রকাশ করেন। চারি বৎসরের

মধ্যে ফ্রান্স এক নাগাড়ে অনেকগুলি বিপ্লবের মধ্য দিয়া রাজতন্ত্র হইতে দ্বিতীয় প্রজাতন্ত্রে এবং পরে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যে পরিবর্তিত হয়, যাহাতে একনায়ক হিসাবে আগমন করেন আরেকজন বোনাপার্ট, লুই নেপোলিয়ন।

লুই নেপোলিয়ন, যিনি পোপকে তাঁহার দুর্যোগে সাহায্য করেন এবং পুনরায় সম্রাট হইবার জন্য তাঁহার বিদ্রোহের সময় ভ্যাটিক্যান দ্বারা সাহায্যপ্রাপ্ত হন, নিজেকে একজন বিশ্বস্ত ধর্মপুত্র বলিয়া প্রমাণ করিতে উদগ্রীব হন। সুলতানের রোমান ক্যাথলিক প্রজাদের উপর ফ্রান্সের স্বার্থ পুনঃঘোষণা করিয়া এবং প্যালেস্টাইনের খ্রীস্টান পবিত্র স্থানগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রশাসনের ব্যাপারে ভ্যাটিক্যানের বিশেষ সুবিধা দান করিয়া তিনি এই কাজ সম্পাদন করিতে সক্ষম হন। তদুপরি এই ধরনের প্রচেষ্টা প্রথম নিকোলাসের আকাঙ্খাকে প্রতিহত করে, যিনি তৃতীয় নেপোলিয়নকে 'ভ্রাতা' সম্রাট হিসাবে স্বীকার করেন নাই এবং ফ্রান্সের মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

পবিত্র স্থানগুলির কর্তৃত্বের অধিকার লইয়া রোমান ক্যাথলিক ও অর্থোডক্সদের মধ্যে সর্বদা বিবাদ ছিল। ওসমানীয়দের প্যালেস্টাইন অধিকারের পর হইতে সুলতান সর্বদা কখনও একদল এবং কখনও আরেক দলকে আধিপত্য দিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রক্তপাত বন্ধ করিবার জন্য কখনও কখনও মুসলমানদের হাতে এই সব স্থানের রক্ষণাবেক্ষণের ভার ও চাবি অর্পণ করা হয়। ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় সংঘর্ষ হয় এবং ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দের দিকে সুলতান আবদুল মজিদ (১৮৩৯—১৮৬১ খ্রীঃ) অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফরাসী আধিপত্যের উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। জার প্রথম নিকোলাস, যিনি ইহাকে রাশিয়ার সম্মানের প্রতি এক বিরাট আঘাত বলিয়া বিবেচনা করেন, মেনশিকভকে সুলতানের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিবার জন্য প্ররোচিত ও প্রভাবান্বিত করিতে প্রেরণ করেন। সুলতান ফরাসীদের প্রকাশ্য সহায়তা ও বৃটিশদের প্রচ্ছন্ন উৎসাহে ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়াকে সরাসরি প্রত্যাখ্যানমূলক জবাব প্রদান করেন।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ কে আরম্ভ করে তাহা সঠিক করিয়া বলা দুষ্কর। নিজের সম্মান সমুন্নত করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাশিয়া গ্রেট বৃটেনের নিরপেক্ষতা সম্পর্কে 'নিশ্চিত' হয় এবং স্বীয় সাফল্যের উপর আস্থাশীল হয়। প্রথম নিকোলাস পরামর্শ দান করেন যে মৃতপ্রায় "রুগ্ন লোকটির" সম্পত্তি ভাগবাটোয়ারা

করিয়া লইবার ব্যাপারে রাশিয়া ও গ্রেট বৃটেন একে অপরের সহিত সহযোগিতা করুক। ফ্রান্স স্বীয় লব্ধসুবিধাদি রক্ষণাবেক্ষণ করিতে উদ্যোগী হয়। সে দৃশ্যতঃ গ্রেট বৃটেনের নিরপেক্ষতা আশা করে নাই। ওসমানীয়দের পক্ষে ইহা অভাবনীয় সুযোগ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, কারণ সুলতান গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স উভয়ের সহায়তা লাভের ব্যাপারে আশাশীল হন। বৃটেনে প্রথম নিকোলাসের একনায়কত্বের ব্যাপারে সাধারণ বিপত্তি এবং ভারতবর্ষের রাস্তার নিরাপত্তার বিষয়ে সরকারের ভীতি—উভয় কারণ একত্র হইয়া বৃটেনের এই যুদ্ধে জড়াইয়া পড়া অবশ্যম্ভাবী করিয়া তোলে।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধে প্রধান বিবাদমান দলগুলি ছিল রাশিয়ার বিরুদ্ধে ওসমানীয় সাম্রাজ্য, বৃটেন ও ফ্রান্স। পরে অষ্ট্রীয়া ও প্রুশিয়া একে অপরের সহিত একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদন করে এবং ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে অষ্ট্রীয়া বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে যোগদান করে। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে এই যুদ্ধ সমাপ্ত করিয়া প্যারিসের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির ফলে ইউরোপের ক্ষমতার রাজনীতিতে বিজড়িত ওসমানীয়গণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বিজয়ী পক্ষের অংশভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাহারা অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এই চুক্তিতে স্বার্থান্বিত ইউরোপীয় শক্তিবর্গ প্রকারান্তরে ওসমানীয় সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করে এই ঘোষণার দ্বারা যে, যেকোন কার্যকলাপ যাহা এই সাম্রাজ্যের অখণ্ডতাকে বিপদগ্রস্ত করে উহাকে "ইউরোপীয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় হিসাবে গণ্য করা হইবে।" ইউরোপীয়গণ সংস্কার দাবী করে এবং অন্ততঃপক্ষে কাগজে-কলমে তাহা লাভ করে। সুলতানের ফরমান, হাত্তি হুমায়ুন ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে জারী করা হয় এবং উহা দ্বারা সুদূর প্রসারী সংস্কারসমূহ হাতে লওয়া হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ পর্যন্ত ওসমানীয়গণ অন্ততঃপক্ষে বাঁচিয়া থাকিবার অনুমতি লাভ করিবার জন্য উত্তম স্বভাবের নমুনা হিসাবে কিছু 'সংস্কার' প্রদর্শন করে।

ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সংস্কারের ব্যাপারে ইউরোপীয় শক্তিবর্গ আগ্রহান্বিত হয় প্রধানতঃ তাহাদের নিজস্ব স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য, বিশেষতঃ অর্থনৈতিক বিষয়ে, তদুপরি তাহাদের নিজস্ব নাগরিকদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যও বটে, যাহারা উদারনৈতিক মতবাদে উদ্বুদ্ধ হয় এবং মানব জাতির উপকার সাধনের আলোক প্রাপ্তিতে আশান্বিত হয়। পশ্চিম ইউরোপীয়গণ তখনও

রুশ অনধিকার প্রবেশ হইতে সুলতানের স্বাধীনতা রক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী ছিল। অধিকন্তু পশ্চিমী শক্তিবর্গ আবিষ্কার করে যে ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে জীবিত রাখাটাই অর্থনৈতিক দিক হইতে অধিক লাভজনক এবং ইউরোপীয় মহাজনগণ এই লুঠে একে অপরের সহিত প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে।

অন্যূন ২০০ বৎসর ধরিয়া ওসমানীয় সাম্রাজ্য অপমানিত ও পরাজিত হয়, বিশাল ভূখণ্ড হারায়, কিন্তু সুলতান অন্ততঃপক্ষে অর্থনৈতিক দিক দিয়া বৈদেশিক আধিপত্য হইতে মুক্ত থাকেন। ওসমানীয় সুলতানদের ঘাটতি পূরণের অনেক পথ ছিল। তাঁহারা মুদ্রামান হ্রাস করেন এবং কত তাঁহাদের প্রজাদের সম্পদ বাজেয়াফত করেন এবং তাঁহারা দেশীয় মহাজনদের নিকট হইতে টাকা ধার করেন। বিদেশী ব্যাংক ও সরকার হইতে টাকা ধার করিবার অভ্যাস তাহাদের ছিল না। যতদূর সম্ভব ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে সুলতান অস্ত্র ক্রয় করিবার জন্য এবং ক্রিমিয়ার যুদ্ধের ব্যয়ভার বহনের জন্য সর্বপ্রথম বৃটেন ও ফ্রান্স হইতে টাকা ধার করেন। একবার দ্বার উন্মুক্ত হইবার পর সুলতানগণ ধার করিতে থাকেন। স্থানীয় ব্যাংক মালিকগণ এবং ইউরোপীয় মহাজনগণ এমন অধিক হারে মুনাফা অর্জন করেন যে তাহারা এই অভ্যাসকে ক্রমাগত উৎসাহ দিতে থাকেন। শতকরা ৫৫ ভাগ বাটার হারে কর্জ এবং শতকরা ১২ টাকা সুদের হার নিশ্চয়ই লাভজনক। দ্বিতীয় আবদুল হামিদ যখন সুলতান হন (১৮৭৬—১৯০৯ খ্রীঃ) তখন দেশ প্রকারান্তরে কর্জের পঙ্কিলে নিমজ্জিত। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ওসমানীয়দের পরাজয়ের ফলে সুলতানের উপর ১০০,০০০,০০০ ডলার ক্ষতিপূরণ বসান হয়। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সমগ্র সাম্রাজ্য খাতকের আসনে বসে। বৃটিশ, ফরাসী, ডাচ, জার্মান, অষ্ট্রীয়ান ও ইটালীয়ান লগ্নীদাতাগণ ওসমানীয় সরকারী ঋণের জন্য প্রশাসনিক পরিষদ স্থাপন করে এবং সাম্রাজ্যের রাজস্বের উৎপাদন ও আদায় উভয় বিভাগে অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান স্তরগুলির কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। এই পরিষদ হিসাবের জমার স্থিতিশীলতা আনয়ন করে এবং বিদেশী পুঁজির গতিতে উৎসাহ প্রদান করে। প্রথমবারের মত সাম্রাজ্যের প্রজাসাধারণ উন্নয়নে যৎসামান্য অংশীদার হইতে আরম্ভ করে এবং প্রত্যেকে অনুভব করে যে সুলতানের কর্তৃত্বে অবস্থিত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠানগুলি এইগুলির কিছুর মধ্যে নাই।

ইউরোপীয় লগ্নীদাতাগণ সাম্রাজ্যের বিশাল অনুন্নত ভূখণ্ডের কাঁচামাল এবং উন্নয়নের সুযোগসুবিধা লাভ করে যাহা স্বর্ণের খনি আবিষ্কারের সহিত তুলনীয়। ওসমানীয়গণ রাস্তা, রেলপথ, শহরের আলো, পানি এবং সর্বপ্রকারের সরকারী পূর্তকার্যের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ইউরোপীয়গণ টাকা ঋণ দিতে এবং সুবিধাদি লাভ করিতে সদা প্রস্তুত। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে বিসমার্ক চিন্তা করেন নাই যে বলকানবাসীগণ "একটি মাত্র পোমেরানিয়ান পদাতিক সৈন্যের হাড়ের" সমতুল্য। বিশ বৎসর পর দ্বিতীয় উইলহেলমের অধীনে জার্মানগণ তুর্কীদের নিকট শুধু অস্ত্রশস্ত্র বিক্রয় নহে বরং আনাতোলিয়ায় রেলপথ নির্মাণেও ব্যস্ত হইয়া পড়ে। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে কাইজার দ্বিতীয়বার ইস্তাম্বুল সফর করেন এবং এইবার তিনি দামেস্ক ও জেরুজালেম গমন করেন। প্রাচ্যে ড্রাঙ্গনাস অস্টেন (Drang-nach Osten) উদ্বোধন করা হয় এবং প্রসিদ্ধ বার্লিন হইতে বাগদাদ রেলপথ মধ্যপ্রাচ্যে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সূচনা করে। ইহা বৃটিশ, ফরাসী ও রুশদিগকে এমন ভীত করে যে তাহারা নিজেদের পার্থক্য ভুলিয়া যায় এবং জার্মানদের পূর্বদিকের অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য একে অপরের সহিত সহযোগিতা করে।

প্যারিসের চুক্তির পর দুই যুগ ধরিয়া ইউরোপীয়গণ নিজেদের সংঘর্ষ একত্রীকরণের যুদ্ধ এবং অন্যান্য অনেক বিষয় লইয়া ব্যস্ত থাকে। ইহা ওসমানীয়দিগকে কিছু অবকাশ প্রদান করিবার কথা, কিন্তু তাহা করে নাই। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ এবং পশ্চিম ইউরোপের জাতীয় রাষ্ট্রগুলির আবির্ভাব বলকানের প্রজাসাধারণের মধ্যে অনুরূপ অনুভূতির জন্ম দেয়। সার্বগণ স্বাধীনতার প্রয়াসী হয়, গ্রীকগণ আরও ভূখণ্ডের আশা করে, বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বলিত হয় এবং রুমানিয়ায় বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

যেই গতি ও নির্মমতার সহিত ওসমানীয় সৈন্যগণ বিদ্রোহীদের দমন করে তাহাতে পশ্চিম-ইউরোপের শিক্ষিত উদারপন্থীগণ ভরাভিভূত হইয়া পড়ে এবং তুর্কীদিগকে শাস্তি দেওয়ার জন্য দল পাকাইতে থাকে। অপরদিকে পশ্চিম-ইউরোপের সরকার ও শিল্পপতিদের রক্ষা করিবার মত যথেষ্ট লাভজনক অর্থের বিনিয়োগ ছিল বলিয়া তাহারা এইসব মানবিক বিবেচনায়

দিকে মোটেই ভ্রূক্ষেপ করে নাই। রুশ ও অষ্ট্রীয়ানগণ এতদ্বারা তুর্কীদের সঙ্গে তাহাদের উদ্দেশ্য হাসিল করিবার সুযোগ লাভ করে। ইউরোপের শক্তিসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ একটি সমাধানের জন্য ইস্তাম্বুলে সমবেত হয়। সুচতুর দ্বিতীয় আবদুল হামীদ, যিনি সংস্কারবাদীদের দ্বারা মাত্র সিংহাসনারূঢ় হন (৩১শে আগষ্ট, ১৮৭৬ খ্রীঃ), শাসনতান্ত্রিক সংস্কারে সম্মত হন। ইহা বৃটিশদিগকে খুশী করে কিন্তু রুশদিগকে নহে, কারণ তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। ফ্রান্স তখনও জার্মানীর হাতে পরাজয়ের ক্ষত সারাইতে ব্যস্ত। বিসমার্ক বলকানে তেমন আগ্রহী নহেন; এবং বৃটেনে জনমত তুর্কীদের ব্যাপারে এমন সমালোচনামুখর যে, তাহারা নেতৃবৃন্দকে ওসমানীয়দের স্বপক্ষে যুদ্ধে অবতরণ করিবার ব্যাপারে নারাজ।

১৮৭৭ হইতে ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের যুদ্ধে তুর্কীগণ সাহসিকতার সহিত যুদ্ধ করে, কিন্তু রুশদিগকে ঠেকাইতে ব্যর্থ হয়, যাহারা ইস্তাম্বুলের মাত্র দশ মাইল নিকটস্থ স্যানস্টেফানো ইয়াশীলকর গ্রামে পৌঁছিয়া যায়। আবদুল হামীদ স্যানস্টেফানোর চুক্তিতে (১৩ই মার্চ, ১৮৭৮ খ্রীঃ) স্বাক্ষর করেন, যদ্বারা ইউরোপে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাও চলিয়া যায়। এই চুক্তি মণ্টোনিগ্রো, সার্বিয়া ও রুমানিয়াকে স্বাধীনতা দান করে এবং বসনিয়া ও হার্জেগোভিনাকে স্বায়ত্তশাসন দান করে। তবে এই চুক্তির মূল ছিল কৃষ্ণসাগর হইতে এজিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট বুলগেরিয়ার সৃষ্টি। তদুপরি পূর্ব এশিয়া মাইনরে সুলতান এক বিশাল ভূখণ্ড ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। এইসব কিছু ছাড়াও হৃতমনোবল সুলতান প্রায় ৩০০,০০০,০০০ রুবল ক্ষতিপূরণ দান করিতে সম্মত হন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ উত্থাপিত হয় গ্রীকদের নিকট হইতে—যাহারা তাহাদের ভূখণ্ডজনিত আকাঙ্খার সমাপ্তি দেখিতে পায়; সার্বদের নিকট হইতে—যাহারা বহু সংখ্যক সার্বদিগকে বিরাট বুলগেরিয়ার প্রজা হইয়া যাওয়ার আক্ষেপ করে; অষ্ট্রীয়ানদের নিকট হইতে—যাহারা তাহাদের পূর্বদিগের অগ্রগতি রুদ্ধ দেখিতে পায়; এবং বৃটিশদের নিকট হইতে—যাহারা প্রধান মন্ত্রী ডিজরাইলীর নেতৃত্বে রাশিয়ার বিরুদ্ধে চলিয়া যায়। জার্মানীসহ এইসব দেশ রাশিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করে এবং স্যান স্টেফানোর চুক্তি পুনর্বিবেচনার জন্য বার্লিনের সম্মেলন (১৩ই জুন, ১৮৭৮ খ্রীঃ) আহ্বান করে।

বার্লিনের চুক্তি স্যান স্টেফানোর চুক্তির স্থলাভিষিক্ত হয় এবং ইহা সম্পূর্ণ প্রতারণামূলক, যাহা বলকান সমস্যার কোন সমাধানই উপস্থাপিত করে নাই। বুলগেরিয়াকে বিভক্ত করা হয় এবং ইহার কিছু অংশ তুরস্ককে দেওয়া হয়; অষ্ট্রীয়া বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার কর্তৃত্ব অর্জন করে; সার্বিয়া ও মণ্টোনিগ্রো স্বাধীনতা লাভ করে; রাশিয়া বেসারাবিয়ার স্থায় বাটুম ও কার্স্ অধিকার করে, গ্রীস কিছু ভূখণ্ড লাভ করে, এবং গ্রেট বৃটেন সাইপ্রাস লাভ করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তি ঘটে এবং তৎসঙ্গে ওসমানীয়গণ ইউরোপীয় শক্তিসমূহের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্যে চলিয়া যায়। দ্বিতীয় আবদুল হামীদ নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত বুদ্ধি নিয়োজিত করেন, কিন্তু ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ নিরাশাব্যঞ্জক। প্রথম মহাযুদ্ধ নাগাদ সুলতান তাঁহার ইউরোপীয় ভূসম্পত্তির প্রায় সবকিছুই হারাইয়া ফেলেন এবং ফারটাইল ক্রিসেণ্ট ও উত্তর আফ্রিকায় তাঁহার কর্তৃত্ব অবশিষ্ট থাকে শুধু নামে মাত্র।

একবিংশ অধ্যায়

আরবীভাষী বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদ

১৭৯৮ খ্রীস্টাব্দে মিসরে নেপোলিয়নের অভিযানকে সাধারণতঃ আরবীভাষী বিশ্বে ইউরোপীয় অনুপ্রবেশের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলিয়া বিবেচনা করা হয়। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্তঃস্থলীয় এলাকায় ইউরোপীয়দের আগ্রহ জাগাইতে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি কিছু সংখ্যক মুসলিম নেতৃবৃন্দের চক্ষু উন্মোচন করিতে ইহা এক অদ্ভুত উপাদান হিসাবে কাজ করে। এই অঞ্চলের সঙ্গে ফ্রান্স ও গ্রট ব্রিটেন উভয়েই কিছুটা পরিচিত ছিল। ক্রুসেডের সময় হইতে লেবাননের শন ও সিল্ক উভয়বিধ ব্যবসার জন্য এবং রোমান ক্যাথলিক ও ফরাসীদের প্রতি সমবেদনশীল মেরোনাইটদের জন্য ফ্রান্স লেবাননের প্রতি আগ্রহশীল ছিল। মেরোনাইট খ্রীস্টান ও ড্রুজেসদের সদাসংঘটিত যুদ্ধে ফ্রান্স সর্বদাই মেরোনাইটদের সহায়তায় আগাইয়া আসে। মধ্যপ্রাচ্যে ভূম্যাধিকারী এবং ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বী বৃটিশগণ ড্রুজেসদের পক্ষ অবলম্বন করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পারস্য উপসাগরে অনুপ্রবেশ করে এবং বসরা, বাগদাদ, দামেস্ক ও আলেপ্পোতে ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপন করে। ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দে বাংলাদেশের বৃটিশ কোম্পানীর গভর্ণর ওয়ারেন সুয়েজে একটি অভিযান প্রেরণ করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল স্থলপথে ভূমধ্যসাগরে মালপত্র প্রেরণ করিবার জন্য ইহাকে একটি কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা। ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে লোহিত সাগরে জাহাজ চলাচলের জন্য বৃটিশ মিসরের মামলুক শাসকদের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করিতে সমর্থ হয়।

মধ্যপ্রাচ্য ও ভারতবর্ষে ফ্রান্স ও বৃটেনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়নের উত্থানের দ্বারা আরও জটিল আকার ধারণ করে। নেপোলিয়নের বিরাট পরিকল্পনার একটি অংশ ছিল ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের প্রধান

যুদ্ধস্থল ইউরোপে রাখিয়া বৃটেনকে সকল দিক হইতে হয়রানী করা। ভারতবর্ষের বাণিজ্যপথ ছিল নিশ্চয়ই নাজুকতম। সম্ভবতঃ একটি বিশাল সাম্রাজ্য গঠন অথবা মধ্যপ্রাচ্যের লোকদের মধ্যে পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি বিস্তারের স্বপ্নও তাঁহার ছিল। তিনি যে তাঁহার দলের সঙ্গে অনেক বেসামরিক লোক-কেও লইয়াছিলেন তাহাই প্রমাণ করে যে স্বদেশে এবং বিশাল পৃথিবীতে যশ ও জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য প্রতিটি সুযোগ গ্রহণ করিতে তিনি প্রস্তুত। তাঁহার অভিযান মিসরের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সম্যক জ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া পরিচালনা করেন এবং আরও অধিক জ্ঞান লাভের জন্য তিনি বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ ও বৈজ্ঞানিকদিগকেও সঙ্গে রাখেন। মিসরে নেপোলিয়ন মামলুকদের হাত হইতে জনগণকে বাঁচাইবার জন্য ত্রাণকর্তার মূর্তি ধারণ করেন। তিনি নিজেকে ইসলাম ও ওসমানীয় সুলতানের বন্ধু বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু মিসরের মালীক ছিল ওসমানীয়গণ এবং মহামান্য দরবার নেপোলিয়নের অনুপ্রবেশ পছন্দ করেন নাই। বৃটিশও কালবিলম্ব না করিয়া ইহা দেখাইয়া দেয় এবং সুলতান একটি অভিযান প্রেরণ করেন যাহা বৃটিশদের সহায়তায় ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী বাহিনীকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করে।

মুহাম্মদ আলীর উত্থান

নেপোলিয়ন বৃটিশদিগকে নাজেহাল করিতে যেমন ব্যর্থ হন ঠিক তেমনি তাঁহার নিজস্ব খ্যাতি বৃদ্ধি করিতেও ব্যর্থ হন। তাঁহার সেনাবাহিনী আত্ম-সমর্পণ করিবার অনেক পূর্বে তিনি ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করেন। নেপো-লিয়নের অভিযানের সময় দুইটি আনুষঙ্গিক ঘটনা না ঘটিলে প্রত্যেক কিছু হয়ত স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরিয়া যাইত। এইগুলির একটি হইল, নেপো-লিয়নের সঙ্গী পণ্ডিতবর্গ কর্তৃক প্রসিদ্ধ রসেতা পাথর (Rosetta stone) আবিষ্কার যাহা প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার দ্বার উন্মোচনে মূল্যবান চাবিকাঠি হিসাবে প্রতীয়মান হয়। নেপোলিয়ন বিদ্বানবর্গ মিসরের প্রাকৃতিক, মানবিক ও অর্থনৈতিক ভূগোলের সঠিক তথ্যের এক মহাসম্পদও প্রস্তুত করেন। দ্বিতীয় অনুষঙ্গ হইল একটি দুর্ঘটনা, যাহার জন্য নেপোলিয়ন দায়ী ছিলেন না। ঘটনাটি হইল মিসরে সুলতান কর্তৃক প্রেরিত অভিযাত্রী

বাহিনীতে মুহাম্মদ আলী নামে একজন যুবককে প্রেরণ করা হয়, যিনি মিসরের ইতিহাসকে পরিবর্তন করিয়া দেন। নেপোলিয়নের অভিযান ইউরোপের ক্ষমতা সপ্রমাণ করে, কিন্তু মুহাম্মদ আলী ছিলেন গুটিকতকের মধ্যে একজন যিনি এই ক্ষমতার উৎস অনুধাবন করেন এবং পাশ্চাত্য হইতে সেইগুলি ধার করিয়া মিসরকে আধুনিক বিশ্বে আনয়ন করিতে চেষ্টা করেন।

মুহাম্মদ আলী ১৭৬৯ খ্রীস্টাব্দে আলবেনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সম্ভবতঃ তিনি পারস্য ও তুর্কী বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি কি একজন তামাক বিক্রেতা ছিলেন অথবা একজন তামাক ব্যবসায়ীর পুত্র ছিলেন তাহা সঠিক বলা যায় না। সঠিক যাহা বলা যায় তাহা হইল এই যে, ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে যখন তিনি আলবেনিয়ান সেনাদলের সহিত মিসরে গমন করেন তখনও তিনি একজন গুরুত্বপূর্ণ অফিসার ছিলেন। ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে ফরাসী সেনাবাহিনীর পরাজয়ের পর মুহাম্মদ আলীই সেই শূন্যতা পূরণ করেন। ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ তিনি মিসরের পাশা নিযুক্ত হন। তখন হইতে বৎসর অতিক্রমের সাথে সাথে মুহাম্মদ আলীর ভাগ্যতারকা উজ্জ্বলতর হইতে থাকে। অনতিকাল পরেই বৃটিশগণ সন্দেহ করে যে ফ্রান্সের হাত হইতে তাহারা মিসরকে রক্ষা করিয়াছে শুধুমাত্র ইহাকে মুহাম্মদ আলীর হাতে ন্যস্ত করিবার জন্য। অপরদিকে ফরাসীগণ অনুভব করে যে নিজেরা যাহা করিতে পারে নাই তাহা সম্ভবতঃ মুহাম্মদ আলীই করিতে সক্ষম, তাই তাহারা তাঁহাকে সমস্ত সহযোগিতা প্রদান করিতে আরম্ভ করে।

তবে মুহাম্মদ আলী ফরাসীদের হাতের ক্রীড়নক হইয়া যান নাই। তিনি ইউরোপীয় অস্ত্রশস্ত্র, কারিগরিবিদ্যা ও শিক্ষার আধিপত্য উপলব্ধি করিবার মত যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি তাঁহার অনুসারিদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য ফরাসীদিগকে অনুরোধ করেন। ফরাসী নৌ ও সামরিক বিশেষজ্ঞদিগকে মিসরে আনয়ন করতঃ সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া তিনি একটি নতুন সামরিক ও নৌবাহিনী গঠন করেন। ফরাসী ধারার স্কুল খুলিয়া তিনি ফরাসী পুস্তকাবলী আরবীতে অনুবাদও করেন। তিনি কৃষি বিশেষজ্ঞদিগকেও আনয়ন করেন এবং ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ তুলা, শন, নীল ও তিলের ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া তোলেন। তিনি জাহাজ

ও পোতাশ্রয়ও নির্মাণ করেন। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এইসব কিছু তিনি ইসলামের গৌরব বা মিসরীয় জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য করেন নাই। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে তাঁহার উচ্চাকাঙ্খা ছিল তাঁহার নিজের জন্য এবং তাঁহার বংশধরদের জন্য।

১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে আরবে একটি অভিযান প্রেরণ করিয়া ওয়াহাবীদের[১] ধর্মীয় রাজনৈতিক বিদ্রোহ দমন করিবার নিমিত্ত সুলতানের আদেশও তিনি পালন করেন। কয়েক বৎসর পর ১৮২৪ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীনতার জন্য গ্রীকগণ বিদ্রোহ করিলে সুলতান পুনরায় মুহাম্মদ আলীর সাহায্য চাহিয়া পাঠান। মুহাম্মদ আলীর পুত্র ইব্রাহীম ১০,০০০ সৈন্য লইয়া তথায় গমন করেন এবং ইউরোপীয় শক্তিবর্গ হস্তক্ষেপ করিয়া ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে নাভারিনোয় মিসরীয় নৌবহরকে ধ্বংস না করিলে তিনি এই অভিযানে সফলতাই লাভ করিতেন।[২]

এইসব কিছু চলাকালে বৃটিশ মুহাম্মদ আলীর সম্ভাব্য ক্ষমতার বিরুদ্ধে নিজেদিগকে শক্তিশালী করিতে ব্যস্ত থাকে। আরব উপদ্বীপে তাহারা বাব আল-মান্দেব ও এডেন অধিকার করে। পারস্য উপসাগরের মস্কট ও বাগদাদে তাহারা স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। সিরিয়ায় তাহারা সুলতানের হাত দৃঢ় করে এবং খোদ মিসরে মুহাম্মদ আলীর বিরুদ্ধে মামলুকদের ক্ষমতার পুনরুত্থান করিতে চেষ্টা করে। বৃটিশদের পরিকল্পনা নস্যাৎ করা এবং নিজেকে মামলুকদের হাত হইতে রক্ষা করা এই উভয় উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ আলী এক নাগাড়ে কয়েকটি প্রচেষ্টার মাধ্যমে মামলুকদের দুইজন প্রভাবশালী নেতাকে একে অপরের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেন। মাত্র একজন নেতা বাকী থাকে। মুহাম্মদ আলী তাঁহাকে এবং মামলুকদের অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে এক ভোজসভায় দুর্গে আমন্ত্রণ করেন। তথায় ভোজের পর তিনি তাহাদের সবাইকে হত্যা করান। এইভাবে মামলুকদের ক্ষমতা লোপ পায় ও স্বেচ্ছাচারী শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা ও বলপ্রয়োগের দ্বারা ক্ষমতায় আসে এবং একই উপায়ে ধ্বংস হইয়া যায়।

১। নীচে দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৪২ (মূল গ্রন্থ)।
২। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ২০৪ (মূল গ্রন্থ)।

১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে মুহাম্মদ আলী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে সিরিয়া আক্রমণ করিয়া মূল ক্ষমতা দখল করিবার জন্য তাঁহার পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার সময় সমুপস্থিত। তিনি দাবী করেন যে গ্রীক বিদ্রোহে মহামান্য দরবারের সাহায্যে যাইবার পুরস্কার হিসাবে সুলতান তাঁহাকে সিরিয়ার পাশা পদ প্রদান করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। পুনরায় তিনি তাঁহার পুত্র ইব্রাহীমের নেতৃত্বে যথেষ্ট সাজসরঞ্জামপূর্ণ একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। তেমন কোন বাধাবিপত্তি ছাড়াই মিসরীয় বাহিনী সিরিয়া অধিকার করে এবং ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ তাহারা এশিয়া মাইনরে উপস্থিত হইয়া ওসমানীয় সেনাবাহিনীকে কোনিয়ায় পরাজিত করে। ওসমানীয় সুলতান মাহমুদ এতই বিচলিত হইয়া পড়েন যে তিনি রাশিয়ার সাহায্য চাহিয়া পাঠান। প্রভাব বিস্তার করিবার এই সুবর্ণ সুযোগের আশায় রাশিয়ার জার সানন্দে এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং ইস্তাম্বুলে সৈন্য প্রেরণ করেন। ফরাসীগণ, যাহারা সর্বদাই মুহাম্মদ আলীকে উৎসাহ দিয়া আসিতেছিলেন, এই কার্যে শঙ্কিত হইয়া পড়ে এবং তাহাদের শিষ্যকে শত্রুভাবাপন্ন সুলতানের সঙ্গে শান্তি স্থাপন করিতে পরামর্শ প্রদান করে। মুহাম্মদ আলী তাহাদের কথামত কাজ করিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তৎপরিবর্তে বাৎসরিক ১৫০,০০০ পাউণ্ডের বিনিময়ে তাঁহাকে বাৎসরিক ভিত্তিতে মিসর, সিরিয়া ও ক্রীটের পাশা পদ প্রদান করা হয়। তবে রুশগণ ইস্তাম্বুল ত্যাগের প্রাক্কালে হুনকিয়ার ইস্কেলেসীর চুক্তি সম্পাদন করে যদ্বারা আভ্যন্তরীণ অবস্থা মোতাবেক তাহারা তুরস্কে সৈন্য প্রেরণের অধিকার লাভ করে।

এইভাবে মিসর এবং সমগ্র ফারটাইল ক্রিসেণ্টকে ইউরোপীয় ক্ষমতার রাজনীতির আবর্তে টানিয়া আনা হয়। সিরিয়ার মিসরীয়গণ তাহাদের ভারতবর্ষের পথে হুমকি সৃষ্টি করিলে বৃটিশগণ বিচলিত হয়। মুহাম্মদ আলীর সাহায্যদাতা ফরাসীগণ ঘটনার বৈপরিত্যে শঙ্কিত হয় এবং বৃটিশদের ন্যায় হুনকিয়ার ইস্কেলেসীর চুক্তির ফলাফলে আশঙ্কা প্রকাশ করে। সুলতান তাঁহার ভৃত্যের হাতে পরাজয় বরণ করিতে সম্মত না হইয় যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ আলী এইভাবে তাঁহার ঘৃণার পাত্র দ্বিতীয় মাহমুদকে ধ্বংস করিবার পথে বাধাপ্রাপ্ত হন। কিন্তু আট বৎসর ধরিয়া ইব্রাহীম যোগ্যতা ও প্রগতিশীল উপায়ে সিরিয়া শাসন করেন। বহু শতাব্দীকালের

মধ্যে এই প্রথম মুসলমান, খ্রীস্টান, ড্রুজেস ও ইহুদীগণ একত্রে শান্তিতে বসবাস করে। ইব্রাহীম যুদ্ধের জন্যও প্রস্তুত হন এবং সিরিয়াবাসীদের উপর অতি ঘৃণিত বাধ্যতামূলক সৈন্যবাহিনীর চাকুরী চালু করেন। বিভিন্ন জায়গায় বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়ে।

এইরূপ বিশ্বজনীন অসন্তোষে যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হয় নাই। জার্মান জেনারেল ফন মল্টকের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সুলতানের সেনাবাহিনী ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে সীমান্ত অতিক্রম করিয়া সিরিয়ায় প্রবেশ করে এবং নাজিবে ইব্রাহীমের হাতে প্রচণ্ড মার খায়। এই যুদ্ধের কিছুদিন পর সুলতান মারা যান এবং তাঁহার মৃত্যুর পরেই আলেকজান্দ্রিয়ায় ওসমানীয় নৌবাহিনী মিসরের নিকট আত্মসমর্পণ করে। নতুন সুলতান মুহাম্মদ আলীর দাবী মানিয়া লইতে রাজী হন। পুনরায় ইউরোপীয় শক্তিসমূহ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। শেষ পর্যন্ত বৃটেন, রাশিয়া, প্রুশিয়া ও অষ্ট্রীয়াকে ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দে একটি চুক্তিতে রাজী করাইতে সচেষ্ট হয়, যদ্বারা মুহাম্মদ আলীকে মিসরের বংশানুক্রমিক পাশাপদ এবং আজীবন দক্ষিণ সিরিয়ার আধিপত্য দান করা হয়। মুহাম্মদ আলী এই প্রস্তাব অস্বীকার করিলে বৃটিশ সেনাবাহিনী সিরিয়ায় অবতরণ করে। তাঁহাদের বন্ধু ড্রুজেসদের সহায়তায় বৃটিশ বৈরুত অধিকার করে এবং ইব্রাহীমকে পরাজিত করে। ফ্রান্স একটি কূটনৈতিক পরাজয় বরণ করে, কারণ তাহারা বৃটেনের ন্যায় রুশ অভিপ্রায়ে শঙ্কিত ছিল এবং ইউরোপীয় শক্তিবর্গকে বাধা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল। মুহাম্মদ আলী পরাজিত হন এবং মিসরের বংশানুক্রমিক পাশাপদ গ্রহণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকেন। ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দে "প্রণালীর প্রতিনিধি সভা" (straits convention) হুনকিয়ার ইস্কেলেসীর চুক্তির স্থলাভিষিক্ত হয় যদ্বারা সমস্ত জাতির যুদ্ধ জাহাজের জন্য প্রণালী বন্ধ করা হয়। এইভাবে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ওসমানের বংশকে উৎখাত করিবার প্রথম প্রধান প্রচেষ্টার পরিসমাপ্তি ঘটে। প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, কিন্তু ইহা সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া রাখিয়া যায়। ইহা মিসরকে তাহার ভয়ানক হতবুদ্ধিতা হইতে উদ্ধার করে, ইহা মিসর ও ফারটাইল ক্রিসেণ্টকে সরাসরি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের পথে টানিয়া আনে, এবং সম্ভবতঃ সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হইল, ইহা আরবীভাষী বিশ্বকে

ইউরোপীয় কারিগরিবিষ্ঠার ক্ষমতার স্বাদ প্রদান করে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্ব স্ব স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স, রাশিয়া ও অষ্ট্রিয়ার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। সময় সময় তাহারা অসন্তোষসহকারে বলকানস্থ সুলতানের প্রজা জাতিসমূহের প্রতি নজর দেয়, যাহারা স্বাধীনতা দাবী করে। তবে উপরোল্লিখিত নীতিসমূহ এই দুই জাতিকে ফারটাইল ক্রিসেণ্ট, মিসর ও উত্তর আফ্রিকায় সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ভঙ্গ করিতে বাধা দান করে নাই।

সিরিয়া লেবানন

বহুদিন পর্যন্ত ধর্মীয় শত্রুতা ও যুদ্ধবিগ্রহ ছিল সিরিয়া লেবাননের ইতিহাসের অংশবিশেষ। শুধু মুসলমান, খ্রীস্টান ও দ্রুজেসগণই একে অপরের বিরুদ্ধে বিবাদমান ছিল না, বরং ইসলাম ও খ্রীস্টান উভয় ধর্মের অন্তর্নিহিত বিভিন্ন ধর্মীয় প্রশাখার মধ্যেও বিবাদ ছিল। ইব্রাহীম তাঁহার মিসরীয় সৈন্যগণ লইয়া যখন এই অঞ্চলে প্রবেশ করেন লেবানন তখন দ্বিতীয় বশীর (১৭৮৮—১৮৪০ খ্রীঃ) কর্তৃক শাসিত সিরিয়ার পাশার একটি অংশ ছিল। তিনি শিহাবের বংশের একজন উত্তরাধিকারী, যাহারা ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দ হইতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। তিনটি ধর্মের মধ্যে গোলযোগের সময় এই বংশ তিনটি ধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত এই কথা সপ্রমাণ করিতে সক্ষম হয়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁহারা তাঁহাদের ধর্ম পরিবর্তন করিতেন। দ্বিতীয় বশীরের নামকরণ হয় একজন খ্রীস্টান হিসাবে কিন্তু তাহার মাতা ছিলেন একজন মুসলমান। মিসরীয়দের এই এলাকা দখলের সময় তিনি ছিলেন একজন দ্রুজে। তিনি ইব্রাহীমের সহিত সহযোগিতা করেন যদিও বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বেশ কিছু সংখ্যক নিম্নমানের শেখ সুলতানের প্রতি অনুগত থাকেন। ইব্রাহীমের উৎসাহে বশীর পাশ্চাত্যের জন্য লেবাননের দ্বার উন্মুক্ত করেন। ফরাসী ব্যবসায়ী ও বৃটিশ জাহাজসমূহ ছাড়াও ফরাসী ও আমেরিকান মিশনারীগণও এই অঞ্চলে আগমন করেন।

ইব্রাহীমের পরাজয়ের সহিত বশীরের শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং তাঁহাকে মাল্টায় নির্বাসিত করা হয়। এতদঞ্চলে ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ব্যাপক আকার ধারণ করে। মোটের উপর মেরোনাইট খ্রীস্টানগণ ফরাসীদের

পক্ষাবলম্বন করে। আর অর্থোডক্সগণ রুশদের, দ্রুজেগণ বৃটিশদের এবং মুসলমানগণ সুলতানের পক্ষাবলম্বন করে। ফারটাইল ক্রিসেণ্টে সুলতান অথবা রুশদের যেহেতু তেমন কোন ক্ষমতা ছিল না তাই ইহার প্রধান নায়ক ছিল ফরাসী ও বৃটিশগণ যাহারা তাহাদের শিষ্য যথাক্রমে মেরোনাইট ও দ্রুজেদের মধ্যে কাজ করে।

কিছুকালের জন্য মহামান্য দরবার পাঁচটি ইউরোপীয় শক্তির ছত্রছায়ায় এই অঞ্চল শাসন করিবার জন্য শাসনকর্তা প্রেরণ করে। এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হইলে শক্তিবর্গ একটি যৌথ আধিপত্য সৃষ্টি করে, যথা উত্তরে মেরোনাইটগণ এবং দক্ষিণে দ্রুজেগণ। দ্রুজেগণ প্রায় ১৪,০০০ মেরোনাইটকে হত্যা করিলে এই দুই দলের মধ্যে সংঘটিত ছোট ছোট যুদ্ধ ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে এক প্রকাশ্য যুদ্ধে পরিণতি লাভ করে। মেরোনাইটদিগকে সাহায্য করিবার জন্য ফরাসীগণ একটি অভিযান প্রেরণ করে, কিন্তু সৈন্যগণ পৌঁছিবার পূর্বেই ওসমানীয়গণ সেই এলাকায় শান্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হয়। রাশিয়ার সহায়তায় ফরাসীগণ লেবাননকে একটি আশ্রিত রাজ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে চায়। মহামান্য দরবারের সহায়তায় বৃটিশগণ এই প্রচেষ্টাকে বাধা দান করে। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের জুন মাস নাগাদ ইউরোপীয় শক্তিবর্গ এবং দরবার ইস্তাম্বুলে "রেলমেণ্ট অর্গানিক" (Reglment Organique) স্বাক্ষর করিতে সক্ষম হয়। ইহা অনুসারে দরবারের মনোনীত একজন খ্রীস্টান শাসনকর্তার অধীনে লেবাননকে স্বায়ত্তশাসিত ঘোষণা করা হয়। এই ব্যবস্থা প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত স্থায়ী হয়।

মিসর

ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার ন্যায় সাম্রাজ্যবাদের প্রধান কার্যাবলী মিসরে কেন্দ্রীভূত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে মুহাম্মদ আলীই ছিলেন মিসরের আসল কর্তা এবং ইস্তাম্বুলের কোন হস্তক্ষেপই সেখানে ছিল না। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু নাগাদ মুহাম্মদ আলী প্রশাসনকে পুনর্বিন্যাস করেন এবং মিসরের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। রাজস্ব আদায়, পানি সেচের কর্তৃত্ব ও গণনিরাপত্তার জন্য তিনি কর্মকর্তাদের একটি কাঠামো তৈয়ার করেন।

মামলুকদের নিকট হইতে বাজেয়াফ্‌ত করা সমস্ত জমি তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। ইহার অংশ বিশেষ তিনি তাঁহার পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবকে দান করেন। অবশিষ্ট জমি রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং এই গুলি প্রজাদের নিকট ইজারা দেওয়া হয়। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ এইসব জমি "মালীক-দের নামে রেজিস্ট্রি" করা হয় এবং ইসলামী উত্তরাধিকারী আইনের আওতাভুক্ত করা হয়। ইহার অর্থ এই যে জমি পরিবারদের মধ্যে থাকিয়া যায় এবং এইভাবে একটি জমিদার শ্রেণী সৃষ্টি করা হয়। তুলা, তামাক ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যে তিনি রাষ্ট্রের একচেটিয়া নীতি স্থাপন করেন। সরকার সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য স্বল্পমূল্যে ক্রয় করে এবং অতি উচ্চ লাভে বিক্রয় করে। তাহার শাসনের প্রায় ৪০ বৎসরে মিসরের চাষোপযোগী এলাকা ৩,২০০,০০০ একর হইতে ৪,১৬০,০০০ একরে উন্নীত হয়, রাজস্ব ১,২০৩,৫০০ পাউণ্ড হইতে ৪,২০০,০০০ পাউণ্ডে উন্নীত হয়, এবং রপ্তানী ২০০,০০০ পাউণ্ড হইতে ২,০০০,০০০ পাউণ্ডে বৃদ্ধি পায়।

তিনি কারখানাও নির্মাণ করেন, কিন্তু এইগুলি সাধারণতঃ ব্যর্থ হয়। কারণ মিসরে কোন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কারিগর, জ্বালানী অথবা খুচরা যন্ত্রাংশ ছিল না। অর্থনৈতিক দণ্ড ছিল দোদুল্যমান, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও মুহাম্মদ আলীর লৌহকঠিন নিয়ন্ত্রণের ফলে এইসব কারখানা চালু থাকে। ১৮৩৮ খ্রীস্টাব্দে ইঙ্গ ওসমানীয় বাণিজ্যিক চুক্তির ফলে মুহাম্মদ আলীর শিল্প-সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়। এই চুক্তির ফলে একচেটিয়া কারবার ও বাণিজ্যনিয়ন্ত্রণ নিষিদ্ধ করা হয় এবং বৃটিশগণ সরাসরি জনসাধারণ হইতে ক্রয় করিবার অধিকার লাভ করে। এই চুক্তি মিসরে কার্যকরী করা হয় এবং ইহা দেশকে শিল্পোন্নত করিতে বাধা দান করে। মুহাম্মদ আলীর সংস্কারসমূহ জীবনধারণের মান এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্য উন্নত করিয়াছিল কিনা সন্দেহের বিষয়, কিন্তু এইগুলি ছিল উল্লেখযোগ্য প্রারম্ভ।

মিসরের দুর্ভোগ্য, মুহাম্মদ আলীর উত্তরাধিকারীগণ ছিলেন অধিকাংশই অযোগ্য ও অমিতব্যয়ী। তাঁহার পরবর্তী উত্তরাধিকারী আব্বাস ছিলেন একজন ধর্মান্ধ, যিনি মুহাম্মদ আলী কর্তৃক আনীত ফরাসী উপদেষ্টাদিগকে গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত ছয় বৎসরের কুশাসন

অনুল্লেখযোগ্য এবং ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার হত্যার পর পেটুক সাঈদ ক্ষমতায় আসেন।

সুয়েজ খাল

সাঈদের অনেক ইউরোপীয় বন্ধু ছিলেন। ইহাদের ভিতর ছিলেন মিসরের ফরাসী রাজনৈতিক প্রতিনিধির পুত্র সুদক্ষ ফার্ডিন্যাণ্ড ডি লেসেপ্‌স্‌। তিনি সুয়েজখাল পুনরায় চালু করিবার বিষয় চিন্তা করেন, যাহার অংশ-বিশেষ ফেরাউনগণ খনন করিয়া ছিলেন। সাঈদের সিংহাসনে আরোহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ডি লেসেপ্‌স্‌ কায়রোতে আগমন করেন এবং খাল খনন করিবার একটি অনুমতিপত্র লাভ করেন। অধিকাংশ বিশ্ব যখন এই খবরে তেমন মনোযোগ প্রদান করে নাই, তখন ফ্রান্সে এক ক্ষুদ্র অংশ অত্যন্ত উৎসাহী হইয়া উঠে। অনুরূপ এক ক্ষুদ্র অংশ গ্রেট বৃটেনে দিশেহারা হইয়া উঠে এবং এই কাজে বাধাপ্রদান করিবার জন্য ইহাদের সাধ্যমত চেষ্টা করে। এই অনুমতিপত্রে মহামান্য দরবারের সম্মতি প্রয়োজন হয়। সেসময় বিদ্যমান ক্রিমিয়ার যুদ্ধে বৃটেনের মত এক বন্ধুর বিরাগভাজন হওয়া দরবারের উপায় ছিল না। এমন নহে যে ইংল্যাণ্ড মিসরের বাণিজ্যিক সম্ভাবনা কামনা করিত না। বস্তুতঃ মিসর অন্য যে কোন দেশের তুলনায় বৃটেনের সঙ্গেই অধিক ব্যবসা করিত। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে বৃটিশ বাণিজ্যের শতকরা ৪১ ভাগ ছিল মিসরের আমদানী এবং ৪৯ ভাগ ছিল মিসরের রপ্তানী। তবে ইংল্যাণ্ড ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার ভাব-ধারায় প্রভাবিত ছিল। ইহা সত্য যে এই খাল লণ্ডন ও বোম্বাইয়ের দূরত্ব বেশ সংক্ষিপ্ত করে কিন্তু অনুরূপভাবে ইহা ভারতবর্ষে বৃটিশের আধিপত্য খর্ব করিতে অন্যান্য শক্তিকে সহায়তা করে এবং মিসর ও পারস্য উপসাগরের এলাকায় প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে বৃটেনের সঙ্গে ব্যবসায় প্রতিযোগিতা করিতে সুযোগ দান করে।

কিন্তু ডি লেসেপ্‌স্‌ ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ডস্‌, স্পেন ও ইটালী হইতে প্রয়োজনীয় পুঁজি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ তিনি ইউনিভার্সেল সুয়েজ মেরিটাইম ক্যানাল কোম্পানী (Campagnin Universelle du Canal Moritime de Suez) গঠন করেন। সমাপ্ত

করিবার তারিখ হইতে ৯৯ বৎসরের জন্য কোম্পানীকে অনুমতিপত্র দান করিবার ফলে সাঈদ পছন্দনীয় শেয়ার ল্যাভ করেন, যদ্বারা তাঁহাকে মূল লাভের শতকরা ১৫ ভাগ দেওয়া হয়। খাল খনন করিবার জন্য তিনি পাঁচ ভাগের চারি ভাগ শ্রমিক দিতে অঙ্গীকার করেন। কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতাগণ এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ যাহারা কোম্পানীকে সহায়তা দান করিতে পারেন তাঁহারা শেয়ার লাভ করেন, যাহা লাভের শতকরা ১০ ভাগে দাঁড়ায়। এ ছাড়াও প্রতি শেয়ারে ৫০০ ফ্রাংকের ৪০০,০০০ শেয়ার ছিল সাধারণ স্টকে। সুলতানের অনুমতি ছাড়াই ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে খনন কার্য আরম্ভ হয়, যদিও ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে সাঈদের মৃত্যুর সময় খননের কাজ বিশেষ অগ্রসর হয় নাই।

সাঈদের দেশভ্রমণ, জনহিতকর কার্যাবলী এবং উচ্চ জীবিকার ফলে ৩০০,০০০ পাউণ্ড কর্জ হয়। এই কর্জ সাঈদের অমিতব্যয়ী উত্তরাধিকারী ইসমাইলকে তেমন বিচলিত করে নাই, কারণ মিসরের তখন সমৃদ্ধির যুগ। যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের ফলে মিসরীয় তুলার চাহিদা বেশ বাড়িয়া যায় এবং তুলা হইতে প্রাপ্ত ইসমাইলের রাজস্ব স্বাভাবিক হইতে পাঁচগুণ বৃদ্ধি পায়। ইসমাইল অনুমতিপত্র অনুমোদন করেন এবং চুক্তিবদ্ধ বাধ্যতামূলক শ্রমিক সরবরাহ করিতে অসমর্থ হওয়ায় ক্ষতিপূরণ দান করেন। খাল খনন কার্য চলা অবস্থায় ইসমাইল তাঁহার ইমারত নির্মাণকার্যের উন্মাদনার প্রতি মনোযোগ দেন। কায়রোর বিশাল আবেদীন প্রাসাদসহ বিভিন্ন প্রাসাদসমূহ তিনি নির্মাণ করেন। তিনি সরকারী ভবনাদি নির্মাণ করেন, গ্যাস ও পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চালু করেন, রেলপথ সম্প্রসারণ করেন এবং এমন ব্যয়বহুল কারখানাসমূহও নির্মাণ করেন যাহা চালু করা সম্ভব হয় নাই। তিনি ইউরোপের রাজধানীসমূহ ভ্রমণ করেন এবং প্রত্যেক জায়গায় আতিথেয়তা এবং ব্যয়বহুল উপঢৌকনাদি প্রদানে তিনি অমিতব্যয়িতার পরিচয় দেন। দরবারে দেয় বাৎসরিক কর তিনি প্রায় দ্বিগুণ বাড়াইয়া দেন এবং বিনিময়ে তাঁহার শাখায় উত্তরাধিকারের আইন প্রতিষ্ঠাসহ খেদিভ উপাধি লাভ করেন।

১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে সুয়েজ খাল খননকার্য যখন শেষ হয় ইসমাইল আতিথেয়তায় ঊর্ধ্বসংখ্যা ১,০০০,০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত খরচ করেন। খাল দৈর্ঘ্যে

হয় ৯৩'৫ মাইল, ৯৬ হইতে ১১০ গজ হয় প্রস্থ এবং গভীরতায় হয় ৩৫ ফুট। ভূমধ্যসাগরের সাঈদ বন্দর হইতে ইহা আরম্ভ হয় এবং লোহিত সাগরে সুয়েজ পর্যন্ত শেষ হয়। ইহা খননে ১২ বৎসর সময় ব্যয় হয়। হাজার হাজার অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ফ্রান্সের প্রিন্সেস ইউজীন, অষ্ট্রীয়ার সম্রাট জোসেফ এবং প্রুশিয়ার যুবরাজ। তাঁহার নির্মিত নাট্যভবনে প্রাচীন মিসরীয় ইতিহাসের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত কাহিনী ভারদীর আইদা (verdi's Aida) প্রথমবারের মত ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে মঞ্চস্থ করা হয়।

বাধ্যতামূলক শ্রমের বিরাট খরচ যোগ না করিয়াও এই খাল খনন করিতে মিসরের খরচ পড়ে ১১,৫০০,০০০ ফ্রাংক। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে কোম্পানী কোন মুনাফা অর্জন করিতে পারে নাই। ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন এই খালের মধ্য দিয়া জাহাজ চলাচলের ভাড়ার একটি তালিকা প্রস্তুত করে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, এই খাল সমস্ত দেশের জাহাজের জন্য উন্মুক্ত থাকিবে। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে কনস্ট্যান্টিনোপল কনভেনশন প্রস্তুত করা হয় এবং ইহাতে অষ্ট্রীয়া, ফ্রান্স, জার্মানী, বৃটেন, ইটালী, হল্যাণ্ড, রাশিয়া, স্পেন ও তুরস্ক স্বাক্ষর করে। ইহাতে বলা হয় যে খাল "সর্বদা শান্তির সময়ের অনুরূপ যুদ্ধের সময়েও যেকোন পতাকাবাহী প্রত্যেক বাণিজ্য অথবা যুদ্ধ জাহাজের জন্য অবাধ ও খোলা থাকিবে।" গ্রেট বৃটেন প্রথম মহাযুদ্ধে তাহার শত্রুদেরকে অবাধ প্রবেশে বাধা দান করিবার মাধ্যমে এই চুক্তি ভঙ্গ করে। অনুরূপভাবে ইতিপূর্বে সে ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের খাল-চুক্তি ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে এবং ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে ভঙ্গ করিয়াছিল। যাহা হউক, কোম্পানীর বাণিজ্যিক তৎপরতা অক্ষুন্ন থাকে এবং ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করা পর্যন্ত তাহা সুষ্ঠুভাবে চলিয়াছিল। খালের কৌশলগত স্থান এবং ইহার নিয়ন্ত্রণ অথবা আয়ত্বাধীন রাখিবার প্রতিদ্বন্দ্বিতাই হইল একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়—যাহার ফলে মিসর ইউরোপীয় শক্তিসমূহের প্রভাবে পতিত হয়।

ইউরোপীয় হস্তক্ষেপ এবং বৃটিশ আধিপত্য

ইসমাইল অমিতব্যয়িতার গভীর পংকে পতিত হন। তাই, যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের সমাপ্তির পর তুলার মূল্য কমিয়া যাওয়ার ফলে ইউরোপের

অবিবেচক ব্যাংক মালিকদের নিকট হইতে দুর্বহ শর্তে তিনি বিরাট অর্থ ঋণ করেন। শর্তের মধ্যে ছিল বাট্টা, উদার কমিশন এবং প্রবল সুদের হার। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে নাগাদ আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ প্রায় ১০০,০০০,০০০ পাউণ্ডের কোঠায় পৌঁছে। শুধু সুদের বোঝা দাঁড়ায় বাৎসরিক মোট ৫১,০০০,০০০ পাউণ্ড। মাথাপিছু সরকারী ঋণ আসে ১৪ পাউণ্ডে; তৎসঙ্গে পরিচর্চা খরচ দাঁড়ায় ১ পাঃ ১৫ সিঃ ১০ ডি, যাহা ছিল সম্ভবতঃ পৃথিবীর সর্বোচ্চ খরচ। নির্বিকার ইসমাইল তাঁহার নতুন নতুন পরিকল্পনার ব্যয় বাবদ ফালাহীনদের[১] কর বাড়াইয়া দেন। এই উৎসও নিঃশেষ হইয়া গেলে তিনি তাঁহার খালের স্টকের সমস্ত সাধারণ শেয়ার বৃটেনের নিকট ৪,০০০,০০০ পাউণ্ডের বিনিময়ে বিক্রয় করেন। ইহার ফলে প্রাক্তন শত্রুভাবাপন্ন ইংল্যাণ্ডকে এই খালে রাজনৈতিক স্বার্থের ন্যায় অর্থনৈতিক স্বার্থও প্রদান করিতে হয়।

খেদীভের ঋণগ্রস্ততার তুলনায় এই অর্থ ছিল অতি তুচ্ছ অংক। ঋণদাতাগণ শঙ্কিত হইয়া তাহাদের দাবীর জন্য চাপ দিতে থাকে। বিসমার্কের প্ররোচনায়, যাহার সঙ্গে ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সও যোগ দেয়, সুলতান ইসমাইলকে বরখাস্ত করিয়া তদস্থলে তাঁহার কোমল স্বভাবের পুত্র তৌফিককে বসাইতে সম্মত হন। আলেকজান্দ্রিয়া হইতে স্বীয় জাহাজে ইসমাইলের প্রস্থানের ঘটনা ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে তাহার প্রপৌত্র ফারুকের একই বন্দর দিয়া বহিষ্কারের সূচনা করে। খেদীভের এই পরিবর্তনের ফলে মিসরের বন্ধকী হইতে উদ্ধারের পথ রুদ্ধ হইয়া যায় এবং ইউরোপের ব্যাংক মালিকেরা খালের নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করে। দুইজন কণ্ট্রোলারের দ্বারা তাহারা কাজ করে—যদ্বারা দ্বৈত নিয়ন্ত্রণ প্রথা চালু হয়। ফরাসী মসিয়ে দ্য ব্লিনিয়াস (Monsieur de Blignieres) মিসরের ব্যয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ইংরেজ মেজর ইভ্‌লীন বেয়ারিং কর আদায়ের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন।

দ্বৈত নিয়ন্ত্রণকারীগণ যাঁহারা মিসরের সত্যিকারের শাসকে পরিণত হন, ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে ঋণ পরিশোধের আইন (Law of Liquidation)

১। মিসরের সাধারণ মানুষদিগকে ফালাহীন বলা হয়।—অনুবাদক

পাশ করেন। এই আইন দেশের ঋণ ৯৮,৩৭৭,০০০ পাউণ্ড এবং শতকরা ৪ ভাগ সুদ নির্ধারণ করে। সরকারের বাৎসরিক আয় হইতে বাজেটের প্রয়োজনীয় একটি অংক পৃথক করিয়া রাখা হয়, অবশিষ্ট সম্পূর্ণ অঙ্ক ঋণ পরিশোধের জন্য রাখা হয়। উন্নয়নের জন্য আর কোন অর্থ অবশিষ্ট থাকে না। জনগণ যত কঠোর পরিশ্রমই করুক না কেন, তাহাদের আয়, জীবন ধারণের অংশ বা তাহার চেয়েও কম বাদ দিয়া, বাকী অংশ ঋণ পরিশোধ করিতে খরচ হয়।

প্রথম মিসরীয় বিদ্রোহ

ব্যয় সঙ্কোচনের নামে সামরিক অফিসারসহ এক বিরাট সংখ্যক চাকুরীজীবীকে হয় বরখাস্ত করা হয় অথবা অবসর গ্রহণ করানো হয়। কিন্তু তৎসঙ্গে বিদেশীগণ বেশ উচ্চহারের বেতন গ্রহণ করে। অর্থনৈতিক সংকোচনের দ্বারা তুর্কী বা কারকাশিয়ান উচ্চ পদস্থ সামরিক ও প্রশাসনিক অফিসারগণ ক্ষতিগ্রস্থ হন নাই। বিরাট কর-বোঝা, সরকারী কর্মচারীদের অযোগ্যতা, বিদেশীদের উপস্থিতি, যাহারা তুর্কীদের সহিত হৃদ্যতাপূর্ণ বলিয়া মনে হয়—এই সবকিছু মিসরীয়দের মধ্যে তীব্র ঘৃণার সৃষ্টি করে। বহু শতাব্দীর পর এই প্রথম সেনাবাহিনীর জুনিয়ার অফিসারবৃন্দ, যাহাদের সবাই ছিলেন মিসরীয়, প্রতিবাদ উত্থাপন করেন। তাঁহাদের নেতা, আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সাবেক ছাত্র এবং একজন ফাল্লাহের পুত্র কর্ণেল আরাবী প্রতিবাদ আন্দোলনের নেতৃত্ব দান করেন। এই প্রতিবাদ একটি শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে মামুলী ধারণা ছাড়া সুসংগঠিতও ছিল না, সুচিন্তিতও ছিল না। ইহার বিভিন্ন স্তরে ছিলেন ধর্মতত্ত্ববিদ, সিভিল সার্ভেন্টস্ ও সেনাবাহিনীর জুনিয়ার অফিসারসহ কিছুসংখ্যক শিক্ষিত মিসরীয়। দ্বৈত নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা সত্ত্বেও তৌফিক অফিসারদের দাবী স্বীকার করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বাড়াবাড়ির ফলে আলেকজান্দ্রিয়ায় দাঙ্গা আরম্ভ হয় এবং কিছু সংখ্যক ইউরোপীয় ও মিসরীয় নিহত হয়।

বৃহৎ শক্তিবর্গ ইহাকে হস্তক্ষেপের অজুহাত হিসাবে গ্রহণ করে। মহামান্য দরবার নিরপেক্ষতার ভূমিকা পালন করে এবং ফ্রান্স সশস্ত্র হস্তক্ষেপের দাবী করিলেও শেষ পর্যন্ত নিরপেক্ষ থাকে। বৃটিশ ঐতিহাসিকগণ মনে

করেন যে গ্রেট বৃটেনকে একাকী কার্যক্ষেত্রে রাখা হয় এবং অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাকে হস্তক্ষেপের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয়। অপরদিকে এই সিদ্ধান্তে সহজেই আসা যায় যে গ্রেট বৃটেন ঐরূপ সুযোগের অপেক্ষাতেই দিন গুণিতেছিল। তাহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্স ইহার সরকারের পরিবর্তনের ফলে এবং উত্তর আফ্রিকায় জার্মানীর মতলবের ভয়েও, নিরপেক্ষ হিসাবে সরিয়া যায় এবং আশা করে যে গ্রেট বৃটেনও একই পন্থা অবলম্বন করিবে এবং পরে তাহারা আরাবীর সঙ্গে একটি পরামর্শে আসিতে চেষ্টা করিবে। ইহার ফলে গ্রেট বৃটেনকে মিসরে ভীত-সন্ত্রস্ত ইউরোপীয় জাতিসমূহের একমাত্র উদ্ধারকারীর ভূমিকা পালনের সুযোগ দেওয়া হয়। ইহা বৃটেনকে মিসরে অবিসম্বাদিত শাসকও বানাইয়া দেয়।

যাহাই হউক, ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ১১ই জুলাই বৃটিশরা আলেকজান্দ্রিয়ায় বোমা বর্ষণ করে। ঐ বৎসরের সেপ্টেম্বর মাসে কায়রোর উত্তরে তেল আল-কবীর নামক স্থানে বৃটিশ সেনাবাহিনী আরাবীর বাহিনীকে পরাজিত করে এবং মিসরের পূর্ণ আধিপত্য গ্রহণ করে। আরাবীকে সিংহলে নির্বাসন দেওয়া হয়। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয় সংগঠনের অভাবে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে এই আন্দোলন আরো শক্তভাবে দানা বাঁধে এবং গতিশীলতা লাভ করে। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে আরেক দল জুনিয়র অফিসার জামাল আবদুল নাসের নামক জনৈক কর্ণেলের নেতৃত্বে সর্বশেষ অমিসরীয় শাসককে বলপূর্বক বাহির করিয়া দেয় এবং দেশের সর্বময় ক্ষমতা গ্রহণ করে।

মিসরের সৈন্য প্রেরণের সময় বৃটিশ ওয়াদা করে যে "খেদীভের ক্ষমতা বহাল করিবার জন্য দেশের অবস্থা ও সত্যিকারের সংগঠন যখনই স্বাভাবিক হইবে তখনই" তাহারা ফিরিয়া যাইবে। বৃটিশ সৈন্যগণ যে ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মিসরের মাটিতে অবস্থান করে তাহার সম্ভবতঃ যুক্তিসঙ্গত কারণও থাকিতে পারে। তবে মিসরীয়দের এবং অধিকাংশ এশিয়াবাসীদের ধারণা এই যুক্তি সাম্রাজ্যবাদী ব্যবসার আরেক চালাকি মাত্র।

বৃটিশদের অধীনে মিসর

১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত (কিছু সংখ্যক মিসরীয় ঐতিহাসিকের মতে ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত) স্থায়ী সরাসরি ও পরোক্ষ বৃটিশ শাসন ছিল এই দেশের

জন্য একটি মিশ্র আশীর্বাদ। মিসরীয়গণ ওসমানীয় ও বৃটিশ উভয়ের অধীনে ছিল, কিন্তু ওসমানীয়গণ ছিল বৃটিশদের অধীনে। এই দ্বৈত সাম্রাজ্যবাদে বৃটিশগণ নিশ্চয়ই ওসমানীয়দের চেয়ে অধিক যোগ্য ছিল। ভারতবর্ষের রাস্তার নিরাপত্তার জন্য, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য এবং ঘটনাচক্রে উত্তম জনসংযোগের জন্যও তাহারা একটি প্রতিযোগিতামূলক মিসর সৃষ্টি করিতে আগ্রহী হয়।

দ্বৈত শাসনের ভণিতা ত্যাগ করা হয় এবং মিসরের একমাত্র ক্ষমতার অধিকারী হিসাবে বৃটিশ অতি সুযোগ্য ও বিচক্ষণ সাবেক মেজর ইভ্লীন বেয়ারিং লর্ড ক্রোমারকে উপ-প্রতিনিধি হিসাবে প্রেরণ করে। ওসমানীয় সুলতান ছিলেন নামেমাত্র শাসক এবং তাঁহার প্রতিনিধি ছিলেন খেদীভ, কিন্তু সত্যিকারের ক্ষমতা ছিল লর্ড ক্রোমারের হাতে। তিনি ৩০ সদস্য বিশিষ্ট ১৬ জন নির্বাচিত ও ১৪ জন নিযুক্ত একটি "আইন" পরিষদের মাধ্যমে শাসন করেন। এই পরিষদ ছিল বাস্তবে পরামর্শ দাতার মত। প্রত্যেক মিসরীয় মন্ত্রীর জন্য ছিলেন একজন বৃটিশ উপদেষ্টা এবং প্রত্যেক গভর্ণরের জন্য একজন বৃটিশ পরিদর্শক।

ক্রোমার বাধ্যতামূলক শ্রম বিলুপ্ত করেন, ফালাহীনের স্বপক্ষে কর প্রথার পুনর্বিন্যাস করেন, জাতীয় ঋণ সঙ্কোচিত করেন এবং পানি সরবরাহ, জনস্বাস্থ্য বিধান ও অন্যান্য জনহিতকর কার্যাবলীর উন্নয়ন করেন। এইসব সংস্কার প্রশাসনিক আদেশে কার্যকরী করা সম্ভব ছিল এবং ক্রোমার এই-গুলিকে সুশৃংখল ও যোগ্যতা সহকারে সম্পাদন করেন। তবে যেসব সংস্কার সামাজিক বিপ্লবের দ্বারা কার্যকরী করিতে হয়, যথা—জমি ভোগ-দখলের শর্ত, ওয়াকফ্, শিক্ষা এবং এই ধরনের কার্যাবলীতে তিনি নিজেকে জড়িত করেন নাই। ক্রোমারের অধীনে মিসর অর্থনৈতিক দিক দিয়া স্বনির্ভরশীল হইয়া উঠে এবং একটি ভারসাম্যমূলক বাজেটের অধিকারী হয়। মাথাপিছু আয় এবং তৎসঙ্গে জীবনের মান উন্নীত হয়। তদুপরি শান্তি ও শৃঙ্খলার দরুণ মিসরের কৃষিকাজ ও বৈদেশিক ব্যবসার প্রসার সাধিত হয়। শতাব্দীর শেষরদিকে তুলার দাম বৃদ্ধি পায় এবং ব্যবসার শর্তাবলী মিসরের অনুকূলে যায়। অপরদিকে বৃটিশ এক ফসলের কৃষি-নীতির উপর নির্ভর করে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যাকে উপেক্ষা করে।

খনিবিষয়ক কাজে উৎসাহ প্রদান করিলেও তাহারা সঙ্গোপনে শিল্পায়নের বিরোধিতা করে। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ মিসরের শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা ৩৫০০০ ছাড়াইয়া যায় নাই।

ইউরোপের সহিত মিসরের সান্নিধ্যের স্পষ্ট ও অস্পষ্ট ধারা সহযোগীর ন্যায় বিরোধী, সামাজিক পরিবর্তনে বিবর্তনবাদীদের ন্যায় বিপ্লবীপন্থীর সৃষ্টি না করিয়া পারে নাই। সহজেই বলা যায় যে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার যে কোন বহিঃপ্রকাশকে দাম্ভিক লর্ড ক্রোমার ক্রমশঃ বিরক্তির চোখে দেখেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে স্যার এলডন গর্স্ট এবং ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কিচেনার মোটামুটি একই ভাবধারা পোষণ করেন, কিন্তু ইহারা ছিলেন অপেক্ষাকৃত কম যোগ্য। লর্ড ক্রোমার অতি অল্প সংখ্যক বৃটিশ অফিসার রাখেন, কিন্তু গর্স্ট ও কিচেনারের সময় ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তবে যোগ্যতা হ্রাস পায়। গ্রেট বৃটেনের পক্ষে মিসরের নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা সম্ভব ছিল না। শুধুমাত্র ভারতবর্ষের নিরাপত্তাই বিপন্ন ছিল না, তৎসঙ্গে সুয়েজ খাল এবং ব্যাপক অর্থনৈতিক বিনিয়োগও বিপন্ন হইত। অতএব বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মিসরের ইতিহাস হইল মিসরীয়দের ক্রমবর্ধমান পরিবর্তনের আগ্রহ বনাম বৃটিশদের সুযোগ প্রদানে অনীহার কাহিনী।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

ইরানে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্য

আধিপত্যের জন্য আরবীভাষী বিশ্বের ন্যায় ইরানেও ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষের পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং প্রায় একই কারণে। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের নেতৃত্বে ফ্রান্স ভারতবর্ষে পদার্পণ করিতে চায় এবং ইংল্যাণ্ড সেই উপ-মহাদেশে যাইবার পথ নির্বিঘ্ন রাখিতে উৎসুক। তবে ইরানে রাশিয়ার স্বার্থ ফ্রান্সের চাইতে আরও মৌলিক। উষ্ণ-জলের বন্দরে ইহার চিরাচরিত প্রয়োজনের দোহাই দিয়া ইহা কাস্পিয়ান সাগর ও পারস্য উপসাগর অঞ্চলের ব্যাপারে আগ্রহী হয়। ভারতবর্ষ গ্রাস করিবার কথা রাশিয়া গভীর ভাবে চিন্তা করে কিনা তাহা পুরাপুরিভাবে জানা যায় নাই। এরূপ একটি পরিকল্পনা থাকিলে তাহা সে পারস্য উপসাগর অথবা আফগানিস্তানের মধ্য দিয়া বাস্তবায়িত করিতে পারিত। ফলে বৃটিশ রাজকীয় নীতির মূল-কথা দাঁড়ায় রাশিয়াকে ইরান গ্রাস করিবার পথে বাধা প্রদান করা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসরগুলিতে আফগানিস্তান ইরানের অংশ বিশেষ ছিল। নেপোলিয়নের পরাজয়ের পর ইরানে ফ্রান্সের রাজনৈতিক আগ্রহ প্রায় বিলীন হইয়া যায় এবং ইরানে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের ইতি-হাস সেই দেশে ইঙ্গ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতার কাহিনীতে পরিণত হয়।

১৭৪৭ খ্রীস্টাব্দে নাদির শাহের হত্যার সঙ্গে সঙ্গে পারস্য সাম্রাজ্যের গৌরব অস্তমিত হইলেও সংক্ষিপ্ত পরিসরের জান্দ বংশের সময় (১৭৫০—১৭৯৪) ইরান তবুও পশ্চিম এশিয়ায় গণ্য করিবার মত শক্তি হিসাবে বিরাজমান ছিল এবং ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা বন্ধুত্ব কামনা করিবার মত যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপ যখন শিল্প-বিপ্লব, সাম্রাজ্য বিস্তার, মতবাদের পরিবর্তন এবং বুদ্ধিমত্তার অগ্রগতিতে ব্যস্ত, ইরান তখনও তাঁহার প্রতিবেশী ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ন্যায় এমন সব

নৃপতিদের দ্বারা শাসিত হয় যাঁহারা প্রায় সম্পূর্ণভাবে এইসব অগ্রগতির ব্যাপারে নির্লিপ্ত। ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে ক্ষমতায় আগত কাজার বংশ মধ্যপ্রাচ্যের সমগ্র ইতিহাসে সম্ভবতঃ একমাত্র বংশ যাহার প্রতিষ্ঠাতার মধ্যে অন্যান্য বংশের প্রতিষ্ঠাতাদের ভিতর প্রাপ্ত সাধারণ উৎসাহ ও পৌরুষত্ব ছিল না। ১৭৯৪ হইতে ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী কাজার বংশের প্রায় প্রত্যেক শাহ ছিলেন অযোগ্য, কল্পনাশূন্য, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং স্বার্থপর। তাহারা শুধু ইউরোপের উন্নতির প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারেই অজ্ঞ ছিলেন না বরং তাঁহারা তাঁহাদের স্বীয় দেশের পুরাতন ঐতিহ্য মোতাবেক কাজও করিতেন না; চলাফেরাও করিতেন না। ফলে তাঁহারা উভয়ের রুশ শক্তি এবং দক্ষিণের ইংল্যাণ্ডের চাপের মাঝখানে পতিত হন।

উত্তর ইরানের মাজান্দারানের তুর্কী কাজার গোত্রের বংশধর আগা মুহাম্মদ ছিলেন একজন নিষ্ঠুর ও সাহসী যুবক। তাঁহার মানসিক প্রতিহিংসাপরায়ণতার কারণ বোধহয় এই যে পাঁচ বৎসর বয়স হইতে তিনি শিবির জীবনে সংস্থাপিত হন। শিরাজ নগরীতে করিম খান জান্দের দরবারে তিনি জামানত হিসাবে অবস্থান করেন এবং কোমল স্বভাব শাসক হইতে তিনি সদয় ব্যবহার লাভ করেন। করিম খানের মৃত্যুর পর আগা মুহাম্মদ মাজান্দারানে পলায়ন করেন এবং কয়েক বৎসরের যুদ্ধবিগ্রহের পর ক্ষমতার এক দুর্বোধ্য লড়াইয়ের মাধ্যমে ১৭৯৪ খ্রীস্টাব্দে ইরানের সিংহাসন লাভ করেন ও তেহরানকে তাঁহার রাজধানী হিসাবে গড়িয়া তোলেন। তিনি দেশকে একত্রীভূত করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত ক্যাথারিনের আদেশে ১৭৯৬ খ্রীস্টাব্দে রুশ সেনাবাহিনী ককেশাস আক্রমণ করে। কিন্তু সেই বৎসরেই সম্রাজ্ঞী মারা যান এবং জার পল, যাহার নীতি ছিল তাঁহার মাতার নীতির বিরোধিতা করা, এই অভিযান বন্ধ করিয়া দেন। এক বৎসর পর আগা মুহাম্মদ তাঁহার নিজস্ব ভৃত্যগণ কর্তৃক নিহত হন।

তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও উত্তরাধিকারী ফতেহ আলী শাহ্ (১৭৯৭—১৮৩৪) তাঁহার চাচার অধিকাংশ খারাপ স্বভাবগুলির অধিকারী হন। তাঁহার খ্যাতির একমাত্র কারণ ছিল তাঁহার অস্বাভাবিক লম্বা দাঁড়ি এবং প্রায় ২০০০ শাহজাদা ও শাহজাদীর পিতৃত্ব। প্রায় সূচনা হইতেই তাঁহাকে আন্তর্জাতিক সমস্যাসমূহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়,

যাহার জন্য তিনি মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। ভারতবর্ষ অভিমুখী আফগানিস্তানের রাস্তার নিরাপত্তার ব্যাপারে উৎসুক বৃটিশ আশা করে যে শাহ সেই অঞ্চলে শান্তি রক্ষা করিবেন। অপরদিকে জার পল ও নেপোলিয়ন গ্রেট বৃটেনকে অপদস্থ করিবার জন্য শাহের সঙ্গে একটি চুক্তি করিতে চান।

১৮০০ খ্রীস্টাব্দে তেহরানে প্রেরিত অনেকগুলি প্রতিনিধিদলের প্রথম দলে ইংল্যাণ্ড ক্যাপ্টেন মেলকমকে প্রেরণ করে। ফ্রান্সের সহিত চুক্তি না করিবার জন্য তিনি শাহকে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেন। তিনি একটি বাণিজ্য চুক্তিও সম্পাদন করেন যদ্বারা বৃটিশ ও ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগকে কর মুক্ত করা হয় এবং বিনা শুল্কে বৃটিশ থানকাপড়, লোহা, ইস্পাত ও সীসা আমদানীর অনুমতি প্রদান করা হয়। ইতিমধ্যে ফ্রান্স ও রাশিয়া তাহাদের যুগধর্মী বিবাদে লিপ্ত হয় এবং ফলে নেপোলিয়ন ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দে ইরানে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। এই প্রতিনিধিদল রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি চুক্তির প্রস্তাব করেন, তবে শর্ত হইল ইরান ইংল্যাণ্ডের সহিত তাহার পূর্বচুক্তি বাতিল করিবে। এই প্রস্তাবে শাহ সম্মত হন এবং বিভিন্ন সলা-পরামর্শের দ্বারা ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে ফিংকেন্সটাইনের সন্ধি (Treaty of Finkenstein) স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধি অনুসরণে নেপোলিয়ন জেনারেল গাডানের নেতৃত্বে এক বিরাট প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল পারস্য সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দান করা এবং কামান ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র তৈয়ারীর কারখানা নির্মাণ করা। তবে ১৮০৭ খ্রীস্টাব্দে নেপোলিয়ন ও জার প্রথম আলেকজাণ্ডারের মধ্যে তিলসিটে অনুষ্ঠিত বন্ধুত্বের চুক্তির ফলে এইসব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়।

বৃটিশ এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে এবং ১৮০৮ খ্রীস্টাব্দে স্যার হ্যারফোর্ড জোন্সের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। এই প্রতিনিধি দল ইরানের সহিত ফ্রান্স এবং রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তিতে পারস্য সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দান করা এবং শাহকে ১২০,০০০ পাউণ্ড "অর্থ সাহায্যের" একটি ধারাও সন্নিবেশিত হয়। ইহার পরপরই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রতিনিধিত্ব করিয়া মেলকমের নেতৃত্বে ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে এক বিরাট জাকজমকপূর্ণ দল প্রেরণ করা হয়। স্মরণ রাখিতে হইবে যে তখন বৃটিশ সরকার ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা

চলিতেছিল। প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে এবং কখনও কখনও দল দুইটি পরস্পরবিরোধী উদ্দেশ্যেও কাজ করে। শাহ্ অথবা তাঁহার কোন উপদেষ্টা এই সুবিধা অথবা ইউরোপীয়দের মধ্যে বিদ্যমান প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধের সুযোগ গ্রহণ করিবার মত যথেষ্ট বুদ্ধিমান ছিলেন না।

১৮০৪ খ্রীস্টাব্দের পর হইতে রুশগণ ইরানের ক্ষতির বিনিময়ে ককেশাশে রাজ্য বিস্তারের অভিযান পরিচালনা করে। রাশিয়া ওসমানীয়গণ বা যে কোন ইউরোপীয় শক্তির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলেই এই অভিযান শিথিল হইয়া যায়। পারস্য সেনাবাহিনী তখন ছিল শাহজাদা আব্বাস মীর্জার অধিনায়কত্বে, যাহাকে কাজার বংশের অত্যন্ত যোগ্য লোক বলিয়া গণ্য করা হয়। এই বাহিনীকে ইউরোপীয় কায়দায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, কখনও ফরাসীদের দ্বারা, কখনও বৃটিশদের দ্বারা। সমস্ত বর্ণনা অনুযায়ী মনে হয় সৈন্য পরিচালনায় সমঝোতা ছিল না এবং সৈন্যগণও ছিল বিমূঢ়। যাহা হউক, এই সুদীর্ঘ ও শ্লথ সময়ের প্রধান যুদ্ধ সংগঠিত হয় ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে আসলান্দাজে। গ্রেট বৃটেন নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধে যেহেতু রাশিয়ার সঙ্গে একটি সমঝোতায় উপনীত হইয়াছে তাই পারস্য সেনাবাহিনীতে কার্যরত অধিকাংশ বৃটিশ অফিসারদিগকে তাঁহারা ফেরত লয়। ইহার দ্বারা পারস্য সৈন্যদের মধ্যে কতটুকু বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় তাহা অবশ্য জানা যায় নাই, তবে রুশগণ এক বিরাট বিজয় লাভ করে। বৃটিশ তাহাদের সহিত সৌহার্দ-মূলক ব্যবহার করে এবং পারস্যবাসীগণ ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের ১২ই অক্টোবর গুলিস্তানের চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি অনুসারে ইরান ককেশাশে পাঁচটি নগর হারায় এবং জর্জিয়া ও দাঘেস্তানের উপর তাঁহার দাবী প্রত্যাখ্যান করে। অপরদিকে রাশিয়া সিংহাসনে আব্বাস মীর্জার দাবী সমর্থন করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে।

রাশিয়ার সমর্থন গ্রহণ করিয়া শাহজাদা রাশিয়াকে ইরানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে আহ্বান জানান। পাছে পিছনে পড়িয়া যায় তাই গ্রেট বৃটেনও ইহার সমর্থনে রাশিয়ার সহিত হাত মিলায়। ইহার পর সর্বশেষ শাহজাদা ব্যতীত প্রত্যেক কাজার শাহজাদা সিংহাসনে আরোহণ করিবার সময় রুশ ও বৃটিশমন্ত্রী সমভিব্যবহারে রাজধানী গমন করেন।

নেপোলিয়নের সহিত যুদ্ধে জড়িত হইবার ফলে রাশিয়া ককেশাশে তাহার নতুন এলাকায় নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যর্থ হয়। ইহা পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে পারস্যবাসীগণ তাহাদের পরাজয়কে চূড়ান্ত জ্ঞান করে নাই এবং তাহাদের হৃত ভূখণ্ড পুনরায় লাভ করিবার ইচ্ছা তাহারা সর্বদা পোষণ করে।

১৮১২ খ্রীস্টাব্দে রাশিয়া যখন নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে জীবনমরণ যুদ্ধে লিপ্ত গ্রেট বৃটেন তখন ইরানে ইহার অবস্থিতি সুদৃঢ় করিতে সচেষ্ট। বৃটিশ প্রতিনিধি স্যার গোর অস্‌লে ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে ইরানের সহিত একটি "চূড়ান্ত চুক্তি" সম্পাদন করে। এই চুক্তি অনুযায়ী ইরান গ্রেট বৃটেনের সহিত যুদ্ধরত যে কোন ইউরোপীয় শক্তির সহিত ইহার বন্ধুত্ব ছিন্ন করিতে প্রতিশ্রুতি দান করে, গ্রেট বৃটেনের সহিত শত্রুভাবাপন্ন যে কোন সেনাবাহিনীকে ইরানে প্রবেশে বাধা দান করিতে এবং খারিজম, তাতারিস্তান, বোখারা ও সমরখন্দের খানদিগকে (যাহারা শাহকে কর প্রদান করে) ভারতবর্ষ অভিমুখে অগ্রসরমান যে কোন আক্রমণকারী সেনাবাহিনীকে বাধাদানে সম্মত করাইতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। অপরদিকে গ্রেট বৃটেন রাশিয়ার সহিত ইরানের সীমান্ত মীমাংসায় সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দান করে, কোন ইউরোপীয় শক্তির সহিত যুদ্ধ বাধিলে ইরানের সাহায্যে আগাইয়া আসিতে, ইরান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সংঘটিত কোন সংঘর্ষে হস্তক্ষেপ না করিতে, এবং ইরানকে বার্ষিক ১৫০,০০০ পাউণ্ড সাহায্য দান করিতে প্রতিশ্রুতি দান করে।

১৮১৫ হইতে ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে এই যুগে ফতেহ্ আলী শাহ্ আভ্যন্তরীণ শত্রুদের সহিত তাঁহার সিংহাসন নিষ্কণ্টক করিতে ব্যস্ত হন। অতএব আফগানিস্তানকে করদানে বাধ্য করিতে এবং ১৮২১—১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াইয়া পড়েন। এই শেষোক্তটি হইল ১৫১৪ খ্রীস্টাব্দের কলড্রনের যুদ্ধের পর দুই জাতির মধ্যে সূচিত দীর্ঘ ও নিষ্ফল অভিযানের শেষ অভিযান। ওসমানীয়গণ যেহেতু তখন গ্রীক বিদ্রোহ লইয়া ব্যস্ত তাই রুশগণ তুর্কীদিগকে আক্রমণ করিয়া রুশদের হাতে বিপর্যস্ত সম্মান পুনরায় লাভ করিবার জন্য আব্বাস মীর্জাকে প্ররোচনা দান করে। অতীতের অনেক যুদ্ধের ন্যায় এবারের পারস্য-তুর্কী যুদ্ধও ছিল অসমাপ্ত

এবং আর্জেরুমের সন্ধির মাধ্যমে ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দেই এই যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। এই সন্ধির দ্বারা কোন এলাকার পরিবর্তন হয় নাই।

এরিভান অঞ্চলে গোচ্‌কা অধিকার করিবার সময় রাশিয়া ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে ইরানের বিরুদ্ধে প্রবল চাপ সৃষ্টি করে। প্রথমে পারস্য বাহিনী বেশ সফলতা লাভ করে এবং ককেশাশে অনেক হৃত নগর পুনর্দখল করে। তবে ফতেহ্ আলী শাহ্, যাহার ধনলিপ্সা তাঁহার লম্বা দাঁড়ির ন্যায়ই প্রসিদ্ধ, স্বর্ণমুদ্রা প্রতিরক্ষায় ব্যয় না করিয়া তাঁহার কোষাগারে জমা করেন। গোলাগুলির ভাণ্ডার ছিল শূন্য এবং বেতনের অভাবে সেনাবাহিনীর বিরাট অংশ ছাঁটাই করা হয়। বৃটিশদের ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দের চুক্তি অনুযায়ী ইরানের সাহায্যে আগাইয়া আসিবার কথা থাকিলেও তাহারা ইরান আক্রমণকারী এই অজুহাতে আগাইয়া আসিতে অস্বীকার করে। প্রকৃত ব্যাপার হইল ইংল্যাণ্ড তখন রাশিয়ার সহিত সবেমাত্র একটি বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে। ফলে পারস্য বাহিনী, কিছু সফল অভিযান পরিচালনা করা সত্ত্বেও এক সুদীর্ঘ যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে ব্যর্থ হয় এবং পশ্চাদপসারণ করিতে বাধ্য হয়। ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ তাব্রিজের ন্যায় প্রধান নগরও অধিকার করা হয়। পারস্যবাসীগণ শান্তি প্রস্তাব করিতে বাধ্য হয় এবং ১৮২৮ খ্রীস্টাব্দে তুর্কমাঞ্চাইয়ের সন্ধি স্বাক্ষর করে।

ইরানের পরাজয় ছিল চূড়ান্ত। কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিমে ইরান তাহার সমগ্র অঞ্চল হারায়। সীমান্ত চিহ্নিত হয় আরাস নদী, আটচল্লিশ সমান্তরাল রেখা বরাবর, দক্ষিণে লাংকারান পর্যন্ত এবং পূর্বে কাস্পিয়ান সাগরের আস্তারা পর্যন্ত। তদুপরি রুশ আমদানীকৃত দ্রব্যের উপর শুল্ক নির্ধারণ করা হয় শতকরা ৫ ভাগ এবং ইরান রাষ্ট্র বহির্ভূত নীতি (extraterritoriality) গ্রহণ করিতে এবং ৩,০০০,০০০ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দান করিতে স্বীকৃত হয়। তুর্কমাঞ্চাইয়ের সন্ধি এক নতুন যুগের সূচনা করে। কারণ ঐ তারিখের পর হইতে ইরান সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকে নাই। এই ব্যাপারটি বৃটিশ অনুধাবন না করিয়া পারে নাই, কারণ সে ইরানকে সাহায্য করিবার ব্যাপারে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে। নিঃস্ব শাহাজাদাকে ১৫০,০০০ পাউণ্ড প্রদান করিবার পর বৃটিশ ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দে "চূড়ান্ত চুক্তির" কিয়দংশ বাদ দিতে সক্ষম হয়, যে অংশে গ্রেট বৃটেন অঙ্গীকার করিয়াছিল

যে, কোন ইউরোপীয় দ্বারা ইরান আক্রান্ত হইলে সে ইরানকে সাহায্য প্রদান করিবে।

শাহজাদা আব্বাস মীর্জা ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দে মারা যান এবং তাঁহার পিতা ফতেহ্ আলী শাহ তাঁহার এক বৎসর পর ৬৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। নতুন উত্তরাধিকারী ছিলেন আব্বাস মীর্জার পুত্র মুহাম্মদ। কিন্তু সিংহাসনের অন্যান্য আরও দাবীদারও ছিলেন। যুবক মুহাম্মদ শাহ্ এক সেনাবাহিনী লইয়া তেহরান অভিমুখে অগ্রসর হন। সেই বাহিনীর সেনাপতিত্ব করেন বৃটিশ জেনারেল স্যার হেনরী লিণ্ডসে বেথুন। রুশ ও বৃটিশ উভয় মন্ত্রিবর্গ তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। অধিকাংশ প্রতিদ্বন্দ্বিদিগকে নিরস্ত করিবার পক্ষে ইহাই ছিল যথেষ্ট। তবে এমন অনেক বোকাও ছিলেন যাহারা এই ব্যাপারে আরও কিছুকাল চেষ্টা করেন।

যুবক শাহের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য রুশ মন্ত্রীর আগমন গ্রেট বৃটেনের জন্যও একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যাপার। অতঃপর বৃটিশ আশঙ্কা করে যে ফরাসীগণ হয়তো ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে পারে। ফ্রান্সকে কাবু করিবার পর এই ভীতি রাশিয়ার দিকে যায়। রুশগণ ভারতবর্ষ অধিকার করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিল কিনা তাহা একটি অনুমানের ব্যাপার, তবে সুযোগমত তাহারা কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিমের ন্যায় পূর্বের ভূখণ্ডও অধিকার করিতে চেষ্টা করে। এইসব অঞ্চল যেহেতু ভারতবর্ষের দিকে, তাই স্বভাবতঃই বৃটিশগণ ভয় করে পাছে রুশগণ সেইদিকে অগ্রসর হইতেও আগ্রহান্বিত হয়। অতএব আফগানিস্তান এবং ইহার দক্ষিণে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত সমগ্র এলাকা গ্রেট বৃটেনের নিকট অতি গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে।

আফগানিস্তান এবং কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বাঞ্চলের উপর আধিপত্য ঘোষণাকারী পারস্যবাসীগণ পশ্চিমে তাহাদের হৃত এলাকা পোষাইয়া লইবার জন্য এতদ্ঞ্চলে তাহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে। তবে বৃটিশগণ এই পরিকল্পনায় সায় দেয় নাই, কারণ রুশ অগ্রগতি বাধা দান করিবার পক্ষে তাহারা পারস্যবাসীদিগকে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করে নাই। তদুপরি বৃটিশগণ যথার্থভাবেই বিশ্বাস করে যে কাজার শাহগণ রুশদের প্রতি সংবেদনশীল এবং ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে একটি অভিযানের ব্যাপারে তাহারা হয়তো একটি চুক্তিও করিয়া ফেলিতে পারে। ফলে ১৮২৮

খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ তুর্কমাঞ্চাইয়ের চুক্তির তারিখ হইতে প্রায় ১৯০০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইরানের প্রধান ইতিহাস হইল উত্তর্-পূর্ব দিক হইতে রাশিয়ার এবং দক্ষিণ-পূর্ব দিক হইতে গ্রেট বৃটেনের মন্থর কিন্তু নিশ্চিত অগ্রগতির কাহিনী। অধিকাংশ ইরান যে কবলিত হয় নাই তাহা ইরানের ক্ষমতার জন্য নহে বরং এইজন্য যে রাশিয়া ও গ্রেট বৃটেন কেউই একে অন্যকে এই দেশ গ্রাস করিতে দেয় নাই।

মুহাম্মদ শাহ তাঁহার ১৩ বৎসর রাজত্বের অধিকাংশ সময় আফগানিস্তানে স্বীয় অবস্থান সুদৃঢ় করিতে ব্যয় করেন। বৃটেন এইবার পুনরায় ইরানের সহিত স্বাক্ষরিত তাহার ১৮১৪ খ্রীস্টাব্দের "চূড়ান্ত চুক্তি" ভঙ্গ করে গোলযোগে হস্তক্ষেপ করিয়া। মুহাম্মদ শাহকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। কাজার নৃপতিগণ, যাহাদের নিজস্ব কোন যোগ্যতা ছিল না, তাহারা কোন যোগ্য প্রধান উজীরকেও বেশীদিন সহ্য করিতে পারেন নাই। মুহাম্মদ শাহ অতি সুযোগ্য আবুল কাসেম কায়েম মাকামের মৃত্যু দণ্ডাদেশ প্রদান করেন এবং তদস্থলে তাঁহার গৃহশিক্ষক হাজী মীর্জা আঘাসীকে নিযুক্ত করেন, যাঁহার কুসংস্কার, অজ্ঞতা, ধর্মান্ধতা এবং একগুঁয়েমী দেশকে আরও ধ্বংসের দিকে ঠেলিয়া দেয়। মুহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে উল্লেখযোগ্য ঘটনা সমূহের একটি হইল বাবী ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা বাবের আগমন। পরের একটি অধ্যায়ে এই ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে।

১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে মুহাম্মদ শাহ মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁহার পুত্র নাসের আল-দ্বীনকে শাহ করিবার জন্য বৃটিশ ও রুশ উভয় মন্ত্রিবর্গ তাব্রিজ হইতে তেহরানে লইয়া যান। কাজারদের রীতি ছিল সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে আজারবাইজানের গভর্ণর হিসাবে নিযুক্ত করা, যাহার রাজধানী ছিল তাব্রিজ। নাসের আল-দ্বীন ছিলেন কাজার শাহদের মধ্যে অন্যতম, কিন্তু তাঁহার ৫০ বৎসরের রাজত্বকালে তিনি তেমন কোন গঠনমূলক ঐতিহ্য রাখিয়া যান নাই। তিনি তাঁহার পিতার ন্যায় প্রধান উজীর মীর্জা তকিখান আমীর কবিরের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা না দিলে হয়তো এই কাহিনী ভিন্নরূপ ধারণ করিত। এই উজীর ছিলেন নিঃসন্দেহে ইরানের একজন সুযোগ্য ব্যক্তি, যিনি উনবিংশ শতাব্দীতে এই সুউচ্চ পদে সমাসীন হন।

১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণের সময় নাসের আল-দ্বীন ছিলেন

১৬ বৎসর বয়স্ক। আফগানিস্তানে ইরান ও গ্রেট বৃটেনের সুদীর্ঘ রাজনৈতিক কসরতের পর ইরান হেরাত নগর অধিকার করে। একই বৎসর গ্রেট বৃটেন কর্তৃক ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার পক্ষে এই কাজ যথেষ্ট বলিয়া বিবেচনা করা হয়। একটি বৃটিশ সেনাবাহিনী হেরাত অভিমুখে অগ্রসর হয়, অপরদিকে অন্যান্য বৃটিশ বাহিনী পারস্য উপসাগরের তীরে অবস্থিত বুশাইয়ার দখল করিবার পর মোহাম্মারেহ নগর (পরবর্তীকালে ইহাকে খোররাম শহর বলা হয়) অধিকার করে। এই নগরটি করুন ও শাত-ইল আরবের নদীসমূহের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। পরে একটি বৃটিশ নৌবাহিনী করুন নদীতে যাইয়া আহ্বাজ অধিকার করে। দৃশ্যতঃ পারস্যবাসীদের কোন বাধা ছাড়াই এইসব কাজ সমাধা করা হয় এবং বাধা যাহাও দেওয়া হয় তাহাও ছিল বিশৃঙ্খল।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে ইরান আফগানিস্তান ত্যাগ করতঃ ইহার স্বাধীনতা স্বীকার করিতে সম্মত হয়। ভবিষ্যতে আফগানিস্তানের সঙ্গে যেকোন বিবাদে বৃটেনের "মধ্যস্থতা" মানিয়া লইতেও ইরান রাজী হয়। এই চুক্তি সম্পাদনের কয়েক সপ্তাহ পরেই প্রসিদ্ধ "ভারতীয় বিদ্রোহ" আরম্ভ হয় এবং সেই বিদ্রোহ দমন করিতে বৃটিশ তাহাদের সৈন্য বাহিনীকে ব্যবহার করে। এই "বিদ্রোহের" পর বৃটিশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতবর্ষের শাসনকার্য স্বহস্তে গ্রহণ করে এবং ইহার পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমের পথ পরিষ্কার রাখা আরও গুরুত্বপূর্ণ হইয়া উঠে। ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষা সহজ করা হয় আফগানিস্তানের উপর বৃটিশ কর্তৃত্বের দ্বারা। হিন্দুকুশ পর্বতশ্রেণীও আফগানিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই পর্বতশ্রেণীর নিরাপত্তা ত্যাগ করিয়া আরও উত্তরে যাইতে বৃটিশদের কোন প্রয়োজন ছিল না। ইহার ফলে মধ্য এশিয়া এবং কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব অঞ্চলে রুশগণ নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করিবার সুযোগ লাভ করে।

কিন্তু ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয় বরণ এবং প্রথম নিকোলাসের মৃত্যুর ফলে রাজ্য বিস্তারের অভিযান চালাইবার মত অবস্থা রাশিয়ার ছিল না। অধিকন্তু দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার ক্রীতদাসের মুক্তি এবং অন্যান্য আভ্যন্তরীণ সংস্কার লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু ইউরোপে ইটালী ও জার্মানীর

একত্রীকরণের যুদ্ধের ফলে আলেকজাণ্ডার পুনরায় তুরস্ক এবং বিশেষতঃ কাস্পিয়ান সাগরের পূর্বাঞ্চলে নিজের ভাগ্য পরীক্ষা করিবার সুযোগ লাভ করেন, কারণ একত্রীকরণ যুদ্ধের ফলে দেশে কিছু স্থিতিশীলতা আসে। সেই অভিযানের বর্ণনা এত দুরূহ যে তাহা এইখানে ব্যক্ত করা যায় না। তবে এতটুকু বলাই যথেষ্ট যে রুশ সৈন্যগণ ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে বোখারা, ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে খিভা এবং ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে খোকন্দ অধিকার করে। ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে মার্ভ অধিকারের পর রাশিয়া কাস্পিয়ানের সমগ্র পূর্বাঞ্চল এবং মধ্য এশিয়ার একচ্ছত্র অধিপতি হয়। ইরান আটক নদীকে নতুন সীমান্ত হিসাবে মানিয়া লয় এবং এইভাবে সে নদীর উত্তরাংশে বিস্তীর্ণ উর্বর এলাকা রাশিয়ার নিকট ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়।

রাশিয়া ও গ্রেট বৃটেন কর্তৃক ইরানকে গ্রাস করা এখন সম্পূর্ণ। আটক নদী ও আফগানিস্তানের উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত রুশ অগ্রগতিতে গ্রেট বৃটেন যেরূপ হস্তক্ষেপ করে নাই, অনুরূপভাবে আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চল হইতে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত সমগ্র পারস্য এলাকা অধিকার করিবার ব্যাপারে গ্রেট বৃটেনকে রাশিয়া কোনরূপ বাধা প্রদান করে নাই। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গ্রেট বৃটেন সামরিক অভিযানের পরিবর্তে অন্যান্য উপায় অবলম্বন করে। ১৮৭০ হইতে ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে পর্যন্ত বেলুচিস্তানের কিছু ছোটখাট বিদ্রোহ এবং আফগানিস্তানের সঙ্গে কিছু সীমান্ত বিরোধ দেখা দেয়। এইগুলির প্রত্যেকটিতে গ্রেট বৃটেন "মধ্যস্থতাকারী" হিসাবে আগাইয়া আসে। উদাহরণস্বরূপ ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে মাকরান সীমান্ত কমিশন (Mokrns Boundary Commission), ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে সিস্তান মধ্যস্থতা কমিশন (Sistan Arbitration Commission) এবং ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে পারস্য-বেলুচিস্তান সীমান্ত কমিশন (Perso-Baluchistan Boundary Commisson) গঠিত হয়। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় সিস্তান কমিশন নাগাদ ইরানের বিনিময়ে বৃটিশ-ভারতের সীমান্ত বেশ বিস্তৃতি লাভ করে। উত্তর-পশ্চিম ইরানের ন্যায় আজারবাইজানও দুইভাগে বিভক্ত হয়—রুশ ও পারস্য; দক্ষিণ পূর্বেও অনুরূপ বেলুচিস্তান দুইভাগে বিভক্ত হয়—বৃটিশ ও পারস্য।

ইরানে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব যাহা ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে নেপোলিয়নের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়, বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ইহার ভূখণ্ড দখলের পর্ব

শেষ হয়। কোন দেশই অপর পক্ষকে অতঃপর আর কোন অঞ্চল দখল করিতে দেয় নাই। তবে উনবিংশ শতাব্দী শেষ হইবার অনেক পূর্বেই এই দ্বন্দ্ব ইহার দ্বিতীয় পর্বে, অর্থাৎ অর্থনৈতিক পর্বে প্রবেশ করে এবং প্রায় ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৯২১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই সুদীর্ঘ সময়ে ইরান প্রকাশ্যভাবেই একটি মধ্যবর্তী রাজ্য হিসাবে বিরাজ করে এবং রাশিয়া ও গ্রেট ব্রিটেন ইরানের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা গ্রহণ করে মাত্র, জনগণের কল্যাণের কোন দায়দায়িত্ব তাহাদের ছিল না।

ভারতীয় বিদ্রোহকে ইরানের এই অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের তাৎক্ষণিক কারণ বলা যাইতে পারে। ভারতবর্ষে সংঘর্ষ চলাকালীন সময়ে এবং পরেও যখন ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের পূর্ণ দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করে, তখন দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থা অতি প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। টেলিগ্রাফের সাহায্যে লণ্ডনের সহিত দিল্লীর যোগসূত্র স্থাপনের জন্য ইরানের প্রয়োজন হয়। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে ইস্তাম্বুলে স্থলপথের টেলিগ্রাফ নিয়মপত্র (Overland Telegraph Convention) স্বাক্ষরিত হয়-যদ্বারা ওসমানীয়-দের রাজধানীকে বাগদাদের সহিত সংযুক্ত করা হয়। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে এই লাইনকে কারমানশাহ্, হামাদান, তেহরান ও বুশাইরের সহিত সংযুক্ত করিবার জন্য ব্রিটিশ শাহের সঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা আরও ব্যাপক করিবার জন্য ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে ইন্দো-ইউরোপীয় টেলিগ্রাফ কোম্পানী গঠিত হয় এবং তেহরানকে তাব্রিজ ও ওডেসার সহিত সংযুক্ত করা হয়। এইসব লাইনের দ্বারা ইরান যে বেশ লাভবান হয় ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহা শুধু প্রাদেশিক সরকার-সমূহকে নিয়ন্ত্রণে রাখিবার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারকেই সাহায্য করে নাই বরং ইহা ইরানের বিচ্ছিন্নতাও দূর করে এবং ইরানকে ইউরোপের বিভিন্ন ভাবধারার সান্নিধ্যে আনয়ন করিতে সহায়তা করে। তৎসঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখা প্রয়োজন যে এই প্রথম অনুমতিপত্র আরও অনেক অনুমতি পত্রের দ্বার উন্মুক্ত করে—শুধু ব্রিটিশদের জন্য নহে বরং রুশদের জন্যও। রুশগণ সর্বদা ব্রিটিশদের সমানাধিকার দাবী করে। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে দেওয়া টেলিগ্রাফের অনুমতিপত্র ছিল ৪০ বৎসরে গ্রেট ব্রিটেন ও রাশিয়া উভয়কে দেওয়া অনেকগুলি অনুমতিপত্রের প্রথম। এইসব অনুমতিপত্র এবং

ঋণ ক্রমশঃ দেশের উৎপাদিত শক্তিকে বিদেশী কর্তৃত্বের অধীনে ন্যস্ত করে এবং এক সুদূর প্রসারী অনুমতিতে পর্যবসিত করে—যেগুলি ছিল তৈল সংক্রান্ত—যেগুলি বৃটিশদিগকে দেওয়া হয় ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে এবং রুশদিগকে দেওয়া হয় ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে।

১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে ব্যারণ জুলিয়াস দি রয়টার নামে একজন দেশজাত বৃটিশ প্রজা নাসির আল-দ্বীন শাহের নিকট হইতে ৭০ বৎসর মেয়াদী রেলপথ নির্মাণ, খনিজ সম্পদ আহরণ, একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, পানির কল নির্মাণ, নদী প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতির এক বিরাট একক অনুমতিপত্র লাভ করেন। বিনিময়ে তিনি সমস্ত শুল্কের আয় এবং দেশের অধিকাংশ সম্পদের মালিক হন। পরবর্তী বৎসর শাহ প্রথমবারের মত ইউরোপ সফরে গিয়া দেখিলেন যে রুশগণ এই অনুমতিপত্রের বিরোধী। এই কারণে তিনি ইহা নাকচ করিতে বাধ্য হন।

পারস্য সেনাবাহিনী প্রথমে ফরাসীদের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয়। অতঃপর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হয় বৃটিশদের দ্বারা, পুনরায় আবারও ফরাসীদের দ্বারা, তারপর ইটালীয়ানদের এবং পরে অষ্ট্রীয়ানদের দ্বারা। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে তাহাদের প্রশিক্ষণের ভার পড়ে রুশদের হাতে। রুশগণ একটি কোশাক বিগ্রেড প্রস্তুত করে। ইহা রুশ অফিসারগণ কর্তৃক পরিচালিত হয় এবং ইহাদের পোশাক হয় রুশদের কোশাক সৈন্যদের ন্যায়। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইরানে ইহাই একমাত্র সুসংগঠিত বাহিনী হিসাবে অবস্থান করে।

১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে নিম্ন করুন নদীকে জাহাজ চলাচলের উপযোগী করিবার জন্য বৃটিশ একটি অনুমতিপত্র লাভ করে। পর বৎসর পূর্ববর্তী অনুমতিপত্র নাকচ করিবার আংশিক ক্ষতিপূরণ হিসাবে শাহ ব্যারণ দি রয়টারকে একটি নতুন অনুমতিপত্র দান করেন। ইহার দ্বারা তিনি ইম্পেরিয়াল ব্যাংক অব পার্শিয়া নামে একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করিবার অনুমতি লাভ করেন এবং তৎসঙ্গে ব্যাংক নোট চালু করিবার অনুমতিও লাভ করেন। ইহার সহিত সমতা রক্ষা করিয়া রাশিয়াকেও একটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া হয় (Banque D' Escompte de Persi)। ইম্পেরিয়াল ব্যাংকে মুদ্রিত কাগজের টাকা শুধু বিলে উল্লেখিত শহরগুলিতে আদান-প্রদান করা হয়। এক নগর হইতে আরেক নগরে গমনেচ্ছু পর্যটকদিগকে নির্দিষ্ট নগরে

সেই টাকা বিনিময়ের জন্য একটি কমিশন প্রদান করিতে হইত, যেন তাহারা ভিন্ন দেশে ভ্রমণ করিতেছে।

অনুমতিপত্র সমূহের মধ্যে মারাত্মক ছিল ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের তামাক সংবিধান, যদ্বারা বৃটিশকে ইরানের সমস্ত তামাকের উৎপাদন, বিক্রয় ও রফতানীর একচেটিয়া অধিকার প্রদান করা হয়। বিনিময়ে শাহ বাৎসরিক ১৫,০০০ পাউণ্ড এবং লাভের এক চতুর্থাংশ লাভ করিতেন। অনুমতি প্রাপ্ত কোম্পানী, শেয়ার বিক্রয়ের প্রচারপত্র অনুসারে, বাৎসরিক ৫০০,০০০ পাউণ্ড মুনাফার আশা করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে ওসমানীয় সাম্রাজ্যও ফরাসীদিগকে প্রায় অনুরূপ, কিন্তু সীমিত একটি অনুমতিপত্র প্রদান করে এবং বিনিময়ে সরাসরি বাৎসরিক ৬৩০,০০০ পাউণ্ড লাভ করে। পারস্য অনুমতিপত্র ছিল ব্যাপক এবং ৫০ বৎসরের জন্য স্থায়ী; পক্ষান্তরে তুর্কী অনুমতিপত্র ছিল শুধু আভ্যন্তরীণ চাহিদার জন্য এবং ৩০ বৎসরের জন্য স্থায়ী। ফরাসী অনুমতিপত্র যেখানে প্রায় সম্পূর্ণভাবে জনসাধারণের অগোচরে থাকে, সেখানে ইরানের অনুমতিতে জনগণের মধ্যে অত্যন্ত ভয়াবহ বিরোধের সৃষ্টি করে। যে দেশের এক বিরাট সংখ্যাগুরু নারী-পুরুষ ধূমপান করে সেখানে এই ধরনের বিরোধ ধামাচাপা দেওয়া যায় না। যে তামাক তাহারা উৎপন্ন করে সেই তামাক কেন বৃটিশদের নিকট হইতে ক্রয় করিতে হয় তাহা জনসাধারণের বোধগম্য হয় না। ইরানে সমস্ত প্রকার পাশ্চাত্য ও অমুসলিম অনুপ্রবেশের বিরোধী উলামাগণ জনগণের পক্ষ অবলম্বন করে এবং সরকারকে এই অনুমতিপত্র নাকচ করিতে চাপ দেয়। সঙ্গে সঙ্গে শাহ অনুমতিপত্রের বিরোধীগণকে গ্রেফতার করেন। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই বিতর্ক চলিতে থাকে। অতঃপর শ্রদ্ধেয় শীয়া মুজতাহিদ, হাজী মীর্জা হাসান শিরাজী তাঁহার আবাসস্থল ইরাকের সামাররায় হইতে এক ফতোয়া জারী করেন। সেই ফতোয়ার দ্বারা অনুমতিপত্র নাকচ করা পর্যন্ত পারস্য মুসলমানদের জন্য ধূমপান নিষিদ্ধ করা হয়। এই ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি আনুগত্য এত প্রখর ছিল যে শাহ শেষ পর্যন্ত সেই অনুমতিপত্র নাকচ করিতে বাধ্য হন।

তবে এই নাকচে ইরানের ৫০০,০০০ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ হিসাবে খরচ হয়। এই অর্থ নতুন প্রতিষ্ঠিত ইম্পেরিয়াল ব্যাংক হইতে ৬ শতাংশ সুদের

বিনিময়ে ঋণ লইয়া কোম্পানীকে প্রদান করা হয়। সুদ প্রদানের জন্য পারস্য উপসাগরের শুল্ক বিসর্জন দিতে হয় এবং মূল ঋণ ৪০ বৎসর পর প্রদান করিবার সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। ইহাই ছিল ইরানের প্রথম বৈদেশিক ঋণ। ইহার পর আরও অনেক ঋণ করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত দেশের অধিকাংশ সম্পদ বৃটিশ-রুশ মহাজনদের হাতে চলিয়া যায়।

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে নাসের আল-দ্বীন শাহ মুসলিম চান্দ্র সন অনুযায়ী শাহান শাহ হিসাবে এক বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দের পহেলা মে, শুক্রবার, অনুষ্ঠান আরম্ভ হইবার মাত্র কয়েক দিন পূর্বে শাহ তেহরানের ১০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত শাহ আবদুল আজিমের মাজার জেয়ারত করিতে যান। সেখানে কেরমানের জনৈক মীর্জা রেজার গুলীতে তিনি প্রাণত্যাগ করেন। সেই আততায়ী ছিল কুখ্যাত সৈয়দ জামাল আল-দীন আফগানীর শিষ্য।[১] আফগানী ছিলেন একজন প্যান-ইসলামী নেতা, যাঁহাকে ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে শাহ ইরান হইতে বহিষ্কার করেন। তিনি দ্বিতীয় সুলতান আবদুল হামিদের আশ্রয়ে বাস করেন। সুলতানের এক সম্মিলিত ইসলামী বিশ্বের খলিফা হইবার বাসনা কাহারও অবিদিত নহে। ইরানে প্যান ইসলামী আন্দোলন তেমন কোন জনপ্রিয় আন্দোলন ছিল না, এবং এই হত্যা তামাক আন্দোলনের সহিত জড়িত বলিয়া মনে হয় না। শাহ যে নিহত হইবেন তাহা আফগানী একাধিকবার ব্যক্ত করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত তাঁহার এই অনুরাগী শিষ্য শাহের সহিত যাহার ব্যক্তিগত শত্রুতাও ছিল সেই ইচ্ছাকে কার্যে পরিণত করে।

এইভাবে ইরানের শেষ স্বেচ্ছাচারী শাহের জীবনাবসান হয়। নিকৃষ্ট শাহদের বংশে তিনিই ছিলেন সম্ভবতঃ সুযোগ্য শাহ। তিনি তিনবার ইউরোপ সফর করেন ১৮৭৩, ১৮৭৮ এবং ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে। এইসব সফরের দ্বারা দেশের কোন উপকার হয় নাই। ইউরোপের বিভিন্ন সংস্কার আন্দোলন দেখিলেও তিনি সেগুলিকে ইরানের জন্য উপকারী মনে করেন নাই। কারণ সমস্ত পাশ্চাত্য ভাবধারাকে তিনি তাঁহার দেশে কঠোরভাবে দমন করেন। কিন্তু তিনি ইউরোপের বেলে নর্তকীদের ছোট ঘাগড়া

১। সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানী কখনও কুখ্যাত ছিলেন না। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে তাঁহাকে জাগরণের অগ্রদূত হিসাবে সম্মান দেওয়া হয়।—অনুবাদক

২৪—

পছন্দ করেন এবং তাঁহার প্রাসাদের মহিলাদিগকে সেগুলি পরিধান করিতে আদেশ দেন। লম্বা এবং কখনও আটসাঁট পাজামার উপর বেলে নাচের ঘাগড়া পরিধান করা ইরানের মহিলাদের একটি ফ্যাসানে পরিণত হয়। শাহ তাঁহার ইউরোপ সফরের উপর একটি সংক্ষিপ্ত ভ্রমণবৃত্তান্তও রাখিয়া যান।

মনোনীত উত্তরাধিকারী মুজাফফর আল-দ্বীন তখন তাব্রিজে ছিলেন। বৃটিশ ও রুশ মন্ত্রিবর্গ সদ্ভিব্যবহারে তিনি তেহরানে আসেন এবং শাহ হিসাবে অভিষিক্ত হন। তিনি তখন ৪৩ বৎসর বয়স্ক এবং কিছুটা রোগা। চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ইউরোপ গমন করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল, তাই শাহ হইবার পর তিনি ইউরোপ সফর করিতে ব্যাকুল হইয়া পড়েন। কিন্তু ট্রেজারীতে কোন টাকা ছিল না এবং বেলজিয়ান শুল্ক উপদেষ্টাগণ অত শীঘ্র টাকা প্রদান করিতে সক্ষম ছিলেন না। বেলজিয়ান শুল্ক উপদেষ্টাদের কর্মকর্তা এম, নাউসকে প্রাক্তন শাহ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তবে রুশ ব্যাংক, একমাত্র পারস্য উপসাগর ব্যতীত সমস্ত দেশের শুল্ক আদায়ের বিনিময়ে ৫ শতাংশ সুদের হারে শাহকে ২,৪০০,০০০ পাউণ্ড ঋণ দান করে। রাশিয়াকে একমাত্র মহাজন বানাইবার জন্য শর্ত দেওয়া হয় যে, উক্ত অর্থ হইতে ৫০০,০০০ পাউণ্ড ইম্পেরিয়াল (বৃটিশ) ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করা হইবে—তামাকের গালমালে এই অর্থ ঋণ হয়। এই ঋণ, মুনাফা ও কমিশন আদায় করিবার পরও যথেষ্ট টাকা হাতে থাকে এবং সেই টাকায় ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে শাহ ইউরোপ গমন করেন।

দুই বৎসর পর শাহ পুনরায় রাশিয়ার নিকট হইতে ৪ শতাংশ সুদের হারে ১০ লক্ষ পাউণ্ডের এক ঋণের বন্দোবস্ত করেন। এই ঋণের সহিত রুশ-পারস্য সীমান্তের জুলফা হইতে তাব্রিজ, কাজভিন ও তেহরান পর্যন্ত একটি রাস্তা নির্মাণের অনুমতিপত্রও দেওয়া হয়। এই ঋণের সঙ্গে শুল্ক আইন পুনর্বিবেচনার একটি শর্তও জুড়িয়া দেওয়া হয়। বেলজিয়ান অফিসার এম, নাউসকে সাধারণতঃ ইরানের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের জন্য দায়ী করা হয়, কিন্তু প্রাপ্ত প্রমাণাদি তাহা সমর্থন করে না। তাঁহার পরিবর্তিত শুল্ক নীতি ইরানের জন্য অধিক অর্থাগমের বন্দোবস্ত করে, কিন্তু ইহা গ্রেট বৃটেনের বিরুদ্ধে রাশিয়াকেও সন্তুষ্ট করে।

এই অনুৎপাদিত ঋণের প্রকাণ্ড বোঝা, দুর্নীতিপরায়ণ কলঙ্কভারাপন্ন

পারস্য কর্মকর্তাদের সহিত সমতুল্য দুর্নীতিপরায়ণ ইংরেজভাবাপন্ন কর্মকর্তাদের বিবাদ, জনসাধারণের সহিত প্রধান উজীরের (সদর-এ-আজম) দুর্ব্যবহার এবং সাধারণ গণজাগরণের (পরের একটি অধ্যায়ে ইহা আলোচনা করা হইবে) ফলে একটি "বিচার সভার" দাবী উত্থিত হয়। সাধারণ মানুষ যাহা বুঝে এবং দাবী করে তাহা হইল "বিচার"। তবে শিক্ষিত উলামাগণ ইহার দ্বারা মুসলিম শরীয়তের প্রতিষ্ঠা বুঝায় এবং ইউরোপীয় শিক্ষিত ভদ্র সম্প্রদায় ইহার দ্বারা বুঝায় একটি "শাসনতন্ত্র"। সে যাহাই হউক, ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে ৫ই আগস্ট শাহ অতি সহজেই একটি রাজকীয় ফরমানের দ্বারা এই দাবী মঞ্জুর করেন। এই ঘোষণা শাহের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া দেয় ও একটি "মজলিশ" গঠন করিবার আদেশ প্রদান করে এবং শাসনকার্যের জন্য একটি বিধি-ব্যবস্থা তৈয়ার করিবার ব্যবস্থা করে।

ইহাই ছিল সেই বৎসর শাসনতন্ত্র প্রস্তুত করিবার ভিত্তি। সাধারণতঃ শাসনতন্ত্র খসড়ার পূর্বে বিদ্রোহাদি সংঘটিত হয়, কিন্তু ইরানের ক্ষেত্রে শাসনতন্ত্র জারী করিবার পরে গৃহযুদ্ধ ও রক্তপাত হয়। সমস্ত সংঘর্ষে —সরকার পরিবর্তনে এবং এমন কি বংশ পরিবর্তনেও শাসনতন্ত্র অপরিবর্তনীয় থাকে এবং সমগ্র এশিয়ায় ইহা সর্বপুরাতন শাসনতন্ত্রে পরিণত হয়।

পারস্য তৈল ঃ প্রথম পর্ব

মধ্যপ্রাচ্যে তৈলের অস্তিত্ব অতি প্রাচীন কাল হইতে লোকজন জানিত। নূহের নৌকা সমুদ্র উপযোগী করা হয় আলকাতরার দ্বারা, যাহা এক প্রকারের তৈলজাত দ্রব্য। ইরানের জরথুস্ত্রগণ তাহাদের কোন কোন ধর্মীয় অগ্নি মন্দির নির্মাণ করিত প্রজ্বলিত প্রাকৃতিক গ্যাসের চতুষ্পার্শ্বে। দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের কোন কোন অঞ্চলে ভূপৃষ্ঠে অল্প অল্প তৈল নির্গমনের ফলে ছোট ছোট কূপের সৃষ্টি হয় এবং এই অপরিশোধিত তৈলের বণ্টনের দ্বারা উনবিংশ শতাব্দীতে একটি ছোট শিল্পও গড়িয়া উঠে। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে ইরানের শাহ ব্যারণ দি রয়টারকে যে ব্যাপক অনুমতিপত্র দান করেন উহাতে তৈলের কথাও উল্লেখ ছিল।[1] ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিম ইরানের

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ২২৬

প্রাচীন সুসা এলাকায় ফরাসী প্রত্নতত্ত্ব অভিযাত্রীদলের নেতা অধ্যাপক জ্যাকোস ছ মর্গান দেশের সেই অঞ্চলে তৈল প্রাপ্তির সম্ভাবনা দাবী করিয়া একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। পরে কেতাবচী খান নামক একজন ইরানী আবগারী কর্মকর্তা এই প্রবন্ধের দ্বারা চমৎকৃত হন এবং ফরাসী পুঁজিপতিদিগকে তৈল অনুসন্ধানে উৎসাহিত করিতে চেষ্টা করেন। ইহাতে ব্যর্থ হইয়া তিনি ইরানে নিযুক্ত প্রাক্তন বৃটিশ মন্ত্রী স্যার হেনরী ড্রামণ্ড উল্‌ফ্ (Sir Henry Drummond Wolf)-এর স্মরণাপন্ন হন। উল্‌ফ্ কেতাবচীকে তাঁহার বন্ধু এবং একজন অস্ট্রেলীয় তৈল উত্তোলনকারী উইলিয়াম নক্স ডি আরকি (Willium Knox D' Arcy)-এর সহিত পরিচয় করাইয়া দেন।

পারস্যের তৈলের সহিত অবিস্মরণীয় নাম আরকি কখনও ইরানে গমন করেন নাই। সেখানে তিনি ভূতত্ত্ববিদ প্রেরণ করেন এবং আশাপ্রদ রিপোর্ট লাভ করিবার পর তাঁহার প্রতিনিধি আলফ্রেড ম্যারিয়টকে একটি অনুমতিপত্রের ব্যবস্থা করিতে প্রেরণ করেন। ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে ইরানের পক্ষে মুজাফফর আল-দীন শাহ এবং ডি' আরকির পক্ষে ম্যারিয়ট একটি অনুমতিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এই অনুমতিপত্রে উত্তরের পাঁচটি প্রদেশ ছাড়া ইরানের সমগ্র অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত হয়। অনুমতির মেয়াদ নির্ধারিত হয় ৬০ বৎসর। এই সময়ের পর সমস্ত যন্ত্রপাতি, ভবনাদি এবং কারখানা কোন ক্ষতিপূরণ ছাড়াই ইরানের সম্পত্তিতে পরিণত হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অনুমতিপ্রাপ্ত পক্ষ পারস্য সরকারকে ২০,০০০ পাউণ্ড নগদে এবং ২০,০০০ পাউণ্ড শেয়ার বাবদ, তৎসঙ্গে বাৎসরিক লভ্যাংশের শতকরা ১৬ ভাগ দিতে স্বীকৃত হন।

সাত বৎসর কঠোর পরিশ্রম এবং প্রচুর অর্থ ব্যয়ের পর ডি' আরকি ও তাঁহার সঙ্গীগণ যখন সমগ্র পরিকল্পনাটি ত্যাগ করিবার বিষয় চিন্তা করেন, তখন হঠাৎ আহ্বাজের উত্তর-পূর্বে মাছজিদ-ই-সোলাইমান অঞ্চলে ব্যবসাভিত্তিক পরিমাণে তৈলের সন্ধান পাওয়া যায়। সেই স্মরণীয় তারিখটি হইল ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ২৬ শে মে। এক বৎসর পর ২,০০০,০০০ পাউণ্ড পুঁজি লইয়া ইঙ্গ-পারস্য তৈল কোম্পানী গঠিত হয়। ততদিনে পারস্য বিপ্লব দুই বৎসরের পুরাতন। পারস্য পরিষদের প্রথম অধিবেশনের কার্যবিবরণীতে

দেখা যায়, সদস্যগণ তৈলের অনুমতিপত্র লইয়া আলোচনা করেন কিন্তু তাঁহাদের দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইহার প্রবল গুরুত্ব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন না। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ ইঙ্গ-পারস্য তৈল কোম্পানী প্রায় ৩০টি কূপ খনন করে এবং নিকটস্থ তৈল পরিশোধ কেন্দ্রের সহিত একটি পাইপ লাইন নির্মাণ করে। পরিশোধন কেন্দ্রটি পারস্য উপসাগরের আবাদান দ্বীপে নির্মাণ করা হয়। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের পর কোম্পানী বখতিয়ারী গোত্রের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইবার ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের সহায়তা লাভ করে। তৈল ক্ষেত্রে এই গোত্রের জমি ছিল। পরে যুদ্ধাধিপতি শেখ খাজালের সহিতও চুক্তি করা নয়। আবাদান অঞ্চলে শেখ ভূ-সম্পত্তি দাবী করেন।

প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় নাগাদ বৃটিশ নৌবিভাগ বৃটিশ নৌবাহিনীকে কয়লার পরিবর্তে তৈল দ্বারা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে। স্বল্পমূল্যে তৈল লাভ করিবার জন্য এবং ইরানের সমৃদ্ধশালী তৈলকূপগুলি হইতে অন্যান্য দেশগুলিকে বাধা দান করিবার জন্য বৃটিশ নৌ-বিভাগ তেল কোম্পানীর অনেকগুলি শেয়ার ক্রয়ের বন্দোবস্ত করে। ফলে ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের মে মাস নাগাদ বৃটিশ তৈলকোম্পানীর একজন প্রধান ও নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ারের মালিকে পরিণত হয়। একমাস পর বৃটিশ কমন্সসভা এই ক্রয় অনুমোদন করে। ২,২০০,০০০ পাউণ্ড বিনিয়োগ করিয়া বৃটিশ সরকার ইঙ্গ-পারস্য তৈল কোম্পানীর নিয়ন্ত্রণ লাভ করে এবং দুইজন পদাধিকার বলে মনোনীত প্রতিনিধির মাধ্যমে কোম্পানী ও ইহার শাখাসমূহের নীতিমালার উপর ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা লাভ করে। এই তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে পারস্যের তৈল জাতীয়করণ পর্যন্ত বৃটিশ নৌবাহিনী ইঙ্গ-পারস্য তৈল কোম্পানী হইতে "বিশেষ" মূল্যে তৈল ক্রয় করে। এই মূল্যের পরিমাণ কত বা বৃটিশ নৌবাহিনী আদৌ কোন মূল্য দিত কিনা, তাহা কোম্পানী কখনও প্রকাশ করে নাই।

ইরানে বৃটিশ ও রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য উত্তরের পাঁচটি প্রদেশ ডি' আরকির অনুমতিপত্র হইতে বাদ দেওয়া হয়। বাহ্যতঃ রুশ সরকার, সম্ভবতঃ বাকুর তৈল ক্ষেত্রগুলির জন্য, উত্তর ইরানে এই ধরনের কোন অনুমতিপত্র দাবী করে নাই। তবে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে একজন রুশ ব্যবসায়ী

এ. এম. খোসতারিয়া, রুশ সরকারের সহায়তায় ইরানের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী ভশূক আল-দলেহ্ (Vosuq al-doleh)-এর নিকট হইতে একটি অনুমতিপত্র লাভ করে। এই অনুমতিপত্র ছিল উত্তরের জিলান, মাজানদারান ও আস্ত্রাবাদ প্রদেশগুলি হইতে ৭০ বৎসর মেয়াদী একটি তৈল আহরণের চুক্তি। অনুমতিপত্রের বাকী শর্তগুলি ডি' আরকির শর্তসমূহের ন্যায়। পারস্যের আইনানুসারে সমস্ত অনুমতিপত্র ছিল পার্লামেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষ; কিন্তু ১৯০১ খ্রীস্টাব্দে ডি' আরকিকে অনুমতি প্রদান করিবার সময় এই আইন ছিল না। খোসতারিয়ার অনুমতিপত্রকে পার্লামেন্ট কখনও অনুমোদন করে নাই এবং তাই ইহাকে বাতিল বলিয়া গণ্য করা হয়। পরবর্তীকালের রুশ বিপ্লব এবং বলশেভিকগণ কর্তৃক সমস্ত অনুমতিপত্র প্রত্যাখ্যানের ফলে সমগ্র বিষয়টি ধামাচাপা পড়িয়া যায়। পারস্যবাসীগণ মনে করে যে বিষয়টি ঐখানেই সমাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা ভুল বুঝিয়াছে।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

তুর্কী জাগরণ

বিগত ২০০ বৎসরের মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস সে তুরস্কের হউক, ইরানের হউক বা আরবীভাষী বিশ্বেরই হউক, পাশ্চাত্য সভ্যতার মোকাবিলায় অত্র অঞ্চলের সরকারের ও জনগণের প্রতিক্রিয়ার কাহিনী। এইসব মোকাবিলা রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক ও শিল্পকলাভিত্তিক। জনগণ বিভিন্নভাবে এইসব ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে এবং খুব সম্ভবতঃ বিংশ শতাব্দীর পরিসমাপ্তি নাগাদ এই প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকিবে।

তবে একটা জিনিস নিশ্চিত এবং তাহা হইল এই যে, মধ্যপ্রাচ্যের জনগণের সহিত পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতের দ্বারা দুই ধরনের বিপ্লব সূচিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই দুই বিপ্লব হইল একই অবস্থার দুইটি প্রকারভেদ মাত্র; সেই অবস্থা হইল জাতীয়তাবাদ। একটি হইল উপনিবেশিক শক্তির নিকট হইতে স্বাধীনতা লাভের বিপ্লব এবং অপরটি হইল পরিবর্তনের জন্য বিপ্লব। স্বাধীনতার বিপ্লব তুলনামূলকভাবে সংক্ষিপ্ত এবং সর্বদাই দর্শনীয় ও সংযোগশীল। সমাজের সমস্ত দোষের জন্য যেহেতু বিদেশীদিগকে দায়ী করা হয়, তাই সমাজের সর্বস্তরের লোক সাধারণতঃ একত্রিত হইয়া যায়। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লোকদের মধ্যে যাহার নিজের ভাবধারার উপর সাহস এবং কিছুটা গর্ব রহিয়াছে সে-ই প্রায়শঃ নায়ক হইয়া যায়।

পরিবর্তনের বিপ্লব সাধারণতঃ দীর্ঘ, কষ্টসাধ্য ও কৌশলগত হয়। নায়ককে যেহেতু প্রয়োজনের খাতিরে একজন সংস্কারক হইতে হয় তাই তাহাকে সমালোচনা করিতে হয় এবং কখনও কখনও প্রতিষ্ঠিত আচার-অনুষ্ঠান ধ্বংস করিতে হয়, সে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, সাহিত্যিক হউক বা শিল্পকলাজনিতই হউক। এই ধরনের কার্যকলাপ

মতবিরোধ ও গৃহযুদ্ধ সৃষ্টি করে। বিবাদমান দলগুলি হাতের কাছে প্রাপ্ত যেকোন উপায়ে ক্ষমতা দখল করিতে চায় এবং যুদ্ধ অনেকদিন স্থায়ী হয়।

তুরস্ক ও ইরান যেহেতু কোন ইউরোপীয় উপনিবেশবাদী শক্তির সরাসরি নিয়ন্ত্রণে ছিল না তাই তাহারা উপনিবেশিক শাসনের নিকট হইতে স্বাধীনতা লাভের বিপ্লবে জড়িত হয় নাই। তৎপরিবর্তে তাহারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির শাসন হইতে স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম করে। এই দুই দেশে সংগ্রাম এবং পরিবর্তনের জন্য বিপ্লব একই সঙ্গে কাজ করে। তবে আরবীভাষী দেশগুলি স্বাধীনতার সংগ্রামে যথেষ্ট সময় ব্যয় করে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বে তাহারা কৃতকার্য হইতে পারে নাই। ইহার অর্থ এই নহে যে, আরবগণ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সময় আধুনিকতার দিকে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নাই, তবে সেই পদক্ষেপ কোন পরিকল্পনা মোতাবেক বা সরাসরি প্রচেষ্টার মাধ্যমে হয় নাই।

১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে মিসরে নেপোলিয়নের আগমনকে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ঘটনা মনে করা হয়, কিন্তু ইহা দ্বারা মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের কোন পাঠকের এই সিদ্ধান্তে আনা উচিত নহে যে, তাঁহার অভিযানের দ্বারাই পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রথম বিকাশ ঘটিয়াছে বা পাশ্চাত্য ভাবধারা মিসরের মাধ্যমে সেই তারিখ হইতে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যের তিনটি অঞ্চলই ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসে। মিসরে পাশ্চাত্য ভাবধারার বিকাশ সিরিয়া-লেবাননের পরিবর্তনের ধারাকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে, যদিও ওসমানীয় সাম্রাজ্যের উপর ইহার প্রভাব অতি স্বল্পই ছিল এবং ইরানের উপর প্রায় ছিলই না।

তাঞ্জিমাত

১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দের ৩রা নভেম্বর সুলতান আবদুল মজিদ (১৮৩৯—১৮৬১ খ্রীঃ) সাম্রাজ্যের নামজাদা লোকদিগকে গুলহানেহ্ (প্রাসাদের গোলাপ বাগান)-এর মধ্যে একত্রিত করেন এবং তাঁহার বৈদেশিক মন্ত্রী দ্বারা একটি বিবৃতি পাঠ করিয়া শোনান, যাহাকে হাত্তিশরীফ বা "মহৎ ফরমান" বলা হয়। ২৭ বৎসর পর ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী একই সুলতান আরেকটি বিবৃতি জারী করেন যাহাকে হাত্তি হুমায়ুন, বা

"রাজকীয় ফরমান" বলা হয়। উভয়টি চাপে পড়িয়া জারী করা হয় এবং কতকাংশে ইউরোপীয় সরকারসমূহকে শান্ত করিবার জন্য। এতদ্‌-সত্ত্বেও ঐগুলি ওসমানীয় সাম্রাজ্যে এক সংস্কার যুগের উদ্বোধন করে, যাহাকে তাঞ্জিমাত বলা হয়। তবে উল্লেখ করিতে হইবে যে, তাঞ্জিমাত অষ্টাদশ শতাব্দীর বিভিন্ন গোলযোগের দরুন যতটুকু আসিয়াছে ঠিক ততটুকু ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন পরিবর্তনের দরুনও আসিয়াছে।

ওসমানীয় রাষ্ট্র ইসলাম প্রচারের এক সামরিক ছাউনিমাত্র। সুলতানগণ শুধু দার আল-ইসলাম বা ইসলামী ভূখণ্ডই সম্প্রসারণ করেন নাই বরং বিজয় অভিযানের দ্বারা শক্তিশালীও হন, এবং কর ও যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি দ্বারা সাম্রাজ্যকে সম্পদশালীও করেন। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ক্রমাগত পরাজয়ের ফলে সাম্রাজ্যকে কাঁপাইয়া তোলে এবং ওসমানীয়গণ তিনদিকে হুমকির সম্মুখীন হয় : অর্থনৈতিক দিকে, রাজস্ব হারাইবার ফলে ; রাজনৈতিক দিকে, ক্ষমতা হারাইবার ফলে ; এবং মানসিক দিকে, ইসলামের ভূখণ্ড সম্প্রসারণে তাঁহাদের অপারগতার ফলে।

এইসব কারণেই তৃতীয় আহমদের (১৭০৩—১৭৩০) প্রধান উজীর ইব্রাহীম পাশা সংস্কারের প্রচেষ্টা চালান। তিনি অনুভব করেন যে সামরিক ব্যাপারে ওসমানীয়দের পাশ্চাত্যের নিকট হইতে অনেক কিছু শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে। ১৭২০ খ্রীস্টাব্দে মুহম্মদ সেলেবিকে তিনি ফ্রান্সে প্রেরণ করেন এবং তাঁহাকে তাহাদের দুর্গ ও কারখানাসমূহ পরিদর্শন করিয়া ওসমানীয় সেনাবাহিনীর জন্য শিক্ষণীয় বিষয়ে রিপোর্ট প্রদান করিতে বলেন। রিপোর্টের একটি ফল হইল ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা। ছাপাখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জনৈক ইব্রাহীম মুতাফাররিক, তাঁহার পাঠকদিগকে পাশ্চাত্য ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এইসব কিছু উলামা ও জান-নিসারীদের দাপটে ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ফলে তৃতীয় আহমদকে পদত্যাগ করিতে হয় এবং প্রধান উজীরকে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হয়।

আমলাগণ একবার যখন এই নতুন জ্ঞানের স্বাদ লাভ করে, সংস্কারের প্রচেষ্টা তখন পুরাদস্তুর চলিতে থাকে। এইসব আমলারা প্রশাসনের জন্য ছিল অপরিহার্য। আমলারা সাম্রাজ্যের শিক্ষিত শ্রেণী এবং তাহাদিগকে

বলা হয় আহ্‌ল আল-কালাম বা কলমের লোক। শেষ পর্যন্ত তাহারাই তাঞ্জিমাতের পুরোধা হয়। ১৭৩২ খ্রীস্টাব্দে মুব্রাকর ইব্রাহীম মুতাফার্‌রিকা পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্বের উপর প্রথম পুস্তক প্রকাশনা করেন, এবং ১৭৩৪ খ্রীস্টাব্দে সামরিক অফিসারদিগকে গণিত শিক্ষা দিবার জন্য পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রথম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৭৭৪ খ্রীস্টাব্দ প্রকাশিত গ্রন্থে সম্ভবতঃ আমলাতান্ত্রিকদের সুদূর প্রসারী "আবিষ্কার" প্রকাশ করা হয়। ইহাতে বলা হয় যে নতুন পন্থা পুরাতন প্রতিষ্ঠান হইতে ভিন্ন প্রকৃতির এবং আরও বলা হয় যে, নিত্য-নতুন সমস্যাবলীর সহিত তাল রাখিবার জন্য ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রয়োজন নতুন প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রবর্তন করা।

সুলতান সেলিম (১৭৮৯—১৮০৭) প্রথম সংস্কারক সুলতান। তিনি "কলমের লোকদিগকে" রিপোর্ট ও সুপারিশ পেশ করিতে বলেন। তাঁহার সময় হইতে সংস্কারের ধারা শুধু সামরিক ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, বরং বেসামরিক এমনকি ধর্মীয় ব্যাপারেও প্রযোজিত হয়। এইসব রিপোর্টে অন্যান্য বিষয়ে যতই দ্বিমত থাকুক না কেন, একটি বিষয়ে সবাই একমত হয় যে পাশ্চাত্যকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে এবং প্রশিক্ষণের জন্য ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞদিগকে আনয়ন করিতে হইবে। তবে বিশেষ কিছু ফল লাভ ইহাতে হয় নাই, কারণ সাম্রাজ্যে এইগুলি কার্যে পরিণত করিবার প্রণালীর যথেষ্ট অভাব তখনও বিরাজমান ছিল। ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে নিজাম-ই-জদীদ বা নতুন সামরিক পরিকল্পনা ছিল প্রথম। যদিও সেলিমের অধিকাংশ "সংস্কার" রিপোর্টের উপর সীমাবদ্ধ, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জান-নিসারীগণ শংকিত হইয়া উঠে এবং সেলিমকে পদচ্যুত করিয়া চতুর্থ মুস্তফাকে সিংহাসনে বসায়। তবে এই ব্যবস্থায় কিছুই হয় নাই, কারণ "রুশুকের কমরেডগণ" (Comrades of Ruschuk) নামে খ্যাত আরেকটি উপবিপ্লবের দ্বারা মুস্তফাকে পদচ্যুত করিয়া তদস্থলে দ্বিতীয় মাহমুদকে (১৮০৮—১৮৩৯) সিংহাসনে বসানো হয়।

যে বিদ্রোহের দ্বারা দ্বিতীয় মাহমুদ ক্ষমতায় আসেন তাহার পিছনে যেহেতু আমলাতান্ত্রিকগণ প্রধান ভূমিকা পালন করে, তাই উভয়পক্ষের মধ্যে সানাদি ইত্তেফাক নামে একটি সহযোগিতামূলক দলিল স্বাক্ষরিত হয়। এই দলিল অভিজাত সম্প্রদায় ও উলামাদিগকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা

করে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে অবহেলা না করিয়া মাহমুদ আমলাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। তাঁহার একটি দুঃসাহসিক কাজ হইল জান-নিসারী-দিগকে কর্মচ্যুত করা, তবে তিনি অন্যান্য কাজও করেন। আমলাদিগকে তিনি বেতনভুক করেন এবং প্রশংসামূলক কার্যের জন্য তাহাদিগকে উপাধি প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি একটি ডাক বিভাগ গঠন করেন এবং একটি বিশেষ পরিষদ প্রতিষ্ঠা করেন। নবপ্রতিষ্ঠিত মন্ত্রীপরিষদের সভাপতিত্ব করিবার জন্য তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করেন। ফলাফলের দিক হইতে সবচাইতে সুদূরপ্রসারী সম্ভবতঃ বিচার পরিষদ গঠন করা, যদ্বারা উলামাদের নিকট হইতে তাঁহাদের অতি গুরুত্বপূর্ণ একচেটিয়া অধিকার ছিনাইয়া লওয়া হয় বলিয়া মনে হয়; সেই একচেটিয়া অধিকার হইল আইন ব্যবসায়। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে বৈদেশিক মন্ত্রী পারভেজ এফেন্দী যখন সরকারের চারিটি স্তর উল্লেখ করেন তখন তিনি উলামাদের নাম উল্লেখ করেন নাই।

মাহমুদ উদারপন্থী ছিলেন না। সমসাময়িক কয়েকজনের ন্যায় তিনি ছিলেন কুসংস্কারবর্জিত স্বেচ্ছাচারী, কিন্তু আনুগত্য চাহিতেন। সুলতানের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্যের প্রয়োজনীয়তার উপর একটি পুস্তক রচনা করিবার জন্য তিনি শেখ উল-ইসলামকে বাধ্য করেন। তাঁহার "সুলতানের প্রতি আনুগত্যের কারণসমূহের সারাংশ" নামক গ্রন্থে সেই ধর্মীয় নেতা এই বিষয়টি প্রমাণ করিবার জন্য ২৫টি হাদীস উদ্ধৃত করেন। ইসলাম প্রচারের জন্য ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—এই ভাবধারা দ্বিতীয় মাহমুদ ত্যাগ করেন বলিয়া মনে হয়। তিনি সম্ভবতঃ ধর্মনিরপেক্ষ হইয়া যান এবং বিশ্বাস করেন যে, ক্ষমতার আলোকে সংস্কার সম্ভব, ধর্মের আলোকে নহে। সম্ভবতঃ এই মন্তব্যটি তাঁহার যে, "এখন হইতে আমি আমার প্রজাদিগকে 'মুসলমান' হিসাবে দেখিতে চাই 'মসজিদে', 'খ্রীস্টান' হিসাবে দেখিতে চাই শুধু গীর্জায় এবং 'ইহুদী' হিসাবে দেখিতে চাই শুধু তাঁহাদের ধর্মমন্দিরে (Synagogue)।" ইহার ফল স্বরূপ ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে হাত্তি শরীফ ফরমান জারী হয় এবং তাহা তাঞ্জিমাতের সূচনা করে।

হাত্তি শরীফ এবং হাত্তি হুমায়ুন এই দুইটি ফরমানকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার

ফরমান হিসাবে চিহ্নিত করিলে বাড়াবাড়ি করা হয়, কারণ মাহমুদ (যিনি পথ প্রস্তুত করেন) এবং আবদুল মজিদ (যিনি তাঞ্জিমাত সম্ভব করিয়াছেন) উভয়েই স্বেচ্ছাচারী। অপর দিকে, শুধুমাত্র ইউরোপীয় শক্তিসমূহের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে এইগুলি করা হইয়াছে বলিলে মূল সূত্রেই হারাইয়া যায়। তাঞ্জিমাতের মধ্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও শাসনতান্ত্রিক সরকার উভয়টির বীজ বপন করা হয়। ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে বিদ্যমান উদারনৈতিক ব্যক্তিবর্গকে শান্ত করিবার জন্য ইহা ব্যবহার করা হয়, কিন্তু ইহা আবার কিছুকাল যাবত ওসমানীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে বিদ্যমান বুদ্ধিবৃত্তিমূলক ও প্রশাসনিক আলোড়ন হইতেও উত্থিত হয়। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আমলাদের অবস্থা সুদৃঢ় করিবার জন্য তাঞ্জিমাত একটি "প্রাসাদ বিপ্লব"। সরকারী ব্যবস্থার প্রায় সমস্ত পরিবর্তন সাধিত হয় "কলমের লোকদের" হাতে অধিক ক্ষমতা প্রদানের উদ্দেশ্যে।

পতনোন্মুখ পুরাতন দুই প্রতিষ্ঠান—শেখ উল-ইসলামের নেতৃত্বে "মুসলিম প্রতিষ্ঠান" এবং প্রধান উজীরের নেতৃত্বে "প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান"কে সম্পুর্ণভাবে বাদ দেওয়া হয়। অতঃপর প্রধান মন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রীপরিষদ গঠন করা হয় এবং "নতুন" সামরিক ব্যবস্থাকে মন্ত্রীপরিষদের নেতৃত্বে ন্যস্ত করা হয়। এইসব মন্ত্রীবর্গের অধীনে সাম্রাজ্যের শিক্ষিত ও ধর্মনিরপেক্ষ আমলাদিগকে ন্যস্ত করা হয়। আমলাতন্ত্রের সদস্যদের কেউ কেউ হয়তো উলামা বিরোধী ছিল, কিন্তু কার্যতঃ কেউই ইসলাম বিরোধী ছিল না। তাহারা যতদূর সম্ভব মুসলিম প্রতিষ্ঠানকে পরিহার করে। ধর্মীয় বিদ্যালয়সমূহ তাহারা বন্ধ করে নাই তবে তৎসঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানও চালু করে। ধর্মীয় বিদ্যালয়সমূহ ধর্মীয় আইন বিশারদ তৈয়ার করিতে থাকে, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ বিদ্যালয়সমূহ আইন বিশারদ ছাড়াও বেসামরিক প্রশাসক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ও সামরিক অফিসার তৈয়ার করে। ১৮৩০ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিচার ব্যবস্থাকে ক্রমশঃ ফ্রান্সের অনুকরণে পরিবর্তন করা হয়। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ বেসামরিক আইনগুলি বিধিবদ্ধ করা হইলে শুধু ব্যক্তিগত মর্যাদার আইনগুলি, যথা—বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার ও ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে শরীয়তের আওতায় রাখা হয়।

উপরোল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি ছাড়াও তাঞ্জিমাত যুগে সরকার শিক্ষার্থীদিগকে

পশ্চিম ইউরোপে, বিশেষতঃ ফ্রান্সে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রেরণ করিতে উৎসাহ প্রদান করে। ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে বালিকাদের জন্য [illegible] উচ্চ [illegible] খোলা হয়। দুই বৎসর পর আমেরিকান কনগ্রেগেশনালিষ্ট মিশনারী (American Congregationalist Missionary) সাইরাস হ্যামলিন (Cyrus Hemlin) বরার্ট কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে শুধু বুলগেরিয়, গ্রীক ও আর্মেনীয় বংশের খ্রীস্টান ছাত্রগণ ইহাতে যোগদান করে, কিন্তু শীঘ্রই মুসলমানগণও এই কলেজের পৃষ্টপোষকতা করে। এই প্রতিষ্ঠান এবং বালিকাদের আমেরিকান কলেজ তুরস্কের আধুনিকতার ব্যাপারে যথেষ্ট অবদান রাখে। ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে ওসমানীয় বিজ্ঞান সমিতি (Ottoman Scientific Society) গঠিত হয় এবং ইহার পর এই ধরনের আরও অনেক সমিতি গঠিত হয়। এই ধরনের সমিতিতে ইউরোপ হইতে প্রত্যাগত যুবকগণ তাঁহাদের অভিজ্ঞতা আলোচনা করেন এবং কবি ও লেখকগণ তাঁহাদের ভাবধারা প্রকাশ করেন।

তান্জিমাত যুগ তুর্কী লেখকদের এক নতুন শ্রেণী প্রস্তুত করে যাহারা তুর্কী সাহিত্যকে শৈলী ও বিষয়বস্তু উভয় প্রকারে উন্নত করে। এই লেখকদের মধ্যে রহিয়াছেন ইব্রাহীম শিনাসী, যিনি পাঁচ বৎসর প্যারিসে অতিবাহিত করেন। তুর্কী শিক্ষামন্ত্রণালয়ে কয়েক বৎসর কাজ করিবার পর তিনি তার্জুমানী আহ্‌ভাল নামক একটি বেসরকারী খবরের কাগজের সম্পাদকমণ্ডলীর পদে কাজ করেন। এই পত্রিকা ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে তিনি তাঁহার নিজস্ব পত্রিকা, তাসভিরি এফকার (Tasviri Efker)-এর সম্পাদনা করেন। এই পত্রিকা ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চালু থাকে এবং অতঃপর মুস্তফা কামাল আতাতুর্ক ইহাকে নিষিদ্ধ করিয়া দেন। আড়ম্বরপূর্ণ শৈলী হইতে ভাষাকে মুক্ত করিবার ব্যাপারে তিনি ছিলেন পুরোধা, এবং তাঁহার অনুবাদের মাধ্যমে তিনি প্রমাণ করেন যে বিদেশী ও শালীন ভাবধারাকে সহজ তুর্কী ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব। তাঁহাকে অনুকরণ করেন জিয়া পাশা, যিনি রুশো ও মলিয়ারের (Molliere) অনুবাদ করেন; আহমদ মিধাত, ছোট গল্প লেখক এবং আহমদ জেভ্‌দাত, যিনি তুর্কী ভাষা হইতে আরবী ও ফার্সী শব্দসমূহ বাদ দিবার জন্য একটি আন্দোলন চালু করেন।

১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে সুলতান আবদুল মজিদ কর্তৃক জারীকৃত হাত্তি শরীফ আইনের সার্বভৌমত্ব, সমস্ত প্রজাবৃন্দের সমতা, এবং বিচারের নিরপেক্ষ প্রয়োগ অনুমোদন করে। যুগের উৎসাহে তুর্কীগণ তাহাদের দাড়ি কামাইয়া ফেলে, ইউরোপীয় কোট ও পাজামা পরিধান করে, পাশ্চাত্য সঙ্গীত শ্রবণ করে এবং পাগড়ীর পরিবর্তে ফেজ টুপী পরিধান করে। ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে একই সুলতান কর্তৃক জারীকৃত হাত্তি হুমায়ুন আরও ব্যাপক। ইহা বিশেষভাবে বৈদেশিক চাপের ফলে জারী করা হয়। ইহা অন্ততঃ কাগজে-কলমে মুসলমান ও খ্রীস্টানদের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য দূরীভূত করে এবং মুসলমানগণ কর্তৃক ভোগ করা সমস্ত অধিকার ও সুবিধাদি খ্রীস্টানদের জন্যও উন্মুক্ত করে। ইহার দ্বারা কর প্রদান, সামরিক চাকুরী ও শিক্ষায় সমতা বুঝায়। ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এবং অর্থ ও কৃষিজাত সংস্কারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হয়।

কিন্তু এইসব সংস্কার ও ঘোষণাবলী বাধা-বিপত্তিহীনভাবে হয় নাই। উলামাগণ অলসভাবে বসিয়া ছিলেন না এবং অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা সুপ্রতিষ্ঠিত আমলাদের সাহায্যপুষ্টও হন। বিদেশী শক্তিবর্গ, যাহারা নিজেদের দেশের উদারপন্থী লোকদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য সংস্কারে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিল, তাহারাও এখন তুর্কী সংস্কারদিগকে সাহায্য করা বন্ধ করে। দুর্বল সাম্রাজ্যকে আধুনিক প্রতিষ্ঠানাদির দ্বারা শক্তিশালী করিবার চাইতে তাহারা ইহাকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক হইতে শোষণ করিতেই অধিক উৎসাহী হইয়া উঠে।

মিল্লাত প্রথায় সুলতান কর্তৃক নিযুক্ত ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ মোটেই উৎসাহী ছিলেন না, কারণ নতুন সাম্যপ্রথায় তাঁহারা তাঁহাদের সম্প্রদায়ের উপর কোন ক্ষমতার অধিকারী হন না। প্রথমবারের মত সর্বস্তরের খ্রীস্টানগণ সেনাবাহিনীতে চাকুরী করিবার সুযোগ লাভ করে এবং মুসলমানদের ন্যায় একই হারে কর প্রদান করে। তাহাদের এক বিরাট অংশ সমানাধিকারও দাবী করে, আবার মিল্লাত প্রথার দ্বারা তাহারা যেসব সুবিধাদি ভোগ করিত তাহাও দাবী করে। একজন তুর্কী লেখক বলেন যে, তান্জিমাতের লোকজন ইউরোপ হইতে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারা আনয়ন করে। ইহার ভিতর তুর্কীগণ গণতন্ত্র পছন্দ করে আর খ্রীস্টানগণ

করে জাতীয়তাবাদ। ইহার প্রমাণ হইল গ্রীক, সার্বিয়ান, রুমানিয়ান প্রভৃতিদের একের পর এক সংঘটিত স্বাধীনতা আন্দোলনসমূহ, যাহা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসকে চিহ্নিত করে।

নব্য-ওসমানীয়গণ (Young Ottomans)

তাঞ্জিমাতের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়ায় নব্য তুর্কী সমালোচকগণ। ইহারা অভিযোগ করে যে আমলাগণ একটি নতুন ওসমানীয় সমাজ সৃষ্টি করিবার চাইতে পাশ্চাত্যকে অনুকরণ করিতেই অধিক আগ্রহী। এইসব যুবকদের অধিকাংশই সেই আমলাদের অংশ বিশেষ এবং ইহাদের কেউ কেউ সুলতানের অনুবাদ সংস্থায় কার্যেও নিযুক্ত। তাহারা পাশ্চাত্যের সহিত সুপরিচিত এবং ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে আগ্রহী। ইহাদের কিছু সংখ্যক লোক ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে সেকালের ইউরোপে প্রচলিত কাঠামোতে '"দেশ প্রেমিক সংঘ" (Patriote Allience) নামে একটি গোপন সংস্থা গঠন করে। তাহারাই নব্য যুবকদের অগ্রগামী দল—যাহারা রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে আধুনিককরণের বিরোধী। তাহারা শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং ইসলামকে পুনর্জীবিত করিবার পক্ষপাতি। সুস্পষ্টভাবে ইহাদিগকে "নব্য-ওসমানীয়" বলা যাইতে পারে। তাহাদের স্থিতিকাল তাঞ্জিমাত ও "নব্য-তুর্কীদের" মাঝামাঝি।

এই নাম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কারণ এইসব লোক, তাঞ্জিমাতের আমলাদের বিপরীত, জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্র উভয় আদর্শ গ্রহণ করে। তাহাদের জ্ঞাত একমাত্র 'জাতি' হইল ওসমানীয় সাম্রাজ্য, তাই তাহারা একটি প্রকৃত জাতি গঠন করিবার কাজে লাগিয়া যায়। ইহা এমন একটি কাজ যাহাকে বিগত সাড়ে পাঁচ শতাব্দী যাবত উপেক্ষা করা হয়। সমস্যা ছিল পর্বত প্রমাণ, বিশেষতঃ যেহেতু সাম্রাজ্যের অ-তুর্কীগণ ইতিমধ্যে তাহাদের স্বাধীন জাতীয়তাবাদী কর্মসূচী বাস্তবায়ন আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু নব্য-ওসমানীয়গণ নির্বিকার। তাহারা ইসলামকে তাহাদের জাতীয়তাবাদের আধ্যাত্মিক ও মতবাদ সম্বন্ধীয় ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে। তাহারা সম্ভবতঃ অবগত ছিল যে ইসলামের উপর গুরুত্ব আরোপ করিবার ফলে তাহারা সাম্রাজ্যের অমুসলিম প্রজাসাধারণের সমর্থন হইতে বঞ্চিত হইবে, কিন্তু এইসব

জনসাধারণ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন বিদ্রোহে জড়িত হইয়া পড়ে। অপরদিকে তাহারা সাম্রাজ্যের অ-তুর্কী মুসলমান প্রজাদের সমর্থন আশা করে। তাহারা ওসমানীয় সাম্রাজ্যের শক্তিদ্বারা একত্রে সন্নিবিষ্ট সীমিত প্যান-ইসলামী মতে বিশ্বাস করে। বস্তুতঃ সাম্রাজ্যের বেশ কিছু সংখ্যক আরবী-ভাষী শিক্ষিত গণ্যমান্য প্রজা তাহাদের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কিছুকালের জন্য "ওসমানীয় ভাবধারা" আলোচিত হয় ও আরবী সাহিত্যে লিখিত হয়। কিন্তু, সামনে দেখা যাইবে, ইহা বেশীদিন স্থায়ী হয় নাই, কারণ আরবগণ জাতীয়তাবাদের প্রতি ইতিমধ্যে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে বলিয়া তুর্কী-দের সঙ্গে নিজেদের ভাষ্য জড়াইয়া ফেলিতে রাজী হয় নাই।

নব্য-ওসমানীয়দের, ইউরোপের এই ধরনের আরও অনেক বুদ্ধিজীবীর ন্যায় নিজেদের কোন সুস্পষ্ট কর্মপন্থা ছিল না। কেউ কেউ সন্ত্রাসের পক্ষে রায় দেয়, আবার কেউ কেউ সরকারের মধ্যে অনুপ্রবেশে বিশ্বাস করে এবং আরেকদল সুলতানকে নিজেদের মতে দীক্ষিত করিবার আশা পোষণ করে। নিজেদের আদর্শ ও কর্মপন্থায় ভিন্নমত পোষণ করিলেও তাহারা যেভাবেই হউক নিজেদের গোপন সংস্থায় মিলিত হয় এবং একসঙ্গে কাজ করে। নব্য-ওসমানীয়গণ একটি ইসলামী ভাষা ব্যবহার করে। মধ্যযুগের ওসমানীয় সাম্রাজ্যের বুদ্ধিজীবীগণ যেখানে তাঁহাদের ভাবধারা কোরান, ইসলামী রাজনৈতিক দার্শনিকগণ, বাস্তব উপদেশাবলী এবং তুর্কী-ইরানী ধর্মনিরপেক্ষ আইনের[১] ন্যায় বিভিন্ন দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করিয়া-ছিলেন, সেখানে নব্য-ওসমানীয়গণ তাহাদের ভাবধারা সম্পূর্ণভাবে কোরানের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া তোলে। তাহাদের পূর্বে এবং পরে আগত বহু মুসলমান সংস্কারকদের ন্যায় তাহারা ইসলামের সেই "খাঁটি" মদিনা—খেলাফতের যুগে ফিরিয়া যাইতে চায়, সেই খেলাফতকে পুনঃপুনঃ দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখানো হয়।

নব্য-ওসমানীয়দের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিজীবী, কল্পনাবিদ এবং লেখক সম্ভবতঃ নমিক কামাল (মৃঃ ১৮৮৭ খ্রীঃ)। তিনি তাঞ্জিমাতের একজন সফল সমালোচক। তাঁহার মতে তাঞ্জিমাত কিছুটা আধুনিকতা আনয়ন করিয়াছে বটে, কিন্তু জনগণকে আভ্যন্তরীণ শোষণ হইতে রক্ষা

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১১০।

করিতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে এবং জাতিকে বৈদেশিক আধিপত্য হইতে মুক্তি দিতে পারে নাই। এই লেখক ও গুণী কবি বক্তাশি দরবেশ পরিবারভুক্ত এবং যুবক বয়সে তিনি ফরাসী দর্শনের তুর্কী অনুবাদ পাঠ করেন। তাঁহার সমগ্র জীবনে তিনি ইসলাম ও আধুনিকতার সংমিশ্রণের জন্য চেষ্টা করিয়া যান। তিনি 'হুররিয়াত' নামক পত্রিকায় বিস্তারিত-ভাবে তাঁহার ভাবধারা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা নব্য-ওসমানীয়দের মুখপাত্র এবং ইহা বিভিন্ন সমস্যাকে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করে। তাঁহার পরে আগত নব্য-তুর্কীদের মত তিনি তুর্কী হিসাবে নিজেদের ব্যাপারে আগ্রহী নহেন, কিংবা মধ্য এশিয়ার প্রাক ইসলামী তুর্কীদের ব্যাপারেও তাঁহার কোন আগ্রহ নাই। তাঁহার পূর্বে আগত তাঞ্জিমাত আমলাদের প্রতিকুলে, তিনি শরীয়তের গুরুত্ব এবং ইসলামের মূল আদর্শ পালন করিবার কথা বলেন। তিনি একজন ওসমানীয়। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ভাতান (আরবী ওয়াতান) "পিতৃভূমি" ও মিল্লাত "জাতি" ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে প্রশংসা করা হয়। প্রথমোক্তটি শীঘ্রই সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে ব্যবহৃত হয় এবং পরবর্তীটি ব্যবহৃত হয় অধিকাংশই অনারব লোকদের মধ্যে।

ইসলামের প্রতি নব্য-ওসমানীয়দের ঝোঁক থাকিবার ফলে কিছু সংখ্যক উলামাও ইহাদের প্রতি আকৃষ্ট হন, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি নগণ্য। মোটের উপর নব্য-ওসমানীয়গণ সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের ন্যায় প্রতিক্রিয়াশীলদের সন্দেহের চোখে পতিত হয়। তাহাদের কেন্দ্রস্থলে পুলিশ হানা দেয়। এতদ্‌সত্ত্বেও নমিক কামাল, উদারনৈতিক রাজনীতিবিদ মিধাত, সাংবাদিক জিয়া এবং অন্যান্যদের মত নব্য-ওসমানীয়গণ ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় আবদুল হামিদকে সিংহাসনে আনয়নের ব্যাপারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। ধূর্ত সুলতান বলকানদের ভবিষ্যৎ পুনর্বিবেচনা করিবার নিমিত্ত ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত বৃহৎশক্তিবর্গের সম্মেলন হইতে নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য শাসনতন্ত্রে সম্মতি দান করেন। ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে ৩রা ডিসেম্বর নব্য-ওসমানীয়গণ এই শাসনতন্ত্র রচনা করে। তিনি মিধাত পাশাকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং নমিক কামালকে তাঁহার ব্যক্তিগত সচিব নিযুক্ত করিতে ওয়াদা করেন। সুলতান আবদুল হামিদকে একজন উদারনৈতিক শাসক মনে করিয়া ইউরোপীয় শক্তিবর্গের সম্মেলন স্থগিত

করিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শাসনতন্ত্রকে তিনি শিকায় তুলিয়া রাখেন এবং মিধাত ও নমিক কামালকে নির্বাসিত করেন। তিনি পরিষদ আপাততঃ বন্ধ করিয়া দেন এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে একের পর এক হয় জেলে পুরেন অথবা নির্বাসনে প্রেরণ করেন। ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ নব্য-ওসমানীয় আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

নব্য-ওসমানীয়গণ সম্ভবতঃ আধুনিক যুগে ইসলামের প্রথম মতাদর্শী যাহারা পাশ্চাত্যের "সর্বশ্রেষ্ঠ" গুণাবলী গ্রহণ করিয়া ঐগুলিকে ইসলামে সংস্থাপিত করিতে চেষ্টা করে। তাহারা ব্যর্থ হয় কারণ তাহাদের মদিনা খেলাফতের "অকৃত্রিমতা"র চিত্র তাহাদের কল্পনায় রচনা মাত্র। তদুপরি জনগণতান্ত্রিক সরকারের মতবাদের সহিত খাপ খাইবার জন্য তাহারা ইসলামের ব্যাখ্যায় অনেক বাড়াবাড়ি করে। উদাহরণ স্বরূপ, বাইয়া বা আনুগত্য এবং মাশওয়ারা বা পরামর্শকে তাহারা আধুনিক "গণ সার্বভৌমত্ব" ও "জনগণের সরকারের" সহিত তুলনা করে। ইসলামে নবনির্বাচিত খলিফার প্রতি আনুগত্য প্রকাশের অধিকার শুধু গুটি কয়েকের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং পরামর্শের মতবাদ হইল জনসাধারণের জন্য যে সরকার, উহাকে শক্তিশালী করা, কিন্তু জনসাধারণের দ্বারা নহে। ইহা বলার অপেক্ষা রাখে না যে ইসলামে সরকার অর্থ আল্লাহর সরকার, জনগণের নহে। অতএব "সরকার জনগণের সম্পত্তি, জনগণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা" —এই আদর্শ ইসলামী শিক্ষায় মিলে না। এই প্রবাদটি এইভাবে পরিবর্তন করিতে হইবে—"আল্লাহর সরকার, তাঁহার মনোনীত প্রতিনিধি দ্বারা এবং জনসাধারণের জন্য।"

নব্য-ওসমানীয়গণ ইসলামের মধ্যে পাশ্চাত্য ভাবধারার সংমিশ্রণে ব্যর্থ হইলেও তাহারা তুর্কীদের মধ্যে নতুন গুণাবলীর জন্ম দিতে সক্ষম হয়। ওসমানীয় লেখকগণ তাহাদের পূর্ববর্তী লোকদের অনুকরণে বারবার সুলতানদিগকে সৎপরামর্শ দান করে, যাহা ইতিমধ্যে পাঠকদের নিকট নিশ্চয়ই সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে। "সেনাবাহিনী ছাড়া সরকার হয় না, অর্থ ছাড়া সেনাবাহিনী হয় না, প্রজাসাধারণ ছাড়া অর্থ হয় না।"[১] ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নব্য-ওসমানীয়গণ উপরোল্লিখিত আপ্তবাক্য

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১৫২।

ব্যবহার করে, কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন এবং নতুন গুণাবলীতে উজ্জীবিত। তাহারা লেখে, "স্বাধীনতা ছাড়া নিরাপত্তা হয় না, নিরাপত্তা ছাড়া প্রচেষ্টা হয় না, প্রচেষ্টা ছাড়া উন্নতি হয় না, উন্নতি ছাড়া সুখ আসে না"।

নব্য তুর্কীগণ (Young Turks)

১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে সুলতান কর্তৃক শাসনতন্ত্র মুলতবী রাখার পর হইতে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইহা পুনরায় চালু করিতে বাধ্য হওয়া পর্যন্ত দ্বিতীয় আবদুল হামিদ তুরস্কে কেন্দ্রীয় ব্যক্তি হিসাবে বিরাজ করেন। ওসমানীয় ইতিহাসের অত্যন্ত দুরূহ সময়ে দেশের ঘটনাবলীকে প্রভাবান্বিতকারী এই ব্যক্তি, পরস্পর-বিরোধী চরিত্রের অধিকারী। প্রথমে ইউরোপীয়গণ তাঁহার প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট হয় যে, তাহারা এরূপ ভবিষ্যদ্বাণীও করে, তিনি হয়তো দ্বিতীয় মহৎ সুলায়মান হইতে পারেন। অবশ্য পরে তাহারা তাঁহাকে "অভিশপ্ত আবদুল" হিসাবে অভিহিত করে। তাঁহার নিজস্ব প্রজাবৃন্দ তাঁহাকে "জল্লাদ" "নিষ্ঠুর রাজন" বা ইলদীজের রাক্ষস" নামে উল্লেখ করে, যদিও ইহাদেরই কোন কোন প্রজা তাঁহার প্রতি আনুগত্যও প্রকাশ করে। দুইটি বিষয়ে তাঁহাকে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক কিছুর ব্যাপারে তিনি সন্দেহপরায়ণ। সমগ্র সাম্রাজ্যে তাঁহার একটি গুপ্তচর দল ছড়ানো এবং ইহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য আরেকটি দল কাজ করে। বিদেশী রাজধানীগুলিতে তাঁহার দালাল নিযুক্ত থাকে তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য নহে, বরং তাঁহার নিজস্ব প্রজাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য। দ্বিতীয় সামঞ্জস্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হইল তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতা। সুলতানের ক্ষমতা সীমিতকারী যে কোন কার্যকলাপের তিনি বিরোধী। পিতার সংস্কারমূলক কার্যাবলী হইতে তাঁহার শিক্ষা রাশিয়ার তৃতীয় আলেকজাণ্ডার স্বীয় পিতা হইতে যাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন উহারই অনুরূপ।

১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে তৃতীয় আলেকজাণ্ডার জার হইবার পর তিনি তাঁহার পিতামহ প্রথম নিকলাসের চরণরেখা অনুসরণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং "স্বেচ্ছাচারিতার শক্তিতে তাঁহার বিশ্বাসের" কথা ঘোষণা করেন এবং "স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা বজায় রাখিবার ও রক্ষা করিবার..." ওয়াদা করেন।

১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে শাসনতন্ত্রকামীদিগকে নির্বাসনে প্রেরণ করিবার সময় তিনি তাঁহার পিতামহ সুলতান মাহমুদকে অনুসরণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, "তিনি বুঝিয়াছিলেন যে একমাত্র ক্ষমতার দ্বারাই জনসাধারণকে বশ করা যায়, যাহাদের অভিভাবকত্ব আল্লাহ্ আমাকে দান করিয়াছেন।" সেই পরিবর্তনের যুগে আবদুল হামিদ ও আলেকজাণ্ডার উভয়েই তাঁহাদের পিতামহদের যুগে বিদ্যমান অবস্থাকে উত্তম মনে করেন, যদিও সে যুগের অবস্থা সম্পর্কে সম্যক কোন অভিজ্ঞতা তাঁহাদের ছিল না।

এই স্বেচ্ছাচারী সুলতান তাঁহার গুপ্তচরের জাল লইয়াও দেশের ভিতরে ও বাহিরে নতুন তুর্কী দেশপ্রেমিকদের সভাসমিতি বন্ধ করিতে কিংবা সাম্রাজ্যের ভিতরে অ-তুর্কী লোকদের ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদী আকাঙ্খা দমন করিতে ব্যর্থ হন। ইহাদের মধ্যে আর্মেনীয়গণ ও কুর্দগণ প্রবল সমস্যা হইয়া উঠে, কারণ তাহাদের অবস্থান ছিল পূর্বে এশিয়া মাইনরে—সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে আর্মেনীয়গণই অধিক ভয়াবহ হইয়া উঠে, কারণ তাহারা খ্রীস্টান এবং ইউরোপীয় রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে তাহাদের অনেক বন্ধু বিদ্যমান। বস্তুতঃ বার্লিন চুক্তির (১৮৭৮) মধ্যে তাঁহাদের রক্ষাসূচক একটি ধারা সন্নিবেশিত করা হয়। অন্যান্য মিল্লাতের ন্যায় আর্মেনীয়দের নিজস্ব সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস রহিয়াছে। তাহাদের বিত্তশালী শ্রেণী আর্মেনীয় চার্চের ধর্মযাজককে স্বীকার করে। এই কারণে ওসমানীয় প্রথা চালু থাকিবার মধ্যে তাহাদের স্বার্থ জড়িত।

অধিকাংশ আর্মেনীয় জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ বলিয়া তাহারা স্বীয় স্বাধীন রাষ্ট্র দাবী করে। ১৮৮০—১৮৯০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তাহাদের নিজস্ব গোপন জাতীয়তাবাদী সংস্থাসমূহ ছিল। দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন হইলেও এগুলির উদ্দেশ্য ছিল একই—স্বাধীনতা। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে সমস্ত আর্মেনীয় সংস্থাগুলিকে একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পরিণত করা হয়, যাহা দাশ্‌নাক্‌ত্‌জুতুন (Dashnaktzutun) নামে পরিচিত। রোমান ক্যাথলিক ও আমেরিকান প্রটেস্টান্ট মিশনারীগণ অনেক আর্মেনীয়কে তাহাদের ধর্মে দীক্ষিত করে। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে তাহারাই একমাত্র মিল্লাত যাহারা পাশ্চাত্যের গ্রীক অর্থোডক্স, রোমান ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট শক্তিসমূহের সমর্থন লাভ করে। আবদুল হামিদ তাহাদের ব্যাপারে শঙ্কিত হন, অবশ্য শঙ্কার

যথেষ্ট কারণও রহিয়াছে। তিনি অস্থির কুর্দদিগকে আর্মেনীয়দের বিরুদ্ধে লেলাইয়া দেন। তাহাদের বল্গাহীন বাড়াবাড়ির ফলে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। আর্মেনীয় নেতৃবৃন্দ প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং ইউরোপীয়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য অযথা তাহাদের স্বধর্মীদের সমালোচনা করেন বলিয়া মনে হয়। তিন বৎসরে প্রায় ১০০,০০০ আর্মেনীয় প্রাণ হারায়, কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও ইউরোপ মোটেই হস্তক্ষেপ করে নাই। অপরদিকে ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে কাইজার উইলহেল্‌ম্‌ ওসমানীয় সুলতানের নিকট তাঁহার দ্বিতীয়বারের সফরে গমন করেন। প্যালেস্টাইনের পথে তিনি সালাহ্‌উদ্দীনের সমাধিতে একটি পুষ্পমাল্য অর্পণ করেন এবং একজন আরব শেখের ন্যায়, তিনি ইসলামকে রক্ষা করিতে ওয়াদা করেন। যে কেউ কল্পনা করিতে পারে, এই দৃশ্য কাইজারের মাতামহ সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নিকট তেমন উপভোগ্য বলিয়া প্রতীয়মান হইত না। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে তাঁহার নিজের ১০০,০০০,০০০ কোটিরও অধিক মুসলিম প্রজা ছিল।

ইতিমধ্যে নব্য-ওসমানীয় মতবাদের উত্তরাধিকারীগণ একদলে মিলিত হয় এবং সুলতানকে উৎখাত করিবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে মেডিকেল কলেজের একদল ছাত্র ইব্রাহীম আধমের (তেমো) নেতৃত্বে একতা ও উন্নতির কমিটি (Committee of union and progress) নামক একটি সংঘ গঠন করে। এই সংঘ পরে বেশ পরিপুষ্ট ও যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ সুলতানের গুপ্তচর দল এই ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে, এবং ইহার সদস্যবৃন্দ দেশের বাহিরে পলায়ন করে। একদল মিসরে গমন করে এবং তাহাদের জনৈক সদস্য, মুরাদ বে, মিজান নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। আরেকদল প্যারিস গমন করে এবং তাহাদের জনৈক সদস্য, আহমদ রেজা, মিশভারত নামে আরেকটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। পরে এই পত্রিকা দুইটি আলাদা দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধিত্ব করে। মুরাদ বে নব্য-ওসমানীয়দের ভাবধারা সমর্থন করেন। তিনি একজন প্যান-ইসলামী মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি, যিনি মনে করেন যে মুসলমানদিগকে একই ছাদের তলায় রাখিবার পক্ষে ইসলাম যথেষ্ট উদার। সমস্যা সমাধান-কল্পে তাঁহার মত ছিল সুলতানকে সরাইয়া দেওয়া, শাসনতন্ত্র চালু করা,

ইসলামকে সাম্রাজ্যের কষ্টিপাথর হিসাবে গ্রহণ করা, এবং সমস্ত জাতিকে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের স্বপক্ষে আনয়ন করা। প্রায় এই সময় আবদুল হামিদ প্যান-ইসলামী উদ্যোক্তা আফগানীর সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং স্বয়ং সুলতান-খলিফা হিসাবে প্যান-ইসলামী ভাবধারার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সজাগ হন। মুরাদ বে তাঁহার বেশ কিছু সংখ্যক অনুসারীসহ বিপ্লবী শ্রেণী হইতে বাহির হইয়া যান এবং ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে সুলতানের সহিত মিলিত হন। এই সম্মেলনের সহিত তৎকালে ইস্তাম্বুলে অবস্থানকারী আফগানীর হাত ছিল কিনা জানা যায় নাই।

তবে আহমদ রেজা ভিন্ন ভাবধারার লোক। তিনি কখনও ইসলাম প্রত্যাখ্যান না করিলেও তিনি অগাস্ট কমটের (Auguste comte) শিষ্য, এবং প্যান-ইসলামী মতবাদে কখনও চিন্তা করিতেন না। কমটের বাস্তব দর্শন তাঁহাকে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি আকৃষ্ট করে, ফলে ওসমানীয় জাতীয়তা-বাদের চেয়ে তিনি তুর্কী জাতীয়তাবাদেরই একজন উদ্যোক্তায় পরিণত হন। তাঁহার অনুসারীদের মধ্যে বহুসংখ্যক স্বাধীন রাজমিস্ত্রী ছিল। তাহারা তুরস্কে অনেকগুলি আশ্রয় নির্মাণ করে।[১]

সুলতানের শ্যালক দামাদ মাহমুদ পাশা এবং তাঁহার দুই পুত্র সাবাহ্ আল-দ্বীন ও লুতফুল্লাহ্র পলায়নের ফলে প্যারিসের বিপ্লবীগণ বেশ সাহায্য লাভ করে। ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে রাজকীয় পলাতকদের প্যারিসে আগমনের ফলে তুরস্ক ও ইউরোপে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি হয়। দামাদ মাহমুদ পাশা তাঁহার পরিশ্রমের ফল দেখিয়া যাইবার মত দীর্ঘদিন বাঁচিয়া ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার পুত্র সাবাহ্ আল-দ্বীন আহমদ রেজাকে লইয়া ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে প্যারিসে প্রথম ওসমানীয় উদারপন্থীদের সম্মেলন আহ্বান করেন। উপস্থিত ৪৭ জন সদস্যদের মধ্যে ছিল আলবেনীয়, আরব, আর্মেনীয়, কার্কাশিয়ান, গ্রীক, ইহুদী, কুর্দী ও তুর্কী। সাবাহ আল-দ্বীন ইহাতে সভাপতিত্ব করেন। একমাত্র সুলতানকে পদচ্যুত করিবার বিষয়ই সম্মেলনে সবাই একমত হয়। জাতীয় সংখ্যালঘুগণ বিদেশী শক্তির সহিত মিলিয়া যাইবার আগ্রহ প্রকাশ করে, অমুসলিমগণ বংশের ব্যাপারে নির্লিপ্ত ভাব

১। প্রায় একই সময় ইরানে স্বাধীন রাজমিস্ত্রী প্রথা চালু করা হয়। নীচে দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৫৬।

প্রকাশ করে, এবং এমনকি অ-তুর্কী মুসলমানগণও জাতীয়তাবাদী হইয়া উঠে। সাবাহ্ আল-দীন ফেডারেল ইউনিয়ন গঠনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন, পক্ষান্তরে আহমদ রেজা তুর্কী জাতীয়তাবাদের স্বপক্ষে তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করেন। শেষ পর্যন্ত আহমদ রেজাই জয় লাভ করেন।

সম্ভবতঃ রেজার প্রভাবে, কিন্তু পৃথকভাবে সামরিক স্কুলের একদল গ্রাজুয়েট ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে ভাতান (ওয়াতান) নামে একটি সংস্থা গঠন করে। সদস্যদের মধ্যে ছিলেন মুস্তফা কামাল নামে একজন যুবক অফিসার, যিনি প্রথম মহাযুদ্ধের পর আধুনিক তুরস্কের প্রথম আতাতুর্ক বা প্রেসিডেণ্ট হন। কিন্তু সেই সময় নেতৃত্ব থাকে তালাত বে, এনভার (আনোয়ার) পাশা ও জামান বে'র হাতে। তাঁহারা ছাত্রদল, রাজমিস্ত্রীদের আশ্রয় ও দরবেশ শ্রেণীগুলির মাধ্যমে তাঁহাদের বিপ্লবীভাবধারা প্রচার করেন। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে বিভিন্ন সংস্থাসমূহকে ভাঙ্গিয়া পুরাতন "ঐক্য ও উন্নতির কমিটি" এই নামে একত্রিত করা হয়। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁহারা সুলতানের বিরুদ্ধে একটি সফল সামরিক বিপ্লব সংঘটিত করেন। জনগণ এই বিপ্লব গ্রহণ করে শুধু আবদুল হামিদের কুশাসনের জন্য নহে বরং রাশিয়া ও গ্রেট বৃটেনের কার্যকলাপের ভয়েও। তাহাদের চিরাচরিত শত্রু রাশিয়া ইউরোপের ত্রি-পক্ষীয় সন্ধিতে যোগদান করে এবং ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে গ্রেট বৃটেনের সহযোগিতায় ইরানকে প্রভাব-প্রতিপত্তিগত ভাগে বিভক্ত করে।[১] তুর্কীগণ আশঙ্কা করে যে তাহাদিগকেও হয়তো একই ভাবে ভাগ করা হইবে।

কিন্তু ধূর্ত আবদুল হামিদ এই বিপ্লবে বিচলিত হন নাই। তিনি ইহাকে স্বাগত জানান এবং ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে শাসনতন্ত্র পুনর্বহাল করেন। কয়েক সপ্তাহের জন্য আনন্দ উৎসব চলিতে থাকে। মুসলমান, খ্রীস্টান ও ইহুদীগণ একত্রে উল্লাস করে, মুসলমান উলামা ও খ্রীস্টান ধর্মযাজকগণ পরস্পরকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন এবং আনোয়ার পাশা সবাইর সমতা ঘোষণা করেন। সুযোগ পাইলে নব্য-তুর্কীগণ হয়তো একটি গর্ব করিবার মত জাতি গঠন করিতে পারিত, কিন্তু তাহারা সে সুযোগ লাভ করে নাই। একই বৎসর অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী বসনিয়া অধিকার করে এবং বুলগেরিয়ার ফার্ডিনান্ডও নিজেকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের

১। নীচে দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৩৯।

১৩ই এপ্রিল আবদুল হামিদ কর্তৃক সংঘটিত উপ-বিপ্লব সুলতান ও শরীয়তের কর্তৃত্ব ঘোষণা করে। তবে সেনাবাহিনী বিপ্লবের পক্ষে থাকে, এবং ২৭শে এপ্রিল আবদুল হামিদ পদচ্যুত হন ও তাঁহার ভ্রাতা পঞ্চম মুহাম্মদ সুলতান হন, যিনি "বিশ বৎসরে একটি পত্রিকাও পাঠ করেন নাই।"

ঘটনার এইখানেই শেষ নহে। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দে আলবেনিয়া বিদ্রোহ করে, এবং ইটালী ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে ত্রিপলী অধিকার করে। তুরস্ক ইটালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ও পরাজয় বরণ করে। ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে বুলগেরিয়া, সার্বিয়া, মাণ্টেনিগ্রো ও গ্রীস ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে একত্রিত হয় এবং প্রথম বলকান যুদ্ধের সূচনা করে। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে ওসমানীয়দের পরাজয়ের দ্বারা যুদ্ধ শেষ হয় নাই, কারণ বিজয়ীগণ একে অন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ইহা পুনরায় ওসমানীয়দিগকে দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধে জড়াইয়া ফেলে। শান্তি স্থাপিত হয় ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে, এবং ওসমানীয়দের নিকট ইউরোপীয় সাম্রাজ্যের মাত্র ১১,০০০ বর্গমাইল ভূখণ্ড নিজেদের হাতে অবশিষ্ট থাকে। এক বৎসর পর প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়। ইহা ওসমানীয়দিগকে পুনরায় যুদ্ধে জড়াইয়া ফেলে এবং গোটা সাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়।

এবং তবু ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের পর শান্তি স্থাপিত হইলেও নব্য তুর্কীগণ সফলতা লাভ করিত কিনা, তাহা সন্দেহের বিষয়। আবদুল হামিদের পদত্যাগের পর পার্লামেণ্টের যে সভা অনুষ্ঠিত হয়, উহাতে আহমদ রেজা সভাপতিত্ব করেন। সভাপতিত্ব করিবার জন্য তাঁহাকে প্যারিস হইতে আহ্বান করা হয়। তালাত, আনোয়ার ও জামাল এই তিনজন নেতার দ্বারা দেশ শাসিত হয়। পুরাতন পন্থীদের ওসমানীয়বাদ এবং সাবাহ্ আল-দ্বীনের যুক্তরাষ্ট্রীয় মতবাদের পরিবর্তে রেজার তুর্কী জাতীয়তাবাদ স্থান লাভ করে। নব্য-তুর্কীগণ তুর্কী ভাষা ও প্যান-তুরানী আদর্শের ভিত্তিতে সাম্রাজ্য একত্র করিতে চায়। প্যান-তুরানী আদর্শ তুর্কীদিগকে মধ্য এশিয়ার তাতারগণ ও প্রসিদ্ধ চেঙ্গিস খানের সহিত সংযুক্ত করে। তাঁহারা দেশকে সম্পূর্ণ তুর্কী হিসাবে গড়িয়া তুলিবার কর্মসূচী প্রণয়ন করে ও তুর্কী ওজাক (গৃহ) প্রতিষ্ঠা করে—যেখানে জিয়া গোকাল্প, হেলিদ এদিব ও অন্যান্যদের ন্যায় বুদ্ধিজীবী ও লেখকগণ তুরানের ইতিহাস ও তুর্কীদের গুণাবলীর উপর বক্তৃতা দান

করেন। তবে এই কর্মসূচী অ-তুর্কীদের জন্য দমনমূলক হইয়া দাঁড়ায়, ফলে ইহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অ-তুর্কী লোকদের, বিশেষতঃ আরবী-ভাষী মুসলমান হিসাবে সাম্রাজ্যের প্রতি তবুও সহানুভূতি ছিল, কিন্তু তুর্কী ভাষার খাতিরে তাঁহাদের নিজস্ব ভাষা ত্যাগ করিবার চাপে পড়িয়া সেই সহানুভূতি তাহারা হারাইয়া ফেলে। ১৯১৪—১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের মহাযুদ্ধ সেই স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ করিয়া দেয়। জামাল বে, সামরিক উপদেষ্টা হইয়া আফগানিস্তানে চলিয়া যান, তালাত বে, এক আর্মেনীয়ের হাতে জার্মানীতে নিহত হন, এবং শেষ পর্যন্ত প্যান-তুরানী আদর্শ সমর্থক আনোয়ার পাশাও সেই আদর্শের জন্য তুর্কীস্থানে নিহত হন।

তাঞ্জিমাত লইয়া সূচিত তুর্কী জাগরণের ঘটনাবলী বিভিন্ন ধাপের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়—ওসমানীয় আদর্শ, প্যান-ইসলামী আদর্শ এবং প্যান-তুরানী আদর্শ। অতঃপর ইহাকে সৈনিক সংস্কারক মুস্তফা কামালের হাতেই ছাড়িয়া দেওয়া হয়, যিনি ইহাদের সবগুলি ত্যাগ করিয়া এশিয়া মাইনরের তুর্কীদের সাধারণ তুর্কী আদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজে সফলতা লাভ করেন।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

আরবীভাষী জনগণের জাগরণ

বিভিন্ন ভাবধারা ও ঘটনাবলী উনবিংশ শতাব্দীতে আরবীভাষী লোকদিগকে উত্তেজিত করিয়া তোলে। তাহারা মিসরের মাধ্যমে ও লেবাননের আমেরিকান এবং ফরাসী মিশনারীদের কার্যাবলীর মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে, এবং নব্য-ওসমানীয় ও নব্য-তুর্কী আন্দোলনসমূহের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হয়। তবে পাশ্চাত্য প্রভাবেরও পূর্বে এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আরব উপদ্বীপে দেশীয় ওয়াহাবী আন্দোলন বিস্তার লাভ করে। উদ্দেশ্য ও প্রক্রিয়ার দিক হইতে এই আন্দোলন সপ্তম শতাব্দীতে হযরত মুহাম্মদ (সঃ) কর্তৃক পরিচালিত আন্দোলনের সহিত এমন সাদৃশ্যমূলক যে কেউ কেউ ইহাকে "ইসলামের দ্বিতীয় আবির্ভাব" বলিয়া বিবেচনা করে। ওয়াহাবী আন্দোলন পর্যালোচনা না করিয়া পাশ্চাত্যের ভাবধারার প্রতি ইসলামের প্রতিক্রিয়া বুঝা সম্ভব নহে। ওয়াহাবী আদর্শ আরব উপদ্বীপের বাহিরে বিস্তার লাভ না করিলেও ইহার ধর্মীয় ভাবধারা প্যান-ইসলামী আদর্শকে প্রভাবান্বিত করে এবং ইহার মূল আরবপ্রকৃতি বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের প্যান-আরবীয় আদর্শে যথেষ্ট অবদান রাখে।

মুহাম্মদ ইবনে আব্দ্ আল-ওয়াহ্হাব (মৃঃ ১৭৯২) ওসমানীয় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা ভ্রমণ করেন এবং তাহাতে এক টলটলায়মান ও রুগ্ন সমাজ লক্ষ্য করেন। কয়েক বৎসর পর জিয়া পাশা নামে একজন ওসমানীয় বুদ্ধিজীবীও ইউরোপ এবং ওসমানীয় সাম্রাজ্য ভ্রমণ করেন। তিনি লিখেন: "আমি কাফেরদের দেশে ভ্রমণ করি এবং তাহাদের নগর ও প্রাসাদসমূহ দেখি। আমি ইসলামের রাজ্যেও ভ্রমণ করি এবং যাহা আমি অবলোকন করি তাহা শুধু ধ্বংস।" পরবর্তী মুসলমানগণ

ইসলামী বিশ্বকে ইউরোপের সহিত তুলনা করিয়া তাহাতে অনেক অভাব দেখিতে পায়, অথচ ইবনে আবদ আল-ওয়াহ্হাব ইসলামী বিশ্বকে কোরা-নের আলোকে বিশ্লেষণ করেন এবং ইহাতে অনেক অভাব দেখিতে পান। তিনি ইউরোপ সফর করেন নাই, কারণ তিনি নিশ্চিত যে ইসলামকে শিখাইবার মত কোন কিছুই ' 'কাফেরদের'' নাই। তৎপরিবর্তে তিনি কোরান ও রাসুলুল্লাহর জীবনে ফিরিয়া যান এবং ধর্মীয়, সামাজিক ও বুদ্ধিমত্তার সমস্ত কোরান বহির্ভূত প্রভাব পরিত্যাগ করেন। ইবনে আবদ আল-ওয়াহ্হাবের মতানুসারে এইসব প্রভাবের মধ্যে রহিয়াছে আল্লাহর অন্তর-অবতরণ সম্পর্কীয় সুফী বিশ্বাস, বুদ্ধিজীবীদের যুক্তিবাদ এবং সাধা-রণ লোকদের মাজার পরিদর্শন ও রসুলুল্লাহ (সঃ) এবং ইমামদের মধ্যস্থতা প্রার্থনা করিবার রীতি। তিনি একজন খাঁটি মুসলমান এবং এই হিসাবে তিনি মনে করেন যে দরবেশ, দরগাহ, মাজার, তসবিহমালা ও জিনসমূহে বিশ্বাস করা ইসলাম বিরোধী। তিনি একজন আরব এবং এই হিসাবে তিনি প্রচার করেন যে ইসলাম অনারবদের, বিশেষতঃ পারস্যবাসী ও তুর্কী-দের সংস্পর্শে আসিয়া কলুষিত হইয়া যায়। তিনিই আবার প্রথম ব্যক্তি যিনি সুলতান-খলিফার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন।

তাঁহার অনুসারীগণ নিজদিগকে মুয়াহিদিন (ঐক্যবাদী) বলে এবং অন্যান্য মুসলমানদিগকে তাহারা ''পৌত্তলিক'' বলিয়া আখ্যায়িত করে। তাঁহারা রসুলুল্লাহর ও তাঁহার প্রথম যুগের অনুগামীদের যুগকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করে এবং হাম্বলী মজহাব[১] অনুসারে কোরান এবং রসুলুল্লাহর সুন্নতের আইন-কানুন যথাযথভাবে পালনের কথা ঘোষণা করে। প্রথম যুগের ইসলামের নীতি অনুযায়ী তাঁহারা অস্ত্রধারণ করে এবং ''পৌত্তলিকদিগকে'' দীক্ষিত করিবার পথ গ্রহণ করে। ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে মুহাম্মদ ইবনে সউদ নামক একজন গোত্রপতি এই আহ্বানে সাড়া দেন এবং নিজের বাহুবল এই কাজে নিয়োজিত করেন। ১৭৭৩ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ রিয়াদ নগরী অধিকার করা হয় এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ নাগাদ সাধারণ্যে পরিচিত, ওয়াহাবীগণ পশ্চিমে মক্কা ও মদিনা অধিকার করে এবং উত্তরে কারবালা ও নাজাফ্ অধিকার করিতে উদ্যত হয়। তাহাদের মতানুসারে

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১০৫।

আরবগণ দ্বিতীয় জাহিলিয়া (অজ্ঞতা) যুগে নিপতিত এবং তাঁহারা খাঁটি ইসলাম পুনরুজ্জীবিত করিতে ও আরবদিগকে বাঁচাইতে অগ্রসরমান।

সুলতান-খলিফা এই হুমকিতে নীরব থাকিতে পারেন না, আবার সাম্রাজ্যের সুদূর কোণে সংঘটিত এই ধরনের একটি বিদ্রোহ দমন করিবার মত শক্তিও তাঁহার নাই। ফলে তিনি মিসরের মুহাম্মদ আলীর নিকট আবেদন করেন, যিনি ১৮১১ খ্রীস্টাব্দে সেই আবেদনে সাড়া দেন। কয়েক বৎসর স্থায়ী এক অভিযানে মুহাম্মদ আলীর পুত্র ইব্রাহীম ১৮.৮ খ্রীস্টাব্দে ওয়াহাবীদিগকে পরাজিত করেন এবং মক্কা ও মদিনা পুনর্দখল করেন। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে ওয়াহাবীগণ সুলতানের প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকে। এই যুদ্ধ চলিতে থাকে ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত যখন মুহাম্মদ ইবনে রশিদ রিয়াদ অধিকার করেন এবং ইবনে সউদের পরিবারকে কুয়াইতে নির্বাসিত করেন। এইস্থান হইতেই ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে ১৬ই জানুয়ারী ২০ বৎসর বয়সের আবদ আল-আজিজ ইবনে সউদ, ওয়াহাবীদের শেখ গোপনে রিয়াদে অবস্থিত রশিদী প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া গভর্ণরকে হত্যা করেন। সেইখান হইতেই তিনি শেষ পর্যন্ত সমগ্র আরবের কর্তৃত্ব অর্জন করেন।

ওয়াহাবীদের সুস্পষ্ট ভাবধারা, তাহাদের একক উদ্দেশ্য এবং কর্মপন্থা মিসর ও ফারটাইল ক্রিসেন্টের আরবীভাষী লোকদের মনে বিদ্যমান সংশয়ের সম্পূর্ণ বিরোধী। শেষোক্ত লোকদের মধ্যে অনেক পরস্পর-বিরোধী আনুগত্য কাজ করে। ধর্মগত দিক হইতে সেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর খ্রীস্টান এবং হরেক রকম মতবাদের মুসলমান দ্রুজেস ও একটি ছোট ইহুদী সংখ্যা-লঘু বিদ্যমান। রাজনৈতিক দিক হইতে কেউ কেউ ওসমানীয় সাম্রাজ্য চায়, কেউ কেউ স্বাধীনতা চায়, আবার কেউ কেউ ওসমানীয়দের অধীনে স্বায়ত্বশাসনের পক্ষপাতি। তাহারা সবাই আরবী ভাষায় কথা বলিলেও তাহাদের অনেকেই, বিশেষতঃ মিসরীয়গণ নিজদিগকে "আরবী" বলিয়া বিবেচনা করে না। কারণ "আরব জাতির" মতবাদ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্বে রূপ পরিগ্রহ করে নাই। ফলে কোন্ আন্দোলন প্রথম আসে তাহা সঠিকভাবে বলাও যায় না, এবং ইহা তেমন গুরুত্বপূর্ণও নহে।

প্যান-ইসলামী আদর্শ

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে নব্য-ওসমানীয়দের কেউ কেউ যেমন নমিক কামাল প্রমুখ ওসমানীয় সাম্রাজ্যের আওতায় সীমিত আকারের প্যান-ইসলামী আদর্শের কথা চিন্তা করেন। দ্বিতীয় আবদুল হামিদ এই ভাবধারায় উৎসাহ প্রদান করেন অংশতঃ তাঁহার নিজ সাম্রাজ্যের অ-তুর্কী লোকদের আনুগত্য লাভ করিবার জন্য এবং অংশতঃ ইউরোপীয় শক্তিবর্গের চাপ লঘু করিবার জন্য—যে শক্তিবর্গের অধীনে অনেক মুসলমান প্রজাও বিদ্যমান। আরবীভাষী লোকজন যেহেতু ওসমানীয় সাম্রাজ্যে সর্ববৃহৎ মুসলিম জনশক্তি এবং তাহাদের ভাষার জন্য, প্যান-ইসলামী আদর্শ প্রচারের পক্ষে অতি উত্তম তাই সুলতান তাদের মধ্য হইতে বেশ কিছু সংখ্যক লোক তাঁহার স্বপক্ষে আনয়ন করেন।

আবদুল হামিদ কর্তৃক আমন্ত্রিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন প্যান-ইসলামী আদর্শবাদী হইলেন আলেপ্পোর শেখ আবুল হুদা, যিনি ওসমানীয় দরবারে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি ওয়াহাবী মতবাদের বিরোধী। তিনি বিশ্বাস করেন যে ইসলামে খেলাফত একটি অতি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান এবং স্বয়ং খলিফা আল্লাহর বিধি-নিষেধ কার্যকরী করিবার মাধ্যম। বিশ্বাসীগণ "(খলিফা) ন্যায় করিলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিবে এবং অন্যায় করিলে ধৈর্য ধারণ করিবে।" আবুল হুদার প্যান-ইসলামী আদর্শ সাম্রাজ্যের মুসলমানদের মধ্যে সীমিত এবং তাহার উদ্দেশ্য ছিল আবদুল হামিদের দাবী জোরদার করা।

জামাল-আল-দীন আল-আফগানী

উনবিংশ শতাব্দীর অত্যন্ত প্রসিদ্ধ প্যান-ইসলামী আদর্শবাদী নিঃসন্দেহে জামাল-আল-দীন আল-আফগানী (১৮৩৯—১৮৯৭ খ্রীঃ), যাঁহার সীমারেখা শুধু ওসমানীয় সাম্রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে বরং ইসলামের সমস্ত উম্মাকে অন্তর্ভুক্ত করে। তাঁহার জীবন এত ঘাতপ্রতিঘাতমূলক, তাঁহার রচনা এত অনলবর্ষী ও প্রখর এবং ইসলামের মহিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার পরিকল্পনা এত বিভিন্নমুখী এবং সময় সময় এত পরস্পরবিরোধী যে পণ্ডিতগণ তাঁহার সম্পর্কে এখনও শেষ কথা লিখিতে পারেন নাই। তিনি নিজেকে

আফগানিস্তানের অধিবাসী বলিয়া দাবী করেন, যদিও মূলতঃ তিনি একজন পারস্যবাসী। তিনি নিজেকে সুন্নী বলিয়া জাহির করেন যদিও তিনি একজন শীয়া। এমন অনেকেই আছেন যাহারা বিশ্বাস করেন যে তিনি পারস্য বিপ্লবের পুরোধা, কিন্তু ইহাও আবার পরিষ্কার যে তিনি শাসনতন্ত্রবাদী নহেন। সমগ্র জীবনে তিনি একজন শক্তিশালী মুসলমান শাসকের খোঁজ করেন যাঁহার প্রধান মন্ত্রী হিসাবে তিনি ইসলামকে পুনর্জীবিত ও একগ্রন্থীভুক্ত করিতে পারেন। তিনি নিন্দাসূচকভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে লেখেন এবং ইহাকে ইসলামের প্রধান শত্রু মনে করেন। এতদ্‌সত্ত্বেও এমন অনেকও আছেন যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে তিনি বৃটিশদের একজন গুপ্তচর।

আফগানী বা ইরানে পরিচিত আসাদাবাদী, একজন যোগ্য, কার্যকর ও অস্থির আন্দোলনকারী ছিলেন। তিনি ধর্মতত্ত্বের চাইতে দর্শনশাস্ত্রে অনেক বেশী আগ্রহী এবং তাহার চাইতে অনেক আগ্রহশীল রাজনীতিতে। রাজনীতিতে তিনি কল্পনাবিদ নহেন বরং কর্মবিদ। অধিকাংশ কর্মবিদের ন্যায় তাঁহার মধ্যে নিজের মতবাদকে অতি সহজভাবে তুলিয়া ধরিবার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়কে তুলিয়া ধরিবার ভাব পরিলক্ষিত হয়। ওয়াহাবীদের ন্যায় তিনি প্রথম চারি খলিফার যুগকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন এবং অলৌকিকতায় বিশ্বাস করেন। ওয়াহাবীদের তুলনায় আফগানী ইসলামকে যুক্তিবাদের গুরুত্বের উপর বিশ্বাসী। তাঁহার মতে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ, যথা—বাষ্পীয় ইঞ্জিন এবং বিদ্যুতের ন্যায় আধুনিক রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপারে কোরানে লুক্কায়িত উল্লেখ রহিয়াছে।[1] মানুষের একমাত্র করণীয় হইল আল্লাহর বাণী সঠিকভাবে অনুধাবন করিবার জন্য নিজের যুক্তি প্রয়োগ করা। কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হইল, তাহার মতে ইসলাম একটি শক্তি এবং ঘটনাচক্রে ইহা একটি ধর্ম।

তাঁহার একটি অতি পছন্দনীয় প্রবাদ বাক্য হইল, "ইসলামে একজন মার্টিন লুথারের প্রয়োজন," এবং সম্ভবতঃ তিনি বিশ্বাস করেন যে তাঁহার

১। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আফগানীর আধ্যাত্মিক উত্তরসূরীগণ দাবী করেন যে, কোরানে রেডিও, টেলিভিশন, এটমিক এনার্জি ও মহাশূন্যে রকেট নিক্ষেপের বিষয় উল্লেখ রহিয়াছে।—অনুবাদক।

মধ্যে ইসলাম অনুরূপ একজনকে লাভ করিয়াছে। কিন্তু তিনি সংস্কারের কলমের চাইতে ধর্মযোদ্ধার তরবারিকে অধিক পছন্দ করেন। ইসলামের ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি আশা করেন যে ইরানের শাহ ওসমানীয় সুলতানকে খলিফা হিসাবে স্বীকার করুন। বিনিময়ে সুলতান কর্তৃক ইরানের "স্বাধীনতা" স্বীকার করা এবং শীয়া পবিত্র নগরী কারবালা ও নাজাফ সেই দেশের নিকট ফেরত দেওয়া উচিত। ইহার পর তাঁহার ইচ্ছা হইল সমস্ত মুসলিম দেশসমূহ ইস্তাম্বুলে তাহাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রেরণ করিয়া এক সম্মেলনে মিলিত হউক এবং ইউরোপীয় শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করুক। ইরানের শাহ তাঁহাকে দেশ হইতে বিতাড়িত করেন। অবশ্য ইহাতে আশ্চার্যান্বিত হওয়ার কিছুই নাই। তবে অনতিবিলম্বে শাহ আফগানীর এক শিষ্যের হাতে নিহত হন।

ইহা সুস্পষ্ট যে একজন দক্ষ আন্দোলনকারী হিসাবে আফগানী স্বীয় উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করিতে আগ্রহী। তিনি ইসলামের একতা প্রচার করেন, সমস্ত ধর্মের উপর ইহার আধিপত্যের ব্যাপারে তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেন এবং যাহারা তাঁহার পথের অন্তরায় তিনি তাহাদের হত্যা করিবার বৈধতা স্বীকার করেন। কিছুকালের জন্য তিনি সত্যসত্যই বৃটিশের সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করেন এবং পরে আবার রুশদের সাহায্য কামনা করেন। তাঁহার শীয়া মতবাদ যেহেতু একটি অন্তরায় তাই তিনি নিজেকে আফগানিস্তানের লোক বলিয়া দাবী করেন যাহাতে সবাই নিশ্চিতরূপে তাঁহাকে একজন সুন্নী হিসাবে গণ্য করে (অধিকাংশ আফগানী সুন্নী মতাবলম্বী)। তিনি প্যারিস, লণ্ডন ও পিটার্সবার্গে গমন করেন যাহাতে ইসলামের পুনর্মিলনের জন্য ইহাদের যে কোন সাম্রাজ্যের সাহায্য তিনি লাভ করিতে পারেন। ইসলামী বিশ্বে তিনি একজন শক্তিশালী রাজনৈতিক শাসকের সন্ধান করেন, যেকোন-শাসক, যিনি ইসলামের একতা আনয়ন করিবার মত যথেষ্ট শক্তিশালী। তিনি মিসরের খেদিভ, ইরানের শাহ ও তুরস্কের সুলতানের নিকট গমন করেন। ইহাদের প্রত্যেকে তাঁহাকে কিছুকালের জন্য ব্যবহার করেন এবং পরে চলিয়া যাইতে বলেন। তিনি তুলনামূলকভাবে সুলতান আবদুল হামিদের প্রতি অধিক আকৃষ্ট হন। তিনি পুনরায় ইস্তাম্বুল গমন করেন,

কিন্তু আফগানীর আনুগত্য যেহেতু ইসলামের প্রতি, ওসমানীয় বংশের প্রতি নহে, তাই ধূর্ত সুলতান তাঁহাকে সসম্মানে গৃহবন্দী অবস্থায় রাখেন এবং সেখানেই তিনি ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন করেন।

মুহাম্মদ আবদুহু

প্যান-ইসলামী আদর্শের আরেকজন অতি প্রভাবশালী ব্যক্তি মুহাম্মদ আবদুহু (১৮৪৯—১৯০৫ খ্রীঃ)। তিনি আফগানীর একজন শিষ্য হইলেও চিন্তাবিদ হিসাবে খ্যাত এবং আরও অধিক প্রভাবের অধিকারী। ভবঘুরে শিক্ষকের তুলনায় আবদুহু মিসরের জীবন ও সংস্কৃতির সহিত ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত। যদিও কিছুকালের জন্য তিনি আফগানীর রাজনৈতিক কার্যাবলীতে আকৃষ্ট হন, তাঁহার অন্তর ইহাতে ছিল না এবং তিনি তাঁহার সকল জীবন শিক্ষা ও সংস্কারে অতিবাহিত করেন। ইসলাম যে হুমকির সম্মুখীন এই ব্যাপারে তিনি তাঁহার শিক্ষকের সহিত এক মত, কিন্তু এই হুমকি যে খ্রীস্টান ধর্মের দ্বারা এই ব্যাপারে তিনি দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি মনে করেন স্বয়ং মুসলমানদের কার্যাবলীর দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলামের অপব্যাখ্যা করা হয়। আবদুহু বিশ্বাস করেন যে ইসলামকে পাশ্চাত্যের হুমকির মোকাবিলা করিতে হইবে এবং তাহা রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের দ্বারা করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই, বরং ইসলামের আভ্যন্তরীণ সংস্কারের দ্বারাও ইহা সম্পাদন করা সম্ভব। আবদুহু আধুনিক মুসলিম বিশ্বে প্রথম জনহিতকর সামাজিক সেবা সংঘ প্রতিষ্ঠা করেন এবং আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার কর্মশক্তি শিক্ষামূলক সংস্কারে ব্যয় করেন। মুসলিম জাহানের রাজধানীগুলিতে আফগানী অনুসৃত সম্পূর্ণ রাজনীতি-ধর্মীয় কূটনীতি তিনি পরিহার করেন এবং তৎপরিবর্তে শাসকদিগকে শিক্ষা-মূলক সংস্কার উদ্বোধন করিবার জন্য সম্মত করাইবার পরামর্শ দিয়া তিনি তাঁহার শিক্ষকের বিরাগভাজন হন।

প্রথম শতাব্দীর "খাঁটি" ইসলামকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিবার ব্যাপারে তিনি ওয়াহাবীদিগকেও অনুকরণ করেন, কিন্তু তাহাদের প্রতিকূলে ইসলাম প্রচারের জন্য আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার নতুন পন্থা এবং এমনকি

ইসলাম প্রচারের জন্য আধুনিক দর্শনের ক্রমবিকাশও গ্রহণ করেন। তিনি তকলিদ বা অতীত লোকদের অনুকরণের বিরোধিতা করেন এবং বিশ্বাস করেন যে ইজতিহাদ বা কোরানের ব্যাখ্যার পথ এখনও রুদ্ধ হয় নাই। শেষোক্তটি সুন্নী ইসলামের অন্ধবিশ্বাস। কিন্তু তিনি কখনও শিক্ষার ইউরোপীয় আদর্শের পক্ষপাতী নহেন। তিনি অনুভব করেন যে, মুসলমানদিগকে ইউরোপীয় ব্যবস্থা হইতে ধার করিতে হইবে এবং উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ইউরোপীয়দের ন্যায় অনেক কিছু বিসর্জন দিতে হইবে। তিনি ইসলামকে একটি বিশ্বজনীন ধর্ম বলিয়া বিবেচনা করেন এবং কোরানের উপর তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা সহনশীল, নৈতিকতাপূর্ণ ও সুদক্ষ। ইহা একজন স্বেচ্ছাসেবক ও কর্মী উভয় নীতিজ্ঞানমুখী।

জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁহার নিজেকে রক্ষণশীল মুসলমানদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হয়, যাহারা পূর্বপুরুষদের নিকট হইতে প্রাপ্ত ঐতিহ্যের প্রতি আস্থাশীল। তাঁহারা অভিযোগ করেন, "ইনি কি ধরনের শেখ, যিনি ফরাসী ভাষায় কথা বলেন, ইউরোপ ভ্রমণ করেন, পাশ্চাত্য পুস্তকাদি অনুবাদ করেন, পাশ্চাত্য দার্শনিকদের উদ্ধৃতি দান করেন, তাহাদের পণ্ডিতবর্গের সহিত আলোচনা করেন, এমন সব ফতওয়া জারী করেন যেগুলি প্রাচীনগণ কখনও জানেন না, জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন এবং দরিদ্র ও দুর্ভাগাদের জন্য চাঁদা আদায় করেন। তিনি যদি একজন ধর্ম বিশেষজ্ঞ হইয়া থাকেন তবে তাঁহাকে আপন গৃহ ও মসজিদের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করিতে দাও। তিনি যদি ধর্মনিরপেক্ষ বিশ্বের লোক হন তবে আমাদের মতানুসারে তিনি সেই পথে বাকী মুসলমানদের চাইতে অধিক কর্মঠ।"

আবদুহু একজন মিসরীয়। জাতীয়তাবাদী আরাবী পাশা পরিচালিত খেদিভ বিরোধী ও বিদেশীশক্তি বিরোধী বিদ্রোহে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। তিনি প্রাচীন মিসরের ঐতিহ্যে গর্ববোধ করেন এবং ফলে তাঁহার ভাবধারা মুসলিম উদার ব্যাপক জাতীয়তাবাদ হইতে ঈষৎ পরিবর্তিত। তিনি একটি দেশের মুসলমানদের ঐক্যকে সমগ্র মুসলমানদের ঐক্যসূত্রের শক্ত সংযোজনী গ্রন্থি বলিয়া মনে করেন। ইহা হইল প্রাচীন পন্থী প্যান-ইসলামী আদর্শ, কিন্তু আবদুহু কর্তৃক প্রবর্তিত পরিবর্তন হইল, কোন জাতির মধ্যে মুসলিম ও

অমুসলিম উভয় ধর্মাবলম্বী থাকিলে সেখানে ধর্মনির্বিশেষে তাহাদের মধ্যে ঐক্য আনয়ন করিতে হইবে। অপরদিকে তিনি মতবাদ ভিত্তিক জাতীয়তাবাদী চিন্তার একজন সমালোচক।

পরে আগত অসংখ্য মুসলিম চিন্তাবিদের ন্যায় তিনি সর্বদা দুইটি বিষয় লইয়া চিন্তা করেন। একটি হইল ইসলামের দাবী, যাহা একজন মুসলমানের নিকট হইতে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী জীবন নির্বাহ করা এবং অপরটি হইল আধুনিক সভ্যতার দুর্নিবার দাবী, যাহা তাহাদিগকে ভিন্নভাবে চলিতে বাধ্য করে। এই দুইটি অসঙ্গত নহে বলিয়া তিনি মত প্রকাশ করেন। এইগুলির মধ্যে অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হইলে তিনি মত প্রকাশ করেন যে, ইসলামের নৈতিক ও মতবাদমূলক দিকগুলির সহিত আপোষ করা যায় না। তাহা সত্ত্বেও তাঁহার অস্থিরতা বিদূরিত হয় নাই এবং এক সময় তিনি প্রাচীন পন্থীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হন, কারণ তিনি সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছেন, আবার আধুনিক পন্থীদের দ্বারাও তিনি প্রত্যাখ্যাত হন কারণ তিনি মোটেই অগ্রসর হন নাই।

প্যান-আরবী আদর্শের সূচনা

ইসলামের খাঁটি বিশ্বজনীন ভাবধারা সত্ত্বেও ইহার সহিত আরবীবাদের একটি সুবিমল সম্পর্ক বিদ্যমান। দ্বিতীয় খলিফা ওমর নিশ্চয়ই আরবদিগকে বাকী মুসলমান হইতে উচ্চমানের বলিয়া বিবেচনা করেন। অনারব মুসলমানদিগকে শুধু 'বন্ধু' হিসাবে গ্রহণ করা হয়। উমাইয়াগণ এই আরব প্রাধান্যকে আরও জোরদার করেন এবং আরবীভাষাকে নব-দীক্ষিত মুসলমানদের উপর চাপাইয়া দেন। আরবদের রাজনৈতিক ক্ষমতা চলিয়া যাইবার পর রাজনৈতিক বিষয় হিসাবে আরববাদ তিরোহিত হয়, কিন্তু ভাষার সহিত সম্পর্কযুক্ত আরববাদ থাকিয়া যায়। খাঁটি মুসলমানগণ সাধারণতঃ বিশ্বাস করে, "যে ব্যক্তি রসুলুল্লাহকে ভালবাসে সে আরবদিগকে ভালবাসে এবং যে ব্যক্তি আরবদিগকে ভালবাসে সে আরবী ভাষাকে ভালবাসে—যে ভাষায় অত্যুত্তম গ্রন্থাবলী অবতীর্ণ হয়।" মুসলমানদের মধ্যে সর্বত্র এই কথা প্রচলিত আছে যে, "আরবী ফেরেস্তাদের ভাষা।" যাহাই হউক, ঊনবিংশ শতাব্দীতে আরবীভাষা ও সাহিত্যের পুনর্জাগরণ

এবং প্যান-আরবী আদর্শের রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তি হিসাবে ইহার ব্যবহার, যাহা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উন্নতি লাভ করে, প্রধানতঃ ফারটাইল ক্রিসেন্টের খ্রীস্টানদের কার্যাবলীর দ্বারা এবং আমেরিকার প্রটেস্টান্ট খ্রীস্টানদের উৎসাহ প্রদানের দ্বারা কার্যকরী হয়।

মুসলমান প্রতিবেশীদের তুলনায় সিরিয়া-লেবাননের অধিকাংশ খ্রীস্টান ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নাই। প্যান-ইসলামী আদর্শের কর্মসূচীর প্রতি মুসলমানদের সমর্থন লাভ করিবার জন্য আবদুল হামিদ হেজাজ রেলপথের কাজ সমাপ্ত করেন—যাহাতে হজযাত্রা সহজতর হয়, পবিত্র নগরীগুলির ভবনাদি মেরামত করেন, আরবদিগকে উচ্চপদে নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার দেহরক্ষী হিসাবে আরবী সৈন্য পছন্দ করেন। তবে, খ্রীস্টানদিগকে এইসব বদান্য-বিবেচনা হইতে দূরে রাখা হয়। সঠিকভাবে বলিতে গেলে, তাহাদের আনুগত্যের অভাবে খ্রীস্টানগণ পাশ্চাত্য ভাবধারা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। লেবাননের মেরোনাইটদের ব্যাপারে ফরাসী ক্যাথলিকদের ধর্মীয় উৎসাহ এবং আমেরিকার প্রটেস্টান্টদের ধর্মীয় আগ্রহ পাশ্চাত্য সভ্যতার সুফল আনয়ন করে। ধর্মীয় ব্যাপারে কোন মিশনই তেমন সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহাদের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও পরোক্ষ রাজনৈতিক প্রভাব যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট মিশনদের মধ্যে একটি নিঃশব্দ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান। উভয়ে বিদ্যালয় ও হাসপাতাল খোলে, উভয়ে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে এবং উভয়ে চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রকৌশলীবিদ্যা ও জ্ঞানের অন্যান্য শাখায় অনুষদ সম্বলিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ স্থাপন করে। ফরাসী প্রভাব কিছুটা সীমিত, কারণ রোমান ক্যাথলিকগণ শুধু মেরোনাইট খ্রীস্টান-দিগকে শিক্ষা দিতে ও শক্তিশালী করিতেই অধিক আগ্রহী। তদুপরি ফরাসী সংস্কৃতি প্রচারে আগ্রহী হিসাবে তাহারা ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। অপরদিকে আমেরিকার প্রটেস্টান্টগণ সমস্ত আরবীভাষী লোকদের মধ্যে খ্রীস্টান বাণী প্রচারের দেশীয় ভাষা ব্যবহার করে। ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে তাহারা বৈরুতে প্রথম আরবী ছাপাখানা প্রতিষ্ঠা করে এবং সমস্ত অগ্রগামী প্রটেস্টান্ট মিশনারীদের ন্যায়

তাহারা বাইবেল গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদ আরম্ভ করে। কর্নেলিয়াস ভ্যান ডাইক (Cornelius Van Dyke), যিনি একজন প্রসিদ্ধ আরবী পণ্ডিতে পরিগণিত হন, এই পরিকল্পনায় দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং দুইজন লেবাননী—বাটরাস আল-বুস্তানী (১৮১৯—১৮৮৩ খ্রীঃ) এবং নাসিফ আল-ইয়াজিজী (১৮০০—১৮৭১) [Butrus al-Bustani and Nasif al-Yazizi] তাঁহাকে এই কাজে সাহায্য করেন। ইয়াজিজী আরব ইতিহাস ও সাহিত্যের উপর লেখেন এবং তাঁহার কবিতায় প্রাচীন আরবীর প্রশংসা করেন। ইনিই ১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দে সম্ভবতঃ প্রথম ঘোষণা করেন যে, ওসমানীয় শাসন হইতে মুক্তি লাভের জন্য তাঁহাদের কাজ করা উচিত। বাটরাস একজন স্কুল শিক্ষক ও অত্যন্ত উন্নতিশীল লেখকে পরিণত হন। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রথম আরবী সাময়িকী 'আল-জিনান' প্রতিষ্ঠা করেন, যাহা ১৬ বৎসর ধরিয়া আরবীভাষী বিশ্বে আধুনিক চিন্তাধারার উপর পাঠ্য হিসাবে কাজ করে।

সিরিয়ান প্রটেস্টাণ্ট কলেজ, পরে আমেরিকান ইউনিভার্সিটি অব বৈরুত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ইহার ছাত্রগণ নাহ্‌দা নামে একটি জাতীয় নবজাগরণের নেতৃত্ব দান করে—যাহা শুধু আরবীভাষার বিভিন্নমুখী প্রতিভাই পুনরাবিষ্কার করে নাই বরং পশ্চাত্যের ধর্মীয়, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারাও প্রবর্তন করে। এইসব অগ্রনায়কগণ বিভিন্ন সাহিত্যিক ও বৈজ্ঞানিক সমিতিসমূহ চালু করেন এবং এইসব সমিতিতে আরবী জাতীয় আন্দোলনের সূচনা করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে প্রকাশিত প্রভাবশালী সাময়িকী দুইটির মধ্যে একটি হইল 'আল মুকতাতাফ'। ইহা ইয়াকুব শরুফ ও ফারিস নিমর নামক সিরিয়ান প্রটেস্টাণ্ট কলেজের দুইজন গ্রাজুয়েট ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। অপর সাময়িকীর নাম 'আল-হিলাল', যাহা ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে জুর্জী যায়েদান প্রতিষ্ঠা করেন। এই উভয় সাময়িকীর সম্পাদকদ্বয় ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকার সম্পাদকবৃন্দ পরে আবদুল হামিদের গুপ্তচরদের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য কায়রোর অপেক্ষাকৃত মুক্ত আবহাওয়ার পলায়ন করেন। এই সব ব্যক্তি ও আরও অনেকে যাহাদের মধ্যে শিবলী শুমাইল (১৮৫০—১৯১৭ খ্রীঃ) এবং ফারাহ্ আনতুন (১৮৭৩—১৯২২ খ্রীঃ) কিছু কিছু বিষয়ে একমত হন।

প্রথম ও প্রধান হইল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান। ইহার একটি নিজস্ব বিশ্বজনীন মূল্য এবং ইহার নিকট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় গোপন বিষয়ের চাবিকাঠি রহিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। সমস্ত কিছুর ঐক্যের ভিত্তি ইহার মধ্যে রহিয়াছে। সেই ঐক্যকে প্রকাশ করিবার জন্য তাহারা 'তাওহীদ' শব্দ ব্যবহার করেন, সেই একই ভয়ানক শব্দ যদ্বারা ইসলামে আল্লাহর একত্ব প্রকাশ করা হয়। তাঁহাদের অধিকাংশই ডারউইনের মতবাদের দ্বারা মুগ্ধ হন এবং তাহাদের নিকট প্রগতির বাস্তবতা ইউরোপীয় লেখকদের ন্যায়ই, যাঁহাদের কার্যাবলীকে তাঁহারা আরবীতে অনুবাদ করেন। দ্বিতীয়, তাহারা ধর্মনির্বিশেষে জাতির ঐক্য এবং ইহার সমস্ত নাগরিকদের সাম্যে বিশ্বাস করে। জাতি বুঝাইবার জন্য তাহারা কখনও ওয়াতান (পিতৃভূমি), কখনও কউম (জনসাধারণ) বা কখনও উম্মা বলে, যদ্বারা প্যান-ইসলামী পন্থীগণ মুসলিম সম্প্রদায়কে বুঝায়। ঐসব শব্দ বিংশ শতাব্দীতে পরিষ্কার রূপ ধারণ করে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হইল তখন মুসলমান, খ্রীস্টান ইহুদী ও দ্রুজেস সবাই একই উম্মার সদস্যভুক্ত হয়।

তৃতীয়ত তাহারা বিশ্বাস করে যে, নতুন বিজ্ঞান ইহার মধ্যে নতুন আইন ও নতুন সম্পর্ক সৃষ্টি করে। অতীতের আইনের প্রতি পরিপূর্ণ আনুগত্য পরিত্যাজ্য, তা সে ইসলামের শরীয়ত হউক অথবা খ্রীস্টানদের বিধিবদ্ধ আইন হউক। তদুপরি ইহা জনগণকে বিভক্ত করিয়া ফেলিবে এবং বৈষম্য ও বিবাদ সৃষ্টি করিবে।

চতুর্থ, পার্থিব ব্যাপারে তাহারা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের—মুসলিম অথবা খ্রীস্টান, পৃথকীকরণে বিশ্বাস করে। এই দুইটির সংমিশ্রণ উভয়কে কলুষিত করিবে এবং ধর্মকে জাতীয়তার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করিলে চিন্তার স্বকীয়তা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা ব্যাহত হইবে। তাহাদের অধিকাংশ, সবাই নহে ধর্মীয় লোক এবং তাহাদের কেউ কেউ খ্রীস্টান হইলে এতদূর পর্যন্ত বলে যে আরবদের ঐতিহাসিক প্রদর্শনীয় বিষয় হিসাবে ইসলামকে ইহার সম্মানিত আসন প্রদান করা উচিত।

একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন করিবার দাবী করতঃ খ্রীস্টানগণ মুসলমানদের সহিত শুধু সমান অধিকারই দাবী করে না বরং সমাজের যাবতীয়

সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যাবলীতে সমান ও বাস্তব অংশ দাবী করে। অপরদিকে মুসলমানদের পক্ষে একই নীতি গ্রহণ করিবার অর্থ হইল এতদিন পর্যন্ত তাহারা যে প্রাধান্য লাভ করিত, তাহা ত্যাগ করা। প্যান-ইসলামীদের মতে, এমন কি আবদুহুর ন্যায় একজন সহিষ্ণু ও উদার ব্যক্তির মতেও ইহার অর্থ হইল সমস্ত ধর্মের উপর ইসলাম যে প্রাধান্য লাভ করিত, তাহা অস্বীকার করা।

কিন্তু মুসলমানগণ যতই দলে দলে পাশ্চাত্যের ভাবধারা ও প্রতিষ্ঠান সমূহের সংস্পর্শে আসিতে থাকে এবং যতই তাহারা ওসমানীয় সুলতানের নীতিসমূহের প্রতি অনাসক্ত হইতে থাকে ততই তাহারা এই সমস্ত ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হইতে থাকে। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের নব্য তুর্কী বিপ্লব এবং ইহার তুর্কী জাতীয় করিবার কর্মসূচী আরবীভাষী মুসলিম যুবকদিগকে খ্রীস্টানদের সহিত একই কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতে বাধ্য করে। কেউ কেউ খ্রীস্টান সংগঠনসমূহে যোগদান করে এবং অন্যান্যগণ আল-ফাতাত জাতীয় মুসলিম দলসমূহ গঠন করে, যাহা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে। আবার অনেকে, যাহারা এতদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই, তাহারা অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর ন্যায় আরব-তুর্কীর দ্বৈতরাজতন্ত্র কামনা করে। এইসব সমিতি-সমূহের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং তাহারা গোপনে কায়রো বা ইউরোপে বিভিন্ন সভায় মিলিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এই স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে বৃটিশগণ তাহাদের সুবিধামত ব্যবহার করে।

স্থানীয় জাতীয়তাবাদ

ওসমানীয়গণ লেবানন ও আরব উপদ্বীপের কিছু অংশ ব্যতীত অধিকাংশ ফারটাইল ক্রিসেন্ট এক অঞ্চল হিসাবে পৃথক সরকারের অধীনে শাসন করে। ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি যে, মিসর ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক উভয়দিক হইতে আলাদা ছিল। মুহাম্মদ আলীর আগমন এবং পরবর্তী মিসরের ইতিহাস মিসরীয় ও ফারটাইল ক্রিসেন্টের জনগণের ব্যবধান আরও বিস্তৃত করে। অতএব মিসরের বুদ্ধিজীবী সমাজ ও রাজনৈতিক কর্মীদের পক্ষে নিজদিগকে পৃথক জাতি হিসাবে চিন্তা করা সহজতর হয়। মুহাম্মদ আলীর সংস্কারের ফলে ইউরোপীয়দের সঙ্গে যে সম্পর্ক

স্থাপিত হয় তখন তাহাদের পক্ষে ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ গ্রহণ করা সহজ হয়। "মিসর মিসরীয়দের"—এই ধ্বনি মিসরে উঠে ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে অথচ ইহার সহিত "সিরিয়া সিরিয়াদের" ব "ইরাক ইরাকীদের" এই ধরনের কোন ধ্বনি উত্থিত হয় নাই।

অপরদিকে ইসলামী শিক্ষার সর্ববৃহৎ কেন্দ্র হিসাবে অতি প্রভাবশালী কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইহার আফগানী ও আবদুহর ন্যায় শিক্ষকগণ ইসলামের দাবীসমূহ ঘোষণা করেন। তদুপরি ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অন্য যে কোন অংশের চেয়ে যেহেতু মিসরে স্বাধীনতা অধিক তাই সিরিয়া ও লেবাননের বহু লেখক কায়রোতে চলিয়া যান এবং তাহাদের পত্রপত্রিকা সেখান হইতে প্রকাশ করেন। তাই মিসর ওসমানীয় সাম্রাজ্যে বিদ্যমান সমস্ত প্রকার আন্দোলনের পীঠস্থানে পরিণত হয়। সেখানে প্যান-ইসলামীগণ যেরূপ কাজ করিবার সুযোগ পায় অনুরূপ প্যান-আরবীয়গণও সুযোগ পায়। মুসলিম ঐতিহ্যবাদীগণও স্থান লাভ করে, ধর্মনিরপেক্ষগণও বিরাজ করে। এমন মিসরীয়ও সেখানে বিদ্যমান যাহারা নিজদিগকে "জাতি" হিসাবে বিবেচনা করে এবং অন্যদের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্পর্ক নাই মনে করে, যদিও তাহারা আরবী ভাষায় কথা বলে, অথবা মুসলমান অথবা উভয়ই। ব্যাপারটি আরও ঘোরালো মনে হয় যখন দেখা যায় প্যান-ইসলামীগণ, প্যান-আরবীগণ ও মিসরীয় জাতীয়তাবাদীগণের প্রত্যেকের পরস্পরের সহিত বিভিন্ন প্রকারের সম্পর্ক অথবা ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতি অনুরূপ আনুগত্য বিদ্যমান।

মিসরের অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং পরবর্তী বিদেশী মহাজনদের প্রাধান্য অনেক কিছু আনয়ন করে এবং তৎসঙ্গে হিজব আল-ওয়াতানিয়া নামে জাতীয় দলও আনয়ন করে—যাহার পরে আরবী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই বিদ্রোহের অন্তর্নিহিত আদর্শের সহিত একমত না হইলেও আবদুহ ইহাতে যোগদান করেন। তাহাদের উভয়কে দোষীসাব্যস্ত করা হয় ওসমানীয় বা আরব বা এমনকি মুসলমান হিসাবেও নহে বরং মিসরীয় হিসাবে। একজন মুসলমান (আবদুল্লাহ নাদিম), একজন খ্রীস্টান (আদিব ইসহাক) ও একজন ইহুদী (ইয়াকুব সানু) "জাতীয়" অর্থাৎ মিসরীয় ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

পরবর্তীকালে বৃটিশগণ জয়লাভ করিলে ও শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করিলে অনেকেই নতুন সিভিল সার্ভিসে যোগদান করে, আবার আবদুহুর ন্যায় অন্যান্যগণ শিক্ষার উন্নতি এবং অন্যান্য সংস্কারে মনোনিবেশ করেন। এক নতুন পুরুষের আগমন ঘটে যাহারা বৃটিশের আগমনের পূর্বে বিদ্যমান মিসরের অবস্থা সম্পর্কে অবগত নহে। তাহাদের মতে বৃটেন মিসরকে দেউলিয়া অবস্থা হইতে উদ্ধার করে নাই বরং ইহা শাসন চাপাইয়া দেওয়া একটি বিদেশী শক্তি। স্বভাবতঃই বৃটিশ মনোভাব এই যুবকদিগকে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করে। লর্ড ক্রোমার ও অন্যান্যদের মাধ্যমে বৃটিশ ব্যক্ত করে যে মিসর জাতি নহে, তাই মুসলমান হউক বা অমুসলমান হউক দেশপ্রেম বুঝিবার ক্ষমতা তাহাদের নাই। অপরপক্ষে ক্রোমার বলেন, মিসরের বিভিন্ন জাতিগুলিকে একত্রিত করিয়া "একটি আত্মনিয়ন্ত্রণকারী সংস্থায়" পরিণত করা সম্ভব। কিন্তু এই ধরনের আদর্শ "লাভ করিতে কয়েক বৎসর—সম্ভবতঃ কয়েক পুরুষ লাগিবে ..।" অবশ্য পরোক্ষ অর্থ হইল, বৃটিশ কয়েক বৎসর—সম্ভবতঃ কয়েক পুরুষ মিসরে অবস্থান করিবে —যতক্ষণ না সেই লক্ষ্য অর্জিত হয়।

মিসর যে একটি জাতি নহে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করেন মুস্তফা কামিল (১৮৭৪—১৯০৮ খ্রীঃ)। তিনি প্রমাণ করেন যে ইহা একটি জাতি। তিনি একজন বিতর্কমূলক ব্যক্তি। কাহারও মতে তিনি একজন নেতা আবার কাহারও মতে তিনি একজন প্রতারক। ৩৪ বৎসর বয়সে তাঁহার অপরিণত মৃত্যুর ফলে তিনি তাঁহার স্বদেশবাসীর মনে একজন প্রকৃত নেতার আসন লাভ করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে মিসর একটি জাতি কিন্তু ব্যাপক আকারের, যাহা একাধারে ওসমানীয়, মুসলিম ও প্রাচ্যদেশীয়। তবে আপাততঃ মিসরীয়গণ কর্তৃক তাহাদের জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করা পর্যন্ত শেষোক্ত তিনটিকে অপেক্ষা করিতে হয়। বৃটিশদিগকে মিসর হইতে বাহির করিবার জন্য একসময় তিনি ফরাসীর সাহায্য কামনা করেন এবং তাই ফরাসী কর্তৃক আলজিরিয়া অধিকারে তিনি বাধা প্রদান করেন নাই। তিনি এবং আরও অনেক মিসরীয় আরবীবাদের সমালোচনা করেন এবং বিশেষতঃ সিরিয়দিগকে অপছন্দ করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে জাতীয়তার ভিত্তি ভাষা, ধর্ম বা গোত্রীয় বংশ নহে বরং দেশ। মিসরীয়গণ

যদি বলিতে পারে "মিসর আমার দেশ" তবেই মিসর একটি জাতি হইতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মিসরে তিনটি দল গঠিত হয়। প্রথম পিপল্‌স্ (উম্মা) পার্টি, যাহার সদস্যভুক্ত থাকেন আবদুহু ও তাঁহার বন্ধুগণ, যাঁহারা প্যান-ইসলামবাদী হিসাবে প্রথমতঃ মুসলমান, দ্বিতীয়তঃ মিসরীয় এবং তৃতীয়তঃ ওসমানীয় ও আরব। দ্বিতীয় দল কন্স্টিটিউশনাল রিফর্ম পার্টি (Constitutional Reform Party)। ইহা বৃটিশের আশীর্বাদ লইয়া খেদিভের বন্ধুবর্গ প্রতিষ্ঠা করে এবং এই দলের উদ্দেশ্য হইল পূর্বাবস্থা বজায় রাখা। তৃতীয় দল হইল কামিল পরিচালিত ন্যাশনাল পার্টি। ইহাদের মতে মিসরের আসন সর্বপ্রথম এবং ইসলাম ও ওসমানীয়বাদের আসন পরে। ন্যাশনাল পার্টির আদর্শই শেষ পর্যন্ত টিকিয়া থাকে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় র্ধ পর্যন্ত মিসরীয় জাতীয়তাবাদের মূলমন্ত্র হিসাবে মিসরীয়-বাদই সক্রিয়ভাবে কাজ করে।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

পারস্যের জাগরণ

মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে আরবগণ কর্তৃক বিজিত জাতিগুলির মধ্যে পারস্যবাসীগণই একমাত্র প্রধান অংশ যাহারা জাতি হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সক্ষম হয়। ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, পারস্য-বাসীগণ প্রায় সর্বদাই নিজদিগকে পৃথকভাবে রাখিয়াছে। সত্য হউক বা মিথ্যা হউক, তাহারা নিজদিগকে অন্যান্য মুসলমানগণ হইতে পৃথক মনে করে বলিয়া শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া তাহারা অন্যান্যদের বিরাগভাজন হয়। পৃথক জাতি হিসাবে তাহারা নিজদিগকে প্রকাশ করে কখনও ধর্মীয়ভাবে যথা প্রাথমিক আব্বাসীয় যুগে 'ব্লাকশার্ট', 'হোয়াইট শার্ট', 'রেডশার্ট' বিদ্রোহের দ্বারা।[১] কখনও ইহা প্রকাশ করে সাহিত্যের মাধ্যমে, যথা শুবিয়া আন্দোলন ও ফেরদৌসীর কবিতার দ্বারা।[২] ইহা কোন কোন সময় রাজনৈতিকভাবেও প্রকাশ করা হয়, যথা সফারীয়, সামানীয় ও অন্যান্য-দের আংশিক সফল বিদ্রোহের দ্বারা। ইহারা পরে স্বায়ত্বশাসিত ক্ষুদ্র রাজ্যসমূহ প্রতিষ্ঠা করে। কখনও ইহা প্রকাশ করা হয় সাংস্কৃতিকভাবে যথা মোঙ্গল যুগে পারস্যবাসীগণ কর্তৃক আরবীভাষী লোকজন হইতে পৃথক তাহাদের নিজস্ব একটি সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিবার দ্বারা।

পারস্যবাসীগণ নিজদিগকে বিশেষ বা অদ্বিতীয় মনে করিলেও তাহারা অন্ততঃপক্ষে মুসলিম বিশ্বের মধ্যে বা ইহার অংশ হিসাবে বিরাজ করে। তাহারা ইসলাম সম্প্রদায়ের (উম্মা) বিভিন্ন কার্যাবলীতে অংশ গ্রহণ করে। পারস্যবাসীগণ সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ আরবী ভাষার ব্যাকরণ লেখে,

---

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃ: ৭৯, ৮১।

২। উপরে দ্রষ্টব্য পৃ: ৮২।

যদিও তাহারা এ ভাষা বলিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। একটি ধারাবাহিক ইসলামী ধর্মতত্ত্ব লিখিবার ব্যাপারে তাহাদের বিশেষ অবদান থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে তাহারা ইহা পালন করিতে অস্বীকার করে। ইসলামের ইতিহাসে তাহারা ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করে এবং ভাবী বংশধরদের জন্য ইহা লিপিবদ্ধ করে—কিন্তু যেভাবেই হউক তাহারা নিজদিগকে ইহার অংশ বলিয়া মনে করে না। সাধারণভাবে পরিচিত 'ইসলামী' এবং ভুলক্রমে পরিচিত 'আরব' সংস্কৃতির শিল্পকলা, সাহিত্য, দর্শন, চিকিৎসাবিদ্যা, গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থ বিদ্যা, ইতিহাস, ভূগোল ও ধর্মতত্ত্বের বিষয়ে পারস্যবাসীদের অবদান অনেক বেশী। তাহাদের কবি ও স্থাপত্য শিল্পীদিগকে ভারতবর্ষে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তাহাদের শিল্পকলা ওসমানীয়দের মসজিদ ও ভবনসমূহের শোভা বর্ধন করে। ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে ষষ্টদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুল হইতে দিল্লী পর্যন্ত অধিকাংশ শিল্পকলা ছিল পারস্য এবং সংস্কৃতির লক্ষণ ছিল ফার্সী ভাষায় কথা বলার মধ্যে।

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য এই কথা ব্যক্ত করা যে, পারস্যবাসীগণ আরব অথবা তুর্কী হইতে শুধু পৃথক নহে বরং তাহারা এই পার্থক্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ, যাহা তাহাদিগকে নিন্দনীয় করিয়া তোলে এবং এই গর্বের জন্য তাহাদিগকে কঠোরভাবে শাসন করা হয়। সাফাভীয় যুগে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসাবে শীয়া মতবাদ গ্রহণ করা হইলে পারস্যবাসীগণ আরও কোণঠাসা হইয়া যায়। সাফাভীয় যুগে ইরান ও বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশসমূহের মধ্যে ব্যাপক বাণিজ্যিক রাজনৈতিক সম্পর্ক বজায় থাকিলেও কোন সাংস্কৃতিক মতবিনিময় হয় নাই। সাংস্কৃতিক দিক হইতে ইরান অমুসলিম বিশ্ব হইতে পৃথক থাকে এবং শীয়া মতবাদ গ্রহণ করিবার ফলে তাহারা বাকী মুসলিম জাহান হইতেও পৃথক হইয়া যায়। ইরান ইসলামী বিশ্বের মধ্যেই থাকে কিন্তু কিছুতেই ইহার অংশ হিসাবে নহে। সাফাভীয় ও অন্যান্য শাহ্‌দের ক্ষমতা যতই কমিতে থাকে শীয়া উলামাদের প্রভাব ততই বাড়িতে থাকে এবং পরিণতিতে ইরান সম্পূর্ণভাবে একঘরে হইয়া যায়। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ইরানে সংঘটিত বিভিন্ন আন্দোলন এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝা যায়। এইসব আন্দোলন পারস্যবাসীদের

চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত প্রাচীর ধ্বংস করিবার চেষ্টা করে। ইরানের আফগানী উৎসাহিত প্যান-ইসলামী দলের মূল উদ্দেশ্য ছিল আভ্যন্তরীণ প্রাচীর ধ্বংস করা যাহা পারস্যের শীয়াদিগকে বাকী মুসলমান হইতে পৃথক করিয়াছে। "শাসনতন্ত্রবাদীদের" উদ্দেশ্য হইল, ইরানকে বাকী পৃথিবী হইতে আলাদাকারী সেই প্রাচীর ধ্বংস করা। সব ক্ষেত্রেই বিপুল সংখ্যক শীয়া উলামা ও তাঁহাদের শিষ্যগণ এই উভয় প্রাচীরকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন।

পারস্যবাসীগণ যে কঠোর স্বাতন্ত্র্য গড়িয়া তোলে তাহা ১৯০০ খ্রীস্টাব্দের দিকে তাহাদের জাতি গঠনের কাজে সহায়তা করে। সেই দশম শতাব্দীতে ফেরদৌসী এই মনোভাব ব্যক্ত করেন, "ইরান না থাকিলে আমার বাঁচিবার সার্থকতা নাই।" মধ্যপ্রাচ্যের জাতীয়তাবাদের উনবিংশ শতাব্দীর তুর্কী লেখক শামক কামালকে আধুনিক মতে ভাতান, বা পিতৃ-ভূমি ব্যবহারের জন্য প্রশংসা করা হয়; অথচ পারস্য কবি সাদীকে (মৃঃ ১২৯১ খ্রীঃ) আমরা 'পিতৃভূমির ভালবাসা' বা হোব্ব এ-ভাতান প্রবাদ দ্বারা এমন এক ভাবের সমালোচনা করিতে দেখি যাহা সম্পূর্ণ আধুনিক। তিনি বলেন "ওহে সাদী। ভাতানের ভালবাসা একটি মহৎ মনোভাব। কিন্তু কেউ (ইহার জন্য) বিপন্নভাবে মরিতে পারে না, কারণ সেখানেই তাহার জন্ম।"

এইসব মনোভাবকে "জাতীয়তাবাদ" হিসাবে চিহ্নিত করা ভুল বলিয়া বিবেচনা করা হয়, অথচ ইহাকে কি নামে অভিহিত করা হইবে তাহাও সঠিক বলা যায় না। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হইল পারস্যবাসীগণ পাশ্চাত্যের নিকট হইতে ধার করিয়া আধুনিক জাতীয়তাবাদ গড়িয়া তোলে এবং তৎসঙ্গে তাহারা তাহাদের নিজস্ব জাতীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয় সম্পর্কেও সজাগ থাকে। তুর্কী ও আরবী-ভাষী লোকদের পক্ষে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে ইসলাম, ওসমানীয়বাদ, আরবীবাদ ও তুরানীবাদের খাপ খাওয়ানো মুশকিলের ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পারস্যবাসীদের এইরূপ কোন অসুবিধা ছিল না। উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে তুর্কী ও আরবীগণ, বিশেষতঃ আরবগণ এখনও, যেখানে স্বাতন্ত্র্যের খোঁজে ব্যস্ত, সেখানে পারস্যবাসী-গণ ইতিমধ্যেই সেই স্বাতন্ত্র্য গঠন করিয়া লইয়াছে।

বাবী-বাহাইজম (Babi-Bahaism)

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা সুন্নী ইসলামের একটি দেশীয় সংস্কার আন্দোলন হিসাবে ওয়াহাবীবাদ আলোচনা করিয়াছি। বাবী-বাহাইজম শীয়া ইসলামের একটি দেশীয় সংস্কার আন্দোলন। স্বাতন্ত্র্যের প্রাচীর ধ্বংস করিবার ব্যাপারে ইহার যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। বাবিজম একটি খাঁটি ইরানী ও শীয়া আন্দোলন এবং কোন বিদেশী প্রভাব ইহাতে নাই, অথচ বাহাইজমের মধ্যে বিদেশী প্রভাব বিদ্যমান।

বাবী-বাহাইজম দ্বাদশ শীয়া ইমামতের অন্তর্ভুক্ত শেখী ধর্মমতের একটি শাখা। ইহাদের মতানুসারে দ্বাদশ ইমাম, যিনি লুক্কায়িত এবং একদিন আত্মপ্রকাশ করিবেন, এক ব্যক্তির মাধ্যমে বিশ্বাসীদের সহিত সম্পর্ক রক্ষা করেন, এবং সেই ব্যক্তিটিকে বলা হয় বাব অথবা দরজা। ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দে শেখী দলের নেতা, দক্ষিণ ইরানের শিরাজ নগরীর মীর্জা আলী মুহাম্মদ (১৮২১—১৮৫০ খ্রীঃ) নিজেকে বাব বলিয়া দাবী করেন। পরে তিনি ঘোষণা করেন যে তিনিই "ঐশীবাণীর স্থল" এবং স্বয়ং লুক্কায়িত ইমাম। তিনি স্বয়ং লুক্কায়িত ইমাম বলিয়া দাবী করিয়াছিলেন কি না তাহা সঠিক বলা যায় না, কারণ বায়ান নামক তাঁহার গ্রন্থে বাব অতীন্দ্রিয় শব্দাবলী ব্যবহার করেন, নিজেকে একটি আয়না বলিয়া অভিহিত করেন এবং তাঁহার সম্পর্কে বলেন, "যাহাকে আল্লাহ প্রকাশ করিবেন।" তবে ইহা সুনিশ্চিত যে তিনি মনে করেন, তিনি একটি নতুন যুগ এবং নতুন বর্ষপঞ্জী সম্বলিত একটি নতুন রাজ্য স্থাপন করিতেছেন যাহাতে ৯ ও ১৯ সংখ্যাদ্বয়ের কিছু অতীন্দ্রিয় গুণাবলী রহিয়াছে।

দেশের সমগ্র অঞ্চলে এই দাবীর অনুসারী পাওয়া যাইবার অর্থ এই যে, জনসাধারণ উলামা ও দেশের সাধারণ অবস্থার প্রতি বীতশ্রদ্ধ। অধিকাংশ ইসলামী আন্দোলনের ন্যায় বাবীগণ অস্ত্রধারণ করে এবং নতুন রাজ্য গঠনে উদ্যোগী হয়। শীঘ্রই দক্ষিণ ইরানের কেরমান ও ইয়াজ্‌দ্ তাহাদের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়। ইহা দক্ষিণাঞ্চলীয়দের বিরুদ্ধে উত্তরাঞ্চলীয়দের বা এই ধরনের কোন আন্দোলন নহে যেরূপ জনৈক ঐতিহাসিক দাবী করিয়াছেন। কারণ ইহার একটি কেন্দ্র স্থাপিত হয় কাস্পিয়ানের তীরে অবস্থিত বারফরোসে এবং আরেকটি ঘাঁটি প্রস্তুত করা হয় উত্তর-পশ্চিম ইরানের

জান্‌জানে। শাহ ইহাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং উলামাগণ ইহার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালান, কিন্তু আন্দোলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। দেশের অনেক স্থানে যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং জানজানের বা'বীগণ একটি অবরোধ এক বৎসর পর্যন্ত প্রতিহত করে।

বা'ব স্বয়ং বন্দী হন এবং পরে পারস্য সরকারের একটি ফায়ারিং স্কোয়াডের হাতে তাব্রিজে নিহত হন। তাঁহার দুইজন অনুসারী বা'ব হত্যার প্রতিশোধ স্বরূপ পারস্য শাহ নাসির আল-দীন শাহকে হত্যার চেষ্টা করে। ইহার প্রতিশোধে ব্যাপক ধরপাকড় ও অত্যাচার আরম্ভ হয়। বা'বীগণ কবিতা আবৃত্তি করিতে করিতে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইবার সময় যে সাহসিকতা, দৃঢ়তা ও স্বার্থহীনতা প্রদর্শন করে তাহা ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে ইহার নেতাদের শিক্ষার চেয়ে অধিক কার্যকরী বলিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।

বা'বের মৃত্যুদণ্ডের পর বা'বীদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে থাকেন উত্তর ইরানের মাজান্দারানের দুইজন বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। ইহাদের একজন ইয়াহইয়াকে বা'ব এই দলের নেতা বলিয়া মনোনয়ন দান করেন। এবং সোব্‌হ্‌-এ-আজল বা "অনন্ত প্রভাব" উপাধি প্রদান করেন। অন্যজন হোসেন আলীকে বাহাউল্লাহ বা "আল্লাহর শোভা" উপাধি দেওয়া হয়। উভয় ভ্রাতাসহ অসংখ্য বা'বীদিগকে ওসমানীয় সাম্রাজ্যে নির্বাসিত করা হয়। ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দে বাহাউল্লাহ দাবী করেন যে, তিনি "সেই ব্যক্তি যাহার মধ্যে খোদা আত্মপ্রকাশ করিবেন" যেরূপ বা'ব ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। ইয়াহইয়া এই দাবীর নিকট মাথা নত করে নাই এবং এই দুই দলের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষের সুযোগে ওসমানীয় সরকার এই দুই ভ্রাতাকে পৃথক করিয়া ফেলে। সোব্‌হ্‌-এ-আজলকে সাইপ্রাস এবং বাহাউল্লাহকে প্যালেস্টাইনের আক্কায় নির্বাসিত করা হয়।

তবে বাহাউল্লাহ এই সংঘর্ষে জয়লাভ করেন এবং বাহাইজম বা'বীজমের স্থান দখল করে। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দে বাহাউল্লাহর মৃত্যুর পর বাহাইদের মধ্যে আরও যে সব মতবিরোধ হয় এবং পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে কেন্দ্র লইয়া যে "বাহাই বিশ্ব ধর্ম" জন্মলাভ করে তাহা এই কাহিনীর অংশ নহে।[১]

১। যুক্তরাষ্ট্রে এই ধর্মের কেন্দ্রস্থল ইলিওনিসের ইউলমেটে অবস্থিত তাহাদের নয় পার্শ্ববিশিষ্ট ধর্ম-মন্দির একটি সুপরিচিত নিদর্শন।

বা'বীজম ইরানে একটি জাতীয় ধর্মীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছিল কিনা, তাহা সঠিক বলা যায় না। তবে বাহাউল্লাহ, বিশেষতঃ তাঁহার পুত্র আবদুল বাহার নেতৃত্বে বাহাইজম আন্তর্জাতিকতার প্রতি বেশী আকৃষ্ট হইয়া যায় এবং ফলে ইরানের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা পারস্যের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবগুলির প্রতি তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। শীয়া ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ যাঁহারা বাহাইজম ও পাশ্চাত্যকরণের বিরোধী ছিলেন তাঁহারা এই দুইটির একটিকে অপরটি হইতে পৃথকভাবে দেখেন। তাঁহারা বাহাইজমের বিরোধিতা করেন কারণ ইহা নতুন মতবাদ প্রচার করে এবং তাঁহারা যেকোন নতুন জিনিসকে "বাহাই" বলিয়া প্রত্যাখ্যান করেন। বাহাইগণ পাশ্চাত্যকরণের প্রতি তেমন উৎসাহী না হইলেও তাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং সমস্ত আধুনিক ভাবধারার জন্য তাহাদিগকে দায়ী মনে করা হয়। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, পারস্যের বাহাইগণ নতুন ভাবধারার প্রতি উৎসাহী, যদিও তাহারা ইহার মূল উদ্যোক্তা নহে। অবশ্য প্রথম মহাযুদ্ধের পর বাহাইজম ইহার নতুন দৃষ্টিভঙ্গী হারাইয়া ফেলে এবং ইহার আধুনিককরণের প্রভাব তিরোহিত হয়। ইরানে বাহাইদের সংখ্যা নিরূপণ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার, কারণ ১৯৫৩ পর্যন্ত ইহাদিগকে দমন করা হয়। তাহাদের কোন আইনসম্মত মর্যাদা ছিল না।

ইরানে আফগানী

প্যান-ইসলামী আদর্শ সর্বাঙ্গীনভাবে ইরানের ন্যায় শীয়া দেশে জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই। সুন্নীদের দূষিত প্রভাব হইতে নিজস্ব ইসলামকে পৃথক রাখিবার জন্য পারস্যের উলামাগণ ইহা প্রত্যাখ্যান করেন। অবশ্য অতি জোরালো ও ধুরন্ধর ব্যক্তি বিধায় প্যান-ইসলামী আফগানীর স্বল্প সংখ্যক অনুসারী ইরানের শাহের সন্নিকটে কাজ করিয়া যায়। তাঁহার সক্ষম বয়ঃকালে আফগানী মাত্র দুইবার ইরান গমন করেন। উভয় বারই তিনি তেহরানের এক ধনী ব্যবসায়ীর আতিথ্য গ্রহণ করেন। তাঁহার অধিকাংশ সাক্ষাৎপ্রার্থী সাধারণ লোক, আলেম নহে। উভয় বারে তিনি নাসির আল-দীন শাহের সাক্ষাৎ লাভ করেন।

আফগানী প্রথম ইরান সফর করেন ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে। তাঁহার তিরস্কারমূলক কথাবার্তা শাহ ও তাঁহার পরিষদবর্গকে এমন রাগান্বিত করে যে শীঘ্রই তাঁহাকে দেশ হইতে বাহির করিয়া দিবার জন্য তাঁহার নিমন্ত্রণকারী হাজী আমিন আল-জারব-এর প্রতি আদেশ দেওয়া হয়। আমিন অতঃপর আফগানীকে লইয়া রাশিয়া গমন করেন। ১৮৮৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার তৃতীয় ইউরোপ সফরের সময় শাহ মিউনিখে আফগানীর সাক্ষাৎ লাভ করেন। আফগানী দাবী করেন যে, একটি বিশেষ কার্যোপলক্ষে তাঁহাকে রাশিয়া প্রেরণ করা হয়। শাহ তাঁহাকে কাজ শেষ হইলে ইরানে ফিরিয়া যাইতে বলেন। আফগানীর স্বীয় বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি কুখ্যাত প্রধানমন্ত্রী আমিন আল-সুলতানের স্বপক্ষে পিটার্স'বার্গ গমন করেন। উদ্দেশ্য হইল করুণ নদী ও ইহার তীরবর্তী এলাকায় নৌ-চলাচলের জন্য গ্রেটব্রটেনকে যে অনুমতিপত্র প্রদান করা হয়, রুশদিগকেও অনুরূপ অনুমতি দান করিবার বিষয়ে রুশদিগকে নিশ্চয়তা প্রদান করা। ইরানের পক্ষে ক্ষতিকর এরূপ একটি কাজে যাইতে আফগানীর সম্মত হওয়া রাজনৈতিক উস্কানিদাতা হিসাবে তাঁহার সুবিধাবাদের পরিচায়ক। অপরদিকে আফগানীর পরিচয় জানা সত্ত্বেও শাহ তাঁহাকে পুনরায় ইরানে আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিবার দ্বারা সম্ভবতঃ তাঁহার মনের হতবুদ্ধিতাই প্রকাশ পায়।

দ্বিতীয় সফর প্রথমটির মতই। সম্ভবতঃ আফগানী পুনরায় ওসমানীয় খলিফার অধীনে ইরানকে স্বায়ত্বশাসন প্রদান সহকারে ইসলামের একতার পরিকল্পনার উপর জোর দেন। এইবার শাহ এতই রাগান্বিত হন যে, আফগানী নিজেকে নির্বাসন হইতে রক্ষা করিবার জন্য নিকটস্থ শাহ আবদুল আজিমের মাজারে আসন বা বাস্ত গ্রহণ করেন। অনতিকাল পরে তাঁহাকে জোরপূর্বক ইরান হইতে বহিষ্কার করা হয়।

১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে যে বৎসর আফগানীকে বহিষ্কার করা হয় সে বৎসরই একটি বৃটিশ কোম্পানীকে কুখ্যাত তামাক অনুমতিপত্র প্রদান করা হয়।[১] সম্ভবতঃ যেহেতু অধিকাংশ পারস্যবাসী ধূমপায়ী তাই এই অনুমতিপত্র দ্বারা সমগ্র দেশে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। অথচ আফগানী এই ব্যাপারে মুখ খোলেন নাই। উলামাদের মতে এই অনুমতিপত্র তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্যের

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ২২৬।

প্রাচীরে আরেক ভাঙ্গন। আফগানীর কোন সহযোগিতা ছাড়াই তাঁহারা অনুমতিপত্রের বিরুদ্ধে দাঙ্গা বাঁধায়। শাহ কর্তৃক তিরস্কৃত হইবার পর তাঁহার বিরুদ্ধে আফগানীর ঘৃণা এত প্রবল আকার ধারণ করে যে তিনিও উলামাদের সঙ্গে হাত মিলান ; অথচ ইহার পূর্বেও তিনি উলামাদের বিরোধিতা করেন। শাহ এবং অনুমতিপত্রের বিরোধিতা করিয়া তিনি সামাররা ও শিরাজের মুজতাহিদদের নিকট পত্র লেখেন। একটি পত্র তিনি লেখেন হাজী মীর্জা মুহাম্মদ হাসান শিরাজীর নিকট, তিনি ধূমপানের বিরুদ্ধে প্রসিদ্ধ ফতওয়া জারী করেন। এই চিঠির ফলেই তামাক ধর্মঘটের জন্য, পরে পারস্যের পুনর্জাগরণের জন্য এবং পরবর্তী ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের বিপ্লবের জন্য আফগানীর প্রশংসা করা হয়। অনুমতিপত্রের পরাজয়ের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে সম্মিলিত কর্মপন্থার দ্বারা পারস্যবাসীগণ শাহের ক্ষমতা হ্রাস করিতে সক্ষম। ফলে ইহা শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে পরিণত হয়।

যাহা হউক, আফগানী ইস্তাম্বুল গমন করেন এবং তাঁহার শাহ-বিরোধী কার্যকলাপ চালাইয়া যান। ইরানের প্যান-ইসলামী দল ছিল খুবই ছোট এবং কেরমানের একজন কবি শেখ আহমদ রুহী ইহার নেতৃত্ব দান করেন। নাসির আল-দীন শাহকে তিরস্কার এবং "ইসলামের সুলতান" হিসাবে আবদুল হামিদের প্রশংসাকারী তাঁহার কবিতার দ্বারা ইসলামের একতার জন্য আফগানীর পরিকল্পনা এবং সেই একতায় ইরানের মর্যাদা সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। পরবর্তীকালে কেরমানের মীর্জা রেজা নামক আফগানীর একজন প্যান-ইসলামী শিষ্য ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে নাসির আল দীন শাহকে হত্যা করে।

পাশ্চাত্যের প্রভাব

পাশ্চাত্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রত্যক্ষভাবে এবং তুরস্ক ও ভারতবর্ষের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ইরানের স্বাতন্ত্র্য ভঙ্গ করা হয়। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের ন্যায় পারস্যের প্রথম ঋণ হয় সামরিক সাজ-সরঞ্জামে ও প্রশিক্ষণে। ফতেহ আলী শাহের (১৭৯৭—১৮৩৪) রাজত্বকালে এবং রুশ-পারস্য যুদ্ধের সময় বিদেশী অফিসারবর্গ পারস্য-সৈন্য পরিচালনা করেন, কিন্তু নাসির আল-দীন

শাহের সুচতুর প্রধান উজীর মীর্জা তকী খানই শক্তিশালী ভিত্তিতে আধুনিকতা আনয়ন করেন।

আমীর-এ-কবির নামে সাধারণতঃ পরিচিত এই উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিটি মুহাম্মদ শাহের সুদক্ষ উজীর কায়েম মাকামের এক বাবুর্চী ও আর্দালীর পুত্র। নাসির আল-দীন যখন শাহজাদা ও আজার বাইজানের গভর্ণর, তখন আমীর-এ-কবির তাঁহার প্রধান অফিসার হিসাবে এত ঘনিষ্ঠ ছিলেন যে শাহজাদার ভগ্নীকে বিবাহ করিবার যোগ্যতা তিনি অর্জন করেন। ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে নাসির আল-দীন অভিষিক্ত হইবার সময় মীর্জা তকী খানকে প্রধান উজীর বানানো হয়। তাঁহার তিন বৎসরের সংক্ষিপ্ত গদীনসীন সময়ে ইরানকে আধুনিকতার প্রতি পরিচালনা করিবার ব্যাপারে তিনি যে কোন ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশী অবদান রাখিয়া যান। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের তাঞ্জিমাত সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল ছিলেন এবং তাঁহার পিটার্সবার্গ সফরের সময় তিনি অনেক কিছু লক্ষ্য করেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গীতে সংস্কার সাধনের মাধ্যমেই ইরানের মুক্তি নিহিত।

তিনি সরকার পুনর্গঠিত করেন, ইউরোপের সহিত ব্যবসাবাণিজ্যের সুযোগ দান করেন, বাজার ও মাল গুদামসমূহ নির্মাণ করেন এবং সেনা-বাহিনী পুনর্গঠন করেন। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব সম্ভবতঃ ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে দার-আল-ফনুন বা কলা ও বিজ্ঞান গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা, যাহা পরবর্তী-কালে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। এই কেন্দ্রে ইউরোপ হইতে শিক্ষক আনা হয়। যাহারা পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, ইতিহাস ও কারিগরিবিদ্যা শিক্ষাদান করেন। কিন্তু আমীর-এ-কবিরকে এই পদে থাকিতে দেওয়া হয় নাই। তাঁহার শক্তিশালী শত্রু ছিলেন উলামাগণ, যাঁহাদের অতি কার্যক্ষম বন্ধু ছিলেন সম্রাজ্ঞীমাতা। পুত্রের উপর তিনি যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেন এবং জামাতার মারাত্মক শত্রুতে পরিণত হন। ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দের শেষ নাগাদ মীর্জা তকী খানকে বরখাস্ত করা হয় এবং এক বৎসর পর কাশানে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। একমাত্র ব্যক্তি যিনি শেষ পর্যন্ত তাঁহার পার্শ্বে থাকেন তিনি হইলেন তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী, শাহের একমাত্র ভগ্নী।

ছাত্রদের মাধ্যমেও ইরানে পাশ্চাত্য প্রভাব আসে। এইসব ছাত্র

সেই ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দ হইতে ইউরোপ সফর করেন। দেশে ফিরিয়া তাঁহারা শিক্ষক, পত্রিকা প্রকাশক, অনুবাদক ও গ্রন্থকার হন। ইরানে প্রথম পত্রিকা প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক সরকারী গেজেট হিসাবে আমীর-এ-কবির দ্বারা। নিষেধাজ্ঞার ফলে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা দেশের বাহিরে প্রকাশিত হয় এবং চোরাচালানের মাধ্যমে দেশে আসে। দুইটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকার মধ্যে একটি হইল আখতার (তারা), যাহা ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দ হইতে ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত হয়। রুহীর[১] প্রভাবে এই পত্রিকা কিছুকাল যাবত প্যান-ইসলামী আদর্শ প্রচার করে, কিন্তু পরে ইহা পাশ্চাত্য ভাবধারার উদ্যোক্তা হয় এবং ইরানে খুব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আরেকটি পত্রিকা কানুন (আইন), ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডনে প্রকাশিত হয়। ইহার সম্পাদক মলকম খান, নাসির আল-দীন শাহের অতি ঘনিষ্ঠ এবং ইংল্যাণ্ডে তাঁহার দূত হিসাবে কাজ করেন। কিন্তু মলকমের প্রগতিশীল ভাবধারা শাহ সহ্য করিতে পারেন নাই, কারণ পাশ্চাত্যকরণের মধ্যে তিনি তাঁহার বিপদ দেখিতে পান এবং তাই জনগণকে তিনি এতই অজ্ঞ রাখেন যে তাহারা জানিত না, স্বয়ং শাহের ভাষায়, "ব্রাসেলস্ একটি শহরের নাম না কি এক ধরনের বাঁধাকপি।" মলকম খান সহজ ফার্সী ভাষায় সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় লেখেন। তিনি সর্বদা আইনের শাসনের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বর্ণমালা পরিবর্তন করিতেও চেষ্টা করেন এবং ইরানে ফারামুশখানা বা "ক্ষমাগৃহ" প্রবর্তন করেন।

পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে পুস্তক প্রকাশনা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কলা ও বিজ্ঞান গবেষণাগার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক, কারিগরি ও সমাজবিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকের অনুবাদ ও প্রকাশনার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। আজার বাইজানের আবদুর রহমান তালেবফ এবং জয়নুল আবেদীন মারাঘেই নামক দুইজন ব্যবসায়ী ও গ্রন্থকার বিপ্লবের উপর প্রত্যক্ষ প্রভাব বিস্তার করেন। ককেশাশে বহুদিন বসবাসকারী তালেবফ রসায়নবিদ্যার ও পদার্থ বিদ্যায় উৎসাহী ছিলেন এবং এইসব বিষয়ের ন্যায় সমাজবিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতি বিষয়াদির উপর তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার একটি

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ২২৬।

অতি জনপ্রিয় গ্রন্থের নাম আহমদ। ইহা এক পিতা ও তাহার পুত্র আহমদের মধ্যে কথোপকথন। একটি শিশুর সাধারণ ভাষায় পিতা ইউরোপের উন্নতি ও ইরানের অবনতির কথা আলোচনা করে।

আহমদের চেয়েও অধিক জনপ্রিয় গ্রন্থ হইল মারাঘেরী রচিত "ইব্রাহীম বে'র ভ্রমণ বৃত্তান্ত"। ইব্রাহীম কায়রোতে বসবাসকারী এক পারস্যবাসী ব্যবসায়ীর পুত্র। ইরান কিরূপ তাহা সে দেখিতে যায়। তাহার বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও যোগাযোগের মাধ্যমে জনগণের দুঃখদুর্দশা, পুরোহিত শ্রেণীর শঠতা এবং কর্মকর্তাদের নিষ্ঠুরতা প্রকাশ পায়। এই গ্রন্থ জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যাহারা পড়িতে পারে তাহারা ইহা নিজেরা পাঠ করে এবং অন্যদেরকে চায়ের দোকানের আসরে পড়িয়া শোনায়।

ইরানের জাগরণে বিদ্যালয়সমূহও এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সরকার প্রতিষ্ঠিত দার-আল-ফনুনই একমাত্র উল্লেখ-যোগ্য বিদ্যালয়, কিন্তু আজারবাইজান, জিলান ও অন্যান্য প্রদেশের উদার-পন্থী ব্যবসায়ীগণ পাশ্চাত্য ধারার বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠা করে। এইগুলির আদর্শ হইল আমেরিকান, বৃটিশ ও ফরাসী মিশনারীগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়সমূহ। ফরাসী ল্যাজারীর মিশন ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে তাব্রিজে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এবং পরে দেশের অন্যান্য অংশেও বিদ্যালয়সমূহ স্থাপন করে। আমেরিকানগণ তাহাদের কাজ আরম্ভ করে 'আজারবাই-জানের' উরু মিয়্যায় (পরবর্তী রেজাইয়্যা), ১৮৩৯ খ্রীস্টাব্দে এবং বৃটিশগণ ইসফাহানে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে। উভয়ে হাসপাতাল এবং বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠা করে। এই বিদ্যালয়সমূহের মধ্যে তেহরানের আলবুর্জ কলেজ বিশেষতঃ দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ইহার সুদীর্ঘ-কালীন ও প্রিয় অধ্যক্ষ ডঃ এস. এম. জর্দান সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে একমাত্র আমে-রিকান, সম্ভবতঃ একমাত্র বিদেশী যাঁহার মর্মরমূর্তি তাঁহার গুণমুগ্ধ জন-গণ কর্তৃক স্থাপিত হয়। আমেরিকানগণ সর্বপ্রথম মহিলাদের বিদ্যালয় স্থাপন করে। মহিলাদের সাময়িকী প্রকাশনার ব্যাপারেও তাহারা সর্ব-প্রথম। তেহরানের আমেরিকান গার্লস স্কুলের গ্রেজুয়েটদের সহায়তায় মিসেস আর্থার বরেস্ কর্তৃক সম্পাদিত "দি ওয়ার্ল্ড অব উইমেন" (মহিলা জগৎ) ১২ বৎসর পর্যন্ত প্রকাশিত হইতে থাকে এবং ইহা মহিলাদের

এই ধরনের আরও অনেক সাময়িকীর অগ্রদূত।

বিংশ শতাব্দীতে মধ্যপ্রাচ্যের বিপ্লবগুলির মধ্যে পারস্য বিপ্লব সম্ভবতঃ অদ্বিতীয় এই অর্থে যে, সেনাবাহিনীর ইহাতে করণীয় তেমন কিছু ছিল না। সামরিক বা বেসামরিক কোন শক্তিশালী ব্যক্তির সম্পূর্ণ বা আংশিক কোন দায়িত্বও ইহাতে নাই। এই বিপ্লব পরিচালিত হয়, অনেকটা বিশৃঙ্খল ভাবে, ব্যবসায়ী, শিক্ষিত প্রভাবশালী লোক এবং মধ্যম-উদারপন্থী উলামাগণের দ্বারা। পারস্যের বিপ্লবে বাজারের ব্যবসায়ী ও বণিক সম্প্রদায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ হইতে শুরু করিয়া পারস্যের বিশেষতঃ আজারবাইজান ও জিলানের ব্যবসায়ীগণ উত্তরে রাশিয়ায় গমন করে। নিজনি নভগর্দের (Nizhni Novgorod) বার্ষিক মেলায় পারস্যের অনেক দর্শক উপস্থিত থাকে। তদুপরি ইউরোপের নিকটতম রাস্তা হইল রাশিয়ার মধ্য দিয়া। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে হাজার হাজার পারস্যবাসী বাকুর তৈল উত্তোলন ক্ষেত্রে এবং রাশিয়ার অন্যান্য শিল্পগুলিতে কাজ করে। এইসব লোকজন ইরানের তুলনায় রাশিয়ার শুধু উন্নতিতেই মুগ্ধ হইয়া ফিরে নাই বরং যেসব ভাবধারা রাশিয়ায় ১৯০৫ ও ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের বিপ্লব সাধন করে ঐসব দেখিয়াও মুগ্ধ হইয়া আসে।

পারস্য বিপ্লব

ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে, ব্যক্তি বা দলবিশেষ এই বিপ্লবের পথ নির্দেশ করে নাই বা বিভিন্ন ভাবধারার লোকদিগকে এক গ্রন্থিতে আবদ্ধ করে নাই। এইসব কিছুতে উলামাদের নিজস্ব উদ্দেশ্য এবং ইউরোপপন্থী বিশিষ্ট লোকদের তাহাদের নিজস্ব উদ্দেশ্য কাজ করে। এই উভয় পন্থীদের মাঝখানে আবদ্ধ ব্যবসায়ীগণ সম্ভবতঃ উলামাদের চেয়ে পাশ্চাত্য পন্থীদের দিকেই অধিক আকৃষ্ট হয়। ইহা কোন পরিকল্পিত বিপ্লব নহে, বরং সংঘটিত হইয়াছে মাত্র।

১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে মুজাফফর আল-দীন শাহের সিংহাসনে আরোহণের ফলে ইরানের অবস্থার কোন পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। সুযোগ সন্ধানী প্রধান উজীর আমিন আল সুলতান ভারপ্রাপ্ত কর্মাধ্যক্ষ থাকেন এবং অবস্থাভেদে কখনও বৃটিশদের এবং কখনও রুশদের পক্ষাবলম্বন করেন। রুশ

এবং দুর্বলচিত্ত শাহ চিকিৎসার (তিনি যকৃতের রোগী ছিলেন) ও ইউরোপের রাজণ্যবর্গের আপ্যায়ন লাভের জন্য ইউরোপ গমন করিতে কৃতসংকল্প হন। শাহের দুইটি সফরের ফলে রাশিয়া ও বৃটেন উভয়ের নিকট ইরানের করের বোঝা বৃদ্ধি পায়। বেলজিয়ান শুল্ক পরিচালকের নতুন রুশঘেষা শুল্কনীতির ফলে চিনির দাম বাড়িয়া যায়। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর একদল ব্যবসায়ী ইহার প্রতিবাদে ধর্মঘট পালন করে এবং সমস্ত বাজার বন্ধ করিয়া দেয়। সরকার বেত্রাঘাত করিয়া ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ১৩ই ডিসেম্বর দুইজন মধ্যপন্থী মুজতাহিদ সৈয়দ মুহাম্মদ তাবাতাবায়ী ও সৈয়দ আবদুল্লাহ বাহবাহানীর নেতৃত্বে প্রায় দুই হাজার উলামা ও ব্যবসায়ী নিকটবর্তী শাহ আবদুল আজিমের মাজারে অবস্থান ধর্মঘট করে। সেখানে তাহারা একটি "বিচারালয়" দাবী করে।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী শাহ জনসাধারণের ইচ্ছা পূরণ করিবার ওয়াদা করিয়া একটি ফরমান জারী করেন। মসজিদ প্রাঙ্গণে এই ফরমান পড়িয়া শুনান হইলে আনন্দের বন্যা বহিয়া যায় এবং "পারস্য জাতি দীর্ঘজীবি হউক" এই ধ্বনি বারংবার শোনা যায়। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীবর্গ শাহকে এই ওয়াদা ভুলিয়া যাইতে পরামর্শ দিয়া সফল হন।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে এক বিরাট সংখ্যক উলামা ও তাঁহাদের অনুসারী তেহরানের প্রায় ৬০ মাইল দক্ষিণে বিশিষ্ট কোম-এর মাজারে অবস্থান ধর্মঘট করে। একই সময়ে ১৩০০০ পাশ্চাত্যপন্থী, ব্যবসায়ী, বণিক ও অন্যান্যগণ তেহরানের বৃটিশ কার্যালয়ের মাঠে অবস্থান ধর্মঘট করে। অবস্থান গ্রহণ করা বা বাস্ত (Bast) ইরানের একটি সম্মানিত নিয়মপদ্ধতি, কিন্তু অবস্থান গ্রহণের সচরাচর স্থান হইল দরগাহ্, মসজিদ, শাহের আস্তাবল এবং ইদানীং প্রাদেশিক টেলিগ্রাফ অফিস, যাহার সহিত শাহের প্রাসাদের তার যোগাযোগ রহিয়াছে সম্ভবতঃ তাই। বিদেশী রাষ্ট্রের কার্যালয়ে অবস্থান গ্রহণ করা নতুন নিয়ম, তবে বৃটিশদের অনুমতিক্রমে ইহা করা হয়। রাশিয়া ও গ্রেট বৃটেনের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিপ্লবীগণ গ্রেট বৃটেনের উদার ও গণতান্ত্রিক নিয়ম প্রণালীর জন্য ইহার পক্ষাবলম্বন করে। অপরদিকে গ্রেট বৃটেনও বিপ্লবীদের পক্ষ অবলম্বন করে, কারণ এই নীতি রাশিয়াকে আঘাত করে। শেষ পর্যন্ত ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের ৫ই আগস্ট মুজাফফর আল-দীন

শাহ একটি শাসনতন্ত্র ও একটি পার্লামেণ্ট বা মজলিশ প্রদান করেন। প্রথম মজলিশের নির্বাচন সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর যথা শাহজাদা, উলামা, অভিজাত, জমিদার, ব্যবসায়ী ও সংস্থাসমূহের সদস্যভুক্তির উপর ভিত্তি করিয়া অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম মজলিশ কৃষকশ্রেণী ব্যতীত সমাজের প্রত্যেক স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে। ইহার প্রথম কাজ হইল ৪০০,০০০ পাউণ্ড অঙ্কের একটি ইঙ্গ-রুশ যুক্ত ঋণ প্রত্যাখ্যান করা এবং ইহার সঙ্গে সঙ্গে বেলজিয়ান শুল্ক কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করিতে শাহকে বাধ্য করা।

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী শাহের মৃত্যুর ফলে নব্য বিপ্লবী আন্দোলন জটিলতার সম্মুখীন হয়। নতুন শাহ মুহাম্মদ আলী রাশিয়ার ক্রীড়নক এবং বিপ্লবের বিরোধী হিসাবে পরিচিত। তাঁহার অভিষেক অনুষ্ঠানের সময় তিনি শাসনতন্ত্র মানিয়া চলিবেন বলিয়া শপথ গ্রহণ করিলেও তাঁহার কার্যাবলী ইহার বিপরীত বলিয়া প্রমাণিত হয়। তাঁহার কার্যাবলীর প্রথমটি হইল প্রতিক্রিয়াশীল আমীন-আল-সুলতানকে প্রধানমন্ত্রী নামে পুনর্বহাল করে।

শাসনতন্ত্র প্রদান করিবার ফলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আসে। মাসে মাসে সংবাদপত্রের সংখ্যা বাড়িতে থাকে এবং ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে নাগাদ এই সংখ্যা ৪০০-এ উন্নীত হয়। নতুন শাহ তাঁহার মজলিশ-বিরোধী কার্যকলাপ বৃদ্ধি করিবার সাথে সাথে সংবাদপত্রগুলি কবিতা, গল্প, ব্যঙ্গ রচনা, রম্য রচনা ও ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে শাহ ও প্রতিক্রিয়াশীলদিগকে বিদ্রূপ করে। স্বদেশপ্রীতি, স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়বিচার ও গণতন্ত্রের উপর বিভিন্ন গান রচনা করা হয়। দেশের সর্বত্র বিবাহের গায়কদল এইসব গান পরিবেশন করে এবং তৎসঙ্গে এই বাণীও ছড়াইয়া দেয়, যাহা জনগণকে প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে উস্কানীতে উৎসাহ প্রদান করে।

শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন যে একটি "অতি ক্ষুদ্র ইউরোপীয় শিক্ষিত ভদ্রলোকদের" একচেটিয়া ব্যাপার নহে তাহার সর্বোত্তম উদাহরণ সম্ভবতঃ আঞ্জুমন বা পরিষদসমূহের আবির্ভাবে। সমগ্র দেশে প্রকৃত অর্থে শত শত আঞ্জুমন বিপ্লবের বিভিন্ন স্তর প্রতিফলিত করিবার জন্য গঠিত হয়। প্রতিটি আঞ্জুমনে অর্ধ ডজন হইতে হইতে ১০০জন সদস্য থাকে। কোন কোনগুলি ধর্মীয় দল, কোন কোনটি শিক্ষা সমর্থন করে এবং গণ-শিক্ষার ক্লাস

পরিচালনা করে ; আবার কেউ প্রচারপত্র বিলি করে এবং কয়েকটি সন্ত্রাসবাদের মাধ্যমে বিপ্লব বিরোধী নেতৃবৃন্দকে হত্যা করে। আঞ্জুমনসমূহের কার্যাবলী পরিচালনা করিবার জন্য বিপ্লবের কোন কেন্দ্রীয় কমিটি ছিল না। প্রত্যেকটি ইহার নিজস্ব আইন-কানুনের অধিকারী। সন্ত্রাসবাদী আঞ্জুমনগুলি, যেগুলি রাশিয়ার সমসাময়িক নাস্তিক ও সামাজিক বিপ্লবী শ্রেণীগুলির ন্যায়, নিজস্ব বাধ্যবাধ্যক্তি বাছিয়া লয়। পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর অধিকারী কোন নেতা ইহাদিগকে একত্রে সন্নিবেশিত করিতে পারিত কিন্তু অনুরূপ এক নেতা তখনও উদয় হয় নাই।

আমীন আল-সুলতানের প্রত্যাবর্তন এবং অর্থের প্রয়োজনীয়তার দরুন ঋণের প্রশ্ন পুনরায় উত্থিত হয়। মজলিশ রাশিয়া বা ইংল্যাণ্ড হইতে ঋণ গ্রহণ করিবার বিরোধী, অথচ আমীন আল-সুলতান ইহার পক্ষপাতী। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ৩১ শে আগস্ট প্রধান মন্ত্রী মজলিশ ত্যাগ করিবার সময় এক সন্ত্রাসবাদীর গুলির আঘাতে নিহত হন। হত্যাকারী সঙ্গে সঙ্গে আত্মহত্যা করে। হত্যাকারীর দেহে একটি কাগজে লেখা পাওয়া যায়, "আব্বাস আকা, আজারবাইজানের অর্থবিনিময়কারী, আঞ্জুমনের সদস্য, জাতীয় শিষ্য বা ফেদাই নম্বর ৪১।" অবশ্য আঞ্জুমনের নাম কাগজে লিখা ছিল না। এই ধরনের গোপন সন্ত্রাসবাদী সংস্থার সংখ্যা ছিল অনেক, এবং পরবর্তী বৎসরগুলিতে তাহারা আরও অনেককে গোপনে হত্যা করে।

সেই হত্যার দিনই একটি ইঙ্গ-রুশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পারস্য বিপ্লবের উপর এই চুক্তি সুদূর প্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। এই চুক্তি "প্রাচ্য প্রশ্নের" ফলশ্রুতি, যাহা প্রকৃতপক্ষে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের একযোগে থাকিবার অক্ষমতা প্রকাশ করে। ইউরোপের আকাশে সংযুক্ত জার্মানীর আবির্ভাব এবং মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যাবলীতে কাইজার উইল্‌হেল্‌মের একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিবার ফলে রাশিয়া ও বৃটেন নবাগতের বিরুদ্ধে একটি "যুক্তফ্রন্ট" দেখাইতে চায়। ইরান, আফগানিস্তান ও তিব্বতের ব্যাপারে তাহারা একটি সমঝোতায় উপনীত হয়। গ্রেট বৃটেন ও রাশিয়া উভয়ে যেহেতু ইরানের ব্যাপারে আগ্রহী, তাই তাহারা সেখানে "প্রভাব প্রতিপত্তির এলাকা" চিহ্নিত করিয়া লয়। উত্তরাঞ্চলে একটি রেখা ইয়াজ্‌দ্‌ হইতে উত্তর-পূর্বে ইরান-আফগান সীমান্তে এবং মাশহাদের পূর্ব পর্যন্ত, এবং

আরেকটি রেখা উত্তর-পশ্চিমে যাইয়া কেরমানশাহের পশ্চিমে ইরান-তুরস্ক সীমান্ত পর্যন্ত রাশিয়ার প্রভাবে থাকে। রুশ এলাকার মধ্যে ইরানের অধিকাংশ বড় বড় শহরগুলি পড়ে। পক্ষান্তরে প্রভাব প্রতিপত্তির এলাকা হিসাবে বৃটিশগণ শুধু "বৃটিশ" বেলুচিস্তানের নিকটবর্তী দক্ষিণ-পূর্ব কোণা-টুকু লাভ করে। দেশের অবশিষ্ট অংশ, অর্থাৎ অধিকাংশ দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলকে নিরপেক্ষ এলাকা বলিয়া চিহ্নিত করা হয়। এইরূপ একটি অসম বণ্টন প্রমাণ করে যে, বৃটেন তখনও ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে উদ-গ্রীব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানে তখনও তৈল আবিষ্কৃত হয় নাই। পারস্য-বাসীগণ সঠিকভাবেই হৃদয়ঙ্গম করে যে এই ধরনের চুক্তি তাহাদের দেশের স্বাধীনতার পরিপন্থী। "গণতান্ত্রিক" বৃটেন হইতে অনেক কিছুর প্রত্যাশী পারস্য বিপ্লবীগণ বিশ্বাস করে যে তাহাদিগকে ঠকানো হইয়াছে। এই বিশ্বাস আরও সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, কারণ ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে এইসব ঘটনাপ্রবাহ হইতে তাহারা আরও অনেক শিক্ষা লাভ করে।

তবে ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মে বিপ্লবীগণ এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ লইবার সুযোগ লাভ করে নাই, কারণ প্রতিক্রিয়াশীল শাহ তাহাদের উপর কঠোর হইয়া উঠেন। এক নাগাড়ে অনেকগুলি আন্দোলন ও প্রতি-আন্দোলনের পর কর্ণেল লিয়াখানভের নেতৃত্বে একটি কোসাক রেজি-মেন্ট শাহের আদেশে তোপের মুখে মজলিশ উড়াইয়া দেয়। বহুসংখ্যক বিপ্লবীকে বন্দী করা হয়, তাহাদের নেতাদিগকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় এবং অবশিষ্ট বিপ্লবীগণ দেশ ত্যাগ করে। মনে হইল শাসনতান্ত্রিক আন্দো-লন শেষ, কিন্তু জনগণের মধ্যে আন্দোলনের সমর্থক থাকিয়া যায়। তিনটি কেন্দ্র শাসনতন্ত্র রক্ষায় টিকিয়া থাকে : তাব্রিজ, ইসফাহান ও রাস্‌ত্‌।

তাব্রিজীগণ সাত্তার খান ও বাকের খানের[1] নেতৃত্বে সরকারী বাহি-নীকে শহরে প্রবেশে বাধা দান করে এবং পরিণামে শাহ ও রুশ সৈন্যগণ কর্তৃক নয় মাসেরও অধিকাল অবরুদ্ধ থাকে। মিঃ হাওয়ার্ড বাস্কেরভীল নামক তাব্রিজের মিশনারী স্কুলের একজন যুবক আমেরিকান শিক্ষক তাঁহার

১। "খান" আসল নাম নহে, বরং প্রায় সমস্ত পারস্যবাসীগণ কর্তৃক ব্যবহৃত একটি সম্মানীয় উপাধি। ১৯৩৪ সনে সমস্ত উপাধি বিলোপ করা হইলে ইহার ব্যবহারও নিষিদ্ধ হইয়া যায়।

কাজে ইস্তাফা দান করিয়া বিপ্লবীদের দলে যোগদান করেন। তিনি তাহার নিজস্ব কিছু ছাত্রকে প্রশিক্ষণ দান করেন এবং বুভুক্ষু জনতার জন্য খাদ্য আনিবার মানসে একটি আক্রমণ পরিচালনা করেন। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ২১ শে এপ্রিল তিনি নিহত হন এবং তাঁহার কবর বিপ্লবের তীর্থস্থানে পরিণত হয়।

তাব্রিজের সাহসিক বাধা অন্য কেন্দ্রগুলির জাতীয়তাবাদীদিগকে সময় ও উৎসাহ দান করে। নেতা সরদার আসাদের নেতৃত্বে বখতিয়ারী গোত্র শাসনতন্ত্রের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করে এবং তেহরান অভিমুখে যাত্রা করে। পরে দেখা যায় বখতিয়ারীগণ বিপ্লবের ভাবধারার চাইতে তাহাদের নিজস্ব ক্ষমতার উপরই অধিক আস্থাশীল, কিন্তু সেই সময় তাহাদের সহযোগিতা শাসনতন্ত্রবাদীদের পরম উপকারে আসে। উত্তরে রাস্‌তে দাসনাক্তবতুন (Dashnaktzoutun) নামে আর্মেনীয় জাতীয়তাবাদীদের এক বিরাট অংশসহ একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীও তেহরান অভিমুখে যাত্রা করে। রাস্‌ত বাহিনী সিপাহদারের সাধারণ পরিচালনাধীনে থাকে, কিন্তু প্রকৃত আধিপত্য থাকে সরদার মুহী এবং আর্মেনীয় ইয়াফ্‌রেম খানের হাতে। উত্তর ও দক্ষিণের এই দুই বাহিনী তেহরানে মিলিত হয় এবং ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই জুলাই রাজধানী অধিকার করে। শাহকে পদচ্যুত করা হয় এবং পরদিন তাঁহার যুবক পুত্র আহমদকে শাহ বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

তাব্রিজের অবরোধ উঠাইয়া লওয়া হয় এবং শাসনতন্ত্রবাদীগণ পুনরায় ক্ষমতাসীন হয়। কিন্তু তাহারা বিভিন্ন প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হয়। রুশ ও বৃটিশদের হস্তক্ষেপের ফলে প্রাক্তন শাহকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও অবসরকালীন ভাতা প্রদান করা হয় এবং প্রফুল্লচিত্তে ইউরোপে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। তদুপরি বখতিয়ারী দলপতি সরদার আসাদ বা রাস্‌তের সিপাহদার কেউই প্রকৃত শাসনতন্ত্রবাদী নহে। ইহা ছাড়াও উলামা ও পাশ্চাত্য শিক্ষিত জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে পার্থক্য ব্যাপক আকার ধারণ করে। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই নভেম্বর দ্বিতীয় মজলিশের অধিবেশনে দুইটি পৃথক দল দৃষ্ট হয়, একটি বিপ্লববাদী এবং অন্যটি বিবর্তনবাদী। প্রথমোক্তটি সোশ্যাল ডেমোক্রেটস্ নামে পরিচিত এবং তাহারা ধর্মীয় ও পার্থিব

ক্ষমতার পৃথকীকরণ, ভূমি সংস্কার, সেনাবাহিনীতে বাধ্যতামূলকভাবে লোক নিয়োগ, বিশ্বজনীন শিক্ষা, ভূমি বণ্টন ইত্যাদি নীতিতে বিশ্বাস করে। অপর দলটি সোশ্যাল মডারেটস্ নামে পরিচিত। উলামা এবং অধিকাংশ অভিজাতবর্গ ও জমিদার এই দলের অন্তর্ভুক্ত। তাহারা শুধু মুহাম্মদ আলী শাহের বাড়াবাড়িরই বিরোধিতা করে।

১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ৭ই অক্টোবরে গৃহীত শাসনতন্ত্রের ক্রোড়পত্রে সর্বপ্রথম এই দলীয় বিভক্তি দেখা যায়। জাতীয়তাবাদীগণ একটি শাসনতান্ত্রিক সরকার মাশ্রুতেহ্ দাবী করে,—যাহার ভিত্তি হইবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের পাশ করা আইনের উপর, অথচ উলামাগণ দাবী করে মাশ্রুরা, অথবা মুসলিম শরীয়তের শাসন। উভয় দলের মধ্যে বিরাট ব্যবধান, কিন্তু তাহারা যে সমঝোতায় উপনীত হয় তাহা শাসনতন্ত্রের ক্রোড়পত্রে পরিস্ফুট হয়। এই দলিলের দ্বিতীয় ধারায় বর্ণিত হয় যে মজলিশে উলামাদের পাঁচজন প্রতিনিধি থাকিবে। তাঁহাদের বিবেচনা মত কোন আইন ইসলামের বিরোধী হইলে সেগুলির উপর তাঁহাদের প্রতিষেধক (Veto) ক্ষমতা থাকিবে। তবে দ্বিতীয় ধারা যে কখনও কার্যকরী হয় নাই তাহাতেই প্রমাণ করে যে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদীগণ কখনও নিরপেক্ষভাবে কাজ করে নাই।

দ্বিতীয় মজলিশের আয়ুকালে এই দুই দলের বিবাদ প্রকাশ্য ও ভয়াবহ আকার ধারণ করে। নাজাফের উলামাগণ সোশ্যাল ডেমোক্রেটদিগকে সমাজচ্যুত করে, অপর দিকে গোপন আঞ্জুমানসমূহের সদস্য দ্বারা অনেক মডারেটগণ নিহত হয়। ১৯১০ খ্রীস্টাব্দের অধিকাংশ সময় মজলিশ দেশ চালাইবার জন্য অর্থ যোগাড় করিতে ব্যয় করে। তাহারা যেহেতু রাশিয়া ও বৃটেন হইতেও ঋণ গ্রহণ করিবার বিরোধী, আবার জার্মানী হইতেও ঋণ লইতে অপারগ, সেহেতু মজলিশ আভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণ অনুমোদন করে। জনগণ ইহাকে উৎসাহের সহিত গ্রহণ করে এবং মহিলাগণ টাকা প্রদান করিবার জন্য তাহাদের অলঙ্কারাদি বিক্রয় করে।

ইতিমধ্যে মজলিশ হৃদয়ঙ্গম করে যে তাহাদের বিদেশী অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন। রাশিয়া ও বৃটেন হইতে এই ধরনের সাহায্য চাওয়া কল্পনাতীত। অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিসমূহের সহিতও তাহাদের অভিজ্ঞতা

তেমন সন্তোষজনক নহে। কিন্তু আমেরিকান মিশনারীদের প্রভাব, বাস্কেরভীলের আত্মদান এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নীতির ফলে স্বভাবতঃই পারস্যবাসীগণ এই ধরনের সাহায্যের জন্য আমেরিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়। মর্গান শুস্তার আরও বেশ কিছু সংখ্যক সহকারী সমভিব্যহারে ট্রেজারার জেনারেল হিসাবে ইরানে আগমন করেন। তাহাদিগকে বিভিন্ন ব্যাপারে প্রচুর ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

পারস্যবাসীদের মধ্যে শুস্তার খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠেন এবং মজলিশের সোস্যাল ডেমোক্রেট সদস্যদের নীতির প্রতি অনুরাগী হইয়া উঠেন। ইহা সম্ভবতঃ বখতিয়ারী ও মডারেটদিগকে হতাশ করে, কারণ তাহারা ইহা দ্বারা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের মনস্থ করিয়াছিল। শুস্তার অনুভব করেন, নিয়মিত কর আদায় হইলে দেশ যথেষ্ট রাজস্বের মালীক হইবে। কোন কোন জমিদার কর প্রদান হইতে নিস্তার লাভের জন্য নিজদিগকে রাশিয়া ও বৃটেনের "আশ্রিত" বলিয়া ঘোষণা করেন। ট্রেজারী বাহিনী সম্পত্তি বাজেয়াফ্‌ত করে আর অপরদিকে মালীকগণ বিদেশী দূতাবাসগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। রুশগণ ইহার প্রতিবাদ করে এবং দেখা যায় যে, বৃটিশগণও তাহাদের সহিত সংবেদনশীল।

১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর রুশ সরকার শুস্তারকে বরখাস্ত করিবার জন্য পারস্য সরকারের নিকট চরমপত্র প্রেরণ করিলে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। অতঃপর আরেকটি চরমপত্র প্রদান করা হয়, যাহাতে বলা হয় যে, ইরান কোন বিদেশী উপদেষ্টা নিয়োগ করিতে চাহিলে রুশ ও বৃটিশ সরকারের অনুমতি লাগিবে। শীঘ্রই তৃতীয় চরমপত্র আসে। ইহাতে দাবী করা হয় যে, রাশিয়া ইরানে যে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিল উহার ক্ষতিপূরণ দেওয়া হউক। বৃটিশের নিকট পারস্যবাসীগণ আবেদন জানাইলে সে শুধু রুশ চরমপত্র মানিয়া লইতেই উপদেশ দেয় নাই বরং দক্ষিণ ইরান দখল করিবার জন্য ভারতীয় সৈন্য প্রেরণ করে। জনসাধারণের একটি বিরাট অংশ রুশ ও বৃটিশ পণ্য পরিত্যাগ, বাজার বন্ধ ও যুদ্ধের মোকাবিলা দাবী করিয়া আগাইয়া আসে। বিপ্লবের মহার্ঘ সময় উপনীত হয় যখন মজলিশের সদস্যগণ একযোগে চরমপত্র প্রত্যাখ্যান করে।

তবে সাম্‌সাম আল-সালতানেহ বখতিয়ারীর নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা ও

মজলিশ বন্ধ করিয়া দেয় এবং ১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর শুস্তারকে বরখাস্ত করে। আরিফ কাজভিনী নামক এক জনপ্রিয় বিপ্লবী কবিতা রচয়িতা একটি গান রচনা করেন। শুস্তারের প্রস্থানের অনেক পরেও এই গান লোকের মুখে মুখে শুনা যায়।

"ঠিক সেই অতিথি সেবকের যে তাকে অভুক্ত
অবস্থায় টেবিল হইতে উঠাইয়া দেয়,
ইহা ঘটিবার চেয়ে তোমার জীবন তাহার জন্য
কোরবানী কর
শুস্তার যদি পারস্য হইতে চলিয়া যায় তবে পারস্য
যথার্থই পরাজিত হইয়াছে
ওহ্ তুমি যদি সত্য পুরুষ হও, পারস্যকে
এইভাবে পরাজিত হইতে দিও না।[1]

এইভাবে পারস্য বিপ্লবের এই অধ্যায় সমাপ্ত হয়। উলামা ও জাতীয়তাবাদীগণের মধ্যে বিবাদ, জাতীয়তাবাদীদের ভিতর একতার অভাব এবং সরকার ও প্রশাসনের মধ্যে অভিজ্ঞতার অভাবে ইহা ব্যর্থ হয়। রাশিয়া ও গ্রেট বৃটেনের হস্তক্ষেপের ফলেও ইহা ব্যর্থ হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পারস্যবাসীগণ আশঙ্কা করে যে, আঁতাত পক্ষ জয়লাভ করিলে ইরানকে নিশ্চয়ই রাশিয়া ও বৃটেনের মধ্যে ভাগ করা হইবে। অতএব তাহারা কেন্দ্রীয় শক্তিগুলির পক্ষ অবলম্বন করে। আঁতাত জয়লাভ করে, কিন্তু কমিউনিস্ট বিপ্লবের দরুন সাময়িকভাবে রাশিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে সরিয়া দাঁড়াইবার ফলে ইরানকে বিভক্ত করা হয় নাই।

১। মৃত ই. জি. ব্রাউন কর্তৃক ফার্সী হইতে ইংরেজীতে অনূদিত।

একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী

Adams, C.C., Islam and Modernism in Egypt. London : Oxford University Press, 1933.

Ahmed, Jamal M., The Intellectual Origins of Egyptian Nationalism. New York : Oxford University Press, 1960.

Anderson, M.S., The Eastern Question. New York : The Macmillan Company, 1966.

Antonius, George, The Arab Awakening : The Story of the Arab National Movement (4th ed.). Beirut : Khayyat's, 1961.

Berkes, Niyazi, The Development of Secularism in Turkey. Montreal : McGill University Press, 1964.

Browne, E G., The Persian Revolution. London : Frank Cass, 1966.

Curzon, George, Persia and the Persian Question. London : Frank Cass, 1966.

Earle, Edward Mean, Turkey, the Great Powers and the Baghdad Railway : A Study in Imperialism. New York : The Macmillan Company, 1923.

Emin, Ahmed, The Development of Modern Turkey as Measured by Means of Its Press, New York : Columbia University Press, 1968.

Herold, J.C., Bonaparte in Egypt. London : Hamilton, 1962.

Hoskins, Halford L., British Routes to India. New York :

Longmans, Green & Co, 1928.

Hourani, Albert, Arabic Thought in the Liberal Age 1798—1939. London : Oxford University Press, 1963.

Hurewitz, J C., Diplomacy in the Near and Middle Eest (Vol. I, 1535—1914). Princeton, N. J. : D. Van Nostrand Co , 1956.

Issawi, Charles, ed., The Economic History of the Middle-East, 1800-1914. Chicago : University of Chicago Press, 1966.

Jach, Ernest, ed., Background of the Middle East. New York : Cornell University Press, 1952.

Keddie, Nikki R., Religion and Rebellion in Iran, The Iranian Tobacco Protest of 1891—1892. London : Frank Cass, 1966.

An Islamic Response to Imperialism : Political and Religious Writing of Sayyid Jamal al-Din 'al-Afghani.' Berkeley, Calif. : University of California Press, 1968.

Kedourie, Elie, Afghani and 'Abduh : An Eassy on Religious Unbelief and Political Activism in Modern Islam. London : Frank Cass, 1966.

Lendes, David S., Bankers and Pashas, International Finance and Economic Imperialism in Egypt. Cambridge, Mass : Harvard University Press, 1958.

Daniel, The passing of Traditional Society : Modernizing the Middle East. Glencoe, Ill. : The Free Press, 1958.

Mardin, Serif, The Genesis of Young Ottoman Thought—A Study in Modernization of Turkish Political Ideas. Princeton, N. J., : Princeton University Press, 1962.

Marlowe, John, Arab Nationalism and British Imperialism : A

Study in Power Politics. London : The Cresset Press, 1961.

Puryear, Vernon J., Napoleon and the Dardanelles. Berkeley, Calif.: University of California Press, 1951.

Ramsaur, Ernest E., The Young Turks. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1957.

Rifaat, Mohammed, The Awakening of Modern Egypt. London : Longmans, Green & Co., 1957.

Saunders, J. J., ed., The Muslim World on the Eve of Europe's Expansion. Englewood Cliffs, N. J. : Pentice-Hall, 1966.

Shuster, Morgan, The Strangling of Persia. New York : The Century Co., 1912.

Von Grunebaum, G, E., ed., Unity and Variety in Muslim Civilization. Chicago : University of Chicago Press, 1955.

Yale, William, The Near East. Ann Arbor, Mich. : University of Michigan Press, 1958.

Amin, Osman, Muhammad, Abduh (trans. C. Wendell). Washington, D. C. : American Council of Learned Societies, 1953.

Young, C. T., ed., Near East Culture and Society. Princeton, N. J. : Princeton University Press, 1951.

Zeine, Zeine N., Arab-Turkish Relations and the Emergence of Arab Nationalism. Beirut : Khayats, 1958.

The Struggle for Arab Independence. Beirut : Khayat's, 1960.

চতুর্থ খণ্ড

আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

নতুন তুরস্ক

প্রথম মহাযুদ্ধে কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের স্বপক্ষে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের যোগদান করা সম্ভবতঃ অনিবার্য হইয়া পড়ে। রাশিয়া পুরাতন শত্রু এবং অতীতের অভিজ্ঞতা তুর্কীদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছে যে তাহারা সর্বদা বৃটিশ ও ফরাসীদের উপর নির্ভর করিতে পারে না, বিশেষতঃ তাহারা যখন রাশিয়ার মিত্র। অপরদিকে জার্মানী একটি নতুন শক্তি যাহার সঙ্গে তাহাদের কোন তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় নাই। সাম্রাজ্যে জার্মানদের ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান এবং কাইজারের সফর (১৮৮৯ ও ১৮৯৮ খ্রীঃ) বেশ সৌহার্দপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তদুপরি সাম্রাজ্য পরিচালক ত্রিরত্ন—জামাল, আনোয়ার ও তালাত জার্মান সমর্থক, তাই অনেক তুর্কী বিশ্বাস করে, জার্মানীর আগমনের ফলে রাশিয়া ও বৃটেনের শক্তি নিরপেক্ষ হইয়া যাইবে।

অবশ্য যুদ্ধ ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেয়। বিভিন্ন রণাঙ্গণে তুর্কী সৈন্যদের সাহসিকতা এবং গ্যালিপলিতে তাহাদের জয়লাভ সত্ত্বেও সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা কাটাইয়া উঠা সম্ভব হয় নাই। জার্মানীর পরাজয়ের অনেক পূর্বেই ওসমানীয়গণ পরাজয় বরণ করে। "ধ্বংসের মুখে" কথাটি সুবিবেচনামূলকভাবে ব্যবহার করা হয় কারণ ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের ৩রা অক্টোবর মুদ্রসের সন্ধির পর মিত্রশক্তি বিশেষতঃ গ্রেট বৃটেন ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা যুক্তিযুক্ত মনে করে নাই। একটি দুর্বল ও অনুগত ওসমানীয় রাষ্ট্র একই উদ্দেশ্য সাধন করিবে এবং কমিউনিষ্ট ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি কার্যকরী মধ্যরাষ্ট্র হিসাবে কাজ করিবে। "ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তিটি" এখনও উপকারী। ইহাকে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের পরিচালনাধীন হাসপাতালে জীবিত রাখাটাই

বুদ্ধিমানের কাজ। ১৯১৯ হইতে ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়েই তুর্কীগণ এই রুগ্ন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া নতুন ভাবে কাজ আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে আধুনিক তুর্কীদের নিকট যুদ্ধকালীন চারি বৎসরের তুলনায় প্রথম মহাযুদ্ধের পরের চারি বৎসরই অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

পরাজিত ওসমানীয়দের নিকট প্রেসিডেণ্ট উডরু উইলসনের বাণীই সম্বল হিসাবে থাকে, তিনি বলেন ঃ "বর্তমান ওসমানীয় সাম্রাজ্যের তুর্কী অংশটুকুর পূর্ণ সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা দিতে হইবে।" যুদ্ধ চলাকালে (১৯১৫—১৯১৭ খ্রীঃ) গোপন চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের অজ্ঞাতসারে মিত্রশক্তিবর্গ এশিয়া মাইনরকে নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করিয়া লয়। ওসমানীয় রাষ্ট্রের জন্য শুধু উত্তর আনাতোলিয়া অবশিষ্ট থাকে। ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত পশ্চিম ইউরোপের শক্তিবর্গ রাশিয়ার হাতে প্রণালীর কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিতে সম্মত হয়। সম্ভবতঃ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দার্দানালিসের দক্ষিণে এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাংশ গ্রীসের নিকট হস্তান্তর করিতে গ্রেট বৃটেন পীড়াপীড়ি করে এবং ফ্রান্স ও ইটালী অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাতে রাজী হয়।

বলশেভিকগণ রাশিয়ার সরকার হাতে লইয়া পূর্ববর্তী সরকারের সমস্ত চুক্তিসমূহ বাতিল করে এবং গোপন চুক্তিসমূহ ফাঁস করিয়া তাহাদের প্রাক্তন মিত্র রাষ্ট্রসমূহকে বেকায়দায় ফেলে। তবে ইহা অবস্থার তেমন কিছু পরিবর্তন আনয়ন করে নাই এবং তাহা ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ১০ই আগস্ট স্বাক্ষরিত সেভারসের সন্ধি দ্বারাই বুঝা যায়। একমাত্র পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় গোপন চুক্তি দ্বারা রাশিয়াকে প্রদত্ত ভূখণ্ডসমূহের নতুন বিন্যাসের মধ্যে। পশ্চিমে জাতিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণে প্রণালীকে আন্তর্জাতিক করা হয়, কিন্তু ইস্তাম্বুল তুর্কী আধিপত্যে থাকিয়া যায়। পূর্বে, রাশিয়াকে প্রদত্ত অবিকল সেই এলাকায় স্বাধীন আর্মেনীয় রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়। অধিকন্তু, গণভোটের অধিকার সহকারে কুর্দদিগকে স্বায়ত্তশাসন এবং এক বৎসরের মধ্যে সম্ভাব্য স্বাধীনতা প্রদান করা হয়।

ভূখণ্ডের ভাগবাটোয়ারা ছাড়াও তুর্কী সেনাবাহিনীর সংখ্যা ৫০,০০০ এ সীমিত করিয়া ইহাকে মিত্রশক্তি অথবা কোন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উপদেশ

সাপেক্ষ রাখা হয়। বৃটেন ফ্রান্স ও ইটালীর প্রতিনিধিদ্বে গঠিত একটি অর্থনৈতিক কমিশনের হাতে রাষ্ট্রের যাবতীয় অর্থনৈতিক বিষয়াদি অর্পণ করা হয়। উপরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চালু রাখা হয় এবং তুর্কীদিগকে স্বীয় সীমান্ত-ভুক্ত সমস্ত সংখ্যালঘুদের দায়িত্ব ও সুবিধাদির নিশ্চয়তা প্রদান করিতে হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন এরূপ একটি অপমানজনক চুক্তি তুর্কী-গণ হয়ত গ্রহণ করিত যদি গ্রীকদিগকে এই যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির ভাগ দিতে না হইত। গ্রীস ওসমানীয় শাসনের অধীনে প্রায় তিন শতাব্দী ছিল। তাহাদিগকে প্রভু হিসাবে আনয়ন করাটা তুর্কীদের সহ্য করার পক্ষে অতি তিক্ত ব্যাপার। গ্রীকদের সম্ভাব্য লাভই শুধু তুর্কীদিগকে জাগরিত করে নাই বরং সেভারসের চুক্তির অন্তর্ভুক্ত আর্মেনিয়া রাষ্ট্র গঠন, কুর্দদের স্বায়ত্তশাসন, আত্মসমর্পণ ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব সমস্ত কিছু তুর্কীদের নব-জাগরণে সহায়তা করে। অবশ্য ইহার সব কিছুই হয়ত চাপানো যাইত কিন্তু শুধু একজন লোকের জন্য তাহা সম্ভব হয় নাই। তিনি মুস্তাফা কামাল পাশা, পরে আতাতুর্ক নামে পরিচিত, যিনি তুর্কীদিগকে একত্রিত করেন এবং জয়ের পথে পরিচালিত করেন।

মুস্তাফা কামালের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। একজন যুবক অফিসার হিসাবে তিনি কমিটি অব ইউনিয়ন এণ্ড প্রোগ্রেসে (Committee of Union and Progress) যোগদান করেন। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে সামরিক অভ্যুত্থানে তাঁহার কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। কোন সময় তিনি নব্য-তুর্কীদের নীতি ও কার্যাবলীর সঙ্গে জড়িত হন নাই যাহারা সরকার নিয়ন্ত্রণ করিত। ত্রিরত্নের সহিত তাঁহার মতবিরোধ হয়, কিন্তু তাঁহাকে একপাশে ঠেলিয়া ফেলা তেমন সহজ ব্যাপার ছিল না। গ্যালিপলির প্রতিরক্ষায় তিনি জাতীয় সম্মান লাভ করেন। অবশ্য যুদ্ধের শেষভাগে সিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার মোহমুক্তি ঘটে। দুর্ঘটনা বশতঃ নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে তাহা হয়ত জানা যাইবে না, কিন্তু ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে আনাতোলিয়ায় তাঁহাকে তৃতীয় বাহিনীর ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করা হয়। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে মে তিনি উত্তর আনাতোলিয়ায় কৃষ্ণসাগরের সামসান বন্দরে অবতরণ করেন। এই তারিখটি পরে সমস্ত তুরস্কে জাতীয় দিবস হিসাবে পরিগণিত হয়।

অবতরণ করিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাতিকে সামনে আগত কঠিন

পরাধীনতার বিষয় অবহিত করেন। বলশেভিকগণ এইসব গোপন বিষয়াদি পূর্বেই প্রকাশ করিয়া দেয়। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে আরজেরুমে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলন এবং একই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে সিভাসে অনুষ্ঠিত আরেকটি সম্মেলনে তিনি পূর্ব এশিয়া মাইনরের প্রতিরক্ষার জন্য কমিটি গঠন করেন। প্রধান মন্ত্রীকে বরখাস্ত করিয়া ওসমানীয় পার্লামেণ্টের নতুন নির্বাচন দিবার জন্য তিনি সুলতানের নিকট তারবার্তা প্রেরণ করেন। সুলতান এই কাজ করিবার জন্য অগ্রসর হন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মুস্তাফা কামাল একজন সুপরিচিত নেতা। ইহার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, আনাতোলিয়ার তৃতীয় বাহিনী পূর্ণ শক্তিতে বিদ্যমান এবং জেনারেল কাকেরের নেতৃত্বে ককেশাশে সফল অভিযানে ব্যস্ত নবম বাহিনী জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে যোগদান করিয়াছে। মুস্তাফা কামাল যে শক্তিশালী, সুলতান এ বিষয়ে বেশ অবগত।

নির্বাচনে কামালের সমর্থকগণ চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে এবং দেশের বিভিন্ন অংশ হইতে প্রতিনিধিবর্গ ইস্তাম্বুলে জমায়েত হয়। বৃটিশগণ হৃদয়ঙ্গম করে যে, এ ধরনের পার্লামেণ্টের সহিত তাল মিলাইয়া চলা দুরূহ ব্যাপার এবং তাই তাহারা প্রতিনিধিবর্গকে বন্দী করে ও ইহাদের কিছু সংখ্যককে মাণ্টায় প্রেরণ করে। সুলতান জাতীয়তাবাদীদের বিরোধিতা করিতে বাধ্য হন। শেখ উল-ইসলাম ইতিহাসের সর্বশেষ ফতওয়ায় ঘোষণা করেন যে সমগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনটিই ইসলাম বিরোধী। পক্ষান্তরে মুস্তাফা কামাল আনাতোলিয়ার উলামাদিগকে একত্রিত করিয়া শেখ উল-ইসলামের বিরোধী একটি পাণ্টা ফতওয়া জারী করেন। নিষিদ্ধ ওসমানীয় পার্লামেণ্টের স্থলে জাতীয়তাবাদীগণ ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল আঙ্কারায় গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল এসেম্বলি প্রতিষ্ঠা করে।

গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল এসেম্বলি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তুরস্কে বস্তুতঃ দুইটি সরকার চলিতে থাকে, কিন্তু আঙ্কারায় প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী সরকারই অধিক ক্ষমতাশালী ও জনপ্রিয়। মুস্তাফা কামাল সমাগত সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। ইহাদের একটি হইল মিত্রশক্তির আত্মকলহ। যুদ্ধের পর ফারটাইল ক্রিসেণ্টকে কেন্দ্র করিয়া বৃটিশ ও ফ্রান্সের মধ্যে দারুন মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীকালে ইহা চরম শত্রুতায় পর্যবসিত

হয়। তদুপরি তুরস্কে বৃটিশদের তুলনায় ফরাসীদের অনেক ব্যাপক অর্থনৈতিক বিনিয়োগ বিদ্যমান। ফরাসী মহাজনদের চিন্তা ছিল, পাছে বলশেভিকদের ন্যায় তুর্কী জাতীয়তাবাদীগণও সমস্ত ঋণ বাতিল ঘোষণা করে। ইতালীয়গণ গ্রীকদের আগমনে অসন্তুষ্ট হয়। অধিকন্তু ইস্তাম্বুলের ইটালীয় কমিশনার কাউন্ট ফরজা (Count Sforza) জাতীয়তাবাদীদের বিজয়ের পূর্বাভাস দান করেন। ফ্রান্স ও ইতালী উভয়ে যুদ্ধে জড়িত না হইয়া যতদূর সম্ভব লাভবান হইতে চেষ্টা করে এবং এ ব্যাপারে তাহারা বৃটিশদের আঘাত করিতেও কুন্ঠিত হয় নাই। এই ভাবে অর্থনৈতিক অনুমতিপত্রের বিনিময়ে তাহাদের এলাকা ছাড়িয়া দিয়া ইটালী ও ফ্রান্স মুস্তাফা কামালের সহিত চুক্তিবদ্ধ হয়।

মুস্তাফা কামালের অতি গুরুত্বপূর্ণ মিত্র সম্ভবতঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন। বলশেভিকদের মার্কস মতবাদীগণ পূর্ব ঘোষিত সর্বহারার বিপ্লবের জন্য ইউরোপের দিকে তাকাইলেও তাহাদের মধ্যে অনেক "এশিয়া প্রথম"-এর সমর্থক বিদ্যমান ছিল। যাহারা ইরান ও তুরস্কের প্রতি দৃকপাত করে। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ৮ই নভেম্বর বলশেভিক জার-রাশিয়া কর্তৃক অধিকৃত সমস্ত এলাকা ছাড়িয়া দেয়। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের বলশেভিকগণ মুস্তাফা কামাল ও তাঁহার বিপ্লবের প্রতি সমর্থন প্রদান করে। অনেকে এতদূর পর্যন্ত বলে যে তুরস্কের লাল পতাকা ও রাশিয়ার লাল পতাকার মধ্যে তেমন পার্থক্য নাই। মুস্তাফা কামাল কখনও কমিউনিস্ট ছিলেন না, কিন্তু তিনি তাহাদের সহিত তাল মিলাইয়া চলেন। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের তুর্কী কমিউনিস্ট শফি দেগমার সোস্যালিষ্ট ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজেন্টস পার্টি (Socialist workers and peasent party) প্রতিষ্ঠা করেন যাহা ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে কমিউনিষ্ট পার্টি হইয়া যায়। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে বিশ্ব কমিউনিষ্ট সম্মেলনে কার্যকরী সংসদে একজন তুর্কী অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু মুস্তাফা কামাল তুরস্কের অবস্থা স্বীয় আয়ত্বাধীন করিবার পর কমিউনিষ্ট দলকে বেআইনী ঘোষণা করেন এবং দেগমার সহ অনেককে কারারুদ্ধ করেন।

বলশেভিকগণ তাহাদের নিজস্ব গৃহযুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়ে এবং তাই মুস্তাফা কামালকে সামরিক সাহায্য দিতে সক্ষম হয় নাই। কিন্তু লেনিনের সরকারের সহিত বন্ধুত্ব থাকিবার ফলে তুর্কীদের মনোবল দৃঢ় থাকে এবং

ইহা তাহাদিগকে পূর্বাঞ্চলের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। জেনারেল কাইয়াজিম বাকেরের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী বাহিনী আর্মেনীয়দের হাত হইতে কার্স অধিকার করিলে বলশেভিকগণ ইহাতে আনন্দ প্রকাশ করে। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তাহারা আনুষ্ঠানিকভাবে কার্স আর্দাহান এবং এশিয়া মাইনরের এক বিরাট অংশ তুর্কীদের হাতে ছাড়িয়া দেয়। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই মার্চ মুস্তাফা কামাল পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সহিত একটি বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদন করেন।

যুদ্ধ

গ্রীকগণ ছিল বৃটিশের পদলেহী। জাতীয়তাবাদীদের কর্মসূচী বানচাল করিবার জন্য তাহারা বৃটিশের অনুচর হিসাবে কাজ করে। তদুপরি তাহাদের পুরাতন শত্রু তুর্কীগণের পরাজয় ও অপমানে গ্রীকগণ অতি প্রফুল্ল হয়। এই পরাজয়ে তাহারা এশিয়া মাইনরে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিবার এক বিরাট সুযোগ দেখিতে পায় এবং সম্ভবতঃ বাইজে-ণ্টাইনদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হিসাবে ইস্তাম্বুলের আধিপত্য লাভের স্বপ্নও দেখে। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই মে গ্রীকগণ এশিয়া মাইনরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত স্মারনায় অবতরণ করে।

মুস্তাফা কামালের প্রবল বাধার সম্মুখে ওসমানীয় রাষ্ট্রকে শাসন করিবার বৃটিশ পরিকল্পনা ধূলিস্যাৎ হইয়া যায়। এক সুদীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষ করিবার পর বৃটিশ জনগণের একটা অংশ তুরস্ক জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার মনোবল হারাইয়া ফেলে। তদুপরি ইংল্যাণ্ডের পরিচিত ও উদার জনমত এই আত্মনিয়ন্ত্রণকামী জনসাধারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সমর্থন করে নাই। এই অবস্থায় বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জের একমাত্র করণীয় কাজ হইল মুস্তাফা কামালের বিরুদ্ধে গ্রীকদিগকে সাহায্য করা। গ্রীকরাও এই ধরনের সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে অত্যন্ত উদগ্রীব হইয়া উঠে।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে গ্রীক সেনাবাহিনী স্মারনা হইতে পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া অনেকগুলি যুদ্ধে জয় লাভ করে। ওসমানীয়দের প্রথম দিকের রাজধানী ব্রুসা তাহারা অধিকার করে। এইসব বিজয় সহজে লাভ করা সম্ভব হয় নাই। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের পূর্বে তাহারা আর একটি

আক্রমণ পরিচালনা করিবার সময় পায় নাই। পুনরায় তাহারা সফলতা লাভ করে এবং আঙ্কারার নিকটবর্তী কুতাইয়া দখল করে। গ্রীক অগ্রগতির প্রথম বাধা আসে সাকারিয়ার যুদ্ধে (২৪শে আগস্ট—১৬ই সেপ্টেম্বর)। এক বৎসর পর ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে তুর্কীগণ একটি প্রতিআক্রমণ পরিচালনা করিতে সক্ষম হয়। এই আক্রমণে তাহারা সম্মুখের সবকিছু ভাসাইয়া চলে এবং দুই সপ্তাহের মধ্যে গ্রীকদিগকে তাহারা সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। উভয় পক্ষেই অত্যাচার চলে ; পশ্চাদাপসরণের সময় গ্রীকগণ অত্যাচার করে এবং স্মারনা দখলের পর তুর্কীগণও ভীষণ অত্যাচার করে। গ্রীক স্বপ্ন ধূলিস্মাৎ হয় এবং মুস্তাফা কামাল ইস্তাম্বুলের দিকে অগ্রসর হন।

ল্যুজ্যানের চুক্তি

জাতীয়তাবাদীদের হাত হইতে প্রণালী রক্ষা করিবার জন্য বৃটিশকে সাহায্য করিতে লয়েড জর্জ তাঁহার প্রাক্তন মিত্রদের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু প্রত্যুত্তরে ফ্রান্স ও ইতালী প্রণালী হইতে তাহাদের সৈন্য প্রত্যাহার করে। গ্রেট বৃটেনের তখন যুদ্ধ করিবার মত অবস্থা নাই এবং সৌভাগ্য-বশতঃ মুস্তাফা কামাল পশ্চিমা শক্তিবর্গকে খোঁচাইতে চান নাই। ফলে মুদাইনার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং তদানুসারে পূর্ব থ্রেস ও আদ্রিয়ানোপল তুরস্ককে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং মুস্তাফা কামাল প্রণালীর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করেন।

ততদিনে সেভরের চুক্তি কার্যহীন হইয়া পড়ে। একটি দ্বিতীয় শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে ল্যুজ্যানে আর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বিবাদমান প্রতিনিধি ছিলেন বৃটিশের লর্ড কার্জন এবং তুরস্কের জেনারেল ইসমত পাশা, পরে ইনুনু নামে সমধিক পরিচিত। দাম্ভিক কার্জন তুর্কী জাতীয়তাবাদীদের ইচ্ছানুসারে কাজ করিতে নারাজ, অপরদিকে ইসমত পাশা অনুভব করেন যে অবস্থা তাঁহার অনুকূলে এবং তাই তিনি ধৈর্য ধারণ করেন। প্রধান বিষয়াদি হইল তৈল সমৃদ্ধ মোসুল প্রদেশ যাহা তুর্কীগণ দাবী করে এবং উপরাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নীতি যাহা লর্ড কার্জন ছাড়িতে রাজী নহেন। শেষ পর্যন্ত সম্মেলন স্থগিত হয় এবং পুনরায় ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে আরম্ভ হয়। এই সময় লর্ড কার্জন উপস্থিত ছিলেন না। এই সম্মেলনে ল্যুজ্যানের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

তুরস্ককে সমগ্র এশিয়া মাইনর, প্রণালী ও পূর্ব থ্রেসের মালিক বলিয়া স্বীকার করা হয়। উপরাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বাতিল করা হয়। জাতিপুঞ্জের আও-তার প্রণালী আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রাধীনে আনা হয় তবে কমিশনের চেয়ার-ম্যান একজন তুর্কী হইবেন বলিয়া স্বীকার করা হয়। প্রণালী সেনা-বাহিনীমুক্ত করা হয় কিন্তু তুরস্ককে ইস্তাম্বুলে ১২০০ সৈন্য রাখিবার অনু-মতি দেওয়া হয়। ইস্তাম্বুলের গ্রীক অধিবাসী এবং পশ্চিম থ্রেসের তুর্কীগণ ছাড়া তুর্কী ও গ্রীকগণ লোক বিনিময়ে সম্মত হয়। মোসুল প্রশ্নটি জাতিপুঞ্জের এক্তিয়ারে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। চারি বৎসরের ধৈর্য, আত্মদান, কূটনীতি ও যুদ্ধের পর মুস্তাফা কামাল ও তাঁহার সহকারীগণ তাঁহাদের উদ্দেশ্য হাসিল করেন। কামালী তুরস্ক ওসমানীয় সাম্রাজ্যের চেয়ে অনেক ছোট কিন্তু ইহা অনেক সন্নিবেশিত ও নিয়ন্ত্রণশীল এবং শক্তিশালী একটি রাষ্ট্র।

তুর্কী সংস্কারসমূহ

মুস্তাফা কামালের জন্য বিদেশী হস্তক্ষেপ হইতে স্বাধীনতা অর্জন করাই শেষ নহে বরং একটি নতুন তুরস্ক গড়িয়া তুলিবার ব্যাপারে তুর্কীদিগকে সুযোগ প্রদানের একটি পন্থা মাত্র। ইহা জীবনের প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী সংস্কারের দ্বারা লাভ করা সম্ভব। মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদীদের প্রবর্তিত অধিকাংশ সংস্কারের কর্মসূচী তাঞ্জিমাত হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক তুর্কী বুদ্ধিজীবী সংস্কারক প্রস্তাব করেন ও আলো-চনা করেন। মুস্তাফা কামাল যে মৌলিক ভাবধারার প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা নহে বরং তাঁহার অবদান হইল, তিনি যুক্তিসঙ্গত কতকগুলি ভাবধারা হইতে একটি বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি নব্য ওসমা-নীয় নহেন বরং একটি নব্য-তুর্কী শিশু এবং প্যান তুর্কীর তুলনায় তিনি একজন সাধারণ তুর্কী। তাঁহার তুর্কীকরণের ভাবধারা অতুর্কীদের উপর তুর্কী ভাষা ও সংস্কৃতি চাপাইয়া দেওয়া নহে বরং তুর্কী ভাবধারা এমন কি অ-তুর্কী অঞ্চল ও লোকজন হইতে মুক্তি লাভ করা।

এইসব ভাবধারার কিছু কিছু প্রসিদ্ধ সমাজবিজ্ঞানী জিয়া গোকাল্প্ (১৮৭৬—১৯২৪) সামঞ্জস্য বিধান করেন। মুস্তাফা কামাল সহ অনেক তুর্কী জাতীয়তাবাদী তাঁহার রচনায় প্রভাবান্বিত হন। গোকাল্প্

সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে আলাদা করেন এবং তুর্কী জাতীয় সংস্কৃতির মধ্যে "পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে গাঁথিয়া লইবার" প্রস্তাব করেন। তাঁহার মতে বিগত সংস্কারকদের গলদ হইল পাশ্চাত্যের সভ্যতার সহিত প্রাচ্যের সভ্যতার সমন্বয়ের প্রচেষ্টা। গোফাল্পের মতানুসারে সভ্যতাসমূহ একটি অপরটির সহিত তুলনাহীন বলিয়া এইগুলি মিশিয়া যায় না। তুর্কীদের কর্তব্য হইল প্রাচ্য সভ্যতা হইতে মুক্ত হওয়া, তুর্কী সংস্কৃতি পুনরায়ত্ত করা এবং তাহাদের সংস্কৃতির মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা গাঁথিয়া ফেলা। গোফাল্পের নিকট তুর্কী সংস্কৃতি হইল কিছুটা আদর্শ গ্রাম্য রীতি, ইসলাম এবং কিছুটা আধুনিক ভাবধারার সংমিশ্রণ, তবে এইগুলি তুর্কী ভাষার মাধ্যমে, ধর্মীয় ব্যাপারে তুর্কীবাদ হইল তুর্কী ভাষায় কোরান তেলাওয়াত করা, আযান দেওয়া ও নামাজ পড়া। আইনগত দিক হইতে ইহা দ্বারা আধুনিক আইন প্রবর্তন করা বুঝায় এবং নৈতিকতার দিক হইতে ইহা দ্বারা বুঝায় তুর্কীদের প্রাচীন যুগের "গণতন্ত্রে" ফিরিয়া যাওয়া। তুর্কীবাদকে বলা হয় একটি "বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ও সাহিত্যিক আন্দোলন", কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন নহে। অবশ্য তুর্কীবাদ "আমাদের মহান মুস্তাফা কামালের...পিপলস্ পার্টিকে" সমর্থন করে, কারণ তিনি "দেশকে আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন এবং তৎসঙ্গে আমাদের রাষ্ট্র, জাতি ও ভাষাকে প্রকৃত নামে সম্বোধন করেন..." অর্থাৎ তুর্কী নামে। গোফাল্পকে শেষের দিকে তুর্কী জাতীয়তাবাদের দার্শনিক বলা যায়, যে জাতীয়তাবাদের রূপদানকারী ও উৎসাহদাতা হইলেন কামাল আতাতুর্ক।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে আরজেরুম ও সিভাসে সম্মেলন আহ্বানকারী পূর্ব এশিয়া মাইনর প্রতিরক্ষা কমিটি (Committee for the Defence of Eastern Asia Minor) ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ক্রমশঃ পিপলস পার্টি বা হাক ফিরকাশি (Halk Firkasi)-তে রূপান্তরিত হয়। এই দল ছয় দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে, যাহাকে "কামালের ছয় নীতি" বলা হয়। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে এইগুলিকে তুর্কী শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত করা হয়। অবশ্য এই ছয় নীতি ঘোষণার পূর্বে ও পরে সমস্ত সংস্কার এইগুলির উপর ভিত্তি করিয়া প্রবর্তন করা হয়। এই সব নীতি হইল :

১। প্রজাতন্ত্রবাদ, যাহা জনগণের সার্বভৌমত্ব সূচনা করে।

২। জাতীয়তাবাদ, যাহা তুরস্ককে তুর্কীদের বলিয়া দাবী করে এবং অ-তুর্কী জনগণ সংবলিত অঞ্চলসমূহের উপর ইহাদের আধিপত্য অস্বীকার করে।

৩। জনগণবাদ, যাহা মিল্লাত প্রথা বাতিল করে এবং আইনের চোখে সমস্ত শ্রেণীর জনগণের সমতা ঘোষণা করে।

৪। রাষ্ট্রবাদ, যাহা জাতীয় অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের গঠনমূলক হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে।

৫। ধর্মনিরপেক্ষতা, যাহা ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথক নীতি প্রতিষ্ঠা করে।

৬। সংস্কারবাদ যাহা জাতীয় স্বার্থে অপ্রয়োজনীয় ঐতিহ্য ও দৃষ্টান্ত পরিবর্তন ও ছাঁটাই করিবার একাগ্রতার উপর জোর দেয়।

এখানে উল্লেখ করা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে, ভয়াবহ গোলযোগ, ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে আতাতুর্কের মৃত্যু এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সত্ত্বেও উপরের নীতিগুলির বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। অধিকন্তু এইসব নীতি ও অন্যান্য সংস্কার সমূহের প্রধান উদ্দেশ্য হইল প্রাচ্য সভ্যতার পরিবর্তন করিয়া তদস্থলে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবর্তন করা। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশসমূহ এই উভয় সভ্যতার সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তুর্কীগণ প্রাচ্যের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া নিজদিগকে ইউরোপের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করিতে চেষ্টা করে।

ইসলাম যেহেতু ধর্মীয় ও জাগতিক কার্যাবলীর মধ্যে পার্থক্য করিবার নীতি প্রত্যাখ্যান করে, তাই ইহা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে এবং সমস্ত কার্যাবলীকে স্বীয় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে। শুধু নামাজ বা হজ্ব নহে, বরং সরকার ও বাণিজ্য, শান্তি ও যুদ্ধ, যৌন বিষয়াদি, বিবাহ ও তালাক এবং এমনকি পোশাক-পরিচ্ছেদ, কোরান ও হাদিস অথবা রীতি ও ঐতিহ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং প্রায় অবশ্য পালনীয়। ফলে আলোচ্য সংস্কারগুলির প্রত্যেকটির সহিত ইসলামের সম্পর্ক বিদ্যমান। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে আতাতুর্কের মৃত্যু পর্যন্ত তুরস্কের সরকার ও জনগণের প্রধান কার্যাবলী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অথবা আইন অথবা জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিয়া নতুন আইন সংবিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

১। **সুলতানাত বিলুপ্তি:** গ্রীকদের বিরুদ্ধে সামরিক বিজয় এবং

বৃটিশদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ১লা নভেম্বর গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল এসেম্বলি সুলতান পঞ্চম মুহাম্মদকে পদচ্যুত করে। আতা-তুর্কের অন্তরে সম্ভবতঃ সুলতানাতের বিলুপ্তি ঘটে প্রথম হইতেই, কিন্তু তিনি প্রকাশ করেন নাই। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে আরজেরুম ও সিভাসের সম্মেলনে প্রতিনিধিগণ সুলতানের জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে তিনি মিত্রপক্ষের হাতে 'বন্দী'। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসেও এমনকি শেখ উল-ইসলাম কর্তৃক জাতীয়তাবাদীদের নিন্দা করিবার পরও আঙ্কারার হাজী বৈরাম মসজিদে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল এসেম্বলি সুলতানের 'পবিত্র' আত্মার জন্য মোনাজাত করে। পঞ্চম মুহাম্মদ জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহে ব্যস্ত থাকিলেও তাহারা জনসাধারণকে 'বন্দী' হইতে সুলতানকে 'উদ্ধার' করিতে বলে। এইসব মন্তব্য সম্ভবতঃ সুলতানের কপট নিরা-পত্তার জন্য প্রকাশ করা হয় নাই, যদিও এইগুলির মধ্যে বেশ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। প্রকৃত ব্যাপার হইল আঙ্কারার জাতীয়তাবাদীদের অনেকেই ওসমানীয় বংশের বিলুপ্তি কামনা করে নাই, বরং একটি শাসনতান্ত্রিক সুলতান আশা করিয়াছিল। এমনকি সুলতান ও তাঁহার পরিবার একটি বৃটিশ জাহাজে করিয়া নির্বাসনে যাইবার সময়ও তাঁহার চাচাত ভাই আবদুল মজিদকে খলিফা বলিয়া মনোনয়ন দান করা হয়। প্রায় এক বৎসর পর ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল এসেম্বলি তুরস্ককে একটি প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করে এবং মুস্তাফা কামালকে ইহার প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসাবে গ্রহণ করে।

২। **খিলাফতের বিলুপ্তি ঃ** সুলতানের বিলুপ্তির দ্বারা অনেক তুর্কী দুঃখিত হয়, কিন্তু খিলাফতের বিলুপ্তির পর সমস্ত বিশ্বের সুন্নী মুসল-মানগণ মর্মাহত হয়। এই সিদ্ধান্তও অতি সাবধানে লওয়া হয়। আতা-তুর্ক ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করেন এবং আঙ্কারার উলামাদিগকে এ বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা অভিভূত করেন। এমনকি ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে সিভাসে একটি প্যান ইসলামী সম্মেলন আহ্বানও তিনি নীরবে অনুমোদন করেন। গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল এসেম্বলির সদস্যদের এক পঞ্চ-মাংশ ছিল উলামা। আতাতুর্কের সহচরদের অনেকেই একটি উদার ইসলামী রাষ্ট্র কামনা করেন। একজন প্রখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী হিসাবে আতাতুর্ক

সম্ভবতঃ মনে করেন যে রাষ্ট্র ইসলামী হইলে উদার হইতে পারে না। তবে জনগণের মনে খলিফা আবদুল মজিদ ও সুলতান আবদুল মজিদ অভিন্ন। সর্বদা ইহা অভিন্নই ছিল। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানী লোকদের বিবেচনায় সুলতানের ক্ষমতা ছাড়া খেলাফতের পদ বিধি বিরুদ্ধ। প্রশ্নটি এসেম্বলিতে আলোচিত হয় এবং ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের ৩রা মার্চ খলিফার পদ বিলোপ করা হয়। আবদুল মজিদ এবং ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ওসমানের পরিবারের সদস্যবৃন্দকে তুরস্ক হইতে বহিষ্কার করা হয়। ওসমানীয়-গণ ৬২৫ বৎসর রাজত্ব করেন। খেলাফত প্রতিষ্ঠানটি অন্য কিছু দ্বারা পূরণ করা হয় নাই।

৩। ইসলামী আইনের বিলুপ্তি। সুলতানাত ও খেলাফতের বিলুপ্তির দ্বারা সাধারণ তুর্কীদের দৈনন্দিন জীবনে কোন পরিবর্তন আসে নাই। অবশ্য খেলাফতের বিলুপ্তির ফলে এমন কতকগুলি সুদূর প্রসারী সংস্কারের দ্বার উন্মুক্ত হয় যাহা প্রত্যেক ব্যক্তিকে আঘাত করে এবং সমস্ত দেশকে আন্দোলিত করে। এইগুলির মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি হইল ইসলামী আইন বা শরিয়তের বিলুপ্তি। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের বিচার সংক্রান্ত সংস্কার ধর্মীয় বিচারালয়সমূহকে বাদ দিয়া তদস্থলে সুইস বেসামরিক এবং ইতালীয় দণ্ডবিধি চালু করে। এই বিধির ফলে উলামাগণ অকেজো হইয়া যান। আইন ব্যবসায়ে তাঁহাদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। একমাত্র যাঁহারা পাশ্চাত্য আইন অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারাই ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন। বস্তুতঃ ইসলামী আইন শিক্ষার সমস্ত বিদ্যালয়ই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ধর্মতত্ত্ব বিভাগ এত ছোট হইয়া যায় যে ইহাকে শেষ পর্যন্ত সাহিত্য বিভাগের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। শেখ উল-ইসলামের পদ বিলুপ্ত করা হয় এবং তদস্থলে প্রধান মন্ত্রীর পদের সহিত দুইটি সংস্থা সংযুক্ত করা হয়। এই সংস্থাগুলির কাজ হইল সমস্ত ধর্মীয় বিষয়াদি পরিচালনা করা। উহাদের একটির নাম ধর্মীয় কার্যাবলী সংস্থা (Bureau of Religious Affairs)। ইহা ধর্মপ্রচারকদিগকে লাইসেন্স প্রদান করে, ধর্মীয় ভাষণ পরীক্ষা করে এবং শরিয়তের বিভিন্ন বিষয়ের উপর উপদেশ দান করে। দ্বিতীয়টির নাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্থা (Bureau of Religious Foundation) বা

আওকাফ। ইহা ধর্মীয় দান সম্পত্তি পরিচালনা করে।

ইসলামী আইনের পরিবর্তে ইউরোপীয় আইন চালু করা হয় এবং সম্ভবতঃ কিছু সংখ্যক নেতা ইহার দ্বারা বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারাকে ধর্মীয় মনোভাব হইতে পরিবর্তন করিয়া বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের দিকে ফিরাইবার আশা করেন। সরকারী নীতি হিসাবে ধর্মতন্ত্রকে শুধু প্রত্যাখ্যানই করা হয় নাই বরং জাতির ধর্মীয় স্বভাবকেও পরিবর্তন করা হয়। আতাতুর্ক বলেন, "আমরা এখন বিজ্ঞান ও সভ্যতাকে জীবন ও শক্তির আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি" এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে "বাঁচিবার একমাত্র উপকরণ" বলিয়া মনে করি।

৪। ইসলামী পঞ্জিকার বিলুপ্তি : যে বৎসর শরিয়ত বাদ দেওয়া হয় সেই একই বৎসর (১৯২৬) মুসলিম পঞ্জিকার পরিবর্তে খ্রীস্টান পঞ্জিকা চালু করা হয়। বহু বৎসর ধরিয়া তুর্কী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি মুসলিম চান্দ্র তারিখ এবং পশ্চিমা সূর্য তারিখ উভয়ই ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল। সমস্ত মুসলিম অনুষ্ঠানাদি ও ধর্মীয় তারিখগুলি মুসলিম পঞ্জিকা অনুসারে সম্পন্ন হইত। তবে রাষ্ট্র পাশ্চাত্য পঞ্জিকা প্রবর্তন করে এবং নাগরিকদিগকে সর্বোতভাবে ইহা ব্যবহার করিতে নির্দেশ প্রদান করে। প্রাচ্য হইতে দূরে সরিতে এবং পাশ্চাত্যের ঘনিষ্ঠ হইবার পক্ষে ইহা আরেকটি পদক্ষেপ। পঞ্জিকা পরিবর্তনের সাথে সাথে রাজধানীও পরিবর্তন হয়। নতুন মনোভাবের পক্ষে ইস্তাম্বুল অতি ওসমানীয় এবং 'বিদেশী' আঙ্কারা আনাতোলিয়ায় অবস্থিত, যেখানে 'প্রকৃত' তুর্কীদের বাস। ইস্তাম্বুলে অসংখ্য মসজিদ বিদ্যমান, কিন্তু পুরাতন আঙ্কারা শহরের নিকটে নির্মিত নতুন নগরীতে কোন মসজিদ স্থাপিত হয় নাই। তদুপরি আঙ্কারা শহর একটি কৃষিপ্রধান জেলার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলিয়া সরকারী কর্মকর্তাগণ ওসমানীয়দের ন্যায় চতুর্দিকে বসবাসকারী তুর্কী চাষীদিগকে অবহেলা করিতে পারে না।

৫। আরবী বর্ণমালার বিলুপ্তি : প্রাথমিক যুগের দিগ্বিজয়ীদের আশানুযায়ী বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলমানগণ আরবী ভাষা গ্রহণ না করিলেও আরবী বর্ণমালা গ্রহণ করে। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শব্দ না বুঝিলেও কোরান পড়িতে পারা। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে তুর্কী এসেম্বলি আরবী

বর্ণমালার স্থলে তুর্কীভাষার প্রয়োজন অনুযায়ী লাতিন বর্ণমালার প্রবর্তন করে। আতাতুর্ক তুর্কীভাষায় কোরান অনুবাদ করিয়া নতুন বর্ণমালায় তাহা প্রকাশ করিতে আদেশ দেন। তিনি তুর্কীভাষায় আযান দিতেও আদেশ দেন এবং জনসাধারণকে তুর্কীভাষায় নামাজ পড়াইবার চেষ্টা করেন। সমস্ত মুসলমানদিগকে তুর্কীভাষায় নামাজ পড়াইতে তিনি পারেন নাই; কিন্তু বর্ণমালা পরিবর্তনের ফলে নতুন বংশধরগণ আরবী ভাষায় কোরান পড়িতে অক্ষম হইয়া পড়ে। শুধু অত্যন্ত খাঁটি মুসলমানগণ তাহাদের সন্তানদিগকে আরবী বর্ণমালা শিখাইবার কষ্ট স্বীকার করে।

বর্ণমালা পরিবর্তনের পিছনে জনসাধারণকে কোরান তেলওয়াত বিমুখ করিবার কোন উদ্দেশ্য আতাতুর্কের ছিল না। তিনি নিরক্ষরতা দূর করিতে চান এবং একটি সমন্বয়পূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত তুর্কীভাষা গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হন। তিনি সঠিকভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে একজন তুর্কীর পক্ষে লাতিন বর্ণমালার মাধ্যমেই সহজে লেখা-পড়া শেখা সম্ভব। তিনি এবং এসেম্বলির সদস্যবৃন্দ প্রত্যেকে এক একটি কালবোর্ড লইয়া গ্রামে ও শহরে যান এবং প্রমাণ করেন যে মাধ্যম হিসাবে লাতিন বর্ণমালাই সহজতর। দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যালয়ের পাঠ্যবই মুদ্রণের কাজ নতুন বর্ণমালা উদ্ভাবনের ফলে বিঘ্নিত হয়, কিন্তু তবুও ইহা কার্যকর হয়। এই প্রথমবারের মত সর্বত্র তুর্কীগণ বুঝিতে পারিল একটি শব্দ কিভাবে লিখিয়া উচ্চারণ করিতে হয়।

৬। উপাধি বিলুপ্তি: বে, পাশা ইত্যাদি উপাধির প্রচলন জনগণবাদ নীতির বিরোধী। এই নীতি আইনের চোখে সকল মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। ওসমানীয় যুগের শেষের দিকে উপাধিসমূহ সর্বোচ্চ ডাক প্রদানকারীর নিকট বিক্রয় করা হইত এবং ইহা একটি মিথ্যা শ্রেণী বিভেদ সৃষ্টি করিত। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে সমস্ত উপাধি বিলোপ করা হয় এবং তুর্কীদিগকে পারিবারিক নাম গ্রহণ করিতে আদেশ দেওয়া হয়। কোন দুই পরিবারকে একই নাম গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় না, তবে যদি প্রথম গ্রহণকারী অনুমতি দেয় তাহা হইলে সরকার কোন আপত্তি করে না। অনেককে খাঁটি তুর্কীনাম গ্রহণ করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়। এই আইনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই মুস্তাফা কামালকে এসেম্বলি আতাতুর্ক বা জাতির পিতা নাম প্রদান করে।

চতুর্থ খণ্ড

আধুনিক মধ্যপ্রাচ্য

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

নতুন তুরস্ক

প্রথম মহাযুদ্ধে কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের স্বপক্ষে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের যোগদান করা সম্ভবতঃ অনিবার্য হইয়া পড়ে। রাশিয়া পুরাতন শত্রু এবং অতীতের অভিজ্ঞতা তুর্কীদিগকে এই শিক্ষা দিয়াছে যে তাহারা সর্বদা বৃটিশ ও ফরাসীদের উপর নির্ভর করিতে পারে না, বিশেষতঃ তাহারা যখন রাশিয়ার মিত্র। অপরদিকে জার্মানী একটি নতুন শক্তি যাহার সঙ্গে তাহাদের কোন তিক্ত অভিজ্ঞতা হয় নাই। সাম্রাজ্যে জার্মানদের ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান এবং কাইজারের সফর (১৮৮৯ ও ১৮৯৮ খ্রীঃ) বেশ সৌহার্দপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তদুপরি সাম্রাজ্য পরিচালক ত্রিরত্ন—জামাল, আনোয়ার ও তালাত জার্মান সমর্থক, তাই অনেক তুর্কী বিশ্বাস করে, জার্মানীর আগমনের ফলে রাশিয়া ও বৃটেনের শক্তি নিরপেক্ষ হইয়া যাইবে।

অবশ্য যুদ্ধ ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দেয়। বিভিন্ন রণাঙ্গণে তুর্কী সৈন্যদের সাহসিকতা এবং গ্যালিপলিতে তাহাদের জয়লাভ সত্ত্বেও সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা কাটাইয়া উঠা সম্ভব হয় নাই। জার্মানীর পরাজয়ের অনেক পূর্বেই ওসমানীয়গণ পরাজয় বরণ করে। "ধ্বংসের মুখে" কথাটি সুবিবেচনামূলকভাবে ব্যবহার করা হয় কারণ ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের ৩রা অক্টোবর মুদ্রসের সন্ধির পর মিত্রশক্তি বিশেষতঃ গ্রেট বৃটেন ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা যুক্তিযুক্ত মনে করে নাই। একটি দুর্বল ও অনুগত ওসমানীয় রাষ্ট্র একই উদ্দেশ্য সাধন করিবে এবং কমিউনিষ্ট ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি কার্যকরী মধ্যরাষ্ট্র হিসাবে কাজ করিবে। "ইউরোপের রুগ্ন ব্যক্তিটি" এখনও উপকারী। ইহাকে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের পরিচালনাধীন হাসপাতালে জীবিত রাখাটাই

বুদ্ধিমানের কাজ। ১৯১৯ হইতে ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়েই তুর্কীগণ এই রুগ্ন ব্যক্তিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়া নতুন ভাবে কাজ আরম্ভ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে আধুনিক তুর্কীদের নিকট যুদ্ধকালীন চারি বৎসরের তুলনায় প্রথম মহাযুদ্ধের পরের চারি বৎসরই অধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

পরাজিত ওসমানীয়দের নিকট প্রেসিডেণ্ট উডরু উইলসনের বাণীই সম্বল হিসাবে থাকে, তিনি বলেন : "বর্তমান ওসমানীয় সাম্রাজ্যের তুর্কী অংশ-টুকুর পূর্ণ সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা দিতে হইবে।" যুদ্ধ চলাকালে (১৯১৫—১৯১৭ খ্রীঃ) গোপন চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের অজ্ঞাতসারে মিত্রশক্তিবর্গ এশিয়া মাইনরকে নিজেদের মধ্যে ভাগবাটোয়ারা করিয়া লয়। ওসমানীয় রাষ্ট্রের জন্য শুধু উত্তর আনাতোলিয়া অবশিষ্ট থাকে। ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত পশ্চিম ইউরোপের শক্তিবর্গ রাশিয়ার হাতে প্রণালীর কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিতে সম্মত হয়। সম্ভবতঃ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দার্দানালিসের দক্ষিণে এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাংশ গ্রীসের নিকট হস্তান্তর করিতে গ্রেট ব্রিটেন পীড়াপীড়ি করে এবং ফ্রান্স ও ইটালী অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাহাতে রাজী হয়।

বলশেভিকগণ রাশিয়ার সরকার হাতে লইয়া পূর্ববর্তী সরকারের সমস্ত চুক্তিসমূহ বাতিল করে এবং গোপন চুক্তিসমূহ ফাঁস করিয়া তাহাদের প্রাক্তন মিত্র রাষ্ট্রসমূহকে বেকায়দায় ফেলে। তবে ইহা অবস্থার তেমন কিছু পরিবর্তন আনয়ন করে নাই এবং তাহা ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ১০ই আগস্ট স্বাক্ষরিত সেভারসের সন্ধি দ্বারাই বুঝা যায়। একমাত্র পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় গোপন চুক্তি দ্বারা রাশিয়াকে প্রদত্ত ভূখণ্ডসমূহের নতুন বিন্যাসের মধ্যে। পশ্চিমে জাতিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণে প্রণালীকে আন্তর্জাতিক করা হয়, কিন্তু ইস্তাম্বুল তুর্কী আধিপত্যে থাকিয়া যায়। পূর্বে, রাশিয়াকে প্রদত্ত অবিকল সেই এলাকায় স্বাধীন আর্মেনীয় রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়। অধিকন্তু, গণভোটের অধিকার সহকারে কুর্দদিগকে স্বায়ত্তশাসন এবং এক বৎসরের মধ্যে সম্ভাব্য স্বাধীনতা প্রদান করা হয়।

ভূখণ্ডের ভাগবাটোয়ারা ছাড়াও তুর্কী সেনাবাহিনীর সংখ্যা ৫০,০০০ এ সীমিত করিয়া ইহাকে মিত্রশক্তি অথবা কোন নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উপদেশ

সাপেক্ষ রাখা হয়। বৃটেন ফ্রান্স ও ইটালীর প্রতিনিধিদের গঠিত একটি অর্থনৈতিক কমিশনের হাতে রাষ্ট্রের যাবতীয় অর্থনৈতিক বিষয়াদি অর্পণ করা হয়। উপরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চালু রাখা হয় এবং তুর্কীদিগকে স্বীয় সীমান্ত-ভুক্ত সমস্ত সংখ্যালঘুদের দায়িত্ব ও সুবিধাদির নিশ্চয়তা প্রদান করিতে হয়। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন এরূপ একটি অপমানজনক চুক্তি তুর্কী-গণ হয়ত গ্রহণ করিত যদি গ্রীকদিগকে এই যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তির ভাগ দিতে না হইত। গ্রীস ওসমানীয় শাসনের অধীনে প্রায় তিন শতাব্দী ছিল। তাহাদিগকে প্রভু হিসাবে আনয়ন করাটা তুর্কীদের সহ্য করার পক্ষে অতি তিক্ত ব্যাপার। গ্রীকদের সম্ভাব্য লাভই শুধু তুর্কীদিগকে জাগরিত করে নাই বরং সেভারসের চুক্তির অন্তর্ভুক্ত আর্মেনিয়া রাষ্ট্র গঠন, কুর্দদের স্বায়ত্তশাসন, আত্মসমর্পণ ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব সমস্ত কিছু তুর্কীদের নব-জাগরণে সহায়তা করে। অবশ্য ইহার সব কিছুই হয়ত চাপানো যাইত কিন্তু শুধু একজন লোকের জন্য তাহা সম্ভব হয় নাই। তিনি মুস্তাফা কামাল পাশা, পরে আতাতুর্ক নামে পরিচিত, যিনি তুর্কীদিগকে একত্রিত করেন এবং জয়ের পথে পরিচালিত করেন।

মুস্তাফা কামালের কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। একজন যুবক অফিসার হিসাবে তিনি কমিটি অব ইউনিয়ন এণ্ড প্রোগ্রেসে (Committee of Union and Progress) যোগদান করেন। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে সামরিক অভ্যুত্থানে তাঁহার কোন সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। কোন সময় তিনি নব্য-তুর্কীদের নীতি ও কার্যাবলীর সঙ্গে জড়িত হন নাই যাহারা সরকার নিয়ন্ত্রণ করিত। ত্রিয়ের সহিত তাঁহার মতবিরোধ হয়, কিন্তু তাঁহাকে একপাশে ঠেলিয়া ফেলা তেমন সহজ ব্যাপার ছিল না। গ্যালিপুলির প্রতিরক্ষায় তিনি জাতীয় সম্মান লাভ করেন। অবশ্য যুদ্ধের শেষভাগে সিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার মোহমুক্তি ঘটে। দুর্ঘটনা বশতঃ নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে তাহা হয়ত জানা যাইবে না, কিন্তু ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে আনাতোলিয়ায় তাঁহাকে তৃতীয় বাহিনীর ইন্সপেক্টর নিযুক্ত করা হয়। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে মে তিনি উত্তর আনাতোলিয়ায় কৃষ্ণসাগরের সামসান বন্দরে অবতরণ করেন। এই তারিখটি পরে সমস্ত তুরস্কে জাতীয় দিবস হিসাবে পরিগণিত হয়।

অবতরণ করিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাতিকে সামনে আগত কঠিন

পরাধীনতার বিষয় অবহিত করেন। বলশেভিকগণ এইসব গোপন বিষয়াদি পূর্বেই প্রকাশ করিয়া দেয়। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে আরজেরুমে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলন এবং একই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে সিভাসে অনুষ্ঠিত আরেকটি সম্মেলনে তিনি পূর্ব এশিয়া মাইনরের প্রতিরক্ষার জন্য কমিটি গঠন করেন। প্রধান মন্ত্রীকে বরখাস্ত করিয়া ওসমানীয় পার্লামেণ্টের নতুন নির্বাচন দিবার জন্য তিনি সুলতানের নিকট তারবার্তা প্রেরণ করেন। সুলতান এই কাজ করিবার জন্য অগ্রসর হন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মুস্তাফা কামাল একজন সুপরিচিত নেতা। ইহার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইল, আনাতোলিয়ার তৃতীয় বাহিনী পূর্ণ শক্তিতে বিদ্যমান এবং জেনারেল বাকেরের নেতৃত্বে ককেশাশে সফল অভিযানে ব্যস্ত নবম বাহিনী জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে যোগদান করিয়াছে। মুস্তাফা কামাল যে শক্তিশালী, সুলতান এ বিষয়ে বেশ অবগত।

নির্বাচনে কামালের সমর্থকগণ চূড়ান্ত বিজয় লাভ করে এবং দেশের বিভিন্ন অংশ হইতে প্রতিনিধিবর্গ ইস্তাম্বুলে জমায়েত হয়। বৃটিশগণ হৃদয়ঙ্গম করে যে, এ ধরনের পার্লামেণ্টের সহিত তাল মিলাইয়া চলা দুরূহ ব্যাপার এবং তাই তাহারা প্রতিনিধিবর্গকে বন্দী করে ও ইহাদের কিছু সংখ্যককে মাল্টায় প্রেরণ করে। সুলতান জাতীয়তাবাদীদের বিরোধিতা করিতে বাধ্য হন। শেখ উল-ইসলাম ইতিহাসের সর্বশেষ ফতওয়ার ঘোষণা করেন যে সমগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনটিই ইসলাম বিরোধী। পক্ষান্তরে মুস্তাফা কামাল আনাতোলিয়ার উলামাদিগকে একত্রিত করিয়া শেখ উল-ইসলামের বিরোধী একটি পাল্টা ফতওয়া জারী করেন। নিষিদ্ধ ওসমানীয় পার্লামেণ্টের স্থলে জাতীয়তাবাদীগণ ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল আঙ্কারায় গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল এসেম্বলি প্রতিষ্ঠা করে।

গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল এসেম্বলি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তুরস্কে বস্তুতঃ দুইটি সরকার চলিতে থাকে, কিন্তু আঙ্কারায় প্রতিষ্ঠিত জাতীয়তাবাদী সরকারই অধিক ক্ষমতাশালী ও জনপ্রিয়। মুস্তাফা কামাল সমাগত সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। ইহাদের একটি হইল মিত্রশক্তির আত্মকলহ। যুদ্ধের পর ফারটাইল ক্রিসেণ্টকে কেন্দ্র করিয়া বৃটিশ ও ফ্রান্সের মধ্যে দারুন মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীকালে ইহা চরম শত্রুতায় পর্যবসিত

হয়। তদুপরি তুরস্কে বৃটিশদের তুলনায় ফরাসীদের অনেক ব্যাপক অর্থনৈতিক বিনিয়োগ বিদ্যমান। ফরাসী মহাজনদের চিন্তা ছিল, পাছে বলশেভিকদের ন্যায় তুর্কী জাতীয়তাবাদীগণও সমস্ত ঋণ বাতিল ঘোষণা করে। ইতালীয়গণ গ্রীকদের আগমনে অসন্তুষ্ট হয়। অধিকন্তু ইস্তাম্বুলের ইটালীয় কমিশনার কাউণ্ট ফরজা (Count Sforza) জাতীয়তাবাদীদের বিজয়ের পূর্বাভাস দান করেন। ফ্রান্স ও ইতালী উভয়ে যুদ্ধে জড়িত না হইয়া যতদূর সম্ভব লাভবান হইতে চেষ্টা করে এবং এ ব্যাপারে তাহারা বৃটিশদের আঘাত করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। এই ভাবে অর্থনৈতিক অনুমতিপত্রের বিনিময়ে তাহাদের এলাকা ছাড়িয়া দিয়া ইটালী ও ফ্রান্স মুস্তাফা কামালের সহিত চুক্তিবদ্ধ হয়।

মুস্তাফা কামালের অতি গুরুত্বপূর্ণ মিত্র সম্ভবতঃ সোভিয়েত ইউনিয়ন। বলশেভিকদের মার্কস মতবাদীগণ পূর্ব ঘোষিত সর্বহারার বিপ্লবের জন্য ইউরোপের দিকে তাকাইলেও তাহাদের মধ্যে অনেক "এশিয়া প্রথম"-এর সমর্থক বিদ্যমান ছিল। যাহারা ইরান ও তুরস্কের প্রতি দৃকপাত করে। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ৮ই নভেম্বর বলশেভিক জার-রাশিয়া কর্তৃক অধিকৃত সমস্ত এলাকা ছাড়িয়া দেয়। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের বলশেভিকগণ মুস্তাফা কামাল ও তাঁহার বিপ্লবের প্রতি সমর্থন প্রদান করে। অনেকে এতদূর পর্যন্ত বলে যে তুরস্কের লাল পতাকা ও রাশিয়ার লাল পতাকার মধ্যে তেমন পার্থক্য নাই। মুস্তাফা কামাল কখনও কমিউনিস্ট ছিলেন না, কিন্তু তিনি তাহাদের সহিত তাল মিলাইয়া চলেন। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের তুর্কী কমিউনিস্ট শফি দেগমার সোশ্যালিষ্ট ওয়ার্কার্স এণ্ড পেজেণ্টস পার্টি (Socialist workers and peasent party) প্রতিষ্ঠা করেন যাহা ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে কমিউনিষ্ট পার্টি হইয়া যায়। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে বিশ্ব কমিউনিষ্ট সম্মেলনে কার্যকরী সংসদে একজন তুর্কী অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু মুস্তাফা কামাল তুরস্কের অবস্থা স্বীয় আয়ত্বাধীন করিবার পর কমিউনিষ্ট দলকে বেআইনী ঘোষণা করেন এবং দেগমার সহ অনেককে কারারুদ্ধ করেন।

বলশেভিকগণ তাহাদের নিজস্ব গৃহযুদ্ধে জড়িত হইয়া পড়ে এবং তাই মুস্তাফা কামালকে সামরিক সাহায্য দিতে সক্ষম হয় নাই। কিন্তু লেনিনের সরকারের সহিত বন্ধুত্ব থাকিবার ফলে তুর্কীদের মনোবল দৃঢ় থাকে এবং

ইহা তাহাদিগকে পূর্বাঞ্চলের আক্রমণ হইতে রক্ষা করে। জেনারেল কাইরাজিম বাকেরের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী বাহিনী আর্মেনীয়দের হাত হইতে কার্স অধিকার করিলে বলশেভিকগণ ইহাতে আনন্দ প্রকাশ করে। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তাহারা আনুষ্ঠানিকভাবে কার্স আর্দাহান এবং এশিয়া মাইনরের এক বিরাট অংশ তুর্কীদের হাতে ছাড়িয়া দেয়। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই মার্চ মুস্তাফা কামাল পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সহিত একটি বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদন করেন।

গ্রীক-তুর্কী যুদ্ধ

গ্রীকগণ ছিল বৃটিশের পদলেহী। জাতীয়তাবাদীদের কর্মসূচী বানচাল করিবার জন্য তাহারা বৃটিশের অনুচর হিসাবে কাজ করে। তদুপরি তাহাদের পুরাতন শত্রু তুর্কীগণের পরাজয় ও অপমানে গ্রীকগণ অতি প্রফুল্ল হয়। এই পরাজয়ে তাহারা এশিয়া মাইনরে নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিবার এক বিরাট সুযোগ দেখিতে পায় এবং সম্ভবতঃ বাইজে-ণ্টাইনদের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হিসাবে ইস্তাম্বুলের আধিপত্য লাভের স্বপ্নও দেখে। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ২৫ই মে গ্রীকগণ এশিয়া মাইনরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত স্মারনায় অবতরণ করে।

মুস্তাফা কামালের প্রবল বাধার সম্মুখে ওসমানীয় রাষ্ট্রকে শাসন করিবার বৃটিশ পরিকল্পনা ধূলিস্মাৎ হইয়া যায়। এক সুদীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষ করিবার পর বৃটিশ জনগণের একটা অংশ তুরস্ক জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার মনোবল হারাইয়া ফেলে। তদুপরি ইংল্যাণ্ডের পরিচিত ও উদার জনমত এই আত্মনিয়ন্ত্রণকামী জনসাধারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা সমর্থন করে নাই। এই অবস্থায় বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী লয়েড জর্জের একমাত্র করণীয় কাজ হইল মুস্তাফা কামালের বিরুদ্ধে গ্রীকদিগকে সাহায্য করা। গ্রীকরাও এই ধরনের সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে অত্যন্ত উদগ্রীব হইয়া উঠে।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে গ্রীক সেনাবাহিনী স্মারনা হইতে পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া অনেকগুলি যুদ্ধে জয় লাভ করে। ওসমানীয়দের প্রথম দিকের রাজধানী ব্রুসা তাহারা অধিকার করে। এইসব বিজয় সহজে লাভ করা সম্ভব হয় নাই। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসের পূর্বে তাহারা আর একটি

আক্রমণ পরিচালনা করিবার সময় পায় নাই। পুনরায় তাহারা সফলতা লাভ করে এবং আঙ্কারার নিকটবর্তী কুতাইয়া দখল করে। গ্রীক অগ্রগতির প্রথম বাধা আসে সাফারিয়ার যুদ্ধে (২৪শে আগস্ট—১৬ই সেপ্টেম্বর)। এক বৎসর পর ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে তুর্কীগণ একটি প্রতিআক্রমণ পরিচালনা করিতে সক্ষম হয়। এই আক্রমণে তাহারা সম্মুখের সবকিছু ভাসাইয়া চলে এবং দুই সপ্তাহের মধ্যে গ্রীকদিগকে তাহারা সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। উভয় পক্ষেই অত্যাচার চলে; পশ্চাদাপসরণের সময় গ্রীকগণ অত্যাচার করে এবং স্মার্না দখলের পর তুর্কীগণও ভীষণ অত্যাচার করে। গ্রীক স্বপ্ন ধূলিস্মাৎ হয় এবং মুস্তাফা কামাল ইস্তাম্বুলের দিকে অগ্রসর হন।

ল্যুজ্যানের চুক্তি

জাতীয়তাবাদীদের হাত হইতে প্রণালী রক্ষা করিবার জন্য বৃটিশকে সাহায্য করিতে লয়েড জর্জ তাঁহার প্রাক্তন মিত্রদের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু প্রত্যুত্তরে ফ্রান্স ও ইতালী প্রণালী হইতে তাহাদের সৈন্য প্রত্যাহার করে। গ্রেট বৃটেনের তখন যুদ্ধ করিবার মত অবস্থা নাই এবং সৌভাগ্য-বশতঃ মুস্তাফা কামাল পশ্চিমা শক্তিবর্গকে খোঁচাইতে চান নাই। ফলে মুদাইনার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং তদানুসারে পূর্ব থ্রেস ও আদ্রিয়ানোপল তুরস্ককে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং মুস্তাফা কামাল প্রণালীর আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করেন।

ততদিনে সেভয়ের চুক্তি কার্যহীন হইয়া পড়ে। একটি দ্বিতীয় শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে ল্যুজ্যানে আর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান বিবাদমান প্রতিনিধি ছিলেন বৃটিশের লর্ড কার্জন এবং তুরস্কের জেনারেল ইসমত পাশা, পরে ইনুনু নামে সমধিক পরিচিত। দাম্ভিক কার্জন তুর্কী জাতীয়তাবাদীদের ইচ্ছানুসারে কাজ করিতে নারাজ, অপরদিকে ইসমত পাশা অনুভব করেন যে অবস্থা তাঁহার অনুকূলে এবং তাই তিনি ধৈর্য ধারণ করেন। প্রধান বিষয়াদি হইল তৈল সমৃদ্ধ মৌসুল প্রদেশ যাহা তুর্কীগণ দাবী করে এবং উপরাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নীতি যাহা লর্ড কার্জন ছাড়িতে রাজী নহেন। শেষ পর্যন্ত সম্মেলন স্থগিত হয় এবং পুনরায় ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে আরম্ভ হয়। এই সময় লর্ড কার্জন উপস্থিত ছিলেন না। এই সম্মেলনে ল্যুজ্যানের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

তুরস্ককে সমগ্র এশিয়া মাইনর, প্রণালী ও পূর্ব থ্রেসের মালিক বলিয়া স্বীকার করা হয়। উপরাষ্ট্রীর ক্ষমতা বাতিল করা হয়। জাতিপুঞ্জের আওতার প্রণালী আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রাধীনে আনা হয় তবে কমিশনের চেয়ারম্যান একজন তুর্কী হইবেন বলিয়া স্বীকার করা হয়। প্রণালী সেনাবাহিনীমুক্ত করা হয় কিন্তু তুরস্ককে ইস্তাম্বুলে ১২০০ সৈন্য রাখিবার অনুমতি দেওয়া হয়। ইস্তাম্বুলের গ্রীক অধিবাসী এবং পশ্চিম থ্রেসের তুর্কীগণ ছাড়া তুর্কী ও গ্রীকগণ লোক বিনিময়ে সম্মত হয়। মোসুল প্রশ্নটি জাতিপুঞ্জের এক্তিয়ারে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। চারি বৎসরের ধৈর্য, আত্মদান, কুটনীতি ও যুদ্ধের পর মুস্তাফা কামাল ও তাঁহার সহকারীগণ তাঁহাদের উদ্দেশ্য হাসিল করেন। কামালী তুরস্ক ওসমানীর সাম্রাজ্যের চেয়ে অনেক ছোট কিন্তু ইহা অনেক সন্নিবেশিত ও নিয়ন্ত্রণশীল এবং শক্তিশালী একটি রাষ্ট্র।

তুর্কী সংস্কারসমূহ

মুস্তাফা কামালের জন্য বিদেশী হস্তক্ষেপ হইতে স্বাধীনতা অর্জন করাই শেষ নহে বরং একটি নতুন তুরস্ক গড়িয়া তুলিবার ব্যাপারে তুর্কীদিগকে সুযোগ প্রদানের একটি পন্থা মাত্র। ইহা জীবনের প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে সুদূর প্রসারী সংস্কারের দ্বারা লাভ করা সম্ভব। মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদীদের প্রবর্তিত অধিকাংশ সংস্কারের কর্মসূচী তাঞ্জিমাত হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক তুর্কী বুদ্ধিজীবী সংস্কারক প্রস্তাব করেন ও আলোচনা করেন। মুস্তাফা কামাল যে মৌলিক ভাবধারার প্রবর্তন করিয়াছেন তাহা নহে বরং তাঁহার অবদান হইল, তিনি যুক্তিসঙ্গত কতকগুলি ভাবধারা হইতে একটি বাস্তব কর্মসূচী গ্রহণে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি নব্য ওসমানীর নহেন বরং একটি নব্য-তুর্কী শিশু এবং প্যান তুর্কীর তুলনায় তিনি একজন সাধারণ তুর্কী। তাঁহার তুর্কীকরণের ভাবধারা অতুর্কীদের উপর তুর্কী ভাষা ও সংস্কৃতি চাপাইয়া দেওয়া নহে বরং তুর্কী ভাবধারা এমন কি অ-তুর্কী অঞ্চল ও লোকজন হইতে মুক্তি লাভ করা।

এইসব ভাবধারার কিছু কিছু প্রসিদ্ধ সমাজবিজ্ঞানী জিয়া গোকাল্প্ (১৮৭৬—১৯২৪) সামঞ্জস্য বিধান করেন। মুস্তাফা কামাল সহ অনেক তুর্কী জাতীয়তাবাদী তাঁহার রচনায় প্রভাবান্বিত হন। গোকাল্প্

সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে আলাদা করেন এবং তুর্কী জাতীর সংস্কৃতির মধ্যে "পাশ্চাত্য সভ্যতাকে সম্পূর্ণভাবে গাঁথিয়া লইবার" প্রস্তাব করেন। তাঁহার মতে বিগত সংস্কারকদের গলদ হইল পাশ্চাত্যের সভ্যতার সহিত প্রাচ্যের সভ্যতার সমন্বয়ের প্রচেষ্টা। গোকাল্পের মতানুসারে সভ্যতাসমূহ একটি অপরটির সহিত তুলনাহীন বলিয়া এইগুলি মিশিয়া যায় না। তুর্কীদের কর্তব্য হইল প্রাচ্য সভ্যতা হইতে মুক্ত হওয়া, তুর্কী সংস্কৃতি পুনরায়ত্ব করা এবং তাহাদের সংস্কৃতির মধ্যে পাশ্চাত্য সভ্যতা গাঁথিয়া ফেলা। গোকাল্পের নিকট তুর্কী সংস্কৃতি হইল কিছুটা আদর্শ গ্রাম্য রীতি, ইসলাম এবং কিছুটা আধুনিক ভাবধারার সংমিশ্রণ, তবে এইগুলি তুর্কী ভাষার মাধ্যমে, ধর্মীয় ব্যাপারে তুর্কীবাদ হইল তুর্কী ভাষায় কোরান তেলাওয়াত করা, আযান দেওয়া ও নামাজ পড়া। আইনগত দিক হইতে ইহা দ্বারা আধুনিক আইন প্রবর্তন করা বুঝায় এবং নৈতিকতার দিক হইতে ইহা দ্বারা বুঝায় তুর্কীদের প্রাচীন যুগের "গণতন্ত্রে" ফিরিয়া যাওয়া। তুর্কীবাদকে বলা হয় একটি "বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ও সাহিত্যিক আন্দোলন", কিন্তু রাজনৈতিক আন্দোলন নহে। অবশ্য তুর্কীবাদ "আমাদের মহান মুস্তাফা কামালের...পিপল্‌স পার্টিকে" সমর্থন করে, কারণ তিনি "দেশকে আক্রমণ হইতে রক্ষা করেন এবং তৎসঙ্গে আমাদের রাষ্ট্র, জাতি ও ভাষাকে প্রকৃত নামে সম্বোধন করেন..." অর্থাৎ তুর্কী নামে। গোকাল্পকে শেষের দিকে তুর্কী জাতীয়তাবাদের দার্শনিক বলা যায়, যে জাতীয়তাবাদের রূপদানকারী ও উৎসাহদাতা হইলেন কামাল আতাতুর্ক।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে আরজেরুম ও সিভাসে সম্মেলন আহ্বানকারী পূর্ব এশিয়া মাইনর প্রতিরক্ষা কমিটি (Committee for the Defence of Eastern Asia Minor) ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ক্রমশঃ পিপলস পার্টি বা হাক ফিরকাশি (Halk Firkasi)-তে রূপান্তরিত হয়। এই দল ছয় দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে, যাহাকে "কামালের ছয় নীতি" বলা হয়। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে এইগুলিকে তুর্কী শাসনতন্ত্রে সন্নিবেশিত করা হয়। অবশ্য এই ছয় নীতি ঘোষণার পূর্বে ও পরে সমস্ত সংস্কার এইগুলির উপর ভিত্তি করিয়া প্রবর্তন করা হয়। এই সব নীতি হইল ঃ

১। প্রজাতন্ত্রবাদ, যাহা জনগণের সার্বভৌমত্ব সূচনা করে।

২। জাতীয়তাবাদ, যাহা তুরস্ককে তুর্কীদের বলিয়া দাবী করে এবং অ-তুর্কী জনগণ সংবলিত অঞ্চলসমূহের উপর ইহাদের আধিপত্য অস্বীকার করে।

৩। জনগণবাদ, যাহা মিল্লাত প্রথা বাতিল করে এবং আইনের চোখে সমস্ত শ্রেণীর জনগণের সমতা ঘোষণা করে।

৪। রাষ্ট্রবাদ, যাহা জাতীয় অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের গঠনমূলক হস্তক্ষেপের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে।

৫। ধর্মনিরপেক্ষতা, যাহা ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথক নীতি প্রতিষ্ঠা করে।

৬। সংস্কারবাদ যাহা জাতীয় স্বার্থে অপ্রয়োজনীয় ঐতিহ্য ও দৃষ্টান্ত পরিবর্তন ও ছাঁটাই করিবার একাগ্রতার উপর জোর দেয়।

এখানে উল্লেখ করা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে, ভয়াবহ গোলযোগ, ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে আতাতুর্কের মৃত্যু এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সত্ত্বেও উপরের নীতিগুলির বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। অধিকন্তু এইসব নীতি ও অন্যান্য সংস্কার সমূহের প্রধান উদ্দেশ্য হইল প্রাচ্য সভ্যতার পরিবর্তন করিয়া তদস্থলে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রবর্তন করা। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশসমূহ এই উভয় সভ্যতার সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তুর্কীগণ প্রাচ্যের দিকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া নিজদিগকে ইউরোপের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য করিতে চেষ্টা করে।

ইসলাম যেহেতু ধর্মীয় ও জাগতিক কার্যাবলীর মধ্যে পার্থক্য করিবার নীতি প্রত্যাখ্যান করে, তাই ইহা জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে অনুপ্রবেশ করে এবং সমস্ত কার্যাবলীকে স্বীয় আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে। শুধু নামাজ বা হজ নহে, বরং সরকার ও বাণিজ্য, শান্তি ও যুদ্ধ, যৌন বিষয়াদি, বিবাহ ও তালাক এবং এমনকি পোশাক-পরিচ্ছেদ, কোরান ও হাদিস অথবা রীতি ও ঐতিহ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং প্রায় অবশ্য পালনীয়। ফলে আলোচ্য সংস্কারগুলির প্রত্যেকটির সহিত ইসলামের সম্পর্ক বিদ্যমান। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে আতাতুর্কের মৃত্যু পর্যন্ত তুরস্কের সরকার ও জনগণের প্রধান কার্যাবলী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অথবা আইন অথবা জীবন ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করিয়া নতুন আইন সংবিধানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

১। **সুলতানাত বিলুপ্তি ঃ** গ্রীকদের বিরুদ্ধে সামরিক বিজয় এবং

বৃটিশদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ১লা নভেম্বর গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল এসেম্বলি সুলতান পঞ্চম মুহাম্মদকে পদচ্যুত করে। আতা-তুর্কের অন্তরে সম্ভবতঃ সুলতানাতের বিলুপ্তি ঘটে প্রথম হইতেই, কিন্তু তিনি প্রকাশ করেন নাই। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে আরজেরুম ও সিভাসের সম্মেলনে প্রতিনিধিগণ সুলতানের জন্য সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন যে তিনি মিত্রপক্ষের হাতে 'বন্দী'। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসেও এমনকি শেখ উল-ইসলাম কর্তৃক জাতীয়তাবাদীদের নিন্দা করিবার পরও আঙ্কারার হাজী বৈরাম মসজিদে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল এসেম্বলি সুলতানের 'পবিত্র' আত্মার জন্য মোনাজাত করে। পঞ্চম মুহাম্মদ জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহে ব্যস্ত থাকিলেও তাহারা জনসাধারণকে 'বন্দী' হইতে সুলতানকে 'উদ্ধার' করিতে বলে। এইসব মন্তব্য সম্ভবতঃ সুলতানের কপট নিরা-পত্তার জন্য প্রকাশ করা হয় নাই, যদিও এইগুলির মধ্যে বেশ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। প্রকৃত ব্যাপার হইল আঙ্কারার জাতীয়তাবাদীদের অনেকেই ওসমানীয় বংশের বিলুপ্তি কামনা করে নাই, বরং একটি শাসনতান্ত্রিক সুলতান আশা করিয়াছিল। এমনকি সুলতান ও তাঁহার পরিবার একটি বৃটিশ জাহাজে করিয়া নির্বাসনে যাইবার সময়ও তাঁহার চাচাত ভাই আবদুল মজিদকে খলিফা বলিয়া মনোনয়ন দান করা হয়। প্রায় এক বৎসর পর ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল এসেম্বলি তুরস্ককে একটি প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করে এবং মুস্তাফা কামালকে ইহার প্রথম প্রেসিডেণ্ট হিসাবে গ্রহণ করে।

২। **খিলাফতের বিলুপ্তি :** সুলতানের বিলুপ্তির দ্বারা অনেক তুর্কী দুঃখিত হয়, কিন্তু খিলাফতের বিলুপ্তির পর সমস্ত বিশ্বের সুন্নী মুসল-মানগণ মর্মাহত হয়। এই সিদ্ধান্তও অতি সাবধানে লওয়া হয়। আতা-তুর্ক ইসলাম সম্পর্কে পড়াশুনা করেন এবং আঙ্কারার উলামাদিগকে এ বিষয়ে তাঁহার জ্ঞানের দ্বারা অভিভূত করেন। এমনকি ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে সিভাসে একটি প্যান ইসলামী সম্মেলন আহ্বানও তিনি নীরবে অনুমোদন করেন। গ্র্যাণ্ড ন্যাশনাল এসেম্বলির সদস্যদের এক পঞ্চ-মাংশ ছিল উলামা। আতাতুর্কের সহচরদের অনেকেই একটি উদার ইসলামী রাষ্ট্র কামনা করেন। একজন প্রখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী হিসাবে আতাতুর্ক

সম্ভবতঃ মনে করেন যে রাষ্ট্র ইসলামী হইলে উদার হইতে পারে না। তবে জনগণের মনে খলিফা আবদুল মজিদ ও সুলতান আবদুল মজিদ অভিন্ন। সর্বদা ইহা অভিন্নই ছিল। ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানী লোকদের বিবেচনায় সুলতানের ক্ষমতা ছাড়া খেলাফতের পদ বিধি বিরুদ্ধ। প্রশ্নটি এসেম্বলিতে আলোচিত হয় এবং ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের ৩রা মার্চ খলিফার পদ বিলোপ করা হয়। আবদুল মজিদ এবং ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ওসমানের পরিবারের সদস্যবৃন্দকে তুরস্ক হইতে বহিষ্কার করা হয়। ওসমানীয়গণ ৬২৫ বৎসর রাজত্ব করেন। খেলাফত প্রতিষ্ঠানটি অন্য কিছু দ্বারা পূরণ করা হয় নাই।

৩। ইসলামী আইনের বিলুপ্তি : সুলতানাত ও খেলাফতের বিলুপ্তির দ্বারা সাধারণ তুর্কীদের দৈনন্দিন জীবনে কোন পরিবর্তন আসে নাই। অবশ্য খেলাফতের বিলুপ্তির ফলে এমন কতকগুলি সুদূর প্রসারী সংস্কারের দ্বার উন্মুক্ত হয় যাহা প্রত্যেক ব্যক্তিকে আঘাত করে এবং সমস্ত দেশকে আন্দোলিত করে। এইগুলির মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি হইল ইসলামী আইন বা শরিয়তের বিলুপ্তি। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের বিচার সংক্রান্ত সংস্কার ধর্মীয় বিচারালয়সমূহকে বাদ দিয়া তদস্থলে সুইস বেসামরিক এবং ইতালীয় দণ্ডবিধি চালু করে। এই বিধির ফলে উলামাগণ অকেজো হইয়া যান। আইন ব্যবসায়ে তাঁহাদের একচেটিয়া অধিকার ছিল। একমাত্র যাঁহারা পাশ্চাত্য আইন অধ্যায়ন করিয়াছেন তাঁহারাই ওকালতি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন। বস্তুতঃ ইসলামী আইন শিক্ষার সমস্ত বিদ্যালয়ই বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ধর্মতত্ত্ব বিভাগ এত ছোট হইয়া যায় যে ইহাকে শেষ পর্যন্ত সাহিত্য বিভাগের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। শেখ উল-ইসলামের পদ বিলুপ্ত করা হয় এবং তদস্থলে প্রধান মন্ত্রীর পদের সহিত দুইটি সংস্থা সংযুক্ত করা হয়। এই সংস্থাগুলির কাজ হইল সমস্ত ধর্মীয় বিষয়াদি পরিচালনা করা। উহাদের একটির নাম ধর্মীয় কার্যাবলী সংস্থা (Bureau of Religious Affairs)। ইহা ধর্মপ্রচারকদিগকে লাইসেন্স প্রদান করে, ধর্মীয় ভাষণ পরীক্ষা করে এবং শরিয়তের বিভিন্ন বিষয়ের উপর উপদেশ দান করে। দ্বিতীয়টির নাম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সংস্থা (Bureau of Religious Foundation) বা

আওকাফ। ইহা ধর্মীয় দান সম্পত্তি পরিচালনা করে।

ইসলামী আইনের পরিবর্তে ইউরোপীয় আইন চালু করা হয় এবং সম্ভবতঃ কিছু সংখ্যক নেতা ইহার দ্বারা বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারাকে ধর্মীয় মনোভাব হইতে পরিবর্তন করিয়া বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদের দিকে ফিরাইবার আশা করেন। সরকারী নীতি হিসাবে ধর্মতন্ত্রকে শুধু প্রত্যাখ্যানই করা হয় নাই বরং জাতির ধর্মীয় স্বভাবকেও পরিবর্তন করা হয়। আতাতুর্ক বলেন, "আমরা এখন বিজ্ঞান ও সভ্যতাকে জীবন ও শক্তির আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি" এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকে "বাঁচিবার একমাত্র উপকরণ" বলিয়া মনে করি।

৪। **ইসলামী পঞ্জিকার বিলুপ্তি :** যে বৎসর শরিয়ত বাদ দেওয়া হয় সেই একই বৎসর (১৯২৬) মুসলিম পঞ্জিকার পরিবর্তে খ্রীস্টান পঞ্জিকা চালু করা হয়। বহু বৎসর ধরিয়া তুর্কী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলি মুসলিম চান্দ্র তারিখ এবং পশ্চিমা সূর্য তারিখ উভয়ই ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল। সমস্ত মুসলিম অনুষ্ঠানাদি ও ধর্মীয় তারিখগুলি মুসলিম পঞ্জিকা অনুসারে সম্পন্ন হইত। তবে রাষ্ট্র পাশ্চাত্য পঞ্জিকা প্রবর্তন করে এবং নাগরিকদিগকে সর্বোতভাবে ইহা ব্যবহার করিতে নির্দেশ প্রদান করে। প্রাচ্য হইতে দূরে সরিতে এবং পাশ্চাত্যের ঘনিষ্ঠ হইবার পক্ষে ইহা আরেকটি পদক্ষেপ। পঞ্জিকা পরিবর্তনের সাথে সাথে রাজধানীও পরিবর্তন হয়। নতুন মনোভাবের পক্ষে ইস্তাম্বুল অতি ওসমানীয় এবং 'বিদেশী' আঙ্কারা আনাতোলিয়ায় অবস্থিত, যেখানে 'প্রকৃত' তুর্কীদের বাস। ইস্তাম্বুলে অসংখ্য মসজিদ বিদ্যমান, কিন্তু পুরাতন আঙ্কারা শহরের নিকটে নির্মিত নতুন নগরীতে কোন মসজিদ স্থাপিত হয় নাই। তদুপরি আঙ্কারা শহর একটি কৃষিপ্রধান জেলার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত বলিয়া সরকারী কর্মকর্তাগণ ওসমানীয়দের ন্যায় চতুর্দিকে বসবাসকারী তুর্কী চাষীদিগকে অবহেলা করিতে পারে না।

৫। **আরবী বর্ণমালার বিলুপ্তি :** প্রাথমিক যুগের দিগ্বিজয়ীদের আশানুযায়ী বিভিন্ন ভাষাভাষী মুসলমানগণ আরবী ভাষা গ্রহণ না করিলেও আরবী বর্ণমালা গ্রহণ করে। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শব্দ না বুঝিলেও কোরান পড়িতে পারা। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী এসেম্বলি আরবী

বর্ণমালার স্থলে তুর্কীভাষার প্রয়োজন অনুযায়ী লাতিন বর্ণমালার প্রবর্তন করে। আতাতুর্ক তুর্কীভাষায় কোরান অনুবাদ করিয়া নতুন বর্ণমালায় তাহা প্রকাশ করিতে আদেশ দেন। তিনি তুর্কীভাষায় আযান দিতেও আদেশ দেন এবং জনসাধারণকে তুর্কীভাষায় নামাজ পড়াইবার চেষ্টা করেন। সমস্ত মুসলমানদিগকে তুর্কীভাষায় নামাজ পড়াইতে তিনি পারেন নাই; কিন্তু বর্ণমালা পরিবর্তনের ফলে নতুন বংশধরগণ আরবী ভাষায় কোরান পড়িতে অক্ষম হইয়া পড়ে। শুধু অত্যন্ত খাঁটি মুসলমানগণ তাহাদের সন্তানদিগকে আরবী বর্ণমালা শিখাইবার কষ্ট স্বীকার করে।

বর্ণমালা পরিবর্তনের পিছনে জনসাধারণকে কোরান তেলওয়াত বিমুখ করিবার কোন উদ্দেশ্য আতাতুর্কের ছিল না। তিনি নিরক্ষরতা দূর করিতে চান এবং একটি সমন্বয়পূর্ণ ও যুক্তিযুক্ত তুর্কীভাষা গড়িয়া তুলিতে সচেষ্ট হন। তিনি সঠিকভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে একজন তুর্কীর পক্ষে লাতিন বর্ণমালার মাধ্যমেই সহজে লেখা-পড়া শেখা সম্ভব। তিনি এবং এসেম্বলির সদস্যবৃন্দ প্রত্যেকে এক একটি কালবোর্ড লইয়া গ্রামে ও শহরে যান এবং প্রমাণ করেন যে মাধ্যম হিসাবে লাতিন বর্ণমালাই সহজতর। দেশের ক্রমবর্ধমান বিত্তালয়ের পাঠ্যবই মুদ্রণের কাজ নতুন বর্ণমালা উদ্ভাবনের ফলে বিঘ্নিত হয়, কিন্তু তবুও ইহা কার্যকর হয়। এই প্রথমবারের মত সর্বত্র তুর্কীগণ বুঝিতে পারিল একটি শব্দ কিভাবে লিখিয়া উচ্চারণ করিতে হয়।

৬। উপাধি বিলুপ্তিঃ বে, পাশা ইত্যাদি উপাধির প্রচলন জনগণবাদ নীতির বিরোধী। এই নীতি আইনের চোখে সকল মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। ওসমানীয় যুগের শেষের দিকে উপাধিসমূহ সর্বোচ্চ ডাক প্রদানকারীর নিকট বিক্রয় করা হইত এবং ইহা একটি মিথ্যা শ্রেণী বিভেদ সৃষ্টি করিত। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে সমস্ত উপাধি বিলোপ করা হয় এবং তুর্কীদিগকে পারিবারিক নাম গ্রহণ করিতে আদেশ দেওয়া হয়। কোন দুই পরিবারকে একই নাম গ্রহণ করিতে দেওয়া হয় না, তবে যদি প্রথম গ্রহণকারী অনুমতি দেয় তাহা হইলে সরকার কোন আপত্তি করে না। অনেককে খাঁটি তুর্কীনাম গ্রহণ করিবার জন্ত উৎসাহ প্রদান করা হয়। এই আইনের সহিত সামঞ্জস্ত রাখিয়াই মুস্তাফা কামালকে এসেম্বলি আতাতুর্ক বা জাতির পিতা নাম প্রদান করে।

১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দের ৮ই মে উপ-ভূম্যাধিকারী স্বত্ব বিলোপ করা হয় এবং একই বৎসর ২৬শে মে মিসর জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ লাভ করে। কিছুকালের জন্য প্রধান মন্ত্রী ও অল্পবয়স্ক রাজার পরিচালক হিসাবে নাহাস পাশা দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হন। কিন্তু ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে ফারুক বয়ঃপ্রাপ্ত হন এবং পুনরায় প্রাসাদ ও ওয়াফদ্ পার্টির পুরাতন প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। রাজা নাহাস পাশাকে বরখাস্ত করেন এবং অ-ওয়াফ্‌দি মাহমুদ পাশাকে প্রধান মন্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করেন, যিনি একটি ওয়াফ্‌দি পার্লামেন্টের মোকাবিলা করেন। কয়েক বৎসর পর ওয়াফদ্ পার্টি ইহার সচেতনতা ও প্রভাব হারাইয়া ফেলে। নাহাস পাশা জগলুলের ন্যায় বিচক্ষণ ছিলেন না। ওয়াফদ্ দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা নেতৃত্ব লাভ করেন, এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ শিকারী হন তাঁহাদের কেউ কেউ দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠেন এবং অন্যান্যগণ বৃদ্ধ ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়েন। অধিকন্তু তাঁহাদের জনপ্রিয়তার উৎস সেই বৃটিশ বিরোধী উৎসাহও শেষ হইয়া যায়। পরবর্তী কালে নব্য জাতীয়তাবাদীগণ ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের চুক্তিকে "শটগান বিবাহ" হিসাবে বিরোধিতা করে এবং ওয়াফ্‌দ পার্টিকে ইহার জন্য দায়ী করে।

সামাজিক ও বুদ্ধিমত্তার পরিবেশ

মিসরের নেতৃবৃন্দ দুইটি মহাযুদ্ধেই বৃটিশদের পক্ষে থাকিবার ফলে তাঁহারা সামাজিক সংস্কারের প্রতি মনোযোগ দিবার সুযোগ পান নাই। বৃটিশগণও সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের ব্যাপারে যুদ্ধের পূর্বে যেরূপ উৎসাহী ছিল তাহার পরে অধিক আগ্রহী হয় নাই। বস্তুতঃ বৃটিশগণ দেশকে করায়ত্ত রাখিয়াও ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে একতরফাভাবে এবং ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে মিসরের সহিত চুক্তির মাধ্যমে মিসরের উন্নতি সাধনের দায়িত্ব পরিত্যাগ করে। এতদ্‌সত্ত্বেও বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং কোন বিশেষ মহলের সতর্ক পরিকল্পনা ছাড়াই বিভিন্ন পরিবর্তন সাধিত হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মুদ্রাস্ফীতি ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ঘাটতির দরুন গ্রামবাসী ও ছোট ছোট শহরের অধিবাসীবৃন্দ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিন্তু কায়রো ও আলেকজান্দ্রিয়া এবং অন্যত্র যেখানে সেনানিবাস বিদ্যমান ছিল সেখানে সমৃদ্ধিশালী ব্যবসা জমিয়া উঠে। শহরে লোকজন প্রচুর লাভবান

হয় এবং কর্ম ও খাদ্যান্বেষী কৃষকগণ শহরের দিকে ছুটিয়া যায়। শহরগুলিতে জমির দাম বৃদ্ধি পায় এবং ঘরভাড়া ৬০ শতাংশ হইতে ১০০ শতাংশে উঠিয়া যায়। তুলার চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং শহরগুলিতে দ্রুতগতিতে গৃহ নির্মাণ কাজ চলিতে থাকে। এই সব কিছুর দ্বারা একটি নব্য ধনী শ্রেণী জন্মলাভ করে, যাহা পুরাতন বিত্তশালী লোকদের সহিত যোগদান করে এবং জমিদার, ব্যবসায়ী ও পেশাগত শ্রেণী সংবলিত একটি রাজনৈতিক জোটের সৃষ্টি করে। ইহারা নিজেদের অর্থনৈতিক সুবিধাদি রক্ষা করিবার জন্য সম্মিলিত হয় এবং তৎসঙ্গে গ্রেট ব্রটেন হইতে ক্ষমতা কাড়িয়া লইতেও প্রয়াস পায়।

যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জামের চাহিদা মিটাইবার জন্য কিছু সংখ্যক শিল্পকারখানা গড়িয়া উঠে। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে মিসরে ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সুতা, সিল্ক, পশম, সিগারেট, সাবান, জাহাজ চলাচল, বীমা, চলচ্চিত্র ও অন্যান্য কারখানাও ক্রমশঃ গড়িয়া উঠে। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে মিসরীয় শিল্পসংস্থা (Egyptian Federation of Industries) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ ইহার সদস্য সংখ্যা ৪৩০-এ উন্নীত হয়। একটি নতুন বাণিজ্যিক মধ্যবিত্তের সৃষ্টি হয় যাহা উন্নতিশীল এবং অপেক্ষাকৃত স্বল্প উন্নতিশীল কিন্তু মার্জিত রুচির শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত আরও সুসংগঠিত মধ্যবিত্তের সহিত মিলিত হয়। এই বাণিজ্যিক শ্রেণী ভূপতি শ্রেণীকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালায় নাই বরং ইহার সহিত মিশিয়া যায় এবং মোট জনসংখ্যার ২০ শতাংশ সংরক্ষিত শাসক শ্রেণীর জন্ম দেয়। জন সংখ্যার বাকী ৮০ শতাংশ গ্রামে বাস করে; ইহাদের ৯০ শতাংশ অশিক্ষিত।

নতুন কলকারখানা নিত্য নতুন চাহিদা সৃষ্টি করে এবং এই চাহিদা পূরণ করিবার দ্বারা জীবনের গতি ও মূল্য পরিবর্তিত হইয়া যায়। সংবাদ সংস্থা, বেতার ও টেলিফোনের ন্যায় নতুন শিল্পকারখানাসমূহও এক নতুন ধরনের শিক্ষা দাবী করে। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে এবং ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের বিপ্লব পর্যন্ত দুই ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা চালু থাকে, প্রত্যেকটি অপরটি হইতে পৃথক এবং প্রত্যেকটি ইহার নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। পবিত্র আজহার বিশ্ববিদ্যালয় তখন সগৌরবে বিদ্যমান, যাহা ইহার চারি

দেওয়ালের বাহিরের পৃথিবী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ অবস্থায় পুরাতন ধর্মীয় শিক্ষা চালাইয়া যায়। আজহারের অধিকাংশ শেখ আধুনিকতা প্রত্যাখ্যান করেন এবং কোন পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন না। এমন কি নতুন অবস্থার সহিত খাপ খাইবার জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবর্তনে বিশ্বাসী মুহাম্মদ আবদুহুর ন্যায় ব্যক্তিও কোন মৌলিক ধর্মতাত্ত্বিক পুনর্গঠনের আয়োজন করেন নাই। আজহারীগণ মতবাদের উপর কোন বিতর্কে অবতীর্ণ হন না। অপরদিকে আধুনিক স্কুলসমূহ আজহারের প্রতিবিরূপ এবং তাহারা তাহাদের নিজস্ব জীবন পদ্ধতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলে। তাহারা যে ইসলামকে প্রত্যাখ্যান করে তাহা নহে, কিন্তু তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা ও পাঠ্যসূচী সম্পূর্ণভাবে পাশ্চাত্য হইতে ধার করা এবং সম্পূর্ণভাবে আজহারের প্রভাবমুক্ত, কারণ আজহার পুরাপুরিভাবে শরিয়তের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষার আগমন মিসরে তেমন ধীর গতিসম্পন্ন নহে। পুরুষগণ ইউরোপীয় পোশাক পরিধান করে, মহিলাগণ পর্দা ছাড়া বাহির হইয়া আসে, ইউরোপীয় আইন জনপ্রিয় হইয়া উঠে এবং বাল্যবিবাহ বিলুপ্ত হয়। নব্য ধনীশ্রেণী যতই পাশ্চাত্যমুখী হইয়া উঠে, শেখগণ ততই আরও কঠোর হইয়া উঠেন এবং একটি মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী আবদুহুর ন্যায় ব্যক্তিবর্গ বিস্মৃত হন।

১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের স্বাধীনতার সময় বুদ্ধিমত্তা ও ধর্মীয় দিক হইতে মিসরে চারিটি পৃথক শ্রেণী বিদ্যমান ছিল। এইগুলির দুইটি দল অর্থাৎ আজহারের অতিগোড়া শ্রেণী এবং আবদুহুর ন্যায় মধ্যমপন্থী সংস্কারবাদী শ্রেণীর সহিত আমরা ইতিমধ্যে পরিচিত। তৃতীয়টি জঙ্গী মুসলিম শ্রেণী এবং চতুর্থটি একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উদ্যোক্তা।

মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ (Muslim Brotherhood)

অন্ততঃপক্ষে তিনটি কারণবশতঃ জঙ্গী মুসলিম শ্রেণীগুলির জন্ম হয় যাহা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বেশ পরে পর্যন্ত মিসরে প্রবল প্রভাব বিস্তার করে। একটা হইল বৃটিশদের উপস্থিতি এবং ভক্ত-মুসলমানদের মধ্যে খ্রীস্টানদের দ্বারা শাসিত হইবার অপমানজনিত অনুভূতি। দ্বিতীয় কারণ হইল, মিসরীয় শিক্ষিত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অতি দ্রুত ধর্মনিরপেক্ষতা এবং পাশাপাশি মুসলিম আইন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের অবনতি। তৃতীয় কারণ হইল,

তুরস্ক-ভীতি এবং মিসরীয় দৃষ্টিতে সে দেশের ইসলামহীনতা। তুর্কীগণ কর্তৃক খেলাফত বিলোপের ফলে আজহারের শেখগণ এতই বিচলিত হইয়া পড়েন যে, তাঁহারা ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে খিলাফতের উপর একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। ৩৮ জন প্রতিনিধির মধ্যে এক তৃতীয়াংশ আসেন মিসরীয়। সম্মেলন কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়, তবে ইহা মিসরীয় ও অন্যান্য মুসলমানদের নিকট অবস্থার জটিলতা প্রকাশ করে।

জঙ্গী মুসলমানগণ হইল আরবের[১] মৌলিক নীতিবাদী ওয়াহাবী ও জঙ্গী জামাল আল-দীন আফগানীর[২] আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী। মিসরের দুইটি যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে সংগঠিত জঙ্গী দলগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, প্রভাবশালী ও সর্ববৃহৎ হইল মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ (Muslim Brotherhood) বা জমিয়ত আল-ইখওয়ান আল-মুসলিমিন। সুয়েজ খালের ইসমাইলীয়া নগরে ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে হাসান আল-বান্না নামক ২২ বৎসরের একজন স্কুল শিক্ষক ইহা আরম্ভ করেন। তিনি এবং ছয়জন যুবক সহকর্মী এই আন্দোলন আরম্ভ করেন। তাঁহাদের পাথেয় হইল শুধুমাত্র ইসলামের যথেষ্টতায় প্রবল বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসে চরম আস্থা। অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ের মধ্যে মিসর ও অন্যান্য মুসলিম দেশে ইহা একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয় এবং ৪০ বৎসর পর বর্তমানেও ইহা গণ্য করিবার মত একটি শক্তি। ইহার মিশনারী উৎসাহ ও সংগঠনের দিক হইতে বিচার করিলে ইহাকে মধ্য যুগের অকপট ভ্রাতৃ সংঘ[৩] (Brothren of Sincerity) নামক ইসমাইলীয়া দলের সহিত তুলনা করা চলে। জঙ্গীপনা ও প্রতিক্রিয়ার দিক হইতে ইহা আরেকটি ইসমাইলীয়া প্রতিষ্ঠান, আসাসীনদের অনুকরণ করে।

ভ্রাতৃসংঘের তেজস্বী ও সুদক্ষ যুবক নেতা ইসমাইলীদের ন্যায় শীয়া নহে বরং একটি কঠোর সুন্নী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত, যে পরিবার ওয়াহাবীদের ন্যায় মৌলিকনীতিবাদী হাম্বলী প্রতিষ্ঠানের অনুসারী। অবশ্য তিনি ইসমাইলী সংগঠনের কৌশল ধার করেন। ভ্রাতৃসংঘের সর্বময় নেতা হিসাবে হাসান আল-বান্নাকে মুর্শিদ আল-আম বা সাধারণের পথ প্রদর্শক বলা হয়।

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৪২।
২। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৪৪।
৩। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ১১৩।

তাঁহার অধীনে কার্যরত বিশিষ্ট একটি উৎসর্গীকৃত দলকে বলা হয় দা'য়ি বা ভক্ত। ইসমাইলীয়াও একই নাম ব্যবহার করে। কায়রোতে অবস্থিত এই আন্দোলনের সাধারণ কেন্দ্রস্থলকে বলা হয় দার, এবং এই সব আধুনিক অফিসসমূহ হইতে সর্বাধিনায়ক কর্তৃক ভ্রাতৃসংঘের বিভিন্ন কর্মসূচী প্রচারিত হয়।

মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ একটি জঙ্গী মনোভাবাপন্ন দল। ইসলামের স্বয়ং সম্পূর্ণ ও সর্বময় কর্তৃত্ব এবং কোরান ও সুন্নাহর অবিকল ব্যাখ্যায় ইহা বিশ্বাস করে। ইহা জিহাদ বা ধর্মীয় যুদ্ধের আদর্শ পুনর্জীবিত করিবার জন্য চেষ্টা করে। তবে ওয়াহাবীদের তুলনায় ইহা সংস্কার এবং কিছু কিছু পাশ্চাত্য প্রথানুসরণে বিশ্বাস করে। আবদুহুর মত ভ্রাতৃসংঘ ইসলামী মতবাদের পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করে না। ইহা মুসলিম জীবনের ধর্মনিরপেক্ষ রূপদানের ঘোর বিরোধী এবং কোরানী আইনের পুনঃস্থাপনের জন্য কাজ করে। ইহা প্যান-ইসলাম পন্থী, এবং সমস্ত মুসলমানদের সামরিক প্রস্তুতির প্রয়োজনীয়তা প্রচার করে। "একটি শক্তিশালী সেনাবাহিনী, নামাজ বা রোজার চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া ভ্রাতৃসংঘ ঘোষণা করে।" ইহা মুসলমানদের জন্য আল্লাহর সরকার, তৎসঙ্গে সংখ্যালঘুদের জন্য কোরানের সহিষ্ণুতার উপর জোর দেয়, তবে সংখ্যালঘুদিগকে ইসলামের প্রতি অনুগত হইতে হইবে।

উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্য ও ভাবধারাসমূহ বিভিন্ন উপায়ে কার্যে পরিণত করা হয় ও শিক্ষা দেওয়া হয়। মিসরের বিভিন্ন নগর ও শহরে অবস্থিত ভ্রাতৃসংঘের শাখাসমূহ বয়স্কদের জন্য সান্ধ্যস্কুল পরিচালনা করে ও ইসলামের উপর বক্তৃতা দেয়। বালক ও বালিকা উভয়ের জন্য তাহারা দিনের বেলায়ও স্কুল খোলে। অতি গোঁড়াদের মত ভ্রাতৃসংঘ মহিলা শিক্ষার বিরোধী নহে, কিন্তু কখনও তাহারা সহশিক্ষায় বিশ্বাসী নহে। শহরে তাহারা জনহিতকর কাজ করে, পীড়িতদের শুশ্রূষার জন্য ডাক্তারখানা স্থাপন করে এবং দরিদ্রদের মধ্যে বিনাপয়সায় খাদ্য বিতরণ করে। তাহাদের মিশনারীগণ মসজিদে প্রচার কার্য চালায়। প্রত্যেক সদস্যকে তাহার জীবনের পাপকার্য ত্যাগের শপথ করিতে হয় এবং অন্যদিগকেও এই কার্য হইতে বিরত রাখিতে হয়। শরীয়তের এই গুরুত্বপূর্ণ নিষেধাজ্ঞার

মধ্যে রহিয়াছে জুয়াখেলা, নৃত্য, থিয়েটার ও চলচ্চিত্র, মদ্যপান ইত্যাদি। ভ্রাতৃসংঘের একটি যুব সংগঠনও থাকে। প্রায় ১৬ বৎসর বয়স্ক বালকগণ কাশ্‌শাফে যোগদান করে। ইহা অনেকটা স্কাউটিং-এর ন্যায় এবং তাহাদের কাজও প্রায় এক রকম। অতঃপর যুবকদল একটি আধা-সামরিক সংগঠনে যোগ দেয় এবং গোপনে কুচকাওয়াজ ও যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা লাভ করে।

ভ্রাতৃসংঘের সদস্যপদ গোপন রাখা হয় বলিয়া ইহার সঠিক কোন পরিসংখ্যান পাওয়া যায় না। অনুমান করা হয় যে ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ ভ্রাতৃসংঘের প্রায় ৫০০ শাখায় সদস্য সংখ্যা ছিল ৫০০,০০০। ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ ইহার শাখা ২০০০-এ দাঁড়ায় এবং সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ২,০০০,০০০ এ। ভ্রাতৃসংঘের আয়ের উৎসও অনুরূপ অজ্ঞাত। প্রাথমিক সদস্যগণ ছিল অধিকাংশই দরিদ্র ছাত্র, কিন্তু ছয় বৎসরের মধ্যে তাহারা তাহাদের কেন্দ্রস্থল কায়রোতে স্থানান্তর করিয়া তাহাদের সদস্যভুক্তির ভিত্তি বিস্তৃত করিতে সক্ষম হয়। তাহারা একটি ছাপাখানা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে, যথা ইসলামী ট্রানজাকশান কোম্পানী (Islamic Transaction Company), ইখওয়ান স্পীনিং এ্যাণ্ড ইউভিং কোম্পানী (The Ikhwan Spinning and Weaving Company) এবং কমার্শিয়াল এ্যাণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানী (Commercial and Engineering Company)।

মুসলিম ভ্রাতৃসংঘের নীতিবাক্য হইল, "আল্লাহ সর্বশক্তিমান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর" এবং তাহাদের প্রতীক হইল দুইটি তরবারীর মধ্যখানে কোরান। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে ভ্রাতৃসংঘ একটি নিমজ্জিত বরফ খণ্ডের ন্যায় বিদ্যমান থাকে, কারণ ইহার অধিকাংশ কার্যাবলী গোপনীয় থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ইহা আরও প্রকাশ্যরূপ লাভ করে এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া পরবর্তী অন্য একটি অধ্যায়ে আলোচনা করা হইবে।

ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্যোক্তাগণ

মিসরে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তাগণের মুসলিম ভ্রাতৃসংঘের ন্যায় কোন সংগঠন ছিল না। সম্ভবতঃ নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার দরুন তাহারা এইরূপ কোন সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে নাই। তদুপরি ধর্ম

নিরপেক্ষতাবাদীগণ এমন ব্যক্তিকেন্দ্রিক যে, কোন মতবাদ সৃষ্টি করিতে তাহারা নারাজ এবং মতবাদমূলক কোন সংগঠনের গণ্ডী অনুসরণ করিতেও তাহারা পরাঙ্মুখ। কেউ কেউ আবার অজ্ঞেয়বাদী এবং তাই ইসলাম বা কোন ধর্ম সম্পর্কে তাহারা অতি অল্পই তোয়াক্কা করে। আবার অনেকেই খাঁটি মুসলিম যাহারা মনে করে, ধর্ম একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার এবং সরকার হইতে ইহা পৃথক হওয়া উচিত। অজ্ঞেয়বাদী হউক বা বিশ্বাসী হউক, দুইটি ব্যাপারে তাহারা একমত। প্রথমতঃ তাহারা ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথক সত্তার এবং রাষ্ট্রের মধ্যে ধর্মীয় স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। দ্বিতীয়তঃ মিসরীয় জীবনে তাহারা "ইসলামী সংস্কৃতির" উপর গুরুত্ব আরোপে বিশ্বাসী। এমন কি খ্রীস্টান কিতাবীগণও এই আদর্শের উপর জোর দেয়। জীবনের অন্যান্য ধারার সহিত ইসলাম এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, কোন নাস্তিক যদি বলে যে সে মুসলমান নহে তবে ইহার দ্বারা বুঝাইবে যে সে মিসরীয় নহে। ধর্মীয় ও ধর্ম নিরপেক্ষ দলগুলি একে অপরের সহিত সহযোগিতা করে। কোন কোন ধর্মনিরপেক্ষবাদী ইসলামকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করে আবার কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবে ইহা পালন করে, কিন্তু জাতির উপর ইহা চাপাইতে নারাজ।

দুইটি যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে যে ব্যক্তি ধর্মনিরপেক্ষ ভাবধারার উন্মেষ সাধনে অত্যন্ত প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেন তিনি সম্ভবতঃ তাহা হোসেন (জন্ম ১৮৮৯)। এই অন্ধ প্রভাবশালী ব্যক্তি, শিক্ষক এবং মানবীয় গুণের অধিকারী আজহার ও ফ্রান্সে শিক্ষালাভ করেন। বলিতে গেলে তিনি আজহারের ধর্মীয় মৌলিকতাবাদ এবং পাশ্চাত্য কর্তৃক প্রাচ্যের উপর আধিপত্য করিবার ইচ্ছা, যেমন ফ্রান্সে দেখা যায়, উভয়টিই প্রত্যাখ্যান করেন। অবশ্য পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি ও সভ্যতার ব্যাপারে তাঁহার ভালবাসা ও প্রশংসা অপরিসীম। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভালবাসা হইতেই তিনি প্রাচ্যের সংস্কৃতিকে প্রশংসা করিতে শেখেন। ফ্রান্সে থাকা কালে তিনি উত্তর আফ্রিকার ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন সম্পর্কে লেখেন। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে একটি ফরাসী স্ত্রী লইয়া তিনি মিসরে প্রত্যাগমন করেন এবং তাঁহার সমস্ত উৎসাহ শিক্ষার ব্যয় করেন।

শিক্ষার উপর তিনি উপন্যাস, ইতিহাস, জীবনচরিত ও বিভিন্ন প্রবন্ধ

লেখেন। তবে তাঁহার অতি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হইল "প্রাক-ইসলামী কবিতা" ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত এবং "মিসরে সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ"; ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত। প্রথমটি মুসলিম বিশ্বকে মর্মাহত করে এবং তাঁহাকে ধর্মত্যাগী বলিয়া আখ্যায়িত করে। দ্বিতীয়টি আধুনিক মিসরীয় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কিছু কিছু বুদ্ধিমত্তার ভিত্তি স্থাপন করে।

তাঁহার প্রাক-ইসলামী কবিতা গ্রন্থে তাহা হোসেন মোয়াল্লাকা [১] নামে পরিচিত অনেকগুলি কবিতায় পাণ্ডিত্বে আধুনিক সমালোচনামূলক প্রক্রিয়া ব্যবহার করেন এবং এইগুলি আদৌ প্রাক-ইসলামী কিনা এই ব্যাপারে সন্দেহ প্রকাশ করেন। ইহা তুমুল আন্দোলন ও বিরোধিতার সৃষ্টি করে। ধর্মীয় সম্প্রদায় আশঙ্কা করে যে, যে কোন প্রাচীন মূল বচনের উপর সমালোচনামূলক প্রক্রিয়া প্রয়োগের দ্বারা কোরান ও হাদীসের সমালোচনা-মূলক পাঠে উৎসাহ প্রদান করা হইবে এবং ঐশী বাণীর সঠিকতার উপর সন্দেহ আরোপ করা হইবে। তদুপরি আরবী ভাষাকে এত পবিত্র জ্ঞান করা হয় এবং কোরান পাঠ এত অলঙ্ঘ্য যে ইহার কোন পরিবর্তনের দ্বারা ঈমান বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে। ইহার বিরুদ্ধে অনেক পুস্তক রচনা করা হয় এবং হোসেনের পুস্তক প্রত্যাহার করিতে হয়। কিন্তু তাহা হোসেনই সম্ভবতঃ প্রথম মুসলমান যিনি কোরানের উপর সমালোচনামূলক প্রক্রিয়া ব্যবহার করিতে উৎসাহ প্রদান করেন।

"মিসরে সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ" গ্রন্থখানি রচনা করা হয় ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের জন্য কিছু কর্মসূচী প্রদানের উদ্দেশ্যে। মিসরের উপর ইউরোপীয়দের বিশ্বাস এবং ইউরোপের পদাঙ্ক অনুসরণ করিবার মিসরীয় ওয়াদার নিদর্শন স্বরূপ ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে যুক্তিকে তাহা হোসেন আদর্শ হিসাবে তুলিয়া ধরেন। তাঁহার মতানুসারে পাশ্চাত্য সভ্যতা সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে, এবং ইহা উপলব্ধি করা যায় যখন লক্ষ্য করা হয় যে ইহা মানুষের কার্যাবলীতে গতি সঞ্চারের জন্য যুক্তির স্বাধীনতা দান করে এবং মানুষকে কাজে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ইহা ধর্মের স্বাধীনতা দান করে। এই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য মিসরকে তাহার স্বাধীনতার উপায় হিসাবে ব্যবহার করিতে হইবে। তিনি বিশ্বাস করেন যে

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৯

গ্রীক-রোমান সভ্যতার সহিত মিসরের সম্পর্ক রহিয়াছে বিধায় মিসর ইউরোপের একটি অংশ বিশেষ। তিনি তুর্কী সমাজবিজ্ঞানী জীয়া গোকালপের সমতুল্য।[১] কারণ গোকালপের ন্যায় তিনিও বলেন যে, মিসরীয়দের উচিত ইউরোপীয় সভ্যতা গ্রহণ করা, ইহার ধর্ম নহে, এবং তাহাদের মিসরীয় সংস্কৃতির সহিত ইহার সামঞ্জস্য বিধান করা। ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে ভাষা জাতীয়তাবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। আমরা ইতিপূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি যে, তুর্কীগণ আরবী ও ফার্সী ভাষা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, এবং পারস্যবাসীগণ আরবী ও তুর্কী ভাষা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। তাহা হোসেন আরবীর অতি প্রশংসা করেন, ধর্মের খাতিরে নহে বরং জাতির খাতিরে। এমন কি তিনি খ্রীস্টানদের ধর্মীয় রীতিনীতিতে ব্যবহৃত দুর্বল আরবীকে উন্নত করিবার জন্য স্বেচ্ছায় আগাইয়া আসেন যাহাতে মিসরীয় খ্রীস্টানগণ বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় তাহাদের রীতিনীতি পালন করিতে পারে।

সীমিত রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও বিভিন্ন মতাদর্শ লইয়া মিসরীয়গণ মহাযুদ্ধ অতিক্রম করে। অজ্ঞেয়বাদী ধর্মনিরপেক্ষ মতাদর্শী হইতে মৌলিক নীতিবাদী মুসলমান যাহারাই এই ব্যাপারে মাথা ঘামায় তাহারা মিসরের প্রতি অথবা ইসলামের প্রতি অথবা উভয়ের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিবার বিষয়ে চিন্তা করে। তাহারা নিজদিগকে "আরব" বলিয়া বিবেচনা করে না এবং তাই ফারটাইল ক্রিসেন্টের জনগণের কার্যাবলীতে অনেকেই নিজদিগকে জড়িত করে নাই। যুদ্ধের শেষ বৎসরগুলির ঘটনাবলী ইহুদীবাদের প্রেতাত্মা এবং যুব মিসরীয় নেতাদের এক ঘরে নীতির বিরোধিতা অবস্থার বেশ পরিবর্তন সাধন করে এবং মিসরকে "আরব জাতীয়তাবাদের" কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করে।

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৭১।

অষ্টবিংশ অধ্যায়

ফারটাইল ক্রিসেণ্টে সাম্রাজ্যবাদ

কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের স্বপক্ষে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদানের ফলে ভারতবর্ষের সহিত বৃটিশদের রাজকীয় যোগাযোগ ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন হয়। ফলে মিসর ও পারস্য উপসাগরে অবস্থিত তাহাদের বিভিন্ন ঘাঁটি হইতে বৃটিশ এই জীবন রক্ষাকারী যোগাযোগের নিরাপত্তা বিধানের চেষ্টা করে। অপরদিকে, যুদ্ধক্ষেত্রে এবং নীতি নির্ধারণে ওসমানীয় সেনাবাহিনীর প্রধান উপদেষ্টা জার্মানগণ বৃটিশদিগকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত তাহাদের সমস্ত উপনিবেশগুলিতে ব্যতিব্যস্ত করিতে সচেষ্ট হয়। সুয়েজ খালের মধ্য দিয়া জাহাজ চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ এবং আঁতাত পক্ষের বিরুদ্ধে একটি জিহাদ বা ধর্মীয় যুদ্ধের আহ্বান দিবার জন্য তাহারা তুর্কীদিগকে উপদেশ দেয়। জিহাদের প্রধান উদ্দেশ্য হইল ওসমানীয় সাম্রাজ্যের আরবীভাষী মুসলমানদের আনুগত্য নিশ্চিত করা এবং ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে বৃটিশদের বিরুদ্ধে শত্রুভাব গড়িয়া তোলা। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর সমস্ত পবিত্রতা লইয়া সুলতান-খলিফা জিহাদ ঘোষণা করেন, কিন্তু তাহা নিষ্ফল হয়। ইয়ামান, দক্ষিণ আরবের কিছু গোত্রীয় শেখগণ এবং বেশ কিছু সংখ্যক ভারতীয় প্যান-ইসলামী ছাড়া ফারটাইল ক্রিসেণ্টের অধিবাসীবৃন্দ এই জিহাদে কোন সাড়াই প্রদান করে নাই। কেউ কেউ স্বয়ং খলিফার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে।

পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে আমরা ফারটাইল ক্রিসেণ্টের আরবীভাষী লোকদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি। মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ক্রিসেণ্টের আরবীভাষী অধিবাসীদের ওসমানীয়বাদকে প্রচণ্ড আঘাত করা হয়। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের নব্য তুর্কী বিপ্লব অ-তুর্কীদের উপর তুর্কীদের প্রাধান্য পুনঃস্থাপিত করে। ওসমানীয় পার্লামেণ্টে আরবী-

ভাষী লোকদের প্রতিনিধিত্ব যথেষ্টভাবে দেওয়া হয় নাই। তদুপরি তাহারা তুর্কী ভাষার খাতিরে আরবী ত্যাগ করিতে অনীহা প্রকাশ করে। ফলে বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান তাহাদের খ্রীস্টান বন্ধুদের প্যান-আরবী ভাবধারার আকৃষ্ট হয়। প্রথমে তাহারা সম্পূর্ণ পৃথক মুসলিম সংস্থাসমূহ গঠন করে এবং ইহাতে মুসলমান, খ্রীস্টান ও দ্রুজেসগণ ধর্মীয় স্বাধীনতা সংবলিত একটি ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠন করিবার দাবীতে একত্রিত হয়। বাগদাদ হইতে বৈরুত পর্যন্ত এই ধরনের প্রায় এক ডজনেরও অধিক সংস্থা গঠিত হয়, আবার ইহাদের কোন কোনটি গঠিত হয় ওসমানীয় সেনাবাহিনীর আরব অফিসারদের দ্বারা। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের বলকান যুদ্ধের প্রাক্কালে গোপন জাতীয়তাবাদী সংস্থাসমূহের ২৪ জন প্রতিনিধি প্যারিসে একটি সম্মেলনে মিলিত হয় এবং ওসমানীয় শাসন হইতে স্বাধীনতার আহ্বান জানায়। যুদ্ধের প্রথম বৎসরগুলিতে তুর্কী ত্রিজন-শাসনের একজন সদস্য জামালপাশা সিরিয়ায় তুর্কী বাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে কাজ করেন। আরবদের বিরুদ্ধে তাঁহার নিষ্ঠুরতা গোপন সংস্থাসমূহের জনপ্রিয়তা আরও বাড়াইয়া তোলে।

বৃটিশগণ এই সব তুর্কী বিরোধী আন্দোলনসমূহ সম্পর্কে সজাগ এবং স্বভাবতঃই তাহারা এই তুর্কী বিরোধী মনোভাবের সুযোগ গ্রহণ করে। তদুপরি ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে জেনারেল এলেনবির নেতৃত্বে সিনাই এলাকায় পরিচালিত অভিযানও তখন সুবিধা করিতে অপারগ হয় এবং জেনারেল টাউনসেণ্ডের নেতৃত্বে ১৩,০০০ সৈন্যের একটি বৃটিশ সেনাবাহিনী ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে মেসোপোটামিয়ায় আত্মসমর্পণ করে। ওসমানীয়গণ আরবদের কোন বিদ্রোহ আশা করে নাই, কিন্তু বৃটিশগণ একটি বিদ্রোহ সংগঠিত করিতে তৎপর হইয়া উঠে। ফারটাইল ক্রিসেণ্টের বিভিন্ন শহরে অবস্থিত গোপন সংস্থাসমূহ শহর নিয়ন্ত্রণকারী তুর্কীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তুলিবার মত শক্তিশালী ছিল। অবশ্য সে সময় তুর্কীদের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ পরিচালনা করিবার মত যথেষ্ট প্রভাব ও স্বাধীনতার অধিকারী ছিলেন দুইজন আরব নেতা। তাঁহাদের একজন ওয়াহাবীদের নেতা ইবনে-সউদ, যিনি পারস্য উপসাগরের পারে আরব উপদ্বীপের পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত তাঁহার পৈত্রিক রাজ্য নজদ পুনর্দখল করিয়া তথায় শাসনরত।

অপরজন ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে সুলতান কর্তৃক মক্কার শরীফ পদে নিযুক্ত হোসেন। তিনি রসুলুল্লাহর বংশ হাশেমী গোত্রের একজন সদস্য এবং কার্যতঃ লোহিত সাগরের পারে আরব উপদ্বীপের পশ্চিম অঞ্চলে অবস্থিত হেজাজের শাসক।

ইরানে সাম্রাজ্যবাদের আলোচনায় আমরা ভারতবর্ষের প্রকৃত শাসক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং লণ্ডনের বৃটিশ সরকারের মধ্যে বিদ্যমান প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ভারতীয় বিদ্রোহের পর বৃটিশ সরকার কোম্পানী বিলোপ করিয়া স্বয়ং নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। ভারতবর্ষের গুরুত্বের দরুন ইহাকে একটি পৃথক বিভাগের মাধ্যমে শাসন করা হয় এবং ইহা উপনিবেশিক দপ্তরের আওতাধীন ছিল না। বৃটিশ মন্ত্রী পরিষদে ভারতবর্ষের জন্য একজন সেক্রেটারী থাকেন এবং কালক্রমে যে সব ইংরেজ ভারতবর্ষ শাসন করেন তাহারা একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করেন যদ্বারা প্রত্যেক নীতি ভারত প্রতিরক্ষার দৃষ্টিভঙ্গিতে যাচাই করা হয়। মধ্যপ্রাচ্যে গ্রেট বৃটেনের একটি প্রধান আগ্রহ হইল ভারতবর্ষের পথ পরিষ্কার রাখা। ভারতবর্ষের বৃটিশ সরকারী ব্যক্তিবর্গ যেহেতু ঘটনাস্থলে উপস্থিত এবং ভারতীয় সমস্যাবলী সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী বলিয়া দাবী করেন, তাই তাঁহারা মনে করেন যে "নেটিভদের" (স্থানীয় অধিবাসী) সহিত কিভাবে ব্যবহার করিতে হইবে তাহা তাহারা "লণ্ডন সরকারের" চাইতে ভাল জানেন। তবে লণ্ডন দিল্লীর নীতি নির্ধারণী ব্যাপারগুলি ছাড়িয়া দিতে নারাজ। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত লণ্ডন সরকার ও "ভারত সরকারের" মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে থাকে। কখনো কখনো এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ইরান ও ফারটাইল ক্রিসেণ্টের বৃটিশ নীতির সহিত সংশ্লিষ্ট।

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ফারটাইল ক্রিসেণ্টে অনুসৃত নীতি সম্পর্কে লণ্ডন ও নয়া দিল্লীর সহিত মত বিরোধ হয়। ভারতীয় মুসলমানগণ ইসলামের খলিফার প্রতি শ্রদ্ধাশীল, যিনি হইলেন ওসমানীয় সুলতান এবং তিনি গ্রেট বৃটেনের সহিত যুদ্ধরত। ভারত সরকার আশা করে যে, ভারতীয় মুসলমানদের ন্যায় ফারটাইল ক্রিসেণ্টের মুসলমানগণও খলিফার প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল হইবে। অতএব তাহারা আরবদের মধ্যে একটি

বিদ্রোহ সংঘটিত করাইবার বিরোধী। তাহারা পারস্য উপসাগরের শেখদের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তি সম্পাদন করে এবং ইবনে সউদকে নজদের রাজা বলিয়া স্বীকার করে। তাহারা ইহাদের সবাইকে কর প্রদান করে এবং সমগ্র যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বন্ধুভাবাপন্ন থাকে।

অবশ্য লণ্ডন সরকার তুর্কীদের বিরুদ্ধে আরবদের জাতীয়তাবাদী মনোভাব সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং একটি প্রকাশ্য বিদ্রোহ সংঘটিত করাইবার নীতি গ্রহণ করে। বৃটিশগণ হোসেনের ওসমানীয় বিরোধী মনোভাব সম্পর্কে এবং তাঁহার ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খা সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল। তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র আবদুল্লাহ্ যুদ্ধের পূর্বে বৃটিশ মনোভাব জানিবার জন্য মিসরের বৃটিশ উপ-রাষ্ট্রদূত লর্ড কিচেনারের সহিত সাক্ষাৎ করেন। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে লর্ড কিচেনার যুদ্ধ সচিব হিসাবে মক্কার শরীফ হোসেনের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মিসরের হাই কমিশনার স্যার হেনরী ম্যাক মাহনকে উপদেশ প্রদান করেন। ইতিমধ্যে শরীফ হোসেন তাঁহার ওসমানীয় সমর্থক তৃতীয় পুত্র ফয়সলকে দামেস্ক প্রেরণ করেন। তাঁহার আনুগত্য সম্পর্কে তুর্কীদিগকে নিশ্চয়তা প্রদান করা এবং সিরীয় নেতাদের মতামত গ্রহণ করাও ছিল এই দামেস্ক সফরের উদ্দেশ্য। এই সফরেই ফয়সল ধর্মনিরপেক্ষ আরব জাতীয়তাবাদী মত গ্রহণ করেন। তিনি ফাতাত্ গোপন সংস্থার একজন সদস্য হইয়া যান এবং ইহার নেতাদের সহিত তুর্কীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সম্ভাব্যতা এবং বৃটিশ সহযোগিতার সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই নেতৃবৃন্দ ফয়সলকে "দামাস্কাস প্রটোকল" নামক একটি দলিল প্রদান করেন। এই দলিলে বিদ্রোহ সংগঠিত করিবার শর্তাবলীর উল্লেখ থাকে। শরীফ হোসেন এবং গ্রেট বৃটেনের মধ্যে পরবর্তী চুক্তিসমূহ এই দলিলের শর্তাবলীর উপর ভিত্তি করিয়া স্বাক্ষরিত হয়।

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জুলাই হইতে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের ১০ই মার্চ পর্যন্ত ক্রিসেন্টের আরবদের পক্ষে শরীফ হোসেন এবং গ্রেট বৃটেনের পক্ষে স্যার হেনরী ম্যাক মাহন দশটি পত্র বিনিময় করেন—যেগুলি "হোসেন-ম্যাক মাহন পত্রালাপ" (Hussain Mc Mahon Corrospondences) নামে খ্যাত। এই পত্রালাপে ইহার প্রকৃতি ও সচরাচর চুক্তির ভাষার দুইটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হয়। একটি বিষয় হইল ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে

সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধ করিতে হোসেন ওয়াদা করেন এবং গ্রেট বৃটেন জয়ী হইলে "আরবদের স্বাধীনতা সমর্থন" করিতে ওয়াদা করে। তাঁহার পত্রালাপে হোসেন সিরীয় জাতীয়তাবাদীদের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি প্রকাশ করেন এবং জোর দিয়া বলেন যে, "একজন মুসলমান ও খ্রীস্টান আরবের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই, তাহারা উভয়ে একই পূর্বপুরুষের বংশধর।" অধিকন্তু হোসেন বা সিরীয় জাতীয়তাবাদীদের দৃষ্টিতে "আরব" বা "আরব জাতি" বলিতে মিসর, উত্তর আফ্রিকা অথবা দক্ষিণ আরব ও নজদ বুঝায় না।

পত্রালাপের দ্বিতীয় বিষয়—"স্বাধীন আরব জাতির" সীমানা সম্পর্কে আলোচনা হয়। এই বিষয়ে পত্রালাপের ভাষা বিশেষতঃ ম্যাক মাহনের পত্রের ভাষা অত্যন্ত বিদ্ঘুটে। গ্রেট বৃটেন আরব জাতির সীমানা এই বলিয়া সীমিত করে যে, "দামেস্ক, হোম্স্, হ্যামা ও আলেপ্পো জিলার পশ্চিমে অবস্থিত সিরিয়ার অংশগুলিকে সম্পূর্ণ আরব বলা যায় না; এবং তাই দাবীকৃত এলাকা হইতে এই অঞ্চলগুলি বাদ দেওয়া উচিত।" শরীফ হোসেন এই এলাকা বলিতে আধুনিক লেবানন এবং ইহার উত্তরের উপকূলীয় এলাকা বুঝেন, বিশেষতঃ এইজন্য যে ম্যাক মাহন এই অঞ্চলে ফ্রান্সের স্বার্থের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তদুত্তরে হোসেন বলেন যে, উপরোল্লিখিত সীমা গ্রহণের ব্যাপারে তাঁহার সম্মতি সাময়িক মাত্র এবং আশা প্রকাশ করেন যে, যুদ্ধের পর ফ্রান্সের সহিত তাঁহার বুঝাপড়ার ব্যাপারে গ্রেট বৃটেন তাঁহাকে সাহায্য করিবে।

যুদ্ধের পর হোসেন-ম্যাক মাহন পত্রালাপ এবং বিশেষতঃ উপরোল্লিখিত সীমারেখার ভৌগোলিক ব্যাখ্যা এক তিক্ত বিতর্কের সূত্রপাত করে। প্রধান আলোচ্য বিষয় হইল বর্ণনার "দামস্ক জিলার পশ্চিমে......" বলিতে প্যালাস্টাইনও অন্তর্ভুক্ত কিনা। আরবগণ জোরের সহিত বলে যে প্যালে-স্টাইনও আরব রাষ্ট্রের অংশবিশেষ এবং ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের পর হইতে একের পর এক সমস্ত বৃটিশ সরকারগুলি স্বীকার করে যে উপরোল্লিখিত বাক্য দ্বারা সিনাই হইতে তুরস্ক পর্যন্ত সমগ্র উপকূলভাগ বুঝায় এবং তন্মধ্যে প্যালেস্টাইনও অন্তর্ভুক্ত। অথচ ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে স্বয়ং স্যার হেনরী ম্যাকমাহন বলেন যে, "তিনি বাদশাহ হোসেনের প্রতি তাঁহার ওয়াদার প্যালেস্টাইনকে

অন্তর্ভুক্ত করেন নাই।" এই প্রসিদ্ধ বিতর্ক সম্ভবতঃ ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে "ওয়েস্টারম্যান দলিল" (Westerman papers) দ্বারা মীমাংসা হয়। স্ট্যান ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের হুভার ইন্‌স্টিটিউট এই দলিলের উপর গবেষণা পরিচালনা করে। পত্র সংকলনের মধ্যে বৃটিশ বৈদেশিক অফিসের গোয়েন্দা বিভাগ কর্তৃক প্যারিস শান্তি সম্মেলনে বৃটিশ প্রতিনিধি দলের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত দুইটি দলিলও অন্তর্ভুক্ত। এই দলিলগুলি প্যারিসে শান্তি সম্মেলনে মার্কিন প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক উইলিয়াম ওয়েস্টারম্যানের হাতে পড়ে। তিনি এই দলিলগুলি হুভার ইনস্টিটিউটের নিকট হস্তান্তর করেন এবং উপদেশ দেন যে তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে যেন এগুলি খোলা না হয়। দলিলগুলি দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রকাশ করে যে আরবদিগকে দেওয়া বৃটিশ প্রতিশ্রুতির মধ্যে প্যালেস্টাইনও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রকৃতপক্ষে আরবদিগকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি যে বৃটিশ ভঙ্গ করিয়াছে তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য কাউকে ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হয় নাই। হোসেন-ম্যাক মাহন পত্রালাপ বন্ধ হইবার ছয়মাস পর সাইকস্-পিকট চুক্তি (Sykes-Picot Agreement) সম্পাদন করিয়া বৃটিশ সরকার আরবদিগকে দেওয়া সমস্ত প্রতিশ্রুতিই প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু ইহা হইল গোপন ত্রিপক্ষীয় আঁতাতের অংশ বিশেষ এবং যাহা সম্পর্কে আরবগণ সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ম্যাক মাহনের প্রতিশ্রুতির জোরে আরবগণ ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের ৫ই জুন ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। শাহজাদা ফয়সলের পরিচালনায় এবং প্রসিদ্ধ কর্ণেল টি. ই. লরেন্সের উপদেশে আরব সৈন্যগণ তুর্কী সৈন্য সমাবেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং সমগ্র তুর্কী যোগাযোগ লাইনে গেরিলা যুদ্ধ চালাইয়া যায়। আরব অফিসারদের অধিকাংশ ছিল সিরিয়ার ফাতাত গোপন সংস্থার এবং ইরাকের আহ্‌দ সংস্থার সদস্য। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে তাহারা আকাবা বন্দর অধিকার করে, যদ্বারা ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জেনারেল এ্যালেনবি কর্তৃক জেরুজালেম অধিকার সহজতর হয়। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের ১লা অক্টোবর ফয়সল ও তাঁহার সৈন্যগণ বিজয়ীবেশে দামেস্কে প্রবেশ করেন। সাইকস্-পিকট চুক্তি স্মরণ করিয়া বৃটিশ সরকার জেনারেল এ্যালেনবিকে দামেস্কে

যাইয়া ফয়সল ও লরেন্সের কার্যাবলীতে বাধা প্রদান করিতে আদেশ করে। তবে ফয়সল একটি "সম্পূর্ণ স্বাধীন আরব শাসনতান্ত্রিক সরকার" গঠনের কথা ঘোষণা করেন। অতঃপর তিনি তুর্কীদের পিছু ধাওয়া করেন এবং উত্তরে হোমস্ ও হ্যামা অধিকার করেন। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর তুর্কীগণ মার্জদাবিকের প্রান্তরে আত্মসমর্পণ করে। ইহা সেই একই প্রান্তর যেখানে ১৫০৮ খ্রীস্টাব্দে সুলতান সেলিম সিরিয়া জয় করেন।

সাইকস্-পিকট চুক্তি

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ওসমানীয় সাম্রাজ্যের সহিত যুদ্ধরত ত্রিপক্ষীয় (বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া) আঁতাতের সদস্যদের মধ্যে তিনটি গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। একটি হইল ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই মার্চের কনস্টান্টিনোপল চুক্তি, যদ্বারা উত্তর সিরিয়ার কিয়দংশ এবং এশিয়া মাইনরকে সদস্য দেশগুলির মধ্যে বণ্টন করা হয়। দ্বিতীয়টি হইল ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে এপ্রিলের লণ্ডন চুক্তি। ইতালী যুদ্ধে যোগদান করিয়া তাহার ভাগের যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি দাবী করিলে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই দুই চুক্তি দ্বারা ফারটাইল ক্রিসেণ্টকে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের ২১শে অক্টোবর বৃটিশ হোসেন-ম্যাক মাহন পত্রালাপের ব্যাপারে ফ্রান্সকে অবহিত করে এবং পরামর্শ দেয় যে তাহাদের উভয়ের একত্রে বসিয়া ফারটাইল ক্রিসেণ্টে নিজ নিজ স্বার্থ সম্পর্কে আলোচনা করা উচিত। তদনুসারে বৃটেনের স্যার মার্ক সাইক্স্ এবং ফ্রান্সের চার্লস জর্জেস-পিকট ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হন। পরে রাশিয়া ও ইতালী এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লয়। আরবদিগকে দেওয়া প্রতিশ্রুতির প্রতি সামান্যতম সম্মানও প্রদর্শন না করিয়া ফারটাইল ক্রিসেণ্টকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। রাশিয়ার হস্তক্ষেপের দরুন পবিত্র স্থানগুলির জন্য প্যালাস্টাইনকে আন্তর্জাতিক করা হয়। অবশিষ্ট অংশ হাইফার উত্তরে ভূমধ্যসাগরের উপকূল হইতে একটি সরল রেখা উত্তর পূর্বে পারস্য সীমান্তে মোসুল পর্যন্ত টানিয়া ভাগ করা হয়। এই রেখার উত্তর অংশ ফ্রান্সের এবং দক্ষিণ অংশ গ্রেট বৃটেনের। তদুপরি উক্ত অংশকে দুইভাগে ভাগ করা হয়, একটি সরাসরি ফরাসীর আওতাধীন এবং অপরটি তাহার "প্রভাবাধীন"। অনুরূপভাবে দক্ষিণ অংশকে দুই ভাগে

ভাগ করা হয়, একটি সরাসরি বৃটিশ আওতাধীন এবং অপরটি তাহার "প্রভাবাধীন"।

সাইক্‌স-পিকট ছিল গোপন কিন্তু ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে বলশেভিকগণ ইহা তাহাদের বিজয়ের পর সাধারণের মধ্যে ফাঁস করিয়া দেয়। তুরস্কের জামাল পাশা বাদশাহ হোসেনের নিকট এই চুক্তি প্রেরণ করেন এবং পৃথক একটি তুরস্ক-আরব শান্তি চুক্তির প্রস্তাব করেন। হোসেন বৃটিশদের নিকট ব্যাখ্যা চাহিয়া পাঠান এবং তাহারা তিনবার তাঁহাকে নিশ্চয়তা প্রদান করে যে একটি আরব রাষ্ট্র গঠনে তাহারা তাঁহাকে সাহায্য দান করিবে। আরবগণ এই সকল নিশ্চয়তার বিশ্বাস করে, সম্ভবতঃ তাহারা বিশ্বাস করিতে চাহিয়াছিল বলিয়াই। প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে ওসমানীয়দের পরাজয়ের মুখে একটি তুরস্ক-আরব শান্তি চুক্তি নিরর্থক। আরবগণ ভালর আশায় বসিয়া থাকা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারে নাই।

ইহুদীবাদ ও বালফার ঘোষণা।

ফারটাইল ক্রিসেন্টের সদ্যাগত আরব জাতীয়তাবাদ প্রারম্ভেই অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয়। গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের ন্যায় শক্তিশালী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ছাড়াও ফয়সল ও তাঁহার আরব জাতীয়তাবাদী উপদেষ্টাদিগকে অনেক আভ্যন্তরীণ সমস্যার মোকাবিলাও করিতে হয়। সিরিয়া-লেবাননের খ্রীস্টানগণ, বিশেষতঃ মেরোনাইটগণ মুসলমানদের নিকট হইতে পৃথক এবং একটি বিদেশী শক্তির আশ্রয় দাবী করে। উদারপন্থীদের "আরববাদ" বিরোধী স্থানীয় উলামাদের দ্বারা উৎসাহ প্রাপ্ত প্যান-ইসলামীগণ একটি ইসলামী রাষ্ট্র দাবী করে। আবার হেজাজ ও ফারটাইল ক্রিসেন্টের বেদুইনগণ বিশেষ কোন রাষ্ট্রেরই তোয়াক্কা করে না। আরব জাতীয়তাবাদ শান্তি ও সময় পাইলে নিঃসন্দেহে এই সকল সমস্যার সমাধান করিতে পারিত, যদি না ইহাকে এক নতুন প্রতিদ্বন্দ্বীর মোকাবিলা করিতে হইত। এই নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী হইল ইহুদী জাতীয়তাবাদ। ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে এই জাতীয়তাবাদ দৃশ্যে অবতরণ করে।

ইহুদী জাতীয়তাবাদ বা ইহুদীবাদের উৎপত্তি হিব্রু ধর্মীয় ইতিহাসে

নিহিত। তিনটি ধর্মের মধ্যে—ইহুদী, খ্রীস্টান ও ইসলাম—যাহাদের একে অপরের সহিত ধর্মতাত্ত্বিক সম্পর্ক বিদ্যমান, একমাত্র ইহুদী ধর্মই পৃথক। ইহুদীরা বিশ্বাস করে যে ইহার অনুসারীগণ জন্ম, ঐতিহ্য এবং ইব্রাহিম (আঃ) ও মুসা (আঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক ইহার নিকট প্রদত্ত বিশেষ অঙ্গীকারের ফলে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী হইতে পৃথক। অধিকন্তু, প্রাচীনকালে কানান এবং আধুনিক কালে প্যালাস্টাইন নামে পরিচিত এই বিশেষ ভূখণ্ডটিকে আল্লাহ ইহাদের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, যেখানে তাহারা অপরের সহিত আন্তঃবিবাহাদীর সংশয় হইতে মুক্ত থাকিয়া তাহাদের ধর্মচর্চা করিতে পারিবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও কানানে ইহুদীরা কখনও একমাত্র বসবাসকারী ছিল না। বশুহার সেনাবাহিনী কর্তৃক পরাজিত আদি অধিবাসীগণ নিশ্চিহ্ন হয় নাই, বরং সে দেশেই থাকিয়া গিয়াছিল।

শতাব্দীর পর শতাব্দীকালের মধ্যে ইহুদী ধর্মে দুইটি ধারার সৃষ্টি হয়। একটি হইল পুরোহিত ধারা, যাহা রীতি ভিত্তিক, সাধারণতঃ পৃথক থাকিবার নীতিতে বিশ্বাসী এবং মুসা (আঃ-এর আইন ব্যাখ্যায় অলঙ্কার বর্জিত। অপরটি হইল প্রত্যাদিষ্ট ধারা, যাহা রীতিনীতি বিরোধী, সাধারণতঃ সহঅবস্থানে বিশ্বাসী এবং মুসা (আঃ)-এর আইন ব্যাখ্যায় আধ্যাত্মিক পন্থা অবলম্বনকারী। খ্রীস্ট পূর্ব ৫৮৬ অব্দে বেবিলনীয় বন্দীদশা, বিশেষতঃ শেষ রোমান যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ইহুদীগণ ক্রমশঃ বিশ্বের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। যেখানেই যায় তাহারা সেখানেই এই দুই চিন্তাধারা সঙ্গে লইয়া যায়। প্রত্যাদিষ্ট ধারার ইহুদীগণ জেরেমিয়াহ্, ইসাইয়া, মিকাহ্ ও অন্যান্য প্রত্যাদিষ্ট মনীষীদের উপদেশ অনুসরণ করে। ইহারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইহুদীদিগকে যেখানেই থাকুক "ঘর নির্মাণ করিতে...বাগান তৈরার করিতে বিবাহ করিয়া পুত্রকন্যা জন্ম দিতে" উপদেশ প্রদান করেন, "কারণ সেই শান্তির মধ্যেই তোমরা শান্তি পাইবে।" কিন্তু পুরোহিত ধারার ইহুদীগণ ধর্মসঙ্গীত ১৩৭ (Psalm 137)-এর লেখকের ন্যায় মনীষীদের উপদেশ অনুকরণ করে। ধর্মসঙ্গীত ১৩৭-এর লেখক বলেন : "ওহে জেরুজালেম, আমি যদি তোমাকে ভুলিয়া যাই তবে আমার ডান হাত নিশ্চিহ্ন হোক, আমার জিহ্বা তালুর সঙ্গে লাগিয়া থাক,

যদি আমি তোমাকে স্মরণ না করি, যদি আমি জেরুজালেমকে আমার সর্বোচ্চ আনন্দে স্থান দান না করি।" প্রত্যাদিষ্ট ধারার ইহুদীগণ মন্দিরকে "সব লোকের উপাসনা গৃহ" বলিয়া মনে করে, কিন্তু পুরোহিত ধারার ইহুদীগণ ইহাকে শুধুমাত্রই ইহুদীদের জন্ত বলিয়া মনে করে। এক শ্রেণী মনে করে মসিয়াহ্ আল্লাহর রাজত্ব সৃষ্টি করিবেন ; অপর শ্রেণী মনে করে তিনি দাউদের রাজত্ব সৃষ্টি করিবেন।

এই আলোচনার প্রকৃত কথা এই যে পুরোহিত শ্রেণীর অনুসারীগণই সংখ্যাগরিষ্ঠ। বংশপরম্পরায় ইহুদীদিগকে এই শিক্ষা দেওয়া হয় যে, যে দেশেই তাহারা বাস করুক না কেন সেখানে তাহারা "আগন্তুক"। একমাত্র ইয়ম কিপুর বা প্রায়শ্চিত্তের দিন (Day of Atonment) ব্যতীত সমস্ত ইহুদী পর্বগুলিই জাতীয় পর্বের ন্যায়। শুক্রবারের সন্ধ্যার প্রার্থনার পর প্রত্যেক ইহুদী পরিবার "আগামী বৎসর জেরুজালেমে"—এইরূপ কামনা করিয়া মদ্যপান করে এবং প্রার্থনার সময় প্রত্যেক ইহুদী জেরুজালেমের দিকে মুখ করিয়া দাঁড়ায়। কিন্তু পর্ব, কামনা করিয়া মদ্যপান কিংবা প্রার্থনায় জেরুজালেমের দিকে মুখ করিবার অর্থ এই নহে যে অধিকাংশ ইহুদী কানান বা প্যালেস্টাইনে যাইয়া বসবাস করিতে চায়। ইহা অনেকটা মুসলমানদের মক্কার দিকে মুখ করিয়া নামাজ পড়িবার ন্যায়। কেউ কেউ জেরুজালেমে যায় তীর্থ পালনের উদ্দেশ্যে, আবার ফিরিয়া আসে কিন্তু সেই নগর বা দেশকে কখনও তাহারা ভুলিয়া যায় না। তাহাদের উপর অনেক অত্যাচার হইয়াছে এবং যখনই তাহাদের উপর অত্যাচার হয়, তখনই "প্রত্যাবর্তন" এবং "দাউদের রাজত্বের" কথা তাহাদের মানসপটে ফুটিয়া উঠে।

রাজনৈতিক ইহুদীবাদ

ইউরোপের নব জাগরণ রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব এবং ধর্ম হইতে রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নকরণের যুগে পশ্চিম ইউরোপে ইহুদীদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ইহুদী আস্তানাসমূহ বিলুপ্ত হয় এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও প্রক্রিয়ার আওতায় আগত ধর্মভীরু ইহুদীগণ প্রত্যাদিষ্ট শ্রেণীকে পুনর্জীবিত করে এবং শাশ্বত ইহুদীধর্ম প্রবর্তন করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের

শাশ্বত ইহুদীগণ "সত্যের রাজত্বের" কথা বলাবলি করে এবং নিজদিগকে আর "একটি জাতি নহে, বরং একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসাবে বিবেচনা করে। এবং এইজন্য প্যালাস্টাইনে প্রত্যাবর্তন, হারুনের পুত্রদের অধীনে কোরবানীর পূজা পুনরারম্ভ বা ইহুদী রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় কোন আইনের প্রত্যাশা তাহারা করে না।" অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীতে অধিকাংশ ইহুদী পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়ায় তাহাদের বিভিন্ন আস্তানায় বসবাস করে, যেখানে নব জাগরণের ছোঁয়া কখনও প্রবেশ করে নাই। তাহারা সর্বত্র খ্রীস্টান ধর্মান্ধতা ও ইহুদী নিধন যজ্ঞের শিকারে পরিণত হয়। তাহাদের বেশ কিছু সংখ্যক লোক মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের প্রভাবে আসা সত্বেও গোঁড়া ইহুদী থাকিয়া যায় এবং আশা করে যে একদিন মসিয়াহ তাহাদিগকে প্রতিশ্রুত দেশ প্যালাস্টাইনে লইয়া যাইবেন এবং পুনরায় একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিবেন।

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে থিওডর হের্‌জেল নামে একজন ইহুদী বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক তাঁহার ভিয়েনা পত্রিকার জন্য প্রসিদ্ধ ড্রেফুস বিচার পর্যবেক্ষণ করেন। একজন ফরাসী অভিজাত কর্তৃক কৃত একটি অপরাধের দোষ সম্পূর্ণভাবে ফরাসী সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন আলফ্রেড ড্রেফুসের ঘাড়ে চাপানো হয় প্রধানতঃ এই জন্য যে তিনি একজন ইহুদী। ড্রেফুসকে দোষী সাব্যস্ত করা এবং জেলে আবদ্ধ রাখিবার ফলে সমগ্র ফ্রান্সে সেমিটিক-বিরোধী বিক্ষোভের ঢেউ খেলিয়া যায়। কোন কোন উদারপন্থী এই জুয়াচুরি প্রকাশ করিয়া ড্রেফুসকে নির্দোষ বলিয়া প্রমাণ করিলেও থিওডর হের্‌জেল এই শিক্ষা ভুলিয়া যান নাই। নব জাগরণের কেন্দ্রস্থল ফ্রান্সে ইহার অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা সত্বেও যদি এইরূপ সেমিটিক-বিরোধী কার্যকলাপের গোপন ধারা চলিতে থাকে তবে ইহুদীদের একমাত্র ভরসা হইল ইউরোপ ত্যাগ করা এবং নিজেদের জন্য একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। এই মনোভাব তিনি তাঁহার "ইহুদী রাষ্ট্র" (Dar Judenstaat) নামক গ্রন্থে ব্যক্ত করেন এবং আধুনিক ইহুদীবাদ আন্দোলন আরম্ভ করেন।

প্রারম্ভ হইতে ইহুদীবাদ হইল উনবিংশ শতাব্দীর দুইটি ইহুদী চিন্তাধারার সংমিশ্রণ। একটি হইল "প্রতিশ্রুত দেশে প্রত্যাবর্তনের" ধর্মীয় আকাঙ্খা—

যাহা ইহুদী-বিরোধী কার্যকলাপ এবং অত্যাচার হইতে পলায়নের প্রয়োজনের দ্বারা জোরদার হয়। অপরটি হইল উনবিংশ শতাব্দীর উদার ও বিচিত্র জাতীয়তাবাদ, যাহা রাষ্ট্রকে উঁচু করিয়া দেখে এবং ইহার মধ্যে মানবতার দুঃখ-কষ্ট দূরীকরণের সোপান অবলোকন করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের প্রচলিত চিন্তাধারা অনুসরণ করিয়া ধর্মনিরপেক্ষ ইহুদীগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে একমাত্র ইহুদী রাষ্ট্র স্থাপন করিবার দ্বারাই সেমিটিক-বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করা যায়। ইহা তৎকালীন কিছু সংখ্যক অ-ইহুদী উদারপন্থীদিগকেও অনুপ্রাণিত করে। সেমিটিক-বিরোধী কার্যকলাপে ইহুদীগণ ভয় পায়, আর এই সকল উদারপন্থীগণ লজ্জিত হয়।

ইহুদীবাদ সংগঠনের প্রথম দিকে গোঁড়া ও উদারপন্থী ইহুদীদের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ হয়। গোঁড়া ইহুদীদের মতে প্যালাস্টাইনে প্রত্যাবর্তনই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ কাজ, অথচ ধর্মনিরপেক্ষ ইহুদীদের মতে রাষ্ট্রই গুরুত্বপূর্ণ, স্থান নহে। ধর্মনিরপেক্ষবাদী থিওডর হারজেল এবং তাঁহার কোন কোন সহকর্মী আর্জেণ্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা বা যেখানেই পাওয়া যায় এরূপ একটি দেশের পরামর্শ দান করেন। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডে অনুষ্ঠিত প্রথম বিশ্ব ইহুদীবাদী সম্মেলনে প্রতিনিধিবর্গ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে খাঁটি ধর্মীয় ইহুদী ও খ্রীস্টানদের নিকট প্যালাস্টাইনের একটি আবেগময় আবেদন রহিয়াছে, যাহা অন্য কোন স্থানের নাই। একবার প্যালাস্টাইনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর ধর্মীয় ও অজ্ঞেয়বাদী ইহুদীগণ উভয়ে এক যোগে সেই একক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কাজ চালাইয়া যায়।

ইহুদী উপনিবেশিকতা

প্যালাস্টাইন ছিল ওসমানীয় সাম্রাজ্যের একটি অংশ। ইহাকে একটি ইহুদী রাষ্ট্রে পরিণত করিবার জন্য প্রয়োজনের খাতিরে ইউরোপ হইতে দলে দলে ইহুদী আনয়ন করিয়া এখানে বসতি স্থাপন করিতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ইউরোপে উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ ছিল সর্বস্বীকৃত প্রতিষ্ঠান। অতএব ইহুদীদিগকে তাহাদের স্বদেশী বাকী ইউরোপীয়দের ন্যায় একই পন্থা অবলম্বন করিতে দেখিলে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। উদাহরণ স্বরূপ প্যালাস্টাইনে উপনিবেশ স্থাপন করিবার

কাজ তদারক করা ও অর্থ জোগাইবার জন্ত ইহুদীবাদীগণ বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ স্থাপন করে, যথা "ইহুদী কলোনিয়াল ট্রাস্ট" (Jewish Colonial Trust), "কলোনাইজেশন কমিশন" (Colonization Commision), "ইহুদী ন্যাশনাল ফাণ্ড" (Jewish National Fund) "প্যালাস্টাইন অফিস" (Palestine office) এবং "প্যালাস্টাইন ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট কোম্পানী" (Palestine Land Development Company)। ওসমানীয় সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক দেউলিয়াপনার কথা শুনিয়া হারজেল সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদের সহিত একটি সাক্ষাতের আয়োজন করেন এবং প্রস্তাব করেন যে সুলতান প্যালাস্টাইনে একটি ইহুদী উপনিবেশের অনুমতি দান করিলে একটি ইহুদী অর্থনৈতিক পরিষদ সাম্রাজ্যের সমস্ত বৈদেশিক ঋণের দায়িত্ব গ্রহণ করিবে। আবদুল হামিদ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন, অবশ্য তিনি সীমিত সংখ্যক ইহুদীদিগকে প্যালাস্টাইনে বসতি স্থাপন করিবার অনুমতি দানের প্রস্তাব দেন, তবে তাহাদিগকে ওসমানীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। হেরজেল ও তাঁহার বন্ধুগণ ইউরোপের প্রায় প্রত্যেকটি সরকারের নিকট আবেদন করেন এবং প্যালাস্টাইনে ইহুদী উপনিবেশের বিনিময়ে সমস্ত ইহুদীদের আনুগত্য প্রকাশের প্রস্তাব দেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইহুদীবাদীদের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, গ্রেট বৃটেনই একমাত্র শক্তি যে তাহাদিগকে সাহায্য দিতে পারে। হেরজেল ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে সেসিল রডস্‌কে এবং ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে জোসেফ চ্যাম্বারলিনকে সম্মত করাইতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। ১৯০৪ খ্রীস্টাব্দে হেরজেল পরলোক গমন করেন এবং কয়েক বৎসর পর ডঃ চেইম ওয়াইজম্যান নামক একজন রসায়নবিদ ও মূল বৃটিশ নাগরিকের সুযোগ্য নেতৃত্বের উপর ইহুদীবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব অর্পিত হয়। হেরজেল ও তাঁহার সহকর্মীবৃন্দ কয়েকটি বৃটিশ সরকারকে তাঁহাদের অনুরোধে সাড়া জাগাইতে ব্যর্থ হন, কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহুদীবাদী ও গ্রেট বৃটেনের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির প্রথম ঘোষণা প্রকাশিত হয় বৈদেশিক সচিব লর্ড বালফোর কর্তৃক ইহুদী অর্থ পরিবেশক লর্ড রথচাইল্ডের নিকট ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ২রা নভেম্বর লিখিত একটি পত্রের

দ্বারা। এই পত্রই "বালফার ঘোষণা" (Balfaur Declaration) নামে খ্যাত।

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর হইতে ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর এই দুইটি সংক্ষিপ্ত বৎসরের মধ্যে গ্রেট ব্রটেন তিনটি দলের সহিত তিনটি মহৎ চুক্তি সম্পাদন করে, যেগুলি পরস্পর বিরোধী। গ্রেট ব্রটেন বোকামি করিয়া বা ইচ্ছাকৃত অসদুদ্দেশ্যে এইগুলি সম্পাদন করিয়াছে বলিয়া মনে করা সম্ভবতঃ ঠিক নহে। যুদ্ধের দুর্বিপাকে একটি "দুর্ভাগ্যজনক ভুল" বলিয়া সমগ্র ব্যাপারটিকে উড়াইয়া দেওয়াও সম্ভব নহে। প্রত্যেকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় সুবিবেচনার সহিত ব্রটিশ সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করিবার জন্য। কিন্তু জটিলতার সৃষ্টি হইলে সাম্রাজ্যের মঙ্গলার্থে পরিবর্তন সাধন করা হয় এবং এই পরিবর্তনে কোন্ পক্ষ বিরূপ হইল সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করা হয় না। ইহাই সাম্রাজ্যবাদী খেলার নিয়ম।

১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে ব্রটিশ নীতি ছিল ওসমানীয় সাম্রাজ্যের পরিবর্তে ফার-টাইল ক্রিসেন্টে একটি আরব রাষ্ট্র সৃষ্টি করা, যদ্বারা ব্রটেন বিশেষ সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়। অবস্থার পরিবর্তন না হইলে গ্রেট ব্রটেন হয়ত তাহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিত। কিন্তু অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিবর্গ, বিশেষতঃ ফ্রান্সের নিকট হইতে চাপ আসে। তাহারা ফারটাইল ক্রিসেন্টে স্বীয় অংশ নিয়ন্ত্রণ কবিার দাবী করে। ব্রটেন এতদঞ্চলের দক্ষিণভাগ নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে শুধু ফ্রান্সকে উত্তর ভাগ দান করিবার পর। ইহাই ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের সাইক্‌স-পিকট চুক্তির মূল কথা। প্যালাস্টাইনকে আন্তর্জাতি-কীকরণের দাবী তুলিয়া রাশিয়া ব্যাপারটিকে আরও জটিল করিয়া তোলে, কারণ অত্র অঞ্চলে রুশ অর্থডক্স চার্জের স্বার্থ জড়িত। আন্তর্জাতিকতার প্রশ্নে ফরাসীগণও জড়িত হয়, কারণ পবিত্র স্থানগুলিতে তাহাদের স্বার্থও নিহিত। ইহা ব্রটিশ নীতি নির্ধারকদিগকে বিশেষতঃ ভারত সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, কারণ ফ্রান্সকে সুয়েজ খালের অত নিকটবর্তী হইতে দিবার ব্যাপারে তাহারা নারাজ। ইহুদীবাদীগণ সর্বদা যুক্তি প্রদর্শন করে যে প্যালাস্টাইনে জাতীয় আবাসভূমি হইলে অত্র অঞ্চলে গ্রেট ব্রটেনের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে এবং প্যালাস্টাইনে একটি কৃতজ্ঞ ইহুদীবাদী সরকার সর্বদা ব্রটিশ সাম্রাজ্যের বন্ধু থাকিবে।

বৃটিশ সরকারের সহিত এই সহজ চুক্তির কঠিন বাধা আসে বৃটেন, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদীবাদ-বিরোধী ইহুদীদের পক্ষ হইতে। বালফার ঘোষণার মূলবচন পরীক্ষা করিলে ইহা পরিষ্কার হইয়া পড়ে। "মহামহিম সম্রাটের সরকার প্যালাস্টাইনে ইহুদী লোকদের একটি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠাকে সম্প্রীতির চোখে দেখে এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তাহাদের সমস্ত সহযোগিতা প্রদান করিবে, তবে পরিষ্কারভাবে মনে রাখিতে হইবে যে প্যালাস্টাইনে বসবাসকারী অ-ইহুদী সম্প্রদায়ের বেসামরিক ও ধর্মীয় অধিকার ক্ষুণ্ণ করে এইরূপ কোন কাজ করা হইবে না অথবা অন্য যে কোন দেশে বসবাসকারী ইহুদীদের অধিকার ও রাজনৈতিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা হইবে না।"

শেষ বাক্যটি সংযুক্ত করা হয় ইহুদীবাদ-বিরোধী ইহুদীদের ভয় দূর করিবার জন্য। ইহারা ইহুদী সমস্যার সমাধান দেখিতে পায় সংমিশ্রণের মধ্যে, পৃথকীকরণের মধ্যে নহে এবং তাই একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহাদের স্ব স্ব জন্মভূমিতে তাহাদের জাতীয় মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হউক ইহা তাহারা চায় না। প্রথম বাক্যে "জাতীয় আবাসভূমি" বলিতে যে "জাতীয় রাষ্ট্র" বুঝায় তাহা ইহুদীবাদীগণ এবং সম্ভবতঃ বালফারও হৃদয়ঙ্গম করেন। ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের প্রথম বিশ্ব ইহুদীবাদী সম্মেলনে রাষ্ট্রের পরিবর্তে "আবাসভূমি" ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, এবং ইহুদীবাদের একজন প্রসিদ্ধ নেতা ডঃ ম্যাক্স নরদও (Dr. Max Nordau)-এর ভাষায় "সুবিধাবাদের স্বার্থে" এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইহুদীবাদীগণ সম্ভবতঃ বিশ্বাস করে যে প্যালাস্টাইনবাসীদের বেসামরিক ও ধর্মীয় অধিকার ক্ষুণ্ণ না করিয়াই তাহারা প্যালাস্টাইনে বসতি স্থাপন করিতে পারিবে। পরবর্তী ফয়সল-ওয়াইজম্যান চুক্তির দ্বারা তাহা নিশ্চিত করা হয়।

বালফার ঘোষণা শ্রবণ করিবার পর বাদশাহ্ হোসেন হতবুদ্ধি হইয়া যান। "বর্তমানে বসবাসকারী লোকদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উভয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিলে" প্যালাস্টাইনে একটি ইহুদী বসতির অনুমতি দেওয়া হইবে—এই ব্যাপারে হোসেনকে নিশ্চয়তা প্রদান করিবার জন্য গ্রেট বৃটেন ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আরব ব্যুরোর অধিনায়ক হোগার্থকে কায়রো প্রেরণ করে। বৃটিশগণ ইহুদীবাদীদিগকে গ্রহণ করিবার

ব্যাপারে বাদশাহ হোসেনকে উপদেশ প্রদান করে এই জন্যও যে "আরবদের বিষয়ে বিশ্বের ইহুদীদের বন্ধুত্ব তাহাদের সমর্থনের সমান, বিশেষতঃ যে সকল দেশে তাহাদের রাজনৈতিক প্রভাব বিদ্যমান।" কিছুকাল পর একটি ইঙ্গ-ফরাসী যুক্ত ঘোষণা "জনসাধারণের স্বাধীন নির্বাচিত" একটি সরকার গঠনের ব্যাপারে আরবদিগকে প্রতিশ্রুতি দান করে। বাদশাহ হোসেন ও ফয়সল উভয়ে এই সব প্রতিশ্রুতি দ্বারা প্রলুব্ধ হন এবং সাইক্‌স্‌-পিকট চুক্তির ন্যায় এইগুলিকেও গ্রহণ করেন।

প্যারিস শান্তি সম্মেলন

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হইলে তিনটি দল ফারটাইল ক্রিসেণ্টের সর্বত্র বা কিয়দংশে প্রাধান্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করে। প্রথম ও অতি শক্তিশালী দল হইল ইঙ্গ-ফরাসী দল। গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, ইতালী ও যুক্তরাষ্ট্রের সমন্বয়ে "বৃহৎ চতুষ্টয়" গঠন করে এবং শান্তি সম্মেলন নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্স ঐক্যমতে পৌঁছিতে ব্যর্থ হয়। পূর্বাঞ্চলে ফ্রান্স যেহেতু কোন যুদ্ধ করে নাই, তাই বৃটিশ সৈন্যগণ সমগ্র ফারটাইল ক্রিসেণ্ট তাহাদের অধিকারে রাখে এবং কোন এলাকা ছাড়িয়া দিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে। অপরদিকে ফ্রান্স সাইক্‌স্‌-পিকট চুক্তি বাস্তবায়নের উপর জোর দেয়। তাহারা প্রায় ২০,০০০ ফরাসী সৈন্য লেবাননে আনয়ন করে এবং বৃটিশদিগকে ঐ স্থান ত্যাগ করিবার দাবী তোলে। এই দিকে বৃটিশগণ তৈল সমৃদ্ধ মোসুল এবং প্যালাস্টাইনের "আন্তর্জাতিকীকরণের" ব্যাপারে চুক্তির কিছু রদবদল প্রত্যাশা করে। পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের ব্যাপারে বিভিন্ন বক্তৃতা চলাকালীন বিবাদমান দুই সাম্রাজ্যবাদী প্রতিদ্বন্দ্বীর অন্তর্বিরোধের ফলে পরস্পরকে দোষী সাব্যস্তকরণ ও প্রতিশোধ গ্রহণের অবস্থার সৃষ্টি হয়।

ফারটাইল ক্রিসেণ্টের কিয়দংশে প্রাধান্য বিস্তারের প্রত্যাশী দ্বিতীয় দলটি হইল ইহুদীবাদী সংগঠন। ইহুদীবাদীগণ আরবদের চাইতে অধিক শক্তিশালী, কারণ তাহাদের দাবী পূরণের ব্যাপারে সহায়তা প্রদানের জন্য "বৃহৎ চতুষ্টয়ের" দেশগুলিতে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ রহিয়াছে। বালফোর ঘোষণাকে তাহারা তাহাদের ও গ্রেট বৃটেনের মধ্যে একটি ব্যক্তিগত চুক্তি হিসাবে রাখিতে চায় না। তাহারা ইহাকে মধ্যপ্রাচ্যের নীতি নির্ধারক

সমস্ত কিছুর মধ্যে স্থান দিতে চায়। অবশ্য অনেক ইহুদীও রহিয়াছে যাহারা এই ইহুদীবাদী পরিকল্পনার ঘোর বিরোধী। প্রায় ৩০০ নেতৃস্থানীয় আমেরিকান ইহুদী প্রেসিডেণ্ট উইলসনের নিকট ইহুদীবাদের বিরুদ্ধে একটি পত্র প্রেরণ করেন। ইউরোপে অনেক নেতৃস্থানীয় ইহুদীও রহিয়াছেন যাহাদের মতে ইহুদীবাদ তাঁহাদের মর্যাদাকে বিপদগ্রস্ত করিতেছে এবং আরও ব্যাপক সেমিটিক-বিরোধী কার্যকলাপের সুযোগ করিয়া দিতেছে।

ফারটাইল ক্রিসেণ্টের প্রাধান্য প্রত্যাশী তৃতীয় ও দুর্বলতম দল হইল ফয়সলের প্রতিনিধিত্বে অত্র অঞ্চলের আদি অধিবাসীবৃন্দ। আরবগণ গ্রেট বৃটেনের প্রতিশ্রুত স্বাধীনতা দাবী করে। তাহারা তাহাদের আশা-আকাঙ্খা কেন্দ্রীভূত করে উড্রু উইলসনের উপর এবং তাঁহার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের আদর্শের উপর—যে আদর্শ ইঙ্গ-ফরাসী জোট ও ইহুদীবাদীগণ নিজেদের উপর ছাড়া অন্য কোথাও প্রয়োগ করিতে চায় না। দুর্বল আরবগণ নিজেদের অন্তর্বিরোধের দরুন আরও দুর্বল হইয়া পড়ে। সাধারণভাবে খ্রীস্টানগণ এবং মেরোনাইটগণ একটি সংখ্যাগুরু মুসলিম রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু হইতে ভয় পায়। মেরোনাইটদের পুরাতন রক্ষাকারী হিসাবে ফ্রান্স "সিরিয়ান কমিশন" নামে একটি দল গঠন করে। এই কমিশন প্যারিস গমন করে এবং ফয়সল ও তাঁহার মুসলিম আরবদের ইউনিয়নের বিরোধিতা করে। অধিকন্তু বাগদাদ ও দামেস্কের আরব নেতৃবৃন্দের মধ্যেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান। কেউ কেউ একটি যুক্তরাজ্য চান, আবার কেউ কেউ সম্ভবতঃ বাস্তব দিক বিবেচনা করিয়া দুইটি রাষ্ট্রের এক ফেডারেশন পছন্দ করেন।

ফয়সল লণ্ডন গমন করেন এবং প্রথমবারের মত সাইক্‌স্‌-পিকট চুক্তি সম্পর্কে অবগত হন। বৃটিশগণ তাঁহাকে ফরাসীদিগকে গ্রহণ করিতে বলে এবং ইহুদীবাদী নেতৃবৃন্দ তাঁহার সম্মানে এক ভোজসভার আয়োজন করেন। ফয়সল আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার সম্পর্কে বলিয়া যান, কিন্তু তিনি বুঝিলেন যে বাস্তব রাজনীতিতে এই সকল আদর্শের কোন স্থান নাই। সম্ভবতঃ এই বোধশক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া তিনি ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারীতে ইহুদীবাদী সংগঠনের পুরোধা ওয়াইজম্যানের সহিত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই দলিলে ফয়সল "ব্যাপকহারে ইহুদীদের

প্যালেস্টাইনে আগমন" গ্রহণ করেন, তবে শর্ত হইল "আরব কৃষক ও প্রজা-চাষীদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে।" অপরদিকে ইহুদীবাদীগণ "প্যালেস্টাইনে বিশেষজ্ঞদের একটি দল প্রেরণ করিয়া প্যালেস্টাইন তথা আরব রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা জরিপ করিতে" সম্মত হয়। একটি "আরব রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠার শর্ত সাপেক্ষে ফয়সল স্বাক্ষর করেন, কিন্তু পরিণামে তাহা প্রতিষ্ঠা করা হয় নাই। এই চুক্তি পরবর্তী অনেক রক্তপাত হয়ত এড়াইতে পারিত যদি না আরব রাষ্ট্রবিরোধী সাইক্‌স্‌-পিকট চুক্তি মাঝখানে থাকিত।

ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট উইলসন মনে করেন বৃহৎ শক্তিবর্গ তাঁহার চৌদ্দ দফা গ্রহণ করিয়া তাহাদের সমস্ত গোপন চুক্তিসমূহ বাতিল করিয়াছে। উত্তেজনা প্রশমিত করিবার জন্য জাতিপুঞ্জের হুকুমনামা প্রথার ভূমিকার একটি আপোষ করা হয়। ইহার ভিত্তি হইল এই যে আরবগণ নিজস্ব সরকার গঠন করিবার মত উপযুক্ততা অর্জন করে নাই এবং একটি হুকুমনামা প্রাপ্ত শক্তি তাহাদিগকে এই বিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া তুলিবে। প্রেসিডেন্ট উইলসন এই আদর্শ গ্রহণ করেন, কারণ ইহা আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার আদর্শ প্রত্যাখ্যান নহে, স্থগিত করা মাত্র। কিন্তু কোন্ শক্তি কোন্ কোন্ এলাকায় হুকুমনামা লাভ করিবে তাহা লইয়া সমস্যার সৃষ্টি হয়। উইলসন ফারটাইল ক্রিসেন্টে একটি যুক্ত কমিশন প্রেরণ করিয়া জনমত যাচাই করিবার প্রস্তাব করেন। ফ্রান্স ইহাতে অংশ গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে, বৃটেন কোন মন্তব্য হইতে বিরত থাকে এবং ইহুদীবাদীগণ ইহার বিরোধিতা করে। কিন্তু ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে প্রেসিডেন্ট উইলসন অত্র অঞ্চলে কিং-ক্রেন কমিশন প্রেরণ করেন। কমিশন উহার রিপোর্ট লইয়া প্রস্তুত হইতে হইতে উইলসন পরাজিত ও রুগ্নব্যক্তিতে পরিণত হন। শুধু একটি ছাড়া তাঁহার চৌদ্দ দফার প্রত্যেকটি পরিবর্তন করা হয় কিংবা প্রত্যাখ্যান করা হয় অথবা কার্যকারিতা মূলতবী রাখা হয়। অবশিষ্ট একটি দফা, জাতিপুঞ্জ, বাস্তব রূপ লাভ করে, কিন্তু তাঁহার স্বীয় দেশ উহা প্রত্যাখ্যান করে। তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় নাই।

শান্তি সম্মেলনের শেষ নাগাদ সাইক্‌স্‌-পিকট চুক্তি, প্যালেস্টাইন

ও হুকুমনামা লইয়া বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে একটি সমঝোতা হয়। ইহুদী-বাদীগণ বালফার ঘোষণাকে একটি আন্তর্জাতিক ঘোষণা হিসাবে রূপদান করিতে সক্ষম হয়। অবশ্য আরবগণ একটি তুর্কী মুসলিম প্রভুর—যাহার বিরুদ্ধে তাহারা বিদ্রোহ করে—স্থলে দুইটি ইউরোপীয় খ্রীস্টান প্রভুর পদ সেবায় নিয়োজিত হয়।

ঊনত্রিশ অধ্যায়

হুকুমনামার (Mandate) অধীনে

ফারটাইল ক্রিসেণ্ট

হুকুমনামা প্রথার একটি উদ্দেশ্য হইল ইউরোপীয় শক্তিবর্গ যাহাতে একটি নতুন নামে তাহাদের পুরাতন সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ চালাইয়া যাইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা। ইহা হইল জাতিপুঞ্জের আশীর্বাদ লইয়া "শ্বেতাঙ্গ লোকের বোঝা" বৃদ্ধি। হুকুমনামা প্রথা সাইক্স্-পিকট চুক্তির প্রকৃতি পরিবর্তন করে নাই। ইহা লইয়া বৃটেন ও ফ্রান্স দুইটি সমস্যায় উপনীত হয়; একটি হইল প্যালেস্টাইন, অপরটি হইল তৈল সম্বন্ধ মোস্থল। উভয় সমস্যাই প্যারিস শান্তি সম্মেলনের বাহিরে সমাধান করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল স্যান রেমোতে ইহার নিষ্পত্তি হয়। গ্রেট বৃটেনকে প্যালেস্টাইনের হুকুমনামা প্রাপ্ত শক্তি বলিয়া স্বীকার করা হয়। ইহুদীবাদীদের প্রচেষ্টাকে ধন্যবাদ, জাতিপুঞ্জ গ্রেট বৃটেনকে বালফার ঘোষণা কার্যকরী করিতে আদেশ দেন। মোস্থল অঞ্চলে তৈল থাকার দরুন গ্রেট বৃটেন এই মর্মে সাইক্স্-পিকট চুক্তির কিছু রদবদল করিবার জন্য অনিচ্ছুক ফ্রান্সের নিকট ধর্ণা দেয়। এই অঞ্চলের উপর তুরস্কের আধিপত্য দাবী করিবার ফলে ব্যাপারটি আরও ঘোলাটে আকার ধারণ করে।

ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানী

প্রাচীন কালে দক্ষিণ-পশ্চিম ইরানের ন্যায় উত্তর ইরাকেও তৈল রহিয়াছে বলিয়া ধারণা করা হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বাণিজ্যিক আকারে তৈল লাভের সম্ভাবনা সম্পর্কে ওসমানীয় সাম্রাজ্যকে উপদেশ

দেওয়া হয়। একটি বিশেষ আদেশে ওসমানীয় সুলতান ও দ্বিতীয় আবদুল হামিদ মৌসুল ও বাগদাদ প্রদেশের অনুমতিপত্র "বেসামরিক তালিকায়" অর্থাৎ নিজের নামে পরিবর্তন করেন।

১৯০৪ হইতে ১৯১২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এক নাগাড়ে অনেক বিদেশী তৈল অনুসন্ধানকারীদল অনুমতিপত্র লাভের আগ্রহ প্রকাশ করে। জার্মানগণ ইস্তাম্বুলে প্রতিষ্ঠিত দ্যুৎসে ব্যাংকের (Deutche Bank) মাধ্যমে জড়িত হয়। ডি' আর্কির ইঙ্গ-পারস্য তৈল কোম্পানীর মাধ্যমে বৃটিশের স্বার্থ জড়িত থাকে। রয়েল ডাচ শেল কোম্পানী ইহার সহায়তাকারী এ্যাংলো-স্থাকসন তৈল কোম্পানীর মাধ্যমে আগ্রহী হয়। শেষ পর্যন্ত তথাকথিত চেষ্টার গ্রুপের মাধ্যমে মার্কিনগণও কথাবার্তা চালায়। মধ্যপ্রাচ্যের তৈল হইতে মার্কিনদিগকে দূরে সরাইয়া রাখিবার জন্য বৃটিশ, জার্মান ও ডাচ ব্যবসায়ীগণ ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে তুর্কী পেট্রোলিয়াম কোম্পানী গঠন করে। এই কোম্পানীর অংশ সমূহের মধ্যে বৃটিশ ৫০ শতাংশ এবং জার্মান ও ডাচগণ প্রত্যেকে ২৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে। ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে ওসমানীয়দের সহিত আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করা হয় এবং ২৮শে জুন প্রধান উজীর সাঈদ হালিম এক পত্রে জার্মান রাষ্ট্রদূতকে বলেন যে, তাঁহার সরকার "তুর্কী পেট্রোলিয়াম কোম্পানীকে এইগুলি (মৌসুল ও বাগদাদ) ইজারা দিতে এবং......চুক্তির সাধারণ শর্তাবলী .....স্বয়ং নির্ধারিত করিবার অধিকার রাখিতে রাজি।" প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার ফলে এই ব্যাপারে পরবর্তী কার্যকলাপ বন্ধ হইয়া যায়। কোম্পানী একটি সম্মতিপত্র ছাড়া কোন অনুমতিপত্র লাভ করে নাই। পরবর্তী বৎসরগুলিতে ইহার বৈধতার উপর প্রশ্ন তোলা হয়।

এইদিকে মার্কিনগণের প্রতিনিধিত্ব করে চেস্টার গ্রুপ। ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে এডমিরাল কলবি এম. চেস্টার নামক একজন অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন নৌ-বাহিনীর অফিসার পূর্ব এশিয়া মাইনর ও উত্তর মেসোপোটামিয়ায় রেলপথ নির্মাণের জন্য মহামান্য দরবার হইতে একটি অনুমতিপত্র লাভ করেন। রেলপথ চুক্তির মধ্যে ইহাও উল্লেখ ছিল যে, কিরকুক ও মৌসুল হইয়া পারস্য সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত রেলপথের উভয় পার্শ্বে ২০ কিলোমিটার পরিমিত এলাকায় তাহারা তৈলসহ অন্যান্য খনিজ দ্রব্যাও অনুসন্ধান করিবে;

তুর্কী গণপূর্ত মন্ত্রী এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন এবং ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে অনুমোদনের জন্য পার্লামেন্টে প্রেরণ করেন। কিন্তু বলকান যুদ্ধের ফলে অনুমোদন বিলম্বিত হয় এবং ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা প্রথম মহাযুদ্ধের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। অনুমোদন না পাওয়ায় এই অনুমতিপত্র অকেজো হইয়া যায়। পরবর্তীকালেও এই অনুমতিপত্রের বৈধতার উপর প্রশ্ন তোলা হয়।

বাহ্যতঃ সাইক্‌স্‌ বা পিকট কেহই ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে এই সকল চুক্তিপত্র সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না, ফলে যুদ্ধলব্ধ সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারার মধ্যে তাঁহারা তৈল সম্পর্কে বিবেচনা করেন নাই। তবে বৃটিশ কর্মকর্তাদের মধ্যে যাঁহারা তৈল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, তাঁহাদের ধারণা তুর্কী পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর অনুমতিপত্র কার্যকর। কিন্তু ফ্রান্সের জন্য বরাদ্দকৃত এলাকার তৈলের অনুমতিপত্র বিসদৃশকর। বৃটিশ বৈদেশিক সচিব স্যার এডওয়ার্ড গ্রে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই মে এক গোপন পত্রে ফরাসী রাষ্ট্রদূতকে এই অসুবিধা সম্পর্কে অবহিত করেন। ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ফরাসী প্রধান মন্ত্রী ক্লিমেনস্যু (Clemenceau) লণ্ডন সফরে গমন করিলে বিষয়টি পুনরায় উত্থাপন করা হয়। মোটামুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে, মৌসুল তৈলের একটি অংশ এবং রুহরে ফরাসী দাবীর পক্ষে বৃটিশ সমর্থনের বিনিময়ে ফ্রান্স গ্রেট বৃটেনকে স্থান দিতেও পারে। ইহার ভিত্তিতে দুই দেশের মধ্যে পরবর্তী আলাপ-আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। নতুন চুক্তি অনুসারে তুর্কী পেট্রোলিয়ামের ২৫ শতাংশ শেয়ারের বিনিময়ে ফ্রান্স বৃটেনের নিকট মৌসুল প্রদেশ ছাড়িয়া দেয়। এই ২৫ শতাংশের মূল মালিক ছিল জার্মানী। এই পরিবর্তন দেখাইবার জন্য নতুন মানচিত্র তৈয়ার করা হয় এবং সমগ্র পরিকল্পনাটিকে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল স্বাক্ষরিত স্যানরেমো চুক্তির অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

তবে স্যানরেমো চুক্তি তৈল সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান দেয় নাই। মধ্যপ্রাচ্যের তৈলে মার্কিন তৈল কোম্পানীগুলির আগ্রহ এবং মৌসুলের উপর তুর্কী জাতীয়তাবাদীদের দাবীর ফলে বিষয়টি ঘোরালো আকার ধারণ করে। স্যানরেমোতে উপস্থিত একজন মার্কিন পর্যবেক্ষক তৈল অনুমতিপত্র সম্পর্কে রিপোর্ট প্রদান করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সরকার মার্কিন তৈল কোম্পানীগুলির জন্য এই সংস্থার একটি অংশ দাবী করে। মার্কিন যুক্তির

ভিত্তি হইল সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা না করিলেও যুক্তরাষ্ট্র তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অর্থ ব্যয় করিয়াছে। তদুপরি, বৃটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক একটি তৈল-অনুমতিপত্রের উপর একচেটিয়া অধিকার লাভ মাকিন অবারিত দ্বার নীতির পরিপন্থী। পরে যুক্তরাষ্ট্র চেষ্টারের অনুমতিপত্র উত্থাপন করে এবং যুক্তি প্রদর্শন করে যে ইহাও তুর্কী পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর ন্যায় বহাল রহিয়াছে।

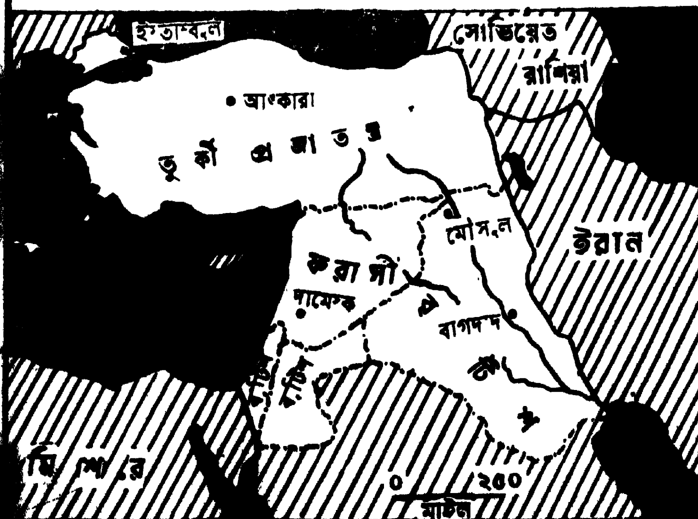
১৯২৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই বাদানুবাদ চলিতে থাকে এবং ল্যুজ্যানের (Lausanne) সম্মেলনে ইহা একটি আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়। এই সম্মেলনে আতাতুর্ক মৌসুল প্রদেশ দাবী করেন। এক সময় তুর্কী ও মাকিনগণ একটি সমঝোতা লইয়া আলোচনা করে, যদ্বারা মাকিনগণ তুর্কীদিগকে মৌসুল লাভের সহায়তা করিলে বিনিময়ে তুর্কীগণ মাকিনদিগকে মৌসুল তৈল দান করিবে। ইতিমধ্যে বৃটিশগণ বুঝিতে পারিল যে ইরানের[১] ন্যায় ইরাকের তৈল ব্যবসায়ে তাহারা মাকিনদিগকে দূরে রাখিতে পারিবে না। জাতিপুঞ্জের পরিষদ মৌসুল প্রশ্নে গ্রেট বৃটেনের স্বপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করিলে তুর্কীগণ বৃটিশদের সহিত সমঝোতায় আসিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অতএব কিঞ্চিৎ সীমান্ত রদবদল এবং মৌসুল তৈল হইতে সেলামী বাবৎ ১০ শতাংশ শেয়ার লইয়া তুর্কীগণ মৌসুল হইতে তাহাদের দাবী প্রত্যাহার করে। মৌসুল, তৈলের শেষ মীমাংসার কাহিনী এইস্থলে বিবৃত করিবার পক্ষে খুবই জটিল। একটি নতুন পন্থা অনুযায়ী ইরাক সরকার তুর্কী পেট্রোলিয়াম কোম্পানীকে ২৪ খণ্ড জমির অনুমতিপত্র দান করে। এই কোম্পানীর পরিবর্তিত নাম 'ইরাক পেট্রোলিয়াম'। বৃটিশ, ফরাসী, ডাচ ও মাকিন গ্রুপগুলির প্রত্যেকে ২৩'৭৫ শতাংশ লাভ করে এবং অবশিষ্ট ৫ শতাংশ সার্কিশ গুলবেংকিয়ানের (Sarkis Gulbenkian) হাতে যায়। সার্কিশ ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের মূল অনুমতিপত্রের একজন দালাল, যিনি যেভাবেই হউক পরবর্তী আলাপ-আলোচনায় নিজের স্থান করিয়া লন। এই বন্দোবস্ত যেহেতু শুধু ২৪টি খণ্ডের জন্য এবং ইরাকী সরকার অবশিষ্ট খণ্ডগুলি প্রতিযোগিতামূলক ভাবে দিতে পারে তাই ইহাতে খুব প্রতিযোগিতা চলে এবং অধিকারের কলহ অনেকদিন চলিতে থাকে।

১। নীচে দ্রষ্টব্য পৃঃ ৩৩৪।

তুরস্কের গোপন বিভক্তিকরণ ও সাইক্স-পিকট চুক্তি
১৯১৫ খ্রীঃ ১৯১৭ খ্রীঃ



ম্যাণ্ডেট প্রথা—১৯২০ খ্রীঃ



ফয়সল এবং ফরাসীগণ

ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, প্যারিস শান্তি সম্মেলন ফারটাইল ক্রিসেণ্টের ব্যাপারে কোন পরিষ্কার সিদ্ধান্ত ছাড়াই মুলতবী হইয়া যায়। ফয়সল এবং ক্ষুদ্র সংখ্যক আরব নেতৃবৃন্দ প্রেসিডেণ্ট উইলসনের কিং-ক্রেন কমিশনের উপর তাহাদের আশার দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। কমিশন ঐ এলাকা সফর করে এবং দুইটি হুকুমনামার শুপারিশ করে, একটি ইরাকে এবং অপরটি সিরিয়ায়। আরও শুপারিশ করে যে বৃটেনকে ইরাকের হুকুমনামা ও যুক্তরাষ্ট্রকে সিরিয়ার হুকুমনামা দেওয়া হউক, সিরিয়ার বিভক্তিকরণ মওকুফ করা হউক এবং ফয়সলকে সিরিয়ার শাসনতান্ত্রিক বাদশাহ করা হউক। এই রিপোর্টে সঠিক এবং পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয় যে, ফ্রান্সকে সিরিয়ার উপর হুকুমনামা প্রদান করিলে যুদ্ধ বাধিবে। কিন্তু কেহই এই রিপোর্টের প্রতি কর্ণপাত করে নাই এবং এমন কি তিন বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে ইহা প্রকাশও করা হয় নাই।

তবে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-ফরাসী চুক্তির দ্বারা আরবগণ হতাশ হয়, যাহাতে দেখানো হয় যে সাইক্‌স্‌-পিকট চুক্তি তখনও দাপ্তরিক নীতি। ফরাসী সেনাবাহিনী বৃটিশদের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং ফয়সলের প্রতিবাদ নিষ্ফল প্রতীয়মান হয়। ইঙ্গ-ফরাসী নীতির পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে ফাতাত সোসাইটির নেতৃত্বে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ২০শে মার্চ সিরীয় কংগ্রেস দামেস্কে মিলিত হয় এবং সিরিয়ার (তন্মধ্যে লেবানন ও প্যালেস্টাইনও সামিল) স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তাহারা ফয়সলকে রাজমুকুট গ্রহণ করিতে আহ্বান করে এবং তিনি তাহা গ্রহণ করেন। বৃটিশ ও ফরাসী সরকারদ্বয় কংগ্রেসের কার্যাবলী অগ্রাহ্য করে এবং স্যান-রেমোর সম্মেলনের প্রস্তুতি চালাইয়া যায়, যাহা ফারটাইল ক্রিসেণ্টের ভাগ্য নির্ধারণ করে।

ফরাসী ও সিরীয়বাসীগণ যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সিরিয়ার নিযুক্ত ফরাসী রাষ্ট্রদূত জেনারেল গোরোদ (General Gourand) ফয়সলের নিকট একটি চরমপত্র প্রেরণ করেন যাহাতে তিনি অনতিবিলম্বে ফরাসী হুকুমনামা গ্রহণ করিতে, ফরাসী কাগজী মুদ্রা গ্রহণ করিতে, ফরাসীদের আলেপ্পো অধিকার স্বীকার করিতে, সিরীয় সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করিতে,

বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে যোগদান বন্ধ করিতে এবং ফরাসী-বিরোধী বিক্ষোভের জন্য দায়ী লোকদের শাস্তি প্রদানের দাবী করেন। সিরীয়গণ বাধা প্রদান করিতে চায় কিন্তু তাহাদের গোলাবারুদের পরিমাণ ছিল মাত্র কয়েক ঘণ্টার মত। ফয়সল চরমপত্র গ্রহণ করেন, যদ্বারা ফরাসী জেনারেল নিশ্চয়ই হতবাক হইয়া যান, কারণ তিনি আরও আটটি জটিল দাবী প্রেরণ করেন। পরিষ্কার বুঝা যায় যে ফরাসীগণ সমগ্র সিরিয়া দখল করিতে চায়। ফলে যুদ্ধ কিছুতেই এড়ানো গেল না। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে ২৪শে জুলাইয়ে সংঘটিত মাইসালানের যুদ্ধ অর্ধেক দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয় এবং ফরাসী বাহিনীর আফ্রিকান, আলজেরীয়, মরক্কো ও সেনেগলী সৈন্যগণ দামেস্ক অভিমুখে অগ্রসর হয়। ২৫শে জুলাই তাহারা শহরে প্রবেশ করে এবং ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের ১লা অক্টোবর বিজয়ীবেশে প্রবেশের ২২ মাস পর ফয়সল দামেস্ক ত্যাগ করেন। ফরাসীদের সহিত বৃটিশদের সম্পর্ক বিদ্যমান এবং আরবদের খাতিরে তাহারা উহা ভঙ্গ করিতে নারাজ। কিন্তু তাহারা ফয়সলকে সসম্মানে তাহাদের এলাকায় গ্রহণ করে।

১৯২২ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে জাতিপুঞ্জের পরিষদ সিরিয়া-লেবাননের উপর ফরাসী হুকুমনামা এবং প্যালেস্টাইন ও ইরাকের উপর বৃটিশ হুকুমনামা অনুমোদন করে। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্র এই হুকুমনামাগুলি স্বীকার করিয়া লয়।

সিরিয়া-লেবাননের উপর হুকুমনামা

শুধু সিরীয় ও লেবাননীদিগকে স্বীয় শাসন শিক্ষা লাভ করিতে সহায়তা করিবার উদ্দেশ্যে ফরাসীগণ এত কষ্ট স্বীকার করিয়া হুকুমনামা লাভ করিয়াছে—ইহা চিন্তা করা হাস্যাস্পদ। এখানে সেখানে সম্ভবতঃ কোন কোন ফরাসী কর্মকর্তা এইরূপ চিন্তা করে, কিন্তু প্রধান উদ্দেশ্য হইল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য লাভ। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ ফ্রান্সই একমাত্র দেশ যাহাদের কঠোর পরহিতকর উদ্দেশ্য রহিয়াছে, অতীতে যেরূপ সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, ইহা অপাশ্চাত্য বিশ্বের মধ্যে ফরাসী সাংস্কৃতির ছোঁয়াচ বিতরণ করিতে ইচ্ছুক। সম্ভবতঃ সাংস্কৃতিক আধিপত্যের জন্য ফ্রান্স অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধাদি বিসর্জন দিয়াছে,

যাহা গ্রেট ব্রটেন কখনও করিতে পারে নাই। ইহার সর্বোত্তম উদাহরণ মধ্যপ্রাচ্যে পাওয়া যায়, যেখানে মিসর ও ইরানের ন্যায় দেশে ব্রটেন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবিধাদি ভোগ করে, অথচ তথায় ফরাসী ভাষা ও সংস্কৃতি প্রবল।

লেবাননে ফরাসী স্বার্থ সুদূর প্রসারী। ফরাসী প্রধান মন্ত্রী ক্লিমেন্সু প্রেসিডেন্ট উইলসনকে নিশ্চিতভাবে বলেন যে ফ্রান্সের সিরিয়ায় অবস্থান না করাটা "জাতীয় অপমান, যাহা একজন সৈনিকের যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিবার সামিল।" এখানে উল্লেখ করা যায় যে একই তেজস্বিতা প্রকাশ করিয়া ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে জেনারেল দ্য গল সিরিয়া-লেবানন হইতে বহিষ্কৃত হন।

এইরূপ জাতীয় ও সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য লইয়া ফ্রান্স আরব জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং যে সকল দল ফ্রান্সকে সমর্থন করে তাহাদের সহায়তা করে। এই সকল সমর্থনকারী ছিল সংখ্যালঘু খ্রীস্টান, আলাভী কুর্দ, আর্মেনীয় প্রভৃতি সুপরীক্ষিত বিভক্ত করিবার নীতি অবলম্বন করিয়া ফরাসী রাষ্ট্রদূত জেনারেল গোঁরো দ ক্ষুদ্র দেশটিকে পাঁচভাগে ভাগ করেন। এইগুলি হইল ঃ (১) বৃহৎ লেবানন, ইহার মধ্যে রহিয়াছে লেবানন ও এণ্টি-লেবানন পর্বতমালা এবং ত্রিপলির উত্তর হইতে প্যালেস্টাইন পর্যন্ত বিস্তৃত উপকূলভাগ, (২) লাতাকিয়া বা ত্রিপলির উত্তরাংশে আলাভী সমুদ্রোপকূল, (৩) আলেপ্পো, (৪) দামেস্ক এবং (৫) জাবাল দ্রুজে বা দামেস্কের দক্ষিণে অবস্থিত দ্রুজে পর্বতমালা। এই বিভক্তি প্রথম হইতেই অবাস্তব প্রমাণিত হয়। বিভিন্ন ফরাসী রাষ্ট্রদূতগণ বিভিন্ন প্রকারের রাষ্ট্রজোটের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুইটি পৃথক প্রশাসনের উন্মেষ ঘটে, একটি বৃহৎ লেবাননের জন্য এবং অপরটি অবশিষ্ট চারটি ভাগের সম্মিলিত অংশের জন্য, যাহাকে পরে সিরিয়া বলা হয়। এই দুইটির মধ্যে শাসন কার্যের দিক হইতে লেবাননই ফ্রান্সের জন্য সহজতর হয়, এবং তাহাও সহজতর হয় প্রধানতঃ মেরোনাইটদের জন্য, কারণ তাহারা সর্বদাই ফরাসীদের সহিত সহযোগিতা করে।

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ফয়সলের বহিষ্কার হইতে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের স্বাধীনতা পর্যন্ত সিরিয়ার ইতিহাস হইল দাঙ্গা, বিদ্রোহ ও যুদ্ধের ইতিহাস। ইহার

পিছনে দুইটি কারণ রহিয়াছে। একটি হইল, আরবীভাষী বিশ্বের অন্য যে কোন এলাকার তুলনায় সিরিয়ার আরব জাতীয়তাবাদ তখনও এবং বর্তমানেও অতি শক্তিশালী। এই সিরিয়া-লেবাননেই আরবীবাদ প্রথম শুরু হয় এবং সেই হোসেন-ম্যাক মাহন পত্রালাপের সময় সিরিয়ার ফাতাত সমিতিই প্রথম সম্মিলিত আরব রাজত্বের প্রস্তাব করে। ওসমানীয় প্রশাসনের সময় "সিরিয়া" বলিতে লেবানন ও প্যালেস্টাইন বুঝাইত। সিরীয়গণ কখনও পৃথক হইতে ইচ্ছুক ছিল না বা সক্ষমও হয় নাই। তদুপরি আরব ঐক্যের ব্যাপারে সিরীয়গণ একটি বিশেষ দায়িত্ব অনুভব করে, কারণ দামেস্ক ছিল প্রথম ও একমাত্র সম্মিলিত আরব সাম্রাজ্যের, অর্থাৎ উমাইয়াদের রাজধানী।

সিরিয়াবাসীদের বিপত্তির দ্বিতীয় কারণ হইল ফরাসীদের অযোগ্য প্রশাসন। মোটামুটিভাবে ফরাসীগণ হইল গর্বিত, নীচমনা, অনুপোযোগী, বিনীতভাবে পুরুষানুক্রমিক ও কঠোর। ধর্মানুসারে জনসাধারণকে বিভক্ত করাই তাহাদের মূলনীতি, কিন্তু সামরিক রাষ্ট্রদূতগণ, যাহারা সম্ভবতঃ ফরাসীদের ঐতিহ্যবাহী ধর্মজাযক শ্রেণী-বিরোধী নীতি সমর্থন করে না এবং তাই রোমান ক্যাথলিক ধর্মের প্রচার কার্যে সাহায্য করিবার জন্য এবং ক্যাথলিক খ্রীস্টানদিগকে বাকী ধর্মাবলম্বীদের চাইতে অধিক সুবিধা প্রদান করিবার জন্য বেশী বাড়াবাড়ি করে।

একদিকে ফ্রান্সের সাম্রাজ্যবাদ এবং অপরদিকে সিরিয়াবাসীদের স্বাধীনতার আগ্রহের ফলে ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ইহার তাৎক্ষণিক কারণ হইল ক্যাপ্টেন কারবিলেটের নির্বুদ্ধিতা, যিনি দ্রুজে নেতা সুলতান আল-আতরাশের পূর্ব অনুমতি ছাড়া কিছু পরিবর্তন সাধন করেন। আবার সমগ্র ব্যাপারটির উপর রাষ্ট্রদূত জেনারেল সারাইলের কঠোর ব্যবহার, যিনি দ্রুজে নেতৃবৃন্দকে একটি ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া কারারুদ্ধ করেন। আতরাশ ভোজ সভায় উপস্থিত হন নাই এবং পরে দ্রুজে এলাকায় একটি ফরাসী সৈন্যদলকে আক্রমণ করেন। এই সংকেত পাইয়া দামেস্ক, হোম্‌স্‌, হ্যামা ও অন্যান্য স্থানে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এই সকল শহরে দ্রুজে নেতা ও জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে ষড়যন্ত্র হয়। জেনারেল সারাইলের পরিবর্তে জেনারেল গ্যামেলিনকে আনয়ন করা হয়।

তিনি ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে দামেস্কের বিরুদ্ধে সাঁজোয়া বাহিনী ও বিমান লইয়া অগ্রসর হন। তিনি নগর অধিকার করেন, কিন্তু প্রচুর প্রাণহানির বিনিময়ে। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্রোহ চলিতে থাকে। ফরাসীগণ একজন বেসামরিক রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করিয়া আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করিলে যুদ্ধ কিছুটা স্তিমিত হয়। সিরীয় জাতীয়তাবাদী দলগুলি আল-কুতলা আল-ওয়াতানিয়্যা নামে একটি জাতীয়তাবাদী সংস্থা গঠন করে এবং স্বায়ত্ত শাসন ও লেবানন ব্যতীত সমস্ত পৃথক প্রশাসনিক এলাকাগুলির ঐক্য'দাবী করে। মাঝে মাঝে ধর্মঘট ও বিদ্রোহের মধ্য দিয়া আট বৎসর ধরিয়া জাতীয়তাবাদী ও ফরাসীগণ একটি শাসনতন্ত্রের মূলনীতি, সরকারের বিন্যাস এবং স্বাধীনতার পরিমাণ লইয়া টানাহেচড়া করে।

যে কারণে গ্রেট ব্রটেন মিসরীয়দের সহিত সমঝোতায় আসিতে বাধ্য হয়, অর্থাৎ হিটলারের উত্থান ও ইথিওপিয়ায় মুসোলীনির অভিযান, সেই একই কারণে ফরাসীগণও সিরীয়বাসীদের সহিত সমঝোতায় আসিতে বাধ্য হয়। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের ৯ই সেপ্টেম্বর দুই দেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইহার ধারাসমূহ একই বৎসরে স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-মিসরীয় চুক্তির ধারাসমূহের ন্যায়। জাতীয়তাবাদীগণ নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং হাসিম আল-আতাশীকে প্রেসিডেণ্ট ও জামিল মারদামকে প্রধান মন্ত্রী হিসাবে মনোনীত করে। বাহ্যতঃ ফ্রান্স ব্যাপারটিকে তেমন আমল দের নাই কারণ সিরিয়ায় সে তাহার হুকুমনামার রাজত্ব এমনভাবে চালাইতে থাকে যেন কোন চুক্তিই স্বাক্ষরিত হয় নাই। ফরাসী পার্লামেণ্ট কখনও এই চুক্তি অনুমোদন করে নাই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনার সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়ার ক্ষণস্থায়ী স্বাধীনতার অবসান হয়।

ফরাসী সেনাবাহিনীর সদর দফতর এবং মেরোনাইটদের প্রতি ফরাসীদের সহানুভূতি থাকিবার ফলে লেবাননের অবস্থা সিরিয়ার ন্যায় তেমন ভয়াবহ রূপ ধারণ করে নাই। লেবাননে জাতীয়তাবাদী খ্রীস্টান, মুসলমান ও দ্রুজে বিদ্যমান, যাহারা সিরীয় জাতীয় দলের (Syrian National Party) সদস্য এবং ঐক্য ও স্বাধীনতা চায়। তবে মোটের উপর জাতীয়তাবাদী বিক্ষোভের সূচনা হইল সিরিয়ায়। সিরিয়ার ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের যুদ্ধের ফলে লেবাননীগণ কিছুটা স্বাধীনতা লাভ করে। তাহারা একটি

প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে এবং চার্লস ডাব্বাসকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে মনোনীত করে, কিন্তু ফরাসীগণ জোরালো কণ্ঠে বলিতে চায় যে লেবানন স্বাধীন কিন্তু সার্বভৌম নহে। শীঘ্রই ফরাসীগণ "স্বাধীনতা" ছিনাইয়া লয় এবং শাসনতন্ত্র বাতিল ঘোষণা করে। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে লেবাননের সহিত ফ্রাংকো-সিরিয়ান চুক্তির ন্যায় একটি চুক্তির আয়োজন করা হয়। কিন্তু ফরাসীগণ সিরিয়াবাসীদের সহিত যেই ব্যবহার করে লেবাননীদের সহিত উহার তুলনায় খুব ভাল ব্যবহার করে নাই। তাহারা শুধু হুকুমনামা ত্যাগ করে নাই এবং ফ্রান্সের "সভ্যকরণের উদ্দেশ্য" কার্যে পরিণত করে নাই।

ইরাকের উপর হুকুমনামা

সিরিয়ার উপর ফরাসী হুকুমনামার তুলনায় ইরাকের উপর বৃটিশ হুকুমনামা অনেকটা শান্তিপূর্ণ। ইহা কতকাংশে অন্য অঞ্চলের উপর বৃটিশ অভিজ্ঞতার দরুন সম্ভব হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল বৃটিশ আওতাভুক্ত হইয়া পড়ে এবং বৃটিশ প্রতিনিধি-বর্গ নিম্ন মেসোপোটামিয়ায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে। তদুপরি বহুসংখ্যক বৃটিশ অফিসার হেজাজ সেনাবাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ইহা এমন এক অভিজ্ঞতা যাহা ফরাসী অফিসারদের ছিল না। সিরিয়ার দলসমূহের ন্যায় ইরাকী রাজনৈতিক দলসমূহ চরমপন্থীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে। সিরীয়দের নীতি হইল "সমস্ত কিছু অথবা কিছুই না"—এমন এক নীতি যাহা আরবগণ বার বার ইহুদীবাদের ব্যাপারে প্রয়োগ করিয়াছে। ইরাকীদের নীতি হইল "লও এবং আরও চাও।" অবশ্য ইহার অর্থ এই নহে যে ইরাকে চরমপন্থীও নাই বা সামরিক অভ্যুত্থানও নাই।

প্রথমদিকে বৃটিশগণ বেশ সমস্যার সম্মুখীন হয় কারণ ইরাকের কার্যাবলী প্রধানতঃ ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকে। সেই ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে "এ্যাংলো ইণ্ডিয়ানগণ" ইরাকে আধিপত্য বিস্তার করিবার ব্যাপারে এমন নিশ্চিত হইয়া যায় যে তাহারা তাহাদের পরিবারবর্গও লইয়া আসে এবং প্রশাসনিক ক্ষমতা এমনভাবে হাতে লয় যেন তাহারা চিরতরে এখানে থাকিয়া যাইবে। বৃটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার আরনল্ড উইলসন একটি "গণভোট" পরিচালনা করেন

এবং তাহাতে দেখা যায় যে ইরাকীগণ গ্রেট বৃটেনকেই চায়, ভারত সরকারকে নহে।

ইরাকীগণ অবশ্য বৃটিশদিগকেও চায় না এবং তাহা ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে সংঘটিত বিদ্রোহের দ্বারা প্রমাণিত হয়। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে স্বাক্ষরিত স্যানরেমো চুক্তি ঘোষণা এবং তৎসঙ্গে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মনোভাবের দরুন ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। ইহা প্রণিধানযোগ্য যে একই সময় মিসরীয় জাতীয়তাবাদীগণ বৃটিশদের আধিপত্যের মোকাবিলা করে, কামালপন্থীগণ আঁতাত কর্তৃক চাপানো "শান্তি"কে বাধা দান করে এবং সিরিয়াবাসীগণ ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। প্রায় ৬৫০০০ সৈন্য আনিয়া, দশলক্ষ ডলার খরচ করিয়া এবং উভয় পক্ষে প্রচুর হতাহতের পর লণ্ডনের বৃটিশ সরকার ক্ষমতা দখল করে। অত্র অঞ্চলে পরিচিত ও সম্মানিত স্যার পার্সি কক্সকে রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করা হয়। তিনি বৃটিশ কর্তৃক একটি জাতীয় ইরাকী সরকার প্রতিষ্ঠা করিবার কথা ঘোষণা করেন।

তদানীন্তন ঔপনিবেশিক সেক্রেটারী ইউন্সটন চার্চিলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে কায়রো সম্মেলনের হাতে হঠাৎ এক জটিল সমস্যা আসিয়া পড়ে। সাইক্স-পিকট চুক্তি বাস্তবায়নের ব্যাপারে সাধারণ মত ছিল ফয়সল সিরিয়ার বাদশাহ্ হইবেন এবং আবদুল্লাহ্ ইরাকের বাদশাহ হইবেন। বস্তুতঃ সিরীয় জাতীয় কংগ্রেস ফয়সলকে সিরিয়ার বাদশাহ হিসাবে গ্রহণ করিবার সময় আবদুল্লাহকে ইরাকের বাদশাহ মনোনীত করে। গ্রেট বৃটেন ইহার বিপক্ষে ছিল না। তবে ফরাসী সরকার ফয়সলকে বহিষ্কার করিয়া ব্যাপারটিকে ঘোরালো করিয়া তোলে, যাহার ফল হইল বৃটিশদের হাতে দুইটি বাদশাহই আসিয়া পড়ে। দুই ভ্রাতার মধ্যে ফয়সলই অধিক জনপ্রিয়, তাই গ্রেট বৃটেন তাঁহাকেই ইরাকের বাদশাহ বানাইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। স্যার পার্সি কক্স এমন আয়োজন করিলেন যাহাতে ইরাকীগণ ফয়সলকে তাহাদের বাদশাহ হইতে আহ্বান জানায়। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে আগস্ট তিনি অভিষিক্ত হন। আবদুল্লাহকে অতঃপর "ট্রান্স-জর্ডনের" আমীরী প্রদান করা হয়। এই দেশ বৃটিশগণ সুবিধানুসারে জর্ডন নদীর পশ্চিম তীরে দক্ষিণে আকাবা উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়া সৃষ্টি করে।

১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে ওসমানীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পরবর্তী তিন বৎসর ফয়সলের নীতিবাদী জাতীয়তাবাদ বেশ খানিকটা ধাক্কা খায়। সিরীয়দের চরম জাতীয়তাবাদ এবং সম্পূর্ণ বৃটিশ আনুগত্যের মাঝামাঝি একটি পথ তিনি বাছিয়া লইতে চেষ্টা করেন। গ্রেট বৃটেনও ভারত সরকারের প্রভাব হইতে মধ্যপ্রাচ্য নীতিকে মুক্ত করিবার পর কিছুটা আপোষমূলক হইয়া পড়ে। ১৯২২ হইতে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে অনেকগুলি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় আবার বাদ দেওয়া হয়। এক চরম টানাহেচড়ার মধ্যে ইরাকের জনসাধারণ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীগণ যাহা দিতেছে তাহার চাইতে অধিক সুবিধাদি দাবী করে। একজন আরব হিসাবে ফয়সলকে গ্রেট বৃটেন পুরাপুরি বিশ্বাস করে না, আবার বৃটিশের একজন বন্ধু হিসাবে তিনি জাতীয়তাবাদীদের চোখেও সন্দেহাতীত নহেন। কিন্তু ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে ইরাককে স্বাধীনতা দিয়া একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া পর্যন্ত তিনি উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সমঝোতা রক্ষা করিয়া চলেন। এই চুক্তি ছয় বৎসর পর স্বাক্ষরিত ইঙ্গ-মিসরীয় চুক্তির সদৃশ এবং ফরাসীদের জন্যও ইহা একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ। পারস্য উপসাগরের বসরায় একটি নৌঘাঁটি এবং বাগদাদের নিকটস্থ হাব্বানিয়া বিমানবন্দরে একটি বিমান ঘাঁটি রক্ষা করিতে গ্রেট বৃটেনকে অনুমতি দেওয়া হয়। যুদ্ধের সময় সমস্ত সম্পদ বৃটিশদের এখতিয়ারে তুলিয়া দিতে ইরাক রাজী হয়। ইরাককে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং হুকুমনামার শেষচিহ্নও বিলুপ্ত হয়। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে গ্রেট বৃটেন ও ইরাক উভয়ে চুক্তিটি অনুমোদন করে এবং জাতিপুঞ্জে আসন লাভের ব্যাপারে ইরাক প্রথম আরব রাষ্ট্রের সম্মান লাভ করে।

১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের চুক্তি লইয়া ইরাকী জাতীয়তাবাদীগণ সন্তুষ্ট হয় নাই। তাহাদের দৃষ্টিতে গ্রেট বৃটেনের সহিত সম্পর্ক রাখিয়া ইরাক সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে পারে না, তাহারা সিরিয়ার জাতীয়তাবাদীদের সহিত একযোগে সংগ্রাম করিতে চায়। অপরদিকে ইরাকে তৈলের অনুসন্ধান লাভ এবং তৈল অনুমতিপত্রের চুক্তি স্বাক্ষরের পর ইরাক ধনী হইয়া উঠে। অনুমতিপত্র ৭৫ বৎসরের জন্য প্রদান করা হয় এবং ইরাক প্রতি মেট্রিক টন অপরিশোধিত তৈলে চারিটি স্বর্ণমুদ্রা সেলামী হিসাবে লাভ করে। ইরাকীদের অনেকেই এই সম্পদে বাকী আরবদিগকেও অংশ দিতে অস্বীকার করে। তদুপরি

"স্টার্লিং ব্লকের" সদস্য হিসাবে ইরাকী মুদ্রা নিশ্চিত হয়, অথচ ফরাসী ফ্রাংকের সহিত সম্পর্কযুক্ত সিরিয়ার মুদ্রা ছিল অনিশ্চিত।

ইরাকের শাসকচক্র বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে বিভক্ত হইয়া যায়। প্রত্যেক দলে প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ থাকে, যাহাদের ভাগ্য পার্ল'ামেণ্টে প্রাপ্তভোটের সংখ্যা দ্বারা উঠানামা করে। মোটের উপর তাহারা দুইটি দলে বিভক্ত, একদল গ্রেট বৃটেনের সহিত সদ্ভাব রাখিবার পক্ষে, আরেক দল ইহার বিপক্ষে। প্রথমোক্ত দলে থাকে ন্যাশনাল পার্টি, প্রগ্রেসিভ পার্টি এবং হুকুম-নামার পূর্বে গঠিত পুরাতন আহ্দ পার্টি, যাহার প্রধান ব্যক্তি হইলেন জেনারেল নূরী আল-সাঈদ। যে সকল ব্যক্তিবর্গ গ্রেট বৃটেনের বিরোধিতা করে তাহারা ন্যাশনাল ব্রাদারহুড বা ইখা আল-ওয়াতানী দল গঠন করে, যাহার প্রধান ব্যক্তিবর্গ হইলেন ইয়াসীন আল-হাশিমি ও রশিদ আল-জিলানী।

ইরাকের জনসাধারণের মধ্যে বৈসাদৃশ্যের ফলে রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাদির সমাধান আরও দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশের মধ্যেই ইহা রহিয়াছে এবং এই জন্য উপনিবেশিক শক্তিবর্গ দায়ী নহে। ইরাকের ৫০ লক্ষ সংখ্যাগুরু অধিবাসীই মুসলমান, কিন্তু তাহারা শীয়া, সুন্নী ও কুর্দ্ নামক তিনটি বিবদমান সম্প্রদায়ে বিভক্ত। শীয়া সংখ্যাগুরুদের শাসক সংখ্যালঘু সুন্নীগণ কখনও প্রথমোক্তদের আনুগত্য সম্পর্কে নিশ্চিত ছিল না, কারণ তাহাদের মধ্যে পারস্যপ্রবণতা বিদ্যমান। শীয়া ও সুন্নীগণ আরবী ভাষায় কথা বলে; কিন্তু ধর্মতঃ সুন্নী কুর্দগণ কুর্দী ভাষায় কথা বলে। তদুপরি তাহারা আধা-বেদুইন কুর্দদের অংশবিশেষ—যাহারা ইরান ও তুরস্কে বসবাস করে এবং জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের আকাঙ্খী। ইরাকের অতি দুর্ভাগা দল সম্ভবতঃ প্রায় ৯০,০০০ সিরিয়াকভাষী আসিরীয় খ্রীস্টান। তাহারা পশ্চিম এশিয়া মাইনরের পার্বত্য অঞ্চলে বাস করে। বৃটিশগণ আর্মেনীয়দের ন্যায় তাহাদিগকেও জাতীয় স্বায়ত্তশাসনের আশা দেয় এবং তুর্কীদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে উৎসাহ প্রদান করে। বলশেভিক বিপ্লবের দরুন রুশ সৈন্যদের প্রত্যাহারের ফলে আসিরীয়দিগকে দক্ষিণে মেসোপোটামিয়ার দিকে ঠেলিয়া দেওয়া হয়। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে সংগ্রামের সময় বৃটিশগণ ইরাকীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য

আসিরীয় সৈন্যদিগকে তালিকাভুক্ত করে এবং ফলে ইরাকীদের সহিত তাহাদের শত্রুতা গড়িয়া উঠে। পরবর্তী শান্তি আলোচনার সময় তুর্কীগণ আসিরীয়দিগকে তাহাদের আবাসভূমিতে ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দেয় নাই; যাহার ফলে তাহাদের বিরাট অংশ ইরাকে আটক হইয়া পড়ে। এইগুলি ছাড়া ছিল ১ লক্ষ ইহুদী যাহারা খ্রীস্টীয় যুগের পূর্ব হইতে মেসোপোটামিয়ায় বসতি স্থাপন করিয়াছিল, ক্ষুদ্র সংখ্যক আর্মেনীয় এবং সারিয়ান ও ইয়াজিদী নামে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল।

১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে ইরাকের স্বাধীনতা লাভের পর ফয়সল বিভিন্ন জাতীয় ও ধর্মীয় দলগুলিকে একটি জাতিতে পরিণত করিতে চান। তিনি দেশের সশস্ত্র বাহিনীকে শক্তিশালী, সুন্নী ও শীয়াদের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন, বিদ্যালয় স্থাপন, শিল্পকারখানায় উৎসাহ প্রদান, ভূমি সমস্যার সমাধান এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থায় সংস্কার সাধন করিতে মনস্থ করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি একটি কোয়ালিশন সরকার গঠন করিতে চেষ্টা করেন। তিনি নুরী আল-সাঈদকে প্রধান মন্ত্রীর পদে ইস্তাফা দিতে বলেন এবং পরে ন্যাশনাল ব্রাদারহুড পার্টির রশিদ আল-জিলানীকে তাহা প্রদান করেন। এই দল ১৯৩২ হইতে ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত পার্লামেন্টে আধিপত্য বজায় রাখে। বাঁচিয়া থাকিলে ফয়সল হয়ত সফলতা লাভ করিতেন, কিন্তু তিনি ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার ২১ বৎসর বয়স্ক পুত্র গাজীকে বাদশাহ্ বলিয়া ঘোষণা করা হয়, কিন্তু রশিদ আল-জিলানী ও ইয়াসীন আল-হাশিমির নেতৃত্বে ন্যাশনাল ব্রাদারহুড-এর এক নায়কত্বমূলক কার্যাবলীতে বাধা প্রদান করিবার মত কোন অভিজ্ঞতা বা সম্মান তাঁহার ছিল না।

১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে দুইটি সম্পুর্ণ বিপরীতমুখী দল একত্রে মিলিত হয় এবং এক সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা সরকারকে উচ্ছেদ করে। ফয়সলের মৃত্যুর পর ইরাকের ইতিহাসে অনেকগুলি সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যে ইহাই প্রথম। এই সকল দলের একটি হইল আহালী দল। যুবক বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা গঠিত এই দল এক ধরনের সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। আরেকটি দল সামরিক অফিসারদের লইয়া গঠিত যাহারা জাতীয়তাবাদ চায় আবার তাহাদের নিজস্ব এক নায়কত্ববাদও রাখিতে চায়। এই দুই দল আহালী

দলের হিকমত সোলায়মানের ও সেনাবাহিনীর জেনারেল বকর সিদকীর মাধ্যমে মিলিত হয় এবং ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে সরকারকে উৎখাত করে। অনভিজ্ঞ যুবক বুদ্ধিজীবীগণ সেনাবাহিনীর সহিত আঁটিয়া উঠিতে ব্যর্থ হয় এবং ফলে জেনারেল সিদকীর অধীনে সেনাবাহিনী ক্ষমতায় আসীন হয়। অতঃপর সেনাবাহিনীর নেতৃবৃন্দ একে অপরের বিরুদ্ধে লাগিয়া যায় এবং ফলে ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে জেনারেল সিদকী নিহত হন ও আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। এক বৎসর পর আরেকটি সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা জেনারেল নূরী আল-সাঈদ পুনরায় ক্ষমতাসীন হন। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ছিল ইরাকের সমস্যাসমূহের মধ্যে একটি। অন্যান্য সমস্যাও ছিল। একটি হইল তৈলসম্বন্ধ কুয়েত লইয়া গ্রেট ব্রটেনের সহিত মত বিরোধ। ঐ অঞ্চলের উপর ব্রটেন একটি হুকুমনামার অধিকারী, অথচ ইরাকও তাহার মালিকানা দাবী করে। প্যালেস্টাইনের ভাগ্য লইয়া ইহুদীবাদীদের সহিত যে সংঘর্ষ তাহাতেও ইরাক জড়িত। তাহা ছাড়া ছিল সংস্কারের সমস্যা এবং একদিকে ইরাকী জাতীয়তাবাদ অপরদিকে বৃহৎ আরব জাতীয়তাবাদ।

এই সকলের মধ্যে ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল যুবক বাদশাহ গাজী এক মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান। তিনি যেহেতু জনপ্রিয় এবং সমস্ত ব্যাপারে সংস্কারপন্থী জাতীয়তাবাদের সমর্থক, তাই অনেকেই তাঁহার মৃত্যুকে নিছক দুর্ঘটনা বলিয়া বিশ্বাস করিতে চান না। তাঁহার চারি বৎসর বয়স্ক পুত্র দ্বিতীয় ফয়সলকে বাদশাহ্ এবং মামা আবদুল ইলাহ্‌কে উপদেষ্টা হিসাবে ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার সময় বৃটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদীদিগকে দূরে সরাইয়া রাখিয়া নূরী আল-সাঈদ প্রধান মন্ত্রীর পদে বহাল থাকেন।

ট্রান্সজর্ডানের উপর হুকুমনামা

আবদুল্লাহ্‌কে যে ট্রান্সজর্ডানের আমীর হইতে বলা হয়, ২০ লক্ষ অধি-বাসী অধ্যুষিত সেই ভূখণ্ডের অধিকাংশই মরুভূমি এবং অধিবাসীগণ প্রায়ই বেদুঈন। সেই শূন্য দেশে আবদুল্লাহর শাসন সহজতর করিবার জন্য বৃটিশ তাঁহাকে মাসিক ৫,০০০ পাউণ্ড ভাতা প্রদানের বন্দোবস্ত করে। ১৯২১

খ্রীস্টাব্দ হইতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত অত্র অঞ্চলে গ্রেট বৃটেনের প্রভাব হুমকির সম্মুখীন হয় নাই। এই অঞ্চলে থাকিয়া বৃটিশ ইরাকের বিক্ষুব্ধ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এবং তাহা দমন করিবার আশা পোষণ করে, প্যালেস্টাইনে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব লক্ষ্য করে এবং পারস্য উপসাগরের পথ পরিষ্কার রাখে। বার্ষিক এক লক্ষ পাউণ্ড প্রদান করতঃ— যাহা ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে ২০ লক্ষে দাঁড়ায়, বৃটিশগণ এক সেনাবাহিনী প্রস্তুত করে, যাহা পরবর্তীকালে সমগ্র ফারটাইল ক্রিসেণ্টের সর্বশ্রেষ্ঠ বাহিনীতে পরিণত হয়। আরব লিজিয়ন (Arab Legion) নামে খ্যাত সেই বাহিনী ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন এফ. জি. পীক-এর পরিচালনাধীন থাকে এবং পরে উপাখ্যানের গ্লাব পাশার (স্যার জন গ্লাব) পরিচালনাধীন থাকে। ফারটাইল ক্রিসেণ্টের সর্বাঞ্চলের স্বেচ্ছাসেবকদিগকে লইয়া এই বাহিনী গঠন করা হয় এবং ইহার পুরোধা হইল বেদুঈন গোত্রসমূহের যুবকদল।

ট্রান্সজর্ডান সরকারের গঠন অতি সাধারণ। আইন প্রণয়ন ও প্রশাসনের সর্বময় ক্ষমতা আমীরের হাতে। তাঁহাকে সহায়তা করিবার জন্য একটি কার্যকরী সংসদ গঠন করা হয়। কার্যকরী সংসদের সদস্যপদ বেদুঈন ও অন্যান্য দলের মধ্যে সমান প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে বণ্টন করা হয়। আম্মানে (রোমান যুগের ফিলাডেলফিয়া) নিযুক্ত বৃটিশ অধিবাসীগণ প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করে এবং বাজেট, সেনাবাহিনী ও বৈদেশিক কার্যাবলী পরিচালনা করে। ইরাকের বাদশাহ ফয়সলের মৃত্যুর পর আবদুল্লাহ হাশেমী বংশের প্রধান হন এবং ইরাক ও ট্রান্সজর্ডান শাসন করেন। ক্রিসেণ্টের আরবদের ঐক্যের আকাঙ্খা লইয়া আবদুল্লাহ নিজের উচ্চাকাঙ্খাকে হাশেমীয় বংশের নামে তুলিয়া ধরেন এবং "বৃহৎ সিরিয়া আন্দোলনকে" (The Greater Syria Movement) সমর্থন করেন। ইহার ভাবধারা হইল হোসেন-ম্যাকমাহন পত্রালাপে উল্লেখিত বিষয়ের পুনরাবতরণ, যাহাতে হাশেমীয় বংশের অধীনে একটি সম্মিলিত ফারটাইল ক্রিসেণ্টের বিষয় উল্লেখ করা হয়। সৌদী আরব ও মিসর, এবং সিরিয়া ও ইরাকের কিছু সংখ্যক রাজনৈতিক দলের সহায়তায় লেবাননের খ্রীস্টানগণ ইহার বিরোধিতা করে।

সৌদী আরব

যুদ্ধের ডামাডোল, প্যারিস শান্তি সম্মেলনে বিভিন্ন দাবী ও প্রতিবাদ এবং হুকুমনামা সরকারের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিদ্রোহের মধ্যে পাঠক সম্ভবতঃ সমস্ত ঘটনার সূচনাকারী বাদশাহ হোসেনের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ বাকী সবাই সম্মানিত মক্কার শরীফকে ভুলিয়া গিয়াছেন ও ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে যিনি নিজেকে "আরব দেশসমূহের বাদশাহ" বলিয়া ঘোষণা করেন এবং এই ধরনের একটি উপাধির অন্যান্য প্রত্যাশীদের শত্রুতে পরিণত হন, তিনি শেষ পর্যন্ত একজন রাজ্যহীন রাজায় পরিণত হন। কিছুকাল তিনি ভান করিয়া কাটান এবং নিজের অবস্থা সুদৃঢ় করিবার জন্য কোন প্রচেষ্টাই চালান নাই। বিভিন্ন ঘটনাবলী ও পরিক্রমা তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া যায়, অথচ তিনি নিজেকে বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করিয়া যান। পরিবর্তিত অবস্থায় তিনি বৃটিশদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন নাই এবং ভার্সাই, স্যানরেমো, ল্যুজ্যানে ও জাতিপুঞ্জের ন্যায় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রতিও দৃকপাত করেন নাই। ইসলামের খলিফার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া তিনি ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষের মুসলমান শ্রেণীর বিরাগ ভাজন হন। রাগ, গর্ব ও নিরুৎসাহের বশবর্তী হইয়া ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের ৭ই মার্চ তিনি "সমগ্র ইসলামের খলিফা" উপাধি গ্রহণ করেন।

তাঁহার এই ঘোষণার দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বী নজদের বাদশাহ ইবনে সউদ স্বীয় বাসনা চরিতার্থ করিবার সুযোগ লাভ করেন। ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, ইবনে সউদ ভারত সরকারের বন্ধু এবং বৃটিশদের সহিত তাঁহার সন্ধিসূত্র বিদ্যমান। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে আগস্ট ইবনে সউদ তাঁহার ওয়াহাবী যোদ্ধাদল লইয়া নির্বান্ধব ও অর্থাভাবে সৈন্য সংগ্রহ করিতে অক্ষম হোসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। হোসেনের পুত্রদ্বয় ফয়সল ও আবদুল্লাহ তখন সম্ভবতঃ তাঁহাকে সাহায্য করিতে অসমর্থ। এবং বৃটিশদের নিকট তাঁহার প্রয়োজনও তখন শেষ। ওয়াহাবীগণ সম্মুখের সকল কিছু জয় করিয়া অগ্রসর হয়। ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী নাগাদ ইবনে সউদ পবিত্র নগরীদ্বয় এবং উপদ্বীপের প্রধান প্রধান অংশগুলির

আধিপত্য অর্জন করেন। হোসেন সাইপ্রাসে পলায়ন করেন এবং তথায় বৃটিশগণ তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানায় ও সেন্ট মাইকেল পদক দ্বারা ভূষিত করে।

সম্ভবতঃ নিঃসন্দেহে বলা যায় যে নবী হযরত মুহাম্মদের (সঃ) উত্থানের পর আরব উপদ্বীপে আব্দ আল-আজীজ ইবনে সউদের ন্যায় এইরূপ ক্ষমতাশালী ও সুনিপুণ নেতার উদয় হয় নাই। কিন্তু মক্কা ও মদীনার পবিত্র নগরীতে ওয়াহাবীদের আধিপত্যের ফলে ইসলামী বিশ্বে এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি হয়। ওয়াহাবীগণ গোঁড়া ধর্মানুসারী এবং অবশিষ্ট মুসলমানদের উদার ধর্মচর্চার তাহারা বিরোধী। এবং এই সকল মুসলমানদিগকে তাহারা "পৌত্তলিক" বলিয়া মনে করে। কিন্তু আরব সরকারের সর্বোচ্চ আয় হইল হজ্জযাত্রীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত রাজস্ব এবং এই আয় ত্যাগ করিবার কোন ইচ্ছা ইবনে সউদের নাই। তাই ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দের ৭ই জুন তিনি মক্কায় একটি ইসলামী সম্মেলন আহ্বান করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য হইল মুসলমানদের ভয় দূর করা এবং তাঁহার ওয়াহাবী উলামাদিগকে অন্যান্যদের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ প্রদান করা। মুসলিম প্রতিনিধিবৃন্দ এই সুদীর্ঘ অবয়বিশিষ্ট বাদশাহর ব্যক্তিত্ব ও জ্ঞানে মুগ্ধ হন। যুদ্ধের সময় কদাচ অনুষ্ঠিত হজ্জব্রত পুনরায় নিয়ম মাফিক আরম্ভ হয়।

অতঃপর ইবনে সউদ গ্রেট বৃটেনের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেন। উত্তরে প্যালেস্টাইন, ট্রান্সজর্ডান ও ইরাক ছাড়াও আরবের দক্ষিণ উপকূল এবং পূর্ব উপকূলের কিছু অংশে গ্রেট বৃটেনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ আধিপত্য বিদ্যমান। একটি মৌলিক সমস্যা ট্রান্সজর্ডানকে ব্যতিব্যস্ত করে, যাহার আংশিক কারণ এই যে আবদুল্লাহর পুনর্বাসনের জন্য গ্রেট বৃটেন তাড়াতাড়িতে এই রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। আবদুল্লাহ ফয়সলের হাশেমীয় বংশের সহিত ইবনে সউদের বহুদিনের পুরাতন কলহ বিদ্যমান। এইগুলি এবং অন্যান্য সমস্যাগুলি দুইটি চুক্তির দ্বারা সমাধান করা হয়, একটি হইল ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের ২রা নভেম্বর স্বাক্ষরিত হাদ্দা চুক্তি, যদ্বারা ট্রান্সজর্ডানের সহিত সীমান্ত নিষ্পত্তি করা হয়। অপরটি হইল ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের ২০শে মে স্বাক্ষরিত জেদ্দা চুক্তি, যদ্বারা গ্রেট বৃটেন সৌদী আরবের স্বাধীনতা

স্বীকার করে এবং ইবনে সউদ পারস্য উপসাগরের শেখ শাসিত রাজ্য-সমূহে গ্রেট বৃটেনের বিশেষ স্বার্থের কথা বিবেচনা করিতে স্বীকৃত হয়। বস্তুতঃ সৌদী আরবই প্রথম অপেক্ষাকৃত স্বাধীন আরব রাষ্ট্র, যাহা রাজনৈতিক সুবিধাদি বা সামরিক ঘাঁটির কোন বিশেষ শর্তে আবদ্ধ নহে। লোহিত সাগর ও পারস্য উপসাগরের উভয় তীরে বৃটিশ বাণিজ্য প্রবল ছিল এবং তাহা আরও কিছুকালের জন্য চলিতে থাকে।

রসুল হযরত মুহাম্মদের (সঃ) ন্যায় ইবনে সউদের প্রধান কাজ হইল গোত্র প্রথা এবং তাহাদের মধ্যে বিরাজমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যুদ্ধবিগ্রহ শেষ করা। ওয়াহাবীদিগকে তিনি ছোট ছোট ভ্রাতৃসংঘে বা ইখওয়ানে গঠন করেন এবং বিভিন্ন মরুস্থানে তাহাদিগকে বসতি প্রদান করেন। প্রত্যেক বসতিতে তিনি চাষাবাদের ব্যবস্থা করেন এবং মসজিদ ও বিদ্যালয় সমূহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সব বসতিসমূহ অনেকটা দ্বিতীয় খলিফা ওমরের সামরিক শহর সমূহের ন্যায়। এইগুলি সামাজিক অর্থনৈতিক সংগঠনের ন্যায় সামরিক সংগঠনও বটে, এবং সবগুলিই বাদশাহ্‌র প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে। কয়েক বৎসরের যুদ্ধবিগ্রহ, কঠোর প্রশাসন ও ন্যায় বিচারের দ্বারা তিনি এই কাজে সফলতা লাভ করেন।

আরবের ঐক্য স্থাপনের ব্যাপারে মুখ্য কারণ হইল তৈল আবিষ্কার। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে বাহরাইন দ্বীপে তৈল পাওয়া যায়। এক বৎসর পর, ২৯শে জুলাই বাদশাহ ইবনে সউদ কালিফোর্নিয়ার স্টাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীকে ৬০ বৎসর মেয়াদী একটি অনুমতিপত্র প্রদান করেন। চুক্তি অনুসারে কোম্পানী শীঘ্রই কাজ আরম্ভ করিবে এবং বাদশাহ্ সেলামী বাবত প্রতি টন অপরিশোধিত তৈলে চারিটি স্বর্ণ শিলিং পাইবেন। খনন কার্যের প্রথম পর্যায়ে ব্যবসায়িক ভিত্তির অনুকূলে তৈল পাওয়া না গেলেও কোম্পানী শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়া ইবনে সউদকে অতি প্রয়োজনীয় ৩০,০০০ পাউণ্ড প্রদান করে। বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দাভাবের ফলে হজযাত্রার আয় ব্যাহত হয় এবং ইবনে সউদ এই অর্থ দিয়া তাহা পূরণ করেন। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ পারস্য উপসাগরের দাহরানে প্রচুর তৈল পাওয়া যায়। টেক্সাস তৈল কোম্পানী স্টাণ্ডার্ড-এর সহিত যোগদান করিলে নতুনভাবে ইহার নামকরণ হয় আরাবিয়ান আমেরিকান তৈল কোম্পানী (আরামকো)।

সাজসরঞ্জাম ও বিদেশী লোকজন আমদানী এবং রাস্তাঘাট ও তৈল পরিশোধনাগার নির্মাণের ফলে বিভিন্ন গোত্রসমূহের যুবকদল শ্রম ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়। ইহার দ্বারা আরবের গোত্রসমূহের ইতস্ততঃ ঘোরাফেরা ও বাদবিসংবাদের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ত্রিংশ অধ্যায়

প্যালেস্টাইনের সংগ্রাম

বালফার ঘোষণা, পরবর্তীকালে জাতিপুঞ্জে ইহার অনুমোদন এবং মধ্যপ্রাচ্য সংক্রান্ত অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ আরব ও ইহুদীবাদী এই দুই জাতীয়তাবাদের মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী আর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রপাত করে। উভয়েই প্যালেস্টাইনের উপর আধিপত্য দাবী করে। ফেলিস্তিনী আরবগণ ইহা দাবী করে কারণ তাহারা ইহাতে বসবাস করে। ইহুদীবাদীগণ ইহা দাবী করে কারণ তাহাদের প্রভু, ইয়াওয়েহ (Yahweh) তাহাদিগকে এই ভূমির ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছেন, যে প্রতিশ্রুতি পরে বালফার কর্তৃক পাকাপাকি হয়, জাতিপুঞ্জ, যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস এবং শেষ পর্যন্ত জাতিসঙ্ঘ (United Nations) কর্তৃক অনুমোদনের মাধ্যমে ইহুদীবাদীগণের নিকট ইহা অতীন্দ্রিয় মহত্বে পরিপূর্ণ একটি "প্রত্যাবর্তন"। আরবদের নিকট ইহা আরেকটি বহিরাক্রমণ মাত্র। উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উভয় পক্ষই ক্ষমতা প্রয়োগে বিশ্বাসী। ইহুদীবাদীগণ পাশ্চাত্যের ধর্মীয়, নৈতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকে তাহাদের নিজস্ব যোগ্যতার সহিত সংমিশ্রণ করিয়া যুদ্ধের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতে সক্ষম হয়। অপরদিকে উন্নয়নের প্রাথমিক স্তরে অবস্থানরত আরবগণ ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হইতে অনেক দূরে এবং তাই যুদ্ধের আধুনিক মারণাস্ত্র সংগ্রহ করিতেও তাহারা অক্ষম এবং অনেকক্ষেত্রে এগুলির সহিত পরিচিতও নহে। যতদূর দেখা যায় তাহারা শুধু এইদিকে সেইদিকে দুই একটি বিদ্রোহ করা, জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেওয়া এবং দুর্বলতার দরুন "বিচারের" জন্য চিৎকার করা ছাড়া আর কিছুই করিতে সক্ষম নহে। ইহুদীদের পক্ষে, যাহাদের অধিকাংশ লোক প্যালেস্টাইনে বাস করে নাই, সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে যে যাহা দিয়াছে তাহাই গ্রহণ করা সহজতর হয়। তবে ফেলিস্তিনবাসীগণ, যাহারা

এই দেশ তাহাদের বলিয়া মনে করে, কখনও আপোষ করিতে রাজী নহে। তাহাদের মূলমন্ত্র হইল "সব কিছু অথবা কিছুই না" আর ইহুদীদের নীতি হইল "নগদ যাহা পাও হাত পাতিয়া লও, এবং আরও চাও।"

বালফার ঘোষণার পঞ্চাশতম বার্ষিকীতে ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ, ইহুদী-বাদীগণ সমগ্র প্যালেস্টাইন ও সিনাই উপদ্বীপ করায়ত্ত করে, কিন্তু সংগ্রামের পরিসমাপ্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। এই ৫০ বৎসরের ইতিহাস সাহসিকতা, ভীরুতা, সহানুভূতি, নিষ্ঠুরতা, ভয়, কুসংস্কার, কৃতিত্ব, হতাশা, সন্ত্রাসবাদ, যুদ্ধ, রাজনৈতিক তৎপরতা, প্রচারণা ও দারুণ মত বিরোধের কাহিনীতে পরিপূর্ণ। সংগ্রামের মতানৈক্যের বিষয়গুলির অধিকাংশই সমাধান করা হয় নাই এবং এই বিষয়ের উপর শত শত খণ্ড গ্রন্থ লিখিত হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত উপাদান ঐতিহাসিকদের নিকট এখনও আসে নাই। তাই একটি সম্পূর্ণ ও পক্ষপাতহীন বর্ণনা দান করা খুবই দুষ্কর। একজন সমসাময়িক ঐতিহাসিক প্রধান প্রধান কার্যাবলীর একটি রূপরেখা দিতে পারেন মাত্র, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি একপক্ষ বা অপর পক্ষ অথবা উভয় পক্ষের সমালোচনার সম্মুখীন হইবেন।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, ইহুদীবাদের নিকট বালফার ঘোষণার 'জাতীয় আবাসভূমি'র অর্থ জাতীয় রাষ্ট্র। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে এবং ইহার পর পুনঃপুনঃ ইহুদীবাদী সংগঠনের প্রধান ডাঃ চেইম ওয়াইজম্যান ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ বলেন, প্যালেস্টাইন হইবে—"ইংল্যাণ্ড বলিতে যেরূপ ইংরেজগণ বুঝায়, অনুরূপ একটি ইহুদী রাষ্ট্র।" এইরূপ একটি লক্ষ্যবস্তু অর্জনের জন্য দুইটি জিনিসের প্রয়োজন। একটি হইল ইউরোপ ও অন্যান্য দেশ হইতে ইহুদীদিগকে প্যালেস্টাইনে স্থানান্তর করা এবং অপরটি হইল এইসব বাস্তুত্যাগীদের পুনর্বাসনের জন্য স্থান জোগাড় করা। বালফার ঘোষণার পূর্বেও ইহুদীবাদীগণ গ্রামাঞ্চলে ইহুদীদের পুনর্বাসনে উৎসাহ প্রদান করে এবং যতদূর সম্ভব জনবহুল নগরীসমূহে পুনর্বাসন করিতে ইতস্ততঃ করে। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী বৎসরগুলিতে ইহুদীবাদীগণ এই দুইটি লক্ষ্য অর্জনের প্রচেষ্টা চালায়। উভয় কর্মসূচীতে তাহাদের সাফল্য লক্ষ্য করিয়া ফেলিস্তিনী আরবগণ শঙ্কিত হয়।

কিং-ক্রেন কমিশন এই দুই কার্যসূচীর গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং

"প্যালেস্টাইনকে শেষ পর্যন্ত একটি পুরাদস্তুর ইহুদী রাষ্ট্রে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে অসংখ্য ইহুদীদের বাস্তুত্যাগের ব্যাপারে গোঁড়া ইহুদীবাদীদের প্যালেস্টাইনী কর্মসূচীতে আমূল পরিবর্তন সাধনের" সুপারিশ করে। পরিবর্তনের কারণ হিসাবে বলা হয় যে, "প্যালেস্টাইন ও সিরিয়ায় ইহুদীবাদ-বিরোধী মনোভাব অতি প্রবল এবং অতি সহজে ইহাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না।" কিন্তু ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি শান্তি প্রতিষ্ঠাকারীগণ কমিশনের রিপোর্টের উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে এপ্রিলে অনুষ্ঠিত স্যানরেমো সম্মেলন গ্রেট ব্রটেনকে প্যালেস্টাইনের উপর হুকুমনামা প্রদান করে এবং দুই বৎসর পর জাতিপুঞ্জের পরিষদ ইহা অনুমোদন করে। হুকুমনামার মূলবচনে শুধু বালফার ঘোষণাই অন্তর্ভুক্ত হয় নাই বরং শান্তি সম্মেলনে ইহুদীবাদী প্রতিনিধি দল প্রদত্ত সমস্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত হয়। ইহা ইহুদী প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করে, যাহারা "ইহুদী জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ক্ষতিকারক" সমস্ত কিছু দেখাশুনা করিবার জন্য প্রশাসনের সহিত কাজ করিবে। "এইরূপ প্রতিনিধি হিসাবে" ইহা ইহুদীবাদী সংগঠনকে স্বীকার করে। অধিকন্তু ইহুদী বাস্তুত্যাগে সহায়তা করিবার জন্য এবং সে দেশে এমনকি "রাষ্ট্রীয় জায়গা এবং জনসাধারণের জন্য অপ্রয়োজনীয় পতিত জমিতে" পুনর্বাসনের কাজে সহায়তা করিবার জন্য প্যালেস্টাইনের প্রশাসনকে আদেশ প্রদান করা হয়। ইহুদী প্রতিনিধি বা এজেন্সী হইল হুকুমনামার প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত বিস্তৃত দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী একটি সরকারের ন্যায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অনুরূপ কোন নিয়ম ফেলিস্তিনী আরবদের জন্য করা হয় নাই। বস্তুতঃ, হুকুমনামার ধারাগুলির মধ্যে আরবদের বিষয়ে কোন উল্লেখও নাই। শুধুমাত্র পরোক্ষভাবে তাহাদিগকে "অ-ইহুদী বা জনসাধারণের অন্যান্য শ্রেণী" হিসাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

স্যানরেমো সম্মেলনের অনতিকাল পরেই গ্রেট ব্রটেন স্যার হার্বার্ট স্যামুয়েল নামক একজন প্রসিদ্ধ ইহুদীকে হাই কমিশনার নিযুক্ত করে। ২০০০ বৎসরেরও অধিককালের মধ্যে তিনিই প্যালেস্টাইনের প্রথম ইহুদী শাসক। ইহার দ্বারা ব্রটিশ কর্মকর্তাগণ আরবদিগকে প্রভাবিত করিতে চাহিয়াছিল কিনা জানা যায় নাই। তবে প্রকৃতপক্ষে স্যার হার্বার্ট, সম্ভবতঃ

ইহুদী হইবার দরুন, উল্টাভাবে আরব জনগণের প্রতি ন্যায় বিচার প্রদর্শন করেন। ইতিহাসের নির্মম অংশ হিসাবে স্যার হার্বার্ট হজ আমীন আল-হোসাইনীকে জেরুজালেমের মুফতী নিযুক্ত করেন। ইনি রসুলুল্লাহ্-র বংশধর বলিয়া দাবী করেন, আজহারে লেখাপড়া করেন এবং যুদ্ধের সময় তুরস্কের পক্ষে যুদ্ধ করেন। মুফতী হিসাবে তিনি ধর্মীয় সম্পত্তি বা ওয়াকফ্-র কর্মকর্তা হন, যাহার আয় ছিল বার্ষিক ৩০০,০০০ ডলার। তিনি সুপ্রীম কাউন্সিলের অধ্যক্ষ হন এবং পরে চরম বৃটিশ বিরোধী, ইহুদীবাদ বিরোধী প্যালেস্টাইন উচ্চ কমিটির সভাপতি হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ তাঁহার হত্যার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে। তিনি তখন বার্লিন হইতে বেতারে মিত্রশক্তি বিরোধী ও ইহুদী বিরোধী বক্তৃতা প্রদানে লিপ্ত।

প্রথম ইহুদীবাদীবিরোধী বিদ্রোহ সংঘটিত হয় জেরুজালেমে ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে। প্যালেস্টাইনের প্রধান বিচারপতি স্যার থমাস হেক্রাফ্ট্-এর সভাপতিত্বে একটি স্থানীয় কমিশন এই মর্মে রিপোর্ট প্রদান করে যে ইহুদীবাদী কর্মসূচীতে ভীত হইয়া আরবগণ দাঙ্গাহাঙ্গামায় উৎসাহ প্রদান করে। তবে ঔপনিবেশিক দপ্তরের প্রধান হিসাবে উইনস্টন চার্চিল একটি দীর্ঘ বিবৃতি প্রদান করেন, যাহাতে উভয়পক্ষ সন্তুষ্ট হয়। তিনি জোর দিয়া বলেন, 'গ্রেট বৃটেনের ইচ্ছা নয় যে, "প্যালেস্টাইন ইংরেজদের ইংল্যাণ্ডের ন্যায় ইহুদী রাষ্ট্র হউক।" তিনি ইহাও ব্যক্ত করেন যে, "ইহুদী জনগণ তাহাদের অধিকার লইয়া প্যালেস্টাইনে বাস করিবে, যন্ত্রণা ভোগ করিয়া নহে।" হুকুমনামার ৩০ বৎসরের মধ্যে গ্রেট বৃটেন বালফার ঘোষণার দুইটি চরম বিপরীতমুখী উদ্দেশ্য কার্যকরী করিতে চেষ্টা করে। তাহার একটি হইল ইহুদীদের জন্য একটি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করা এবং অপরটি হইল আরবদের বেসামরিক ও ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করা। উভয়টি যেহেতু একসঙ্গে সমাধা করা সম্ভব হয় নাই, তাই প্রথমে তাহারা প্রথমটি সমাধা করে এবং অবস্থাভেদে অপরটিও সমাধা করিতে চেষ্টা করে। ইহুদীবাদীগণ অবশ্য জোর দিয়া বলে যে, "সমান গুরুত্বের" কোন বিপরীত দায়িত্ব গ্রেট বৃটেনের নাই। তাহারা দাবী করে যে অ-ইহুদী জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করাটা একটা "গৌণ ও অপ্রধান ধারা", এবং তাই এই

দলিলের প্রধান উদ্দেশ্যের উপর সমান গুরুত্ব দেওয়া উচিত নহে। সেই প্রধান উদ্দেশ্য একটি জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করা।

১৯২১ খ্রীস্টাব্দে প্রাথমিক দাঙ্গার পর প্রায় আট বৎসর শান্তভাবে কাটিয়া যায়। হুকুমনামার সরকার ফেলিস্তীন আরব কার্যকরী কমিটি গঠন করিবার অনুমতি দান করে, যাহা আরবদের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করে। ইহুদী এজেন্সীর ন্যায় অনুরূপ সরকারী কোন মঞ্জুরী এই কমিটির নাই। ইহুদী বাস্তত্যাগী আনয়ন ও জমি দখলে সক্রিয়ভাবে কাজ করিয়া যায়। ইহুদী এজেন্সী প্যালেস্টাইনে নতুন নতুন কলকারখানাও স্থাপন করে, এবং ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ ইহুদীগণ প্রায় ৯০ শতাংশ কারখানার মালিক হয়। কিন্তু কারখানা স্থাপন বাস্তত্যাগী ও জমি দখলের ন্যায় এইরূপ সমস্যা সৃষ্টি করে নাই।

ফেলিস্তিনী আরবগণ আশঙ্কা করে যে দ্রুত ইহুদী বাস্তত্যাগী পুনর্বাসনের ফলে তাহারা তাহাদের নিজস্ব দেশে হয়ত সংখ্যালঘুতে পরিণত হইবে। অবশ্য ইহাই ছিল ইহুদীদের সত্যিকারের উদ্দেশ্য। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ যে বৎসর প্রথম লোকগণনা হয়, তাহাতে প্যালেস্টাইনের অধিবাসীদের সংখ্যা অনুমান করা হয় ৭৪৪০০০ তন্মধ্যে ৮৩০০০ ইহুদী। ১৯২২ ও ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে আরবদের লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায় প্রায় ২৩ শতাংশ, অথচ ইহুদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় প্রায় ১০০ শতাংশ। ১৯৩১ হইতে ১৯৪০-এর লোক সংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও আশঙ্কাজনক। আরব জনগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় প্রায় ৩০ শতাংশ, অথচ ইহুদীদের লোকসংখ্যা প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি পায়। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে ইহুদীদের জনসংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯ শতাংশ, অথচ ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে ইহা ৩০ শতাংশে বৃদ্ধি লাভ করে।

উপরোল্লিখিত সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান ও অন্যান্য সূত্র হইতে আমরা সহজেই কয়েকটি বিষয় অনুমান করিতে পারি। প্রথমতঃ হুকুমনামার তারিখ হইতে ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইহুদী বাস্তত্যাগীদের সংখ্যা তেমন বৃহৎ নহে। দ্বিতীয়তঃ অধিক সংখ্যক বাস্তত্যাগী আসে পোল্যাণ্ড ও রাশিয়া হইতে। তৃতীয়তঃ ইহুদীবাদীদের শত প্রলোভন সত্ত্বেও এই বাস্তত্যাগীদের অধিকাংশ প্যালেস্টাইনের পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে যাইতে চায়। চতুর্থতঃ সাধারণতঃ অত্যাচার ও অন্যান্য অসুবিধার

মধ্যেই শুধু ইহুদীগণ প্যালেস্টাইনে যাইবার বিষয় চিন্তা করে। উদাহরণ স্বরূপ ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর বাস্তত্যাগী আইনের ফলে সে দেশে ইহুদী বাস্তত্যাগীদের সংখ্যা যেখানে ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে ৫০,০০০ ছিল সেখানে ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দে মাত্র ১০,০০০-এ আসিয়া দাঁড়ায়, ফলে দেখা যায় সেই বৎসর প্যালেস্টাইনে বাস্তত্যাগীদের সংখ্যা ভীষণভাবে বৃদ্ধি পায়। উপসংহারে বলা যায় যে হিটলারের ক্ষমতায় আরোহণ এবং ইউরোপে তাঁহার নৃশংস ও ধারাবাহিকভাবে ইহুদী নিধন না হইলে প্যালেস্টাইন ইহুদীদের একটি দুর্যোগ সৃষ্টিকারী জাতীয় রাষ্ট্র না হইয়া বরং একটি শান্তিপূর্ণ জাতীয় আবাস ভূমিই হইত।

প্যালেস্টাইনে অতি দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে স্বভাবতঃই ইহুদী ও আরব উভয়ের মধ্যে অর্থনৈতিক অভাব ও ব্যাপক বেকারত্বের সৃষ্টি হয়। অবশ্য স্বীয় সদস্যদের দেখাশুনা করবার জন্য ইহুদীবাদীদের দেশের বাহিরে বেশ মোটা তহবিল এবং প্যালেস্টাইনে সুসংগঠিত দল বিদ্যমান। ইহুদী-বাদীদের সংগঠিত অতি গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন হইল ইহুদী শ্রমিক ফেডারেশন, হিস্‌তাদ্রাত (Jewish Federation of Labour, Histadrut)। ইহা শুধু একটি ট্রেড ইউনিয়ন নহে বরং ইহা উৎপাদন ও বাজারজাত, হাসপাতাল, বিদ্যালয়, ব্যাঙ্ক ও বীমাসমূহও নিয়ন্ত্রণ করে। আরবদের এইরূপ কোন সংগঠন ছিল না এবং ফলে তাহারা অর্থনৈতিক সংকট আরও প্রবলভাবে অনুভব করে। নিঃসন্দেহে শ্রমিকদের পক্ষে হিস্‌তাদ্রাতের কার্যকলাপ আরব শ্রমিকদিগকেও উপকৃত করে। বিশেষতঃ রেলপথ বিভাগে এবং প্যালেস্টাইনের বন্দরসমূহে, কিন্তু ইহার দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে ৯০ শতাংশ ইহুদী মালিকানার কলকারখানায় আরব শ্রমিকগণকে সাদরে গ্রহণ করা হয়।

ইহুদী এজেন্সীর ভূমিনীতি যেরূপ গ্রামীণ আরবদের ঘৃণা উদ্রেক করে বাস্তত্যাগে অনুরূপ করে নাই। "ভূমি হস্তান্তরের" প্রশ্নটি দুই দলের মধ্যে কাঁটার রূপ ধারণ করে। ইহুদীবাদীগণ সঠিকভাবেই অনুধাবন করে যে ইহুদী গ্রামীণ ও কৃষিপত্তনি ছাড়া একটি আদর্শ ইহুদী রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব নহে। হুকুমনামার সরকার রাষ্ট্রীয় জমি তাহাদিগকে হস্তান্তর না করিলেও ইহুদীবাদীগণ আরবদের নিকট হইতে অতি উচ্চমূল্যে জমি ক্রয়

করে। প্যালেস্টাইনের ন্যায় শুষ্ক জমিতে কৃষকগণ প্রয়োজনের খাতিরে গ্রামের ছোট ছোট নদীর ধারে একত্রে বাস করে। গ্রামের চতুর্দিকে অবস্থিত জমির মালিক প্রায়শঃ একজন অনুপস্থিত আরব জমিদার, যিনি জেরুজালেম, বৈরুত বা দামেস্কে বাস করেন। জমিদার গোচারণ ভূমি ও পানির মালিক হইলেও সমস্ত গ্রামের লোক এইগুলি ব্যবহার করে। গ্রাম একটি সামাজিক ও কৃষি সংস্থা। বিক্রেতা আরব জমিদার হয়ত বেশ মুনাফা লাভ করিল কিন্তু এই হস্তান্তরের সমস্ত বোঝা গিয়া পড়িল আরব চাষীর ঘাড়ে।

ইহুদীবাদীদের পরিকল্পনা হইল কৃষিভূমি ক্রয় করা এবং ঐগুলির উপর ইহুদী বাস্তুত্যাগীদিগকে বসতিস্থাপনে উৎসাহ দান করা ও কৃষক হিসাবে গড়ে তোলা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায়, ইহুদীদের ভূমি ক্রয়ের ফলে আরব চাষীদিগকে উঠিয়া যাইতে হয়। ইহুদী এজেন্সীর শাখা ইহুদী জাতীয় তহবিল (Jewish National Fund) কর্তৃক ক্রীত জমিকে "জাতীয় জমি" বলিয়া ঘোষণা করা হয় এবং এইগুলিকে অ-ইহুদীদের নিকট হস্তান্তর যোগ্য নহে বলিয়া আইন পাশ করা হয়। অধিকন্তু, ইহুদী সমবায়-সমূহ বা যে-ই চাষের জন্য জমি লাভ করে তাহার জন্য আরব শ্রমিক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়। আবাসচ্যুত আরব কৃষক কাজের সন্ধানে শহরে যাইয়াও অসুবিধার সম্মুখীন হয়; কারণ ইহুদী কারখানাগুলি তাহাকে কাজ দিতে অসম্মত হয় অথবা কাজ দিলেও পারিশ্রমিক দেয় স্বল্প। অবশ্য এইখানে উল্লেখ করিতে হইবে যে অধিকাংশ আরব শ্রমিক অশিক্ষিত এবং আধুনিক কারখানাসমূহের সহিত তাল রাখিয়া কাজ করিতে অক্ষম। যে সমস্ত কৃষক গ্রামে থাকিয়া যায়, তাহারা শীঘ্রই তাহাদের গ্রামের নিকট আধুনিক আবাসস্থল অবলোকন করে, সেগুলির সহিত তাহারা আঁটিয়া উঠিতে ব্যর্থ হয়। এই নতুন আবাসগুলির লোকজন শুধু পৃথক ভাষা ও ধর্মই অনুসরণ করে না বরং চাষাবাদের পৃথক পন্থা ও আলাদা সামাজিক রীতিনীতিও অবলম্বন করে। অতএব আরবগণ এইসব নবাগত-দিগকে তাড়াইতে চেষ্টা করিবে তাহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই।

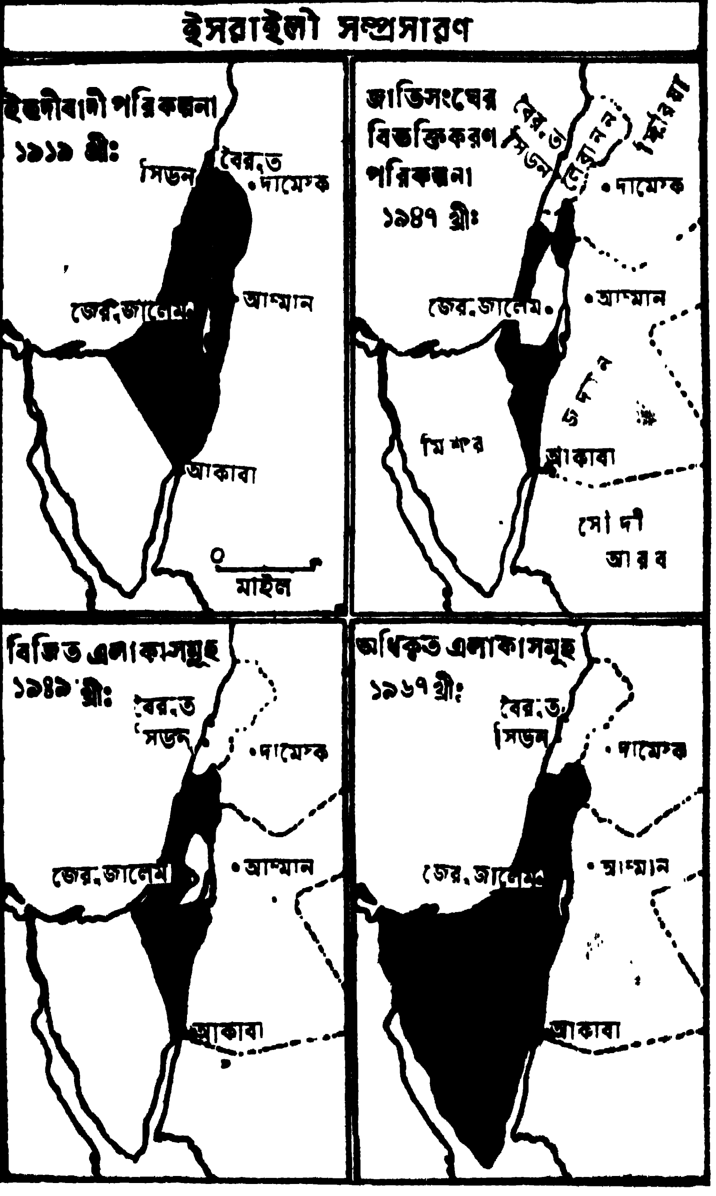
প্যালেস্টাইনে ইহুদী পুনর্বাসনের অদ্ভুত-প্রকৃতির একটি হইল, ইহুদী তহবিলের অর্থ আসিয়াছে প্রধানতঃ পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদী

পুঁজিপতিদের নিকট হইতে, যাহারা স্বাধীন ব্যবসায়ের খাঁটি বিশ্বাসী, আর এইসব অর্থ গ্রহণ করিয়াছে পোল্যাণ্ড ও রাশিয়া হইতে আগত সমাজবাদী বা মার্ক্সপন্থী ইহুদীগণ যাহারা সাম্যবাদে বিশ্বাসী। সাম্যবাদী পুনর্বাসনগুলির মধ্যে প্রধান হইল কিব্‌বুজ (Kibbutz) এবং মোসহাব (Moshav)। কিব্‌বুজ-এর ইহুদীগণ যৌথ চাষাবাদ ও যৌথ বসবাসের সহিত সাধারণ ভোজনালয় ও সাধারণ নার্সারী স্থাপন করে। সমস্ত মুনাফা জমা হয় যৌথ কোষাগারে, এবং ব্যক্তি বিশেষ কোষাগার হইতে সাপ্তাহিক খরচপত্রের জন্য অর্থ লাভ করে মাত্র। অপরদিকে মোস্‌হাব একটি রীতিমত সমবায়, যেখানে প্রত্যেক পরিবারের স্ব স্ব বাসগৃহ রহিয়াছে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক হইতে যথেষ্ট স্বাধীনতা তাহারা লাভ করে।

ভূমিতে প্রত্যাবর্তনের জন্য ইহুদীবাদী প্রতিষ্ঠানের এতসব উৎসাহ প্রদান সত্ত্বেও ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ মাত্র ১৩.২ শতাংশ ইহুদী কৃষি কাজে যোগ দান করে। তাহাদের প্রচেষ্টা সমধিক লক্ষ্য করা যায় শিল্পকারখানার ক্ষেত্রে। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ ইহুদীগণ ২০০০-এরও অধিক কারখানার মালিক হয় এবং প্রায় ৪৫০০০ শ্রমিক নিয়োগ করে। ইহাদের মধ্যে প্রধান হইল প্যালেস্টাইন ইলেক্ট্রো কর্পোরেশন—জর্ডন ও ইয়ারমুক নদী নিয়ন্ত্রণের জন্য, এবং ডেড্‌ সাগরের (Dead sea) উপর প্যালেস্টাইন পটাশ কোম্পানী।

ইহুদীবাদীগণ একটি সম্পূর্ণ হিব্রু শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে। যাহাতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ব্যবসা, চিত্রকলা ও সঙ্গীত বিদ্যালয় এবং কারিগরি কলেজ ও হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্ভুক্ত। প্যালেস্টাইনে ইহুদীবাদীদের চমৎকার কৃতিত্বগুলির মধ্যে একটি হইল হিব্রু ওল্ড টেষ্টামেণ্টের পুনরূপায়ন এবং আধুনিক শিল্পকারখানা ও কারিগরি সমাজে ইহার ব্যবহার।

প্যালেস্টাইনের ইহুদীদের নিজস্ব সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, যেগুলি নির্বাচিত পরিষদ দ্বারা গঠিত এবং যেগুলি কিছুটা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ভোগ করে। প্যালেস্টাইনের ইহুদী বসতিস্থাপনকারীদের প্রতিনিধিত্বমূলক অনেকগুলি রাজনৈতিক দল রহিয়াছে এবং ইহাদের মধ্যে সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদ এবং ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ সমস্ত দলই বিদ্যমান। আবার এক দলের মধ্যে অনেকগুলি দলের অস্তিত্ব রহিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ একজন ধর্মীয় সমাজবাদী ও একজন ধর্মনিরপেক্ষ সমাজবাদী অর্থনৈতিক ব্যাপারে


ইসরাইলী সম্প্রসারণ
ইহুদীবাদী পরিকল্পনা
১৯১৯ খ্রীঃ
বৈরূত
সিডন
দামেস্ক
জেরুজালেম
আম্মান
আকাবা
০
মাইল
জাতিসংঘের
বিভক্তিকরণ
পরিকল্পনা
১৯৪৭ খ্রীঃ
বৈরূত
সিডন
লেবানন
সিরিয়া
দামেস্ক
জেরুজালেম
আম্মান
জর্দান
মিশর
আকাবা
সৌদী
আরব
বিজিত এলাকাসমূহ
১৯৪৯ খ্রীঃ
বৈরূত
সিডন
দামেস্ক
জেরুজালেম
আম্মান
আকাবা
অধিকৃত এলাকাসমূহ
১৯৬৭ খ্রীঃ
বৈরূত
সিডন
দামেস্ক
জেরুজালেম
আম্মান
আকাবা

একমতের অধিকারী হইলেও তাহারা দুই দলের অন্তর্ভুক্ত।

প্যালেস্টাইনের ভবিষ্যৎ লইয়া ইহুদীদের মধ্যে যে মতের গরমিল তাহা আরও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। ইহুদীবাদীগণ Zionists) হুকুমনামার প্রশাসনের সহযোগিতা লইয়া একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতি। ইহুদীবাদীগণ তাহাদের পরিকল্পনায় আরবদিগকে বাদ দেয়। আধুনিক ইহুদীবাদীর প্রতিষ্ঠাতা হের্জেল তাঁহার "ইহুদী রাষ্ট্র" নামক গ্রন্থে আরবদের কথা মোটেই উল্লেখ করেন নাই। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে ইঙ্গ-মার্কিন কমিশনের (Anglo-American Comission of 1946) নিকট ইহুদী এজেন্সী এই কথা ব্যক্ত করে যে, একটি ইহুদী জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে "যতটুকু সুসঙ্গত" ঠিক ততটুকু পরিমাণ প্যালেস্টাইনের অ-ইহুদী জনগণের অধিকার রক্ষা করা হইবে। ইসরাইলের প্রথম প্রধান মন্ত্রী ড্যাভিড্ বেনগুরিয়ান তাঁহার "ইসরাইলের পুনর্জন্ম ও ভবিষ্যৎ" নামক গ্রন্থে বলেন, "ইসরাইল রাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের অংশ বিশেষ শুধু ভৌগোলিক দিক হইতে…।" ইহুদীবাদীদের দুর্ভাগ্যজনক (কারণ ইহা সত্য নহে) কিন্তু শক্তিশালী নীতি হইল ইসরাইল জঙ্গীদের প্রবাদ বাক্য "দেশহীন একটি জাতির জন্য জনগণহীন একটি দেশ।"

ইহুদীবাদীদের প্রধান দল কর্তৃক অনুসৃত কাট-ছাটের নীতি রিভিশনালিষ্ট (Revisionalist) নামে অভিহিত ইহুদীবাদীদের একটি দল কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। তাহারা বৃটিশ হুকুমনামার বিরোধিতা করে এবং ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত প্যারিস শান্তি আলোচনায় ইহুদীবাদীগণ কর্তৃক উত্থাপিত মূল দাবী অনুযায়ী সমগ্র এলাকায় একটি ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী। সে সময় তাহাদের পেশকৃত মানচিত্রে অধিকাংশ ট্রান্স জর্ডান এবং সিরিয়া ও লেবাননের প্রধান এলাকা অন্তর্ভুক্ত। ইহুদীবাদীদের আরেক দল আবার ইহুদ (ঐক্য) দল গঠন করে। ইহার উদ্দেশ্য হইল আরবদের সহিত ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। এই কর্মসূচীর প্রবক্তা হইলেন হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট জুদাস্ ম্যাগনাস (Judas Magnas), দার্শনিক মার্টিন ব্যুবার (Martin Buber) এবং অন্যান্য বুদ্ধিজীবীগণ, যাহারা প্যালেস্টাইনে একটি দ্বিজাতিভিত্তিমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী।

বিশাল কৃষি, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রকল্পের সংগঠন কারী ইহুদী এজেন্সী আবার নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনীও পরিচালনা

করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্যালেস্টাইনের ইহুদী বসতিগুলি এবং আরব গ্রামগুলিও সম্পূর্ণ নিরাপত্তাহীন ছিল। প্রত্যেক ইহুদী বসতির নিজস্ব রক্ষী বাহিনী ছিল। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে এইসব প্রহরীদল হ্যাশোমার (Hashomer) নামক একটি সংস্থা গঠন করে এবং হুকুমনামার যুগেও সম্ভ্রান্ত প্রহরী দল হিসাবে কাজে নিযুক্ত থাকে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় প্যালেস্টাইনে প্রত্যাগত বৃটিশ সেনাবাহিনীর ইহুদী সুদক্ষ সৈন্যগণ বিভিন্ন গোলযোগের সময় ইহুদী বসতিগুলি রক্ষা করিবার জন্য হাগানাহ্ (Haganah) নামে একটি প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করে। তাহারা যন্ত্রতন্ত্র প্রশিক্ষণ দান করে। এবং বেআইনীভাবে অস্ত্রবহন করে। হিস্তাদ্রাত ও ইহুদী এজেন্সী তাহাদের অর্থ জোগায়। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ হাগানাহ্ পরোক্ষভাবে বৃটিশ স্বীকৃতি লাভ করে এবং তাহাদের কোন কোন সদস্য পুলিশ বাহিনীতে স্থান লাভ করে। আরেকটি আধা-সামরিক প্রতিষ্ঠান হইল ইরগুন (Irgun)। ইহা রিভিশনালিষ্ট দলের যোদ্ধৃদল, যাহারা বৃটিশ ও আরব উভয়ের সহিত যুদ্ধ করে। ইরগুনের চাইতেও অধিক জাতীয়তাবাদী দল হইল স্টার্ণ-গ্রুপ বা "ইসরাইলের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধকারী"। তাহারা অধিকাংশই সন্ত্রাসবাদী কাজে লিপ্ত থাকে। ইহুদী এজেন্সী ইরগুন ওস্টার্ণ উভয় দলের সমালোচনা করে এবং তাহাদের সহিত কোন সম্পর্ক স্বীকার করে না। এইভাবে ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে সংগঠিত আরব রাষ্ট্রবর্গের সহিত যুদ্ধ পর্যন্ত চলিতে থাকে এবং তখন সমস্ত যোদ্ধৃদলকে একই পরিচালনাধীন আনা হয়।

স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সুদক্ষ ইহুদী সংগঠনের তুলনায় আরব জাতির সুসংহত কার্যাবলী বৈশিষ্ট্যহীন। প্রকৃতপক্ষে কোন ক্ষেত্রে তুলনামূলক কোন আরব দলই ছিল না। সুপ্রীম মুসলিম কাউন্সিল নামে একটি সংস্থা বিদ্যমান ছিল, যাহার দায়িত্ব হইল মুসলমানদের ধর্মীয় বিচার-সালিশ ও ধর্মীয় দানসত্রগুলির তত্ত্বাবধান করা, কিন্তু রাজনৈতিক বা সামাজিক প্রশ্নে ইহার কোন ভূমিকা ছিল না। আরবদের রাজনৈতিক কার্যাবলী আরব উচ্চ কমিটি (Arab Higher Committee) নামক বিভিন্ন দলের একটি ঐক্য সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়, কিন্তু এই সকল কার্যাবলী ছিল অবিন্যস্ত ও অকেজো। মুসলিম কাউন্সিল ও উচ্চ কমিটি এই উভয় সংগঠনের প্রধান ছিলেন গোঁড়া বৃটিশ-বিরোধী ও ইহুদী-বিরোধী মুফ্তী হজ আমিন আল-হোসাইনী।

আরবগণ হুকুমনামার সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত বিদ্যালয়ের উপর নির্ভর করিত, ইহার বাহিরে তাহারা কোন সাহায্য লাভ করিত না এবং ইহুদীদের দ্বারা প্রাপ্ত সমস্ত কিছুর জন্য গর্ব করিতে পারিত না। ক্রমবর্ধমান ইহুদী ক্ষমতার মুখে তাহাদের হতাশার মধ্যে তাহারা প্রতিবাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা ছাড়া আর কিছুই করিতে পারিত না।

ইহুদীদের বিরুদ্ধে আরবদের প্রথম ও প্রধান প্রতিরোধের সূচনা হয় ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে। জেরুজালেম, হেবরন ও অন্যান্য কেন্দ্রগুলিতে সংগঠিত এই সংঘর্ষে উভয় পক্ষে হতাহত হয়। স্যার ওয়াল্টার শ' একটি তদন্ত কমিটির প্রধান হন এবং তাঁহার রিপোর্ট, পরবর্তী বৎসরগুলিতে এই ধরনের অনেক রিপোর্টসমূহের মধ্যে প্রথম রিপোর্ট। ইহা প্রকাশিত হয় ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে। ইহা আরবদের নিন্দা করে কিন্তু ব্যাখ্যায় বলে যে হতাশার মধ্য হইতে তাহাদের আক্রোশ জন্ম লাভ করিয়াছে। ইহা সুপারিশ করে যে সরকারের উচিত, "আরবদের ভীতি দূর করিবার জন্য বাস্তু ত্যাগ, ভূমি বিক্রয় এবং ভূমি হস্তান্তরের ব্যাপারে একটি পরিষ্কার নীতি ঘোষণা করা।" ইহুদীগণ শ' রিপোর্টের মর্মার্থের প্রতিবাদ করে, ফলে ভূমি সমস্যা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য গ্রেট বৃটেন স্যার জন হোপ সিম্পসনের নেতৃত্বে আরেকটি মিশন প্রেরণ করে। বৃটিশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত প্যাসফিল্ড শ্বেতপত্রের (Passfield white Paper) মূল ভিত্তি এই রিপোর্ট ইহুদীদের ভূমি ক্রয়কে বিধিসম্মত বলিয়া স্বীকার করে। তবে যে ধারায় ক্রয় করা জমিতে অ-ইহুদী শ্রমিকদিগকে কাজে বাধা দান করে এবং অ-ইহুদীদের নিকট উহার পুনরায় বিক্রয় নিষিদ্ধ করে তাহার সমালোচনা করে। অপরদিকে প্যাসফিল্ড শ্বেতপত্র চরমপন্থী ইহুদী ও আরব উভয়ের মতামত প্রত্যাখ্যান করে এবং সবাইকে সহযোগিতা করিতে পরামর্শ প্রদান করে।

শ্বেতপত্র ইহুদীবাদীদের মধ্যে এইরূপ ক্ষোভের সৃষ্টি করে যে, ওয়াইজম্যান ইহুদীবাদী সংগঠন ও ইহুদী এজেন্সী উভয় সংস্থার সভাপতির পদে ইস্তেফা দান করেন। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদীবাদীদের প্রতিবাদ কণ্ঠ এইরূপ জোরালো হয় যে, গ্রেট বৃটেনের প্রধান মন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড বাস্তুত্যাগ ও ভূমি ক্রয়ের ব্যাপারে ওয়াইজম্যানের ভীতি দূর করিবার জন্য তাঁহার নিকট একখানি পত্র লিখিতে বাধ্য হন। অতঃপর আসে আরবদের প্রতি-

বাদের পালা। তাহারা প্রধান মন্ত্রীর "কৃষ্ণপত্রের" (Black letter) প্রতিবাদ করে এবং পুনরায় বালফার ঘোষণার সমালোচনা করে।

১৯৩৩ হইতে ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অসংখ্য বার আরব বিদ্রোহ সংঘটিত হয় এবং এইগুলির অধিকাংশই বৃটিশ হুকুমনামার বিরুদ্ধে। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে বিভিন্ন আরব রাজনৈতিক দলসমূহ জেরুজালেমের মুফতী হজ আমিন আল-হুসাইনীর নেতৃত্বে আরব উচ্চ কমিটিতে (Arab Highaer Committee) একত্রিত হয় এবং একটি সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। এই ধর্মঘটের সঙ্গে সঙ্গে বোমা নিক্ষেপ, নাশকতামূলক কার্যকলাপ, ইহুদী সম্পত্তির ধ্বংস সাধন এবং ব্যাপক হাঙ্গামাও চলিতে থাকে। পরস্পর বিরোধী ওয়াদার নিজস্ব ফাঁদে পড়িয়া গ্রেট বৃটেন কিছু করিতে অপারগ হয় এবং লর্ড পীলের নেতৃত্বে ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে শরৎকালে আরেকটি অনুসন্ধানকারীদল প্রেরণ করে। পীল কমিশন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, "আরবদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দান এবং ইহুদী জাতীয় আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা করা এই উভয় কাজ" গ্রেট বৃটেন একত্রে করিতে পারে না। অতএব ইহা সুপারিশ করে যে, হুকুমনামার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে দেশকে জেরুজালেম ও বেথেলহেম সহকারে ইহুদী ও আরব এই দুইটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করা হউক।

দেশভাগের এই প্রথম প্রস্তাবে ইহুদীবাদী ও আরবদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ওয়াইজম্যান সহ অনেক ইহুদীবাদী ইহা সমর্থন করেন। কারণ ইহা কার্যতঃ ইহুদীদের স্বাধীন রাষ্ট্রের আকাঙ্খাকে স্বীকার করে। তবে ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত বিংশতি ইহুদীবাদী কংগ্রেস ইহাকে প্রত্যাখ্যান করে, কারণ ইহা বালফার ঘোষণার ওয়াদার পরিপন্থী। অবশ্য ইহা ভবিষ্যৎ বিবেচনার পথ উন্মুক্ত রাখে। আরবদের মধ্যে শুধুমাত্র ট্রান্স জর্ডানের আমীর আবদুল্লাহ্ ইহা সমর্থন করেন। আরব উচ্চ কমিটি ইহার বিরোধিতা করে। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে সিরিয়ায় অনুষ্ঠিত প্যান-আরব কংগ্রেসে এই প্রস্তাব সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং বালফার ঘোষণার রহিতকরণ দাবী করা হয়।

সিরিয়া সম্মেলনের অনতিকাল পরে আরব বিদ্রোহ পুনরায় ফাটিয়া পড়ে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভ পর্যন্ত এখানে সেখানে বিদ্রোহজনিত সংঘর্ষ চলিতে থাকে। বৃটিশ সরকার জেরুজালেমের মুফতি এবং আরব

উচ্চ কমিটির অন্যান্য চরমপন্থী সদস্যদের গ্রেফতার করিবার আদেশ দেয়, কিন্তু তাঁহারা লেবাননে পলায়ন করেন এবং সেখান হইতে বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে গ্রেট ব্রটেন অনেকটা অভ্যাস বশতঃ দেশ ভাগ-পরিকল্পনার উপর রিপোর্ট প্রদান করিবার জন্য উড্‌হেড্ কমিশন প্রেরণ করে। কিন্তু সরকার ইহার রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে। অপরদিকে হিটলারের আবির্ভাব এবং জার্মান ইহুদীদের প্যালেস্টাইনে প্রত্যাগমনের ক্রমবর্ধমান দাবীর ফলে ইহুদীবাদীগণ প্রবল চাপের সম্মুখীন হয়। প্যালেস্টাইনে বস্তুতঃ গৃহযুদ্ধই চলিতে থাকে। হ্যাগানাহ্ দল অস্ত্র বহন করিবার জন্য হুকুমনামার সরকার হইতে অনুমতি লাভ করে এবং গুপ্ত সংগঠন ইরগুনও সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে সচল হইয়া উঠে।

আরেকটি কমিশন প্রেরণ করিবার পরিবর্তে গ্রেট ব্রটেন ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ৭ই ফেব্রুয়ারী লণ্ডনে আরব ও ইহুদীবাদীদের একটি গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করে। মধ্যমপন্থী ও উগ্রপন্থী ফেলিস্তিনী আরবগণ ছাড়াও মিসর, ইরাক, সোদী আরব ও ট্রান্স জর্ডানের নিকট হইতেও প্রতিনিধি দল আহ্বান করা হয়। প্রথমবারের মত ফেলিস্তিনী সমস্যা সমাধানের জন্য অ-ফেলিস্তিনী আরবদিগকেও আহ্বান করা হয়। অপরদিকে ইহুদীবাদী ও অ-ইহুদীবাদী ইহুদী এবং ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের ইহুদীদিগকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। আরবদের প্রত্যাখ্যানের ফলে সম্মেলন এমনকি প্রতিনিধিবৃন্দকে এক টেবিলে বসাইতেও অসমর্থ হয় এবং দুইটি পরস্পর বিরোধী মতামতের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য দূরীকরণের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

যুদ্ধের মেঘ পুনরায় ইউরোপীয় দিগন্তে পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। এবং ব্রটেনকেও জার্মান-হুমকি বিবেচনা করিতে হয়। ইহা কিছুতেই প্রত্যাশিত নয় যে, আরবগণ জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করুক। মিসরীয়গণ ও ক্রিসেণ্টের আরবগণ বাহ্যতঃ বৃটিশের সহিত বন্ধুভাবাপন্ন কিন্তু প্যালেস্টাইনের ব্যাপারে অসুখী এবং জার্মান অপপ্রচারের কি প্রতিক্রিয়া তাহাদের মধ্যে সূচিত হয় তাহা কিছুতেই বলা যায় না। আরেকটি মহাযুদ্ধের কথা বিবেচনা করিয়া গ্রেট ব্রটেন ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই মে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। এই শ্বেতপত্র পরিষ্কারভাবে আরবদের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করে। ইহা দশ বৎসরে একটি স্বাধীন দ্বি-জাতিত্বমূলক ফেলিস্তিনী রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করে।

ইহাতে পাঁচ বৎসরে ৭৫০০০ বাস্তুত্যাগীর প্যালেস্টাইনে প্রবেশের অনুমতির ব্যবস্থা রহিয়াছে, এবং পরবর্তী বাস্তুত্যাগ আরবদের সম্মতির উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। জমি বিক্রয় কোন কোন অংশে বৈধ ঘোষণা করা হয়। কোন কোন অংশে সীমিত করা হয় কিন্তু অধিকাংশ প্যালেস্টাইনে ইহাকে নিষিদ্ধ করা হয়। উভয়পক্ষ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, এবং ইহুদীবাদীগণ এই ক্ষেত্রে আরবদের চাইতে উগ্র মনোভাবের পরিচয় দেয়। সমগ্র প্যালেস্টাইনে ইহুদীবাদী বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এবং ইহুদী এজেন্সীর চেয়ারম্যান বেনগুরিয়ান বৃটিশনীতির বিরোধিতা করিবেন বলিয়া ওয়াদা করেন।

অদ্ভুত মনে হইলেও ইহা সত্য যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের বিবাদমান দলগুলিকে কিছুটা শান্ত করে। ইহুদীবাদীদের অভিরুচি পরিষ্কার। গ্রেট বৃটেন ও হিটলারের জার্মানীর মধ্যে সংঘটিত একটি যুদ্ধে ইহুদীবাদীগণ কোন পক্ষ অবলম্বন করিবে তাহা প্রশ্নাতীত। বেন গুরিয়ানের ভাষায়, "আমরা শ্বেতপত্র লইয়া এমনভাবে সংগ্রাম করিব যেন কোন যুদ্ধই নাই; এবং আমরা এমনভাবে যুদ্ধ করিব যেন কোন শ্বেতপত্র নাই।" ইহুদীবাদীগণ একটি সম্পূর্ণ ইহুদী বাহিনী গঠন করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু বৃটিশগণ একটি প্যালেস্টাইন পাইওনিয়ার বাহিনী গঠন করে এবং আরব ও ইহুদী উভয়ে স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য ইহার দ্বার উন্মুক্ত রাখে। অবশ্য ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ বৃটিশগণ কিছুটা নরম হয় এবং ইহুদীদিগকে তাহাদের নিজস্ব চিহ্ন ও পতাকাবাহী বিগ্রেড গঠন করিবার অনুমতি দান করে। আরবগণ জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার ব্যাপারে ইহুদীদের ন্যায় তেমন উৎসাহী ছিল না। ৯,০০০-এর অধিক লোক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদান করে নাই।

ইহুদীবাদী ও আরব উভয়েই জানিত যে বৃহৎ শক্তিবর্গের এই যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত তাহাদের ভাগ্য নির্ধারণ করিবে। পার্থক্য শুধু এই যে ইহুদীবাদীগণ সম্ভাব্য সব উপায়ে ভাগ্যকে তাহাদের স্বপক্ষে আনয়ন করিতে চেষ্টা করে, অপরদিকে আরবগণ সব কিছু আল্লাহ্‌র হাতে ছাড়িয়া দিতে আগ্রহী হয়।

একত্রিংশ অধ্যায়

ইরান—পাহ্লভী যুগ

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইরান তাহার নিরপেক্ষতা ঘোষণা করিলেও ইহা আঁতাত এবং কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের অসংখ্য যুদ্ধের ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়। রুশ ও তুর্কীগণ আজারবাইজানে যুদ্ধ করে, বৃটিশগণ দক্ষিণাঞ্চলে সাউথ পার্শিয়া রাইফেলস নামে একটি পারস্য আধাসামরিক বাহিনী গঠন করে; এবং জার্মানগণ নাইদারমায়ার (Niedarmayer) ও ওয়াস-মুসের (Wassmuss) ন্যায় দুঃসাহসিক অভিযাত্রী দালালদের মাধ্যমে আঁতাত পক্ষের বিরুদ্ধে গোত্রসমূহকে ক্ষিপ্ত করিতে চেষ্টা করে। ইতিমধ্যে যুবক সম্রাট আহমদ শাহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে সিংহাসনে অভিষিক্ত হন, এবং তৎসঙ্গে ইরান কিছুটা পার্লামেণ্টারী পদ্ধতির রূপ ধারণ করে। সরকার তখন রাজনৈতিক মধ্যপন্থী, গোত্রীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ ও জমিদার অভিজাতবর্গের একটি যুক্তফ্রণ্টের হাতে থাকে,—যাহাদের অধিকাংশ লোক কয়েক বৎসর পূর্বেও শাসনতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে ছিল। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে শুস্তারের বরখাস্তের সঙ্গে মজলিশ বন্ধ হইয়া গেলে উদার গণতন্ত্রীদল যেহেতু বিশ্বাস করে যে আঁতাত দল জয়লাভ করিলে ইরানকে রাশিয়া ও গ্রেট বৃটেনের মধ্যে বিভক্ত করা হইবে সেহেতু তাহাদের সহানুভূতি জার্মানী ও তুর্কীর স্বপক্ষে থাকে। ইউরোপে যাহারা পলায়ন করে তাহাদের অধিকাংশ বার্লিনে একত্রিত হয়। সেখানে উদার বিপ্লবীদের একজন পুরোধা তাব্রিজের হাসান তাকিজাদেহ ১৯২১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কাভেহ[1] (Kaveh) নামে একটি পত্রিকা সম্পাদন করে।

১। কাভেহ পারস্যের কিংবদন্তীর এক কর্মকারের নাম, যে তাহার চামড়ার বহিরাবরণ উত্তোলন করিয়া একজন অ-পারস্য জাহ্হাকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহ পরিচালনা করে। কাভেহর চামড়ার বহিরাবরণ পারস্য স্বাধীনতার স্মারক চিহ্নে পরিণত হয় এবং যুদ্ধে পতাকা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ইহাকে দারাফ্শ-এ-কাভেয়ানী বলা হয়।

উদারপন্থীদের মধ্যে যাহারা ইরানে থাকিয়া যায় তাহারা ওসমানীয়দের কাঁধে কাঁধ মিলাইবার জন্য সুদূর পথ অতিক্রম করিয়া ইস্তাম্বুলে পৌঁছে।

জিলানের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র

বার্লিন বা ইস্তাম্বুলের উদারপন্থীগণ ইরানের ঘটনা প্রবাহকে প্রভাবিত করে নাই। তবে কিছু সংখ্যক উদারপন্থী কর্মধারা নিজেদের হাতে নেয়, একটি ছোটখাট অস্ত্রধারী দল গঠন করে এবং ইরানে উত্তরাঞ্চলের প্রদেশ-সমূহ আজার বাইজান, জিলান ও খোরাসানে বিপ্লবী সরকার স্থাপন করে। ইহাদের মধ্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ সম্ভবতঃ কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণে অবস্থিত জিলান প্রদেশে মির্জা কুচুক খান কর্তৃক পরিচালিত বিপ্লবী সরকার। তিনি ও তাঁহার অনুসারীগণ এই মর্মে শপথ গ্রহণ করেন যে, ইরান হইতে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত তাঁহারা দাঁড়ী ও চুল কাটিবেন না। জিলানের বনে অবস্থান করায় তাঁহারা বন-জঙ্গলের লোক নামে পরিচিত হয় এবং রবিনহুডের কায়দায় তাহারা নিজেদের ভরণ পোষণ করে। কিছুকালের জন্য জার্মান ও তুর্কী অফিসারগণ জঙ্গলী স্বেচ্ছাসেবকদিগকে বৃটিশ ও রুশ যোগাযোগ লাইন ধ্বংস করিবার কাজে প্রশিক্ষণ দান করে। রুশ বিপ্লবের পর ইহসানুল্লাহ নামক আজার বাই-জানের এক কমিউনিস্ট এজেন্ট ও কুচুক খানের বন্ধুর মাধ্যমে বলশেভিকগণ জঙ্গলীদের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করে।

জঙ্গলীদের সহিত মস্কোয় অবস্থিত কমিউনিস্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পর্ক কখনও জোরদার হয় নাই। একদিকে বলশেভিকগণ নিশ্চিত হইতে পারে না যে ইরান মতবাদের দিক হইতে বিপ্লবের জন্য 'প্রস্তুত' কিনা, অপরদিকে জঙ্গলীদের মধ্যে একমাত্র ইহসানুল্লাহই খাঁটি কমিউনিস্ট, এবং নেতা কুচুক খান মনেপ্রাণে বলশেভিকদের সহিত সহযোগিতার ব্যাপারে মনস্থির করিতে অপারগ। এতদসত্ত্বেও ১৯২০ খ্রীস্টাব্দের বসন্তকালে বৃটিশ সৈন্যদিগকে জিলান ত্যাগে বাধ্য করিবার ব্যাপারে তিনি বলশেভিক-দের সাহায্য গ্রহণ করেন। বৃটিশ সৈন্যগণ রুশ বিপ্লবের পর উত্তর ইরান দখল করে। প্রাদেশিক রাজধানী রাশ্‌ত্‌-এ জিলানের একটি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র স্থাপন করা হয়, কিন্তু শীঘ্রই জঙ্গলীদের মধ্যে বিভেদ

সৃষ্টি হয়। একজন পারস্য জাতীয়তাবাদী হিসাবে কুচুক খান জিলানকে রাশিয়ার একটি অংশে পরিণত করিবার বিরোধী। আবার একজন মধ্যমপন্থী সমাজবাদী হিসাবে তিনি পারস্যের জমিদার ও ব্যবসায়ীদিগকে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করিবারও বিরোধী।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, এই ব্যাপারে কোন্ নীতি গ্রহণ করিবে সে ব্যাপারে মস্কো তখনও মনঃস্থির করিতে পারে নাই। তৎসঙ্গে জিলানে একটি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র গঠিত হইবার ফলে মস্কো তেহরানের পারস্য সরকারের সহিত একটি বন্ধুত্বের চুক্তি সম্পাদন করিতে সচেষ্ট হয়। ফলে লেনিন এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, একটি মার্ক্সীয় বিপ্লব সংঘটিত হইবার মত ক্ষেত্র ইরানে তৈয়ার হউক। তিনি জঙ্গলীদের প্রতি প্রদত্ত তাঁহার সমর্থন প্রত্যাহার করেন এবং সোভিয়েত সেনাবাহিনীকে ফিরাইয়া আনেন। মির্জা কুচুক খান এইভাবে একাকী পারস্য সরকারী বাহিনীর সহিত আটিয়া উঠিতে ব্যর্থ হন। তাঁহার সৈন্য বাহিনী পরাজিত হয় ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। জিলানের পর্বতে পলাতক হিসাবে তিনি প্রচণ্ড শীতে মারা যান।

জিলানের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা এবং তৎসঙ্গে সম্ভবতঃ সমগ্র উত্তর উপকূল অধিকার করিবার ব্যাপারে মস্কোর অনীহার কারণ অনুমান সাপেক্ষ ও সুদীর্ঘ—যাহা এখানে বিবৃত করা যায় না। তবু নিম্নোক্ত বিষয়-গুলি বিবেচনা করা যাইতে পারে।

১। ইরান মার্কসীয় মতবাদ গ্রহণ করিবার মত যথেষ্ট উন্নত কিনা এই ব্যাপারে বলশেভিকদের মধ্যে সন্দেহ ছিল।

২। বলশেভিকগণ তখনও সাম্রাজ্যবাদের কার্যক্রম হিসাবে অন্যের দেশ দখল করিবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিবার পক্ষে যথেষ্ট আদর্শবাদী।

৩। জিলান মধ্যস্থতাকারী আজারবাইজানের সোভিয়েতের সহিত মস্কোর মতানৈক্য বিদ্যমান ছিল।

৪। গৃহযুদ্ধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন তখনও খুবই দুর্বল এবং এই বিষয়েও নিশ্চিত নহে যে গ্রেট বৃটেন ইহাকে উত্তর-ইরানে অনুপ্রবেশ করিতে দিবে কিনা।

৫। মস্কো সম্ভবতঃ বিশ্বাস করে যে শুধুমাত্র একটি বা দুইটি প্রদেশের চাইতে বন্ধুত্ব ও প্রচারণার মাধ্যমে সে কোন দিন সমগ্র দেশ পাইতে পারে।

৬। সেই ভূখণ্ড দখল না করিয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্ভবতঃ শুধু ভুলই করিয়াছে। শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ পর জিলান পরিকল্পনায় একজন উদ্যোক্তা জাফর পিশভেরী (Jafar Pishevari) পারস্যের আজারবাইজান প্রদেশে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন পরিচালনা করেন। ইহা ছিল স্ট্যালিনের সময় এবং মস্কো পুনরায় তাহার সৈন্য বাহিনী প্রত্যাহার করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া পারস্য সরকারের হাতে কমিউনিস্ট বিদ্রোহী-দেরকে ধ্বংস হইতে দেয়।

ইঙ্গ-পারস্য চুক্তি

রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব ইরানকে বিভিন্নভাবে প্রভাবান্বিত করে। উহাদের একটি হইল এই যে ইহা অন্ততঃপক্ষে দেশের মধ্যে বিদ্যমান ইঙ্গ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতার অবসান ঘটায়। এই বিপ্লব ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দে ইঙ্গ-রুশ কনভেনশনকে অকেজো করিয়া দেয়। যদ্বারা এই দুই দেশ ইরানকে নিজেদের প্রভাবের অংশে বিভক্ত করিয়াছিল। রাশিয়ার অনুপস্থিতির ফলে গ্রেট বৃটেনের পক্ষে শূন্যস্থান পূরণ করা, সমগ্র ইরান নিজের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করা এবং তদ্বারা ভারতবর্ষের জল ও স্থলপথ উন্মুক্ত রাখা ও সদ্য আবিষ্কৃত তৈলকূপগুলি নিয়ন্ত্রণ করা স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। বৈদেশিক সচিব লর্ড কার্জনের স্বপ্ন ছিল "ভূমধ্যসাগর হইতে পামীর পর্যন্ত এক নাগাড়ে কতকগুলি অধীন রাষ্ট্রের গ্রন্থি" সৃষ্টি করা তন্মধ্যে ইরান "অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র"। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে পরাক্রান্ত বৃটিশ কূটনীতিজ্ঞ স্যার পার্সি কক্স (Sir Percy Cox) তেহরানে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হন এবং তাঁহাকে উপরোল্লিখিত নীতি কার্যকরী করিতে বলা হয়।

১৯১৯ খ্রীস্টাব্দ আবার প্যারিস শান্তি সম্মেলনের বৎসর, যাহার প্রতি উডরু উইলসনের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের মতবাদ অনেক ছোট ছোট জাতিকে আকৃষ্ট করে। একগুচ্ছ দাবী সহকারে ইরানও একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। ইরানকে সম্মেলনে গ্রহণ করিবার ব্যাপারে বৃটিশ বিরোধিতা করে। উইলসন সমস্ত প্রতিনিধি দলকে গ্রহণ করিবার পক্ষপাতি, এবং ইরানের

ক্ষেত্রে ফ্রান্স এবং ইতালীও সম্মতিজ্ঞাপন করে, কিন্তু গ্রেট বৃটেন অসম্মত। ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট নাগাদ ঘোষণা করা হয় যে গ্রেট বৃটেন ও ইরান একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে, যে ব্যাপারে বেশ কিছুদিন যাবত আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল। এই অখ্যাত চুক্তিতে ইরানের প্রতিনিধিত্ব করেন প্রধান মন্ত্রী হাসান ওসুক আল-দোলেহ্ এবং শাহজাদা ফিরুয, যাঁহাকে তাঁহার চাচাত ভাই শাহ্ বৈদেশিক মন্ত্রী নিযুক্ত করেন।

সেই চুক্তি পরিষ্কারভাবে গ্রেট বৃটেনের স্বপক্ষে স্বাক্ষরিত হয় এবং ইহা শুধু পারস্যের উদারপন্থীদের ভিতর নহে বরং যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের ন্যায় দেশেও ক্ষোভের সঞ্চার করে। পারস্যের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতার প্রতি সম্পূর্ণ সম্মান প্রদর্শনের গতানুগতিক অঙ্গীকারের পর চুক্তি নিম্নলিখিত বিষয়-গুলি পূর্ণ করিবার ওয়াদা করে ঃ

১। পারস্যের যতগুলি বিভাগের জন্য প্রয়োজন গ্রেট বৃটেন ততগুলি উপদেষ্টা প্রদান করিবে। ইরান উপদেষ্টাদের খরচপত্র ও "যথেষ্ট ক্ষমতা" প্রদান করিবে।

২। গ্রেট বৃটেন পারস্য সরকারের খরচে একটি পারস্য সেনাবাহিনী গঠন ও প্রশিক্ষণ দান করিবে।

৩। উপরোল্লেখিত কার্যের জন্য ৭ শতাংশ সুদের হারে ২০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ প্রদানের বন্দোবস্ত করা হয়, এবং ঋণ প্রদানকারী ইরানের "সমস্ত রাজস্ব ও শুল্ক আয়ের" মালিক হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত লওয়া হয়।

৪। "রেলপথ নির্মাণ ও অন্যান্য যানবাহনের সাহায্যে" গ্রেট বৃটেন ইরানের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করিবে।

চুক্তিটি এমনভাবে স্বাক্ষরিত হয় যেন ইরান গ্রেট বৃটেনের পদানত হইয়া যায়। অনেক দিক হইতে ইহা ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের মিসরের উপর একতরফাভাবে চাপাইয়া দেওয়া চুক্তির ন্যায়।

সঙ্গে সঙ্গে এই চুক্তির বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। পারস্যবাসীদের বিরোধিতার জন্য যতটুকু নহে তাহার চাইতেও বেশী যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধিতার জন্য চুক্তিটি নাকচ হইয়া যায়। এখানে উল্লেখ করিতে হইবে যে, উক্ত উইলসনের আদর্শবাদের সহিত ইরানের তৈলের অনুমতিপত্র লাভের ব্যাপারে মার্কিন তৈল কোম্পানীসমূহের আগ্রহও মিলিত হয়। চুক্তি দ্বারা গ্রেট

বৃটেনকে দেওয়া এইরূপ একচেটিয়া অধিকার কোম্পানীগুলি পছন্দ করে নাই। অপরদিকে বৃটিশগণ এমন নিশ্চিত হইয়া যায় যে তাহারা চুক্তিটি মজলিশের দ্বারা অনুমোদিত হইবার পূর্বেই (কখনও ইহা অনুমোদিত হয় নাই) ইরানে তিনজন প্রধান উপদেষ্টা প্রেরণ করিয়া দেয়। আর্মিটেজ স্মীথকে অর্থনৈতিক বিষয়াদির জন্য, জেনারেল ডিকসনকে সামরিক বিষয়াদির জন্য এবং হার্বার্ট স্মীথকে শুল্ক বিষয়াদির জন্য উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয়। এই চুক্তি কার্যকরী না হওয়ায় বৃটিশ-সম্মানে আঘাত লাগে, কিন্তু ইরানে তাহাদের প্রভাব অম্লান রাখিবার জন্য তাহারা শীঘ্রই আরেকটি পরিকল্পনা লাভ করে। সরাসরি নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব বিধায় ইরানে একটি শক্তিশালী রুশ বিরোধী ও গ্রেট বৃটেনের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন সরকার সাম্রাজ্যের উদ্দেশ্য সফল করিবে—তাহারা অনুরূপ একটি পরিবর্তনের প্রতি মনোনিবেশ করে।

১৯২১ খ্রীস্টাব্দের অভ্যুত্থান

১৯২০ খ্রীস্টাব্দে ইরান বিশৃঙ্খলার আবর্তে নিমজ্জিত হয়। শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র শক্তিশালীও ছিল না, শাসনতান্ত্রিকও ছিল না। মন্ত্রী-পরিষদ এক শক্তিশালী ভূস্বামী হইতে আরেকজনের হাতে হস্তান্তরিত হয় মাত্র। চুক্তির ব্যর্থতা এক শূন্যতার সৃষ্টি করে, আবার জিলানে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ফলে পারস্যের নেতৃবৃন্দ বলশেভিজম সম্পর্কে শংকিত হয়। এই বিশৃঙ্খলা ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে ২১শে ফেব্রুয়ারী সকালবেলায় সংঘটিত সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা দূরীভূত হয়। কর্ণেল রেজা খানের সেনাপতিত্বে এবং পত্রিকা সম্পাদক সৈয়দ জিয়া আল-দীন তাবাতাবাইর সমভিব্যাহারে প্রায় ২৫০০ কোসাক সৈন্য ৬০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত কাজভীন হইতে তেহরানে উপস্থিত হয় ও রাজধানী অধিকার করে। বলিতে গেলে কোন বাধাবিঘ্ন ছাড়াই তাহারা রাজধানী করায়ত্ত করে। সকালে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দলের সুপরিচিত অনেক ব্যক্তিবর্গকে গ্রেফতার করা হয়। ভীতসন্ত্রস্ত শাহ বাধ্য হইয়া সৈয়দ জিয়াকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং রেজা খানকে সরদার-এ-সিপাহ্, বা সেনাবাহিনীর অধিনায়ক উপাধি প্রদান করেন।

সৈয়দ জিয়া একজন মধ্যমপন্থী জাতীয়তাবাদী ও মধ্যমপন্থী পত্রিকা রা'দ (বজ্র)-এর সম্পাদক। ইহা বৃটিশ সমর্থক সম্পাদকীয়ের জন্যও পরিচিত। উদারপন্থীগণ তাঁহাকে বৃটিশ সমর্থনের জন্য সন্দেহের চোখে দেখে, আবার সামাজিক দিক হইতে ভূস্বামীদের আস্থা অর্জন করিবার মত জনপ্রিয়ও তিনি নহেন। তাঁহার রাজনৈতিক কার্যাবলী পুলাদ কমিটিতে (Pulad Committee) কেন্দ্রীভূত। বৃটিশগণ ইসফাহানে এই কমিটি প্রতিষ্ঠা করে। সরকারের সহিত তাঁহার একমাত্র সম্পর্ক হইল ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দে ককেশাসে প্রেরিত পারস্য প্রতিনিধিদলে তাঁহার সদস্যভুক্তি। প্রতিনিধি দলটি বলশেভিক রাশিয়ার কবল হইতে স্বাধীনতাকামী রাষ্ট্রবর্গের সহিত একটি বন্ধুত্বের চুক্তি স্বাক্ষর করে।

অপরদিকে রেজা খান সুদীর্ঘ, কঠোর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কিন্তু স্বল্প শিক্ষিত একজন সামরিক লোক। সাহসিকতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দ্বারা তিনি রুশ পরিচালিত কোসাক বাহিনীর সেনাপতি পদে উন্নীত হন। বলশেভিক বিপ্লবের পর পারস্যের কোসাক রেজিমেন্টের রুশ অফিসারগণ যখন আটক হইয়া যান, রেজা খান তখন পারস্য অফিসারদের একটি দলের নেতা। রুশ-দিগকে বিতাড়িত করিয়া তাঁহারা পূর্ণ রেজিমেন্টের নিয়ন্ত্রণ হস্তগত করেন। সামরিক জীবনে লালিতপালিত হইবার ফলে তাঁহার জাতীয়তাবাদের ধারা একটি সম্মিলিত সামরিক সরকারের হাতে ইরানের গৌরব প্রতিফলিত করে। রুশ অধিনায়কদের হাতে তাঁহার কঠোর অভিজ্ঞতার ফলে তিনি স্বভাবতঃই বিদেশী বিরোধী, বিশেষতঃ বলশেভিক বিরোধী ও রুশ বিরোধী।

রেজা খান ও সৈয়দ জিয়া, এই দুই ব্যক্তিকে যতটুকু জানা যায় তাঁহারা মেজাজ, শিক্ষা এবং প্রায় প্রত্যেক কিছুতে পরস্পর বিরোধী, এবং একে অপরের নিকট অপরিচিত। তেহরানের কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত শাহ্ আবাদে বিপ্লবের রাতে সম্ভবতঃ প্রথম বারের মত তাঁহারা মিলিত হন। তদুপরি বিপ্লবের সফলতার পর তাঁহাদের পরিকল্পনাসমূহ সমন্বিত হয় নাই। বিপুল সংখ্যক লোক গ্রেফতার হয়, কিন্তু ইহা পরিষ্কার যে পূর্ব হইতে ইহার জন্য কোন তালিকা প্রস্তুত করা হয় নাই। তাঁহারা উদারনীতিবাদী, মধ্যমপন্থী, রক্ষণশীল, ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে গ্রেফতার করেন। কখনও কখনও জিয়া হয়ত একজনকে গ্রেফতারের হুকুম দেন আবার রেজা তাহাকে মুক্ত

করিয়া দেন। বিপ্লবের পূর্বে সৈয়দ জিয়া তাঁহার মন্ত্রীসভাও বাছিয়া লন নাই। একটি তৃতীয় দল নিশ্চয়ই সমস্ত প্রাথমিক আয়োজন সম্পন্ন করে। সমস্ত প্রমাণ দ্বারা বৃটিশগণই এই তৃতীয় দল বলিয়া অনুমান করা হয়।

গ্রেট বৃটেননের সামরিক প্রতিনিধি কর্ণেল স্মীথ ও রাজনৈতিক প্রতিনিধি হাওয়ার্ডের সহিত জিয়ার বন্ধুত্বের দ্বারা ব্যাপারটি প্রশ্নাতীত হইয়া যায়। বিপ্লবের পূর্বে, এই সকল লোক ও অন্যান্যদের সহিত তাঁহার ঘন ঘন সাক্ষাৎ এবং "তাহাদের নিকট আধুনিক পারস্য কবিতা আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা" করিবার জন্য বৃটিশ বন্ধুদের সহিত তাঁহার রাত্রিকালীন সাক্ষাৎকার ইহাকে আরও সপ্রমাণিত করে। অধিকন্তু কাজভীনে ছিন্নবস্ত্র পরিধান-কারী এই সকল কোসাক সৈন্যগণ তেহরানে প্রবেশ করিবার সময় সুসজ্জিত বৃটিশ সামরিক পোশাক পরিধান করে। রাজধানীর দিকে কোসাক রেজিমেন্টের অগ্রগতিযান সম্পর্কে অবহিত তেহরান সরকার ঘটনা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য শাহ আবাদে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। ঘটনা চক্রে বৃটিশ লিগেশনের দুইজন প্রতিনিধিও সেই সঙ্গে গমন করেন এবং সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করিবার মত যথেষ্ট টাকাও তাঁহাদের সঙ্গে থাকে। তদুপরি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস এই মর্মে এক স্বীকারোক্তি প্রচার করে যে এই সামরিক অভ্যুত্থানে তাহাদের হাত ছিল।[১]

সৈয়দ জিয়া ও রেজা খান পারস্য সরকারের ক্ষমতা দখলের সময় বৃটিশ-দের সাহায্য লইয়াছিলেন, ইহার অর্থ এই নহে যে তাঁহারা ইরানের স্বার্থ গ্রেট বৃটেনের স্বার্থের নিকট জলাঞ্জলি দিয়াছেন। এই ধরনের অভিযোগ ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের চুক্তি স্বাক্ষরকারী ভসুক আল-দোলেহ্-এর বিরুদ্ধে আনা যায়, জিয়া বা রেজার বিরুদ্ধে নহে। সৈয়দ জিয়ার সরকার তিন মাসের অধিক স্থায়ী হয় নাই। তাঁহার ধরপাকড়ের শিকার হইয়া উদারপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল উভয় মহলই তাঁহার শত্রুতে পরিণত হয়। শাহ হইতে

১। রেজা খানের কোন জীবনচরিত নাই। ইনিই পরে রেজা শাহ হন। সৈয়দ জিয়া তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনচরিত প্রকাশিত করেন নাই। সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি ও পন্থা পর্যালোচনার জন্য এই ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্ররা এই বিষয় ও অন্যান্যের উপর ক্যামব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের (Praeger, 1965) পিটার এ্যাভেরী লিখিত বৃটিশ সমর্থক "মর্ডান ইরান" গ্রন্থ যদি পড়েন তাহলে ভালভাবে জানতে পারবেন।

নীচের দিকে সব ধরনের লোকের উপর তিনি কঠোর কর্তৃত্ব প্রয়োগ করেন, কিন্তু এই তৎপরতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার মত ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। সামরিক বাহিনী তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রেজা খানের সমর্থক ছিল। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল রেজা খান যুদ্ধমন্ত্রী হিসাবে মন্ত্রীসভায় প্রবেশ করে। উভয়ের মধ্যে প্রথম বিরোধ আরম্ভ হয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি সামরিক বাহিনী গেণ্ডারমারীর (Gendermeria) ভবিষ্যৎ এবং বৃটিশ সামরিক উপদেষ্টা দল লইয়া। রেজা খান চান সশস্ত্র বাহিনীকে একত্রীভূত করিতে ও বৃটিশদিগকে বরখাস্ত করিতে। সৈয়দ জিয়া উভয় প্রচেষ্টার বিরোধিতা করেন ও পরাভূত হন। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে ২৪শে মে তিনি ইরাম ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তিনি প্যালেস্টাইনে বাস করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বৃটিশ ও রুশ বাহিনী পুনরায় ইরানে প্রবেশ করিলে এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী পদত্যাগ করিলে তিনি পুনরায় ইরানে আগমন করেন। সৈয়দ জিয়া মনে করেন, কোন বিদেশী শক্তির সাহায্য ছাড়া ইরানে ব্যাপক কোন কিছু করা যায় না। বৃহৎ শক্তিসমূহের মধ্যে তিনি সর্বদাই গ্রেট বৃটেনের সমর্থক।

রেজা খান ছিলেন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। বিদেশী প্রভাব মুক্ত একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সামরিক সরকার ছাড়া কোন কিছু করা যায় না বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। ক্ষমতা দখলের সময় তিনি বৃটিশদের ব্যবহার করেন কিন্তু পরে একাধিকবার তাহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের চেষ্টা করেন। কর্মজীবনে তিনি বিদেশী উপদেষ্টাদিগকে কাজে লাগাইতে বাধ্য হন, অথচ তাহাদের উপস্থিতিতে তিনি স্বস্তি বোধ করেন নাই এবং কখনও কোন পরিকল্পনায় তাহাদিগকে কয়েক বৎসরের বেশী রাখেন নাই। এই ধরনের মনোভাব সুস্থ নয়। কিন্তু ইহা ভাবিবার বিষয় যে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে পারস্যবাসীগণ বিদেশী উপদেষ্টা ছাড়া একটি সেনা বাহিনী গঠন করিতে পারিত কি? কোন বিদেশী ঋণ ছাড়া কাস্পিয়ান স্যাগর হইতে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত একটি রেলপথ নির্মাণ সম্ভব ছিল কি?

ইরান-সোভিয়েত চুক্তি—১৯২১

সামরিক বিপ্লবের পাঁচদিন পর প্রাক্তন পারস্য মন্ত্রীসভা ও মস্কোর মধ্যে স্থিরীকৃত একটি রুশ-পারস্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির তাৎক্ষণিক

ফলাফল হইল জিলান হইতে সোভিয়েত সৈন্য অপসারণ। ইহার ফলে জিলানের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ধ্বংস হয়। মির্জা কুচেক খান জিলানের পর্বতে পলাতক হন এবং পরে শীতে মারা যান। রুশগণ কর্তৃক ব্যাপক-ভাবে প্রচারিত এই চুক্তির ভাষ্য মূলতঃ বলশেভিক সরকারের একটি সাম্রাজ্য-বাদ বিরোধী ও উপনিবেশবাদ বিরোধী নীতির ঘোষণা এবং সদ্যোমাত্র বাতিল ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দের ইঙ্গ-পারস্য চুক্তির প্রতিকূলে একটি নজীর। এই চুক্তি অনুসারে রুশগণ ইরানকে সমস্ত রুশ সম্পত্তি, অনুমতিপত্র ও বিষয়-আশয় প্রদান করে, তবে শর্ত হইল ইরান এই মর্মে প্রতিশ্রুতি প্রদান করে (ধারা-১৩) যে, কোন তৃতীয় শক্তিকে সে এইগুলি প্রদান করিতে পারিবে না, কিন্তু "পারস্য জনগণের উপকারার্থে এইগুলি সংরক্ষণ করিবে।" অবশ্য এই চুক্তি জার সাম্রাজ্যবাদের এবং ভবিষ্যৎ রুশ শ্রমিক সাম্রাজ্যবাদের কিছু চিহ্ন রাখিয়া যায়।

উদাহরণ স্বরূপ, ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ক্যাস্পিয়ান মৎস্য অনুমতিপত্র এবং ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের মাশুলের আইন (Tarrif regulations) অপরিবর্তনীয় রহিয়া যায়। রাশিয়ার খাদ্য সরবরাহের জন্য মৎস্য প্রয়োজন এবং মাশুল ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুকূলে ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দের একটি নতুন ইরানী-সোভি-য়েত মৎস্য কোম্পানী গঠন করা হয় এবং ২৫ বৎসর মেয়াদী একটি অনু-মতিপত্রও প্রদান করা হয়। কিন্তু মাশুল আর পরিবর্তন করা হয় নাই, ফলে পারস্যের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সোভিয়েতের একচেটিয়া ব্যবসার সহিত প্রতিযোগিতা করিবার জন্য ইরান রাষ্ট্রীয়ভাবে একচেটিয়া ব্যবসা আরম্ভ করে। মোটের উপর স্ট্যালিন ও রেজা শাহের অধীনস্থ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইরানের ক্রমবর্ধমান কঠোরতা স্বাধীন ব্যবসার অনুকূলে নহে।

৬ নং ধারা পরবর্তীকালে ইরানের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করে। ইহাতে বলা হয় কোন তৃতীয় শক্তি "রাশিয়ার বিরুদ্ধে পারস্য ভূখণ্ডকে ঘাঁটি বানাইতে চাহিলে···পারস্যের অভ্যন্তরে সৈন্য প্রেরণ করিবার অধিকার রাশিয়ার থাকিবে···।" দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অ-কম্যুনিস্ট দেশসমূহের সহিত ইরানের নিরাপত্তা চুক্তিসমূহে আপত্তি জ্ঞাপন করিবার জন্য সোভি-য়েত ইউনিয়ন ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এবং অন্যান্য সময় ইরান আক্রমণ করিতে এই ধারা ব্যবহার করে।

পারস্যের তৈল : দ্বিতীয় পর্ব

অনতিকাল পরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৩ নং ধারা রহিত করিবার সুযোগ লাভ করে। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে সৈয়দ জিয়া নির্বাচিত হইলে রেজা খান প্রধান মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন নাই বরং গ্রেফতারকৃত সবাইকে মুক্তিদান করেন। ইহাদের একজন, ভাস্থক আল-দোলেহ্-এর ভ্রাতা কাভাম আল-সালতানেহ্ প্রধান মন্ত্রী হন। কাভাম পারস্য কূটনীতির সেই ভাবধারার অন্তর্ভুক্ত যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে গ্রেট বৃটেন ও রাশিয়াকে নিরস্ত করিবার জন্য একটি তৃতীয় শক্তির প্রয়োজন। আধুনিক পারস্যের ইতিহাসে কাভামের নাম উত্তরাঞ্চলের তৈল ও মাকিন অর্থনৈতিক মিশনের সহিত সংযুক্ত।

১৯২১ খ্রীস্টাব্দের ২২শে নভেম্বর পারস্য সরকার একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে যদ্বারা পঞ্চাশ বৎসরের মেয়াদে উত্তরাঞ্চলের তৈল আহরণের জন্য স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীকে অনুমতি প্রদান করা হয়। ইঙ্গ-পারস্য অয়েল কোম্পানী এই মর্মে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে যে উত্তরাঞ্চলের তৈল আহরণের জন্য খোসতারিয়াকে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে অনুমতি প্রদান করা হয়।[1] এক লক্ষ পাউণ্ডের বিনিময়ে বৃটিশ সরকার স্বত্ব ক্রয় করিয়া নর্থ পার্শিয়া অয়েল নামে একটি কোম্পানী গঠন করিয়াছিল। তাহারা এখন দাবী করে যে একই অঞ্চলের তৈল আহরণের জন্য দুইটি দলকে অনুমতিপত্র প্রদান করিবার কোন অধিকার পারস্য সরকারের নাই। অপরদিকে উত্তর-ইরানে মাকিন স্বার্থে বাধা প্রদানকারী রুশগণ এই মর্মে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে যে, চুক্তির ১৩নং ধারা অনুযায়ী সোভিয়েত সরকার কর্তৃক পরিত্যক্ত কোন অনুমতিপত্র কোন তৃতীয় পক্ষকে প্রদান করিবার ব্যাপারে ইরান চুক্তিবদ্ধ। উভয় পক্ষের নিকট ইরানের উত্তর হইল, খোসতারিয়া চুক্তি যেহেতু মজলিশ অনুমোদন করে নাই তাই শাসনতন্ত্র মোতাবেক ইহা অকেজো এবং এই কারণে কার্যকর বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

এই বিষয় লইয়া বৃটিশ ও মাকিনদের মধ্যে বেশ কিছুদিন বিতর্ক চলিতে থাকে। এই ব্যাপারে বৃটিশগণ সুবিধা লাভ করে। কারণ পারস্য উপ-

---

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৩০।

সাগর এলাকায় ইঙ্গ-পারস্য তৈল কোম্পানীর তৈল রপ্তানীর একচেটিয়া অধিকার বিদ্যমান এবং তাহারা স্ট্যাণ্ডার্ডকে দক্ষিণের কোন বন্দর দিয়া তৈল প্রেরণ করিতে অনুমতি দান করে নাই। ১৯২২ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী বৃটিশ ও মার্কিন কোম্পানীগুলি একটি অংশীদারত্বে রাজী হয়, যদ্বারা মার্কিনগণ ভোটের অধিকার লাভ করে। অবশ্য পারস্যবাসীরা রাজী হয় নাই কারণ উত্তরের কোন ব্যাপারে বৃটিশ কোম্পানীর কোন অধিকার তাহারা চায় না এবং তাই সমগ্র পরিকল্পনাই তাহারা প্রত্যাখ্যান করে।

এই সময় সিনক্লেয়ার অয়েল কোম্পানী (Sinclair Oil Company) এই পরিকল্পনায় উৎসাহী হইয়া উঠে। স্ট্যাণ্ডার্ডের উপর সিনক্লেয়ারের বিশেষ সুবিধা এই যে ইহা সোভিয়েত ইউনিয়নের সাখালিন দ্বীপের তৈল আহরণ ও বিশ্বে ইহা বাজারজাতকরণের অনুমতিপত্র লাভ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন সিনক্লেয়ারকে উহার ভূখণ্ডের মধ্য দিয়া উত্তরাঞ্চলের তৈল রপ্তানী করিবার সুযোগ দান করিবে বলিয়া মনে করা হয়। পারস্য মজলিশ ইতিমধ্যে "যে কোন স্বাধীন ও দায়িত্বশীল মার্কিন কোম্পানী"কে উত্তরাঞ্চলের তৈলের জন্য সরকারকে অনুমতিপত্র প্রদান করিবার ক্ষমতা অর্পণ করে। শর্তসমূহের একটি হইল অনুমতিপ্রাপ্ত কোম্পানী পারস্য সরকারকে এক কোটি ডলারের একটি ঋণ প্রদান করিবে। ঋণের সমস্যাটি সহজ নহে, কিন্তু মনে হয় সিনক্লেয়ার সোভিয়েত ইউনিয়নের আশীর্বাদ লইয়া ইরানে আগমন করে এবং আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করে।

সিনক্লেয়ার অয়েলের আলাপ-আলোচনা ও ইহার সহিত সংযুক্ত ঘটনাবলী আন্তর্জাতিক দলাদলি, অপবাদ, লুঠ ও হত্যার উপাদান প্রদান করে। শুরুতেই ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে মজলিশ যখন সিনক্লেয়ার অনুমতিপত্র অনুমোদন করে, মজলিশ ভবনের একাংশে আগুন ধরিয়া যায়। রিপোর্ট অনুসারে একজন লুণ্ঠনকারী কর্তৃক ইহা সংঘটিত হয়। এপ্রিল মাসে আমেরিকান ব্লেয়ার এণ্ড কোম্পানী (American Blair and Company) ইরানের একটি ঋণের নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণ করিবার জন্য জনৈক জেমস ফর্বস্‌কে পাঠায়, কিন্তু বৃটিশগণ জোর দিয়া বলে যে যুক্তরাষ্ট্রে কোন ঋণের জন্য তাহারা দক্ষিণাঞ্চলের আবগারী শুল্ক পণ হিসাবে প্রদানের অনুমতি দিবে না। তারপর ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে সিনক্লেয়ারের

প্রতিনিধি ইরানে থাকাকালীন দুইটি ঘটনা যারা তেহরান প্রকম্পিত হয়। প্রথমতঃ একটি অদ্ভুত ধর্মীয় আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং পরে জানা যায় যে শহরের একটি পানির ফোয়ারায় একটি অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়। শত শত রুগী ঐ স্থানে আরোগ্য লাভের জন্য গমন করে এবং হাজার হাজার লোক ইহা দেখিবার জন্য গমন করে। দ্বিতীয়তঃ ইঙ্গ-পারস্য তৈল কোম্পানীর একজন মার্কিন কর্মচারীর প্ররোচনায় যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস কনসাল্ মেজর ইম্ব্রী ঐ অলৌকিক ঘটনাস্থলের ছবি তুলিতে যান। তথায় জনতা কর্তৃক তিনি নিহত হন, অথচ তাঁহার সঙ্গীর কিছুই হয় নাই। সরকারী অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, পুলিশ ঘটনাটিকে অন্যভাবে বিচার করে এবং তাহারা মার্কিনীটিকে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করে নাই। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে আরেকটি কেলেঙ্কারী সংঘটিত হয় যাহাকে আমেরিকান টিপট ডোম স্ক্যাণ্ডাল (American Teapot Dome Scandal) নামে অভিহিত করা হয়, যাহাতে সিনক্লেয়ার কোম্পানীও বিজড়িত। পরিকল্পনায় ব্যর্থতার ব্যাপারে এই সব ঘটনাবলী কতটুকু দায়ী তাহা সহজেই অনুমেয়। তবে উল্লেখযোগ্য এই যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে উত্তরাঞ্চলের তৈলের বিষয়টি আর উত্থাপিত হয় নাই।

রেজাশাহ্ পাহ্লভী

উত্তর-ইরানে মার্কিনীদিগকে জড়িত করিবার পারস্য সরকারের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়, তবে এতদ্বারা আমেরিকার রাষ্ট্রীয় বিভাগের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ডঃ আর্থার মিল্স্ পাফ্কে ইরানের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা নিয়োগ করা সম্ভব হয়। ডঃ মিলস্ পাফ্ ও তাঁহার দল ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে ইরান আগমন করেন এবং পাঁচ বৎসরের জন্য ইরানে কাজকর্ম সুসম্পন্ন করেন। মিলস্ পাফের অর্থনৈতিক নীতিমালার কল্যাণে যুদ্ধমন্ত্রী রেজা খান সেনাবাহিনীকে সুসংগঠিত ও প্রশিক্ষণ দান করিবার জন্য যথেষ্ট অর্থ লাভ করেন। বিদ্রোহ দমন, গোত্রগুলিকে নিরস্ত্রীকরণ এবং দেশের প্রত্যেক অঞ্চল কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাভুক্ত করিবার কাজে রেজা খান এই সেনাবাহিনী ব্যবহার করেন। এই কাজে নৃশংস পন্থা অবলম্বন করা হয়, তবে রাস্তাঘাট দস্যু মুক্ত হয় এবং বিগত এক শতাব্দীর মধ্যে এই প্রথম

পূর্ণ বোঝা লইয়া কাফেলাসমূহ দ্বিধাহীন চিত্তে দেশের সর্বত্র বিচরণ করিতে সক্ষম হয়। সারা জীবন দস্যুতস্করের ভয়ে সন্ত্রস্ত বসবাসকারী জনসাধারণের নিকট ভোটের নিরাপত্তার চাইতে জীবনের নিরাপত্তাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবরে রেজা খান প্রধান মন্ত্রী হন। বিপ্লবের পর এই প্রথম একজন সামরিক ব্যক্তি সরকারের প্রধান হন। বস্তুতঃ এই সময় প্রদেশসমূহের অধিকাংশ গভর্ণরগণই সামরিক ব্যক্তি, এবং যাহারা বেসামরিক গভর্ণর তাঁহারাও তাঁহাদের স্ব স্ব এলাকার সামরিক অধিনায়কদের প্রভাবাধীন থাকেন। মজলিশের পঞ্চম বৈঠকের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় প্রায় সামরিক গভর্ণর বা অধিনায়কদের প্রভাবাধীনে। অনেক দিক হইতেই ইহা ইরানের আধুনিক ইতিহাসে অত্যন্ত ঘটনাবহুল বৈঠক। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে ইহাই শেষ বৈঠক, যেখানে প্রতিনিধিগণ তাঁহাদের বক্তব্য পেশ করিতে সাহস করিয়াছেন।

নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, পারস্য বিপ্লবে রেজা খানের ভূমিকা ছিল ফরাসী বিপ্লবের জন্য নেপোলিয়নের ন্যায়। রেজা খান বিপ্লবের সন্তান আবার ইহার সমালোচকও। তিনি বিপ্লবের অনেক উদ্দেশ্য বিশ্বাস করেন, কিন্তু ইহার প্রক্রিয়ায় নহে। পঞ্চম মজলিশে তিনটি দল দৃষ্ট হয়: সংস্কারবাদীগণ যাঁহারা রেজা খানের কর্মসূচী ও প্রক্রিয়া উভয়টি সমর্থন করেন; সমাজতান্ত্রিক দল, যাঁহারা তাঁহাকে সমর্থন করেন কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাঁহাকে প্রভাবান্বিত করিতে চান; এবং আলেম মুডারেসে মতাবলম্বী অর্ধ ডজন "সংখ্যালঘু" যাঁহারা বিভিন্ন কারণে রেজা খানের বিরোধিতা করেন। অবশিষ্টগুলি স্বতন্ত্র।

রেজা খান প্রধান মন্ত্রী হইবার পরেই আহমদ শাহ তাঁহার স্বাভাবিক সফরের একটা অংশ হিসাবে ইউরোপ গমন করেন। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে একটি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথাবার্তা উঠে এবং সামরিক অধিনায়কদের প্ররোচনায় দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে তারবার্তা আসিতে থাকে; যাহারা মজলিশকে কাজার বংশকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার জন্য বলা হয়। কাজারের বিরুদ্ধে সমালোচনা যথেষ্ট শোনা যায়, কিন্তু প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বেশ মত বিরোধ দেখা দেয়। মজলিশের ভিতরে ও বাহিরে

প্রজাতন্ত্রের উদ্যোক্তা দেখা যায় উদারপন্থী, মধ্যমপন্থী, সামরিক লোকজন ও অন্যান্য লোকদের মধ্যে। এই প্রস্তাবনার বিরোধী হইলেন উলামাগণ ও বাজারের দোকানদারগণ যাহারা সাধারণতঃ উলামাদের সমর্থন করেন। উলামাদের সহিত একমত থাকেন আলেম সমাজ বিরোধী ক্ষুদ্র সংখ্যক উদারপন্থীগণ, যাঁহারা আদর্শগতভাবে প্রজাতন্ত্রের সমর্থক, কিন্তু গণতন্ত্র ও বেসামরিক শাসনের আদর্শের প্রতি যাঁহাদের একনিষ্ঠতার দরুন তাঁহারা এই বিশেষ আন্দোলনের বিরোধী—কারণ ইহা একজন "একনায়ক ও একজন কোসাক" দ্বারা পরিচালিত।

তেহরানে জনসাধারণ আলেম সমাজের প্রভাবাধীন, তাই তাহারা প্রজাতন্ত্র ও রেজা খানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। যুবক উলামা বিরোধী কবি ইশকীর হত্যা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেয়। এই কবি রেজা খানের একনায়কত্ব ও তাঁহার "বিভ্রান্ত প্রজাতন্ত্রের" উপর বিদ্রূপাত্মক কবিতা লেখেন। দেয়ালের লিখন বুঝিবার মত যথেষ্ট জ্ঞান রেজা খানের ছিল। তিনি দ্রুত তেহরানের দক্ষিণে অবস্থিত দরগাহ নগরী কোমে গমন করেন এবং প্রধান ধর্মীয় নেতাদের সহিত বাক্যালাপ করিয়া একটি ঘোষণা জারী করেন। ঘোষণায় বলা হয় যে পারস্য সরকারের কর্মসূচীর ভিত্তি যেহেতু ইসলামের প্রতিরক্ষা, তাই তিনি ও ধর্মীয় নেতাগণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তাঁহারা জনসাধারণকে "প্রজাতন্ত্রের আলোচনা বন্ধ করিতে বলিবেন, এবং তৎপরিবর্তে···ইসলামের ভিত্তি ও দেশের স্বাধীনতা মজবুত করিতে আমাকে জনগণ সাহায্য করিবে।"

প্রজাতন্ত্র আন্দোলনের ব্যর্থতার দ্বারা কাজার বংশ রক্ষা পায় নাই। শাহ্ প্যারিস হইতে রেজা খানকে প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে বরখাস্ত করেন এবং মজলিশকে আরেকজনের নাম সুপারিশ করিবার জন্য বলেন। মজলিশ শাহের ইচ্ছা অমান্য করিয়া রেজা খানের জন্য সুপারিশ করে। রেজা খান সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ ক্ষমতা করায়ত্ত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। সদস্যবৃন্দকে তাঁহার গৃহে আহ্বান করিয়া আহমদ শাহকে বরখাস্ত ও রেজা খানকে সামরিক রাষ্ট্রপ্রধান করিয়া একটি প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করেন। একটি স্থায়ী পরিষদ গঠনের জন্য গণপরিষদের সভা আহ্বান করার কথাও প্রস্তাবে উল্লেখ থাকে। সদস্যদের অধিকাংশই এই দলিলে স্বাক্ষর করেন। ১৯২৫

খ্রীস্টাব্দে ৩১শে অক্টোবর মজলিশ কাজার বংশকে ক্ষমতাচ্যুত করে এবং একটি গণপরিষদের সভা আহ্বান করে।

মাত্র চারিজন সদস্য সাহস করিয়া প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ইহাদের মধ্যে ইয়াহ্ইয়া দৌলতাবাদী রাজনীতি ত্যাগ করেন। ডঃ মোহাম্মদ মোসাদ্দেক কিছুকালের জন্য ইরানের মধ্যেই রাজনৈতিক অন্তরীণাবদ্ধ থাকেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যথেষ্ট ক্ষমতা লাভ করেন; তাকীজাদা ও আলা নতুন শাহের অধীনে গুরুত্বপূর্ণ পদ অধিকার করেন। এখানে প্রণিধানযোগ্য যে তাঁহাদের বক্তৃতার মধ্যে কেউই আরাম প্রিয় আহমদ শাহ্ বা তাঁহার ভ্রাতা শাহজাদাকে সমর্থন করেন নাই। সকলেই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন শুধু এই জন্য যে ইহা "শাসনতন্ত্র বিরোধী"। শুধু শাসনতান্ত্রিক আইনবিদ ডঃ মোসাদ্দেক ব্যাখ্যা করেন যে কার্যবিহীন শাসনতান্ত্রিক বাদশাহ্ হইবার চাইতে রেজার একজন কর্মক্ষম প্রধান মন্ত্রী হওয়া দেশের জন্য অনেক মঙ্গল। রেজা খান যদি কর্মক্ষম বাদশাহ হন তবে তিনি একজন একনায়ক হইয়া বসিবেন, শাসনতান্ত্রিক বাদশাহ্ নহেন।

মজলিশের উদার ও সমাজতান্ত্রিক দলসমূহ, প্রস্তাবে স্বাক্ষর প্রদান করিলেও ডঃ মোসাদ্দেকের সহিত একমত হন কিন্তু তাঁহারা সমস্যার যথাযথ সমাধান পাইয়াছেন বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের স্বাক্ষরের বিনিময়ে রেজা খান বাদশাহ্‌র পদকে নির্বাচনমূলক করিবার অঙ্গীকার করেন। তাঁহারা মনে করেন যে পশ্চাৎ দ্বার দিয়া হইলেও তাঁহারা একটি প্রজাতান্ত্রিক সরকার গঠনে সক্ষম হইয়াছেন এবং তাহারা ইহাতেই সন্তুষ্ট। অবশ্য ডিসেম্বর মাসে গণপরিষদের সভা বসিলে দেখা গেল নির্বাচনমূলক শাহের কোন উল্লেখই নাই, তৎপরিবর্তে একটি পাকাপোক্ত বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতন্ত্রীদের নেতা সোলাইমান ইস্কান্দরী রাগান্বিত হইয়া যান, কিন্তু তখন এত বিলম্ব হইয়া গিয়াছে যে তাঁহার আর কিছুই করিবার নাই। ১৯২৫ খ্রীস্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর ইরান একজন নতুন বাদশাহ লাভ করে—রেজাশাহ্ পাহলভী।

রেজাশাহ ও সংস্কার

রেজাশাহ্ সাধারণ্যে জনপ্রিয়, কারণ তাঁহার সামরিক ক্ষমতা দেশে নিরাপত্তা আনয়ন করিয়াছে। দস্যুদের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার জন্য গ্রামের

লোকদিগকে আর অস্ত্র বহন করিতে হয় না। শাহের প্রচণ্ড আঘাত পড়ে গোত্রীয় নেতা ও উচ্চপদস্থ লোকদের উপর, কৃষকদের উপর নহে। শিক্ষিত সমাজ ও উদারপন্থীদের মধ্যেও তিনি জনপ্রিয়। কারণ তিনি একজন খাঁটি সংস্কারক এবং সর্বান্তকরণে ইরানকে পাশ্চাত্য সভ্যতায় গড়িয়া তুলিতে আগ্রহী। তিনি প্রধান মন্ত্রী হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সংস্কার আরম্ভ করেন এবং ১৫ বৎসরেরও অধিক কাল তাহা চালু রাখেন।

সমগ্র জীবনে সেনাবাহিনী তাঁহার বিশেষ আগ্রহের পাত্র হিসাবে বিরাজ করে। ইহার চাহিদা মিটাইবার জন্য তিনি তৈলের সালামীর টাকা ব্যয় করেন, এবং ইহার লোকবলের চাহিদা মিটাইবার জন্য চালু করেন বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা। এই সেনাবাহিনীর মাধ্যমেই তিনি তাঁহার অধিকাংশ সংস্কার চালু করেন। তিনি রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন, বেতার ব্যবস্থা স্থাপন করেন এবং বৃটিশদের নিকট হইতে টেলিগ্রাফ কোম্পানীর ব্যবস্থা হস্তগত করেন। যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তাঁহার সর্বোচ্চ গৌরব হইল ক্যাস্পিয়ান হইতে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত একটি রেলপথ নির্মাণ। এই সুদৃঢ় পরিকল্পনা ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে আরম্ভ হইয়া ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। চিনি ও চায়ের উপর বিশেষ করের সাহায্যে তিনি ইহা বাস্তবায়িত করেন এবং ইহার জন্য কোন বিদেশী ঋণ তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হয় নাই। রেজা ব্যক্তিগত ব্যবসা রহিত করেন নাই, কিন্তু বিদেশী ব্যবসা একচেটিয়া করেন এবং প্রত্যেক বাণিজ্যকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ মানিয়া চলিতে বাধ্য করেন। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি ইরানের জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেন এবং বৃটিশ ইম্পেরিয়াল ব্যাঙ্ক-এর নিকট হইতে ব্যাঙ্ক নোট চালু করিবার সুবিধা প্রত্যাহার করেন। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি রাষ্ট্র বহির্ভূত নীতি বিলোপ করেন।

বাদশাহ হইবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উলামাদের ক্ষমতা খর্ব করেন। ধর্মীয় ওয়াক্‌ফসমূহ তাঁহাদের হাত হইতে কাড়িয়া লওয়া হয়, পাশ্চাত্য আইনের স্বপক্ষে কিছু কিছু ইসলামী আইন বিলোপ করা হয়, এবং সরকারী বিদ্যালয়সমূহে ইসলামী শিক্ষা বাদ দেওয়া হয়। ইসলামী চান্দ্রপঞ্জিকা রহিত করা হয় এবং তদস্থলে পুরাতন পারস্য-জরথুস্ত্রের সৌর পঞ্জিকা ইহার মাস ও বৎসরের পারস্য নাম সহকারে চালু করা হয়। রসুলুল্লাহর পৌত্র হোসেনের মৃত্যু উপলক্ষে উদযাপিত এক মাসের শোক পালন তিন সপ্তাহে

সীমাবদ্ধ করা হয় এবং তাহাও ধর্মীয় শোভাযাত্রা ছাড়াই উদযাপন করা হয়। চেয়ার প্রবর্তন করিয়া কিছু সংখ্যক মসজিদকে "আধুনিকী" করা হয়। নামাজের আজানে বিরক্তি প্রকাশ করা হয় এবং মক্কায় হজ্ব যাত্রায় নিরুৎসাহিত করা হয়।

রেজাশাহ সমস্ত উপাধি বিলোপ করেন এবং জনসাধারণকে পারিবারিক নাম বাছিয়া লইতে বলা হয়। তিনি স্বয়ং প্রাক-ইসলামী পারস্যের ইতিহাসে সম্মানিত পাহলভী নাম গ্রহণ করেন। তিনি আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তন করেন এবং বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠা করেন ও ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইউরোপীয় পোশাকের স্বপক্ষে তিনি পারস্য পোশাক শিরস্ত্রাণ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি পুরুষদের তালাক দিবার ক্ষমতা রহিত করেন এবং ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে মহিলাদের পর্দা-প্রথা বিলুপ্ত করেন। তিনি ফার্সী একাডেমী প্রতিষ্ঠা করেন, যাহার প্রধান দায়িত্ব হইল ফার্সীভাষা হইতে সমস্ত ধার করা আরবী শব্দ বাদ দেওয়া। এই সকল কিছুতে এবং অন্যান্য সংস্কারে তিনি শক্তি প্রয়োগ করেন। সংস্কারের সমালোচকদের মুখ বন্ধ করিবার জন্য তিনি সমস্ত সমালোচনা বন্ধ করিয়া দেন, পত্রিকার সংখ্যা মাত্র কয়েকটিতে সীমাবদ্ধ হইয়া যায়। হাত-পা বন্ধ মজলিশের সদস্যবৃন্দ মহামান্য শাহানশাহ্‌র স্তুতিগান করিতে থাকেন মাত্র।

পারস্যের তৈল : তৃতীয় পর্ব

পারস্য সরকার কর্তৃক উত্তর-ইরানের তৈলের সহিত মার্কিনদিগকে জড়িত করিবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর ইঙ্গ-পারস্য তৈল কোম্পানী দেশের তৈল আহরণ করিবার একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। কারিগরী বিশেষজ্ঞগণ ছাড়া ইরানে কোম্পানীর অধিকাংশ প্রশাসনিক গ্রহণ করা হয় ভারত সরকারের নিকট হইতে। এই সকল ব্যক্তিবর্গ তাহাদের পৈতৃক আধিপত্যের মনোভাবও তাহাদের সঙ্গে লইয়া আসে এবং ভারতীয়দের ন্যায় পারস্যবাসীদের সঙ্গেও অনুরূপ ব্যবহার আরম্ভ করে। অনেকদিন যাবত কোম্পানীর সমস্ত লেনদেন ভারতীয় টাকায় সম্পন্ন হয় এবং শ্রমিকদিগকেও ঐ মুদ্রা প্রদান করা হয়।

ইরানে রেজাশাহ্‌র অধীনে একটি শক্তিশালী জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত

হইবার পর তৈল কোম্পানীর এই প্রশাসন এবং সরকারের সহিত এই সম্পর্ক বেশীদিন টিকিতে পারে না। ১৯২৮ খ্রীস্টাব্দে একটি নতুন রাস্তা উদ্বোধন করিবার জন্য শাহ্ খুজিস্তান গমনকালে তিনি কোম্পানীর তৈল প্রতিষ্ঠানসমূহ সফর করিবার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। তৎপরিবর্তে তিনি তাহাদিগকে এই মর্মে এক বাণী প্রদান করেন যে কোম্পানীর বিরাট লাভের অংশ হইতে ইরান যে "যৎসামান্য দান" লাভ করে তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট নহেন এবং তাই তিনি ডি' আর্কির অনুমতিপত্র (D' Arcy Concession) পুনর্বিবেচনা করিতে চান। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে সুদীর্ঘ আলাপ-আলোচনা চলাকালে তৈলের সালামী অনেক কমিয়া যায় এবং পারস্য সরকার তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে নভেম্বর অর্থমন্ত্রী তকীজাদা কোম্পানীর নিকট এক পত্রে ডি' আর্কির অনুমতিপত্র নাকচ ঘোষণা করেন। ইহার কারণ স্বরূপ বলা হয় যে শাসনতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বের কোন অনুমতিপত্র মানিয়া চলিতে এই সরকার বাধ্য নহে। পত্রে আরও উল্লেখ করা হয় যে সরকার একটি নতুন অনুমতিপত্র বিবেচনা করিতে ইচ্ছুক। বৃটিশ সরকার এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি জানায় এবং বিষয়টি জাতিপুঞ্জে যায়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দে শাহের অসময় হস্তক্ষেপের ফলে বিচারালয়ের বাহিরেই ব্যাপারটির মীমাংসা হয়। তিনি অধৈর্য হইয়া উঠেন এবং ব্যক্তিগতভাবে একটি নতুন চুক্তি সম্পাদন করেন, যাহা বাহ্যিক দৃষ্টিতে ইরানের জয় ঘোষণা করিলেও শেষ পর্যন্ত ডি' আর্কির অনুমতিপত্রের চাইতেও নিকৃষ্ট বলিয়া প্রমাণিত হয়। চুক্তির ফলাফল সম্পর্কে শাহ অনবহিত ছিলেন এবং কেউ তাঁহাকে বাধা দিতেও সাহস করে নাই।

১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দের অনুমতিপত্রে ইরানের জন্য দুইটি বাহ্যিক সুবিধা পরিদৃষ্ট হয়, যদ্বারা রেজা শাহ্ সন্তুষ্ট হন। অনুমতিপত্রের সীমা বেশ ছোট করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু কোম্পানীও ঐ এলাকায় সম্পূর্ণ ভূতাত্ত্বিক পরীক্ষা চালায় এবং দেখে যে তাদের আওতাভুক্ত এক লক্ষ বর্গ মাইলের মধ্যেই প্রায় সম্পূর্ণ তৈল বিদ্যমান। দ্বিতীয়তঃ উৎপাদিত প্রতি টন তৈলের উপর সালামী ধার্য করিবার ফলে মন্দা সময়ের জন্যও ইরানের একটি সুনির্দিষ্ট আয়ের বন্দোবস্ত হইয়া যায়, কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে ইরানের [illegible]

সাধারণ শেয়ারের মালিকদের ন্যায় ২০ শতাংশ মুনাফাই ভোগ করিবে। নতুন বন্দোবস্তে ইরানের সমধিক ক্ষতি হয় দুই দিক হইতে। এক ধারা অনুযায়ী কোম্পানীকে সমস্ত কর হইতে রেহাই দেওয়া হয়, এবং অন্য ধারা অনুযায়ী অনুমতিপত্রের সময়সীমা ১৯৩৩ খ্রীস্টাব্দ হইতে ৬০ বৎসরের জন্য ধার্য করা হয়; যাহা পূর্বের অনুমতিপত্রের চাইতে ৩০ বৎসর বেশী।

রেজা শাহের সংস্কারের পুনর্মূল্যায়ন

অনেক লেখক রেজা শাহের সংস্কারকে আতাতুর্কের সংস্কারের সহিত তুলনা করেন; আবার অনেকে এমনও বলেন যে রেজা শাহ্ তুর্কী সংস্কারকের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন মাত্র। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তাহাই মনে হয়, এবং সম্ভবতঃ তিনি তুর্কী একনায়কের দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন। কিন্তু ইহার দ্বারা এই দুই ব্যক্তির পার্থক্য, বিশেষতঃ দুই দেশের পার্থক্য বাধাগ্রস্ত হওয়া উচিত নহে। বস্তুতঃ রেজা শাহের কোন শিক্ষাদীক্ষা নাই। পৃথিবী সম্পর্কে কোন জ্ঞান নাই এবং কোন সুচিহ্নিত কর্মসূচীও নাই। তিনি কোন দল গঠন করেন নাই, কোন বক্তৃতা প্রদান করেন নাই এবং প্রচার করিবার মত কোন মতাদর্শ তাঁহার নাই। ইরানের সংস্কার নির্বাচন, তাঁহার উপদেষ্টাদের পরামর্শ, তাঁহার ক্ষমতার প্রতি মোহ এবং তাঁহার ব্যক্তিগত মনোভাবের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত।

অধিকন্তু, সম্পদের প্রতি, বিশেষতঃ খাস জমির উপর রেজা শাহের দুর্দমনীয় স্পৃহা ছিল। রেজা শাহ মারা যাইবার সময় দেখা যায় তিনি দেশের ইতিহাসে শুধু সর্ববৃহৎ জমির মালিকই নহেন, বরং একজন হোটেল ও কারখানার মালিকও বটে। তিনি এই ব্যাপারে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে যাহাই তিনি করিতেছেন তাহা দেশের মঙ্গলার্থেই করিতেছেন। ইহা কতকাংশে সত্য, কিন্তু এই সব জায়গাজমির ব্যবস্থাপনার জন্য তাঁহাকে অন্যদের উপর নির্ভর করিতে হয় যাহারা আবার নিজেদের জন্য ব্যবসা একচেটিয়া করে এবং জমি করায়ত্ত করে। রেজা শাহ কর্তৃক সেনাবাহিনীকে অতি প্রাধান্য দিবার ফলে বেশ কিছু সংখ্যক অত্যাচারী সামরিক অফিসারের সৃষ্টি হয়, যাহারা জনসাধারণের উপর বিশেষতঃ প্রদেশসমূহে নিজেদের সুবিধার্থে দমননীতি চালান। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে যুদ্ধের

ঘনঘটা পুঞ্জীভূত হইতে আরম্ভ করিলে যে সেনাবাহিনীকে তিনি লালনপালন করেন তাহাই শেষ পর্যন্ত তাঁহার পতনের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। নিজের অবস্থা সুদৃঢ় করিবার জন্য এবং একনায়কত্ব আরও সুদক্ষ করিবার জন্য তিনি হিটলারের সাহায্য প্রার্থনা করেন। হিটলার সানন্দে উপদেষ্টা দল প্রেরণ করেন। সম্ভবতঃ তাঁহার কোসাক ব্রিগেডের অভিজ্ঞতা থাকার ফলে তিনি সমগ্র জীবন ধরিয়া রুশদের উপর বিরক্ত ছিলেন। তৈল ও অন্যান্য বিষয় লইয়া বৃটিশদের সহিত তাঁহার বিবাদ ছিল, কিন্তু সেগুলির একটা সমাধান করা হইত। ইরান ও তুরস্কের ভিতর পুরাতন শত্রুতা থাকা সত্ত্বেও শাহের অধীনে তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয় এবং তাহা বেশ স্থায়ী হয়। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক ও তুরস্ক মিলিয়া সা'দাবাদ চুক্তি স্বাক্ষর করে, যাহা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সেণ্টোর (CENTO) অগ্রদূতহয়।

এতদসত্ত্বেও রেজা শাহ একজন সংস্কারক—যাঁহার শিক্ষাহীনতা তাঁহাকে পাশ্চাত্য সভ্যতার চাক্‌চিক্যের পূজারী করিয়া তোলে, ইহার মূল তত্ত্বে নহে। ইউরোপে অসংখ্য ছাত্রকে অধ্যায়নের জন্য প্রেরণ করিয়া তিনি তাঁহার উপদেষ্টাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন, কিন্তু শিক্ষার্থীগণ ফিরিয়া আসিলে তিনি তাহাদের মতামত ব্যক্ত করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করেন। গণতন্ত্রের বাহ্যিক খোলস তিনি রক্ষা করেন এবং গুটিকয়েক মজলিশের সদস্যই সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অবশ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা, বাণিজ্য, শিল্প ও শিক্ষাক্ষেত্রে বেশ উন্নতি সাধিত হয়। একটি নতুন দলের সৃষ্টি হয় যাহারা নতুন যুগের ব্যবসায়ী ও কন্ট্রাক্টারে পরিণত হয়। পুরাতন খেতাবসমূহ বাতিল করা হয় এবং এই সকল খেতাবধারীদের অনেকেই গণজীবন ত্যাগ করেন। সদ্যোত্থিত নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাঁহাদের শিক্ষার দ্বারা "ডক্টর" বা "মোহান্দ" (ইঞ্জিনিয়ার) জাতীয় নতুন উপাধি ধারণ করে। শেষ পর্যন্ত এই সকল লোকজন ইরানের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে রেজা শাহকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করে।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মধ্যপ্রাচ্য

পূর্ববর্তী যুদ্ধের তুলনায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অতি অল্প সংঘর্ষই মধ্যপ্রাচ্যে সংঘটিত হয়। তাহা সত্ত্বেও, ইহার সুকৌশল অবস্থান ও তৈল সম্পদ ইহাকে সর্বদাই চরম অবস্থায় রাখে।

তুরস্ক ইহার নিরপেক্ষতা ঘোষণা করে এবং প্রায় শেষ পর্যন্ত তাহা বজায় রাখিতে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্বে ইউরোপকে দ্বিধাবিভক্তকারী আদর্শগত সংঘর্ষে তুর্কীগণ যোগদান করে নাই। তাহারা কমিউনিষ্ট নহে বা ফ্যাসিষ্টও নহে বা তাহারা সমাজতন্ত্রী অথবা পুঁজিবাদীও নহে। তুরস্কের শাসকবৃন্দ সামরিক লোক, বুর্জোয়া ও বুদ্ধিজীবী, যাহারা মনেপ্রাণে জাতীয়তাবাদী। ইউরোপের প্রধান দেশ-সমূহের প্রতি তুর্কী মনোভাব তিনটি ধারায় ব্যাখ্যা করা যায়। ঐতিহাসিকভাবে তুর্কীগণ রাশিয়ার প্রতি আস্থাহীন, অর্থনৈতিক কারণে তাহারা জার্মানীকে তথা তাহাদের ব্যবসা পছন্দ করে, এবং সাংস্কৃতিক-ভাবে তাহারা গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রতিষ্ঠানসমূহ ও জীবনধারায় প্রলুব্ধ হয়।

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে রুশ-জার্মান চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার সময় তুর্কীগণ প্রণালীর ভাগ্য লইয়া সন্দিহান হইয়া পড়ে। তুরস্কের বৈদেশিক মন্ত্রী শুকরু সারাজগলু মস্কো গমন করেন কিন্তু শূন্য হাতে ফিরিয়া আসেন, কারণ রুশগণ চায় যে তুরস্ক প্রণালী বন্ধ করিয়া দিক এবং জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করিবার প্রতিশ্রুতি দিক। তুরস্ক ইহা গ্রহণ করিতে পারে নাই এবং তৎপরিবর্তে গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত একটি পারস্পরিক

সহযোগিতামূলক চুক্তি সম্পাদন করে, যদ্দারা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বৈরীভাব পোষণ করিবার কোন অভিপ্রায় তুরস্কের থাকে না। ভূমধ্যসাগরে যুদ্ধ ছড়াইয়া পড়িলে তুরস্ক বৃটেন ও ফ্রান্সকে সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইলেও, মুসোলীনি যুদ্ধে জড়াইয়া পড়িলে তুরস্ক চুক্তির দায়িত্ব এড়াইয়া যাওয়াই শ্রেয় মনে করে।

১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে জার্মানী কর্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হইলে তুরস্কে প্রায় প্রথম মহাযুদ্ধের স্থায় একটি অবস্থার স্থষ্টি হয়। ইহাতে গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়া জার্মানীর বিরুদ্ধে একত্রিত হয়। এই দিকে হিটলারের সেনাবাহিনী বলকান এলাকা নিয়ন্ত্রণ করে এবং গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত সম্পাদিত সমস্ত চুক্তি বাতিল করিবার জন্য জার্মানী তুরস্কের উপর প্রবল চাপ স্থষ্টি করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাব্য বিজয়ীর অসন্তোষ অগ্রাহ্য না করিয়া তুরস্ক নির্লজ্জভাবে ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে জার্মানীর সহিত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং তদ্দারা বৃটেন ও ফ্রান্সের সহিত সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করে। কাঁচামাল বিশেষতঃ আকরজাত ধাতু (chrome ore) বিক্রয়ের জন্য একটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়।

প্রায় সমগ্র যুদ্ধকালে তুরস্ক গুপ্তচর ও কুটনীতির কেন্দ্রে পরিণত হয়। কারণ বিবাদমান দেশসমূহের নাগরিকবৃন্দ বিনা বাধায় এখানে যাওয়া আসা করিতে পারিত। অর্থনৈতিক দিক হইতে যুদ্ধ প্রবল চাপ স্থষ্টি করে। তুরস্কের সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য, যথা আকর, তৈল, ছাগলোম, তামাক প্রভৃতির ক্রেতা পরস্পর-বিরোধী দেশসমূহে বিত্তমান। বস্তুতঃ এক পক্ষকে ক্রয় হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য আরেক পক্ষ চড়া দামে এইগুলি ক্রয় করে। দেশে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার সমাগম হয়, কিন্তু আমদানীর জন্য এই মুদ্রা ব্যবহারের উপায় নাই। ইহার ফলে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয় এবং বাজেটে ঘাটতি পড়িয়া যায়। তদুপরি তুরস্ককে এক বিরাট সেনাবাহিনী পালন করিতে হয় এবং অর্থ সমাগমের জন্য ব্যক্তিবিশেষের আয়ের উপর একটি বিশেষ কর ধার্য করিতে হয়। প্রত্যেক প্রদেশে এই অর্থ নির্ধারণের জন্য বিশেষ কমিটিগুলিকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। মোটের উপর গ্রীক, আর্মেনীয়, ইহুদী ও বিদেশীদের উপর এই করের বোঝা এবং কর আদায় না করিলে অত্যাচারের আপৎ নিপতিত হয়। এই বর্ধিত কর এক বৎসরের

অধিক স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু ইহা তুরস্কের অ-তুর্কী নাগরিকদের মধ্যে একটি বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি করে, কারণ জরুরী অবস্থার মধ্যে ইহাদের স্কন্ধে সমস্ত দায়িত্ব চাপানো হয়।

তুরস্কের নেতৃবৃন্দ তুরস্ককে যুদ্ধের আওতামুক্ত রাখিবার জন্য যথেষ্ট উত্তম মনোভাব, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দান করেন। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ কোন্ পক্ষ জয়লাভ করিতেছে তাহা পরিষ্কার হইয়া যায় এবং তখন তুর্কীগণ অবসর গ্রহণের সুযোগ লাভ করে। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে জাতিসংঘ সনদের সদস্য হইবার জন্য তাহারা জার্মানী, ইতালী ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

মিসর

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে ইঙ্গ-মিসরীয় চুক্তির তিন বৎসর পরও গ্রেট বৃটেন প্রতিশ্রুতি মোতাবেক মিসর ত্যাগ করে নাই। সেপ্টেম্বরে যুদ্ধ আসিলে বৃটিশগণ চুক্তির শর্তসমূহ ব্যবহার করে এবং আরও অধিক সংখ্যক সৈন্য দেশে প্রেরণ করে। যুদ্ধের সময় মিসরীয়গণ বৃটিশদের যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহের কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করে নাই। কিন্তু চক্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার বৃটিশ দাবীর প্রতি মিসরীয় সরকার মাথা নত করে নাই। চক্রশক্তি জয়লাভ করিবে এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তাহারা বিজয়ীদের বিরক্তি উদ্রেক করে এমন কিছু করিতে চায় নাই। এই নীরব বাধায় বৃটিশ অসন্তুষ্ট হয়। নিয়তির নির্মম পরিহাস ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের বৃটিশগণ ট্যাঙ্ক বহর লইয়া কায়রোর আবদিন প্রাসাদ অবরোধ করে এবং একজন পুরাতন বৃটিশ বিরোধী প্রবক্তা ওয়াফদ্ পার্টির নাহাস পাশাকে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ অথবা দেশ ত্যাগ করিবার জন্য বাদশাহ ফারুককে চাপ প্রদান করে। ফারুক যদি বৃটিশ দাবী প্রত্যাখ্যান করিতেন তবে তিনি হয়ত আধুনিক মিসরের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক হইয়া উঠিতেন। কিন্তু তিনি আত্মসমর্পণ করেন। নাহাস পাশা অতঃপর বৃটিশদের সহিত সহযোগিতা আরম্ভ করেন।

নাহাস পাশা ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই পদ মর্যাদায় থাকেন, কিন্তু বাহ্যতঃ সরকারের মধ্যবর্তী দুর্নীতি দমন করিতে অথবা বাদশাহ ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে বিদ্যমান অস্থির অবস্থা দূরীভূত করিতে কোন প্রচেষ্টাই নেন

নাই। আল-আলামীনের যুদ্ধে জেনারেল রোমেলের পরাজয়ের দ্বারা জার্মান বিজয়ের হুমকি দূরীভূত হইলে এবং মার্কিনগণ উত্তর আফ্রিকায় অবতরণ করিলে বৃটিশদের নিকট নাহাস পাশার প্রয়োজন ফুরাইয়া যায়। বাদশাহ্ ফারুক এই সুবিধার সুযোগ গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে বরখাস্ত করেন। তিনি ওয়াফদ্ বিরোধী নেতা সা'দ পার্টি'র আহমদ মাহেরকে বাছিয়া লন এবং সরকার গঠন করিতে বলেন। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী একজন মিসরীয় যুবক কর্তৃক মাহের নিহত হন। সা'দ পার্টি'র দ্বিতীয় নেতা নুকরাশী পাশা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। দুইদিন পর তিনি জার্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। মিসরও পরে জাতিসংঘ সনদের সভ্য হয়।

ইরাক

১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে নূরী আল-সাঈদ ইরাকের প্রধান মন্ত্রী হন। পর পর পাঁচটি সামরিক অভ্যুত্থানের শেষ অভ্যুত্থানে তিনি ক্ষমতায় আসেন। তিনি বৃটিশদের সহিত সহযোগিতা করিবার পক্ষপাতী এবং গ্রেট বৃটেন ও ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানী হইতে ঋণ ও সালামীর অগ্রিম বাবত ৭০ লক্ষ পাউণ্ড গ্রহণ করে। এতদসত্ত্বেও তিনি জার্মানীর সহিত শুধু কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন, কিন্তু যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই। ইরাকে বৃটিশ বিরোধী জনমত এবং জার্মানীর সম্ভাব্য জয়লাভ এত প্রবল যে বৃটিশ সমর্থক ইরাকী সরকারও নিজকে খুব বেশী জড়িত করিতে সাহসী হয় নাই।

স্থানীয় রাজনীতি ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে নূরী আল-সাঈদকে জাতীয়তাবাদী রশীদ আল জিলানীর স্বপক্ষে প্রধান মন্ত্রীর পদে ইস্তাফা দিতে বাধ্য করে। প্যালেস্টাইনের সংগ্রামে ইরাক জড়িত হইয়া পড়ে, কারণ একে তো একটি "প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্র" একটি শত্রু জাতি কর্তৃক "আক্রান্ত" হয়, তদুপরি ইরাকের রাজকীয় পরিবার হাশেমীয় বংশের নেতৃত্বে ফার্টাইল ক্রিসেন্টের ঐক্য সৃষ্টিকারী "বৃহৎ সিরিয়া আন্দোলন" তখন পুরাদস্তুর চলিতেছে। স্মরণ করা যাইতে পারে যে প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য গ্রেট বৃটেন ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের কনফারেন্সে ইরাককে আমন্ত্রণ করে। অধিকন্তু জেরুজালেমের মুফতী এবং বৃটিশ বিরোধী উচ্চ আরব

কমিটির নেতা হজ আমীন আল হুসাইনী, যিনি লেবাননে পলায়ন করেন, তাঁহাকে বাগদাদে আশ্রয় দেওয়া হয়। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইন বিদেশী নিয়ন্ত্রণাধীন বিধায় ইরাক প্যান-আরববাদের কেন্দ্র হইয়া উঠে। হজ আমীন ইরাক সরকারের নিকট হইতে একটি মোটা অঙ্কের বৃত্তিলাভ করেন এবং প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন।

জাতীয়তাবাদী প্রধান মন্ত্রী রশিদ আল-জিলানী বৃটিশদিগকে বালফার ঘোষণা পরিত্যাগ এবং স্বাধীন আরব প্যালেস্টাইন ঘোষণা করিবার জন্য অকপটে চেষ্টা করেন। বিনিময়ে ইরাক মিত্রপক্ষে যোগদান এবং চক্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এই অনুরোধ রক্ষা করিতে বৃটেন অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে জিলানী ও তাঁহার সহ-জাতীয়তাবাদীগণ দৃঢ় আশা পোষণ করেন যে, চক্রশক্তির সহিত সহযোগিতা করিলে তাহারা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিবেন। হজ আমীন ইতিমধ্যে জার্মানীর সহিত যোগাযোগ করেন। জিলানী তাঁহার হাতে হাত মিলান এবং আঙ্কারায় নিযুক্ত জার্মান প্রতিনিধি ফন প্যাপিনের সহিত সংযোগ স্থাপন করেন।

বৃটিশগণ এই সকল কার্যকলাপ সহ্য করিতে পারে নাই এবং জিলানীকে বরখাস্ত করিবার জন্য তত্ত্বাবধায়ক আবদুল ইলাহ্‌কে নির্দেশ প্রদান করেন। প্রধান মন্ত্রী ইস্তফা দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে ইরাকী পার্লামেন্টে গোলযোগের সৃষ্টি হয়। অবশ্য রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির ফলে জিলানী জেনারেল তাহা আল-হাসেমীর স্বপক্ষে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল চারিজন সেনাবাহিনীর কর্ণেলের সহায়তায় জিলানী একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান। তত্ত্বাবধায়ক আবদুল ইলাহ্‌ এবং নূরী আল-সাঈদ সহ বেশ কিছু সংখ্যক মধ্যমপন্থী নেতা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বাদশাহকে লইয়া পলায়ন করেন।

এই অভ্যুত্থানে জার্মানদের হাত থাকিলেও তাহারা গ্রীসে এত ব্যস্ত ছিল যে ইহার কোন সুবিধাই তাহারা গ্রহণ করিতে পারে নাই। এই দিকে ইরাকীগণ হাব্বানিয়া বিমান ঘাঁটি অবরোধ করিয়া রাখে, আর ওদিকে বৃটিশগণ বসরায় সৈন্য অবতরণ করায়। চক্রশক্তির সমর্থক ফরাসী ভিসি সরকারের অধীনস্থ সিরিয়ার মধ্য দিয়া জার্মানগণ ইরাকে ৫০টি

বিমান অবতরণ করিতে সক্ষম হয়, কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। বৃটিশদের উদ্ধারের জন্য ট্রান্স জর্ডান হইতে আরব বাহিনী তখন পৌঁছিয়া গিয়াছে। "ত্রিশ দিনের যুদ্ধের" পরিণামে রশীদ আল-জিলানী জেরুজালেমের মুফতি হজ আমীন এবং তাঁহাদের আরও অনেক সমর্থক পরাজিত হন। তাঁহারা ইরানে পলায়ন করেন এবং সেখান হইতে তুরস্কের মধ্য দিয়া জার্মানী গমন করেন। যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তাঁহারা বিশেষতঃ মুফতী চক্রশক্তির স্বপক্ষে কাজ করেন। যুদ্ধের পর জিলানী ছদ্মবেশে একটি ফরাসী জাহাজে চড়িয়া বৈরুত গমন করেন, এবং সেখান হইতে মরুভূমি পাড়ি দিয়া সৌদী আরবের রাজধানী রিয়াদে পৌঁছেন। তথায় বাদশাহ ইবনে সউদ তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করেন। যুদ্ধের পর মুফতী প্যারিসে গৃহবন্দী হইয়া থাকেন। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে তিনিও ছদ্মবেশে একটি মার্কিন সামরিক বিমান যোগে কায়রো গমন করেন। তথায় বাদশাহ্ ফারুক তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করেন।

যুদ্ধের শেষ নাগাদ নূরী আল-সাঈদ প্রধান মন্ত্রী থাকেন। চক্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের মধ্যে ইরাক জাতি-সঙ্ঘের প্রথম সদস্য হইবার গৌরব অর্জন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকট যুদ্ধসামগ্রী প্রেরণ করিবার ব্যাপারে ইরাক অংশ গ্রহণ করে মধ্য-প্রাচ্যের অন্যান্য দেশের ন্যায় ইরাক বৈদেশিক মুদ্রায় সমৃদ্ধশালী হয়। কিন্তু নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের অভাবে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।

সিরিয়া-লেবানন

জার্মানগণ কর্তৃক ফ্রান্সে প্রতিষ্ঠিত ক্রীড়নক ভিসি সরকার ফরাসী ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব দাবী করে। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে নভেম্বরে ভিসি সরকার জেনারেল দেঁজকে হাই কমিশনার নিযুক্ত করিয়া সিরিয়া-লেবাননে প্রেরণ করিবার পূর্বে বহুসংখ্যক ফরাসী অফিসার ও সৈন্য স্বাধীন ফরাসী বাহিনীতে যোগদান করিবার উদ্দেশ্যে প্যালেস্টাইনে পলায়ন করে। জেনারেল দেঁজের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে সিরিয়া-লেবানন চক্রশক্তির স্বপক্ষে ও বৃটিশদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরের খোলাখুলি কেন্দ্রে পরিণত হয়।

সিরিয়া ও লেবাননীগণ ফ্রান্সের পতনকে তাহাদের স্বাধীনতা লাভের

একটি সুযোগ বলিয়া বিবেচনা করে। ফরাসী ফ্রাংকের অবমূল্যায়ন এবং ইহার ফলে উদ্ভূত অর্থনৈতিক বিপর্যয় সিরীয় ও লেবাননীদিগকে হরতাল ও রাজনৈতিক বিক্ষোভ সহকারে স্বাধীনতা দাবী করিবার সুযোগ প্রদান করে। জেনারেল দেঁজ জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে কার্যকরী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই।

ইরাকী বিদ্রোহে বৃটিশ অভিজ্ঞতার দ্বারা তাহারা সিরিয়া-লেবাননে জার্মান সমাবেশের রাজনৈতিক ভয়াবহতা ভালভাবে উপলব্ধি করে। ফলে ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে বৃটিশ ও স্বাধীন ফরাসী বাহিনী যথাক্রমে জেনারেল উইলসন ও জেনারেল কেঁত্র-র (General Catroux) অধীনে লেবানন ও সিরিয়া প্রবেশ করে। জেনারেল দেঁজ প্রবল বাধার সৃষ্টি করেন কিন্তু মিত্র বাহিনীর বৈরুত ও দামেস্কে প্রবেশ রোধ করিতে সক্ষম হন নাই। জুলাই-এ ভিসি ফরাসী বাহিনী আত্মসমর্পণ করে; যাহারা ফ্রান্স যাইতে চায় তাহাদিগকে যাইতে দেওয়া হয় এবং যাহারা থাকিতে চায় তাহাদিগকে থাকিতে দেওয়া হয়।

স্বাধীন ফ্রান্সের অধিনায়ক জেনারেল দ্য গলের প্রতিনিধি হিসাবে জেনারেল কেঁত্র লেবানন ও সিরিয়ায় নতুন গভর্ণর নিযুক্ত করেন। জাতীয়তাবাদীদিগকে ইহা সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই, তাহারা জাতীয় স্বাধীনতা দাবী করে। বৃটিশগণ কায়রোয় অবস্থিত মধ্যপ্রাচ্য সরবরাহ কেন্দ্রের (Middle East Supply Centre) মাধ্যমে সিরিয়া-লেবাননের অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণ করে। তাহারা এখন মুদ্রা পুনর্বিন্যাস করে এবং এই দুইটি এলাকাকে স্টার্লিং অঞ্চলের আওতাভুক্ত করিয়া লয়। ইহা দিবালোকের মত সত্য হইয়া দাঁড়ায় যে, বৃটিশগণ স্বাধীনতার দাবীতে জাতীয়তাবাদীদিগকে উৎসাহ প্রদান করে। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে সিরীয়গণ একটি নির্বাচন পরিচালনা করে এবং জাতীয়তাবাদী নেতা শুকরী আল-কুয়াতলীকে নতুন প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে। আগস্ট মাসে লেবাননীগণও ঐ একই পন্থা অনুসরণ করে এবং তাহাদের জাতীয়তাবাদী নেতা বিশার আল খুরীকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে বাছিয়া লয়।

জেনারেল দ্য গলের অধীনে স্বাধীন ফরাসী জাতি অন্যান্য ফরাসীদের মত ভূখণ্ড নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে অন্যথা করে নাই। তাহারা ক্ষমতা ত্যাগে

অনীহা প্রকাশ করে। ফলে ধর্মঘট ও বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। ফরাসীগণ লেবাননী প্রেসিডেণ্টকে গ্রেফতার করে এবং লেবাননীগণ দেশের সমস্ত ফরাসী অধিকার বাতিল করিয়া ইহার জবাব দেয়। গ্রেট বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র লেবাননী ও সিরীয়দিগকে সমর্থন করে। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয় প্রজাতন্ত্রকে স্বীকৃতি দান করে এবং তাহারাও প্রত্যুত্তরে ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের চক্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া জাতিসঙ্ঘ সনদের সদস্য হয়। এতদ্‌-সত্ত্বেও জেনারেল দ্য গল "ফরাসী আধিপত্যের" উপর জোর দেন এবং ফরাসী সেনাবাহিনী ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলের পূর্বে সিরিয়া ত্যাগ করে নাই। এবং একই বৎসরের ডিসেম্বর পর্যন্ত লেবাননে থাকিয়া যায়।

প্যালেস্টাইন

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় প্যালেস্টাইনের ইহুদীগণ যুদ্ধ পরিচালনার ব্যাপারে সর্বান্তকরণে বৃটিশদের সঙ্গে থাকে এবং ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের শ্বেতপত্র কার্যকরী করিবার ব্যাপারে বৃটিশদের বিরুদ্ধে থাকে। প্যালেস্টাইনের আরবদের ব্যাপারে এতটুকু বলা যায় যে, বৃটিশদের বিরাগভাজন বা যুদ্ধ প্রস্তুতি বানচাল করিবার ব্যাপারে তাহারা কিছুই করে নাই।

প্যালেস্টাইনকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবার জন্য সম্ভবতঃ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা ঘটে যুক্তরাষ্ট্রে। ঘটনাটি হইল ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে নিউ ইয়র্ক নগরীর হোটেল বিল্টমোরে অনুষ্ঠিত জরুরী ইহুদীবাদী কনফারেন্স। এই কনফা-রেন্সে পরিবর্তিত অবস্থার মোকাবিলা করিবার জন্য ইহুদীবাদী কর্মসূচী পুনর্নির্ধারণ করা হয় এবং ইহার পর হইতে ইহাকে "বিল্টমোর কর্মসূচী" নামে আখ্যায়িত করা হয়। কনফারেন্স বালফার ঘোষণার "মূল উদ্দেশ্য" বাস্তবায়িত করিবার আহ্বান জানায়, যাহার অর্থ করা হয় একটি স্বাধীন ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। ইহা ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে শ্বেতপত্র প্রত্যাখ্যান করে, ইহার নিজস্ব পতাকাতলে একটি ইহুদী সেনাবাহিনী গঠন সমর্থন করে, প্যালে-স্টাইনে সীমাহীনভাবে ইহুদীদের বাস্তত্যাগ চায় এবং প্যালেস্টাইনে ইহুদী বাস্তত্যাগীদের ব্যবহারের জন্য রাষ্ট্রীয় ভূমির উন্নতি সাধনে ইহুদী এজেন্সীকে ক্ষমতা ও সুযোগ প্রদানের দাবী জানায়।

বিল্টমোর কর্মসূচীর অধিকাংশ দাবী কোন নতুন কথা নয়, অবশ্য কিছু

নতুন অনুচ্ছেদ, বিশেষতঃ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারগুলি পূর্বে এমন পরিষ্কারভাবে বলা হয় নাই। অতঃপর ধুয়া উঠে "ইহুদী জাতীয় আবাসভূমির"—রাষ্ট্রের নহে। অবশ্য যাহা নতুন ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাহা হইল, বিল্টমোর কনফারেন্সের পর ইহুদীদের মনোভাব গ্রেট বৃটেনের উপর আস্থাশীলতার পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্রের উপর আস্থাশীল হইয়া উঠে। প্রায় ৩০ বৎসরের অস্থিরতা এবং অসম বৃটিশ-ইহুদী সহযোগিতা শেষ হইয়া আসে। যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধে যোগদান এবং ইহার প্রচণ্ড অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি এমন বাস্তব যাহা ইহুদীবাদীগণ অবহেলা করিতে পারে না। ১৯২০ ও ১৯৩০-এর কোঠায় বৃটিশ সাম্রাজ্য আংশিকভাবে ইহুদীবাদীদের উদ্দেশ্য সাধন করে। পরবর্তী যুগে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাহারা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সমর্থনের জন্য হাত বাড়ায়। বিল্টমোর কনফারেন্সে এই মনোভাব পরিবর্তনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদীবাদীদের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পায়। সে দেশের ইহুদী ও অ-ইহুদী সংগঠনগুলি বিল্টমোর কর্মসূচী বাস্তবায়নের দাবী জানায়। কংগ্রেসের উভয় পরিষদে ইহার উপর প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় এবং প্রধান জাতীয়, রাষ্ট্রীয় এবং এমন কি স্থানীয় পদের নির্বাচনে ইহুদী সমর্থক দেয়ালপত্র উভয় প্রধান দলের নির্বাচনী প্রচারণার অঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়।

ইহুদীদের মধ্যে বিরুদ্ধ মতামতও দেখা যায়। প্যালেস্টাইনে ইহুদ দলের (Ihud Party) সদস্যবৃন্দ বিরুদ্ধ আওয়াজ উত্থাপন করে। ইহাদের অধিকাংশ জেরুজালেমের হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেণ্ট জুদাস ম্যাগনাসের (Judas Magnus) নেতৃত্বে বুদ্ধিজীবীদল, দার্শনিক মার্টিন ব্যুবার ও অন্যান্যগণ, যাঁহারা খাঁটি ইহুদী রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেন। তৎপরিবর্তে তাঁহারা আরবদের সহিত আপোষ চান এবং একটি দ্বিজাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সমর্থন করেন। যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদী ধর্মের আমেরিকান পরিষদ (American Council for judaism) বিল্টমোর কর্মসূচীর বিরোধিতা করে। ইহার সদস্যবৃন্দ, যাহারা সকলেই ইহুদী, বিশ্বাস করে যে ইহুদী ধর্মের লক্ষ্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করিবার ন্যায় কোন জাতীয়তাবাদ নহে, বরং ইহা আধ্যাত্মিক মিলনের একটি ধর্ম। অ-ইহুদীদের মধ্যে প্যালেস্টাইনের আরবগণ, খ্রীস্টান ও মুসলমান—সকলেই বিল্টমোর কর্মসূচীর বিরোধী। অবশ্য তাহাদের কোন মুখপাত্র নাই, বিশেষতঃ তাহাদের

নেতা মুফতী একজন নাজী হইয়া গিয়াছেন। ট্রান্স জর্ডানের আমীর আবদুল্লাহ ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিকট আপীল করেন। আরবের বাদশাহ্ ইবনে সউদের সহিত প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের সাক্ষাতের এক বৎসর পর তিনি আমীর আবদুল্লাহ্‌র নিকট যে পত্র লিখেন তাহা ব্যক্ত করেন। ইহাতে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন যে, আরবদের ক্ষতি হয় এমন কোন সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিবে না।

যুদ্ধকালীন প্যালেস্টাইনের কোন আলোচনার মাধ্যমে ইউরোপে ইহুদীদের অবর্ণনীয় দুর্দশার কথা ভুলিয়া যাওয়া উচিত নহে। ইউরোপীয় ইহুদীদের নির্বংশ করিবার জন্য নাজীগণ যে ধারাবাহিক নীতি গ্রহণ করে তাহাতে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ইহুদী ও অ-ইহুদী সকলেই বিক্ষুব্ধ হয়। একদিকে পাশ্চাত্যের স্বাধীন দেশগুলি এই সকল ভাগ্যহতদের জন্য শুধু শুধু যেমন তাহাদের দ্বার উন্মুক্ত করে নাই, আবার অন্যদিকে ইহুদীবাদীগণও তেমনি এই সকল- বাস্তুত্যাগীদের ধূয়া তুলিয়া তাহাদের নিজস্ব রাষ্ট্র গড়িয়া তুলিবার দাবীকেও জোরদার করিয়া তোলে। কিছু ইহুদী এবং কিছু অ-ইহুদী গোপন সংস্থাসমূহ ইহুদী বাস্তুত্যাগীদিগকে ইউরোপ হইতে বাহির করিয়া প্যালেস্টাইনে আনিয়া বসায়। বৃটিশগণ যাহারা হয়ত তাহাদের ভূমিকা ঈষৎ পরিবর্তন করিতে পারিত, ইহুদী বাস্তুত্যাগ বন্ধ করিবার জন্য জোর জবরদস্তির আশ্রয় লয়। এই বাস্তুত্যাগীদের হাজার হাজার লোককে বৃটিশ গ্রেফতার করিয়া সাইপ্রাসের বিভিন্ন শিবিরে রাখে। এই সকল শিবির ইহুদীদিগকে নিশ্চয়ই নাজী-বন্দী শিবিরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

আরব লীগ

স্মরণ করা যাইতে পারে যে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষা করিবার এই ঐতিহ্যবাহী বৃটিশ নীতি ত্রিমুখী। একটি হইল রাশিয়ার দক্ষিণমুখী বিস্তৃতি বন্ধ করিবার জন্য ইহাকে একটি মধ্যম রাষ্ট্র (Buffer State) হিসাবে ব্যবহার করা, দ্বিতীয়টি হইল ভারতবর্ষের রাস্তা কণ্টকমুক্ত রাখিবার জন্য ইহাকে ব্যবহার করা এবং তৃতীয়টি হইল ইউরোপে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা করা। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল

তৈলাগারগুলির রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভবতঃ সমস্ত ভারসাম্য নষ্ট করিয়া দেয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় গ্রেট বৃটেন বাতিলকৃত ওসমানীয় সাম্রাজ্যের স্থলে ফারটাইল ক্রিসেণ্টে একটি সম্মিলিত বা সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের দ্বারা তাহার পুরাতন নীতি বহাল রাখিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তথাকথিত হোসেন-ম্যাক মাহন পত্রালাপের মাধ্যমে সংঘটিত চুক্তি অনুরূপ নীতির সরাসরি ফল। সাইক্স্-পিকট চুক্তি ও বালফার ঘোষণা অবশ্য এই নীতি বাস্তবায়নের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। ফারটাইল ক্রিসেণ্টে একটি সম্মিলিত বা সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের পরিবর্তে সউদী আরব এবং পারস্য উপসাগরের শেখ রাজ্যগুলি ছাড়াও পাঁচটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ফ্রান্সের পরাজয়ের ফলে বৃটিশ সৈন্যগণ ১৯১৭ খ্রীস্টাব্দের ন্যায় সমগ্র ফারটাইল ক্রিসেণ্ট নিয়ন্ত্রণ করে। সোভিয়েত ইউ-নিয়নের আগ্রাসন বন্ধ করিবার জন্য বৃটিশদের এখনও একটি মধ্যম রাষ্ট্র প্রয়োজন এবং ভারতবর্ষের রাস্তায় এখনও তাহাদের বন্ধুভাবাপন্ন লোক-জনের প্রয়োজন। অতএব, গ্রেট বৃটেনের পুরাতন নীতি পুনঃপ্রয়োগের মধ্যে আশ্চর্যের কিছুই নাই।

সেই ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে বৃটিশ সরকার প্যালেস্টাইনের উপর একটি সম্মেলন আহ্বান করে এবং প্রথমবারের মত আরব রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দকে ইহার মধ্যে জড়িত করে। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে মে বৃটিশ বৈদেশিক সচিব এন্থনী ইডেন আরব ঐক্যের প্রয়োজনের কথা ঘোষণা করেন এবং "বর্তমানের ঐক্যের চাইতে আরও শক্তিশালী ঐক্য" গঠন করিবার ব্যাপারে তাঁহাদের আগ্রহের কথা বলেন। একই বক্তৃতায় তিনি প্রতিশ্রুতি দান করেন যে, "মহিমান্বিতের সরকার তাঁহাদের দিক হইতে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত যে কোন পরিকল্পনায় পরিপূর্ণ সমর্থন দান করিবে।" ফারটাইল ক্রিসেণ্টের আরবীভাষী লোকদের মধ্যে প্যান-আরবীদের ভাবধারা তখনও বিরাজ-মান বলিয়া ইডেনের মন্তব্যগুলি বেশ গ্রহণযোগ্য হয়। এই আমন্ত্রণের প্রত্যুত্তরে ইরাকের নূরী আল-সাঈদ ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে ইরাক, প্যালেস্টাইন, ট্রান্স জর্ডান, সিরিয়া ও সম্ভবতঃ লেবাননের ঐক্যের প্রস্তাব করেন এবং আশা করেন যে, অন্যান্যগুলি পরে যোগদান করিবে। ইহাকে অনেকটা হাশেমীর বংশের "বৃহৎ সিরিয়া আন্দোলনের ন্যায় মনে হয় এবং তাই ইহা গ্রহণ

যোগ্য হয় নাই। মিসরের নাহাস পাশা পূর্বে প্যান-আরববাদের ব্যাপারে তেমন উৎসাহ প্রদান করেন নাই। তিনি এখন "আরব ঐক্যের ব্যাপারে পরামর্শ করিবার জন্য" একের পর এক আরব সরকারকে আমন্ত্রণ করিতে শুরু করেন। এক বৎসর স্থায়ী পরামর্শের মাধ্যমে সিরিয়া ও ইরাক একটি সংযুক্ত রাষ্ট্রের পরিকল্পনা করে, ট্রান্স জর্ডান, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া এবং সম্ভবতঃ লেবাননসহ একটি বৃহৎ আরব ঐক্যের কথা জোর দিয়া উত্থাপন করে, এবং মিসর, লেবানন, সউদী আরব ও ইয়ামন একটি সংযুক্ত রাষ্ট্রের কথা বিবেচনা করিতে পারে।

বিণ্টমোর কর্মসূচী আরবদিগকে ঐক্যের পথে কতটুকু বাধা প্রদান করিয়াছে বা বৃটিশদিগকে আরবদের ঐক্য আনয়নে কতটুকু উৎসাহিত করিয়াছে তাহা নির্ধারণ করা যায় না, তবে ইহার যে কিছু অবদান রহিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের ৭ই অক্টোবর উপরোল্লিখিত আটটি রাষ্ট্র আলেকজান্দ্রিয়া খসড়ায় (Protocal of Alexandria) দস্তখত করে। এই খসড়ায় তাহারা একটি আরব লীগ গঠন করিতে সম্মত হয়। আরব রাষ্ট্রসমূহের একটি লীগ বা দলের চূড়ান্ত চুক্তি কায়রোয় স্বাক্ষরিত হয় ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ২২শে মার্চ। ইহা একটি সংযুক্ত পরিকল্পনার সুপারিশ করে এবং অনেকাংশে জাতিসংঘ সনদ দ্বারা উৎসাহিত হয়। প্রত্যেক রাষ্ট্র সার্বভৌম, এবং লীগের সিদ্ধান্তসমূহ অবশ্য পালনীয় নহে। চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত তিনটি পরিশিষ্টের একটি প্যালেইস্টাইন সম্পর্কে। ইহা আইনগতভাবে প্যালেস্টাইনকে একটি স্বাধীন আরব রাষ্ট্র বলিয়া বিবেচনা করে, যে রাষ্ট্র তখনও ইহার অধিকার প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয় নাই। প্যালেস্টাইনের নিজস্ব প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার সময় না আসা পর্যন্ত এই চুক্তি লীগকে প্যালেস্টাইনের জন্য একজন প্রতিনিধি বাছিয়া লইবার ক্ষমতা প্রদান করে। যুদ্ধের শেষ নাগাদ এই প্রথমবারের মত আরব জাতীয়তাবাদ কঠোর ভিত্তিমূলক না হইলেও প্যালেস্টাইনে ইহুদীবাদী জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য একটি আইনানুগ সংগঠন লাভ করে।

ইরান

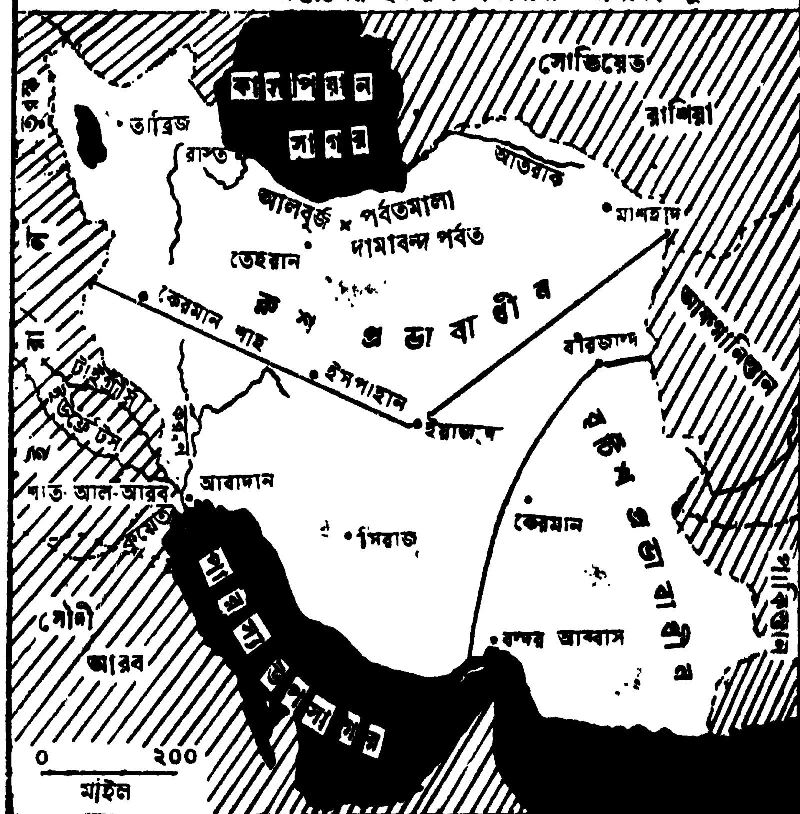
স্মরণ করা যাইবে যে রেজা শাহ্ তাঁহার শেষের বৎসরগুলিতে হিটলারের

সুযোগ্য একনায়কত্ব পছন্দ করেন। তিনি সম্ভবতঃ চিন্তা করেন যে নিজেকে বৃটিশ প্রভাব হইতে মুক্ত করিবার জন্য তিনি জার্মানদিগকে ব্যবহার করিতে পারেন। যাহা হউক, জার্মানী কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত কারিগরী সাহায্য ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ইরান তাহার কাজে লাগায়। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ ইরানের ৪১ শতাংশেরও অধিক বৈদেশিক ব্যবসা-বাণিজ্য জার্মানীর সহিত গড়িয়া উঠে এবং বহু সংখ্যক জার্মান ইঞ্জিনিয়ার ও কারিগর ইরানে আসে। এইগুলির সঙ্গে সঙ্গে নাজী প্রচারণা আসে এবং ফন শিরাচের (Von Schirach) ন্যায় নাজী যুব নেতাও শুভেচ্ছা সফরে ইরানে আসেন। প্রথমবারের মত পারস্য সেনাবাহিনী সংখ্যালঘু ধর্মীয় দল হইতে বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে নিয়োগের বিরোধিতা করে এবং পারস্যের বয়স্কাউট আন্দোলন নাজী যুব আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহণ করে। যুদ্ধের প্রারম্ভে পারস্যের প্রশাসনিক শ্রেণী বিশেষতঃ সামরিক অফিসারবৃন্দ ছিলেন জার্মান সমর্থক। সোভিয়েত ইউনিয়নের মাধ্যমে তখন জার্মানীর সহিত অনবরত ব্যবসা চলিতে থাকে।

জার্মানীর রাশিয়া আক্রমণের ফলে ইরানের অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন সরবরাহের অসুবিধায় পড়ে। সরবরাহ প্রেরণ করিবার তিনটি রাস্তা, ইরান, মুরমান্স্ক ও ভলাদিভস্তকের মধ্যে ইরানই একমাত্র সমস্ত মৌসুমের উপযোগী রাস্তা। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে গ্রেট বৃটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন তখন নিরপেক্ষ ঘোষণাকারী ইরানকে ইহার ভূখণ্ড দিয়া যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম প্রেরণ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করে। রেজা শাহর প্রত্যাখ্যানের ফলে এই অনুরোধ আদেশে পরিণত হয়। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ রেজা শাহ ও তাঁহার সামরিক উপদেষ্টাবৃন্দ জার্মান বিজয় আশা করেন এবং তাই অন্য কোন অনুরোধে রাজী হইতে চান নাই। আদেশ প্রত্যাখ্যান করা হইলে গ্রেট বৃটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন একযোগে ইরান আক্রমণ করে এবং রেজা শাহের সেনাবাহিনী তাসের ঘরের ন্যায় উড়িয়া যায়। রুশ ও বৃটিশগণ ইরান অধিকার করে এবং প্রবল চাপে পড়িয়া রেজা শাহ তাঁহার ২০ বৎসর বয়স্ক পুত্র মোহাম্মদ রেজা শাহলভীর স্বপক্ষে পদত্যাগ করেন। প্রাক্তন শাহকে মোরিতাস দ্বীপে লইয়া যাওয়া হয় এবং পরে জোহান্সবার্গে

ইরান

এবং ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ইঙ্গ-রুশ প্রভাবাধীন এলাকাসমূহ



লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জুলাই তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

রেজা শাহের প্রস্থান দেশে এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে যাহা ইতিপূর্বে আর কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই। শাহ্ দেশত্যাগ করিবার পূর্বেই তাঁহার মজলিশের বাছিয়া লওয়া গুণগানকারী সদস্যবৃন্দ তাঁহার নিন্দা করিতে আরম্ভ করেন। সাধারণ নাগরিকবৃন্দ তাহাদের পুরাতন জীবন ধারায় ফিরিয়া যায়, যেন মাঝখানে ২০ বৎসরের রেজা শাহের শাসনকাল বলিতে কিছুই ছিল না। কয়েক বৎসর পূর্বে নিষিদ্ধ করা সমস্ত পত্রিকা তাহাদের পরবর্তী সংখ্যা এমনভাবে প্রকাশ করে যেন মাঝখানে কোন ব্যতিক্রমই ঘটে নাই। একইভাবে, এখানে একজন আজান দিতেছে, ওখানে একজন মহিলা মুখে পর্দা দিতেছে, ধর্মীয় লোকজন তাঁহাদের মাথায় পাগড়ী দিতেছেন এবং দরূদ শরীফ পাঠ করিতে করিতে রাস্তায় চলিতেছেন।

মিত্রশক্তিও এমনভাবে কাজকর্ম আরম্ভ করে যেন প্রথম মহাযুদ্ধের পর কিছুই ঘটে নাই। সোভিয়েত সৈন্যগণ উত্তরের প্রদেশসমূহ অধিকার করে এবং বৃটিশগণ দক্ষিণাঞ্চল অধিকার করে। উভয় দেশই তেহরানে দ্রুত তাহাদের সৈন্য প্রেরণ করে। পরে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধে যোগদান করিলে ইহার সৈন্যগণ বৃটিশদের সহিত দক্ষিণাঞ্চলে ভাগ বসায় এবং তেহরানে একটি ঘাঁটি স্থাপন করে। ১৯৪১ হইতে ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে ইরানই একমাত্র দেশ যেখানে মিত্রশক্তির তিনটি প্রধান দেশের সৈন্য এক সঙ্গে অবস্থান করে।

১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে মিত্রশক্তির আগমন এবং একনায়কের দেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ইরানে স্বাধীনতার যুগ ও একটি শাসনতান্ত্রিক সরকার গঠনের প্রচেষ্টা শুরু হয়। কিন্তু মিত্রশক্তি তখন ইরানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার চাইতে যুদ্ধে জয়লাভে অধিক আগ্রহী ছিল। তাহারা গরম মস্তিষ্ক ও অনিশ্চিত যুবক জাতীয়তাবাদীর চাইতে পরিচিত ও পরীক্ষিত পুরাতন লোকদের সহিত কাজকারবার করিতে অধিক উৎসাহী। অতএব পুরাতন লোকজন থাকিয়া যায় এবং পুরাতন নিয়মে কাজকারবার শুরু করে। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে কাভাম আল-সালতানেহ ২০ বৎসর পর পুনরায় প্রধান মন্ত্রী হন। ইঙ্গ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিরসনে তিনি একটি তৃতীয় শক্তির হস্তক্ষেপে বিশ্বাসী। ২০

বৎসর পূর্বে তিনি যাহা করিয়াছিলেন এখন ঠিক তাহাই করেন। অর্থাৎ একজন মার্কিন অর্থনৈতিক উপদেষ্টা আনয়নের ব্যবস্থা করেন। ১৯২২ হইতে ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে পর্যন্ত যে মর্যাদায় ছিলেন, ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের শুরুতে ডঃ আর্থার মিল্‌স্‌ পাক্‌ একই মর্যাদায় ইরানে আগমন করেন। দুর্ভাগ্য-বশতঃ ডঃ মিল্‌স্‌ পাক্‌ও রেজা শাহ্‌র ইরান শাসন ভুলিয়া যান এবং ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি যেখানে ফেলিয়া যান সেখান হইতে কাজ আরম্ভ করেন। ফলে তিনি বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হন এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৪৫ পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

অবশ্য যুব সমাজকেও অস্বীকার করা যায় না। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে রাজ-নৈতিক দলগুলির উত্তম ফসলের বৎসর, প্রত্যেক দল একাধিক পত্রিকা প্রকা-শনার অনুমতি লাভ করে, যাহাতে আজ একটি পত্রিকা নিষিদ্ধ হইলে সঙ্গে সঙ্গে আগামীকাল আরেকটি পত্রিকা প্রকাশ করা যায়। অধিকাংশ দলের কোন জাতীয় কর্মসূচী নাই; হয়ত ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খা পূরণ করিতে চায় অথবা শ্রেণীগত স্বার্থ উদ্ধার করিতে চায়। এই নিয়মের একমাত্র ব্যতিক্রম তুদেহ্‌ (জনগণ) দল; যাহা একটি অতি উত্তম সংগঠন এবং জন সমর্থনের অধি-কারী। ইহা মার্কস্‌পন্থী কিন্তু এমন সব জাতীয়তাবাদীও ইহাতে বিদ্যমান যাহাদের সমস্ত কথাবার্তা মস্কোর মনঃপূত নহে। এই দল কখনও ইহাকে কমিউনিষ্ট বলিয়া ঘোষণা করে নাই, কিংবা সম্পত্তি জাতীয়করণের কথা বলে নাই। উত্তরাঞ্চলে এইদল অধিক শক্তিশালী। ইহা ছয়টি পত্রিকা সম্পাদনা করে এবং বিক্ষোভ প্রদর্শন, জনসভা অনুষ্ঠান ও ধর্মঘট পালন করে। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে নির্বাচনে মজলিশের একমাত্র ব্যতিক্রম হইল, আট-জন তুদেহ্‌ দলের সদস্য ইহাতে স্থান লাভ করে। অবশিষ্টগুলি পুরাতনপন্থী।

উত্তরাঞ্চলে তুদেহ্‌ দলের মাধ্যমে সরাসরি সোভিয়েত রাজনৈতিক কার্য-কলাপ বন্ধ করিবার জন্য বৃটিশগণ ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে সামরিক অভ্যুত্থানকালীন প্রধান মন্ত্রী সৈয়দ জীয়াকে পুনরায় আনয়ন করেন। ইনি তখন প্যালে-স্টাইনে বাস করিতে ছিলেন। তিনি কমিউনিষ্ট বিরোধী ন্যাশনাল উইল দল (National Will Party) গঠন করেন। এই দল বিচার, খাসজমির পুনর্বণ্টন এবং ইসলামকে রক্ষা ও সরকারী বিদ্যালয়সমূহে ধর্মীয় শিক্ষার দাবী তুলিয়া ধরে।

এই সকল রাজনৈতিক কার্যকলাপ চলিবার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী সৈন্যদের রাশিয়ায় যুদ্ধ সরবরাহ প্রেরণ এবং তাহাদের প্রচুর খরচপত্রের দ্বারা দেশে ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। ব্যবসায়ীগণ এবং মিত্রশক্তির সরবরাহ যোগানকারী কণ্ট্রাক্টারগণ সম্পদশালী হইয়া উঠে, জমির দাম ও ঘর ভাড়া বাড়িয়া যায় এবং সাধারণভাবে ধনী ও দরিদ্রের প্রভেদ বাড়িয়া যায়। স্বল্প শস্য উৎপাদনের ফলে দেশ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হয়। পারস্যবাসীগণকে এমন কি তেহরানেও রুটি কিনিবার জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়াইতে হয়।

পারস্যের বিক্ষোভ প্রশমিত করিবার জন্য ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী বৃটিশ ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ইরানের সহিত একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করে। ইহা দাবী করে যে ইরানে মিত্র বাহিনীর অবস্থানের অর্থ এই দেশ অধিকার নহে, এবং যুদ্ধ সমাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে বিদেশী সৈন্য প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করে। পরে, এই চুক্তির জোরে ইরানে মার্কিন সৈন্য প্রবেশ করে। ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরে তেহরান কনফারেন্সের সমাপ্তিতে প্রেসিডেণ্ট পরামর্শ দেন যে তিনি চার্চিল ও স্ট্যালিন ইরানের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন, যুদ্ধের ব্যাপারে ইরানের অবদানের স্বীকৃতি, অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি এবং আতলাণ্টিক সনদের আদর্শ স্মরণ করিয়া একটি বিবৃতি প্রদান করিবেন। পারস্যবাসীগণ, তাহাদের ক্ষতির বিনিময়ে পুরাতন ইঙ্গ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হইবার ভয়ে একটি তৃতীয় শক্তি যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতির উপর তাহাদের আশা স্থাপন করে। যুদ্ধোত্তর যুগে এই নতুন সম্পর্ক অনেক সুখী ও বেদনাদায়ক পরিস্থিতির মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয়।

ত্রয়ঃত্রিংশৎ অধ্যায়

ইরান—শ্বেত বিপ্লব

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে সংঘটিত পারস্য বিপ্লবের সময় হইতে প্রায় প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত জার রাশিয়া পারস্যের প্রাচীনপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষাবলম্বন করে; আর গ্রেট বৃটেন পরিবর্তনকারী বিপ্লবীদের পক্ষে বলিয়া মনে হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় উভয় দেশ ইরান দখল করিলে দেখা যায় তাহাদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। সোভিয়েত ইউনিয়ন পরিবর্তন আকাঙ্খী বিপ্লবীদের পক্ষে, আর গ্রেট বৃটেন প্রাচীনপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের পক্ষে। প্রাথমিক বৎসরগুলিতে বৃটিশগণ বিপ্লবীদেরকে সমর্থন করিয়াছিল তাহাদের নিজেদের স্বার্থে, গণতন্ত্র বা স্বাধীনতার স্বার্থে নহে। ১৯০৭ খ্রীস্টাব্দের ইঙ্গ-রুশ কনভেনশনে দস্তখত করিয়া বা শুস্‌তারকে বরখাস্ত করিবার জন্য রুশীয় চরমপত্র মানিয়া লইতে পারস্য মজলিশকে পরামর্শ দিয়া বৃটিশরা পারস্য বিপ্লবের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে দ্বিধা করে নাই। অনুরূপভাবে ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দ এবং ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে রুশরা পারস্যের কমিউনিষ্ট ও আমূল সংস্কারকামীদের পক্ষে ছিল নিজেদের স্বার্থে, জনগণ বা বিপ্লবের স্বার্থে নহে। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে তাহারাও তাহাদের কমরেডদের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করে এবং ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে তাহাদিগকে একেবারেই পরিত্যাগ করে।

পারস্যের তৈল : চতুর্থ পর্ব

স্মরণ করা যাইতে পারে যে যুদ্ধের সময় ইরানে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। একটি হইল তুদেহ্, যাহা সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক সমর্থিত। এই দল প্রতিষ্ঠিত হয় এমন কিছু সংখ্যক যুবকের দ্বারা যাহাদিগকে রেজা শাহ্ ইউরোপ প্রেরণ করেন এবং ফিরিয়া আসিবার পর "কমিউনিষ্ট"

হইবার অভিযোগে তাহাদিগকে গ্রেফতার করেন। আরেক দল হইল ন্যাশনাল উইল, ইহা সৈয়দ জীয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং বৃটিশ কর্তৃক সমর্থিত। কিছুকালের জন্য এই দুই দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দুই দলীয় ব্যবস্থার আশা দেখা দেয়। ইহারা আদর্শগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি হইতে বিভক্ত হয়। এই দুই দল যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সুযোগ লাভ করিত তবে ফলাফল কি হইত তাহা বলা যায় না। কিন্তু ইরানে তৈল বিদ্যমান। দক্ষিণাঞ্চলের তৈল বৃটিশদের নিয়ন্ত্রণে, এবং গোপন করিবার কিছু নাই যে জার রাশিয়ার ন্যায় সোভিয়েত ইউনিয়নও উত্তরাঞ্চলে অনুরূপ সুবিধা চায়।

যুদ্ধের শেষের দিকে এমন সকল লক্ষণ দেখা যায় যে মার্কিন তৈল কোম্পানীগুলি উত্তরাঞ্চলে তৈলের অনুমতিপত্র লাভের আশায় ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের ব্যর্থ প্রচেষ্টা পুনরারম্ভ করিতে চায়। ইঙ্গ-পারস্য তৈল কোম্পানী[১] ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের ন্যায় ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে মার্কিন "অনুপ্রবেশ অপছন্দ" করে। অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তর-ইরানের নিয়ন্ত্রণে থাকাতে তাহাদের পক্ষে যে কোন অভ্যাগতকে তৈল ক্ষেত্রের বাহিরে রাখিতে সুবিধা হয়। পারস্য মজলিশে এই প্রশ্ন লইয়া সুদীর্ঘ ও গরম বিতর্ক চলে। একজন স্বতন্ত্র সদস্য ডঃ মোহাম্মদ মোসাদ্দেক মজলিশ দ্বারা এক আইন পাশ করাইতে সক্ষম হন যদ্বারা মজলিশের সম্মতি ছাড়া কোন তৈল কোম্পানীর সহিত অনুমতি-পত্রের ব্যাপারে আলোচনা করিতে পারস্য সরকারকে নিষেধ করা হয়। তবে তুদেহ্ দল "সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার" ভিত্তিতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে উত্তরাঞ্চলের তৈলের অনুমতিপত্র দানের পক্ষপাতী। তাহাদের যুক্তি হইল দক্ষিণাঞ্চলের তৈলের ব্যাপারে গ্রেট বৃটেনের যেহেতু অনুমতিপত্র রহিয়াছে, অতএব সোভিয়েত ইউনিয়নকেও উত্তরাঞ্চলের তৈলের অনুমতি দেওয়া উচিত।

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর, জাপান আত্মসমর্পণ করে। মহা-যুদ্ধের শেষ দিবসে উত্তর পশ্চিমের আজারবাইজান প্রদেশে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ সংঘটিত হয় এবং ইহার স্বায়ত্তশাসন দাবী করা হয়। শীঘ্রই প্রমাণিত হয় যে ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বিদের চাইতে অধিক প্রভাব প্রদর্শন

১। পরে এই নাম পরিবর্তন করিয়া ইঙ্গ-ইরানিয়ান তৈল কোম্পানী হয়।

করিয়া উত্তরের তৈলের অনুমতিপত্র লাভের আশায় সোভিয়েত ইউনিয়ন উত্তরে ইহার প্রাধান্য ব্যবহার করে। ডিসেম্বর নাগাদ তুদেহ্ দল তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। মেধাবী নীতিবাগিশ খলিল মালেকীর নেতৃত্বে দলের জাতীয়তাবাদীগণ মস্কোর নিকট তুদেহ্র নতি স্বীকারের বিরোধিতা করে এবং তাহাদের নিজস্ব সমাজতন্ত্রী দল গঠন করে, যাহাকে কখনও কখনও তৃতীয় শক্তি বলা হয়।

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর তুদেহ্র আজার বাইজানী সদস্যবৃন্দ "ডেমোক্র্যাট" নামে তাহাদের নিজস্ব দল গঠন করে। তাব্রিজের গভর্ণরকে বরখাস্ত করে এবং স্বায়ত্তশাসিত আজার বাইজান প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করে। তাহারা লাল বাহিনীর পূর্ণ সমর্থন লাভ করে। পারস্য সেনাবাহিনীর একটি দলকে বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য আজার বাইজান প্রেরণ করা হইলে লাল বাহিনী তাহাদিগকে প্রদেশে প্রবেশ করিতে বাধাদান করে। আজার বাইজান ডেমোক্রেটের নেতা হইলেন কুখ্যাত জাফর পিশভেরী, যিনি ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে গিলান স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি এবং তাঁহার সহকর্মী প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন এবং কমিউনিষ্ট ভাবধারায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সম্পত্তি সংস্কার আরম্ভ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্ররোচনায় ইরানের কুর্দগণ মহাবাদে তাহাদের রাজধানী স্থাপন করিয়া একটি নিজস্ব প্রজাতন্ত্র গঠন করে।

১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে গ্রেট বৃটেন, ইরান ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক স্বাক্ষরিত এবং যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সমর্থিত ত্রিপক্ষীয় চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধাবসানের ছয় মাসের মধ্যে বিদেশী সৈন্যদের ইরান ত্যাগ করিবার কথা। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ২রা মার্চ নাগাদ মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্যগণ দেশ ত্যাগ করে কিন্তু লাল বাহিনী ত্যাগ করিতে অস্বীকার করে, ইরান জাতিসংঘের নিকট আবেদন জানায়, শেষ পর্যন্ত রাশিয়া কর্তৃক ইরান ত্যাগের সিদ্ধান্তের পিছনে বিশ্বজনমতের চাপ এবং গ্রেট বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের দাবী বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছে নিশ্চয়ই, কিন্তু একটি তৈলের অনুমতিপত্র লাভের নিশ্চয়তার পরেই শুধু ইহারা ইরান ত্যাগ করে।

১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে পারস্যের প্রধান মন্ত্রী আহামদ কাভাম

স্ট্যালিনের সহিত আলোচনার জন্য একটি প্রতিনিধি দল লইয়া মস্কো গমন করেন। উত্তর ইরানে তৈল আহরণের জন্য একটি ইরানো-সোভিয়েত তৈল কোম্পানী গঠনের ব্যাপারে কাভাম রাজী হন। কোম্পানীতে ইরানের অংশ থাকে ৫১ শতাংশ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ৪৯ শতাংশ। অনুমতি পত্রের মেয়াদ নির্ধারিত হয় ২৫ বৎসরের জন্য। কাভাম স্ট্যালিনকে প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন যে, নতুন নির্বাচনে গঠিত মজলিশের মাধ্যমে তিনি এই চুক্তি অনুমোদন করাইতে চেষ্টা করিবেন, তবে শর্ত হইল রুশদিগকে ইরান ত্যাগ করিতে হইবে। স্ট্যালিন রাজী হন এবং কাভাম তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে অগ্রসর হন। জাতিসংঘে নিযুক্ত পারস্য প্রতিনিধি হোসাইন আলাকে তিনি ইরানের নালিশ প্রত্যাহার করিতে বলেন। তবে আলা ইহা পালন করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন এবং নালিশটি কার্যসূচীর মধ্যে থাকিয়া যায়।

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ৯ই মে লাল বাহিনী ইরান ত্যাগ করে। পারস্য সেনাবাহিনী আজার বাইজান ও কুর্দিস্তান পুনর্দখল করে এবং ঐ দুই প্রদেশের কমিউনিষ্ট বিদ্রোহীদিগকে কঠোর শাস্তি প্রদান করে। জাফর পিশভেরী সহ কতিপয় নেতা রাশিয়ায় পলায়ন করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের বহু বিঘোষিত নীতি— বিশ্বের সর্বত্র "জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের" সাহায্য করা সর্বত্র পালিত হয়। কিন্তু তৈলের অনুমতিপত্রের বিনিময়ে এখানে ইহার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়।

জাতিসংঘ হইতে পারস্যের প্রতিবাদ প্রত্যাহারের ব্যাপারে আলাকে সম্মত করাইতে না পারিলেও প্রধান মন্ত্রী কাভাম স্বীয় দেশে অনেক শক্তিশালী ছিলেন। কমিউনিষ্ট বিরোধী সৈয়দ জীয়াকে তিনি গ্রফতার করেন এবং ন্যাশনাল উইল পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। অতঃপর তিনি ইরান-এ-ডেমোক্রেট নামে তাঁহার নিজস্ব দল গঠন করিতে সচেষ্ট হন। ইহা তুদেহ্‌সহ সমস্ত দলের আঁতাত। এই দলের সংগঠন খুবই ব্যাপক এবং ইহার নিজস্ব উর্দিপরা "জাতীয় মুক্তি প্রহরীর" (Guard of National Salvation) সংখ্যায় বৃহৎ। শুভেচ্ছা প্রদর্শন করিবার জন্য কাভাম তাঁহার মন্ত্রী সভায় তিনজন তুদেহ্ নেতাকে রাখেন।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে অনুষ্ঠিত পঞ্চদশ মজলিশের নির্বাচনে কাভাম ক্ষমতাসীন হন এবং তাঁহার দল সংখ্যাধিক্য আসনের অধিকারী হয়।

তিনি ইরানো-সোভিয়েত তৈলের অনুমতিপত্রের বিষয়টি মজলিশে উত্থাপন করেন, কিন্তু ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ২২শে অক্টোবর প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে ইহা নাকচ হইয়া যায়। মাত্র দুইটি সদস্য ইহার পক্ষে ভোট দান করেন। কাভাম পদত্যাগ করেন। তাঁহার দল নিষিদ্ধ করা হয় এবং তুদেহ্ দলও দুর্ণামের ভাগী হয়।

এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কাভামের ভূমিকা পুনর্মূল্যায়ন করিতে যাইয়া পারস্যের ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। অনেকে বিশ্বাস করেন যে, তিনি রুশদিগকে ঠকাইয়া ইরানের জন্য আজারবাইজান প্রদেশ রক্ষা করিবার ব্যাপারে বেশ সুচতুরভাবে কাজ করিয়াছেন। আবার অনেকে মনে করেন যে আজার বাইজান রক্ষা করিবার জন্য ইরানো-সোভিয়েত তৈল কোম্পানী প্রতিষ্ঠার মধ্যে তিনি ক্ষতিকর কিছু দেখেন নাই। কারণ ইরানো-সোভিয়েত মৎস্য কোম্পানী বেশ কিছুকাল হইতে কার্যকর রহিয়াছে। ইরান ত্যাগের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর যে চাপ সৃষ্টি করে তাহাতে বাড়াইয়া বলিবার কিছুই নাই। স্ট্যালিনের নিকট বিশেষ পত্র এবং জাতিসংঘে প্রতিবাদের মাধ্যমে সে এই কাজ সম্পাদন করে। কাভামের ইরানো-সোভিয়েত তৈল প্রস্তাবের উপর মজলিশে ভোট গ্রহণের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে ইরানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ জর্জ এ্যালেন অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ এক বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি বলেন যে ইরান যে ভাবে ইচ্ছা তাহার নিজস্ব সম্পদ বিলাইতে পারে, তৎসঙ্গে তিনি দেশ প্রেমিক পারস্যবাসীদিকে এই প্রতিশ্রুতিও দান করেন যে "তাহাদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করিবার ব্যাপারে মার্কিন জনগণ তাহাদের পূর্ণ সমর্থন দান করিবে।" শাহ্ একজন শাসনতান্ত্রিক নৃপতির ভূমিকা পালন করেন। আজার বাইজানের বিদ্রোহীদের দমন করিবার ব্যাপারে আপোষ মীমাংসা প্রত্যাখ্যান করিতে যাইয়া তিনি সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দান করেন। তিনি সেনাবাহিনীর সহিত আজার বাইজানও গমন করেন এবং জনসাধারণের প্রশংসা লাভ করেন।

যুদ্ধের পরিণাম (অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক উত্তেজনা)

উত্তরের প্রদেশসমূহ হইতে লালবাহিনীর অপসারণ এবং আজার বাইজানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের ব্যর্থতার দ্বারা ইরান খণ্ড-বিখণ্ড

হইবার হাত হইতে রক্ষা পায়। কিন্তু ইহা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কোন সংস্কারের দ্বার উন্মুক্ত করে নাই। একনায়ক রেজা শাহের নির্গমনের দ্বারা দেশ মুক্ত হয় নাই, বরং হারানো মর্যাদা ও সম্পত্তি পুনরুদ্ধার এবং তাহাদের পৈতৃক শাসন পুনরারম্ভ করিবার জন্য সংখ্যালঘু শাসনের হাত মুক্ত করে। সংখ্যালঘু শাসক বলিতে তাহাদিগকে বুঝায়, যাহারা কখনও কখনও "এক সহস্র পরিবার" হিসাবে উল্লেখিত, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ দ্বারা শক্তিশালী এবং পুরাতন সেনাবাহিনীর অফিসারদের দ্বারা সমর্থিত। এই সমর্থনের উপর ভিত্তি করিয়া তাহারা শাসনতন্ত্র ও তাহাদের মনগড়া গণতন্ত্রের প্রতি মৌখিক সমর্থন দান করে এবং পরিবর্তিত অবস্থার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ না করিয়াই দেশ শাসন করে।

যেহেতু সংখ্যালঘু শাসক (Oligarchy) সদস্য ও তাহাদের সমর্থক দ্বারা মজলিশ পরিপূর্ণ, এবং তাহাদের নিকট হইতে যেহেতু পূর্বাবস্থার পরিবর্তন আশা করা যায় না, সেহেতু পার্লামেণ্ট ভবনের বাহিরে বিভিন্ন দল পরিবর্তনের জন্য হৈ-চৈ করে। বিদেশী সৈন্য অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে দেশে অর্থনৈতিক মন্দা ও বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। দেউলিয়াপনা একটি নিত্য-নৈমত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায় এবং প্রথম বারের মত ইরানে এক বিরাট শিক্ষিত বেকার বাহিনী দৃষ্ট হয়। উচ্চ বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্র্যাজুয়েটগণ এবং এমন কি যে সকল ছাত্র ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমন করে তাহারাও উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়। আমূল সংস্কারকামীদের ডান ও বাম উভয় দলগুলি, যাহারা সীমাহীন বিক্ষোভ ও দাঙ্গা পরিচালনা করে তাহারা প্রায়ই বেকার শিক্ষিত লোকজন।

কিছু কিছু আমূল সংস্কারকামীদের মধ্যে ধর্মীয় ভাবধারা পরিলক্ষিত হয়। রেজা শাহের পদত্যাগে পর প্রাক্তন শাহ কর্তৃক বিলুপ্ত ধর্মীয় অনুশাসনগুলি সরকার ও ব্যক্তি বিশেষ দ্বারা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। মহিলারা মুখে পর্দা দিবার অনুমতি পায়, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তাহাদের ধর্মীয় পোশাক পরিধান করেন, ধর্মীয় শোভাযাত্রা পুনরায় চালু হয়; বেতারে কোরান তেলাওয়াত হয়, বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়, তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মীয় অনুষদে পুরাতন ও বিলুপ্ত ধর্মীয় সিপাহসালার-মসজিদ বিভাগ পুনরায় চালু করা হয় এবং হাজার হাজার লোককে মক্কায়

হজ্ব পালন করিতে যাইবার জন্ম পাসপোর্ট দেওয়া হয়।

অবশ্য চরম ধর্মীয় কার্যাবলী তখন রাজনৈতিক সংগঠনের কাজে ব্যস্ত। এইগুলির একটি হইল ফেদাইয়ানে-ইসলাম, "ইসলামের ভক্তদল"। ইহার নেতা একজন অপরিচিত ধর্মীয় নেতা, যিনি মিসরের মুসলিম ভ্রাতৃসঙ্ঘের (Muslim Brotherhood) সংগঠন ও পন্থা অনুকরণ করেন। বস্তুতঃ তাহাদের সহিত যে এই নেতার সংযোগ রহিয়াছে তাহার বিভিন্ন প্রমাণ বিদ্যমান। আরেকটি দল হইল আয়াতুল্লাহ আবুল-কাশেমের নেতৃত্বে মোজাহেদীন-এ-ইসলাম, "ইসলামের যোদ্ধৃদল"। ইনি একজন প্রভাবশালী আলেম, যিনি পরে মজলিশের সদস্য ও ইহার স্পীকার নিযুক্ত হন। এই দুই দল পৃথকভাবে এবং কখনও কখনও একত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের জন্য গুপ্তহত্যা ও সন্ত্রাসের মাধ্যমে তাহাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে। একটি গুরুত্বপূর্ণ ডানপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ দল হইল ফ্যাসিষ্ট প্যান-ইরানী দল (Fascist Pan-Iranist Party),—যাহারা জার্মান ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট ধরনের চরম বর্ণবাদী জাতীয়তাবাদ প্রচার করে।

বামপন্থীদের মধ্যে, তৈল ও আজার বাইজানের প্রচণ্ড আঘাত লাভ করিবার পরেও সুসংগঠিত তুদেহ্ পার্টি তখনও শক্তিশালী এবং সক্রিয় ছিল। ইহা ছাড়া আরও দুইটি দল বিদ্যমান। একটি হইল বুদ্ধিজীবী সদস্য ডঃ বাকাইর শ্রমিক দল (Toilers Party), অন্যটি পূর্বোল্লিখিত খলীল মালেকীর তৃতীয় শক্তি (Third Force)। এই সমস্ত দলই স্ট্যালিন-বিরোধী কিন্তু ইহাদের সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের মার্ক্সবাদী ও সমাজতন্ত্রবাদী বিদ্যমান। মধ্যখানে থাকে একদল যুবক বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, আইনবিদ, ডাক্তার ও শিক্ষক দ্বারা গঠিত ইরান দল (Iran Party)। ইহার সাধারণ নেতা একজন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ও মজলিশের সদস্য আল্লাহ ইয়ার সালেহ।

যুদ্ধোত্তর যুগের প্রথম দিকে যুবক শাহের অবস্থা আশাব্যঞ্জক মনে হয়। তিনি তখন পুরাতন সেনাবাহিনীর অফিসারবৃন্দ ও অরাজনৈতিক কিন্তু গোঁড়া ধর্মীয় নেতাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছেন। যুদ্ধের সময় তাঁহার কম বয়স এবং ইরানে বিদেশী সৈন্যের অবস্থানের ফলে দেশ তাঁহার অধীনে সংঘবদ্ধ হয়। আজার বাইজানের বিচ্ছিন্নতাবাদী

আন্দোলন এবং তৎসহ সোভিয়েত ইউনিয়নে অনুসৃত নীতির বিরুদ্ধে তাঁহার সাহসিক ভূমিকার দ্বারা তিনি জনপ্রিয় হইয়া উঠেন। সম্ভবতঃ এই সকল অভিজ্ঞতা তাঁহাকে আত্মবিশ্বাস প্রদান করে এবং আজার বাইজান ঘটনার পরে তাঁহাকে আরও কর্মঠ করিয়া তোলে। তিনিও অতঃপর দেশের কার্যকলাপে আরও ব্যাপকভাবে অংশ গ্রহণ করিতে থাকেন। শাহের প্রথম কার্যাবলীর মধ্যে একটি হইল প্রথম বারের মত শাসনতন্ত্রের মধ্যে একটি সিনেটের সংবিধান করা। ইহার দ্বারা শাহকে ৩০ জন সিনেটের সদস্য নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা দেওয়া হয়। তাঁহার নিযুক্ত লোকদের অধিকাংশই পুরাতন সামরিক অফিসার ও গোঁড়া বুদ্ধিজীবী হইলেও শাহ দেশের কার্যাবলীতে বেশ প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন।

মার্কিনগণ তাঁহাকে সাহায্য করিতে চায় কিন্তু কিভাবে সম্ভব সেই বিষয়ে তাহারা অজ্ঞ। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বৃত্ত যুদ্ধ সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য ইরানকে এক কোটি ডলারের একটি ঋণ দেয়। একটি সাতসালা উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন করিবার জন্য পারস্য সরকার মার্কিন সংস্থা ও বৈদেশিক উপদেষ্টা নিয়োগ করে। ফলে উন্নয়নশীল দেশসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ব্যাপক একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এই পরিকল্পনায় ৬৫ কোটি ডলার খরচের বন্দোবস্ত করা হয় এবং সামাজিক, শিক্ষা বিষয়ক, অর্থনৈতিক ও কারিগরী সমস্যাসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। ইঙ্গ-ইরানী তৈল কোম্পানীর সেলামী এবং যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক সাহায্য হইতে এই পরিকল্পনার অর্থ পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা হয়। সরকার বৃটিশ তৈল কোম্পানীর (British Oil Company) সহিত চুক্তির ধারাসমূহ পুনর্বিবেচনার জন্য আলাপ-আলোচনা চালায়। আশা করা হয় যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত তৈলের সেলামী এবং যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য দ্বারা স্বচ্ছন্দে উন্নয়ন কর্মসূচী শুরু করা যাইবে।

শাহ অনুসৃত কার্যকর কর্মপন্থার প্রমাণ সম্ভবতঃ এই যে তাঁহার জীবনের উপর পরিচালিত বিভিন্ন হামলার প্রথমটি পরিচালিত হয় ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী। শাহের তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করিবার সময় খবরের কাগজের ফটোগ্রাফারের ছদ্মবেশে এক ব্যক্তি অতি সন্নিকট হইতে তাঁহার প্রতি পাঁচটি গুলি ছোঁড়ে। সৌভাগ্যবশতঃ গুলি তাঁহার

শরীরের উপর দিয়া আঁচড় কাটিয়া যায় মাত্র এবং তিনি হাসপাতাল হইতে বেতার মারফত জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে সক্ষম হন। সেই দুর্বৃত্তকে হত্যা করা হয় এবং তাহার ঘরে তল্লাশী চালাইয়া যে সকল কাগজপত্র পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় তাহার সহিত তুদেহ্ ও মুসলিম দলগুলির সম্পর্ক বিদ্যমান। ফলে তু:দহ্ দল নিষিদ্ধ করা হয় এবং ইহার অনেক নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। অবশ্য ইহাতে গোলযোগ দূরীভূত হয় নাই। আজারবাইজান ও তৈল প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া সোভিয়েত ইউনিয়ন শাহ ও ইরানে অবস্থানকারী মার্কিনীদের বিরুদ্ধে বেতার প্রচার আরম্ভ করে।

সাতসালা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়, অথচ এ. আই. ও. সি-র (Anglo-Iranian Oil Company) কর্মকর্তাদের সহিত আলাপ-আলোচনাও ফলদায়ক হয় নাই। এমতাবস্থায় শাহ স্বয়ং যুক্তরাষ্ট্রে আসিয়া অর্থনৈতিক সাহায্যের জন্য একটি ব্যক্তিগত আবেদন জানাইবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর তিনি আগমন করেন এবং সমগ্র দেশে খুব প্রভাব বিস্তার করেন। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ইরানের উন্নয়ন প্রকল্পে তেমন গভীরভাবে নিজেকে জড়াইবার জন্য আগ্রহী নহে। সম্ভবতঃ চীনের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার দ্বারা তাহারা এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে মার্কিন নেতাদের স্বল্প জ্ঞানের ফলে তাহারা ভীত হন, পাছে ইরান আরেকটি চীন ও শাহ আরেকজন চীয়াং কাইশেক বলিয়া প্রতীয়মান হন।

যাহাই হউক, বিফল মনোরথ শাহ শূন্য হাতে ফিরিয়া যান। কিন্তু তিনি সংস্কারের মনোভাব ত্যাগ করেন নাই। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে শাহ নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সংস্কারে জড়াইয়া ফেলেন। তিনি তাঁহার পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত বিশাল জমিদারীকে সামাজিক জনকল্যাণের রাজকীয় প্রতিষ্ঠানে (Imperial Organization for Social Welfare) রূপান্তরের পরিকল্পনার দ্বারা তাঁহার কাজ আরম্ভ করেন। পরিকল্পনা মোতাবেক এই সকল জমি সুবিধাজনক শর্তে তিনি কৃষকদের মধ্যে বিতরণের বন্দোবস্ত করেন। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে তিনি রাজমারা নামক একজন জ্ঞানী সামরিক জেনারেলকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। রাজমারা যুবক

শ্রেণীর লোকদিগকে মন্ত্রীসভায় নিযুক্ত করেন এবং যে সকল কর্মকর্তা হয়ত অকেজো বা দুর্নীতিবাজ তাহাদিগকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। শাহ এই সকল উন্নতিতে সহায়তা করেন, কারণ তিনিও এইগুলি প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন। তাহা ছাড়া তিনি মার্কিনদিগকে তাঁহার কার্যকলাপ দেখাইতে চান।

এই সকল কার্যকলাপ দেখিয়া যুক্তরাষ্ট্র আমদানী-রপ্তানী ব্যাঙ্ক (Export-Import Bank) হইতে আড়াই কোটি ডলার ঋণ দান করে। প্রাক্তন মিত্রশক্তির দেশগুলিকে যুক্তরাষ্ট্র যে সকল উদার সাহায্য প্রদান করে উহার তুলনায় এই স্বল্প অংকে পারস্যবাসীগণ ক্রুদ্ধ হইয়া যায় এবং প্রথমবারের মত দেশে মার্কিন বিরোধী বিক্ষোভ দেখা যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন কাল বিলম্ব না করিয়া ইহার সুযোগ গ্রহণ করে এবং দুই কোটি ডলারের বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করে।

তৈল জাতীয়করণ

স্মরণ করা যাইতে পারে যে সাতসালা উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য তৈলের সালামী ব্যবহার করিবার আশা করা হয়। কিন্তু ইঙ্গ-ইরানী তৈল কোম্পানী পারস্যের দাবী পূরণ করে নাই। মজলিশের তৈল কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ মোহাম্মদ মোসাদ্দেক সততা ও জাতীয়তাবাদের জন্য সুনামের অধিকারী।[১] বৃটিশদের মধ্যে চেতনার অভাব এবং মার্কিনীদের মধ্যে উৎসাহের অভাব দেখিয়া ডঃ মোসাদ্দেক বলেন যে, নিজেদের তৈলের মধ্যে আশানুরূপ অর্থ রাখিয়া বাদশাহকে ভিক্ষার ঝুলি লইয়া আমেরিকায় পাঠানো ইরানের জন্য অপমানজনক। তিনি তৈল জাতীয়করণের ইঙ্গিত প্রদান করেন। ডঃ মোসাদ্দেকের নেতৃত্বে মজলিশের আটজন সদস্য, যাহাদের অনেকেই ইরান পার্টির সদস্য, ন্যাশনাল ফ্রন্ট নামে একটি কোয়ালিশন গঠন করেন এবং জাতীয়করণের জন্য প্রবল চাপ সৃষ্টি করেন। তাঁহারা "নেতিবাচক নিরপেক্ষতার" (Negative Neutralism) আদর্শ প্রচার করেন। তাঁহারা যুক্তি প্রদর্শন করেন—রুশদিগকে যখন উত্তরাঞ্চলের তৈল দেওয়া হয় নাই, বৃটিশদের নিকট হইতেও দক্ষিণাঞ্চলের তৈল ছিনাইয়া লওয়া উচিত।

১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী নাগাদ খবর পাওয়া গেল যে, আরামকো (Aramco) সৌদী আরবের সহিত ইহার তৈল চুক্তি পরিবর্তন করিয়া আধা-আধি মুনাফায় সম্মত হইয়াছে। এই খবর জাতীয়করণের পরিকল্পনাকে জোর-দার করে। বৃটিশ কোম্পানী অতঃপর প্রধান মন্ত্রী রাজমারাকে অনুরূপ ব্যবস্থার কথা বলিতে আসে, কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। জেনারেল রাজমারা ইতিমধ্যে জাতীয়করণের বিরুদ্ধে নিজের মনোভাব প্রকাশ করেন। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের ৭ই মার্চ ইসলামের ভক্তদলের একজন সদস্য দ্বারা তিনি সিপাহসালার মসজিদে নিহত হন। ১৫ই মার্চ মজলিশ জাতীয়-করণের নীতি অনুমোদন করে। ৩০শে এপ্রিল মজলিশ একটি নয় দফা আইন পাশ করে এবং উহাতে কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণ দানের আইনও অন্তর্ভুক্ত হয়। বৃটিশ সরকার জাতীয়করণের প্রতিবাদ করে এবং বার বার উল্লেখ করে যে এই ব্যাপারে ইরানের মধ্যস্থতা মানা উচিত। ইতিমধ্যে নিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রধান মন্ত্রী হোসাইন আলা উত্তরে বলেন, ইরান ও একটি তৈল কোম্পানীর মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার কোন অধিকার বৃটিশ সরকারের নাই। ১৫ই এপ্রিল বৃটিশ আবাদানের তৈল শোধনাগার বন্ধ করিয়া দেয় এবং ২৭শে এপ্রিল আলা পদত্যাগ করেন। ২৮শে এপ্রিল মোসাদ্দেক প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং একই দিন ইরানে অবস্থিত কোম্পানীর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াফত করিবার ব্যাপারে মজলিশ সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব পাশ করে।

ঘটনাবলী অতি দ্রুত সংগঠিত হয় এবং সমস্যার সহিত জড়িতপ্রায় সকলকে হতচকিত করিয়া তোলে। বৃটিশ আশ্চর্যান্বিত হয় যে হুমকি প্রদর্শনে, পারস্যের সম্পত্তি বন্ধ করায়, এমন কি পারস্য উপসাগরে যুদ্ধজাহাজ প্রেরণেও ইরান ভীত হয় নাই। পাশ্চাত্যের পর্যবেক্ষকগণ আরও আশ্চর্যা-ন্বিত হয় যে আবাদানের তৈল শোধনাগার বন্ধ হইয়া তাহার রাজস্ব আগমন বন্ধ হইলেও ইরান কাবু হয় নাই। পারস্যবাসীগণ আহ্লাদে আশ্চর্যান্বিত হয় যে তাহারা বৃটিশ সিংহের লেজ পাকাইয়া টানিয়া লইতে সক্ষম। ইহাদের ভিতর সর্বাপেক্ষা বেশী বিস্মিত হন ডঃ মোসাদ্দেক, এবং তাহা তাঁহার জনপ্রিয়তা দেখিয়া। তবে মোসাদ্দেকের সবচাইতে বড় ভুল সম্ভবতঃ এই যে, তিনি তাঁহার জনপ্রিয়তা পরিমাপ করিতে অক্ষম ছিলেন।

দুই বৎসর স্থায়ী সঙ্কটকালে অর্ধ ডজন বিকল্প প্রস্তাব পেশ করা হয়, যেগুলির অধিকাংশই জাতীয়করণের নীতি গ্রহণ করিবার প্রস্তাব, কিন্তু সমস্যার সমাধান আনিতে ব্যর্থ হয়। বৃটিশ জাতিসংঘে অভিযোগ উত্থাপন করে। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে ইরানের বক্তব্য পেশ করিবার জন্য ডঃ মোসাদ্দেক নিউ ইয়র্ক গমন করেন। তাঁহার বক্তব্য হইল জাতীয়করণ একটি আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং আন্তর্জাতিক আওতায় পড়িবার মত বিষয় নহে। বিষয়টি আন্তর্জাতিক আলোচনার আওতাভুক্ত কি-না তাহা যাচাই করিবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ বিশ্ব কোর্টের স্মরণাপন্ন হয় কিন্তু কোর্ট ইরানের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করে। কোর্টের রায় হইল সমস্যাটি আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং তাই ইহা বিশ্ব কোর্ট অথবা জাতিসংঘের আওতার বাহিরে।

দুইজন মার্কিন প্রেসিডেন্ট, ট্রুম্যান ও আইসেন হাওয়ার এবং বিশ্ব ব্যাংকের হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও সমস্যার সমাধান হয় নাই। মোসাদ্দেক আবাদানের তৈল প্রকল্প বাজেয়াফত করেন এবং গ্রেট বৃটেনের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কিন্তু স্বদেশে তিনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন হন। স্মরণ করা যাইতে পারে যে জাতীয় ফ্রণ্ট (National Front) হইল বিভিন্ন দল, স্বার্থান্বেষী মহল এবং বিভিন্ন মতাবলম্বী ব্যক্তিবর্গের সংমিশ্রণ, যাহারা শুধু জাতীয়করণের উদ্দেশ্যেই একত্রিত হয়। সমস্যা সমাধানের ব্যর্থতা চলিতে থাকিলে মতান্তরের সূচনা হয়। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে মজলিশ ইহার সপ্তদশ অধিবেশনে মিলিত হইলে মোসাদ্দেক ছয় মাসের জন্য বিশেষ ক্ষমতা দাবী করেন। কিছু সংখ্যক সদস্য আপত্তি করিলে তিনি পদত্যাগের হুমকি দেন। এই ধরনের হুমকির সাথে সাথে সাধারণতঃ তুদেহ্ পার্টি এবং গোঁড়া মুসলিম দলগুলির সদস্যরা গণবিক্ষোভ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁহাকে সমর্থন দিত।

সমস্যা যতই জটিল আকার ধারণ করে মোসাদ্দেকও তৎসঙ্গে আরও অধিক ক্ষমতা দাবী করেন। যতই তিনি ক্ষমতা দাবী করেন ততই তিনি বন্ধু হারাইতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে তুদেহ্ পার্টির সদস্যদের উপর অধিক নির্ভর করিতে হয়। ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মকালে শাহ্ তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর মধ্যে, এবং প্রধান মন্ত্রী ও তাঁহার মন্ত্রীসভা ও মজলিশের,

মধ্যে মত বিনিময়ের সম্পর্ক নষ্ট হইয়া যায়। এতদসত্ত্বেও মোসাদ্দেক তখনও এত জনপ্রিয় যে তাঁহাকে বহিষ্কার করিতে শাহ, পারস্যের সেনাবাহিনী এবং মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থাকে (C.I.A.) সম্মিলিত প্রচেষ্টা চালাইতে হয়। ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট মোসাদ্দেককে বরখাস্ত এবং জেনারেল ফজলুল্লাহ জাহেদীকে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করিয়া শাহ একটি আদেশ জারী করেন। মোসাদ্দেক আদেশ পালন করিতে অস্বীকার করেন এবং আদেশ বহনকারী দূতকে গ্রেফতার করেন। "রক্তপাত বন্ধ" করিবার জন্য ১৬ই আগষ্ট শাহ ও সম্রাজ্ঞী সুরাইয়া দেশ ত্যাগ করেন। তিন দিনের জন্য তেহরান মোসাদ্দেকের অনুসারীদের হাতে থাকে। কিন্তু তাঁহাদের উপর তিনি নিয়ন্ত্রণ হারাইয়া ফেলেন। গোলযোগের দিনের কৌতূহলদীপক ঘটনা হইল মস্কোর ভূমিকা। তুদেহ্ পার্টির প্রথম প্ররোচনায় বিক্ষুব্ধ জনতা রাস্তার প্রোথিত শাহ ও তাঁহার পিতার সমস্ত মূর্তি ভাঙ্গিতে থাকে। তুদেহ পার্টির সদস্যবৃন্দ সম্ভবতঃ সরকারের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করিতে পারিত, কিন্তু মস্কোর কঠোর আদেশের ফলে তাহারা নিজ নিজ গৃহে আবদ্ধ থাকে। এইরূপ নিষ্ক্রিয়তার জন্য তাহাদিগকে কঠোর দণ্ড লইতে হয়, কারণ অনতিবিলম্বে ক্ষমতায় আগত নতুন সরকার ইহাদিগকে বিভিন্ন মহল হইতে খুঁজিয়া বাহির করে এবং হত্যা করে। যাহারা নিষ্কৃতি পায় তাহারা দেশ ত্যাগ করে এবং কমিউনিষ্ট দেশে অতি কষ্টে জীবন যাপন করে।

১৯শে আগস্ট নাগাদ জেনারেল জাহেদী তেহরান প্রবেশ করেন এবং শাহের পক্ষে সমর্থন আদায় করিতে সক্ষম হন। তাঁহার সৈন্যগণ মোসাদ্দেকের বাড়ী অবরোধ করিয়া অংশতঃ ধ্বংস করিয়া ফেলে। রাত্রি নাগাদ তিনি নিজেকে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ সংবলিত শাহের আদেশ প্রকাশ করেন। ২২শে আগস্ট বিজয়ীবেশে শাহ তেহরান প্রবেশ করেন। মোসাদ্দেককে গ্রেফতার করা হয় এবং পরে তাঁহার বিচার হয়। জাহেদীর প্রচণ্ড আঘাতের দ্বারাও মোসাদ্দেকের অনুসারীগণ কাবু হয় নাই। জনসাধারণকে শান্ত করিতে আরও কয়েক বৎসরের প্রয়োজন হয়, যাহার ফলে ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে মার্চ মাসে তাঁহার মৃত্যুতে অল্প প্রতিক্রিয়া হয়।

মোসাদ্দেকের পুনর্মূল্যায়ন

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে ডঃ মোহাম্মদ মোসাদ্দেকের মধ্যে পারস্যবাসীগণ এমন এক লোকের সন্ধান পায় যাহাকে তাহারা অবচেতন মনে খোঁজ করে—একজন চরিত্রবান, উদ্যোগী এবং অনুসরণ করিবার মত জনপ্রিয় নেতা। ইরানের আধুনিক ইতিহাসে ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে তামাক একচেটিয়া করণের বিরুদ্ধে ধর্মঘট, ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে শাসনতন্ত্র প্রদানের জন্য ধর্মঘট, ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে মর্গান শুস্‌তারের স্বপক্ষে মিছিল এবং ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের প্রথমদিকে বংশ পরিবর্তনের জন্য বিক্ষোভের তুলনায় অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে তৈল জাতীয়করণ। বৃটিশ ও অন্যান্য পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ পারস্যের মূল বক্তব্য অনুধাবন করে কিনা সন্দেহের বিষয়। বৃটিশগণ প্রথমে "যুদ্ধজাহাজ" কূটনীতি দ্বারা পারস্য সরকারকে কাবু করিতে চেষ্টা করে। ইহাতে এবং বিশ্বকোর্টে ব্যর্থ হইবার পর বৃটিশ পারস্যের তৈল উত্তোলন বন্ধ করিয়া দেয় এবং পারস্যের তৈল প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য অন্যান্য ইউরোপীয়দিগকে পরামর্শ দেয় এবং মার্কিনবাসীদিগকে অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করিতে বলে, কিন্তু তাহাতেও ফলোদয় হয় নাই।

ইঙ্গ-ইরানী তৈল কোম্পানীর প্রতি বৃটিশ মুনাফা অর্জনকারী ব্যবসায়ীর দৃষ্টিতে তাকায়। পেশকৃত সমস্ত পরিকল্পনায় বৃটিশ শুধু কোম্পানীর সম্পত্তির মূল্যই দাবী করে নাই, বরং ১৯৯৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানী যে মুনাফা লাভ করিত তাহাও দাবী করে। পারস্য সরকার অবশ্য সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ দিতে রাজী হয়। বৃটিশ কোম্পানী সর্বদা মনে করে যে, তৈল উত্তোলন করিয়া সে ইরানের বিরাট উপকার করিয়াছে, কিন্তু পারস্যবাসীদের অকৃতজ্ঞতায় সে বিস্মিত হয়। এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানীর এই বিরাট লাভ সামঞ্জস্যহীন। কোন কোন বৎসর এই লাভ ১৫০ শতাংশে দাঁড়ায়। তাহাদের প্রকৃত মনোভাব এই যে বৃটিশদের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যতীত পারস্য সরকার তৈল হইতে কোন আয়ই পাইত না।

অপরদিকে পারস্যবাসীগণ মুনাফার এক বিরাট অংশ দাবী করে। পারস্যের পরিদর্শকদিগকে হিসাবের খাতা দেখাইতে বার বার অস্বীকার করায় তাহারা অবাক হয়; বিদেশী কারিগরদের স্থলে পারস্যের কারিগর নিয়োগের ব্যাপারে বৃটিশদের অযথা বিলম্ব দেখিয়া তাহারা হতাশ হয় এবং কোম্পানী

কর্তৃক দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লঙ্ঘন করিতে দেখিয়া তাহারা ক্রুদ্ধ হয়। তৈলের সমস্ত সেলামী যেহেতু পারস্যের সেনাবাহিনীর জন্য খরচ হয় এবং জনগণের নিকট আসে না তাই মোসাদ্দেকের সমর্থক ছোট ছোট ব্যবসায়ী, বুর্জুয়া গোষ্ঠী ও ছাত্রগণ কোম্পানী বন্ধ হইয়া গেলেও কোন পরোয়া করে না।

গোলযোগের সময় পারস্যবাসীদের আশা ও গর্বের মূল প্রেরণা আসে ডঃ মোসাদ্দেক হইতে। কিন্তু আন্দোলনের আংশিক ব্যর্থতা এবং পারস্য-বাসীদের অপমানের জন্যও তিনিই দায়ী। মোসাদ্দেক তৈল শিল্পের ব্যাপারে নিদারুণ উদাসীন থাকেন। তাঁহার জন্য প্রস্তুত নির্খুত রিপোর্টগুলি হয়ত তিনি মোটেই পড়েন নাই অথবা পড়িলেও তিনি তাহা লক্ষ্য করেন নাই বা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই—এইসব একজন নেতার দোষ হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি বিশ্বাস করেন, ইউরোপে তাঁহার তৈলের চাহিদা এত ব্যাপক যে তাঁহার তৈল ক্রয়ের জন্য সেখানে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়া যাইবে। তাঁহার অবগত হওয়া উচিত ছিল যে গ্রেট বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র বাহরাইন, কুয়েত ও সৌদী আরবের বিশাল তৈল ক্ষেত্র হইতেও ইহা লইতে পারে। কার্যতঃ তাহাই তাহারা করে। অধিকন্তু, তৈল পরিবহনের কোন ট্যাঙ্কারও ইরানের নাই। ইউরোপ ও আমেরিকার বড় বড় তৈল কোম্পানীগুলির একে অপরের সহিত যোগ-সূত্রে এবং তৈল রপ্তানী ও বাজারজাত করিবার ব্যাপারে তাহারা কিরূপ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে তাহা চার্টের সাহায্যে তাঁহাকে দেখানো হয়। বৃটিশ কোম্পানী জাতীয়করণের মোকাবিলা না করিলেও তৈল বাজারজাত করিবার ব্যাপারে ইরানকে অন্যান্য কোম্পানীর উপর নির্ভর করিতে হইত।

দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায় মোসাদ্দেক বৃটিশদের প্রতি তাঁহার ব্যক্তিগত ঘৃণার নিকট একজন দায়িত্বশীল নেতা হিসাবে তাঁহার বিচার বিবেককে বলি দেন। প্রস্তাবিত অনেকগুলি প্রকল্পের মধ্যে বিশ্ব ব্যাংক প্রস্তাবিত প্রকল্পটিই সম্ভবতঃ সর্বোত্তম। ইহা পারস্যের জাতীয়করণ আইনের সমস্ত ধারার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করে। কিন্তু তবুও মোসাদ্দেক ইহা প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ একটি নিরপেক্ষ সংস্থা হিসাবে ব্যাংক ইহার সরেজমিনে তদন্তের ব্যাপারে বৃটিশ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের স্বাধীনতার উপর জোর দেন।

সম্ভবতঃ মোসাদ্দেকের সকলের চাইতে বড় অসুবিধা হইল তিনি বিপ্লবী নহেন। জাতীয়করণের উপর তিনি এতই অভিভূত হইয়া যান যেন ইহাই শেষ, সংস্কারের জন্য একটি পদক্ষেপ নহে। তাঁহার কোয়ালিশন দল, জাতীয় ফ্রণ্টের সদস্যবর্গ পাছে অসন্তুষ্ট হন তাই তিনি আভ্যন্তরীণ সংস্কারের ব্যাপারে উদাসীন থাকেন। তিনি এমন কি শাহ্‌কেও তাঁহার নিজস্ব জমি বণ্টনে বাধা দান করেন, পাছে কোয়ালিশনের সদস্যবর্গ আঘাত পান। এতদসত্ত্বেও পারস্যবাসীদিগকে একটি অতি গভীর বিষয়ে সচেতন করিবার নেতা হিসাবে ডঃ মোসাদ্দেকের নাম পারস্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের আগস্টে জেনারেল জাহেদী তৈলের ব্যাপারে একটি সমাধানে উপনীত হন। যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের আটটি প্রধান তৈল কোম্পানীর একটি সংস্থা জাতীয় ইরানী তৈল কোম্পানীর তৈল আধা-আধি শেয়ারে উত্তোলন, পরিশোধন ও বাজারজাত করিবে। এই ব্যবস্থা মোসাদ্দেক কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করা ঠিক হয় নাই, অবশ্য মোসাদ্দেকের প্রচেষ্টা না থাকিলে ইহাও হইত না।

শাহ এবং শ্বেত বিপ্লব

১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের আগস্টে মোহাম্মদ রেজা শাহ্ পাহ্‌ভী তাঁহার আত্ম-নির্বাসন হইতে তেহরানে ফিরিবার সময় তাঁহার নিজস্ব কর্মপন্থা নির্ধারণ করিয়া আসেন। ১২ বৎসর পর্যন্ত তিনি সংবিধানিক নৃপতি হিসাবে রাজত্ব করিয়া আসেন, কিন্তু ইহাতে তিনি বা দেশ কোন উন্নতি লাভ করে নাই। ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁহাকে ফিরিয়া আসিবার সুযোগ দেওয়া হইলে তিনি নিজে শাসন করিবার প্রতিজ্ঞা লইয়া আসেন। তিনি বারংবার বলেন যে দরিদ্র-প্রপীড়িত, রোগশোকে জর্জড়িত লক্ষ লক্ষ লোকের উপর বাদশাহ হইবার পিছনে গৌরব নাই। তিনি তাঁহার জমির একটি অংশ কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া জমিদারদের দ্বারা "বলশেভিক শাহ" উপাধিতে ভূষিত হন। সেই একই ভূস্বামীগণই ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে মজলিশ নিয়ন্ত্রণ করে, প্রতি-ক্রিয়াশীল ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের পুরাতন ক্ষমতা ফিরিয়া পান এবং মোসাদ্দেকের পরাজয়ে আশাহত যুবক শিক্ষিত জাতীয়তাবাদীগণ তাঁহাদের ভাবধারায় হতাশ মনোভাব গ্রহণ করেন।

কিছু সংখ্যক পুরাতন সামরিক অফিসারদের দুর্নীতি ও প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের দরুন বেশ কিছু সংখ্যক যুবক অফিসার তুদেহ্ পার্টিতে যোগ দেন। তবুও বেশীর ভাগ সামরিক লোক তখনও রাজভক্ত। শাহ সাবধানে অগ্রসর হন। প্রতিবেশীদের সহিত ইরানের সম্পর্ক উন্নত করিবার মাধ্যমে তিনি কাজ আরম্ভ করেন। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের জুনে ইরান সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত একটি বাণিজ্য চুক্তি প্রণয়ন করে। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর নতুন সোভিয়েত নেতৃত্ব তখন বন্ধু লাভ করিতে আগ্রহী। পরে ইরান বাগদাদ প্যাক্টে যোগদান করে। ইহা ইরান, ইরাক, পাকিস্তান, তুরস্ক ও যুক্তরাজ্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা চুক্তি। বৃটিশের সদস্যভুক্তির ফলে এই চুক্তি পারস্যবাসীদের সমালোচনার বিষয় হইয়া উঠে, এবং রুশগণ প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করে। কিন্তু ইরাক এই প্রতিষ্ঠান ত্যাগের পর ইহার নাম পরিবর্তিত হইয়া সেন্টো (CENTO) হইলেও ইরান একজন শক্তিশালী সদস্য হিসাবে বিরাজ করে।

স্মরণ করা যাইতে পারে যে, শতাব্দী পরিবর্তনের পর হইতে একের পর এক পারস্য সরকারসমূহ বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করিতে চেষ্টা করে। শাহ এই ঐতিহ্য ভঙ্গ করেন এবং "মার্কিন শিবিরে" যোগদান করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিবাদের মুখে ইরানে একটি মার্কিন সামরিক মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একটি পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তির মাধ্যমে ইরান শুধু ব্যাপক অর্থনৈতিক সাহায্যই নহে বরং বিপুল পরিমাণে সামরিক সাজ-সরঞ্জামও লাভ করে। অবশ্য ইরান-মার্কিন চুক্তির দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক শাহকে মস্কো ও দেশের অন্যান্য অংশে সরকারী অতিথি হিসাবে সফর করিবার আমন্ত্রণ জ্ঞাপনের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে নাই। ইরান ও তুরস্ক প্রমাণ করে যে স্ট্যালিনোত্তর রাশিয়ার সুদৃষ্টিতে থাকিবার জন্য নিরপেক্ষতার প্রয়োজন নাই।

শাহ্ কৃষকদের মধ্যে তাঁহার জমি বণ্টন অব্যাহত রাখেন। তাঁহার উৎসাহে মন্ত্রীসভা মার্কিন সাহায্যের দ্বারা একের পর এক পাঁচসালা পরিকল্পনা উদ্বোধন করে। কৃষিনির্ভর অর্থনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সরকার বাঁধ, সেচ ব্যবস্থা ও পাওয়ার হাউস নির্মাণ করে। তৈল-শিল্প বিস্তার লাভ করে এবং এই খাতে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ব্যয় করা হয়।

১৯৬১ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ শাহ কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয় হইয়া উঠেন এবং জাতীয় ফ্রন্ট ও তুদেহ্ পার্টির কিছু সংখ্যক প্রাক্তন সদস্য ও অনুসারীর আস্থা অর্জন করেন। সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ রাজভক্ত হইয়া পড়ে এবং শাহ্ মনে করেন যে তিনি এখন যে কোন কাজে সক্ষম। তাঁহার অনুরোধে মজলিশে একটি প্রস্তাব প্রেরণ করা হয় যদ্বারা জমির ব্যক্তিগত মালিকানার সীমা নির্ধারণ করা হয়। উদ্‌বৃত্ত জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টনের জন্য সরকারের নিকট বিক্রয় করিতে ভূস্বামীদের বাধ্য করা হয়। জমিদার সমর্থিত মজলিশ এই প্রস্তাবে এত অধিক সংশোধন যুক্ত করে যে শেষ পর্যন্ত ইহা অর্থহীন হইয়া পড়ে। শাহের ভাষায়, "আমি বুঝিতে পারিলাম নিজে উদাহরণ সৃষ্টি করিলে, উপদেশ দিলে ..বা প্রচলিত প্রাথমিকপন্থা অবলম্বন করিলেও কাজ হইবে না।" অতএব তিনি তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের ৬ই মে তিনি মজলিশ ভাঙিয়া দেন এবং নতুন নির্বাচন না দিয়া তিনি কার্যতঃ সংবিধান স্থগিত রাখেন। একটি উদার মন্ত্রীসভা ভূমি-সংস্কারের একটি রাজকীয় ফরমান কার্যকরী করে। ৪০০ সেচ ব্যবস্থা যুক্ত এবং ৮০০ সেচ ব্যবস্থাহীন হেক্টরের অতিরিক্ত জমি সরকারের নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য করা হয়। জমির দাম স্বয়ং জমিদারগণ কর্তৃক দাখিল-কৃত আয়করের বিবরণ অনুসারে নির্ধারণ করা হয়। যেহেতু আয়কর কম দিবার জন্য জমি অবমূল্যায়ন করে নাই এইরূপ জমিদারদের সংখ্যা অতি বিরল, তাই একটি "অন্যায়ের" ধূয়া উত্থাপন করা হয়, কিন্তু জমিদার-দের করিবার মত কিছুই নাই। অবশ্য শাহও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া এই বিষয়ের উপর তেমন গুরুত্ব দেন নাই।

ইতিহাসে ইরানের শাহই সম্ভবতঃ প্রথম রাজা যিনি একটি কৃষক আন্দোলনের নেতা হন। ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারীতে পল্লী সমবায়ের একটি সম্মেলন উদ্বোধন করিবার কালে তিনি একটি ছয় দফা বিপ্লবী কর্ম-সূচী পেশ করেন। পরে ইহার সহিত আরও তিন দফা যোগ করা হয়। একটি জাতীয় গণভোটে শাহের এই "শ্বেত বিপ্লব" বিপুল ভোটাধিক্যে পারস্যবাসীগণ গ্রহণ করে। বিপ্লবের নয়টি লক্ষ্য হইল : ভূমিবণ্টন, বন-ভূমি জাতীয়করণ, ভূমিসংস্কার সুনিশ্চিত করিবার জন্য সরকারী মালিকানা কারখানাগুলির শেয়ার বিক্রয়, কারখানার লভ্যাংশে শ্রমিকদের অংশ

গ্রহণ, নির্বাচনের সংস্কার ও মহিলাদের ভোটাধিকার, গণশিক্ষা বাহিনী গঠন, জনস্বাস্থ্য বাহিনী গঠন, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন বাহিনী গঠন এবং সাম্য-গৃহ স্থাপন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন বাহিনী পরিচালিত হয় প্রধানতঃ শিক্ষিত যুবকদের দ্বারা, যাহারা দুই বৎসরের সামরিক জীবনের পরিবর্তে এই সকল উদ্ভাবনী কাজে তাহাদের সময় ব্যয় করে।

এইগুলি হইল সুদূর প্রসারী সংস্কার। ভূমিসংস্কার বাস্তবায়ন ও মহিলাদের ভোটাধিকারের ফলে জমিদার ও প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ক্রুদ্ধ হন। বিক্ষোভ ও রক্তপাত সংঘটিত হয়, কিন্তু শাহ অনমনীয়ভাব ধারণ করেন এবং অনেক বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ, এমন কি প্রসিদ্ধ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকেও তিনি কারাগারে বা নির্বাসনে প্রেরণ করেন। ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মতের মজলিশ গঠিত হয়। ইহার সদস্যবৃন্দ আধুনিকতা এবং শাহের শ্বেত বিপ্লবের কর্মসূচী বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। নতুন মজলিশে শাহ নবগঠিত নতুন ইরান দলের (New Iran Party) মাধ্যমে কাজ করেন। অন্যান্য দল ও ইহাদের সদস্যবৃন্দ মজলিশে থাকিলেও শুধু নিউ ইরানই শাহের মতামত কার্যকরী করে।

ইরানের সমস্যাবলীর সমাধান হয় নাই এবং এইগুলি সমাধান করিতে আরও প্রচেষ্টার প্রয়োজন। ভুলত্রুটি থাকিতে পারে কিন্তু সূচনা সাধিত হইয়াছে। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে যুবক শাহ্ তাঁহার পিতার উত্তরাধিকারী হইবার পর অনেকে আশ্চর্যান্বিত হইয়াছে; তিনি অভিষিক্ত হন নাই কেন? তিনি এই মন্তব্য করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় যে তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, কিন্তু রাজমুকুট তিনি জয় করিতে চান। অভিষেক অনুষ্ঠান হয় তাঁহার আট চল্লিশতম জন্ম বার্ষিকীতে, ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর। সেইদিন তিনি সম্রাজ্ঞী ফারাহকেও অভিষিক্ত করেন—ইহা মুসলিম ইরানে সম্পূর্ণ নতুন একটি ঘটনা। পারস্যবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ উৎসব নিশ্চয় এই কথাই প্রমাণ করে যে শাহ্ রাজমুকুট জয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

তুরস্ক—গণতন্ত্রের এক অগ্নি পরীক্ষা

জনগণের প্রতি কামাল আতাতুর্কের সম্বন্ধ ও বিচিত্র কীর্তি দুইভাগে ভাগ করা যায়। একটি হইল, বিশ্বের অন্যান্য জাতির তুলনায় তুর্কীগণ নিজেদের প্রতি কি মনোভাব পোষণ করে। দ্বিতীয়টি হইল, একটি স্বাধীন জাতি হিসাবে তুর্কীগণ নিজেদের প্রতি কিরূপভাবে তাকায়। তুর্কীদের মধ্যে প্রেসিডেণ্ট আতাতুর্ক এই উভয় প্রশ্নের গভীর ছাপ রাখিয়া যান। তাঁহার ভাবধারা ও নীতি অনুসরণ করিবার জন্য ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি রিপাবলিকান পিপল্স পার্টি গঠন করেন। এই দল "কামালবাদ" ও তাঁহার আদর্শ কার্যকরী করিবার মাধ্যম হইয়া উঠে।

আধুনিক তুরস্কের উপর আমাদের আলোচনা ইহাই প্রমাণ করে যে, আতাতুর্ক তুরস্কের মুক্তি নিজদিগকে ইউরোপীয় বলিয়া ধারণা করিবার মধ্যে নিহিত দেখিতে পান। তাঁহার অসংখ্য সংস্কারের মাধ্যমে তিনি অনিচ্ছুক ও গোঁড়া তুর্কীদিগকে প্রাচ্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে এবং পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি, চালচলন ও ভাবধারা গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করেন। কমিউনিষ্ট আদর্শ পাশ্চাত্য জগতে বিরাট ভাঙ্গন সৃষ্টি করিলে আতাতুর্ক ও তাঁহার সহচরবৃন্দ পাশ্চাত্য সভ্যতার কমিউনিস্ট ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করিয়া পশ্চিম ইউরোপের প্রতিষ্ঠানাদি ও ভাবধারা দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে তুর্কীদের নিকট কমিউনিজম গ্রহণযোগ্য হইলেও তাহাদের চিরাচরিত শত্রু রাশিয়া যেহেতু কমিউনিস্ট তাই এই আদর্শ তুর্কীরা পছন্দ করিতে পারে না।

ট্রুম্যান নীতি (The Truman Doctrine)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তুরস্ক যুদ্ধের প্রায় শেষ নাগাদ ইহার নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে সক্ষম হয়।

অবশ্য যুদ্ধের পরে পরেই তুরস্ক লক্ষ্য করে যে সে ইউরোপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। গ্রীস ব্যতীত সমগ্র বলকান রাশিয়ার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসনে চলিয়া যায়। পারস্যের আজার বাইজানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং কুর্দদের সম্ভাব্য স্বায়ত্তশাসন সফল হইলে তুরস্ক নিজেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার আওতাভুক্ত দেখিত। আধুনিক তুরস্কের প্রতি সোভিয়েত রাশিয়ার নীতি যে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতি জার রাশিয়ার চাইতে ভিন্ন হইবে না তাহা তুর্কীগণ বিশ্বাস না করিবার পিছনে কোন যুক্তি নাই।

বস্তুতঃ এই নীতি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তুর্কীদিগকে বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব তুরস্কের পার্বত্য অঞ্চল, কারস ও আর্দাহান দাবী করে। তৎসঙ্গে তাহারা প্রণালীতে ঘাঁটিও দাবী করে। তুরস্কের ইতিহাসে রাশিয়ার এই ধরনের দাবী নতুন নহে, এবং তুর্কীগণও সর্বদা এই সকল দাবী প্রতিহত করিয়া আসিতেছে। ইহার উত্তর প্রদান করিবার জন্য মস্কোতে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত সেলিম সোপের তাঁহার সরকারের সহিত আলোচনা করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। উভয় দাবী যুগপৎ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাঁহার সরকারের গোচরীভূত করেন।

কিন্তু রুশগণ সেই চিরাচরিত লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করে। প্রণালী উদ্ধার করিবার জন্য ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত মন্ট্রি চুক্তির (Montriux Convention) ২৯ নং ধারা মোতাবেক প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী প্রতি পাঁচ বৎসর শেষে এই চুক্তি পরিবর্তনের প্রস্তাব করিতে পারেন। চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে যেহেতু দ্বিতীয় পাঁচসালার বিরতি শেষ হয়, তাই ত্রিশক্তি (সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য) চুক্তিটি পরিবর্তনের মনঃস্থির করে। ফলে, মন্ট্রি চুক্তি পরিবর্তনে অংশ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র চারিটি প্রস্তাব পেশ করে। এইগুলি হইল প্রণালীর মধ্য দিয়া সমস্ত দেশের বাণিজ্য জাহাজ চলাচলের অনুমতি দেওয়া; কৃষ্ণ সাগরীয় দেশসমূহের যুদ্ধ জাহাজগুলিকে সর্বদা চলাচলের অনুমতি দেওয়া; কৃষ্ণ সাগরীয় দেশসমূহের অনুমতি ব্যতীত অন্য কোন দেশের যুদ্ধ জাহাজকে চলাচলের অনুমতি না দেওয়া, এবং চুক্তিটিকে সময়োপযোগী

করিবার জন্ত প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে।

চুক্তিভুক্ত সমস্ত দেশ এই সকল পরিবর্তন সমর্থন করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে প্রেরিত এক বার্তায় মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণ করে কিন্তু তাহার দুইটি প্রস্তাবও বিবেচনার জন্ত যোগ করে। প্রস্তাবগুলি হইল প্রণালী এলাকা কৃষ্ণ সাগরীয় শক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা; এবং প্রণালী প্রতিরক্ষার দায়িত্ব কৃষ্ণসাগরীয় শক্তিবর্গের হাতে ন্যস্ত করা। রাশিয়া পুনরায় প্রণালীতে স্থান করিবার জন্ত তাহার চিরাচরিত খেলা আরম্ভ করে। কৃষ্ণ সাগরীয় শক্তিবর্গের মধ্যে রহিয়াছে তুরস্ক, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, উকরাইন সোভিয়েত এবং সোভিয়েত রাশিয়া। ইহার অর্থ হইল একের বিরুদ্ধে চারি ভোট এবং ইহা গ্রহণ করা হইলে প্রণালীর কর্তৃত্ব যায় রাশিয়ার হাতে। স্বভাবতাই তুরস্ক ইহাতে সন্দেহ প্রকাশ করে। রাশিয়ার দাবী প্রত্যাখ্যান করিবার ব্যাপারে তুরস্ককে সাহায্য করিবার মত কোন শক্তি বা উপায় গ্রেট বৃটেনের নাই। সোভিয়েত চাপ প্রতিহত করিবার জন্ত তুরস্ককে প্রায় ১০ লক্ষ লোক সশস্ত্র অবস্থায় রাখিতে হয়। তুরস্ককে অবরোধ করিবার জন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন গ্রীসের উপর চাপ দেয়। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১২ই মার্চ মার্কিন কংগ্রেস একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব পেশ করে যাহাকে ট্রুম্যান নীতি (Truman Doctrine) বলা হয়। রুশ চাপ প্রতিহত করিবার জন্ত তুরস্ক ও গ্রীসকে শক্তিশালী করিতে ইহা ৪০ কোটি ডলার প্রদান করে। কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্তের নিকট ইহার অর্থ হইল "কমিউনিজমকে প্রতিরোধ" করা কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র দুর্বল পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিবর্গের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং রাশিয়াকে ইস্তাম্বুল ও প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রচেষ্টায় বাধা প্রদান করিতে প্রস্তুত হয়। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ ২৫০ কোটি ডলারে উন্নীত মার্কিন সাহায্য তুর্কী সেনাবাহিনীর যান্ত্রিক উন্নতি, রাস্তা নির্মাণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং সাধারণভাবে রুশ হুমকির মোকাবিলায় তুরস্ককে সাহায্য করিবার কাজে ব্যয় হয়।

তুরস্ক ও পাশ্চাত্য

ট্রুম্যান নীতি তুরস্ককে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করে এবং তদ্‌সঙ্গে একটি "ইউরোপীয়" শক্তি হিসাবে ইহাকে পাশ্চাত্য দেশভুক্ত করিবার পথ উন্মুক্ত করে। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে উত্তর দিক হইতে কমিউনিস্ট আগ্রাসন হইতে দক্ষিণ কোরীয় প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্ম জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী গঠন করিলে অগ্রগামী দেশসমূহের মধ্যে তুরস্ক প্রথম ৫০০০ সৈন্ম প্রেরণ করে। এই সব সৈন্ম জেনারেল ম্যাক আর্থারের অধীনে যুদ্ধ করে। যুদ্ধক্ষেত্রে তুর্কী সৈন্তদের বীরত্ব বিশ্ববাসীর প্রশংসা অর্জন করে এবং তাহাদিকে পাশ্চাত্য শিবিরের দিকে আর এক ধাপ আগাইয়া দেয়। বস্তুতঃ ইউরোপীয় হিসাবে চিহ্নিত হইবার তুর্কী আগ্রহ এত প্রবল যে ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহেরু "এশিয়া কনফারেন্সে" প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার আমন্ত্রণ জানাইলে তুর্কী সরকার তাহা প্রত্যাখ্যান করে। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি ও যুক্তরাষ্ট্র উত্তর আটলান্টিক চুক্তিসংস্থা (NATO) গঠন করিলে তুরস্ক সদস্তভুক্তির আবেদন করে। ন্যাটো (NATO) দেশগুলির মধ্যে এমন সকল সদস্তও অবশ্য বিদ্যমান যাহারা তুরস্কের সদস্যভুক্তির বিরোধিতা করে, কারণ ইহা আটলান্টিক দেশ নহে। কিন্তু সদস্য দেশ ইতালীর ক্ষেত্রেও এই কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। তুর্কী আবেদন ফলপ্রসূ হয়। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে গ্রীসের সহিত ইহাকেও সদস্যভুক্ত করা হয়। ইজমির ন্যাটোর পূর্বাঞ্চলীয় সদর দপ্তর হয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের লক্ষ্যসীমায় তুরস্কে গুরুত্বপূর্ণ নৌ ও বিমান ঘাঁটি স্থাপন করা হয়।

তুরস্ক ন্যাটো ও ইউরোপীয় পরিষদের (Council of Europe) ন্যায় পশ্চিম ইউরোপীয় জোটসমূহে যোগদানের পরেই শুধু ইহা প্রাচ্যের দেশসমূহের সহিত বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। সম্ভবতঃ একটি "ইউরোপীয়" শক্তি হিসাবে প্রাচ্যের প্রতিবেশীদের সহিত সে পারস্পরিক আঞ্চলিক ও প্রতিরক্ষামূলক সমস্যাদি নিরসনের জন্য অনুরূপ চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলে তুরস্ক পাকিস্তানের সহিত একটি পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদন করে এবং ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী প্রতিরক্ষার শূন্যতা পূরণ করিবার জন্য ইরানের সহিত বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান করে। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উৎসাহিত অনেকগুলি পারস্পরিক প্রতিরক্ষা

চুক্তিসমূহের মধ্যে ইহা একটি। ইহার সদস্যবৃন্দ হইল ইরান, ইরাক, তুরস্ক, পাকিস্তান ও যুক্তরাজ্য। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে এই চুক্তি হইতে ইরাকের পদত্যাগের পর ইহার নতুন নামকরণ হয় কেন্দ্রীয় চুক্তি সংস্থা (Central Treaty Organization বা CENTO) মধ্যপ্রাচ্যের "উত্তর গোলকে" তুরস্ক হইতে পাকিস্তান পর্যন্ত একটি প্রতিরক্ষা ব্যূহ সৃষ্টি করা হয়।

একাধিক দলীয় গণতন্ত্র

জাতির জন্য প্রদত্ত আতাতুর্কের আরেকটি ঐতিহ্য হইল জাতির আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন। ইহা কামালবাদের ছয় দফার মধ্যে রূপলাভ করে এবং তুরস্কের নিয়ন্ত্রক রিপাবলিকান পিপল্স্ পার্টি'র প্রধান পথ প্রদর্শকে পরিণত হয়। এই দফাগুলি হইল ঃ প্রজাতন্ত্রবাদ, জাতীয়তাবাদ, গণবাদ, রাষ্ট্রবাদ, ধর্মনিরপেক্ষবাদ ও সংস্কারবাদ।[১] এইগুলি তুর্কী সরকার ও সমাজের নিম্ন কাঠামো। বিভিন্ন সময় একটা বা আরেকটা দফার উপর জোর দেওয়া হয়, কিন্তু কোনটিই বাদ দেওয়া হয় না।

আতাতুর্কের জীবদ্দশায় গণতন্ত্রের মতবাদ সংবলিত গণবাদের উপর জোর দেওয়া হয়, কিন্তু ইহা চালু করা হয় নাই। সংস্কারসমূহকে প্রয়োজনীয় বিবেচনা করা হয়, কিন্তু তুরস্কে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হইবার পর গণতান্ত্রিক উপায়ে জনসাধারণের মতামত যাচাই করা হইলে কোন সংস্কার সাধনই সম্ভব হইত না। প্রেসিডেন্ট আতাতুর্ক সরকারের "রাজভক্ত বিরোধীদল" হিসাবে কাজ করিবার জন্য আরেকটি দল গঠনের অনুমতি প্রদানের বিষয়টি পরীক্ষা করেন, কিন্তু ইহা কার্যকরী হয় নাই। রাজভক্ত বিরোধীদলের মতবাদটি নতুন, এবং ফলে বিতর্ক গালাগালিতে রূপান্তরিত হয়। আতাতুর্ককে এই সিদ্ধান্ত বাদ দিয়া একদল দ্বারাই শাসনকার্য চালাইতে হয়। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর শীঘ্রই তুরস্ককে যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত বিশ্বের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করিতে হয়।

যুদ্ধের সময় নিরপেক্ষতার জন্য তুরস্ককে মাশুল দিতে হয় ব্যাপক হারে। জনগণ খাদ্যাভাব, মুদ্রাস্ফীতি ও অব্যবস্থামূলক করভারে জর্জরিত হয়।

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৭২।

আতাতুর্কের পার্টি হইলেও জনগণ ক্ষমতাসীন দলকে এইগুলির জন্য দায়ী করে। নেতৃত্ব আসিয়া পড়ে ইসমত ইনুনুর হাতে। দুর্নীতি দমনের ব্যাপারে ইনি আতাতুর্কের ন্যায় কঠোর নহেন। যুদ্ধ শেষে উদারতা দেখাইয়া প্রেসিডেণ্ট ইনুনু ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য রাজনৈতিক দল গঠনের অনুমতি প্রদান করেন। আতাতুর্কের রিপাবলিকান পিপলস্ পার্টির চারিজন নেতা, সেলাল বায়ার, আদনান মেন্দারেস, ফুয়াত কপরুলু ও রফিক করালতান দল ত্যাগ করিয়া ডেমোক্রেটিক পার্টি নামে একটি নতুন দল গঠন করেন। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করিবার তেমন সময় ছিল না। ৪৮৭ আসনের মধ্যে ডেমোক্রেটিক দল শুধু ৬০টি আসন লাভ করে। পরবর্তী চারি বৎসরে বিরোধী দলসমূহ নিজেদের দলীয় সংগঠনের জন্য যথেষ্ট সময় লাভ করে। ডেমোক্রেটিক পার্টি হইতে দলত্যাগ করিয়া কিছু লোক ন্যাশন পার্টি নামে একটি নতুন দল গঠন করে। দেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক কার্যকলাপ চলিতে থাকে। তুরস্কের রাজনৈতিক কার্যকলাপ লক্ষ্যকারী অনেকে অবাক হইয়া লক্ষ্য করেন যে, একটি একদলীয় একনায়কত্ববাদী দল ইহার নীতিমালা সমালোচনা করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া নির্বাচনে প্রায় পরাজয় বরণ করিবার মুখোমুখী হইয়া পড়ে। এই ধরনের ঘটনা ইতিহাসে বিরল।

সুদীর্ঘকাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবার ফলে রিপাবলিকান পার্টি বেশ সমালোচনার সম্মুখীন হয়। প্রকৃত ও কাল্পনিক দুর্নীতির অভিযোগ ছাড়াও যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণের দরুন তুরস্কের ব্যবসায়ীগণ অসন্তুষ্ট হয়; উচ্চমূল্যের দরুন শহরে লোকজন অসুখী হয়; ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে বাজেয়াফ্‌ত করের দরুন অমুসলমানগণ নিষ্পেষিত হয় বলিয়া মনে করে, এবং চাষীগণ তাহাদের উৎপাদনের বিনিময়ে শিল্পোন্নয়নের দ্বারা নিজদিগকে অবহেলিত বোধ করে। অবশ্য জাতিকে বিভক্তকারী প্রধান বিষয় হইল আতাতুর্কের ছয় দফার দুই দফা। এই দুইটি হইল অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারক রাষ্ট্রবাদ এবং ধর্মীয় বিষয়ের ধর্মনিরপেক্ষতা।

আতাতুর্ককে বিপ্লবে সাহায্যকারী এই সকল বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ এই নীতিসমূহের বিরোধিতা করেন না, তবে তাঁহাদের বক্তব্য হইল রিপাবলিকান পার্টি এইগুলির অপব্যাখ্যা করে। রিপাবলিকান পার্টির

সমালোচনার কারণ হইল ইহা। রাষ্ট্রবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষবাদকে জাতির সমৃদ্ধি ও উন্নতির লক্ষ্য মনে করে, উন্নতির উপায় নহে। নগরীর কেন্দ্রস্থলসমূহে ব্যবসায়ীগণ আরও অধিক ব্যক্তিগত ব্যবসা দাবী করে এবং আঙ্কারার বুর্জুয়াগণ কর্তৃক আরোপিত বিধিনিষেধের আরও শিথিলতা চায়। ডেমোক্রেটিক দল ধর্মনিরপেক্ষবাদের বিরূপ ব্যাখ্যার জন্য এবং "ধর্মের প্রতি বৈরীভাব পোষণের" কর্মসূচী প্রচার করিবার দায়ে সরকারকে দোষী করে। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে রিপাবলিকান দলের মধ্যেই এই মর্মে সন্দেহের উদ্রেক হয় যে তাহারা ধর্মনিরপেক্ষবাদ কার্যকরী করিতে যাইয়া হয়ত বেশী বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছে এবং ফলে এই ব্যাপারে আগ্রহী কৃষকদিগকেও শত্রু বিগড়াইয়া দিয়াছে। ফলে মাতাপিতার লিখিত অনুরোধে সরকার বিদ্যালয়সমূহে ধর্মীয় শিক্ষার অনুমতি প্রদান করে। সরকার সীমিত সংখ্যক লোককে মক্কায় হজ্ব করিতে যাইবার অনুমতি প্রদান করে, ইমাম প্রশিক্ষণের বিশেষ পাঠ্যসূচী গ্রহণ করে, আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ধর্মীয় অনুষদ প্রতিষ্ঠা করে এবং ওসমানীয় সুলতান ও ওসমানীয় যুগের অন্যান্য ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমাধিসমূহ খুলিয়া দেয়। অবশ্য এই সকল পন্থাসমূহ রিপাবলিকান পার্টিকে বাঁচাইতে ব্যর্থ হয়। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে ডেমোক্রেট দল বিপুল ভোটে জয় লাভ করে, ৪৮৭টি আসনের মধ্যে ৪১৬টি আসন, এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে সরকার হাতে পরিবর্তন করে।

ডেমোক্রেটিক পার্টির হাতে তুরস্ক

নতুন ন্যাশনাল এসেম্বলি ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রধান সেলাল বায়ারকে প্রেসিডেন্ট এবং আদনান মেন্দারেসকে প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত করে। নতুন সরকার পশ্চিম ইউরোপীয় গণতন্ত্রের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা লাভ করে, এবং নবাগত জাতিসমূহের জন্য ইহাকে আদর্শ বলিয়া গণ্য করা হয়। এইখানেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে গণতন্ত্রের পথে শিক্ষিত একটি জাতি কিভাবে কোন বিপ্লব ও রক্তপাত ছাড়া সরকার পরিবর্তন করিবার মত সুপরিপক্ক হয়। আবার এমন অনেকও রহিয়াছে, যাহাদের ধারণা, পরবর্তী ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে সামরিক বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাও বলা যায় যে, এইরূপ বিশ্বাস ও উৎসাহ অসময়োচিত। কিন্তু তুর্কী ইতিহাসের

পরিপ্রেক্ষিতে তুরস্কে গণতন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে করাও উচিত নহে।

১৯৫৪ ও ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে আসনের সংখ্যা কম হইলেও ডেমোক্রেটিক পার্টি বেশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ১৯৫০ হইতে ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তাহাদের এই শাসনের যুগে প্রধান কর্মসূচী ছিল ধর্মনিরপেক্ষবাদ ও রাষ্ট্রবাদের পুনঃব্যাখ্যা করা এবং নতুন ব্যাখ্যা কার্যকরী করা। অবশিষ্ট চারিটি নীতির মধ্যে প্রজাতন্ত্রবাদ ও জাতীয়তাবাদ এমন পাকা আসন গ্রহণ করে যে তুর্কী সমাজের অতিক্ষুদ্র অংশ ব্যতীত কেহই এইগুলি লইয়া বিতর্কের সৃষ্টি করে নাই। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের বাহক গণবাদের নীতি—যাহা রিপাবলিকান পিপলস্ পার্টির শাসনামলে অবহেলিত হয়, তাহা সেই পার্টির ইচ্ছানুযায়ীই এখন কার্যে পরিণত হয়। অবশ্য এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে গণবাদের নীতির উপর ভিত্তি করিয়া ক্ষমতায় আগত ডেমোক্রেটিক পার্টির বিরুদ্ধে বিরোধী দল সৃষ্টি হইবার আংশিক কারণ হইল এই দল বারংবার এইনীতি ধ্বংস করিবার প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে নির্বাচনের গঠিত একাধিক দলীয় প্রথার পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কারবাদের নীতি, অর্থাৎ সরকার কর্তৃক শক্তি প্রয়োগ দ্বারা সংস্কার সাধন করিবার অধিকার যেমন অপ্রয়োজনীয় তেমন অবাস্তব হইয়া পড়ে। অতঃপর বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া আতাতুর্কের ন্যায় তুরস্কে সংস্কার চাপাইয়া দেওয়া বোধহয় অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। যে দুইটি বিষয়ে জাতীয় ভিত্তিতে বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং ভবিষ্যতেও কিছুকাল এইরূপ চলিবার সম্ভাবনা এই দুইটি বিষয় হইল ধর্ম ও অর্থনীতি।

তুর্কী ধর্মনিরপেক্ষতা

আতাতুর্কের বিপ্লবের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। আতাতুর্কের নিকট ইহার অর্থ হইল জনজীবন হইতে ধর্মের প্রভাব এক রকম উঠাইয়া দেওয়া। আতাতুর্কের অনেক সহচর জনজীবনে ধর্মীয় হস্তক্ষেপের বিরোধী হইলেও তাঁহারা আতাতুর্কের এই পন্থা পছন্দ করে নাই, কারণ ইহার দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে তাহাদের ধর্মচর্চা করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে আতাতুর্ক একটি "খ্রাজভক

বিরোধী দল" হিসাবে প্রগ্রেসিভ রিপাবলিকান পার্টি নামে একটি দল গঠন করিবার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু তিনি ইহা পরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন প্রধানতঃ এই জন্য যে এই দল ব্যক্তিগত ধর্মীয় স্বাধীনতা সীমিত করিবার ব্যাপারে সরকার "বাড়াবাড়ি" করিয়েছে বলিয়া সমালোচনা করে। দীর্ঘদিন যাবত তুরস্কের অত্যন্ত বিতর্কমূলক আলোচনা সম্ভবতঃ সীমা নির্ধারণ লইয়া। সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করিলে তুর্কী সংস্কার আন্দোলন কর্তৃক বিলুপ্ত ওলামা, ইসলামী আইন ও সমস্ত পুরাতন অভ্যাস পুনর্বার চালু হইবার সমূহ সম্ভাবনা। আতাতুর্কের নিকট সমাধান অতি সাধারণ—তিনি দলবদ্ধভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশ্যে ধর্মচর্চা বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন। আতাতুর্ক যদিও জনসাধারণকে মসজিদে নামাজ পড়া বা নামাজের জন্য আজান দেওয়া নিষেধ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তুর্কী ভাষায় আজান দিতে বাধ্য করিয়া এবং যাহারা আরবীভাষা ব্যবহার করে (ইসলামী নীতি অনুযায়ী) তাহাদিগকে শাস্তি দিয়া প্রকারান্তরে তিনি আজান একরূপ বন্ধ করিয়া দেন।

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে নির্বাচনে একাধিক দলীয় ব্যবস্থা চালু হইবার পর ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারে আতাতুর্কের ব্যাখ্যা অনুসরণকারী রিপাবলিকান পিপল্স পার্টি বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। অতএব তাঁহারা এই আইন কিছুটা শিথিল করেন এবং বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষা, মক্কায় হজে যাওয়া এবং অন্যান্য রীতিনীতি পালন করিবার অনুমতি প্রদান করেন। অবশ্য ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টি নির্বাচনী প্রচারণার মধ্যে "পবিত্র মানবিক অধিকার হিসাবে ধর্মীয় স্বাধীনতা" অন্তর্ভুক্ত করে। নির্বাচনের সময় ডেমোক্রেট দল আবিষ্কার করে যে ধর্মীয় ব্যাপারে সরকারের বিরুদ্ধে গ্রামের লোকদের প্রবল বিক্ষোভ বিদ্যমান।

ডেমোক্রেটিক পার্টির অধীনে নতুন সরকারের প্রায় প্রথম কাজ হইল আজানে আরবীভাষা ব্যবহারের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা। ইহার পরে আসে রমজান মাসে রোজা পালন, ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশনা, ধর্মীয় আদেশ সংক্রান্ত আইনসমূহ শিথিল, ইমাম প্রশিক্ষণের বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং মসজিদ নির্মাণ করা। এক সমীক্ষায় দেখা যায় দশ

বৎসরের শাসনামলে ডেমোক্রেটিক দলের সরকার ৫০০০ মসজিদ ও সম-সংখ্যক সাধারণ স্কুল নির্মাণ করে। আতাতুর্কের ধর্মনিরপেক্ষবাদের ব্যাখ্যার অনুসারীগণের নিকট, যাহারা মসজিদ নির্মাণের বিরোধী, সমসংখ্যক বিদ্যালয় ও মসজিদ নির্মাণের অর্থ হইল এই নীতির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি। তুর্কী ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের রোষের কারণ হইল এই যে সরকার বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে পূর্ববর্তী আইনের বিপরীত কাজ করে। সমস্ত বিদ্যালয়ে ইহা ধর্মীয় শিক্ষা চালু করে এবং যে সকল অভিভাবক তাহাদের ছেলে-মেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষা চায় না তাহাদিগকে লিখিতভাবে অনুরোধ জ্ঞাপন করিবার বন্দোবস্ত করা হয়।

এতদসত্ত্বেও, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ত্যাগ করা বা তুর্কী প্রজাতন্ত্র গঠিত হইবার পূর্বের অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার কোন উদ্দেশ্য ডেমোক্রেটিক দল পোষণ করে নাই। কোন কোন দল ও ব্যক্তিবিশেষ অনুরূপ ভাবধারা চালু করিবার চেষ্টা করিলে সরকার ঐগুলিকে বন্ধ করিবার চেষ্টা করে। ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের সমালোচনার বিষয়বস্তু হইল, ধর্মকে গণ্ডীভূত করিবার আইন শিথিল করিলে পুরাতন রীতিনীতি পুনঃ প্রবর্তনে উৎসাহ প্রদান করা হয়। বস্তুতঃ ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে গঠিত ন্যাশন পার্টি এই ব্যাপারে ডেমোক্রেটিক পার্টির তুলনায় আগাইয়া যায়। ইহা জাতির ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রত্যাশা করে এবং প্রত্যেককে যে কোন ভাষায় ধর্মপালন করিবার স্বাধীনতা প্রদানের দাবী জানায়। ইহা ধর্মীয় দানসমূহ বা ওয়াক্‌ফ্ সম্পত্তি উলামাদের নিকট ফেরৎ প্রদানের দাবীও উত্থাপন করে। লুক্কায়িত ধর্মীয় সংস্থা পুনরায় জনসমক্ষে বাহির হয়, কেউ কেউ পাশ্চাত্যকরণ ও জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে লেখে ও বক্তৃতা প্রদান করে। কেউ কেউ আবার এইরূপও বলে যে, 'তুরস্ককে প্যালেস্টাইনে আরবদের স্বপক্ষে যুদ্ধ করা উচিত।' এই সকল দল বা লোকজনদের অধিকাংশকে স্তব্ধ করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু বিতর্ক চলিতে থাকে। ধর্মের এই পুনঃপ্রকাশের গূঢ় অর্থ সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত করিয়া কিছু বলিতে পারে না। ইহার অর্থ কি রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক উপযোগিতামূলকভাবে ধর্মের ব্যবহার নাকি পুরাতন ব্যবস্থার পুনর্বহাল, নাকি ধর্মীয় স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ, নাকি একটি নতুন ও সংস্কার-সাধিত ইসলামের পুনর্জাগরণ।

মোসাদ্দেকের পুনর্মূল্যায়ন

ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে ডঃ মোহাম্মদ মোসাদ্দেকের মধ্যে পারস্য-বাসীগণ এমন এক লোকের সন্ধান পায় যাহাকে তাহারা অবচেতন মনে খোঁজ করে—একজন চরিত্রবান, উদ্যোগী এবং অনুসরণ করিবার মত জন-প্রিয় নেতা। ইরানের আধুনিক ইতিহাসে ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দে তামাক এক-চেটিয়া করণের বিরুদ্ধে ধর্মঘট, ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে শাসনতন্ত্র প্রদানের জন্য ধর্মঘট, ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে মর্গান শুস্‌তারের স্বপক্ষে মিছিল এবং ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের প্রথমদিকে বংশ পরিবর্তনের জন্য বিক্ষোভের তুলনায় অধিক জন-প্রিয়তা অর্জন করে তৈল জাতীয়করণ। বৃটিশ ও অন্যান্য পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ পারস্যের মূল বক্তব্য অনুধাবন করে কিনা সন্দেহের বিষয়। বৃটিশগণ প্রথমে "যুদ্ধজাহাজ" কূটনীতি দ্বারা পারস্য সরকারকে কাবু করিতে চেষ্টা করে। ইহাতে এবং বিশ্বকোর্টে ব্যর্থ হইবার পর বৃটিশ পারস্যের তৈল উত্তোলন বন্ধ করিয়া দেয় এবং পারস্যের তৈল প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য অন্যান্য ইউরো-পীয়দিগকে পরামর্শ দেয় এবং মার্কিনবাসীদিগকে অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করিতে বলে, কিন্তু তাহাতেও ফলোদয় হয় নাই।

ইঙ্গ-ইরানী তৈল কোম্পানীর প্রতি বৃটিশ মুনাফা অর্জনকারী ব্যবসায়ীর দৃষ্টিতে তাকায়। পেশকৃত সমস্ত পরিকল্পনায় বৃটিশ শুধু কোম্পানীর সম্পত্তির মূল্যই দাবী করে নাই, বরং ১৯৯৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানী যে মুনাফা লাভ করিত তাহাও দাবী করে। পারস্য সরকার অবশ্য সম্পত্তির ক্ষতি-পূরণ দিতে রাজী হয়। বৃটিশ কোম্পানী সর্বদা মনে করে যে, তৈল উত্তোলন করিয়া সে ইরানের বিরাট উপকার করিয়াছে, কিন্তু পারস্যবাসীদের অকৃতজ্ঞ-তায় সে বিস্মিত হয়। এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানীর এই বিরাট লাভ সামঞ্জস্যহীন। কোন কোন বৎসর এই লাভ ১৫৮ শতাংশে দাঁড়ায়। তাহাদের প্রকৃত মনোভাব এই যে বৃটিশদের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম ব্যতীত পারস্য সরকার তৈল হইতে কোন আয়ই পাইত না।

অপরদিকে পারস্যবাসীগণ মুনাফার এক বিরাট অংশ দাবী করে। পারস্যের পরিদর্শকদিগকে হিসাবের খাতা দেখাইতে বার বার অস্বীকার করায় তাহারা অবাক হয়; বিদেশী কারিগরদের স্থলে পারস্যের কারিগর নিয়োগের ব্যাপারে বৃটিশদের অযথা বিলম্ব দেখিয়া তাহারা হতাশ হয়, এবং কোম্পানী

কর্তৃক দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লঙ্ঘন করিতে দেখিয়া তাহারা ক্রুদ্ধ হয়। তৈলের সমস্ত সেলামী যেহেতু পারস্যের সেনাবাহিনীর জন্য খরচ হয় এবং জনগণের নিকট আসে না তাই মোসাদ্দেকের সমর্থক ছোট ছোট ব্যবসায়ী, বুর্জুয়া গোষ্ঠী ও ছাত্রগণ কোম্পানী বন্ধ হইয়া গেলেও কোন পরোয়া করে না।

গোলযোগের সময় পারস্যবাসীদের আশা ও গর্বের মূল প্রেরণা আসে ডঃ মোসাদ্দেক হইতে। কিন্তু আন্দোলনের আংশিক ব্যর্থতা এবং পারস্য-বাসীদের অপমানের জন্যও তিনিই দায়ী। মোসাদ্দেক তৈল শিল্পের ব্যাপারে নিদারুণ উদাসীন থাকেন। তাঁহার জন্য প্রস্তুত নিখুঁত রিপোর্টগুলি হয়ত তিনি মোটেই পড়েন নাই অথবা পড়িলেও তিনি তাহা লক্ষ্য করেন নাই বা অনুসন্ধান করিয়া দেখেন নাই—এইসব একজন নেতার দোষ হিসাবে বিবেচিত হইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, তিনি বিশ্বাস করেন, ইউরোপে তাঁহার তৈলের চাহিদা এত ব্যাপক যে তাঁহার তৈল ক্রয়ের জন্য সেখানে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়া যাইবে। তাঁহার অবগত হওয়া উচিত ছিল যে গ্রেট বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র বাহরাইন, কুয়েত ও সৌদী আরবের বিশাল তৈল ক্ষেত্র হইতেও ইহা লইতে পারে। কার্যতঃ তাহাই তাহারা করে। অধিকন্তু, তৈল পরিবহনের কোন ট্যাঙ্কারও ইরানের নাই। ইউরোপ ও আমেরিকার বড় বড় তৈল কোম্পানীগুলির একে অপরের সহিত যোগ-সূত্র এবং তৈল রপ্তানী ও বাজারজাত করিবার ব্যাপারে তাহারা কিরূপ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে তাহা চার্টের সাহায্যে তাঁহাকে দেখানো হয়। বৃটিশ কোম্পানী জাতীয়করণের মোকাবিলা না করিলেও তৈল বাজারজাত করিবার ব্যাপারে ইরানকে অন্যান্য কোম্পানীর উপর নির্ভর করিতে হইত।

দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যায় মোসাদ্দেক বৃটিশদের প্রতি তাঁহার ব্যক্তিগত ঘৃণার নিকট একজন দায়িত্বশীল নেতা হিসাবে তাঁহার বিচার বিবেককে বলি দেন। প্রস্তাবিত অনেকগুলি প্রকল্পের মধ্যে বিশ্ব ব্যাংক প্রস্তাবিত প্রকল্পটিই সম্ভবতঃ সর্বোত্তম। ইহা পারস্যের জাতীয়করণ আইনের সমস্ত ধারার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করে। কিন্তু তবুও মোসাদ্দেক ইহা প্রত্যাখ্যান করেন, কারণ একটি নিরপেক্ষ সংস্থা হিসাবে ব্যাংক ইহার সরেজমিনে তদন্তের ব্যাপারে বৃটিশ ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের স্বাধীনতার উপর জোর দেয়।

সম্ভবতঃ মোসাদ্দেকের সকলের চাইতে বড় অসুবিধা হইল তিনি বিপ্লবী নহেন। জাতীয়করণের উপর তিনি এতই অভিভূত হইয়া যান যেন ইহাই শেষ, সংস্কারের জন্য একটি পদক্ষেপ নহে। তাঁহার কোয়ালিশন দল, জাতীয় ফ্রন্টের সদস্যবর্গ পাছে অসন্তুষ্ট হন তাই তিনি আভ্যন্তরীণ সংস্কারের ব্যাপারে উদাসীন থাকেন। তিনি এমন কি শাহ্‌কেও তাঁহার নিজস্ব জমি বণ্টনে বাধা দান করেন, পাছে কোয়ালিশনের সদস্যবর্গ আঘাত পান। এতদসত্ত্বেও পারস্যবাসীদিগকে একটি অতি গভীর বিষয়ে সচেতন করিবার নেতা হিসাবে ডঃ মোসাদ্দেকের নাম পারস্যের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের আগস্টে জেনারেল জাহেদী তৈলের ব্যাপারে একটি সমাধানে উপনীত হন। যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, হল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের আটটি প্রধান তৈল কোম্পানীর একটি সংস্থা জাতীয় ইরানী তৈল কোম্পানীর তৈল আধা-আধি শেয়ারে উত্তোলন, পরিশোধন ও বাজারজাত করিবে। এই ব্যবস্থা মোসাদ্দেক কর্তৃক প্রত্যাখ্যান করা ঠিক হয় নাই, অবশ্য মোসাদ্দেকের প্রচেষ্টা না থাকিলে ইহাও হইত না।

শাহ এবং শ্বেত বিপ্লব

১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের আগস্টে মোহাম্মদ রেজা শাহ পাহ্‌ভী তাঁহার আত্ম-নির্বাসন হইতে তেহরানে ফিরিবার সময় তাঁহার নিজস্ব কর্মপন্থা নির্ধারণ করিয়া আসেন। ১২ বৎসর পর্যন্ত তিনি সংবিধানিক নৃপতি হিসাবে রাজত্ব করিয়া আসেন, কিন্তু ইহাতে তিনি বা দেশ কোন উন্নতি লাভ করে নাই। ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁহাকে ফিরিয়া আসিবার সুযোগ দেওয়া হইলে তিনি নিজে শাসন করিবার প্রতিজ্ঞা লইয়া আসেন। তিনি বারংবার বলেন যে দরিদ্র-প্রপীড়িত, রোগশোকে জর্জড়িত লক্ষ লক্ষ লোকের উপর বাদশাহ হইবার পিছনে গৌরব নাই। তিনি তাঁহার জমির একটি অংশ কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া জমিদারদের দ্বারা "বলশেভিক শাহ" উপাধিতে ভূষিত হন। সেই একই ভূস্বামীগণই ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে মজলিশ নিয়ন্ত্রণ করে, প্রতি-ক্রিয়াশীল ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তাঁহাদের পুরাতন ক্ষমতা ফিরিয়া পান এবং মোসাদ্দেকের পরাজয়ে আশাহত যুবক শিক্ষিত জাতীয়তাবাদীগণ তাঁহাদের ভাবধারার হতাশ মনোভাব ব্যক্ত করেন।

কিছু সংখ্যক পুরাতন সামরিক অফিসারদের দুর্নীতি ও প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের দরুন বেশ কিছু সংখ্যক যুবক অফিসার তুদেহ্ পার্টিতে যোগ দেন। তবুও বেশীর ভাগ সামরিক লোক তখনও রাজভক্ত। শাহ্ সাবধানে অগ্রসর হন। প্রতিবেশীদের সহিত ইরানের সম্পর্ক উন্নত করিবার মাধ্যমে তিনি কাজ আরম্ভ করেন। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের জুনে ইরান সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত একটি বাণিজ্য চুক্তি প্রণয়ন করে। স্ট্যালিনের মৃত্যুর পর নতুন সোভিয়েত নেতৃত্ব তখন বন্ধু লাভ করিতে আগ্রহী। পরে ইরান বাগদাদ প্যাক্টে যোগদান করে। ইহা ইরান, ইরাক, পাকিস্তান, তুরস্ক ও যুক্তরাজ্য কর্তৃক স্বাক্ষরিত একটি আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা চুক্তি। বৃটিশের সদস্যভুক্তির ফলে এই চুক্তি পারস্যবাসীদের সমালোচনার বিষয় হইয়া উঠে, এবং রুশগণ প্রতিবাদ লিপি প্রেরণ করে। কিন্তু ইরাক এই প্রতিষ্ঠান ত্যাগের পর ইহার নাম পরিবর্তিত হইয়া সেন্টো (CENTO) হইলেও ইরান একজন শক্তিশালী সদস্য হিসাবে বিরাজ করে।

স্মরণ করা যাইতে পারে যে, শতাব্দী পরিবর্তনের পর হইতে একের পর এক পারস্য সরকারসমূহ বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করিতে চেষ্টা করে। শাহ এই ঐতিহ্য ভঙ্গ করেন এবং "মার্কিন শিবিরে" যোগদান করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিবাদের মুখে ইরানে একটি মার্কিন সামরিক মিশন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একটি পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তির মাধ্যমে ইরান শুধু ব্যাপক অর্থনৈতিক সাহায্যই নহে বরং বিপুল পরিমাণে সামরিক সাজ-সরঞ্জামও লাভ করে। অবশ্য ইরান-মার্কিন চুক্তির দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক শাহকে মস্কো ও দেশের অন্যান্য অংশে সরকারী অতিথি হিসাবে সফর করিবার আমন্ত্রণ জ্ঞাপনের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করে নাই। ইরান ও তুরস্ক প্রমাণ করে যে স্ট্যালিনোত্তর রাশিয়ার সুদৃষ্টিতে থাকিবার জন্য নিরপেক্ষতার প্রয়োজন নাই।

শাহ্ কৃষকদের মধ্যে তাঁহার জমি বণ্টন অব্যাহত রাখেন। তাঁহার উৎসাহে মন্ত্রীসভা মার্কিন সাহায্যের দ্বারা একের পর এক পাঁচসালা পরিকল্পনা উদ্বোধন করে। কৃষিনির্ভর অর্থনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সরকার বাঁধ, সেচ ব্যবস্থা ও পাওয়ার হাউস নির্মাণ করে। তৈল-শিল্প বিস্তার লাভ করে এবং এই খাতে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ব্যয় করা হয়।

১৯৬১ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ শাহ কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয় হইয়া উঠেন এবং জাতীয় ফ্রন্ট ও তুদেহ্ পার্টির কিছু সংখ্যক প্রাক্তন সদস্য ও অনুসারীর আস্থা অর্জন করেন। সেনাবাহিনী সম্পূর্ণ রাজভক্ত হইয়া পড়ে এবং শাহ্ মনে করেন যে তিনি এখন যে কোন কাজে সক্ষম। তাঁহার অনুরোধে মজলিশে একটি প্রস্তাব প্রেরণ করা হয় যদ্বারা জমির ব্যক্তিগত মালিকানার সীমা নির্ধারণ করা হয়। উদ্বৃত্ত জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টনের জন্য সরকারের নিকট বিক্রয় করিতে ভূস্বামীদের বাধ্য করা হয়। জমিদার সমর্থিত মজলিশ এই প্রস্তাবে এত অধিক সংশোধন যুক্ত করে যে শেষ পর্যন্ত ইহা অর্থহীন হইয়া পড়ে। শাহের ভাষায়, "আমি বুঝিতে পারিলাম নিজে উদাহরণ সৃষ্টি করিলে, উপদেশ দিলে ..বা প্রচলিত প্রাথমিকপন্থা অবলম্বন করিলেও কাজ হইবে না।" অতএব তিনি তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের ৬ই মে তিনি মজলিশ ভাঙ্গিয়া দেন এবং নতুন নির্বাচন না দিয়া তিনি কার্যতঃ সংবিধান স্থগিত রাখেন। একটি উদার মন্ত্রীসভা ভূমি-সংস্কারের একটি রাজকীয় ফরমান কার্যকরী করে। ৪০০ সেচ ব্যবস্থা যুক্ত এবং ৮০০ সেচ ব্যবস্থাহীন হেক্টরের অতিরিক্ত জমি সরকারের নিকট বিক্রয় করিতে বাধ্য করা হয়। জমির দাম স্বয়ং জমিদারগণ কর্তৃক দাখিল-কৃত আয়করের বিবরণ অনুসারে নির্ধারণ করা হয়। যেহেতু আয়কর কম দিবার জন্য জমি অবমূল্যায়ন করে নাই এইরূপ জমিদারদের সংখ্যা অতি বিরল, তাই একটি "অন্যায়ের" ধূয়া উত্থাপন করা হয়, কিন্তু জমিদার-দের করিবার মত কিছুই নাই। অবশ্য শাহ্ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়া এই বিষয়ের উপর তেমন গুরুত্ব দেন নাই।

ইতিহাসে ইরানের শাহই সম্ভবতঃ প্রথম রাজা যিনি একটি কৃষক আন্দোলনের নেতা হন। ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারীতে পল্লী সমবায়ের একটি সম্মেলন উদ্বোধন করিবার কালে তিনি একটি ছয় দফা বিপ্লবী কর্ম-সূচী পেশ করেন। পরে ইহার সহিত আরও তিন দফা যোগ করা হয়। একটি জাতীয় গণভোটে শাহের এই "শ্বেত বিপ্লব" বিপুল ভোটাধিক্যে পারস্যবাসীগণ গ্রহণ করে। বিপ্লবের নয়টি লক্ষ্য হইল ঃ ভূমিবণ্টন, বন-ভূমি জাতীয়করণ, ভূমিসংস্কার সুনিশ্চিত করিবার জন্য সরকারী মালিকানা কারখানাগুলির শেয়ার বিক্রয়, কারখানার লভ্যাংশে শ্রমিকদের অংশ

গ্রহণ, নির্বাচনের সংস্কার ও মহিলাদের ভোটাধিকার, গণশিক্ষা বাহিনী গঠন, জনস্বাস্থ্য বাহিনী গঠন, সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন বাহিনী গঠন এবং সাম্য-গৃহ স্থাপন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন বাহিনী পরিচালিত হয় প্রধানতঃ শিক্ষিত যুবকদের দ্বারা, যাহারা দুই বৎসরের সামরিক জীবনের পরিবর্তে এই সকল উদ্ভাবনী কাজে তাহাদের সময় ব্যয় করে।

এইগুলি হইল সুদূর প্রসারী সংস্কার। ভূমিসংস্কার বাস্তবায়ন ও মহিলা-দের ভোটাধিকারের ফলে জমিদার ও প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ ক্রুদ্ধ হন; বিক্ষোভ ও রক্তপাত সংঘটিত হয়, কিন্তু শাহ অনমনীয়ভাব ধারণ করেন এবং অনেক বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ, এমন কি প্রসিদ্ধ ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকেও তিনি কারাগারে বা নির্বাসনে প্রেরণ করেন। ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মতের মজলিশ গঠিত হয়। ইহার সদস্যবৃন্দ আধুনিকতা এবং শাহের শ্বেত বিপ্লবের কর্মসূচী বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। নতুন মজলিশে শাহ নবগঠিত নতুন ইরান দলের (New Iran Party) মাধ্যমে কাজ করেন। অন্যান্য দল ও ইহাদের সদস্যবৃন্দ মজলিশে থাকিলেও শুধু নিউ ইরানই শাহের মতামত কার্যকরী করে।

ইরানের সমস্যাবলীর সমাধান হয় নাই এবং এইগুলি সমাধান করিতে আরও প্রচেষ্টার প্রয়োজন। ভুলত্রুটি থাকিতে পারে কিন্তু সূচনা সাধিত হইয়াছে। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে যুবক শাহ্ তাঁহার পিতার উত্তরাধিকারী হইবার পর অনেকে আশ্চর্যান্বিত হইয়াছে; তিনি অভিষিক্ত হন নাই কেন? তিনি এই মন্তব্য করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায় যে তিনি সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, কিন্তু রাজমুকুট তিনি জয় করিতে চান। অভিষেক অনুষ্ঠান হয় তাঁহার আট চল্লিশতম জন্ম বার্ষিকীতে, ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে অক্টোবর। সেইদিন তিনি সম্রাজ্ঞী ফারাহকেও অভিষিক্ত করেন—ইহা মুসলিম ইরানে সম্পূর্ণ নতুন একটি ঘটনা। পারস্যবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ উৎসব নিশ্চয় এই কথাই প্রমাণ করে যে শাহ্ রাজমুকুট জয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

তুরস্ক—গণতন্ত্রের এক অগ্নি পরীক্ষা

জনগণের প্রতি কামাল আতাতুর্কের সমৃদ্ধ ও বিচিত্র কীর্তি দুইভাগে ভাগ করা যায়। একটি হইল, বিশ্বের অন্যান্য জাতির তুলনায় তুর্কীগণ নিজেদের প্রতি কি মনোভাব পোষণ করে। দ্বিতীয়টি হইল, একটি স্বাধীন জাতি হিসাবে তুর্কীগণ নিজেদের প্রতি কিরূপভাবে তাকায়। তুর্কীদের মধ্যে প্রেসিডেণ্ট আতাতুর্ক এই উভয় প্রশ্নের গভীর ছাপ রাখিয়া যান। তাঁহার ভাবধারা ও নীতি অনুসরণ করিবার জন্য ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি রিপাবলিকান পিপল্‌স পার্টি গঠন করেন। এই দল "কামালবাদ" ও তাঁহার আদর্শ কার্যকরী করিবার মাধ্যম হইয়া উঠে।

আধুনিক তুরস্কের উপর আমাদের আলোচনা ইহাই প্রমাণ করে যে, আতাতুর্ক তুরস্কের মুক্তি নিজদিগকে ইউরোপীয় বলিয়া ধারণা করিবার মধ্যে নিহিত দেখিতে পান। তাঁহার অসংখ্য সংস্কারের মাধ্যমে তিনি অনিচ্ছুক ও গোঁড়া তুর্কীদিগকে প্রাচ্যের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে এবং পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি, চালচলন ও ভাবধারা গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করেন। কমিউনিষ্ট আদর্শ পাশ্চাত্য জগতে বিরাট ভাঙ্গন সৃষ্টি করিলে আতাতুর্ক ও তাঁহার সহচরবৃন্দ পাশ্চাত্য সভ্যতার কমিউনিস্ট ব্যাখ্যা প্রত্যাখ্যান করিয়া পশ্চিম ইউরোপের প্রতিষ্ঠানাদি ও ভাবধারা দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করেন। স্মরণ রাখিতে হইবে যে তুর্কীদের নিকট কমিউনিজম গ্রহণযোগ্য হইলেও তাহাদের চিরাচরিত শত্রু রাশিয়া যেহেতু কমিউনিস্ট তাই এই আদর্শ তুর্কীরা পছন্দ করিতে পারে না।

ট্রুম্যান নীতি (The Truman Doctrine)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তুরস্ক যুদ্ধের প্রায় শেষ নাগাদ ইহার নিরপেক্ষতা বজায় রাখিতে সক্ষম হয়।

অবশ্য যুদ্ধের পরে পরেই তুরস্ক লক্ষ্য করে যে সে ইউরোপ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। গ্রীস ব্যতীত সমগ্র বলকান রাশিয়ার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ শাসনে চলিয়া যায়। পারস্যের আজার বাইজানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং কুর্দদের সম্ভাব্য স্বায়ত্তশাসন সফল হইলে তুরস্ক নিজেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে সোভিয়েত রাশিয়ার আওতাভুক্ত দেখিত। আধুনিক তুরস্কের প্রতি সোভিয়েত রাশিয়ার নীতি যে ওসমানীয় সাম্রাজ্যের প্রতি জার রাশিয়ার চাইতে ভিন্ন হইবে না তাহা তুর্কীগণ বিশ্বাস না করিবার পিছনে কোন যুক্তি নাই।

বস্তুতঃ এই নীতি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তুর্কীদিগকে বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হয় নাই। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে যুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বেই সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব তুরস্কের পার্বত্য অঞ্চল, কারস ও আর্দাহান দাবী করে। তৎসঙ্গে তাহারা প্রণালীতে ঘাঁটিও দাবী করে। তুরস্কের ইতিহাসে রাশিয়ার এই ধরনের দাবী নতুন নহে, এবং তুর্কীগণও সর্বদা এই সকল দাবী প্রতিহত করিয়া আসিতেছে। ইহার উত্তর প্রদান করিবার জন্য মস্কোতে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত সেলিম সোপের তাঁহার সরকারের সহিত আলোচনা করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। উভয় দাবী যুগপৎ তিনি প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাঁহার সরকারের গোচরীভূত করেন।

কিন্তু রুশগণ সেই চিরাচরিত লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করে। প্রণালী উদ্ধার করিবার জন্য ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত মন্ট্রি চুক্তির (Montriux Convention) ২৯ নং ধারা মোতাবেক প্রত্যেক স্বাক্ষরকারী প্রতি পাঁচ বৎসর শেষে এই চুক্তি পরিবর্তনের প্রস্তাব করিতে পারেন। চুক্তি স্বাক্ষরিত হইবার পর ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে যেহেতু দ্বিতীয় পাঁচসালার বিরতি শেষ হয়, তাই ত্রিশক্তি (সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য) চুক্তিটি পরিবর্তনের মনঃস্থির করে। ফলে, মন্ট্রি চুক্তি পরিবর্তনে অংশ গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়া যুক্তরাষ্ট্র চারিটি প্রস্তাব পেশ করে। এইগুলি হইল প্রণালীর মধ্য দিয়া সমস্ত দেশের বাণিজ্য জাহাজ চলাচলের অনুমতি দেওয়া; কৃষ্ণ সাগরীয় দেশসমূহের যুদ্ধ জাহাজগুলিকে সর্বদা চলাচলের অনুমতি দেওয়া; কৃষ্ণ সাগরীয় দেশসমূহের অনুমতি ব্যতীত অন্য কোন দেশের যুদ্ধ জাহাজকে চলাচলের অনুমতি না দেওয়া, এবং চুক্তিটিকে সময়োপযোগী

করিবার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে।

চুক্তিভুক্ত সমস্ত দেশ এই সকল পরিবর্তন সমর্থন করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে প্রেরিত এক বার্তায় মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণ করে কিন্তু তাহার দুইটি প্রস্তাবও বিবেচনার জন্য যোগ করে। প্রস্তাবগুলি হইল প্রণালী এলাকা কৃষ্ণ সাগরীয় শক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা ; এবং প্রণালী প্রতিরক্ষার দায়িত্ব কৃষ্ণসাগরীয় শক্তিবর্গের হাতে ন্যস্ত করা। রাশিয়া পুনরায় প্রণালীতে স্থান করিবার জন্য তাহার চিরাচরিত খেলা আরম্ভ করে। কৃষ্ণ সাগরীয় শক্তিবর্গের মধ্যে রহিয়াছে তুরস্ক, বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, উকরাইন সোভিয়েত এবং সোভিয়েত রাশিয়া। ইহার অর্থ হইল একের বিরুদ্ধে চারি ভোট এবং ইহা গ্রহণ করা হইলে প্রণালীর কর্তৃত্ব যায় রাশিয়ার হাতে। স্বভাবতঃই তুরস্ক ইহাতে সন্দেহ প্রকাশ করে। রাশিয়ার দাবী প্রত্যাখ্যান করিবার ব্যাপারে তুরস্ককে সাহায্য করিবার মত কোন শক্তি বা উপায় গ্রেট ব্রটেনের নাই। সোভিয়েত চাপ প্রতিহত করিবার জন্য তুরস্ককে প্রায় ১০ লক্ষ লোক সশস্ত্র অবস্থায় রাখিতে হয়। তুরস্ককে অবরোধ করিবার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন গ্রীসের উপর চাপ দেয়। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১২ই মার্চ মার্কিন কংগ্রেস একটি ঐতিহাসিক প্রস্তাব পেশ করে যাহাকে ট্রুম্যান নীতি (Truman Doctrine) বলা হয়। রুশ চাপ প্রতিহত করিবার জন্য তুরস্ক ও গ্রীসকে শক্তিশালী করিতে ইহা ৪০ কোটি ডলার প্রদান করে। কংগ্রেসের অধিকাংশ সদস্যের নিকট ইহার অর্থ হইল "কমিউনিজমকে প্রতিরোধ" করা কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র দুর্বল পশ্চিম ইউরোপীয় শক্তিবর্গের স্থলাভিষিক্ত হয় এবং রাশিয়াকে ইস্তাম্বুল ও প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করিবার প্রচেষ্টায় বাধা প্রদান করিতে প্রস্তুত হয়। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ ২৫০ কোটি ডলারে উন্নীত মার্কিন সাহায্য তুর্কী সেনাবাহিনীর যান্ত্রিক উন্নতি, রাস্তা নির্মাণ, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং সাধারণভাবে রুশ হুমকির মোকাবিলায় তুরস্ককে সাহায্য করিবার কাজে ব্যয় হয়।

তুরস্ক ও পাশ্চাত্য

ট্রুম্যান নীতি তুরস্ককে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করে এবং তৎসঙ্গে একটি "ইউরোপীয়" শক্তি হিসাবে ইহাকে পাশ্চাত্য দেশভুক্ত করিবার পথ উন্মুক্ত করে। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে উত্তর দিক হইতে কমিউনিস্ট আগ্রাসন হইতে দক্ষিণ কোরীয় প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনী গঠন করিলে অগ্রগামী দেশসমূহের মধ্যে তুরস্ক প্রথম ৫০০০ সৈন্য প্রেরণ করে। এই সব সৈন্য জেনারেল ম্যাক আর্থারের অধীনে যুদ্ধ করে। যুদ্ধক্ষেত্রে তুর্কী সৈন্যদের বীরত্ব বিশ্ববাসীর প্রশংসা অর্জন করে এবং তাহাদিকে পাশ্চাত্য শিবিরের দিকে আর এক ধাপ আগাইয়া দেয়। বস্তুতঃ ইউরোপীয় হিসাবে চিহ্নিত হইবার তুর্কী আগ্রহ এত প্রবল যে ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহেরু "এশিয়া কনফারেন্সে" প্রতিনিধি প্রেরণ করিবার আমন্ত্রণ জানাইলে তুর্কী সরকার তাহা প্রত্যাখ্যান করে। পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলি ও যুক্তরাষ্ট্র উত্তর আটলান্টিক চুক্তিসংস্থা (NATO) গঠন করিলে তুরস্ক সদস্যভুক্তির আবেদন করে। ন্যাটো (NATO) দেশগুলির মধ্যে এমন সকল সদস্যও অবশ্য বিদ্যমান যাহারা তুরস্কের সদস্যভুক্তির বিরোধিতা করে, কারণ ইহা আটলান্টিক দেশ নহে। কিন্তু সদস্য দেশ ইতালীর ক্ষেত্রেও এই কথা সমানভাবে প্রযোজ্য। তুর্কী আবেদন ফলপ্রসূ হয়। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে গ্রীসের সহিত ইহাকেও সদস্যভুক্ত করা হয়। ইজমির ন্যাটোর পূর্বাঞ্চলীয় সদর দপ্তর হয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের লক্ষ্যসীমায় তুরস্কে গুরুত্বপূর্ণ নৌ ও বিমান ঘাঁটি স্থাপন করা হয়।

তুরস্ক ন্যাটো ও ইউরোপীয় পরিষদের (Council of Europe) ন্যায় পশ্চিম ইউরোপীয় জোটসমূহে যোগদানের পরেই শুধু ইহা প্রাচ্যের দেশসমূহের সহিত বিভিন্ন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। সম্ভবতঃ একটি "ইউরোপীয়" শক্তি হিসাবে প্রাচ্যের প্রতিবেশীদের সহিত সে পারস্পরিক আঞ্চলিক ও প্রতিরক্ষামূলক সমস্যাদি নিরসনের জন্য অনুরূপ চুক্তি স্বাক্ষর করে। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিলে তুরস্ক পাকিস্তানের সহিত একটি পারস্পরিক সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদন করে এবং ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী প্রতিরক্ষার শূন্যতা পূরণ করিবার জন্য ইরানের সহিত বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান করে। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উৎসাহিত অনেকগুলি পারস্পরিক প্রতিরক্ষা

চুক্তিসমূহের মধ্যে ইহা একটি। ইহার সদস্যবৃন্দ হইল ইরান, ইরাক, তুরস্ক, পাকিস্তান ও যুক্তরাজ্য। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে যে এই চুক্তি হইতে ইরাকের পদত্যাগের পর ইহার নতুন নামকরণ হয় কেন্দ্রীয় চুক্তি সংস্থা (Central Treaty Organization বা CENTO) মধ্যপ্রাচ্যের "উত্তর গোলকে" তুরস্ক হইতে পাকিস্তান পর্যন্ত একটি প্রতিরক্ষা ব্যূহ সৃষ্টি করা হয়।

একাধিক দলীয় গণতন্ত্র

জাতির জন্য প্রদত্ত আতাতুর্কের আরেকটি ঐতিহ্য হইল জাতির আভ্যন্তরীণ উন্নয়ন। ইহা কামালবাদের ছয় দফার মধ্যে রূপলাভ করে এবং তুরস্কের নিয়ন্ত্রক রিপাবলিকান পিপলস্ পার্টি'র প্রধান পথ প্রদর্শকে পরিণত হয়। এই দফাগুলি হইল ঃ প্রজাতন্ত্রবাদ, জাতীয়তাবাদ, গণবাদ, রাষ্ট্রবাদ, ধর্মনিরপেক্ষবাদ ও সংস্কারবাদ।[১] এইগুলি তুর্কী সরকার ও সমাজের নিম্ন কাঠামো। বিভিন্ন সময় একটা বা আরেকটা দফার উপর জোর দেওয়া হয়, কিন্তু কোনটিই বাদ দেওয়া হয় না।

আতাতুর্কের জীবদ্দশায় গণতন্ত্রের মতবাদ সংবলিত গণবাদের উপর জোর দেওয়া হয়, কিন্তু ইহা চালু করা হয় নাই। সংস্কারসমূহকে প্রয়োজনীয় বিবেচনা করা হয়, কিন্তু তুরস্কে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হইবার পর গণতান্ত্রিক উপায়ে জনসাধারণের মতামত যাচাই করা হইলে কোন সংস্কার সাধনই সম্ভব হইত না। প্রেসিডেন্ট আতাতুর্ক সরকারের "রাজভক্ত বিরোধীদল" হিসাবে কাজ করিবার জন্য আরেকটি দল গঠনের অনুমতি প্রদানের বিষয়টি পরীক্ষা করেন, কিন্তু ইহা কার্যকরী হয় নাই। রাজভক্ত বিরোধীদলের মতবাদটি নতুন, এবং ফলে বিতর্ক গালাগালিতে রূপান্তরিত হয়। আতাতুর্ককে এই সিদ্ধান্ত বাদ দিয়া একদল দ্বারাই শাসনকার্য চালাইতে হয়। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর শীঘ্রই তুরস্ককে যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং যুদ্ধ বিধ্বস্ত বিশ্বের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করিতে হয়।

যুদ্ধের সময় নিরপেক্ষতার জন্য তুরস্ককে মাসুল দিতে হয় ব্যাপক হারে। জনগণ খাদ্যাভাব, মুদ্রাস্ফীতি ও অব্যবস্থামূলক করভারে জর্জরিত হয়।

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃঃ ২৭২।

আতাতুর্কের পার্টি হইলেও জনগণ ক্ষমতাসীন দলকে এইগুলির জন্য দায়ী করে। নেতৃত্ব আসিয়া পড়ে ইসমত ইনুনুর হাতে। দুর্নীতি দমনের ব্যাপারে ইনি আতাতুর্কের ন্যায় কঠোর নহেন। যুদ্ধ শেষে উদারতা দেখাইয়া প্রেসিডেন্ট ইনুনু ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য রাজনৈতিক দল গঠনের অনুমতি প্রদান করেন। আতাতুর্কের রিপাবলিকান পিপল্‌স্ পার্টির চারিজন নেতা, সেলাল বায়ার, আদনান মেন্দারেস, ফুয়াত কপরুলু ও রফিক করালতান দল ত্যাগ করিয়া ডেমোক্রেটিক পার্টি নামে একটি নতুন দল গঠন করেন। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে বিভিন্ন সমস্যা আলোচনা করিবার তেমন সময় ছিল না। ৪৮৭ আসনের মধ্যে ডেমোক্রেটিক দল শুধু ৬০টি আসন লাভ করে। পরবর্তী চারি বৎসরে বিরোধী দলসমূহ নিজেদের দলীয় সংগঠনের জন্য যথেষ্ট সময় লাভ করে। ডেমোক্রেটিক পার্টি হইতে দলত্যাগ করিয়া কিছু লোক ন্যাশন পার্টি নামে একটি নতুন দল গঠন করে। দেশে সুষ্ঠু রাজনৈতিক কার্যকলাপ চলিতে থাকে। তুরস্কের রাজনৈতিক কার্যকলাপ লক্ষ্যকারী অনেকে অবাক হইয়া লক্ষ্য করেন যে, একটি একদলীয় একনায়কত্ববাদী দল ইহার নীতিমালা সমালোচনা করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া নির্বাচনে প্রায় পরাজয় বরণ করিবার মুখোমুখী হইয়া পড়ে। এই ধরনের ঘটনা ইতিহাসে বিরল।

সুদীর্ঘকাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিবার ফলে রিপাবলিকান পার্টি বেশ সমালোচনার সম্মুখীন হয়। প্রকৃত ও কাল্পনিক দুর্নীতির অভিযোগ ছাড়াও যুদ্ধকালীন নিয়ন্ত্রণের দরুন তুরস্কের ব্যবসায়ীগণ অসন্তুষ্ট হয়; উচ্চমূল্যের দরুন শহরে লোকজন অসুখী হয়; ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে বাজেয়াফ্‌ত করের দরুন অমুসলমানগণ নিষ্পেষিত হয় বলিয়া মনে করে, এবং চাষীগণ তাহাদের উৎপাদনের বিনিময়ে শিল্পোন্নয়নের দ্বারা নিজদিগকে অবহেলিত বোধ করে। অবশ্য জাতিকে বিভক্তকারী প্রধান বিষয় হইল আতাতুর্কের ছয় দফার দুই দফা। এই দুইটি হইল অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারক রাষ্ট্রবাদ এবং ধর্মীয় বিষয়ের ধর্মনিরপেক্ষতা।

আতাতুর্ককে বিপ্লবে সাহায্যকারী এই সকল বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ এই নীতিসমূহের বিরোধিতা করেন না, তবে তাঁহাদের বক্তব্য হইল রিপাবলিকান পার্টি এইগুলির অপব্যাখ্যা করে। রিপাবলিকান পার্টির

সমালোচনার কারণ হইল ইহা রাষ্ট্রবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষবাদকে জাতির সমৃদ্ধি ও উন্নতির লক্ষ্য মনে করে, উন্নতির উপায় নহে। নগরীর কেন্দ্রস্থলসমূহে ব্যবসায়ীগণ আরও অধিক ব্যক্তিগত ব্যবসা দাবী করে এবং আঙ্কারার বুর্জুয়াগণ কর্তৃক আরোপিত বিধিনিষেধের আরও শিথিলতা চায়। ডেমোক্রেটিক দল ধর্মনিরপেক্ষবাদের বিরূপ ব্যাখ্যার জন্য এবং "ধর্মের প্রতি বৈরীভাব পোষণের" কর্মসূচী প্রচার করিবার দায়ে সরকারকে দোষী করে। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে রিপাবলিকান দলের মধ্যেই এই মর্মে সন্দেহের উদ্রেক হয় যে তাহারা ধর্মনিরপেক্ষবাদ কার্যকরী করিতে যাইয়া হয়ত বেশী বাড়াবাড়ি করিয়া ফেলিয়াছে এবং ফলে এই ব্যাপারে আগ্রহী কৃষকদিগকেও শত্রু বিগড়াইয়া দিয়াছে। ফলে মাতাপিতার লিখিত অনুরোধে সরকার বিদ্যালয়সমূহে ধর্মীয় শিক্ষার অনুমতি প্রদান করে। সরকার সীমিত সংখ্যক লোককে মক্কায় হজ্জ করিতে যাইবার অনুমতি প্রদান করে, ইমাম প্রশিক্ষণের বিশেষ পাঠ্যসূচী গ্রহণ করে, আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ধর্মীয় অনুষদ প্রতিষ্ঠা করে এবং ওসমানীয় সুলতান ও ওসমানীয় যুগের অন্যান্য ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সমাধিসমূহ খুলিয়া দেয়। অবশ্য এই সকল পন্থাসমূহ রিপাবলিকান পার্টিকে বাঁচাইতে ব্যর্থ হয়। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে ডেমোক্রেট দল বিপুল ভোটে জয় লাভ করে, ৪৮৭টি আসনের মধ্যে ৪১৬টি আসন, এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে সরকার হাত পরিবর্তন করে।

ডেমোক্রেটিক পার্টির হাতে তুরস্ক

নতুন ন্যাশনাল এসেম্বলি ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রধান সেলাল বায়ারকে প্রেসিডেন্ট এবং আদনান মেন্দারেসকে প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত করে। নতুন সরকার পশ্চিম ইউরোপীয় গণতন্ত্রের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা লাভ করে, এবং নবাগত জাতিসমূহের জন্য ইহাকে আদর্শ বলিয়া গণ্য করা হয়। এইখানেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে গণতন্ত্রের পথে শিক্ষিত একটি জাতি কিভাবে কোন বিপ্লব ও রক্তপাত ছাড়া সরকার পরিবর্তন করিবার মত সুপরিপক্ক হয়। আবার এমন অনেকও রহিয়াছে যাহাদের ধারণা, পরবর্তী ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে সামরিক বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাও বলা যায় যে, এইরূপ বিশ্বাস ও উৎসাহ অসময়োচিত। কিন্তু তুর্কী ইতিহাসের

পরিপ্রেক্ষিতে তুরস্কে গণতন্ত্র ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে করাও উচিত নহে।

১৯৫৪ ও ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে আসনের সংখ্যা কম হইলেও ডেমোক্রেটিক পার্টি বেশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ১৯৫০ হইতে ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তাহাদের এই শাসনের যুগে প্রধান কর্মসূচী ছিল ধর্মনিরপেক্ষবাদ ও রাষ্ট্রবাদের পুনঃব্যাখ্যা করা এবং নতুন ব্যাখ্যা কার্যকরী করা। অবশিষ্ট চারিটি নীতির মধ্যে প্রজাতন্ত্রবাদ ও জাতীয়তাবাদ এমন পাকা আসন গ্রহণ করে যে তুর্কী সমাজের অতিক্ষুদ্র অংশ ব্যতীত কেহই এইগুলি লইয়া বিতর্কের সৃষ্টি করে নাই। প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের বাহক গণবাদের নীতি—যাহা রিপাবলিকান পিপল্‌স পার্টির শাসনামলে অবহেলিত হয়, তাহা সেই পার্টির ইচ্ছানুযায়ীই এখন কার্যে পরিণত হয়। অবশ্য এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে গণবাদের নীতির উপর ভিত্তি করিয়া ক্ষমতায় আগত ডেমোক্রেটিক পার্টির বিরুদ্ধে বিরোধী দল সৃষ্টি হইবার আংশিক কারণ হইল এই দল বারংবার এইনীতি ধ্বংস করিবার প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে নির্বাচনের গঠিত একাধিক দলীয় প্রথার পরিপ্রেক্ষিতে সংস্কারবাদের নীতি, অর্থাৎ সরকার কর্তৃক শক্তি প্রয়োগ দ্বারা সংস্কার সাধন করিবার অধিকার যেমন অপ্রয়োজনীয় তেমন অবাস্তব হইয়া পড়ে। অতঃপর বিশেষ ক্ষেত্রে ছাড়া আতাতুর্কের ন্যায় তুরস্কে সংস্কার চাপাইয়া দেওয়া বোধহয় অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। যে দুইটি বিষয়ে জাতীয় ভিত্তিতে বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং ভবিষ্যতেও কিছুকাল এইরূপ চলিবার সম্ভাবনা এই দুইটি বিষয় হইল ধর্ম ও অর্থনীতি।

তুর্কী ধর্মনিরপেক্ষতা

আতাতুর্কের বিপ্লবের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতি। আতাতুর্কের নিকট ইহার অর্থ হইল জনজীবন হইতে ধর্মের প্রভাব এক রকম উঠাইয়া দেওয়া। আতাতুর্কের অনেক সহচর জনজীবনে ধর্মীয় হস্তক্ষেপের বিরোধী হইলেও তাঁহারা আতাতুর্কের এই পন্থা পছন্দ করে নাই, কারণ ইহার দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে তাহাদের ধর্মচর্চা করা দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে আতাতুর্ক একটি "রাজতন্ত্র

বিরোধী দল" হিসাবে প্রগ্রেসিভ রিপাবলিকান পার্টি নামে একটি দল গঠন করিবার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু তিনি ইহা পরে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন প্রধানতঃ এই জন্য যে এই দল ব্যক্তিগত ধর্মীয় স্বাধীনতা সীমিত করিবার ব্যাপারে সরকার "বাড়াবাড়ি" করিতেছে বলিয়া সমালোচনা করে। দীর্ঘদিন যাবত তুরস্কের অত্যন্ত বিতর্কমূলক আলোচনা সম্ভবতঃ সীমা নির্ধারণ লইয়া। সম্পূর্ণ ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করিলে তুর্কী সংস্কার আন্দোলন কর্তৃক বিলুপ্ত ওলামা, ইসলামী আইন ও সমস্ত পুরাতন অভ্যাস পুনর্বার চালু হইবার সমূহ সম্ভাবনা। আতাতুর্কের নিকট সমাধান অতি সাধারণ—তিনি দলবদ্ধভাবে ও ব্যক্তিগতভাবে প্রকাশ্যে ধর্মচর্চা বন্ধ করিতে চেষ্টা করেন। আতাতুর্ক যদিও জনসাধারণকে মসজিদে নামাজ পড়া বা নামাজের জন্য আজান দেওয়া নিষেধ করিতে পারেন নাই। কিন্তু তুর্কী ভাষায় আজান দিতে বাধ্য করিয়া এবং যাহারা আরবীভাষা ব্যবহার করে (ইসলামী নীতি অনুযায়ী) তাহাদিগকে শাস্তি দিয়া প্রকারান্তরে তিনি আজান একরূপ বন্ধ করিয়া দেন।

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে নির্বাচনে একাধিক দলীয় ব্যবস্থা চালু হইবার পর ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারে আতাতুর্কের ব্যাখ্যা অনুসরণকারী রিপাবলিকান পিপল্‌স পার্টি বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। অতএব তাঁহারা এই আইন কিছুটা শিথিল করেন এবং বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষা, মক্কায় হজে যাওয়া এবং অন্যান্য রীতিনীতি পালন করিবার অনুমতি প্রদান করেন। অবশ্য ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টি নির্বাচনী প্রচারণার মধ্যে "পবিত্র মানবিক অধিকার হিসাবে ধর্মীয় স্বাধীনতা" অন্তর্ভুক্ত করে। নির্বাচনের সময় ডেমোক্রেট দল আবিষ্কার করে যে ধর্মীয় ব্যাপারে সরকারের বিরুদ্ধে গ্রামের লোকদের প্রবল বিক্ষোভ বিদ্যমান।

ডেমোক্রেটিক পার্টির অধীনে নতুন সরকারের প্রায় প্রথম কাজ হইল আজানে আরবীভাষা ব্যবহারের উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা। ইহার পরে আসে রমজান মাসে রোজা পালন, ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশনা, ধর্মীয় আদেশ সংক্রান্ত আইনসমূহ শিথিল, ইমাম প্রশিক্ষণের বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং মসজিদ নির্মাণ করা। এক সমীক্ষায় দেখা যায় দশ

বৎসরের শাসনামলে ডেমোক্রেটিক দলের সরকার ৫০০০ মসজিদ ও সমসংখ্যক সাধারণ স্কুল নির্মাণ করে। আতাতুর্কের ধর্মনিরপেক্ষবাদের ব্যাখ্যার অনুসারীগণের নিকট, যাহারা মসজিদ নির্মাণের বিরোধী, সমসংখ্যক বিদ্যালয় ও মসজিদ নির্মাণের অর্থ হইল এই নীতির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি। তুর্কী ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের রোষের কারণ হইল এই যে সরকার বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে পূর্ববর্তী আইনের বিপরীত কাজ করে। সমস্ত বিদ্যালয়ে ইহা ধর্মীয় শিক্ষা চালু করে এবং যে সকল অভিভাবক তাহাদের ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষা চায় না তাহাদিগকে লিখিতভাবে অনুরোধ জ্ঞাপন করিবার বন্দোবস্ত করা হয়।

এতদসত্ত্বেও, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ত্যাগ করা বা তুর্কী প্রজাতন্ত্র গঠিত হইবার পূর্বের অবস্থা ফিরাইয়া আনিবার কোন উদ্দেশ্য ডেমোক্রেটিক দল পোষণ করে নাই। কোন কোন দল ও ব্যক্তিবিশেষ অনুরূপ ভাবধারা চালু করিবার চেষ্টা করিলে সরকার ঐগুলিকে বন্ধ করিবার চেষ্টা করে। ধর্মনিরপেক্ষবাদীদের সমালোচনার বিষয়বস্তু হইল, ধর্মকে গণ্ডীভূত করিবার আইন শিথিল করিলে পুরাতন রীতিনীতি পুনঃ প্রবর্তনে উৎসাহ প্রদান করা হয়। বস্তুতঃ ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে গঠিত ন্যাশন পার্টি এই ব্যাপারে ডেমোক্রেটিক পার্টির তুলনায় আগাইয়া যায়। ইহা জাতির ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন প্রত্যাশা করে এবং প্রত্যেককে যে কোন ভাষায় ধর্মপালন করিবার স্বাধীনতা প্রদানের দাবী জানায়। ইহা ধর্মীয় দানসমূহ বা ওয়াক্‌ফ্‌ সম্পত্তি উলামাদের নিকট ফেরৎ প্রদানের দাবীও উত্থাপন করে। লুক্কায়িত ধর্মীয় সংস্থা পুনরায় জনসমক্ষে বাহির হয়, কেউ কেউ পাশ্চাত্যকরণ ও জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে লেখে ও বক্তৃতা প্রদান করে। কেউ কেউ আবার এইরূপও বলে যে, 'তুরস্ককে প্যালেস্টাইনে আরবদের স্বপক্ষে যুদ্ধ করা উচিত।' এই সকল দল বা লোকজনদের অধিকাংশকে স্তব্ধ করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু বিতর্ক চলিতে থাকে। ধর্মের এই পুনঃপ্রকাশের গূঢ় অর্থ সম্পর্কে কেউ নিশ্চিত করিয়া কিছু বলিতে পারে না : ইহার অর্থ কি রাজনৈতিক দলসমূহ কর্তৃক উপযোগিতামূলকভাবে ধর্মের ব্যবহার নাকি পুরাতন ব্যবস্থার পুনর্বহাল, নাকি ধর্মীয় স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ; নাকি একটি নতুন ও সংস্কার সাধিত ইসলামের পুনর্জাগরণ।

নতুন রাষ্ট্রবাদ

ধর্মনিরপেক্ষবাদের চাইতেও অতি জরুরী ও অধিক জটিল হইল নতুন সরকারের অর্থনীতি। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, মুদ্রা স্ফীতি এবং ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের পূর্ববর্তী দশকে অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্যের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহাতে জনগণ একটি পরিবর্তনের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। তদুপরি পঁচিশ বৎসরের স্থিতিশীল সরকারের আমলে তুরস্কে এক নতুন শ্রেণীর ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, পুঁজিপতি ও ম্যানেজারের সৃষ্টি হয় যাহারা ডেমোক্রেটিক পার্টি কর্তৃক প্রতিশ্রুত অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে স্বাগত জানায়। যুদ্ধোত্তরকালের তুরস্কের অবস্থা, ট্রুম্যান নীতি এবং বিপুল আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ও প্রত্যাশার দ্বারা তুরস্কের নেতৃবৃন্দ অতিক্রত শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন সাধনের এই সুযোগ কাজে লাগাইতে ব্যস্ত হইয়া উঠে।

মধ্যপ্রাচ্যে, বিশেষতঃ তুরস্ক ও ইরানে মার্কিন সাহায্যের স্বরূপ হইল সামরিক এবং ইহার উদ্দেশ্য হইল স্নায়ুযুদ্ধে উস্কানী দেওয়া। অধিকন্তু, উভয় দেশে সাহায্য নিয়ন্ত্রণকারী মার্কিন প্রতিষ্ঠানসমূহ মার্কিন সামরিক লোকজন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও উপদিষ্ট হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস বার্ষিক ভিত্তিতে অর্থ মঞ্জুর করে, এবং ইহা সর্বজনবিদিত যে এক বৎসর মঞ্জুরীকৃত অর্থ কাজে লাগাইতে না পারিলে পর বৎসর মঞ্জুরী অর্থ কমাইয়া দেওয়া হয়। অতএব নিত্য নতুন কলকারখানা স্থাপন ও শিল্প বিস্তৃতির মাধ্যমে দ্রুত সে অর্থ খরচ করিবার প্রবণতা দেখা দেয়। মার্কিন সংস্থাসমূহের নিকট এই ধরনের খরচের অর্থ হইল কংগ্রেসের নিকট হইতে নতুন নতুন মঞ্জুরী লাভ করা, যে কংগ্রেসের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল "মধ্যপ্রাচ্যে কমিউনিজম রোধ করা", তুর্কী জনগণের নিকট কলকারখানার অর্থ হইল "উন্নয়ন" এবং ক্ষমতাসীন দলের নিকট ইহার অর্থ হইল আরও অধিক ভোট।

অবশ্য উন্নয়ন একটি দীর্ঘকালীন পন্থা। সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিবেশে একটি কারখানা নির্মাণে বিনিয়োগকৃত অর্থ আদায় হইতে কমপক্ষে পাঁচ বৎসর সময়ের প্রয়োজন। অনেকক্ষেত্রে কারখানা নির্মাণ সমাপ্ত হইবার পর উৎপাদন আরম্ভ করিবার মত যথেষ্ট পুঁজি তুর্কী সরকারের ছিল না।

অতএব বিদেশী সাহায্যের আশায় মেন্দারেস সরকার ঘাটতি খরচের কর্মসূচী গ্রহণ করে। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ ইহার ঋণের পরিমাণ ১৩৫,৪৬,০৪,৬৩৬ ডলারে দাঁড়ায়।

তবে ইহার অর্থ এই নহে যে কিছুই করা হয় নাই। রাস্তাঘাট নির্মাণ করা হয়, কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়। এবং অনেক কারখানার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু মোটামুটিভাবে, দ্রুত শিল্পায়ন ও অতিরিক্ত পূর্ত কর্মসূচীর ফলে অর্থনীতির উপর প্রবল চাপ পড়ে। প্রধান মন্ত্রী মেন্দারেস পরিকল্পনা অপছন্দ করেন, অর্থনৈতিক বাস্তবতা অবহেলা করেন, অনুৎপাদন-মূলক প্রকল্পে অর্থব্যয় করেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নির্মাণ কার্য চালান এবং দেশকে অর্থনৈতিক দেউলিয়ার সম্মুখীন করেন। তুর্কী অর্থনীতির শিক্ষানবিশগণ বলেন যে, এই সকল অপরাধের জন্য যাহারা অর্থ প্রদান করে তাহারাও কিয়দংশে দায়ী।

১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের সামরিক অভ্যুত্থান

ধর্মীয় শক্তির পুনরাগমনে ধর্মনিরপেক্ষবাদীগণ শঙ্কিত হয়, ব্যবসায়ীগণ বহির্গত ও ভিতরগত মূল্যে হতাশ হয়, কারণ ইহার ফলে রপ্তানীতে মুনাফা হয় স্বল্প অথচ আমদানীতে খরচ পড়ে বেশী, এবং তুর্কী জনগণ নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাবের ফলে সৃষ্ট মুদ্রা স্ফীতিতে বিক্ষুব্ধ হয়। যে কোন সরকারের পতনের জন্য এই কারণগুলি যথেষ্ট, কিন্তু সামরিক বিপ্লবের কারণ হইল গণবাদ দমন, যদ্বারা ডেমোক্রেটিক পার্টি ক্ষমতায় আগমন করে। এই দল ক্ষমতাসীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে ইহাকে ক্রমশঃ দেশের একমাত্র দল হিসাবে রাখিতে চেষ্টা করে। ক্ষমতাসীন দল একটি রাজভক্ত বিরোধী দলের ব্যাপারে অনভ্যস্ত। ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে সরকার ২৫ বৎসর বা ততোধিক কাল হইতে কর্মরত সমস্ত জজবৃন্দকে অবসর প্রদান করে এবং রাজনৈতিক নিয়োগের সুযোগ দান করে। ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের জন্য রাজ-নীতি নিষিদ্ধ করে এবং রিপাবলিকান পিপল্‌স্‌ পার্টির আসবাবপত্র বাজেয়াফত করে। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে সরকার "রাজনৈতিক প্রচারণা" বন্ধ করিয়া দেয়, বিধিনিষেধের আইন চালু করে এবং সরকারের প্রতি 'জনসাধারণের আস্থা বিনষ্ট' করিবার অপরাধে সরকার বিরোধী

পত্রপত্রিকা বন্ধ করিয়া দেয়। ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দের নির্বাচনে সরকার একটি আইন পাশ করিয়া বিভিন্ন দলের কোয়ালিশন নিষিদ্ধ করে এবং কোন দল যে প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোট লাভ করে সে দলকে সে প্রদেশের সমস্ত সদস্যের আসন প্রদান করে। এই সকল কৌশল অবলম্বন করিয়াও তাহারা ৪৭.৭ শতাংশ ভোটের অধিক লাভে ব্যর্থ হয়। অথচ রিপাবলিকান পার্টি ৪০.৯ শতাংশ ভোট লাভ করে।

তুরস্কের বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার সুযোগে মেন্দারেস সরকার দমন-নীতির দ্বারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে উৎসাহিত হয়। ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে প্রথম হাঙ্গামা শুরু হয় এবং রিপাবলিকান পিপল্‌স্ পার্টির নেতা ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ইসমত ইনুনু মাথায় আঘাত পান। ইহা ও অনুরূপ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য সরকার একটি সৈন্যদল প্রেরণ করিতে বাধ্য হয়। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে বিরোধী দল সরকারের অনেকগুলি অনিয়মিত কার্যাবলীর বৈধতার উপর প্রশ্ন তোলে। ২রা এপ্রিল পুলিশ ইনুনুকে কায়সারী শহরে প্রবেশকালে বাধা প্রদান করিতে চেষ্টা করে। তিনি আদেশপত্র ছিন্ন করিয়া ট্রেনে বসিয়া থাকেন। জনসাধারণ এই খবর শুনিতে পাইয়া ঘটনাস্থলে আগমন করে এবং তাঁহার হস্তচুম্বন করে। আরেকটি ঘটনায় সৈন্যগণ একটি পুলের উপর তাঁহার গাড়ীর গতিরোধ করে। ইনুনু গাড়ী হইতে বাহির হইয়া সৈন্যদের নিকট হাঁটিয়া যান। সৈন্যগণ সম্মানসূচকভাবে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাকে যাইতে দেয়।

প্রথম ছাত্র বিক্ষোভ শুরু হয় ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৮-২৯শে এপ্রিল, এবং শীঘ্রই ইহা আঙ্কারায় ছড়াইয়া পড়ে। ছাত্রগণ ব্যারিকেড সৃষ্টি করে, প্রস্তর নিক্ষেপ করে এবং "স্বাধীনতা, স্বাধীনতা, মেন্দারেস পদত্যাগ কর"— এই মর্মে স্লোগান দেয়। মে মাসে ইস্তাম্বুলে ন্যাটোর সম্মেলন চলাকালে ছাত্রগণ সরকারকে বেকায়দায় ফেলিবার জন্য বিক্ষোভের মাত্রা বাড়াইয়া দেয়। ২০শে মে ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহেরু একটি রাষ্ট্রীয় সফরে আগমন করিলে আঙ্কারায় জনতা মেন্দারেস-বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। প্রকৃত সামরিক অভ্যুত্থান যাহাকে কখনও কখনও বিপ্লব বলা হয় তাহা সংঘটিত হয় ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে মে এবং মাত্র চারি ঘণ্টা স্থায়ী হয়।

রাজধানীর কৌশলের দিক দিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভবনগুলি তাহারা অধিকার করে এবং প্রেসিডেন্ট সেলাল বায়ার ও প্রধান মন্ত্রী মেন্দারেসকে গ্রেফতার করে। সামরিক অভ্যুত্থান পরিচালিত হয় স্থল বাহিনীর প্রাক্তন অধিনায়ক জেনারেল কামাল গুর্শেলের নেতৃত্বে। ন্যাশনাল ইউনিটি কমিটি নামক একটি সামরিক সরকারের তিনি নেতা নিযুক্ত হন। তাঁহাদের প্রাথমিক কার্যাবলীর একটি হইল ইস্তাম্বুল ও আঙ্কারা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও আইন বিভাগের অধ্যাপকদিগকে একটি সংবিধান রচনার কাজে নিয়োগ করা। সামরিক সরকার ১৭ সদস্যের একটি মন্ত্রীসভা গঠন করে, যাহাদের ১৫ জনই বেসামরিক লোক এবং একটি ১৫ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করে। এই কর্মসূচীর মধ্যে থাকে অর্থনৈতিক বিষয়াদি, ধর্ম, সাংবাদিক স্বাধীনতা, কফি আমদানী, বিদেশ ভ্রমণ সহজতরকরণ, সম্পত্তি হস্তান্তর ও অর্থনৈতিক লেনদেনসহ সমস্ত বিষয়।

১৭ মাসের শাসনামলে ন্যাশনাল ইউনিটি কমিটি ৫০০০ অফিসার ও ১৪৭ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে চাকুরী হইতে অবসর প্রদান করে; এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রায় ৬০০ সদস্যকে কাঠগড়ায় দাঁড় করায়। বিচার ১১ মাস স্থায়ী হয়। কোর্ট ১৫ জনের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন, ৩১ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করেন, ১৩৮ জনকে অব্যাহতি প্রদান করেন এবং অবশিষ্ট লোকদিগকে বিভিন্ন মেয়াদী কারাবাস প্রদান করেন। প্রধান মন্ত্রী মেন্দারেস, বৈদেশিক মন্ত্রী জরলু ও অর্থমন্ত্রী পোলাটকান ব্যতীত বাকী সকলের মৃত্যুদণ্ড মওকুপ করিয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এই বিচারের উদ্দেশ্য হইল তুর্কীদিগকে এই ধারণা প্রদান করা যে, যে কোন সরকারের অপরাধীকেই শাস্তি পাইতে হইবে। পর্যবেক্ষকগণের বিশ্বাস, এই বিচারের ইতিবাচক ও নেতিবাচক ফলাফল যাহাই থাক না কেন, ইহার দ্বারা মেন্দারেস ও ডেমোক্রেটিক পার্টির জনপ্রিয়তা, বিশেষতঃ কৃষকদের মধ্যে কোন অংশে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। কোন কোন নতুন রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ডেমোক্রেটিক পার্টির অনুসারীদের ভোট পাইবার জন্য প্রকাশ্যে এই পার্টির নীতিমালা গ্রহণ করে।

সংবিধান রচনা করা হয় এবং ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারীতে ইহা অনুমোদন করিবার জন্য গণপরিষদের বৈঠক হয়। ৯ই জুলাই নতুন সংবিধান

গণভোটে দেওয়া হয় এবং ৬০ শতাংশেরও অধিক লোক ইহা সমর্থন করে। ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দের সংবিধান ছিল প্রজাতান্ত্রিক যাহারা ন্যাশনাল এসেম্বলির হাতে সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। ইহাতে যথেষ্ট ভারসাম্য ছিল না, নতুন সংবিধানে তুর্কীগণ বিভিন্ন চোরাপথ বন্ধ করিতে চেষ্টা করে, যে পথে কোন ব্যক্তিবিশেষ শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে। ইহাতে অধিক দল গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয় এবং বেশ ভারসাম্য রক্ষা করা হয়। আতাতুর্কের ছয়টি নীতিমালার মধ্যে শুধু চারিটি রাখা হয়। বিপ্লববাদ ও রাষ্ট্রবাদ বাদ দেওয়া হয়। সংবিধান ঘোষণা করে যে, "তুর্কী প্রজাতন্ত্র একটি জাতীয়তাবাদী, গণতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ ও সামাজিক রাষ্ট্র।" মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষাই সর্বাপেক্ষা বিতর্কমূলক। ইহাকে "ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও প্রবৃত্তির" উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কেউ কেউ মনে করেন যে রাষ্ট্রবাদ ত্যাগ করা হইলেও একটি রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা সংস্থা গঠনের মধ্যে ইহার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। যে কোন সংবিধানের ন্যায় ইহার কার্যকারিতা প্রকাশ পাইবে অভিজ্ঞতার পরীক্ষায় ইহাকে যাচাই করা হইলে।

দ্বিতীয় তুর্কী প্রজাতন্ত্র

বিচার চলাকালে ও সংবিধান রচনার সময় নতুন রাজনৈতিক দলসমূহ গঠিত হয় এবং তাহারা প্রতিশ্রুত নির্বাচনের প্রস্তুতি আরম্ভ করে। প্রায় ১১টি দল তালিকাভুক্ত হয় ও প্রাণবন্ত প্রচারণা শুরু করে। ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের ১২ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মাত্র চারিটি দল পরিষদে আসন লাভ করিতে সমর্থ হয়। রিপাবলিকান পিপল্‌স্ পার্টি ১৭৩টি আসন লাভ করে, জাষ্টিস পার্টি ১৫৮টি, নিউ টার্কী পার্টি ৬৫টি এবং রিপাবলিকান পেজেণ্টস ন্যাশনাল পার্টি ৫৪টি আসন লাভ করে। রিপাবলিকান পিপল্‌স্ পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে ব্যর্থ হওয়ায় ইহা জাষ্টিস পার্টির সহিত কোয়ালিশন করে। পরিষদ জেনারেল গুর্শেলকে প্রেসিডেন্ট ও ইসমত ইনুনুকে প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত করে। এক বৎসর পর কোয়ালিশনের মধ্যে অন্তর্বিরোধ দেখা দিলে পিপল্‌স্ পার্টি অন্য দুই দলের সহিত কোয়ালিশন করে এবং জাষ্টিস পার্টিকে সরকার হইতে বহিষ্কার করে।

রিপাবলিকান পিপল্‌স পার্টি অন্যান্য পার্টি হইতে অধিক ভোট লাভ করায় কেউ আশ্চর্যান্বিত হয় নাই। আতাতুর্কের দল হওয়া ছাড়াও ইহা ডেমোক্রেটিক পার্টির বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে বিরোধিতার নেতৃত্ব প্রদান করে। তবে পর্যবেক্ষকগণ আশ্চর্যান্বিত হন জাষ্টিস পার্টির শক্তি প্রদর্শনে। সাধারণতঃ ইহা রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন লোকদের লইয়া গঠিত, যাহারা স্বল্প কর এবং শিল্পকারখানায় রাষ্ট্রীয় এক চেটিয়া নীতি বেসরকারী লোকদের হাতে ছাড়িয়া দিবার পক্ষপাতী, এই দল সরকারী নিয়ন্ত্রণের বিলোপ চায় এবং ইহা সমস্ত রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার বিরোধী। জাষ্টিস পার্টি মোটামুটিভাবে ডেমোক্রেটিক পার্টির অনুসারীদের ভোট লাভ করে।

নিউ টার্কী পার্টি (নতুন তুর্কী দল) অর্থনৈতিক, উদার ও রাজনৈতিক প্রগতিশীল লোকজনদের সমন্বয়ে গঠিত, যাহারা রিপাবলিকান পিপল্‌স্‌ পার্টির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে। তাহারা কঠোর ধর্ম নিরপেক্ষবাদী এবং শ্রমিকদের ধর্মঘটের অধিকার দাবী করে। রিপাবলিকান পেজেন্ট্‌স্‌ ন্যাশনাল পার্টি (Republican Peasants National Party) সামাজিক রক্ষণশীলতা দাবী করে এবং তাহাদের মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষবাদ-বিরোধী মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। ইহা ও জাষ্টিস পার্টি গ্রামাঞ্চলের লোকদের সমর্থন লাভ করে, অপরদিকে রিপাবলিকান ও নিউ টার্কী পার্টি শহরে লোকদের মধ্যে অধিক জনপ্রিয়।

তুরস্ক একটি পাশ্চাত্য দেশ নাকি প্রাচ্য এই প্রশ্নে সহজেই বলা যায় যে গ্রামাঞ্চলের লোকজন দেশকে প্রাচ্যের দিকে টানে, অপরদিকে শহরে লোকজন টানে পাশ্চাত্যের দিকে। এই ব্যাপারে মূল নিষ্পত্তির বিষয় সম্ভবতঃ ধর্ম। ধর্মনিরপেক্ষবাদীগণ আতাতুর্ককে অনুসরণ করিতে চায়,— যাহার অর্থ হইল স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষা চলিবে না এবং ধর্মীয় রীতিনীতিতে আরবী ভাষা ব্যবহার চলিবে না। অপরদিকে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষা চান, নামাজে আরবী ভাষা ব্যবহার চান এবং ধর্মীয় সমস্ত দান-খয়রাতের তহবিল উলামাদের হাতে হস্তান্তর দাবী করেন। এই উভয় দলের মধ্যবর্তী স্থানে রহিয়াছে মধ্যমপন্থী দল যাহারা ইসলামের "আংশিক" রীতিনীতি প্রবর্তন চায়। কিন্তু এই প্রবর্তনকে কার্যে পরিণত করিবার ক্ষেত্রে অধিকাংশ মধ্যমপন্থী আশঙ্কা করে যে, এই প্রথা প্রবর্তিত হইলে ধর্মীয় শিক্ষায়

স্বাধীনতা, আরবীভাষা, পর্দাপ্রথা, বহুবিবাহ, খেলাফত ইত্যাদি পুনরায় চালু হইবে। অতএব শেষ সিদ্ধান্ত লওয়া হইবে হুকুমের দ্বারা নহে, বরং শিক্ষা চালুর মাধ্যমে, এবং যত শীঘ্র গ্রামাঞ্চলের লোকজন পাশ্চাত্য ভাব-ধারায় শিক্ষিত হইয়া উঠে উহার মাধ্যমে।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

ইসরাইল রাষ্ট্রের সৃষ্টি

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের জার্মানীর পরাজয়, তৎসঙ্গে নির্বাচনে বৃটিশ শ্রমিক পার্টির জয়লাভ ইহুদীবাদীদের মনে নতুন আশার সঞ্চার করে। শ্রমিক দলের সদস্যবৃন্দ সাধারণতঃ "ইহুদীবাদী সমর্থক" এবং ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে শ্বেত-পত্র প্রকাশের জন্য রক্ষণশীল সরকারকে আক্রমণ করিয়া আসিতেছে, শ্বেতপত্রের দ্বারা প্যালেস্টাইনে ইহুদীদের আগমন সীমিত করে। তবে এইক্ষেত্রে ইহুদীবাদীগণ হতাশ হয়। বিরোধী দলের সদস্য হিসাবে সমাজতান্ত্রিক আর্নেস্ট বেভিন ইহুদীবাদীদের অধিকার সংরক্ষণে তৎপর থাকেন, কিন্তু বৃটিশ সরকারের নতুন বৈদেশিক সচিব হিসাবে তিনি আরবদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সজাগ হন। তুরস্ক ও গ্রীসের উপর সোভিয়েত রাশিয়ার প্রবল চাপের মুখে, পারস্য আজারবাইজানের পৃথকীকরণের আন্দোলন, কুর্দদের স্বায়ত্তশাসনের দাবী এবং ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রেট বৃটেন আরবদের মধ্যে বৃটিশ-বিরোধী আন্দোলনের ঝুঁকি লইতে পারে না। ফলে বেভিন তাঁহার পূর্বসূরীর নীতিই চালাইয়া যান।

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান অবিলম্বে প্যালে-স্টাইনে ১০০,০০০ ইহুদী উদ্বাস্তু গ্রহণ করিবার জন্য প্রধান মন্ত্রী ক্লিমেণ্ট এট্‌লীকে আদেশ দেন। বিনিময়ে এট্‌লী প্যালেস্টাইন সমস্যা সমাধানে মার্কিনীদের অংশ গ্রহণের আহ্বান জানান। যুক্তরাষ্ট্র ইহা গ্রহণ করে এবং সমস্যাটি পর্যালোচনার জন্য একটি ইঙ্গ-মার্কিন কমিশন, লণ্ডন, জার্মানী, অষ্ট্রীয়া ও প্যালেস্টাইনে প্রেরণ করে। ইতিমধ্যে মধ্যইউরোপ ও পশ্চিম জার্মানীতে ইহুদী বাস্তুত্যাগীদের দুরবস্থা চরম আকার ধারণ করে। ইহুদী বাস্তুত্যাগীদের দুরবস্থাকে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির মহাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করিবার জন্য ইহুদীবাদীকে যথার্থভাবেই দায়ী করা হয়। পাঁচ বৎসর পর,

প্রায় একইভাবে ইসরাইলের উপর চাপ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে আরব বাস্তুত্যাগীদিগকে ব্যবহার করিবার জন্য আরব রাষ্ট্রবর্গকে দায়ী করা হয়।

বৃটিশ শ্রমিক সরকারের মনোভাবে ইহুদীবাদীদিগকে হতাশ করিলেও ইহা প্যালেস্টাইনের ইরগুন ষ্টার্ণ ও অন্যান্য ইহুদী চরমপন্থী সন্ত্রাসবাদী সংস্থাসমূহের ক্রোধের উদ্রেক করে। সন্ত্রাসবাদীগণ অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিবার জন্য এবং আধাসরকারী ইহুদীবাদী শক্তি হ্যাগানাহ্ (Haganah)-এর সহিত তাহাদের কার্যাবলীর যোগসূত্র রক্ষা করিবার জন্য যুক্তরাষ্ট্র হইতে অর্থ লাভ করিতে সমর্থ হয়, অপরদিকে ইহুদীবাদী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্যে তাহাদের কার্যকলাপের নিন্দা করেন। যাহাই হোক, ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দ হইতে বৃটিশদের বিরুদ্ধে এই সকল গোপন ইহুদী দলসমূহের সন্ত্রাস-মূলক কার্যকলাপ আরম্ভ হয়। তাহারা বৃটিশ পুলিশ ফাঁড়িসমূহে বোমা বর্ষণ করে এবং সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদিগকে হত্যা করে। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে নভেম্বরে চরমপন্থী দলের একজন সদস্য বৃটিশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী লর্ড ময়েনকে (Lord Moyne) কায়রোতে হত্যা করে।

ইঙ্গ-মার্কিন কমিশন

ইঙ্গ-মার্কিন কমিশন একটি বিক্ষুব্ধ পরিবেশ ও সাধারণ নিরাপত্তাহীন অবস্থায় ইহার অনুসন্ধান কাজ চালাইয়া যায়। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের শীতকালে, এমন কি হ্যাগানার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলা দলও (পালমাখ্) বৃটিশ-বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত হইয়া পড়ে। অক্টোবর মাসে তাহারা একটি শিবির আক্রমণ করিয়া ২০০ উদ্বাস্তুকে মুক্ত করে। এই সকল উদ্বাস্তু দলকে ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দের শ্বেতপত্রের আইন ভঙ্গ করিয়া অন্যায়ভাবে আনা হয়। ঐ মাসের শেষের দিকে তাহারা তিনটি বৃটিশ জাহাজ ডুবাইয়া দেয়। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের অবশিষ্ট মাসগুলিতে ইরগুন ও স্টার্ণের চরমপন্থী গোপন সংস্থাসমূহ রেল লাইন উপড়াইয়া ফেলে, তৈল শোধনাগারসমূহ উড়াইয়া দেয়, অস্ত্রাগারসমূহে হানা দেয়, ব্যাংক লুট করে, সেতু ধ্বংস করে এবং বৃটিশ সৈন্যদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করে। বৃটিশ প্রতিশোধ গ্রহণ করে, কিন্তু বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে ব্যর্থ হয়, কারণ গোপন সংস্থাসমূহ ইহুদী জনসাধারণের সাহায্য পুষ্ট। ইরগুনের সাহসিকতামূলক কার্যাবলীর মধ্যে প্রসিদ্ধ

হইল জেরুজালেমের কিং ডেভিড হোটেলে অবস্থিত বৃটিশ সামরিক সদর দপ্তরে বোমা বর্ষণ, যাহাতে ৯০ জনের অধিক লোক নিহত হয়।

ইঙ্গ-মার্কিন কমিশন ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল ইহার রিপোর্ট পেশ করে। ইহার উপসংহার পূর্ববর্তী কমিশনসমূহের রিপোর্ট হইতে তেমন পার্থক্যমূলক কিছু নহে। ইহার সুপারিশ হইল, প্যালেস্টাইন কোন ইহুদী বা আরব রাষ্ট্র হইবে না। দেশ ভাগের বিরুদ্ধে হুসিয়ারী করিয়া রিপোর্টে বলা হয়, আরব ও ইহুদীদের অধিকারসমূহ সমভাবে রক্ষা করতঃ একটি দ্বিজাতিক ও দ্বিভাষী রাষ্ট্র গঠনই সমস্যার সমাধান। স্বাধীনতা দান করিবার মত সুপরিপক্ক অবস্থা ইহা পায় নাই। ইহা সুপারিশ করে যে, "জাতিসংঘের অধীনে একটি জিম্মাদারী চুক্তি (Trusteeship agreement) কার্যকরী হওয়া সাপেক্ষে প্যালেস্টাইনকে বর্তমানের স্থায় হুকুমনামার অধীনে রাখা হউক।" ইউরোপের ইহুদী উদ্বাস্তুদের দুরবস্থা নিরসনের জন্য কমিশন ১০০,০০০ ইহুদীকে প্যালেস্টাইনে প্রবেশাধিকার দানের সুপারিশ করে। রিপোর্ট প্রকাশের দিন বিকালে তাঁহার পছন্দমত শুধু একটি সুপারিশ উল্লেখ করিয়া প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান অনুরোধ করেন যে ১০০,০০০ ইহুদীকে অবিলম্বে গ্রহণ করা হউক। প্রধান মন্ত্রী এটলী অনুরোধটি প্রত্যাখ্যান করেন এবং বলেন যে, রিপোর্টটি "সামগ্রিকভাবে এবং সমস্ত মর্মার্থ সহকারে বিবেচনা করিতে হইবে।"

এই সমস্যার সমাধান লাভের আশায় বৃটিশ ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে আরব ও ইহুদীবাদী প্রতিনিধিবর্গকে লণ্ডনে একটি সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানায়। সম্মেলনে কোন চুক্তির আশা পরিলক্ষিত হয় নাই, তবে ব্যর্থতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করিবার উদ্দেশ্যে বৈদেশিক সচিব বেভিন একটি মোক্ষম সুযোগ লাভ করেন। স্মরণ করা যাইতে পারে যে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দ হইল যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের সন, এবং ডেমোক্রেটিক পার্টির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রচারাভিযানের মধ্যে একটি হইল নিউ ইয়র্কের গভর্ণর পদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। নীরবতা অবলম্বনের জন্য একটি বৃটিশ অনুরোধ সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান নিউ ইয়র্কে তাঁহার বক্তব্য পেশ করেন এবং ১০০,০০০ ইহুদীকে অবিলম্বে প্যালেস্টাইনে গ্রহণের দাবী জানান। পরদিন রিপাবলিকান গভর্ণর-পদপ্রার্থী থমাস ডিউই (Thomas Dewey) আরেক ধাপ অগ্রসর

হন এবং বলেন যে ১৫০,০০০-ই বাস্তব সংখ্যা। কয়েক দিন পর রিপাবলিকান সিনেটর রবার্ট ট্যাফট এই সংখ্যাকে ১৭৫,০০০-এ উন্নীত করেন।

বৃটিশ দোটানায় পড়িয়া যায়। আরব নেতৃবৃন্দের মধ্যে তাহাদের একমাত্র বন্ধু সম্ভবতঃ ট্রান্স জর্ডানের আবদুল্লাহ্। ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী বৃটিশ হুকুমনামা বিলুপ্ত করিয়া তাঁহাকে বৃটিশগণ "জর্ডানের হাশেমী রাজত্ব" নামক সার্বভৌম রাষ্ট্রের বাদশাহর পদে উন্নীত করে। 'ইরগুন ও চরমপন্থী স্টার্ণ দলসমূহ প্যালেস্টাইনে বৃটিশদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তদুপরি, ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরে বেসেল-এ আহুত বিশ্ব ইহুদীবাদী কংগ্রেসে বৃটিশ সমর্থক চেইম ওয়াইজম্যান কংগ্রেসের সভাপতির পদ হারাইবার উপক্রম হয়। রবিব হিল্লাল সিলভারের নেতৃত্বে মার্কিন ইহুদীবাদীগণ প্যালেস্টাইনে বৃটিশ শাসনকে "অবৈধ" বলিয়া সমালোচনা করে এবং ওয়াইজম্যানকে একজন মন্থরকর্মী এবং সুযোগ-সুবিধার মাধ্যমে শান্তকারী ও এমন কি একজন "বিদ্রোহী" বলিয়া কটূক্তি করে। একটি ক্ষীণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে ওয়াইজম্যান সভাপতি নির্বাচিত হন, কিন্তু মার্কিন ইহুদীবাদীগণ নেতৃত্ব দখল করে এবং বেনগুরিয়ানের নেতৃত্বে ইহুদী এজেন্সীর আরও চরমপন্থী সদস্যদের সহিত সহযোগিতা করে।

জাতিসংঘ কমিশন

এই ধরনের অবিশ্বাস, দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও হত্যাকাণ্ডের পরিবেশে ইহা পরিষ্কার হইয়া উঠে যে অন্য কারও পক্ষে সম্ভব হইলেও বৃটিশগণ এই সমস্যা সমাধানে অক্ষম। প্রথম মহাযুদ্ধে কপটতা ও ওয়াদার বরখেলাপ শেষ পর্যন্ত বৃটিশনীতি প্রণয়নকারীদিগকে চাপিয়া ধরে। ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী বৈদেশিক সচিব বেভিন প্যালেস্টাইন সমস্যাটিকে জাতিসংঘে অর্পণ করিবার বৃটিশ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সেপ্টেম্বরে সাধারণ পরিষদ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিয়া রিপোর্ট প্রদান করিবার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করে। প্যালেস্টাইনের উপর জাতিসংঘের বিশেষ কমিটি (The United Nations Special Committee on Palestine বা UNSCOP) গঠিত হয় ১১টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবর্গ লইয়া। এই রাষ্ট্রগুলি হইল, অষ্ট্রিয়া, কানাডা, চেকোস্লোভাকিয়া, গুয়াতেমালা, ভারত, ইরান, নেদারল্যাণ্ডস,

পেরু, সুইডেন, উরুগুয়ে ও যুগোস্লাভিয়া কমিটি প্যালেস্টাইনে অবস্থানকালে ইরগুন আক্রার বন্দীশালায় এক দুঃসাহসিক অভিযান চালাইয়া অনেক ইহুদী বন্দী মুক্ত করে। সম্ভবতঃ জাতিসংঘের বিশেষ কমিটির উপকারার্থে ইহুদীবাদীগণ প্রায় ৪৫০০ ইহুদী উদ্বাস্তু লইয়া এক্সোডাস জাহাজের (S S Exodus) আগমনের সময়ও নির্ধারণ করে। বৃটিশ ইহা অবরোধ করে এবং ফ্রান্সে পুনরায় ফেরত পাঠায়।

জাতিসংঘের বিশেষ কমিটি (UNSCOP) একটি সর্বসম্মত রিপোর্ট পেশ করিতে ব্যর্থ হয়। ভারত, ইরান ও যুগোস্লাভিয়া এই তিনটি দেশ একটি সংখ্যালঘু রিপোর্ট পেশ করে ও একটি সংযুক্ত প্যালেস্টাইনের সুপারিশ করে। অবশিষ্ট দেশ প্যালেস্টাইনকে আরব ও ইহুদীদের মধ্যে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব পেশ করে। ইহুদীবাদীগণ বিভক্তি পছন্দ করে, অপরদিকে আরবগণ উভয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফলে জাতিসংঘের রাজনৈতিক কমিটিকে বিভক্তির পরিকল্পনা বিবেচনা করিতে হয়। ইহা প্যালেস্টাইনকে ছয়টি অংশে ভাগ করে, তিনভাগ আরবদের জন্য ও তিনভাগ ইহুদীদের জন্য। বিভক্তি প্রত্যেক দলের সন্নিবেশনের ভিত্তিতে করিলেও প্রকৃতপক্ষে আরব রাষ্ট্রে পড়ে ১০০,০০০ ইহুদী (১ শতাংশ) এবং ইহুদী রাষ্ট্রে পড়ে প্রায় ৫০০,০০০ আরব (৪৮ শতাংশ)। সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় ৩০ শতাংশ ইহুদীদিগকে, প্যালেস্টাইনের ৫৬ শতাংশ এলাকা ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং ৪৩ শতাংশ এলাকা দেওয়া হয় আরবদিগকে। অবশিষ্ট ১ শতাংশ এলাকা, জেরুজালেম ও বেথেলহাম, আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়।

দশ বৎসরের জন্য একটি অর্থনৈতিক ঐক্য পরিকল্পনার শর্ত প্রদান করিয়া বিভক্তির উদ্যোক্তাগণ আরেকটি সারল্যের প্রমাণ দেয়। এই অর্থনৈতিক ঐক্য অনুসারে ইহুদী রাষ্ট্র আরব রাষ্ট্রকে সহায়তা করিতে বাধ্য থাকিবে। কিন্তু পরে তুমুল বিতর্কের মুখে বিভক্তির প্রধান যৌক্তিকতা সেই অর্থনৈতিক ঐক্যই চাপা পড়িয়া যায়। জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদের সুপারিশের জন্য প্রয়োজনীয় দুই তৃতীয়াংশ ভোট বিভক্তি নীতির জন্য পাওয়া যাইবে—এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই। কোন কোন দেশ ইহার বিরোধিতা করে, বিশেষতঃ ফিলিপাইন। ইহার প্রতিনিধি জেনারেল কারলস রোমিউলো (Carlos Romulo) ইহার বিরুদ্ধে তুখোড় বক্তৃতা

দেন। চূড়ান্ত ভোটের তারিখ নির্ধারিত হয় ২৬শে নভেম্বর, ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু ইহাতে বিলম্ব করা হয়, অংশতঃ এই জন্য যে ২৭শে নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ধন্যবাদের দিন (Thanks giving Day)। এই সময়ে মার্কিন কর্মকর্তাগণ যাহারা বিরুদ্ধে ভোট দিবে তাহাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন বলিয়া জানা যায়। একের পর এক অনিচ্ছুক দেশগুলিকে লাইনে আনা হয়, শেষ পর্যন্ত এমন কি ফিলিপাইনের প্রতিনিধিও ভোট পরিবর্তনের আদেশ লাভ করেন। নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচজন স্থায়ী সদস্যের মধ্যে তিনজনই এই পরিকল্পনার স্বপক্ষে থাকায় ইহুদীবাদীদের সুবিধা হয়। অপর দুই সদস্য গ্রেট বৃটেন ও চীন ভোট দানে বিরত থাকে।

২৯শে নভেম্বর পরিষদের বৈঠক বসিলে ইহা পরিষ্কার হইয়া উঠে যে বিভক্তির পরিকল্পনা পাশ হইবে। অতঃপর আরব প্রতিনিধিবর্গ সংখ্যালঘু রিপোর্ট বিবেচনার প্রস্তাব করে, অবশ্য ইতিপূর্বে তাহারা এই রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। আরবদের এই ধরনের অভ্যাস অনেক বৎসর ধরিয়া চলিতে থাকে। কোন একটি প্রস্তাব বা আয়োজন তাহারা প্রবল ভাবে বাধা দেয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহা গ্রহণের আশা ফুরাইয়া গেলে তাহারা আবার ইহাকে সমর্থন করে। বিভক্তিকরণের পরিকল্পনা ৩৩ ও ১৩ ভোটে গ্রহণ করা হয়, ১১জন সদস্য ভোট দানে বিরত থাকে। গ্রেট বৃটেন ঘোষণা করে যে ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই মে সে হুকুমনামা বিলুপ্ত করিবে এবং ১লা আগস্টের পূর্বে প্যালেস্টাইন ত্যাগ করিবে।

প্যালেস্টাইনে গৃহযুদ্ধ

জাতিসংঘের ভোটের অব্যবহিত পরেই ফিলিস্তিনী আরব ও ইহুদী-বাদীদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। বৃটিশ সৈন্যগণ ইহাতে হস্তক্ষেপ করে নাই। তাহারা নিজেদের সুশৃঙ্খলভাবে অপসারণ ও অতি দ্রুত শক্তিশালী ঘাঁটিসমূহ ত্যাগ করিবার ব্যাপারেই প্রধানতঃ ব্যস্ত থাকে। আরবগণ প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রসমূহ হইতে অস্ত্র লাভ করে এবং ইহুদীবাদীগণ অস্ত্র ক্রয় করে যুক্তরাষ্ট্র ও চেকোস্লোভাকিয়া হইতে। হাগানাহ, ইরগুন ও স্টার্ন-দলসমূহ আরও অস্ত্রের জন্য বৃটিশ অস্ত্রাগারসমূহে হানা দিতে থাকে। অনুমান করা হয় যে আরবদের সৈন্য সংখ্যা হইল প্রায় ৫০০০ যাহারা

অনভিজ্ঞ এবং বহুদূরে অবস্থানরত জেরুজালেমের প্রাক্তন মুফতি দ্বারা পরিচালিত যিনি তখন কায়রোতে নির্বাসিত। অপরদিকে ইহুদীবাদীগণ আরও উত্তম অস্ত্রে সজ্জিত এবং উত্তম প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। তাহাদের অফিসার ও সৈন্যদের মধ্যে অনেকেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধা।

উভয় পক্ষই সন্ত্রাসমূলক কাজ করে। ইহুদীগণ ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারীতে জেরুজালেমে অবস্থিত আরব মালিকানাধীন সেমিরামিস হোটেল বোমার আঘাতে উড়াইয়া দেয়, এবং আরবগণ ইহুদী মালিকানাধীন জেরুজালেমে পোস্টভবন তোপের আঘাতে উড়াইয়া দিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করে। ফেব্রুয়ারীতে রমলার জনবহুল বাজারে একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। দুইদিন পর তেলআবিবের জনসমাগম কেন্দ্রে একটি বোমা বিস্ফোরণ করিয়া প্রতিশোধ লওয়া হয়। অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ঘটনা হইল দিয়ার ইয়াসীর নামক আরব গ্রামে হত্যাকাণ্ড। ২৯শে এপ্রিল হাগানাহ এই গ্রামটি দখল করে এবং ইরগুন-স্টার্ণ দলের হাতে ইহার পাহারা দিবার ব্যবস্থা ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু ইরগুন-স্টার্ণ দলসমূহ ২৫৪ জন আরব পুরুষ, মহিলা ও ছেলেমেয়েদের হত্যা করে। ইহার কয়েকদিন পর আরবগণ জেরুজালেমের হাদ্দাসাহ্ হাসপাতালের দিকে গমনরত একটি ইহুদী গাড়ীর বহর হঠাৎ আক্রমণ করিয়া প্রায় ৮০ জন ডাক্তার, নার্স ও ছাত্রদলকে হত্যা করতঃ প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আরব ও ইহুদী উভয় পক্ষের বেসামরিক লোকদের মধ্যে ত্রাসের সৃষ্টি হয়, কিন্তু হাগানার অনুমতি ছাড়া কোন ইহুদী তাহাদের ঘর ত্যাগ করিতে পারিত না, অথচ আরবদের অনুরূপ কোন রক্ষামূলক ব্যবস্থা ছিল না। ১৫ই মে হুকুমনামা বিলুপ্তির সময় পর্যন্ত প্রায় ১৫০,০০০ আরব উদ্বাস্তু যুদ্ধক্ষেত্র ও রক্তারক্তির স্থান হইতে পলায়ন করে।

এই সকল রক্তপাত চলাকালীন হাজার হাজার মাইলের ব্যবধানে দুইটি অত্যন্ত অসঙ্গত কাজ চলিতে থাকে। নিউইয়র্কের জাতিসংঘের হলঘরে যুক্তরাষ্ট্রের মত পরিবর্তিত হয় বলিয়া মনে হয়। ইহা প্রস্তাব করে যে, বিভক্তির পরিকল্পনা কার্যকর করিতে বিঘ্ন সৃষ্টি হওয়ায় জাতিসংঘ কর্তৃক প্যালেস্টাইনের জিম্মাদারী লওয়া উচিত। ১৬ই এপ্রিল ও ১৫ই মে'র মধ্যে ইহুদীবাদী ও তাহাদের সমর্থকদের কঠোর সমালোচনার মুখে এই প্রস্তাব

বিবেচনার জন্ম সাধারণ পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন বসে। এই-দিকে জাতিসংঘে প্রতিনিধিবর্গ বিভক্তি পরিকল্পনা লইয়া আলোচনা করেন, অপরদিকে বেনগুরিয়ান এবং প্যালেস্টাইনের ইহুদী রাষ্ট্রের ন্তাশনাল কাউন্সিল ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই মে তেলআবিবে মিলিত হন ও ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান নতুন রাষ্ট্রের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতির কথা ঘোষণা করেন, অথচ তাঁহার দেশের প্রতি-নিধিবর্গ তখনও জাতিসংঘে জিম্মাদারীর উপর বিতর্কে লিপ্ত। ডঃ চেইম ওয়াইজম্যানকে নতুন প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট এবং ডেভিড বেন-গুরিয়ানকে প্রথম প্রধান মন্ত্রী হিসাবে মনোনীত করা হয়।

আরব-ইসরাইল যুদ্ধ

১৫ই মে প্রভাতে ছয়টি আরব রাষ্ট্র (মিসর, ইরাক, জর্দান, লেবানন, সৌদী আরব ও সিরিয়া) ইসরাইল আক্রমণ করে। ৬৫০,০০০ লোক অধ্যুষিত একটি জাতি ৪,০০০০,০০০ লোকের সম্মিলিত আরব রাষ্ট্রকে পরাজিত করিলে ব্যাপারটিকে অলৌকিক বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু প্রকৃত সৈন্ম সংখ্যা বিবেচনা করিলে ব্যাপারটিকে ভিন্নরূপ মনে হইবে। ছয়টি সম্মিলিত আরব রাষ্ট্রের সৈন্ম সংখ্যা ৭০,০০০ এর অধিক হয় নাই। ইহাদের মধ্যে মাত্র ১০,০০০ সৈন্ম সঠিক প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং তন্মধ্যে ৬০০০ হইল জর্দানের আরব বাহিনীর লোক। আরব বাহিনীর মোকাবিলায় ইসরাইলের পক্ষে দেখা যায় কমপক্ষে হাগানাহ্‌র ৬০, ০০০ যোদ্ধ‍ৃদল। এই সেনা-বাহিনীতে থাকে বৃটিশ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৩০০ অফিসার, প্রায় ২০,০০০ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দুর্ধর্ষ যোদ্ধ‍ৃদল এবং ৩০০ বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত গেরিলা বাহিনী (পালমাখ্)। ইরগুন ও স্টার্ণ দলসমূহের কর্মক্ষম যোদ্ধার সংখ্যা এক হাজারের অধিক নহে। তদুপরি ইসরাইলীদের সাহসিকতা ও তৎপরতা অবহেলা করিবার মত নহে। তাহাদের মনোবল অতি উঁচু, কারণ তাহারা যুদ্ধ করে টিকিয়া থাকিবার তাগিদে। অপরদিকে আরবদের একনিষ্ঠ কোন লক্ষ্যও নাই, সেনাপতিও নাই। অধিকাংশ আরব সৈন্ম কেন যুদ্ধ করিতেছে তাহাও জানে না, এবং তাহাদের নেতৃবৃন্দও কোন না কোন জাতীয় বা ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্যই যুদ্ধে লিপ্ত।

প্রারম্ভে উভয় বাহিনীর সাজসরঞ্জাম ছিল অপ্রতুল, কিন্তু আমেরিকা ও ইউরোপের ইহুদীবাদীগণ ইসরাইলের প্রয়োজনীয় অস্ত্র সরবরাহ করে এবং ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও দক্ষিণ আফ্রিকার ইহুদী স্বেচ্ছাসেবকগণ তাহাদের বিমান চালনা করে। এতদসত্ত্বেও প্রথমদিকে আরবগণ বেশ সফলতা অর্জন করে। মিশরীয়গণ নেগেভ অধিকার করে, জর্দান পুরাতন জেরুজালেম নিয়ন্ত্রণ করে, এবং ইরাকী সৈন্যগণ হাইফার ১৫ মাইলের মধ্যে পৌঁছে। ১১ই জুন জাতিসংঘ কর্তৃক আয়োজিত প্রথম শান্তি চুক্তির সময় দেখা যায় যে বিবাদমান পক্ষগুলি মোটামুটি জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত ভূখণ্ডই আঁকড়াইয়া রহিয়াছে। যুদ্ধ বিরতির শর্ত হইল বিবাদমান পক্ষদ্বয় যেখানে আছে সেখানেই থাকিবে এবং নতুন কোন সৈন্য বা অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা নিজদিগকে শক্তিশালী করিবে না। উভয় পক্ষই চুক্তির দ্বিতীয়াংশ ভঙ্গ করে। আরবগণ অবশ্য অস্ত্র নিষেধাজ্ঞার দরুন সমগ্র এলাকা পরিবৃত করিতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু ইসরাইলীগণ চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে বিপুল পরিমাণ প্রথম শ্রেণীর অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিতে সক্ষম হয়। যুক্তরাষ্ট্র হইতে উড়ন্ত দুর্গরাজি এবং বৃটেন হইতে ব্যু-ফাইটার জঙ্গী বিমান ইসরাইলে পাচার করা হয়।

সুইডেনের কাউণ্ট ফোক বার্ণাডটকে জাতিসংঘের তরফ হইতে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে প্রেরণ করা হয়। প্যালেস্টাইন ও জর্দান উভয় দেশের অর্থনৈতিক ঐক্য ও একটি স্বায়ত্তশাসিত ইহুদী রাষ্ট্রের ভিত্তিতে সন্ধি স্থাপনের জন্য তিনি তাঁহার নিজস্ব প্রস্তাবাবলী পেশ করেন। এই পরিকল্পনানুযায়ী জেরুজালেম ও নেগেভ পড়ে আরবদের ভাগে এবং সমগ্র গ্যালিলী পড়ে ইসরাইলের ভাগে। আরব ও ইসরাইল উভয় পক্ষ এই পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে এবং ৯ই জুলাই পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়। পরবর্তী দশদিনের যুদ্ধে ইসরাইলীগণ বেশ এলাকা দখল করে। ১৯শে জুলাই জাতিসংঘ দ্বিতীয় শান্তি চুক্তি আরোপ করে। আরব বাহিনী পুরাতন জেরুজালেম এবং ইসরাইলীগণ নতুন জেরুজালেম দখল করে। কাউণ্ট-বার্ণাডট তবুও এই সমস্যার একটি সমাধান লাভের প্রচেষ্টা চালাইয়া যান, কিন্তু ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর স্টার্ণ দলের এক গুলীর আঘাতে তিনি নিহত হন।

দ্বিতীয় সন্ধি অনেকটা প্রথম সন্ধির ন্যায়। ইসরাইলীগণ নিজেদের

শক্তি সঞ্চয় করে এবং সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে নেগেভ ও গ্যালিলী অঞ্চলে দুইটি আক্রমণ পরিচালনা করে। ৩১শে অক্টোবরের মধ্যে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী বিমান বাহিনী লইয়া ইসরাইলী সেনাবাহিনী মিসরীয়দিগকে নেগেভ হইতে এবং "আরব মুক্তিবাহিনীকে" উত্তর গ্যালিলী হইতে হটাইয়া দেয়। ইতিমধ্যে প্যালেস্টাইন বিষয় লইয়া জাতিসংঘে বিতর্ক চলে। জাতিসংঘ সচিবালয়ের র‍্যাল্‌ফ্ বাঞ্চকে ভারপ্রাপ্ত মধ্যস্থতাকারী হিসাবে মনোনীত করা হয়। রড্‌স দ্বীপে তাঁহার সদর দফতরে তিনি আরব ও ইসরাইলী প্রতিনিধিবর্গকে বিভিন্ন কক্ষে একত্রিত করেন (আরবগণ ইসরাইলীদের সহিত একই কক্ষে বসিতে অস্বীকার করে) এবং উভয় কক্ষে বারংবার আসা যাওয়া করিয়া শেষ পর্যন্ত ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী ইসরাইল ও মিশরের মধ্যে প্রথম সন্ধি স্থাপন করিতে সক্ষম হন। পরে অন্যান্যদের সঙ্গেও সন্ধি হয় : লেবাননের সহিত ২৩শে মার্চ, জর্দানের সহিত ৩রা এপ্রিল এবং সিরিয়ার সহিত ২০শে জুলাই একটি সন্ধি স্থাপিত হয় এবং র‍্যাল্‌ফ্ বাঞ্চ তাঁহার প্রচেষ্টার জন্য শান্তির নোবেল পুরস্কার লাভ করেন, যদিও কোন শান্তি তথায় প্রতিষ্ঠা হয় নাই।

তিনটি জটিল সমস্যা অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। প্রথমটি হইল সীমান্ত প্রশ্ন। প্রত্যেক সন্ধি চুক্তিতে মিসর-ইসরাইল সন্ধির পাঁচ নম্বর ধারার ন্যায় একটি বাক্য সংযোজন করা হয়; তাহাতে বলা হয়, "সন্ধির সীমান্ত রেখাকে কিছুতেই রাজনৈতিক বা ভৌগোলিক সীমান্ত হিসাবে ব্যাখ্যা করা হইবে না, এবং প্যালেস্টাইন সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসার কালে এই সন্ধি মোতাবেক উভয় পক্ষের কোন অধিকার, দাবী ও অবস্থান বিবেচনা না করিয়া সীমান্ত নির্ধারিত হইবে।"* ইসরাইলকে তাহার মূল সীমা রেখায় ফিরিয়া যাইবার জন্য জাতিসংঘ কর্তৃক পীড়াপীড়ি না করিবার অর্থ এই যে সম্ভবতঃ জাতিসংঘে অনেক দায়িত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ইহা চান না। ইসরাইলী-

* "The Armistice Demarcation line is not be construed in any sense as a political or territorial boundary, and is delineated without prejudice to rights, claims, and positions of either party to the Armistice as regards ultimate settlement of the Palestine question."

গণ তাহাদের নতুন সীমান্তে যেইরূপ দ্রুতগতিতে ইহুদীদের "বসতি" স্থাপন করে তাহাতে প্রমাণ করে যে কখনও একটি "চূড়ান্ত মীমাংসার" আয়োজন করা হইলেও তাহারা ঐ অবস্থান হইতে ফিরিয়া যাইবার ইচ্ছা পোষণ করে না। 'অস্থায়ী' সীমান্তের অতি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল বিবাদমান সৈন্যদের অবস্থান। অসামরিক অঞ্চল সৃষ্টি করা হয় ভবিষ্যতের যুদ্ধ এড়াইবার জন্য। ফলে গাজা অঞ্চলটি দেওয়া হয় মিসরকে, লেবাননের সীমান্তে যুক্তিসম্মত কোন পরিবর্তন সাধন করা হয় নাই এবং হুলাহ্ হ্রদের জলা-ভূমি ব্যতীত, তাহাও অসামরিক অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র গ্যালিলী সাগর ও জর্দান নদীর উপরিভাগ ইসরাইলের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। জর্দানের বাদশাহ্ আবদুল্লাহর সেনাবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত জর্দান নদীর পশ্চিম তীর তাঁহার হাতে দেওয়া হয়। ইহাতে পুরাতন জেরুজালেম অন্তর্ভুক্ত। কায়রোতে অবস্থানরত প্রাক্তন মুফ্তী হজ্ব আমিন আল হুসাইনী বাদশাহ আবদুল্লাহ্ কর্তৃক ফেলিস্তিনী ভূখণ্ড অধিকার স্বীকার করে নাই, কিন্তু বিরোধিতা কার্যকরী করিবার মত কোন ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। এইভাবে "অস্থায়ী" সীমান্ত মীমাংসায় ইসরাইলকে বিভক্তি পরিকল্পনায় চাইতে ২০ শতাংশ অধিক ফেলিস্তিনী ভূখণ্ড ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

জেরুজালেম

দ্বিতীয় অমীমাংসিত সমস্যা হইল পুরাতন ও নতুন জেরুজালেম প্রশ্ন। নিকটস্থ বেথেলহেম সহ এই নগরীকে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণে রাখি-বার প্রস্তাব করে। যুদ্ধের ফলে এই নগরের অবস্থা আন্তর্জাতিক নগরী হইতে কাটাতারে ঘেরা একটি বিভক্ত নগরীর রূপ ধারণ করে। জর্দানীগণ পুরাতন জেরুজালেম ও বেথেলহেম নিয়ন্ত্রণ করে, যেখানে খ্রীস্টান, ইসলাম ও ইহুদী ধর্মের অধিকাংশ পবিত্র দরগাহসমূহ বিদ্যমান। ইসরাইলীগণ নতুন জেরুজালেমের বৃহদাংশ অধিকার করে। জাতিসংঘ একটি আন্তর্জাতিক জেরুজালেমের নীতি ত্যাগ না করিলেও শান্তি প্রতিষ্ঠাকারীগণ সন্ধির চুক্তিতে যে সীমান্ত রেখা চিহ্নিত করেন তাহাতে জেরুজালেমকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে ইসরাইল ও জর্দান কর্তৃক অধিকৃত এলাকা পৃথক ভূখণ্ডে

পরিণত হয় এবং জেরুজালেম একটি বিভক্ত নগরী হিসাবে থাকিয়া যায়।

জেরুজালেমের আন্তর্জাতিকতার বিষয়টি জাতিসংঘের আলোচ্য বিষয়ে থাকিয়া যায় এবং ইসরাইলের অস্তিত্বের প্রথম ২০ বৎসরের প্রত্যেক বৎসর প্রতিনিধিবর্গ জেরুজালেমের মর্যাদা লইয়া প্রস্তাব পাশ করেন, কিন্তু ইসরাইল বা জর্দান কেহই ঐগুলির প্রতি কর্ণপাত করে না। ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে ইসরাইল জেরুজালেমকে ইহার রাজধানী বলিয়া ঘোষণা করে এবং নেসেট (Knesset) বা পার্লামেণ্ট সহ অনেক মন্ত্রীসভা তথায় লইয়া যায়। অবশ্য ইসরাইলে নিযুক্ত কুটনীতিবিদগণ ইহা স্বীকার করেন না এবং তাই তাঁহাদের এমবেসী তেলআবিবেই রাখেন। অধিকন্তু ইসরাইল ইহাও ভুলিয়া যায় যে জেরুজালেমকে অসামরিকী করিবার কথা, অথচ তবুও সে তাহার বাৎসরিক স্মরণযোগ্য সামরিক কুচকাওয়াজ এই নগরেই সম্পন্ন করে। ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসের "ছয় দিনের যুদ্ধে" ইসরাইল পুরাতন জেরুজালেম অধিকার করিলে এই নগরীর আন্তর্জাতিকীকরণের সম্ভাবনা চিরতরে তিরোহিত হইয়া যায়।

আরব উদ্বাস্তু দল

ইসরাইল ও আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে স্বাক্ষরিত যুদ্ধ বিরতি চুক্তির পর উত্থিত তৃতীয় ও অত্যন্ত বিরক্তিকর সমস্যা হইল আরব উদ্বাস্তুদের ভাগ্য। ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে যুদ্ধ শেষ হইলে দেখা যায় প্রায় ৭৫০,০০০ আরব উদ্বাস্তু মিসর (গাজা অঞ্চল), জর্দান, লেবানন ও সিরিয়ায় ইতস্ততঃ ছড়ানো। উদ্বাস্তুদের সংখ্যা এত অধিক হইবার কারণ লইয়া পরস্পর বিরোধী মতামত পেশ করা হয়। ইসরাইল ও তাহার সমর্থকগণ সাধারণতঃ দাবী করে যে আরব রাষ্ট্রবর্গ কর্তৃক বেতারের মাধ্যমে আরবদিগকে তাহাদের ঘরবাড়ী ত্যাগ করিয়া আক্রমণকারী বাহিনীতে যোগদান করতঃ ইসরাইলকে পরাজিত করিবার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়। ইহাতে ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না যে তাহারা তাহাদের দারাপুত্র পরিবারও কেন সঙ্গে লইয়া যায়। উত্তরে শুধু এতটুকু বলা হয় যে তাহারা তাহাদের শত্রুদের মধ্যে পরিবারবর্গকে রাখিয়া যাইতে চায় নাই। আরব লেখকবর্গ দাবী করেন যে, ইসরাইলে সমাগত ইহুদী উদ্বাস্তুদের জন্য জায়গা করিবার উদ্দেশ্যে ইসরাইলী সৈন্যগণ আরব নারী পুরুষ ও শিশুদিগকে

বেয়নেটের মুখে "বিতাড়িত" করে। প্যালেস্টাইনে নিযুক্ত ইউরোপীয় দেশসমূহের বেতার বার্তা সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করিলে ইসরাইলের দাবীর সত্যতা প্রমাণিত না হইলেও, ইহা সহজেই অনুমান করা যায় যে অনেক আরব তাহাদের বেতারে অতি আশাব্যঞ্জক আরব "বিজয়ের" খবর শুনিয়া মনে করে যে তাহাদের বরং দেশ ত্যাগ করিয়া বিজয়ীদের সহিত দেশে ফেরাই উত্তম কাজ। অপরদিকে ইহাও প্রমাণিত হয় যে হাইফা ও অন্যান্য বড় বড় শহরে ইহুদী মাইকের দ্বারা আরবদিগকে দেশত্যাগে উৎসাহ প্রদান করা হয়, কোন কোন গ্রামে ইসরাইলী সৈন্যগণ আরবদের ঘরবাড়ী ধ্বংস করে এবং কোথাও কোথাও আরবদিগকে বহিষ্কারও করা হয়। এতদসত্ত্বেও, অধিকাংশ আরব অসংখ্য যুদ্ধ কবলিত লোকদের ন্যায় জীবনের ভয়ে যুদ্ধ হইতে পালাইতে চায় এবং গোলাগুলি শেষ হইলে পুনরায় ফিরিয়া আসিবার আশা পোষণ করে। অবশ্য যুদ্ধ শেষে ইসরাইলী বাহিনী তাহাদিগকে আর ফিরিয়া আসিতে দেয় নাই। ইউরোপ হইতে আগত লক্ষ লক্ষ ইহুদী তাহাদের ঘরবাড়ী দখল করে এবং বিজয়ীগণ তাহাদের ক্ষেত খামারের ফসল ঘরে তোলে।

বস্তুতঃ প্রত্যেক বৎসর জাতিসংঘ আরব উদ্বাস্তুদের তাহাদের ঘরবাড়ীতে ফিরিবার অধিকারের আদর্শ ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করে, কিন্তু ইসরাইল আরব উদ্বাস্তুদিগকে প্রবল গৃহশত্রু বলিয়া বিবেচনা করে এবং তাহাদিগকে ফিরিতে দেয় না। এই দিকে আরব দেশসমূহ একটি প্রাঞ্জল শান্তি চুক্তি সম্পাদন না করিলে তাহাদের ঘরবাড়ী ও ক্ষেতখামারের জন্য ক্ষতিপূরণ দিতেও ইসরাইল নারাজ। অধিকাংশ উদ্বাস্তু শিবিরে বাস করে এবং জাতিসংঘ রিলিফ ও ওয়ার্ক এজেন্সী (United Nations Relief and Work Agency or UNRWA), ফ্রেণ্ডস সার্ভিস কমিটি, ওয়ার্ল্ড চার্চ সার্ভিস ও অন্যান্য জনহিতকর সংগঠন দ্বারা তাহাদের ভরণপোষণ চলে। মিসর অধিকাংশ উদ্বাস্তুকে গাজা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখে এবং তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধিতে নিরুৎসাহ প্রদান করে। সিরিয়া, লেবাননে উদ্বাস্তুদল এক বিদেশীর ন্যায় বাস করে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকজন চাকুরীর রকম সংস্থান করে এবং নাগরিকত্বও লাভ করে। বহু সংখ্যক শিক্ষিত উদ্বাস্তু শিক্ষক হিসাবে কুয়েত ও সৌদী আরব গমন করে। প্যালেস্টাইন নামের

এক ফালি ভূখণ্ড দখলকারী একমাত্র জর্দানই উদ্বাস্তুদিগকে পরিপূর্ণ নাগরিকের মর্যাদা দান করে। তাহা সত্ত্বেও, যাহারা শিবিরে বাস করে তাহারা নিরুদ্দিষ্ট জীবন যাপন করে এবং বছরের পর বছর এইভাবে বাস করিয়া তাহারা ফারটাইল ক্রিসেণ্টের সাধারণ এলাকার দুঃখপূর্ণ একটি অংশ হিসাবে বিরাজ করে।

একটি ইহুদীবাদী রাষ্ট্র

বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের মধ্যে ইসরাইল সম্ভবতঃ অদ্বিতীয়, এই জন্য যে ইহাকে ইচ্ছাকৃতভাবেই একটি আশ্রয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়। একদিক দিয়া যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং এই ধরনের যে সব দেশ উদ্বাস্তুদের লইয়া সমস্যায় পড়িয়াছে তাহারা ইহুদীদের আশ্রয়ের স্থান হিসাবে এই রাষ্ট্রকে বিবেচনা করে। কিন্তু ইসরাইলের অদ্বিতীয় হইবার কারণ হইল ইহা একটি বিশেষ শ্রেণীর লোকদের আশ্রয়স্থল, অর্থাৎ ইহুদীদের, আর কাহারো নহে। কারণ ইহুদীবাদ একটি ইহুদী আবাসস্থল এবং পরে একটি ইহুদী রাষ্ট্রের জন্য পরিশ্রম করে। তাই ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে পৃথিবীর সমস্ত ইহুদীদের "একত্রীকরণের" জন্য ইসরাইল প্রস্তুত থাকিবে। ইসরাইল এই রাষ্ট্রে অ-ইহুদীদের প্রবেশ কখনও অস্বীকার করে নাই কিন্তু ইহার "ইহুদীপনার" উপর এমন জোর দেওয়া হয় যে অ-ইহুদীগণ সর্বদা নিজদিগকে জল বহির্ভূত মৎস্যের ন্যায় মনে করে। ইহুদীবাদীগণ ইহুদীদিগকে শুধু আমন্ত্রণই জ্ঞাপন করে নাই, বরং তাহারা ইহাদিগকে আনয়নে সাহায্যও করে। নতুন রাষ্ট্রে তাহাদিগকে স্থান করিয়া দেয় এবং কর্মসংস্থানও করিয়া দেয়। বিশ্বের যে কোন অংশের ইহুদী ইসরাইলে যাইতে পারে এবং প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র পূরণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকতা লাভ করে। অ-ইহুদীগণ এইরূপ পারে না।

ফলে ইসরাইল একটি বিতর্কের বিষয়, পূর্বেও ছিল এবং এখনও বিদ্যমান। তাহা হইল "ইহুদী কে?" মোটামুটিভাবে অন্ততঃ আইনগতভাবে ইসরাইলীগণ একমত যে একজন ইহুদী হইবার জন্য আস্থা, বিশ্বাস বা আদর্শের কোন প্রয়োজন নাই। ইসরাইলে খোদা ও তোরাতে খাঁটি বিশ্বাসী অনেক লোক বিদ্যমান, আবার অনেক অজ্ঞেয়বাদী ও ধর্মহীন লোকও বিদ্যমান, কিন্তু

সকলেই ইহুদী। একজন ইহুদী হইবার অতি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হইল (সম্ভবতঃ একমাত্র শর্ত) জন্ম। ইসরাইলের বিচারালয়ের রায় হইল যাহার মাতা "ইহুদী বংশের" তাহাকেই ইহুদী হিসাবে বিবেচনা করা যাইতে পারে। "ইহুদী-পনার" উপর এইরূপ জোর দেওয়াটা ইহুদীবাদের দাবী ও কর্মসূচীর সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, কিন্তু একটি আধুনিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ইহা অসঙ্গত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যে ধর্মেরই হউক, ইসরাইলে আগত কোন উদ্বাস্তু সে যে ইহুদী বংশদ্ভূত এই কথা প্রমাণ করিতে না পারিলে তাহাকে ইহুদী বলিয়া বিবেচনা করা হয় না এবং তাই সে কোন সুবিধাদি ভোগ করিতে পারে না ও "একত্রীকরণের প্রয়োজনীয় আইনের আওতায় পড়ে না। সমালোচকের দৃষ্টিতে এইরূপ একটি রাষ্ট্র বর্ণগত, একান্ত ও আত্মকেন্দ্রিক।

প্রধান মন্ত্রী বেনগুরিয়ান ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত পঞ্চবিংশতি ইহুদীবাদী সম্মেলনে পৌরানিক ইহুদীবাদী আদর্শ ব্যক্ত করেন। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইহুদী "তাহার সমগ্র পার্থিব ও রাজনৈতিক জীবনে সে একটি অ-ইহুদী আধিপত্যের দাস" একমাত্র ইসরাইলে—"যে মাটিতে আমরা বিচরণ করি, যে বৃক্ষের ফল আমরা ভক্ষণ করি···যে স্কুলে আমাদের ছেলেমেয়ে শিক্ষা পায়···যে দেশের দৃশ্য আমরা অবলোকন করি এবং যে বৃক্ষতরুরাজী দ্বারা আমরা পরিবৃত—ইহার সবগুলিই ইহুদী।" রাষ্ট্র এই-রূপ সর্বাঙ্গীন ইহুদীপনায়—এমন কি প্রচলিত গণতন্ত্রের মধ্যেও কোন অ-ইহুদী পরিচিত পরিবেশ অনুভব করিতে পারে কিনা সন্দেহ। ইসরাইলে একটি "অ-ইহুদী-বিরোধী" মনোভাব সর্বত্র পরিস্ফুট, যাহা অন্যান্য দেশে অনেকটা ইহুদী-বিরোধী মনোভাবের সমতুল্য।

ইসরাইলী সরকার

ইসরাইলের নাগরিকদের মধ্যে যে গণতন্ত্র বা স্বাধীনতা নাই তাহা নহে। বরং বেশ সভ্যতার সহিতই বলা হয় যে ইসরাইলী সমাজ "বিশ্বের অত্যন্ত আইনানুগ সমাজগুলির অন্যতম।" ইসরাইল সরকার গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাথমিক ইহুদী উদ্বাস্তুগণ পূর্ব-ইউরোপের রাজনৈতিক বিভিন্নতা সঙ্গে লইয়া আসে এবং এইগুলিকে বৃটিশ পার্লামেণ্টারী পদ্ধতির সহিত সংমিশ্রিত করে। ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দের প্রথম নির্বাচনে নেসেটের

(পার্লামেন্ট) ১২০টি আসনের জন্য ২১টি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। জনগণ কোন একটি দলকে ভোট প্রদান করে, ব্যক্তি বিশেষকে নহে। দলগুলি নির্বাচনে প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে নেসেটে প্রতিনিধি প্রেরণ করে। ১৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে ২১টি দলের মধ্যে মাত্র নয়টি দল নেসেটে অন্ততঃ একটি আসন লাভ করিবার মত ভোট পায় (৫ শতাংশ)। উল্লেখযোগ্য দলগুলির মধ্যে থাকে মাপাই, ম্যাপাম, জেনারেল জিওনিস্ট, হিরুত ও মিজরাখী।

মাপাই বা ইসরাইল শ্রমিক দল দেশের অত্যন্ত প্রভাবশালী দল এবং ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দ হইতে এই দল প্রধান মন্ত্রীর পদ নিয়ন্ত্রণ করে। ইহা মার্ক্সীয় সমাজবাদী আদর্শ সংবলিত শ্রমিক দল। ইহার কোন কোন নেতা, যথা বেনগুরিয়ানের মত ব্যক্তি, হুকুমনামার সময় ইহুদী এজেন্সীর (Jewish Agency) সদস্য থাকেন। সম্ভবতঃ বিরাট শ্রম ও শিল্প প্রতিষ্ঠান, হিস্তাদ্রাত (Histadrut)-এর উপর ইহার আধিপত্যের দ্বারা ভোটারদের মধ্যে ইহার ক্ষমতা বুঝা যায়।

মাপাইর পরে আসে বামপন্থী সম্মিলিত শ্রমিক দল বা ম্যাপাম। ইহা মার্ক্সীয় আদর্শ সম্ভূত এবং ইহুদীবাদকে ইহা সমাজবাদের পদানত মনে করে। ইহা একটি দ্বিজাতিত্বমূলক (আরব-ইহুদী) রাষ্ট্র দাবী করে। ইহা বিল্টমোর কর্মসূচী [১] বিরোধী ছিল। এইদল নীতিগতভাবে গ্রামীণ, যৌথ ব্যবস্থাবাদী, পুঁজিবাদ বিরোধী ও নিরপেক্ষবাদী।

উপরোল্লিখিত দলসমূহের মধ্যে ডানপন্থী দল হইল লিবারেল পার্টি, যাহা বিভিন্ন শ্রেণীর একটি সংমিশ্রণ। তাহারা ইহুদীবাদ ব্যতীত অন্যকোন মতবাদ স্বীকার করে না, এবং সময় সময় ইহাদিগকে জেনারেল জিওনিস্ট বা সাধারণ ইহুদীবাদীও বলা হয়। শহরে ব্যবসায়ীদের মধ্যে এই দলের সমর্থক বেশী এবং ব্যক্তি মালিকানায় ব্যবসা-বাণিজ্যে ইহা আস্থাশীল। প্রজাতন্ত্রের প্রথম দিকে ইহা ছিল ইসরাইলের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল, কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইহা হিরাত দলের দিকে ঝুকিয়া যায়। হিরাত পার্টি জেনারেল জিওনিস্টদের ডানপন্থী শাখা। হিরাত দলের নেতৃবৃন্দের মধ্যে রহিয়াছে ইরগুন গ্রুপের কিছু কিছু নেতা। ইহা রিভিশনিস্টদের উত্তরাধিকারী, যাহারা ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে প্যালেস্টাইন হইতে ট্রান্সজর্ডানের

১। উপরে দ্রষ্টব্য পৃ: ৩৪১।

পৃথকীকরণের বিরোধিতা করে। এই দল অন্ধ দেশহিতৈষী, এবং আরব রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে ইহা ইসরাইলের রাজ্য বিস্তারমূলক ও প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধের পক্ষপাতী।

ধর্মীয় দলগুলির মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হইল মিজরাখী ও মিজরাখী ওয়ার্কার্স'। তাহাদের আদর্শ হইল ইহুদীবাদ (zionism) ইহুদী ধর্মের মধ্যে নিহিত এবং তাই ইহুদী ধর্মকে ইহুদী জাতীয়তাবাদ হইতে পৃথক করা যায় না। তাহারা ধর্মীয় শিক্ষা ও রীতিনীতির কঠোর উদ্যোক্তা। নেসেটে কোন দল যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিতে পারে না তাই কোয়ালিশন সরকারের প্রয়োজন হয়। সম্ভবতঃ যেহেতু ধর্মীয় দলসমূহ অন্যান্য দলসমূহের অর্থনৈতিক আদর্শের উপর কোন প্রশ্ন তোলে না তাই সাধারণতঃ ইসরাইলের প্রত্যেকটি কোয়ালিশন সরকারে তাহাদের সদস্যও থাকে। ধর্মীয় দলসমূহের সহযোগিতা লাভ করিবার জন্য ম্যাপাই দল তাহাদের বিভিন্ন দাবী সমর্থন করে, যথা—ধর্মীয় শিক্ষা, আহার ও সাব্বাথের [১] আইন পালন, বিবাহ ও তালাক নিয়ন্ত্রণ এবং শূকর পালিবার উপর নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি।

সামাজিক অখণ্ডতা

ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রকৃতি এবং যে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইহা প্রতিষ্ঠিত তাহার দরুন ইহা কতকগুলি বিশেষ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যার আবর্তে নিমজ্জিত। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে ইসরাইলের লোক সংখ্যা ছিল প্রায় ৬৫০,০০০। ইহা প্রতিষ্ঠিত হইবার প্রথম ১৮ মাসের মধ্যে লোক সংখ্যা ৩০০,০০০ লক্ষেরও বেশী বাড়িয়া যায়। প্রায় সমস্ত উদ্বাস্তু যেহেতু কোন অর্থনৈতিক সম্পদ ছাড়াই আসে, তাই তাহাদের গৃহ নির্মাণ, কর্মের সংস্থান ও সাধারণ সামাজিক একত্রীকরণ এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করে। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের পর ইউরোপীয় ইহুদীদের আশকেনাজিম, (Ashkenazim) আগমন হ্রাস পাইলে আরবীভাষী দেশসমূহ, ইরান, তুরস্ক, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য স্থান হইতে "প্রাচ্য দেশীয়" ইহুদীদের (সেপাহ্রাদিম, Sephar-dim) আনয়ন করিবার জন্য বিশেষ প্রচেষ্টা চালাইতে হয়। "ম্যাজিক

১। সাববাথ ইহুদীদের সাপ্তাহিক ধর্মীয় দিবস, শনিবার।

কার্পেট'' নামক এক প্রচেষ্টায় ৪৫০০০ হাজার ইয়ামানী ইহুদী আনয়ন করা হয়, আবার ''আলীবাবা'' নামক এক প্রচেষ্টায় ইরাক হইতে ১১৪০০০ ইহুদী স্থানান্তর করা হয়। ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ প্রাচ্য দেশীয় ইহুদী ইসরাইলের মোট জনসংখ্যার ৫৫ শতাংশে দাঁড়ায়।

উদ্বাস্তুগণ নিজেদের সঙ্গে বিভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষা, কুসংস্কার, ধর্মীয় বিশ্বাস এবং এমন কি আকৃতিও লইয়া আসে। তাহাদিগকে এক নতুন ভাষা শিক্ষা করিয়া এক জাতি হিসাবে বাস করিতে হয় ও কাজ করিতে হয়। তাহাদের স্ব স্ব দেশে তাহারা ''ইহুদী'' হিসাবে পরিচিত ছিল, কিন্তু ইসরাইলে তাহারা হয় জার্মান, পোল, রুমানিয়ান, ইরাকী, ইয়ামানী, মিসরীয় বা মার্কিন। জার্মানগণ পোলদিগকে অপছন্দ করে, আবার ইউরোপীয়গণ প্রাচ্যদেশীয়দিগকে ঘৃণা করে। একত্রীকরণের জন্য ইসরাইলী সরকার মিশ্র সমবায় প্রতিষ্ঠা করে, কিন্তু এইগুলি পরে ত্যাগ করিতে হয়, কারণ সামাজিক বিভিন্নতার ফলে ঝগড়ার সৃষ্টি হয়, এমন কি কোন কোন সময় গোলাগুলিও চলে।

মোটামুটিভাবে, বিলম্বে আগমনকারী স্বল্প শিক্ষিত, স্বল্প কারিগরি বিদ্যায় পারদর্শী এবং শুধু ''প্রাচ্য দেশীয়'' হইবার দরুন ইচ্ছাকৃতভাবে ও ঘটনাচক্রে এই সকল ইহুদীকে অন্যান্য ইহুদী হইতে পৃথক চোখে দেখা হয়। প্রায় সমস্ত উচ্চ বেতনের চাকুরী ইউরোপীয়গণ করায়ত্ত করে। ইউরোপীয় ইহুদীগণ এই বিষয়ে সজাগ যে বছরের পর বছর ধরিয়া পরিশ্রম ও আত্মদানের দ্বারা তাহারা এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। অতএব তাহারা মনে করে, প্রাচ্যদেশীয় ইহুদীদিগকেও অনুরূপ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া যাইতে হইবে এবং তাই তাহাদের সমান ব্যবহার আশা করা উচিত নহে। ইউরোপীয় ইহুদীদের নিকট ইহা হয়ত যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু দুর্দশাগ্রস্ত প্রাচ্য দেশীয়দের জন্য ইহা হজম করা খুবই কষ্টকর। ফলে, অনারব ও অ-ইউরোপীয় অনেক ইহুদী ইসরাইল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

নারী-পুরুষ উভয় শ্রেণী হইতে বাধ্যতামূলকভাবে সংগৃহীত লোকজন লইয়া গঠিত ইসরাইলী সেনাবাহিনী সংমিশ্রণের সর্ববৃহৎ স্থান। আবার আরব রাষ্ট্রসমূহের সহিত যুদ্ধ বাধিবার ফলে ইসরাইলের বিভিন্ন ভেদাভেদ

এক হইয়া যায়। এতসত্ত্বেও এই স্বল্প ভৌগোলিক পরিসরে সামাজিক অখণ্ডতা একটি সুদীর্ঘ ও কঠিন কাজ।

ইসরাইলী অর্থনীতি

ইসরাইলের অর্থনীতি সর্বদা দুর্বিসহ অবস্থায় বিরাজ করে। দেশটি প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক উভয় দিক হইতে বন্ধ্যা। নতুন উৎস অথবা সমুদ্রের পানি লবণাক্তহীন করিয়া যথেষ্ট পানির বন্দোবস্ত করা হইলে বড়জোর ৫০,০০০,০০ লক্ষ একর জমি চাষ করা যায়। ৪০,০০০,০০ লক্ষ অধিবাসীর জন্য ইহা মোটেই যথেষ্ট নহে। প্রতিষ্ঠিত হইবার ২০ বৎসরের মধ্যে দেখা যায় ইসরাইলের রপ্তানীর তুলনায় আমদানী আড়াই গুণ বেশী। ইসরাইল বহির্বিশ্বের ঋণ ও দানের উপর নির্ভর করিয়া আসিতেছে। এইগুলি আসিয়াছে যুক্তরাষ্ট্র ও জাতিসংঘের দান, ইহুদী সম্পত্তি বিনষ্টের জন্য পশ্চিম জার্মানী হইতে "ক্ষতিপূরণ" মার্কিন ইহুদীদের নিকট হইতে চাঁদা এবং তমসুক বিক্রয় দ্বারা। অন্যান্য দেশের তুলনায় ইসরাইলে যুক্ত রাষ্ট্রের দানই সর্বোচ্চ। এই ক্ষেত্রে সংযুক্ত ইহুদী আবেদনের (United Jewish Appeal) লক্ষ্য হইল ২৫ কোটি ডলার। কিন্তু এই ধরনের সাহায্য চিরকাল থাকিবে এইরূপ কোন নিশ্চয়তা নাই।

এই ধরনের ব্যাপক অর্থনৈতিক অসুবিধা কাটাইয়া উঠিবার জন্য ইসরাইলীগণ দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং ইতিমধ্যে তাহারা বেশ উন্নতি লাভ করে। গ্যালিলি হ্রদ হইতে তাহারা পানি নিষ্কাশন করে ও ১০৮ ইঞ্চি পাইপ দ্বারা সেই পানি নেগেভে লইয়া যায়। প্রায় ৯০০০ শিল্প স্থাপন করিয়া অন্যূন ১০০,০০০ লক্ষ লোকের কর্ম সংস্থান করে। এশিয়ার সহিত বাণিজ্য করিবার জন্য আকাবা উপসাগরে তাহারা আইলাত বন্দরের উন্নয়ন করে এবং সেখান হইতে ভূমধ্যসাগরের হাইফা পর্যন্ত একটি তৈলের পাইপ লাইন বসায়। ইউরোপের বাজারে তাহারা জম্বীর ফল, টকবেগুন, জলপাই ও শশা রপ্তানী করে। তাহারা পর্যটনের উন্নয়ন সাধন করে এবং ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে জর্দান নদীর পশ্চিম তীর অধিকার করিয়া তাহারা বস্তুতঃ "পবিত্র ভূমির" পর্যটন ব্যবসা একচেটিয়া করিয়া ফেলে। ভবিষ্যতের জন্য তাহাদের অনেক পরিকল্পনা রহিয়াছে, কিন্তু অন্ততঃ পক্ষে যতদিন ইসরাইল

আরব রাষ্ট্রসমূহের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবে ততদিন ইহা একটি দুর্দশা-গ্রস্ত অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে থাকিবে।

ইসরাইল ও আরব রাষ্ট্রবর্গ

ইসরাইলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাবলী ইহার প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রবর্গের সহিত সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল। সুয়েজ খালের মধ্য দিয়া যাতায়াতের সমস্যা, বা আকাবা উপসাগর ব্যবহারের সমস্যা বা উদ্বাস্তুদের মর্যাদার সমস্যা মূল সমস্যার লক্ষণ মাত্র অর্থাৎ অ-ইহুদী অধিবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইসরাইলের প্রতিষ্ঠা। সম্ভবতঃ আরবগণ যদি ইসরাইলকে প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে কোন দুরভিসন্ধিহীন ও বন্ধুভাবাপন্ন একটি "ক্ষুদ্র জাতি" হিসাবে জ্ঞান করিতে পারিত তবেই একটি আপোষ মীমাংসা করা যাইত। কিন্তু বিশ্ব ইহুদী গোষ্ঠীর সহিত ইসরাইলের সম্পর্ক এবং "সমস্ত" ইহুদীকে ইসরাইলে আনয়নের ব্যাপারে ইহুদীবাদীদের প্রকাশ্য আশাবাদ এই রাষ্ট্রকে আরবদের চোখে এক বিশালাকার রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করিয়াছে। আরবদের নিকট বিশ্ব ইহুদীবাদ কমিউনিজমের চাইতেও মারাত্মক। তাই তাহারা ইহার সহিত যুদ্ধ করে, ইহাকে এক ঘরে করে এবং ইহাকে তাহারা ভয় করে। ২০ বৎসরে তিনটি যুদ্ধের দ্বারা ইসরাইল সমগ্র প্যালেস্টাইন, সিনাই উপদ্বীপ এবং সিরিয়ার একটি কৌশলগত জেলা দখল করিবার ফলে বুঝা যায় আরবগণ কেন ইহাকে একটি 'ক্ষুদ্র' জাতি মনে করে না। অপর দিকে, তিন দিক হইতে আরবগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত থাকায় ইসরাইল একটি দুর্বিসহ রাজনৈতিক অবস্থায় নিপতিত, যাহা তাহার বর্তমান অর্থনৈতিক অস্থিরতাকে আরও বিষময় করিয়া তুলিয়াছে।

আধুনিক সভ্যতার কারিগরি বিস্তার দ্বারা ইসরাইল আফ্রিকার অনেক নতুন নতুন সৃষ্ট দেশসমূহের ন্যায় প্রতিবেশী মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির জন্যও এক বিরাট আশীর্বাদ স্বরূপ হইতে পারে। এইরূপ আশা পোষণ করিবার পূর্বে দুইটি শর্ত পূরণ করিতে হইবে। একটি হইল ইহুদীবাদী মতাদর্শের পরিবর্তন, যদ্বারা একটি সম্পূর্ণ ইহুদীরাষ্ট্র হইতে ইসরাইল একটি বহু জাতি সংবলিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হইবে, যেখানে 'বর্ণ' বা ধর্ম নাগরিকত্ব লাভের

চাবিকাঠি হইবে না। দ্বিতীয় হইল শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব পরিত্যাগ করা, যাহা একটি ইউরোপীয় প্রোথিত জাতি হিসাবে ইসরাইল এতদিন "প্রাচ্য-দেশীয়" আরবদের প্রতি প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

নতুন মিসর

১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জুলাইয়ের বিপ্লবের ফলে একটি নতুন মিসর আত্মপ্রকাশ করে। রোম কর্তৃক মিসর দখলের পর হইতে এই প্রথম মিসরীয়রা দেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পাইল—আরব, মামলুক, তুর্কী বা বৃটিশেরা নহে। বৎসরের পর বৎসর ব্যাপিয়া যে স্বাধীনতা সংগ্রাম চলিতে থাকে তাহার প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হিসাবে সুদূর প্রসারী সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের সুযোগ আসিয়া পড়ে। আধুনিক মিসরের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মত এমন একটি সরকার প্রতিষ্ঠিত হইল যে সরকার বিদেশী শক্তি বিরোধী শ্লোগানের পরিবর্তে দুর্নীতি বিরোধী শ্লোগান প্রদান করিল। এই বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল কিছু সংখ্যক তরুণ অফিসার এবং মিসরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সন্তানদের দ্বারা। এই বিপ্লবটির একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রহিয়াছে যাহার মূল সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে বর্ণনা প্রদান করা হইয়াছে।

সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মিসরের নব্য মধ্যবিত্ত সমাজের সরকার-বিরোধী অসন্তোষ বৃদ্ধি পাইতে ছিল। বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া মিসরের জাতীয়-তাবাদের মুখপাত্ররা মিসরের মূলভূমির শতকরা ৩৭ ভাগ আবাদী ভূখণ্ডের মালিকে পরিণত হইয়াছিল। ১৮৫০ হইতে ১৯৫০ পর্যন্ত মিসর নিয়ন্ত্রণকারী এই দলটি মোট জনসংখ্যার শতকরা এক ভাগের অর্ধেক মাত্র। এই মালিক গোষ্ঠীর আনুগত্যে ছিল ক্ষুদ্র ভূস্বামী এবং তাহাদের পরিবারেরা —যাহারা আমলাতান্ত্রিক ব্যাপারে যথেষ্ট শিক্ষিত ছিল। তাহারা গণ-পরিষদ, সকল প্রকার আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রণের

মাধ্যমে এই কাজ সম্পন্ন করিত। তাহারা এমন সব রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করিত যাহাদের বিভক্তির কারণ ছিল ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্খা, কোন প্রকার সংস্কার পরিকল্পনা বা মতবাদ নহে। কৃষক, ছোট দোকানদার এবং ক্ষুদ্র কর্মচারী যাহাদের সংখ্যা শতকরা ৮০ ভাগ তাহাদের স্বার্থের অনুকুলে কাজ করিতে হইত।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পদানত অন্যান্য দেশের ন্যায় মিসরকেও দুইটি বিপ্লবের মাধ্যমে আগাইয়া যাইতে হইয়াছে—একটি স্বাধীনতা, অপরটি সমাজ সংস্কার। অতএব ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সমগ্র জাতি কেন স্বাধীনতার জন্য আওয়াজ তুলিয়াছিল তাহা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। প্রত্যেকটি আত্মসম্মানশীল জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দলকেই এই নীতির পরিপোষকতা করিতে হইয়াছে এই কারণেই। স্বার্থপর রাজনৈতিক নেতা বা রাজা কেহই এই কথা উপলব্ধি করিতে পারে নাই যে ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত ভূমিহীন মিসরবাসী স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কারও কামনা করে। দুইটি মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে এই ধারণা অধিকতর গতি লাভ করে। এই সময় মিসরে শিক্ষা এবং অহমিকা বৃদ্ধি পায় যাহা সভ্য লোকদিগকে নিজেদের ভাগ্য সম্পর্কে অসন্তুষ্ট করিয়া তুলে। এই অসন্তোষের কারণ রহিয়াছে। মিসরের জনসংখ্যা খাদ্য উৎপাদনের তুলনায় অনেক গুণ বাড়িয়া যাইতেছিল। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দ হইতে জনসংখ্যার গতি ক্রমবর্ধমান। কিন্তু যে সকল অভিজাত ভূস্বামী এই ব্যাপারে কিছু করিতে পারে তাহারা ব্যাপারটাকে একেবারেই গুরুত্ব প্রদান করিত না। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে মিসরীয় কৃষকদের গড় আয় ছিল ৬০ ডলার। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ এই আয় দ্রুত গতিতে ৩০ ডলারে নামিয়া আসে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর পৌর অঞ্চলে সাধারণ বেকারত্বের অভিশাপ নামিয়া আসে।

এই জাতীয় সঙ্কটের মুখে রাজনৈতিক দলসমূহ শুধু স্বাধীনতার কথাই বলিতে থাকে। যে ওয়াফদ্ পার্টি স্বাধীনতার কর্মসূচীর মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করিয়াছিল এবং জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, তাহারাও মধ্যযুগীয় ভাবধারার অভিষিক্ত হয় এবং সংস্কারের কর্মসূচী ব্যতীতই সন্তুষ্ট থাকিয়া যায়। যে সকল ব্যক্তি ক্ষমতার দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত তাহাদের ভিতর দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার এবং উন্নত জীবনযাত্রার প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিয়াই থাকে।

রাজার করণীয় হইল একটি রাজনৈতিক দলকে আরেকটির বিরুদ্ধে লেলাইয়া দিয়া ক্ষমতা এবং সুযোগ সুবিধার সিংহ ভাগ আদায় করা। রাজা ফারুকের পূর্ব পুরুষদের ভিতর খেদিব ইসমাইলের মত অমিতব্যয়ী এবং সাঈদের মত পেটুক এবং লোভী ছিলেন—যাহাদের সমস্ত দুর্বলতা তিনি উত্তরাধিকারী সূত্রে পাইয়াছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অমিতব্যয়ী, লোভী, নারী লোলুপ, সৌখিন নৌকা বিশেষজ্ঞ, দামী ও দুষ্প্রাপ্য টিকেট এবং নগ্ন ছবি সংগ্রহকারী। যে পৃথিবী প্রলয়ঙ্করী মহাযুদ্ধ দেখিয়াছে, যে এশিয়া আফ্রিকার দ্রুত রাজনৈতিক এবং সামাজিক পরিবর্তন দেখিয়াছে সেই পৃথিবীর অধিবাসী হইয়া স্বাভাবিক ভাবেই মিসরের শিক্ষিত সমাজ রাজার কাছ হইতে বেশী কিছু আশা করে।

ফ্রি অফিসার্স ক্লাব

সৈন্যবাহিনীতেও এই জাতীয় তরুণ মিসরীয় ছিল। কোন এক সময় মিসরীয় সৈন্যবাহিনী সাধারণ লোকের আওতার বাহিরে ছিল। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে এই বাহিনীকে সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। তরুণ সমাজ এইদিকে আকৃষ্ট হয় এই জন্য যে, এই স্থানে সুশিক্ষা এবং পদোন্নতির সুযোগ-সুবিধা বেশী। এই তরুণ অফিসারদের ভিতর জামাল আবদ খান নাসের অন্যতম। ডাকবিভাগের একজন কেরানীর পুত্র নাসের ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। হাই স্কুলে ছাত্র থাকাকালে তিনি স্বাধীনতার জন্য পরিচালিত বহু মিছিলে অংশ গ্রহণ করেন। তরুণ অফিসার হিসাবে তিনি মিসরীয় বিভিন্ন সমস্যা আলোচনার জন্য বহু অফিসারকে একত্রিত করেন। এই তরুণের মিসরের সেই শক্তির উত্তরাধিকারী যাহারা শতাব্দীর পর শতাব্দীর কঠোর অগ্নি পরীক্ষায় দীক্ষিত। তাহারা মোহাম্মদ আলী সম্পর্কে পাঠ করিয়াছেন, আরাবী, জগলুল ও অন্যান্য জাতীয়তাবাদীদের সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন, মোহাম্মদ আবদুহুর ভাবধারা পর্যালোচনা করিয়াছেন এবং রুশ বিপ্লবের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। এই অফিসারদের ভিতর অন্ততঃ দুইজন কম্যুনিস্ট ভাবাপন্ন, চারি বা পাঁচজন মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য এবং অন্যান্যরা জাতীয়তাবাদে দীক্ষিত—যাহারা কোন বিশেষ মতাদর্শের অনুসারী নহে।

ফালুজা অবরোধ

এই কথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, এই সব অফিসার তখন শুধু মাত্র ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ইসরাইল বিরোধী যুদ্ধের কথাই আলোচনা করিত না। স্মরণ করা যাইতে পারে যে মিসর নেগেভ দখল করিয়াছিল এবং জর্দানের আরব বাহিনীর সহিত সংযোগ স্থাপনের জন্য উত্তর দিকে চাপ সৃষ্টির পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছিল। দ্বিতীয় যুদ্ধ বিরতির সময় ইসরাইলরা সদ্য সংগৃহীত নতুন অস্ত্র ও বিমানের সাহায্যে পাল্টা চাপ প্রদান করে এবং মিসরের সৈন্যবাহিনীর একটা বিরাট অংশকে ফালুজায় অবরোধ করিয়া ফেলে। মিসরও তখন নতুন অস্ত্র লাভ করিয়াছিল। কিন্তু রাজার দুর্নীতি এবং লোভের কল্যাণে সংগৃহীত অস্ত্রগুলি খারাপ, পুরাতন এবং অপ্রয়োজনীয় বলিয়া প্রমাণিত হয়।

নাসের এবং তাহার বহু সংখ্যক বন্ধু তখন ফালুজায়। তাহারা তখন প্যালেস্টাইনের যুদ্ধের পরিবর্তে সঙ্কটাপন্ন মিসরের কথাই বেশী আলোচনা করে। যাহা তখন নেকড়ের কুক্ষিগত। যুদ্ধে নিহত তাহার এক বন্ধুর শেষ কথা ছিল 'মিসরই আমাদের কাজের শ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র'। প্যালেস্টাইনের পরাজয়ই তরুণ অফিসারদিগকে এই শিক্ষা প্রদান করিয়াছিল যে তাহাদের প্রথম কাজ হইল মিসরকে দুর্নীতি এবং লোভের গ্রাস হইতে মুক্ত করা। মিসরে ফিরিয়া আসিবার পর নাসের 'সিক্রেট ফ্রি অফিসার্স' সোসাইটি' গঠন করে—যাহার কাজ শুধু আলোচনা নহে বরং কাজ।

ওয়াফ্‌দ্‌ ও বৃটিশ

তরুণ অফিসাররা যখন বিপ্লবের পরিকল্পনা করিতেছিলেন তখন মিসরীয় সরকার কর্মকুশল ওয়াফদ্‌ নেতা নাহাস পাশার নেতৃত্বে বৃটিশেরা সুয়েজ খাল ত্যাগ করিয়া সুদানকে মিসরের হাতে অর্পণ করিবার জন্য চাপ প্রদানে ব্যস্ত। বৃটিশ চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী এত ধীরে অগ্রসর হইতে ছিল যে মিসরের চোখে তাহা অগ্রসর না হওয়ারই শামিল। বৃটিশের দাবী ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের চুক্তির একটা ধারা অনুযায়ী কুড়ি বৎসর পর্যন্ত সুয়েজের উপর তাহাদের দাবী থাকে। অর্থাৎ মিসরকে ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। সুদানের ব্যাপারে বৃটেনের মতামত হইল এই যে তাহাদের সম্পর্কে

কোন প্রকার সিদ্ধান্তের আগে সুদানবাসীদের সহিত আলোচনা করিতে হইবে। এই আলোচনা ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে চলিতে থাকে। অবশেষে নাহাস পাশা সম্ভবতঃ ইরানের ডঃ মোসাদ্দেকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া এককভাবে ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দের চুক্তি বাতিল বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং ফারুককে সুদানের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন। অতঃপর তিনি উশৃঙ্খল জনতাকে খালের পাড়ে এবং অন্যত্র অবস্থানরত বৃটিশ সৈন্যকে হত্যার উস্কানী প্রদান করিলেন। সুয়েজ খালের মিসরীয় শ্রমিকেরা ধর্মঘট করিল এবং বৃটিশের বিরুদ্ধে পরিচালিত গেরিলাযুদ্ধের অবস্থার সেদিন অবনতি ঘটিল। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বৃটিশ সরকার এই অবস্থার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের নিয়ন্ত্রণে গ্রামে গ্রামে সামরিক আইনজারী করে। এই সময় কায়রোর জনতা উত্তেজিত হইয়া পড়ে। এবং তাহারা শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে ধাবিত হয়। সরকারী প্ররোচনায় তাহারা পশ্চিমা ব্যবসাকেন্দ্র এবং বসতির উপর হামলা চালায়। তাহারা থিয়েটার, সিনেমা, হোটেল, রেষ্টুরেন্ট ও দোকানে লুণ্ঠন চালায়—আর অগ্নি-সংযোগ করে। এই সময় উত্তেজিত জনতা কোন প্রকার বাচ-বিচার করে নাই কিন্তু যখন লুণ্ঠন কাজ সমাধা হইল তখন দেখা গেল যে, এই কাজের ফলে প্রায় ১২০০০ মিসরীয় গৃহহারা হইয়াছে। কথিত আছে যে, এই বৃটিশ-বিরোধী কার্যে মুসলিম ব্রাদারহুডের ভূমিকা ছিল মুখ্য। ওয়াফদ্ পার্টির কার্যক্রম ব্যর্থ হইলে পর নাহাস পাশাকে পদত্যাগ করিতে হইল। ইহার পর কয়েক মাস যাবৎ শুধু সরকারই পরিবর্তন হইল—কেহই টিকিয়া থাকিতে পারিল না।

সামরিক অভ্যুত্থান

ইতিমধ্যে ফ্রি অফিসাররা তাহাদের পরিকল্পনা করিতে ছিল। ফারুকের মনে সন্দেহের উদ্রেক হওয়ায় তিনি কায়রোর এই ক্লাব বন্ধ করিয়া দিবার নির্দেশ প্রদান করিলেন—প্রায় সম্পূর্ণ তরুণ সামরিক কর্মকর্তারা এই ক্লাবের সদস্য ছিলেন। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জুলাই তরুণ অফিসাররা আঘাত হানিলেন। যেহেতু তাঁহারা সকলে ছিলেন তরুণ (গড় বয়স ৩৪) ও অজ্ঞাত সেই জন্যে তাঁহারা জনপ্রিয় সম্মানিত এবং বয়োজ্যেষ্ঠ অফিসার জেনারেল

মোহাম্মদ নাজিবকে নেতা হিসাবে কাজ করিবার জন্য বাছিয়া লইলেন। জেনারেল এই পরিকল্পনার গুরুত্ব একটু দেরীতে উপলব্ধি করিলেও সময় মত প্রস্তাবটি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে ২৩শে জুলাই সকাল বেলা নাসের টেলিফোন যোগে নাজিবকে বিপ্লবী পরিষদের কেন্দ্রীয় অফিসে আসিতে বলিয়াছিলেন। "আমরা যদি ব্যর্থ হই," নাসের নাকি বলিয়াছিলেন, "তাহা হইলে মনে করিব আপনি আমাদিগকে দমন করিয়াছেন। আমরা যদি কৃতকার্য হই, আপনি নতুন মিসরের নেতা।" রাত একটা হইতে দুপুর পর্যন্ত সময়ে কোন বাধা-বিপত্তি ছাড়াই নাসের রাজধানী দখল করেন। ফারুক বৃটিশ হস্তক্ষেপের আশা করিয়াছিলেন কিন্তু কিছুই হয় নাই। আধুনিক মিসরের ইতিহাসে প্রথম বারের মত কোন বৃটিশ-বিরোধী বা বিদেশী-বিরোধী ধ্বনি ছাড়া মিসর হইতে দুর্নীতি ও উৎকোচ দূর করিবার ওয়াদা লইয়া একটি নতুন সরকার ক্ষমতায় আসে।

এই কথা দিবালোকের ন্যায় সত্য যে সামাজিক ও রাজনৈতিক বিপ্লবের কোন পূর্ব-নির্ধারিত পরিকল্পনা যুবক অফিসারদের ছিল না। তাহারা দুর্নীতি দূর করিবার সংকল্প করে এবং আশা করে যে, কোনও উপায়ে একটি উদ্দীপনাপূর্ণ বেসামরিক সরকার গঠিত হইবে। তাহাদের মতে দুর্নীতিপরায়ণ কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রধান হইলেন বাদশাহ্, যাঁহাকে ২৬শে জানুয়ারী তাঁহার অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্রের স্বপক্ষে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করা হয়। ফারুক চিরতরে মিসর ত্যাগ করেন। এক বৎসর পর মিসরকে প্রজাতন্ত্র বলিয়া ঘোষণা করা হয়। নাসের ও তাঁহার বন্ধুদের নিকট আশ্চর্যের বিষয় হইল এই যে, এই বিপ্লবে জনতা উৎসাহজনকভাবে সাড়া দেয় নাই। "অগ্রবাহিনী ইহার কর্তব্য পালন করিয়াছে।" তাঁহার "ফিলসফী অব দি রেভল্যুশন" গ্রন্থে নাসের বলেন, "ইহা অত্যাচারের দুর্গের প্রাচীর ধ্বংস করিয়াছে "এবং ইহা জনতার সংস্থাগুলিকে তাহাদের মূল লক্ষ্যে পৌঁছিবার আশায় অপেক্ষা করিয়া থাকে।" কিন্তু তাহারা শুধু বিশৃঙ্খলা, মতভেদ ও অলসতাই লক্ষ্য করে। অতঃপর তাহারা নিজেরাই ক্ষমতায় থাকিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং দিন দিন বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে।

ইঙ্গ-মিসরীয় চুক্তি

যুবক অফিসারগণ শুধু বৃটিশ-বিরোধী জিগিরের বলে ক্ষমতা ও জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই। সম্ভবতঃ এই জন্যই তাহারা বৃটিশদের সহিত উদ্দেশ্যমূলক পরিবেশে একটা সমঝোতায় আসিতে সক্ষম হয়। সুদানের ব্যাপারে বৃটিশগণ সর্বদাই বলিয়া আসে যে সুদানীগণ নিজেরাই তাহাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বাছিয়া লইবে। স্বয়ং আধা-সুদানী জেনারেল নজীবের সুযোগ্য সহায়তায় মিসরীয় সরকার সমস্ত সুদানী দলগুলিকে মিসরের ন্যায় একই শিবিরে একত্রিত করিতে সমর্থ হয়। সুদানীগণ সহযোগিতা করিতে ইচ্ছুক হয় কারণ নতুন মিসরীয় সরকার নমনীয় এবং সুদানী জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে অধিক ওয়াকিফহাল। ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী মিসর ও বৃটেন সুদানকে আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দিতে একমত হয়। মিসরের সহিত সুদানের সম্পর্ক নির্ধারণ করিবার জন্য তিন বৎসরের মধ্যে একটি গণভোট অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত লওয়া হয়। নতুন মিসরীয় সরকারের জন্য এই চুক্তি এক বিরাট কৃতিত্ব। কারণ ইহা দ্বারা গ্রেট বৃটেনের মধ্যে মিসরের জনপ্রিয়তা যেমন সৃষ্টি হয় ঠিক তেমনি সুদানী জাতীয়তাবাদীদের গভীর সহযোগিতা ও মিসর লাভ করে।

পরবর্তী সমস্যা হইল সুয়েজ খাল এলাকা দখল করা। এখানেও একটি সরল পরিবেশে আলোচনা চলিতে থাকে। অনেকগুলি কারণ শেষ পর্যন্ত বৃটিশদিগকে এই প্রত্যয় প্রদান করে যে সুয়েজ খাল এলাকায় একটি ঘাঁটি রক্ষা করিবার আর কোন অর্থ নাই। প্যালেস্টাইনে তাহাদের এই অভিজ্ঞতা হয় যে, একটি শত্রুভাবাপন্ন অঞ্চলে ঘাঁটি রাখা খুবই ব্যয় সাপেক্ষ। তদুপরি হাঙ্গামার ফলে সমগ্র ব্যাপার বৃটিশ জনগণের গোচরীভূত হয়, যাহারা এই ধরনের ব্যাপারে তাহাদের স্বীয় সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার উদাহরণ সৃষ্টি করিয়াছে। ইতিমধ্যে স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতবর্ষ এখন আর কোন সমস্যা নহে। উপরন্তু এটম বোমার আবিষ্কারের ফলে সম্ভবতঃ এই ধরনের ঘাঁটি রাখা নিরর্থক। এই ব্যাপারে মার্কিন চাপ কতটুকু সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই, কিন্তু ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে গ্রেট বৃটেন খাল এলাকা ছাড়িয়া দিতে সম্মত হয়। একমাত্র শর্ত রহিল এই যে, তুরস্ক বা অন্য কোন আরব দেশের উপর কখনও আক্রমণ হইলে তাহাদের জন্য খাল

এলাকা পুনরায় দখল করিবার অনুমতি থাকিবে।

সুদান লইয়া ইঙ্গ-মিসরীয় দ্বন্দ্ব এবং সুয়েজ খাল এলাকার আপোষ-নিষ্পত্তি হইবার ফলে যুবক অফিসারগণ মিসরের আভ্যন্তরীণ সমস্যার প্রতি মনোনিবেশ করিতে সক্ষম হয়। যুবক অফিসারদের উদ্দেশ্য ছিল সরকারকে কলুষমুক্ত করা এবং একটি "খাঁটি" বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করা। সরল বিশ্বাসে তাহারা একজন প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী আলী মাহেরকে সরকার গঠন করিবার জন্য বাছিয়া লয়। ইনি দুর্নীতিহীন ও প্রগতিশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু ইহা সন্তোষজনক প্রতিপন্ন হয় নাই। আমূল পরিবর্তন সাধন করিবার ব্যাপারে বৃদ্ধ লোকজন অতি গোঁড়া। ইহাদের অধিকাংশই যেহেতু জমির মালিকানার ব্যাপারে প্রবল স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সেহেতু ইহাদের দ্বারা সামাজিক বিপ্লব আশা করা যায় না। এই সমস্ত কিছু বিবেচনা করিয়া যুবক অফিসারগণ রেভল্যুশনারী কমাণ্ড কাউন্সিল (Revolutionery Command Council, R.C.C.) গঠন করে এবং জেনারেল নজীবকে প্রধান মন্ত্রীর পদ প্রদান করিয়া সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করে। আর. সি. সি সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদ হইতে প্রায় ৮০০ বেসামরিক লোক বরখাস্ত করে এবং ১০০ পুরাতন সামরিক অফিসারকে অবসর প্রদান করে। তাহারা মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ ব্যতীত সমস্ত দল নিষিদ্ধ করিয়া দেয়।

আর. সি. সি. ও সংস্কার

অবাঞ্ছিত লোকজন হইতে সরকারকে মুক্ত করিয়া আর. সি. সি. প্রথমটায় দ্বিধাগ্রস্তভাবে সামাজিক বিপ্লবীর ভূমিকায় অবতরণ করে। মধ্যপ্রাচ্যে সামাজিক পরিবর্তনের অপরিহার্য অঙ্গ হইল ভূমি সংস্কার। একমাত্র জমিদারগণ ছাড়া প্রায় সকলেই ইহার স্বপক্ষে। অপেক্ষাকৃত গোঁড়া মুসলিম ভ্রাতৃসংঘের মতে সর্বোচ্চ জমির মালিকানা ৫০০ ফেদ্দান বা একরে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত এবং ইহার বাড়তি জমি কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া উচিত। মিসরের চরমপন্থীদলগুলি জমির সর্বোচ্চ মালিকানা ৫০ হইতে ১০০ ফেদ্দানে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত মনে করে। আর. সি. সি. ২০০ ফেদ্দানে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মিসরে প্রতি একরে জমির ফলন যেখানে উচ্চ, ২০০ ফেদ্দান সেখানে যথেষ্ট, ফলে এই বণ্টনের দ্বারা শুধু বড় বড়

জমিদারগণই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাদশাহের বিশাল জমিদারী যেহেতু বাজেয়াফত করা হয় এবং ঐ জমি বণ্টন করা হয় নাই, সেহেতু সরকার মিসরের সর্ববৃহৎ জমির মালিকে পরিণত হয়।

ক্ষমতার দ্বন্দ্ব

নতুন সরকার শত্রুহীন থাকে নাই বরং ইহার বিপ্লবী হইবার সিদ্ধান্তে আরও শত্রুর উদ্ভব হয়। সরকারের শত্রুদিগকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথম হইল পুরাতন রাজনীতিবিদগণ, যাহাদিগকে রাজনৈতিক কার্যাবলী হইতে বিরত রাখা হয়। দ্বিতীয় হইল মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ, যাহাদের দৃষ্টিতে আর. সি. সি. অতি ধর্মনিরপেক্ষ ও চরমপন্থী। তৃতীয় হইল কমিউনিস্টগণ যাহাদের দৃষ্টিতে আর. সি. সি. চরমপন্থীও নহে, যথেষ্ট আদর্শবাদীও নহে। চতুর্থ হইল ধনী ভূস্বামীগণ যাহাদের নিকট হইতে ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের ভূমি সংস্কার আইনের দ্বারা জমি কাড়িয়া লওয়া হইয়াছে। এই শ্রেণীগুলি অর্থশালী, এবং পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রে বিশ্বাসী যুবক মিসরীয়দের সমর্থন লাভ করে। কিন্তু আর. সি. সি. পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র খর্ব করে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারে বিশ্বাস করে। বিরোধী দলগুলির কোন একক কর্মসূচী না থাকিবার ফলে ইহারা সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে সক্ষম হয় নাই। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে তাহারা এই একক কর্মসূচী লাভ করে।

স্মরণ করা যাইতে পারে যে, জেনারেল নজীবকে নতুন শাসনের নামে মাত্র প্রধান হইবার জন্য আনা হয়। প্রকৃত ক্ষমতা থাকে আর সি. সি-র হাতে, যাহার পুরোধা হইলেন নাসের। কিন্তু জেনারেল নজীব মিসরীয়দের নিকট খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠেন এবং তাঁহাকেই বিপ্লবের প্রকৃত নেতা বলিয়া ধরা হয়। ১৩ সদস্য বিশিষ্ট আর. সি. সি. কর্তৃক প্রদত্ত এক ভোটের মালিক হইবার চাইতে তিনি দেশের প্রধান মন্ত্রী হিসাবে আরও ক্ষমতা প্রত্যাশা করেন। নজীব ও আর. সি. সি-র মধ্যে বিবাদ সৃষ্টির মূল কারণ হইল বয়স। আর. সি. সি-র যুবক অফিসারদের বিশ্বাস, রাজনীতিবিদগণ বৃদ্ধ, দুর্নীতিবাজ ও কল্পনাবিহীন। তবে ৫১ বৎসর বয়স্ক নজীব এই রাজনীতিবিদদের কর্মক্ষম, কল্পনাপূর্ণ যৌবনের অগ্নিমূর্তির কথা স্মরণ

করেন। তাঁহার নিজস্ব বয়ঃসীমায় এই সকল রাজনীতিবিদদিগকে নজীব সম্মান করেন এবং সম্ভবতঃ এই সকল লোক তাঁহাকে আরও ক্ষমতা দাবী করিতে উৎসাহিত করে। যাহাই হোক, পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য নজীব আরও ক্ষমতা দাবী করেন, যাহার অর্থ হইল পুরাতন সেই রাজনীতিবিদগণের পুনরায় ক্ষমতায় আগমন।

১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে আর. সি. সি. জেনারেল নজীবের পদত্যাগের কথা ঘোষণা করে। ইহাতে ভীষণ গোলযোগের সৃষ্টি হয়, যাহা আর. সি. সি. মোটেই আশা করে নাই। বিরোধী দলগুলি জেনারেলকে ঘিরিয়া জমায়েত হয় এবং তাঁহার স্বপক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। আর সি. সি. কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করে—সম্ভবতঃ ইহাই তখনকার একমাত্র করণীয় কাজ—এবং জেনারেল নজীবকে পুনর্বহাল করে। সমসাময়িক মিসরের ইতিহাসে পরবর্তী কয়েক মাস দুর্যোগ ও বিশৃঙ্খলার মধ্য দিয়া অতিবাহিত হয়। জেনারেল নজীব আর. সি. সি. কর্তৃক সম্পাদিত কিছু সংস্কার বিলোপ করিতে অগ্রসর হন এবং জুলাই নাগাদ একটি পুরাদস্তুর বেসামরিক সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করেন।

ইতিমধ্যে নজীবকে কোণঠাসা করিয়া আর. সি. সি-র ক্ষমতা পুনর্বহাল করিবার জন্য নাসের পর্দার অন্তরালে কাজ করিয়া যান। এপ্রিল নাগাদ আর. সি. সি. সমর্থনে একটি সাধারণ ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়, সেনাবাহিনী ধর্মঘট করে, রাস্তায় রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয় এবং আর সি. সি. জেনারেল নজীবকে প্রেসিডেন্টের পদে "উন্নীত" করে ও নাসেরকে মিসরের প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করে। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবরে মুসলিম ভ্রাতৃসংঘের একজন সদস্য নাসেরের জীবন নাশের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়। ইহার ফলে আর. সি. সি. ভ্রাতৃসংঘকে বে-আইনী ঘোষণা করা, জেনারেল নজীবকে গৃহবন্দী করা, এবং স্বীয় প্রতিষ্ঠানকে কমিউনিস্ট ও ভ্রাতৃসংঘের সদস্য মুক্ত করার প্রয়োজনীয় অজুহাত লাভ করে। ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের শেষ নাগাদ নাসের বিপ্লবের প্রকৃত নেতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ দেশকে তিনি একটি সংবিধান প্রদানের ওয়াদা করেন।

নাসের ও আরব জাহান

অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের একটি কঠিন কর্মসূচীতে জড়িত যে কোন জাতি বৈদেশিক ব্যাপারে কিছুটা একাকিত্ব ও স্বতন্ত্র থাকিবার প্রয়োজন বোধ করে, যাহাতে সে নিজের দেশে শৃঙ্খলা আনয়ন করিতে ও বিপ্লবকে মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হয়। মধ্যপ্রাচ্যে আরবীভাষী দেশগুলির পক্ষে কোন বিশেষ দেশের উপর তাহাদের চিন্তা ও কর্মধারা কেন্দ্রীভূত করা খুবই কঠিন। পূর্বে আমরা লক্ষ্য করিয়াছি, তুরস্কের পক্ষে ইহার জাতীয়তাবাদকে শুধুমাত্র তুর্কীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা সহজতর হয়। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশ হইতে তাহাদের ভাষা পৃথক। তাহারা অবশ্য মুসলমান, কিন্তু ধর্ম নিরপেক্ষতার নীতির দ্বারা তাহারা সরকারীভাবে প্রতিবেশীদের সহিত ধর্মীয় একাত্মতা ছিন্ন করে এবং ফলে নিজেদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার লইয়া তাহারা অধিকতর মাথা ঘামাইতে সক্ষম হয়। এমন কি পারস্যবাসীদের পক্ষেও প্রতিবেশী দেশসমূহের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া নিজেদের জাতীয়তাবাদের তেজস্বিতার রক্ষা করা সহজ হয়। ভাষা ও ধর্মীয় দিক দিয়া তাহারা তাহাদের পশ্চিমা প্রতিবেশী হইতে ইতিমধ্যেই পৃথক, এবং আফগানিস্তানের ব্যাপারেও তাহারা হস্তক্ষেপ করে না, যদিও ফার্সী সেখানকার সরকারী ভাষা।

মিসরের জন্য ইহা তেমন সহজতর নহে। স্বাধীন অফিসারগণ মিসরকে মুক্ত করিবার জন্য বিপ্লবের পরিকল্পনা করে—ইহা যেরূপ সত্য অপর দিকে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে "আরব স্বার্থ" প্রতিরক্ষার জন্য প্যালেস্টাইনে যুদ্ধরত অবস্থায় পরিকল্পনার কিয়দংশ প্রণয়ন করা হয়। ভাষা ও ধর্মীয় বন্ধনে তাহারা ফারটাইল ক্রিসেণ্ট ও উত্তর আফ্রিকার দেশগুলির সহিত আবদ্ধ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত এই কথা সত্য যে মিসরীয় জাতীয়তাবাদীগণ নিজদিগকে "আরব" বলিয়া মনে করিত না; কিন্তু যুদ্ধের পর অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। মোটের উপর আরব রাষ্ট্রসমূহের লীগ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য গ্রেট বৃটেনই নাহাস পাশাকে ব্যবহার করে, কায়রো লীগের সদর দফতর হয়, এবং মিসরীয়গণ প্যালেস্টাইনে ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করে।

তবে, শুধু জাতীয়তাবাদের জন্য মিসর আরবীভাষী দেশসমূহের

কার্যকলাপে জড়িত হয় নাই। নাসেরের নীতি নির্ধারণে অর্থনৈতিক ও ঐতিহাসিক কারণসমূহ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফেরাউনের সময় হইতে সিনাই ও ফারটাইল ক্রিসেন্টের মধ্য দিয়া মিসর বহির্বিশ্বের সহিত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপন করে। ক্রিসেন্টের ভাগ্য অনেকাংশে মিসরের ভাগ্যও নির্ধারণ করে। এই পথের উপর প্রতিষ্ঠিত ইসরাইল সেই ঐতিহাসিক যোগসূত্র ছিন্ন করে এবং তাই ইহাকে মিসরের হুমকি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মধ্যমপন্থী জেনারেল নজীবের বক্তব্য হইল দক্ষিণ নেগেভের মধ্য দিয়া মিসর ও ফারটাইল ক্রিসেন্টের সংযোগ থাকিলে ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা লাভে তাঁহার কোন আপত্তি নাই।

উপরোল্লিখিত কারণসমূহ ছাড়াও আরবীভাষী দেশসমূহের জাতীয়তাবাদীগণের মধ্যে নাসেরের জনপ্রিয়তার ফলেও মিসর এই সকল দেশের রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত হইয়া পড়ে। এই সকল ব্যাপারে নিরাশক্ত থাকিতে চাহিলেও নাসের তাহা পারেন নাই। প্যালেস্টাইনে পরাজয়ের পর মিসরই প্রথম দেশ, যে নিজের আত্মশুদ্ধি করিয়া নিজ পায়ে দাঁড়াইতে সক্ষম হয়। নাসের এই বিপ্লবের পুরোধা এবং আরবীভাষী দেশসমূহের জাতীয়তাবাদীদের মধ্যমণি। মিসর একটি আদর্শ দেশ এবং নাসের সেই দেশের আদর্শ নেতায় পরিণত হন।

তাঁহার 'ফিলসফী অফ দি রেভল্যুশন' (Philosophy of the Revolution) গ্রন্থে নাসের মিসরীয় বিপ্লবের ভূমিকা তিন ভাগে ভাগ করেন। প্রথম হইল আরব ভাগ, যাহা "আমরা যেরূপ ইহার অংশ বিশেষ, ইহাও আমাদের অংশ বিশেষ।" দ্বিতীয় হইল আফ্রিকা, "নিয়তির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা যাহার এলাকায় পড়িয়াছি..." এবং যে সংগ্রামে ইহা লিপ্ত "উহাতে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা জড়িত হই।" তৃতীয় হইল ইসলামী ভাগ, "যাহার সহিত আমাদের সংযোগ শুধু ধর্ম বিশ্বাসের দ্বারা নহে, বরং ইতিহাসগত ভাবেও আমরা সংযুক্ত।" নাসেরই সম্ভবতঃ প্রথম মিসরীয় জাতীয়তাবাদী নেতা, যিনি প্যান-আরববাদ ও প্যান-ইসলামবাদ উভয়ের সংমিশ্রণের চেষ্টা করেন, যাহা মূলতঃ পরস্পর বিরোধী। প্যান-আরববাদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হিসাবে ইসলাম ধর্ম বা অন্য কোন ধর্মের স্থান নাই। অপরদিকে প্যান-ইসলামবাদ ইসলামের মধ্যে

আরবীবাদ স্বীকার করে না। আরব বিশ্বে বেশ শক্তিশালী প্যান-ইসলামী মুসলিম ভ্রাতৃসংঘ এবং ধর্ম নিরপেক্ষ প্যান-আরবীদের মধ্যে বিদ্যমান বৈরী-ভাবের ফলে এই ধরনের সংমিশ্রণ কার্যকর কিনা তাহা বিবেচনা করার সময় এখনও আসে নাই।

নাসের আবার প্রথম মিসরীয় নেতা যিনি মিসরের ভাগ্য আফ্রিকা মহাদেশের সহিত সংযুক্ত করেন। ইহা একটি অলিখিত পন্থা, ইতিহাসে যাহার কোন নজীর নাই। নাসেরের "বিভক্তিকরণের" মধ্যে উল্লেখযোগ্য এই যে তিনি "মিসরীয় ভাগ"কেই বাদ দিয়াছেন। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে প্যালেস্টাইন যুদ্ধে নাসের ও তাঁহার বন্ধুগণ "প্যালেস্টাইনে যুদ্ধ করেন কিন্তু "(তাঁহাদের) স্বপ্ন ছিল মিসর।" ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ নাসেরের ন্যায় প্যান-আরবীদের চিন্তাধারায় প্যালেস্টাইন মিসর ও অন্যান্য আরব দেশসমূহ একটি "আরব জাতিতে" পরিণত হয়। এতদসত্ত্বেও, "দি ফিলসফী অব দি রেভল্যুশন"-এর মতে এবং পরবর্তী নাসেরের কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে সমস্ত ভাগের কেন্দ্রস্থল কায়রো। আফ্রিকাবাসী-গণ ও অনারব মুসলমানগণ সম্ভবতঃ এইরূপ একটি আদর্শে তেমন মনো-যোগ দেয় নাই; কিন্তু আপামর আরবীভাষী লোকদের মধ্যে এই আদর্শ হারাইয়া যায় নাই। ইরাকী ও সিরীয়গণ বিশেষতঃ উন্মত্ত হইয়া উঠে, কারণ তাহারা নিজেদের রাজধানী, বাগদাদ বা দামেস্ককে প্যান-আরববাদ অথবা প্যান-ইসলামবাদের কেন্দ্রস্থল বলিয়া বিবেচনা করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবেশ

১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে সুয়েজ খাল কোম্পানী জাতীয়করণের ঘটনাবলী কিয়দংশে মিসরের উপর বাহির হইতে চাপাইয়া দেওয়া হয়। প্রথম ঘটনা সম্ভবতঃ ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দের বাগদাদ চুক্তি সম্পাদন। এই চুক্তিতে ইরাকের সদস্য হওয়াটাকে নাসেরের পক্ষে হুমকি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বাগদাদ চুক্তিকে নাসের পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের নবরূপায়ন বলিয়া মনে করেন। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইরাককে অস্ত্র প্রদানের দ্বারা মিসর শঙ্কিত হয়। দুই দেশের মধ্যে শুধু জাতীয়তাবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতাই নহে, বরং ইরাক ইহার রাজতন্ত্র, জমিদারী আভিজাত্য ও গোঁড়ামী লইয়া নাসেরের বিরোধিতার কেন্দ্রস্থলও

হইয়া উঠিতে পারে। অতএব এই চুক্তির বিরুদ্ধে তিনি তাঁহার প্রচারণার সর্বশক্তি ব্যয় করেন।

তদুপরি, মিসরীয় সীমান্তে ইসরাইলের বেশ কিছু আক্রমণের দ্বারা মিসরীয় বাহিনীর প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয় এবং ইহা নাসেরের সেনা-বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির আগ্রহ প্রবলতর করিয়া তোলে। তিনি পাশ্চাত্যের নিকট হইতে অস্ত্র ক্রয় করিতে চান কিন্তু ব্যর্থ হন। যুক্তরাষ্ট্র তাঁহার নিকট অস্ত্র বিক্রয় করিতে নারাজ এবং তাহা আংশিকভাবে ইসরাইলের জন্য, এবং আংশিকভাবে মিসরের নিরপেক্ষতা ও চীন প্রজাতন্ত্রের প্রতি স্বীকৃতি প্রদানের জন্য। অন্যান্য আরব নেতৃবৃন্দের ন্যায় নাসের ইসরাইলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হন এবং মিসরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করা উচিত বলিয়া বিশ্বাস করেন। পাশ্চাত্যের শক্তিবর্গ হইতে পুনঃ পুনঃ ধাক্কা খাইয়া মিসর শেষ পর্যন্ত ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে চেকোস্লাভাকিয়া হইতে অস্ত্র লাভের বন্দোবস্ত করেন। মধ্যপ্রাচ্যে অস্ত্র সরবরাহের উপর পাশ্চাত্য নিয়ন্ত্রণ ভঙ্গ হয় এবং ইহা অত্র অঞ্চলের দেশগুলির জন্য সোভিয়েত জোট হইতে অস্ত্র ক্রয়ের পথ সুগম করে।

আসওয়ান বাঁধ

এই সকল পরিক্রমা সত্ত্বেও রেভল্যুশনারী কমাণ্ড কাউন্সিলের (Revolutionary Command Council) প্রধান কর্মসূচীর মধ্যে থাকে আভ্যন্তরীণ সংস্কার। মিসরের প্রধান সমস্যা নির্ণয় করা খুবই সহজ, অবশ্য ইহার সমাধান যদিও তত সহজ নহে। মিসরের প্রয়োজন বুভুক্ষু জনতার জন্য আরও খাদ্য, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য আরও জমি, এবং বাড়তি জমিতে জল সেচের জন্য আরও পানি। উচ্চ মিসরের উঁচু আসওয়ান বাঁধকে আরও উঁচু করিলে আরও পানি পাওয়া যায়, কিন্তু এই বাঁধ নির্মাণ করিতে কোটি কোটি ডলারের প্রয়োজন। এই অর্থের জন্য মিসর যুক্তরাষ্ট্রের শরণাপন্ন হয় এবং যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেন ও বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায় এই অর্থ প্রদানের আয়োজন করে।

তবে মিসর এই চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বিলম্ব করে, সম্ভবতঃ এই আশায় যে সে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বিদ্যমান শীতল যুদ্ধের

প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ গ্রহণ করিয়া অধিকতর সুবিধা আদায় করিবে। নাসের দাবী করেন যে, "কোন শর্ত ছাড়াই" সোভিয়েত ইউনিয়ন তাঁহাকে আরও অধিক অর্থ ঋণ দিতে ইচ্ছুক, অবশ্য এই দাবী রুশগণ অস্বীকার করে। নাসের চীনের সহিত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন করেন এবং "মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের" বিরুদ্ধে দীর্ঘ বাদানুবাদে লিপ্ত হন, যাহাতে মার্কিন কংগ্রেসের সদস্যবৃন্দ অসন্তুষ্ট হন। তদুপরি ইসরাইলে গোপন আক্রমণ চালাইবার জন্য তিনি বিশেষ গেরিলা দলের (ফেদাইয়ান) প্রশিক্ষণ আরম্ভ করেন। ব্যাপারটি ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দের জুলাই পর্যন্ত গড়াইয়া চলে। অতঃপর নাসের মার্কিন প্রস্তাব গ্রহণ করিতে সম্মত হন, কিন্তু স্বরাষ্ট্র সচিব জন ফস্টার ডালেস সমগ্র পরিকল্পনাটি হঠাৎ বাতিল করিয়া দেন। এই বাতিল করিবার জন্য ডালেস মিসরীয় অর্থনৈতিক অযোগ্যতাকে দায়ী করেন, কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় প্রতীয়মান হয় যে তিনি নাসেরকে অপমানিত করিবার জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইহার এক সপ্তাহ পর ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জুলাই, নাসের সুয়েজ খাল কোম্পানী জাতীয়করণ করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করেন।

সুয়েজের জাতীয়করণ

স্মরণ করা যাইতে পারে যে ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত সুয়েজ খাল কোম্পানী সুয়েজ খাল পরিচালনা করে। ইহা মিসর ও ফ্রান্সে তালিকাভুক্ত (Registered) এবং মিসর ও গ্রেট বৃটেনের মধ্যে বিদ্যমান কোন রাজনৈতিক ও সামরিক চুক্তির সহিত জড়িত নহে। এই খাল পরিচালনার জন্য কোম্পানী ৯৯ বৎসরের অনুমতিপত্র লাভ করে এবং ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে ইহা মিসরীয় সরকারের নিকট হস্তান্তরের কথা। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে ইঙ্গ-মিসরীয় চুক্তি অনুযায়ী এই খালকে মিসরের সম্পত্তি বলিয়া স্বীকার করা হয় এবং ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে ইহার সম্পূর্ণ প্রতিরক্ষার দায়িত্ব মিসরের হাতে ন্যস্ত করা হয়। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আসওয়ানের ঋণ বাতিল করিবার প্রতিক্রিয়া হিসাবে ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জুলাই নাসের খালটি জাতীয়করণ করেন। কিন্তু নাসেরের নেতৃত্বে একটি জাতীয়তাবাদী সরকার কোম্পানীকে ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত খাল পরিচালনা করিবার

অনুমতি প্রদান করিত কিনা তাহাও সন্দেহের বিষয়।

সুয়েজ খাল কোম্পানী জাতীয়করণের ব্যাপারে পাশ্চাত্যের প্রতিক্রিয়া সম্পূর্ণ নেতিবাচক এবং ইহা সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক লালিত প্রাচ্যের প্রতি ইউরোপীয়দের মধ্যে বিদ্যমান মনোভাবের পরিচয় প্রদান করে। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে ইঙ্গ-ইরানী তৈল কোম্পানী জাতীয়করণ করা হইলে পাশ্চাত্য জগৎ পারস্যের প্রতি যে মনোভাব ব্যক্ত করে, মিসরের প্রতিও এখন অনুরূপ মনোভাবই প্রদর্শন করে। দুইমুখী পেরেকের ন্যায় এই মনোভাব প্রাচ্যের যোগ্যতা ও সাধুতা উভয়ের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়। খাল পরিচালনার ব্যাপারে মিসরীয়দের যান্ত্রিক যোগ্যতা ও জ্ঞান উভয়ের অভাব রহিয়াছে বলিয়া বলা হয়। তদুপরি, ইউরোপীয়গণ মনে করে যে খাল নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে মিসরীয়দিগকে বিশ্বাস করা যায় না। ইউরোপের প্রয়োজনীয় তৈলের অর্ধেকেরও অধিক তৈল খালের মধ্য দিয়া যায়, ফলে "ইউরোপের বায়ুনলের উপর মিসরের বৃদ্ধাঙ্গুলী থাকিবে" বিধায় বিভিন্ন জাতির এই কোম্পানীতে মিসর দায়িত্বশীলভাবে কাজ করিতে পারে না বলিয়া মন্তব্য করা হয়।

মিসরকে নিরস্ত্র করিবার জন্য গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স তাহাদের সর্বশক্তি ব্যয় করে। তাহারা মিসরের সম্পত্তিসমূহ বাজেয়াফত করে, তাহাদের রিজার্ভ-বাহিনী তলব করে, নৌবাহিনীকে ভূমধ্যসাগরে ডাকিয়া আনে এবং সাইপ্রাসে অবস্থিত তাহাদের ঘাঁটির স্থল ও বিমান বাহিনী শক্তিশালী করে। খাল কোম্পানীর কার্যে নিয়োজিত তাহাদের পাইলটদিগকে তাহারা ফিরাইয়া লইয়া যায় এবং অন্যান্য অ-মিসরীয় পাইলটদিগকেও পদত্যাগ করিতে উৎসাহ প্রদান করে। খাল ব্যবহারকারী ১৮টি দেশের একটি সম্মেলন তাহারা আহ্বান করে এবং খাল পরিচালনার ব্যাপারে একটি "ব্যবহারকারী"দের কোম্পানী দ্বারা মিসরকে "সহযোগিতা" করিবার প্রস্তাব করে। জাতীয়করণকৃত কোম্পানীকে বৃটিশ ও ফরাসী জাহাজসমূহ নিয়মিত ভাড়া প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শদাতাগণ এই ব্যাপারে বিভক্ত হইয়া যায়। মার্কিনীগণ এই সকল সভা ও প্রতিবাদে অংশ গ্রহণ করে, কিন্তু সর্বান্তকরণে নহে। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দের ৫ই অক্টোবর এই বিষয়টি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করা হয়, কিন্তু পারস্যের

ক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়াছে উহার পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘ হস্তক্ষেপ করিবে বলিয়া কম লোকেই বিশ্বাস করে। অবশ্য নিরাপত্তা পরিষদ খালের কার্যাবলী পরিচালনার জন্ম ছয়টি নীতি ঘোষণা করে, যাহা বিজড়িত সকল দল কর্তৃক গৃহীত হয়।

ইসরাইলের মিসর আক্রমণ

আসলে ইঙ্গ-ফরাসী কর্তৃক জাতিসংঘের সুপারিশকৃত নীতি গ্রহণের ব্যাপারটি নিছক একটি ধাপ্পাবাজী। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দের ২৯শে অক্টোবর ফ্রান্স ও বৃটেনের জ্ঞাতসারে ইসরাইল সিনাই আক্রমণ করে। পরদিন নাগাদ ইসরাইল ৭৫ মাইল অগ্রসর হয়। একই দিন ফ্রান্স ও বৃটেন উভয় পক্ষের নিকট যুদ্ধ বন্ধ করিয়া স্ব স্ব বাহিনীকে খালের দশ মাইল দূরে সরাইয়া লইবার জন্ম একটি চরমপত্র প্রেরণ করে। নাসের ইহা মান্য করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় ইঙ্গ-ফরাসী বিমান ও নৌবাহিনী মিসর আক্রমণ করে ও পোর্ট সাঈদ দখল করে। ইঙ্গ-ফরাসী ইসরাইলী আঁতাত অতি উত্তম পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং অতি দ্রুত খাল দখল করিয়া নাসেরের ক্ষমতাচ্যুতির আশা করে।

সোভিয়েত রাশিয়া হইতে তাহারা আপত্তির আশঙ্কা করে, কিন্তু আক্রমণকারী বাহিনীসমূহ আশ্চর্য হয় যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে কঠোর নিন্দা লাভ করিয়া। খুব সম্ভবতঃ এই আক্রমণের সময় নির্ধারিত হয় মার্কিনীদের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ঠিক এক সপ্তাহ পূর্বে এবং আশা করা হয় যে কোন প্রার্থী স্থির মস্তিষ্কে ৫০ লক্ষ ইহুদী ভোট হারাইবার জন্ম ইসরাইলকে দোষী করিবে না। পুনঃ নির্বাচনের জন্ম প্রার্থী প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার, বোধহয় তাঁহার রাজনৈতিক উপদেষ্টাদের উপদেশে কর্ণপাত না করিয়া ইসরাইল ও ইহার দোসরদের কঠোর ভাষায় নিন্দা করেন। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন, এই দুই বৃহৎ শক্তির মিলনকে হেলা করা যায় না। ডিসেম্বর নাগাদ ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনীদ্বয় মিসর ত্যাগ করে এবং ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দের মার্চ নাগাদ ইসরাইলী সৈন্যগণ সিনাই, গাজা অঞ্চল ও তিরান প্রণালী ত্যাগ করে। ইসরাইলী-মিসরীয় সীমান্তের উভয় পার্শ্ব এবং তিরান প্রণালীর প্রবেশ দ্বার পাহারা দিবার জন্ম একটি জাতিসংঘ শান্তি-

রক্ষী বাহিনী প্রেরণ করা হয়। ইসরাইল জাতিসংঘ বাহিনীকে ইহার মাটিতে পদার্পণে আপত্তি জ্ঞাপন করে কিন্তু মিসর কোন আপত্তি করে নাই।

১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল নাগাদ সুয়েজ খালের পথ বন্ধ করিবার জন্য মিসর যে সকল জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছিল ঐগুলি পরিষ্কার করা হয়। মিসরীয়গণ অতি দক্ষতার সহিত খাল পরিচালনা করে এবং বস্তুতঃ দ্বিমুখী জাহাজ চলাচলের জন্য ইহাকে প্রশস্ত করিবার বন্দোবস্ত করে। সাঈদ বন্দরের ধ্বংসলীলা, সিনাইয়ে পরাজয় এবং খাল হইতে হৃত রাজস্বের মাধ্যমে মিসর বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক ফল লাভের দ্বারা এই ক্ষতি "পরিশোধ" হয়। আরবগণ বিমোহিত হয় যে মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে সমগ্র মিসর ও ফারটাইল ক্রিসেন্টের প্রভু ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেন উভয়কে মোকাবিলা করিয়া নাসের জয়যুক্ত হন। তাঁহাকে সত্যিকারের আরব জাতীয়তাবাদের নেতা এবং বৈদেশিক আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ দুর্নীতি হইতে আরব জনগণের মুক্তিদাতা হিসাবে গণ্য করা হয়।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

আরব জাহানে একতা ও বিভিন্নতা

আরব ঐক্যের রহস্য

আরবীভাষী জনগণ অনন্য অস্তিত্বের খোঁজে লিপ্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর হইতে তাহারা একতার বিষয়ে আলোচনা চালায়, অথচ পূর্ববত পৃথকই থাকিয়া যায়; তাহারা একটি "আরব জাতির" কথা বলে, অথচ এক ডজন ভিন্ন জাতির ন্যায় কাজ করে। তাহাদের একমাত্র অভিন্ন বিষয় হইল ভাষা ও ধর্ম। এইসব পরিচয় ইংরেজীভাষী লোকজনকে একত্রিত করে নাই, বা স্পেনীশ ভাষী লোকদের মধ্যে এক জাতি হিসাবে নিজদিগকে পরিচয় দিবার মত আগ্রহের জন্ম দেয় নাই। বস্তুতঃ মধ্যপ্রাচ্যের আরবীভাষী দেশগুলির চেয়ে ল্যাটিন আমেরিকান দেশগুলির মধ্যে সাদৃশ্যতা অনেক বেশী, অথচ শুধু মধ্যপ্রাচ্যের আরবী ভাষী দেশগুলিই এক জাতিত্বের কথা বলে।

আরবীভাষী দেশসমূহের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টিকারী কারণগুলির একটি হইল সরকারের স্বরূপ। এখানে রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, একনায়কত্ব, আধা-একনায়কত্ব এবং সর্বশ্রেণী হইতে পৃথক পারস্য উপসাগরের শেখতন্ত্র পর্যন্ত বিদ্যমান। অন্যান্য অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রভেদের মধ্যে রহিয়াছে শিক্ষার মান এবং আধুনিক বিশ্বের প্রতি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউরোপীয় দোষ ও গুণাবলীর দৃষ্টিভঙ্গী সমৃদ্ধ লেবানন ও মিসরের এখনও পঞ্চদশ শতাব্দীর অবস্থায় বসবাসকারী সৌদী আরব ও ইয়েমেনের চাইতে ফ্রান্স ও ইতালীর সহিত অধিক ভাবের মিল পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হইল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে। সৌদী আরব, কুয়েত ও ইরাকের ন্যায় "বিত্তশালী" দেশগুলি মিসর, সিরিয়া ও অন্যান্য "বিত্তহীন" দেশগুলিকে কেন তাহাদের সম্পদের ভাগ দিবে তাহা তাহারা বুঝিতে

পারে না। এইসব কারণের সহিত হবু "সংযুক্ত আরব জাতির" নেতৃত্ব লইয়া মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যে বর্তমান প্রতিদ্বন্দ্বিতাকেও সামিল করা যাইতে পারে।

এই ঐক্যের ভাবধারা সাধারণ লোকদের মধ্যে কতদূর গভীর তাহা নিশ্চিত বলা দুষ্কর, তবে প্রশ্নাতীতভাবে শিক্ষিত সমাজ ইহা দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রভাবান্বিত। ফলে প্রত্যেক আরবীভাষী দেশের ইতিহাস পৃথকভাবে বর্ণনা করা দুরূহ ব্যাপার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর দুইটি বিষয়, একটি নেতিবাচক ও অপরটি ইতিবাচক, আরব দেশসমূহের মধ্যে ঐক্যের সম্ভাবনা জীবিত রাখে।

নেতিবাচক বিষয় হইল ইসরাইল। ইহার প্রতিষ্ঠা সমস্ত আরবীভাষী দেশসমূহকে রাগান্বিত করে, ইহার উপস্থিতি তাহাদিগকে হতাশ করে, ইহার বাস্তব ও কাল্পনিক আগ্রাসনী নীতি তাহাদিগকে সন্ত্রস্ত করে। কিন্তু এই রাগ, হতাশা ও ভীতি আরবদিগকে মৌখিক ঐক্যের চাইতে অধিক কিছু দান করে নাই। প্রায়ই অভিন্ন শত্রুর প্রতি ঘৃণা ও ভীতির দরুন বিভিন্ন দেশ একত্রিত হয়, যদিও তাহাদের মতবাদ সরকারের স্বরূপ ও নীতির দিক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক। এই ব্যাপারে হিটলারের বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মিলন একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ইসরাইলের বিরুদ্ধে সমস্ত আরবদের ভীতি ও ঘৃণা থাকিতে পারে, কিন্তু এই ধরনের মনোভাব তাহাদিগকে ইসরাইলের বিরুদ্ধে একত্রিত করিতে ব্যর্থ হয়। ইহার দ্বারা যে কেউ নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবে যে ইসরাইলের ব্যাপারে তাহাদের ঘৃণা ও ভীতি আরব দেশগুলিকে একে অপরের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টিকারী কোন কোন মতভেদের ন্যায়ও গভীর নহে।

আরব ঐক্যের ইতিবাচক বিষয় হইল জামাল আবদ আল-নাসেরের ন্যায় জনপ্রিয় ও কর্মিৎকর্মা নেতার উদয়। সালাহ উদ্দীন কর্তৃক ক্রুসেডারদিগকে (খ্রীস্টান ধর্মযোদ্ধা) পরাজিত করিয়া জেরুজালেম দখল করিবার পর ফারটাইল ক্রিসেন্ট ও মিসরের জনগণ সম্ভবতঃ তাঁহার চাইতে অধিক জনপ্রিয় বা সত্যিকারের ক্ষমতাশালী নেতা লাভ করে নাই। ইয়েমেন হইতে মরক্কো পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক আরব বাজারে নাসেরের ছবি দেখা যায়। তিনি বৃটিশ সৈন্যদিগকে সুয়েজ ত্যাগের বন্দোবস্ত করেন, তিনি একজন

দুর্নীতিপরায়ণ বাদশাহর কবল হইতে মিসরকে মুক্ত করেন; তিনি সম্মিলিত ইঙ্গ-ফরাসী-ইসরাইলী যৌথ আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়ান; তিনি যুক্ত-রাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়ার সম্মান লাভ করেন এবং তিনিই ছিলেন আরব ঐক্যের আশাভরসা। এতকিছু সত্ত্বেও নাসের আরবদের ঐক্য সাধনে ব্যর্থ হন, কারণ তিনিও তাহাদের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টিকারী কারণগুলির উর্ধ্বে উঠিতে সক্ষম হন নাই।

সিরিয়া ও আরব ঐক্য

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সিকি শতাব্দীর ফারটাইল ক্রিসেন্টের আরবী-ভাষী দেশসমূহের ইতিহাস আংশিকভাবে আরব দেশসমূহের মধ্যে বিদ্য-মান স্নায়ুযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে ইসরাইল ও নাসেরের নেতৃত্বের প্রতি প্রত্যেক দেশের প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস। আরব ঐক্যের আগ্রহ এবং তাহা লাভে অসুবিধার ব্যাপারে সিরিয়া একটি অতি উত্তম উদাহরণ। সিরিয়া যথার্থভাবে নিজেকে আধুনিক আরব জাতীয়তাবাদের আবাসস্থল হিসাবে দাবী করিতে পারে। ওসমানীয় "সিরিয়ার" চারিটি স্বাধীন দেশে বিভক্তি (সিরিয়া, লেবানন, জর্দান ও ইসরাইল) এবং তন্মধ্যে একটি বিজাতীয় সত্তা খাঁটি সিরিয়া জাতীয়তাবাদীগণ কখনও স্বীকার করে নাই। এতদ্‌সত্ত্বেও, সিরিয়াবাসীগণ কখনও এক সুরে কথা বলিতে পারে নাই, কারণ তাহারা ধর্মীয়, জাতিগত ও আঞ্চলিক ভাগে বিভক্ত। ৮৫ শতাংশ মুসলমানগণ সুন্নী, শীয়া, আলাভী, ড্রুজেস, ইসমাইলীয়া ও ইয়াজিদী শ্রেণীতে বিভক্ত। স্বল্প সংখ্যক খ্রীস্টানগণও এক ডজন নামে বিভক্ত। প্রায় ১০ শতাংশ লোক আরবীভাষী নহে, যথা—কুর্দ, তুর্কমান ও কারকাসিয়ান। আরেক ১০ শতাংশ লোক বেদুঈন, যাহারা তাহাদের সংখ্যার চাইতেও অধিক বিভক্তি সৃষ্টি করে। কখনও কখনও দামেস্ক, হোমস, হামা ও আলেপ্পো এই চারিটি নগরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ কেন্দ্রীভূত হয়।

কোন একটি বিশেষ সপ্তাহে একজন সিরীয়বাসী সুন্নী হিসাবে অবশিষ্ট মুসলমানদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে; মুসলমান হিসাবে অ-মুসলিমদের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে; একজন প্যান-আরব ধর্মনিরপেক্ষবাদী হিসাবে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে; একজন দামেস্কবাসী হিসাবে

সিরিয়ার বাকী শ্রেণীগুলির বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে ; এবং একজন সিরীয় হিসাবে অন্যান্য আরব দেশসমূহের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারে। কিছুসংখ্যক সিরীয়বাসী কোন ক্রমে এইসব বাধাবিপত্তির ঊর্ধ্বে উঠিতে পারিলেও তাহাদের স্বাতন্ত্র্য তাহাদের সহযোগিতায় বাধা প্রদান করিবে। সিরিয়া আরব জাহানের প্রতিকৃতি, যে সিরিয়া শাসন করিতে পারে সে আরবদের একতাও আনয়ন করিতে পারে।

১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীনতার দুই যুগ সময়ের মধ্যে সিরিয়ায় প্রায় দশটি সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় এবং সমসংখ্যক সংবিধান রচিত হয়। প্রত্যেক সরকার ইহার পূর্ববর্তী সরকারের কার্যাবলী রহিত করে। ১৯৪৯-১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে সম্ভবতঃ প্যালেস্টাইন যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিক্রিয়া হিসাবে পর পর তিনটি সামরিক অভুত্থান সংঘটিত হয়। কর্ণেল আদিব শিশাকলি কর্তৃক পরিচালিত শেষের অভ্যুত্থান বেশ কিছুকাল স্থায়ী হয়। তাহাদের দ্বারা একটি সংবিধান রচিত হয় এবং সুদূর প্রসারী সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্বলিত একটি জনহিতকর রাষ্ট্রের (Welfare State) ভিত্তি স্থাপিত হয়। ভূস্বামী ও গোঁড়া লোকদের বিরোধিতার দরুন শিশাকলি ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দের দ্বিতীয় অভ্যুত্থান ঘটান, পার্লামেণ্ট বন্ধ করিয়া দেন এবং রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন ও ছাত্র সংগঠনসমূহ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি একটি নতুন সংবিধান রচনা করেন, তাহার নিজস্ব আরব মুক্তি দল (Arab Liberation Party) গঠন করেন এবং নিজেকে পাঁচ বৎসর মেয়াদের জন্য প্রেসিডেণ্ট ও প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত করেন। অবশ্য ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে সমস্ত দল সমূহের একটি কোয়ালিশন দ্বারা শিশাকলি বহিষ্কৃত হন।

১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের অভ্যুত্থানের পর অনুষ্ঠিত তুলনামূলক ভাবে স্বাধীন নির্বাচনে বা'থ (পুনরুত্থান) পার্টি ১৫টি আসন লাভ করে। ১৪২টি আসন বিশিষ্ট পার্লামেণ্টে ইহা খুব বেশী কিছু নহে, কিন্তু এই দল সিরিয়ায় যে ভূমিকা পালন করে তাহা উল্লেখযোগ্য। প্যান-আরব ও সমাজতন্ত্রী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ দুইটি দলের সংমিশ্রণে ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে বা'থ পার্টির জন্ম হয়। ইহা শিল্প জাতীয়করণ, ভূমি বণ্টন ও ব্যাপক সমাজ সংস্কারের উপর জোর দেয়। এই দলের নেতৃত্ব দান করেন মাইকেল আফলাক নামে একজন

খ্রীস্টান এবং সালাহ্ আল-বিতার নামক একজন মুসলমান। খাঁটি প্যান-আরব হিসাবে তাহারা "একটি স্থায়ী উদ্দেশ্যপূর্ণ এক আরব জাতিতে" বিশ্বাস করে। ১৯৫৪ ও ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বা'থপন্থীগণ প্রভাবশালী হইয়া উঠে এবং লেবানন, জর্দান ও ইরাকে তাহাদের শাখা প্রতিষ্ঠা করে। সংগঠন, মতবাদ ও প্রভাবের দিক হইতে সিরিয়ায় বা'থ-এর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হইল কমিউনিস্ট পার্টি।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র (The United Arab Republic)

কর্ণেল শিশাকলিকে বহিষ্কার করিয়া একটি বেসামরিক কোয়ালিশন সরকার ক্ষমতায় আসিবার পরও সিরিয়ার সমস্যার সমাধান হয় নাই। বামপন্থী দলগুলি, বা'থ ও কমিউনিস্ট উভয়েই রক্ষণশীল ও মধ্যমপন্থী রাজনীতিবিদগণ কর্তৃক স্থিতিশীলতা আনয়নের প্রচেষ্টাকে তুচ্ছজ্ঞান করে। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে সিরিয়ার রক্ষণশীল ও মধ্যপন্থী রাজনীতিবিদগণ নাসেরের প্রভাবে আসেন এবং আশা করেন যে তিনি হয়তো তাহাদিগকে বামপন্থী আধিপত্য হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন। বামপন্থী শিবিরেই মতবিরোধ দেখা দেয়, কমিউনিস্টগণ সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত একাত্মতা চায়, কিন্তু বা'থপন্থীগণ স্বাধীন কর্মপন্থায় বিশ্বাস করে। কমিউনিস্টগণ সেনাবাহিনীর মধ্যে ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করে এবং সিরীয় সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক (Chief of staff) জেনারেল আফিফ বিজরীকে সোভিয়েত সমর্থক দলে আনয়ন করে। কমিউনিস্টগণ যতই শক্তিশালী হয় ততই বা'থপন্থীগণ মিসরের সহিত সংযুক্ত হইবার বিষয় চিন্তা করিতে থাকে যাহা সিরিয়াকে কমিউনিজমের হাত হইতে রক্ষা করিবে এবং সমস্ত আরবদের ঐক্যের দিকে এক ধাপ আগাইয়া দিবে।

প্রথমে বা'থপন্থীগণ নাসেরকে একজন সামরিক একনায়ক বলিয়া বিবেচনা করিত এবং মিসরের রেভল্যুশনারী কমাণ্ড কাউন্সিলকে মতবাদবিহীন একটি দল বলিয়া ঘৃণা করিত। কিন্তু সুয়েজ কোম্পানী জাতীয়করণ ও সিনাই যুদ্ধের পর নাসের নতুন ভাবধারা লইয়া পুনঃ প্রকাশ করেন। আর. সি. সি'র স্লোগান—শৃঙ্খলা, একতা, কর্ম, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও সমবায় সমিতিতে পরিবর্তিত হয়। নাসের সমস্ত বিদেশী শিল্প ও সম্পত্তি

"মিসরীয়" করেন এবং তৎসঙ্গে অনেক মিসরীয় মালীকনাধীন ব্যক্তিগত শিল্পকারখানা জাতীয়করণ করেন। এইসব কার্যাবলীর দ্বারা তিনি বা'থ-পন্থীদের চোখে অতি প্রিয় হইয়া উঠেন। তাহারা নাসেরের দক্ষতার মধ্যে মতবাদজাতীয় বিস্তৃতি যোগ করিতে চায় এবং সমস্ত আরবজাহানের ঐক্য সাধন ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গঠন করিবার ব্যাপারে তাঁহার জনপ্রিয়তা ও ক্ষমতা ব্যবহার করিতে চায়।

১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারীতে একটি কমিউনিস্ট সামরিক বিপ্লবে ভীত বা'থপন্থীগণ কায়রো গমন করিয়া সংযুক্তির আবেদন জানায়। অতি সংক্ষিপ্ত আলোচনার দ্বারা সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আরব রাষ্ট্রবর্গের সংযুক্তির ব্যাপারে হতাশ হইয়া এই দুই দেশ একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে—তাহা হইল একটি সম্পূর্ণ এক কেন্দ্রিক ঐক্য। এই ঐক্যকে সমস্ত আরবদের ঐক্যের পথে একটি পদক্ষেপ বলিয়া অভিনন্দন জানানো হয়। ইউ. এ. আর. (U. A. R.)-এর প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসাবে নাসের সমস্ত আরবদের প্রিয় ব্যক্তিতে পরিণত হন। পাছে অতিক্রান্ত হইয়া যায় এই ভয়ে জর্দান ও ইরাকের হাশেমীয় বাদশাহগণ একটি ফেডারেল ইউনিয়নের কথা ঘোষণা করেন, কিন্তু ইহা এমনকি ঐ দেশের নাগরিকদের নিকটও গ্রহণযোগ্য হয় নাই। ইউ. এ. আর. আরবদের ভবিষ্যৎ আশার স্থলে পরিণত হয়। কিন্তু এই আশা ছিল ক্ষণস্থায়ী।

লেবানন ও আরব ঐক্য

স্মরণ করা যাইতে পারে যে লেবাননের লোক সংখ্যা খ্রীস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে প্রায় অসমান বিভক্তির ফলে ইহাকে আরব জাহানে একটি অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে ফেলে। মেরোনাইটগণ সাধারণতঃ ইউরোপীয় সমর্থক, আবার মুসলমানগণ অন্যান্য আরব দেশসমূহের সহিত আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কামনাকারী। গোঁড়া ও অন্যান্য খ্রীস্টানগণ আরববাদের পক্ষে মত প্রকাশ করে। এতদসত্ত্বেও খ্রীস্টান সংখ্যালঘুগণ একটি সংযুক্ত আরব মুসলিম দেশে নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে শঙ্কিত বোধ করে। প্রথমে ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে এবং সম্পূর্ণভাবে ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দে লেবানন স্বাধীনতা লাভ করিলে মুসলমান ও খ্রীস্টানদের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমিত করিবার জন্য

প্রেসিডেণ্ট আল-খুরী একটি জাতীয় চুক্তির প্রস্তাব করেন। কেরানী হইতে ডিরেক্টর জেনারেল পর্যন্ত সমস্ত সরকারী পদসমূহ ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের আদমশুমারীর উপর ভিত্তি করিয়া একটি সুনির্দিষ্ট হারে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বণ্টন করা হয়। চেম্বার অব ডিপুটিদের (Chember of Deputies) আসনের সংখ্যা উঠানামা করিলেও সর্বদা ১১ গুনিতকে থাকে—অর্থাৎ ছয়জন খ্রীস্টান ও পাঁচজন মুসলমানের হার।

বৎসরের পর বৎসর অতিক্রমের পর এই অলিখিত জাতীয় চুক্তি হাল্কা হইয়া উঠে। মুসলমানগণ নিজদিগকে "দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে" পরিণত করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ উত্থাপন করে এবং একটি নতুন আদমশুমারীর দাবী জানায় যাহাতে তাহারা নিশ্চিত হয় যে লেবাননে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রকাশ পাইবে। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ নাসের একজন আরব জননায়ক হইয়া উঠিলে লেবাননের মুসলমানগণ তাঁহার অনুসারী হিসাবে পরিচয় দেয়। অপরদিকে মেরোনাইটগণ আরও ইউরোপীয় সমর্থক হইয়া উঠে। মুসলমানগণ এবং কিছু সংখ্যক খ্রীস্টান লেবাননের প্রেসিডেণ্ট চেমনকে অ-মেরোনাইটদের বিরুদ্ধে বৈষম্য সৃষ্টির অভিযোগে অভিযুক্ত করে। ইউ. এ. আর.-এর প্রথম প্রেসিডেণ্ট হিসাবে নাসের দামেস্ক সফরে আসিলে লক্ষ লক্ষ লেবাননী তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিবার জন্য তথায় গমন করে এবং এই ইউনিয়নে লেবাননের যোগদানের আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠে। এই ঘটনার সহিত চেমন সরকারের সাধারণ অসন্তোষ এবং চেমন কর্তৃক সংবিধান পরিবর্তন করিয়া আরেক মেয়াদ ক্ষমতায় থাকিবার গুজব যুক্ত হওয়ায় মুসলমানগণ রক্তক্ষয়ী দাঙ্গায় লিপ্ত হয়।

সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্রোহীগণ মিসর হইতে সামরিক সরবরাহ লাভ করে বলিয়া লেবাননী সরকার অভিযোগ করে এবং এই বিষয়টিকে আরবলীগে উত্থাপন করে। লীগ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায় লেবানন বিষয়টি জাতি সংঘের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করে। অবশ্য নিরাপত্তা পরিষদের পর্যবেক্ষক দল এই অভিযোগের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ লাভে ব্যর্থ হয়। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মের মাঝামাঝিতে লেবাননে বস্তুতঃ গৃহ যুদ্ধই আরম্ভ হইয়া যায়। অবশ্য তাহা খ্রীস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে নহে। এই ক্ষেত্রে মেরোনাইট ধর্মীয়

নেতারা চেমনের নীতির বিরুদ্ধে যান এবং আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে চেমনের নীতি আরব জাহানে সমস্ত খ্রীস্টানদের অবস্থা সঙ্গীন করিয়া তুলিবে।

১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জুলাই ইরাকে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের দ্বারা সে দেশে হাশেমীয় বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে। ইহা নাসের সমর্থক বিদ্রোহ বলিয়া সুনাম অর্জন করায় চেমন শঙ্কিত হইয়া উঠেন, পাছে লেবাননেও অনুরূপ অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় এবং তাই আইসেন হাওয়ার মতবাদ (Eesen-hower Doctrine) কার্যকরী করিবার জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আবেদন জানান। ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে অনুমোদিত এই বিতর্কিত মতবাদের উদ্দেশ্য হইল বহিরাক্রমণ হইতে নিজদিগকে রক্ষা করিবার জন্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিকে সাহায্য করা। প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ার এই আবেদনে সাড়া দেন। অতঃপর লেবাননে মার্কিন সৈন্য অবতরণ করে।

ইরাকী বিপ্লব

স্মরণ করা যাইতে পারে যে ইরাক সরকার ছিল যুবক বাদশাহ্ ফয়সলের নেতৃত্বে স্বল্প সংখ্যক ভূস্বামী, গোত্রীয় শেখ, সামরিক অফিসার ও বয়োজ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদদের হাতে। তৈল সেলামীর মোটা অঙ্ক লাভ করা সত্ত্বেও জনসাধারণের দারিদ্র্য ছিল হৃদয়বিদারক। পারস্যের তৈল শিল্প জাতীয়করণের ফলে ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে ইরাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানী ইরাকী সরকারের সহিত মুনাফার ৫০—৫০ শেয়ারের বন্দোবস্ত করে। কিন্তু এই অঙ্কের তেমন কিছু জনগণের নিকট যায় নাই। বিভিন্ন বেসরকারী প্রকল্পে তৈলের আয় ব্যবহার করিবার জন্য একটি উন্নয়ন বোর্ড গঠিত হয় কিন্তু এই সব প্রকল্পের অধিকাংশই ছিল ভূস্বামীদের উপকারার্থে।

মিসরের ভূমি সংস্কারের ফলে ইরাকী চাষীদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয় এবং ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে মিসরীয় যুদ্ধের দ্বারা নাসের ইরাকীদের চোখে পরমপ্রিয় জননায়কে পরিণত হন। বিপ্লবের ব্যাপারে ইরাকীগণ সিরীয়-বাসীদের সহিত টেক্কা দিতে পারে না, কিন্তু তাহাদিগকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া যাইতে পারে। ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দ হইতে ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইরাকী-গণ বিভিন্ন মাত্রার গোলযোগের মাধ্যমে আটটি বিপ্লব সংঘটিত করে।

১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের সামরিক অভ্যুত্থান হইল জেনারেল আব্দ্ আল-করিম কাশেমের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর সহিত অনেকগুলি জাতীয়তাবাদী ও বামপন্থী দলসমূহের সহযোগিতার বহিঃপ্রকাশ। ইহা মিসরীয় বিপ্লব হইতে ভিন্ন প্রকৃতির, কারণ ইহাতে সবাই সেনাবাহিনীর লোক ছিল না, এবং দাঙ্গাহাঙ্গামাও ইহাতে অনেক বেশী সংঘটিত হয়। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে হত্যা ও লুটতরাজকারী জনতাকে বাগদাদের রাস্তায় ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ বাদশাহ্ ফয়সাল, যুবরাজ আবদুল ইলাহ ও প্রধান মন্ত্রী নূরী আল-সাঈদকে হত্যা করে। বিপ্লবের বেসামরিক পক্ষে থাকে বা'থপন্থী, কমিউনিস্ট এবং আরও কয়েকটি দলের সদস্যবৃন্দ।

হাশেমীয় রাজত্বকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার পর জেনারেল কাশেমের নেতৃত্বে ইরাকী সরকার জর্দানের সহিত স্বাক্ষরিত ফেডারেশন হইতে বাহির হইয়া আসে। বাগদাদ চুক্তির সহিত সমস্ত সম্পর্কচ্ছেদ করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও লাল চীন উভয়কে স্বীকৃতি প্রদান করে। নাসের তাঁহার অভিনন্দন বাণী প্রেরণ করেন এবং সিরীয় বা'থপন্থীগণ ইরাকে তাহাদের দলীয় সদস্যদিগকে ইউ. এ. আর. (U.A.R.)-এ যোগদান করিবার আহ্বান জানায়। ইহাই হইল আরবদের সর্বকালের অতি ঘনিষ্ঠ সংমিশ্রণ। সিরিয়া ও মিসরের ঐক্য বাস্তবরূপ লাভ করে, দৃশ্যতঃ নাসের সমর্থক একটি দল ইরাকে ক্ষমতায় আসে, লেবাননে একটি প্যান-আরব বিদ্রোহ সংঘটিত হয় এবং এমনকি ইয়ামানও ইউ. এ. আর-এর সহিত একটি বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করিতে সক্ষম হয়।

জর্দানের ভবিষ্যৎ

চতুর্দিকে বিপ্লবী বাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ জর্দানের সেন সম্মিলিত আরব প্রজাতন্ত্রে যোগদান করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশ হইতে হাশেমীয় বাদশাহকে প্রথমে বহিষ্কার না করিয়া জর্দান ইউ. এ. আর-এ যোগদান করিতে পারে না। জর্দানে হাশেমীয় পরিবারের অবস্থাও শোচনীয়, কারণ একটি স্থানীয় বিশেষ সমস্ত সমাধানের নিমিত্ত বৃটিশ সরকার কৃত্রিম উপায়ে জর্দান রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে। প্যালেস্টাইনের কিয়দংশ জর্দানের হাশেমীয় রাজত্বের সহিত অন্তর্ভুক্তির পর

বাদশাহর অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠে।

জর্দানের জনসংখ্যার দুই তৃতীয়াংশ ফিলিস্তিনী, যাহারা জর্দান নদীর পূর্ব তীর অধ্যুষিত বেদুঈনদের তুলনায় অধিক শিক্ষিত এবং রাজনীতির দিক হইতে অধিক সজাগ। ইসরাইল রাষ্ট্রের সৃষ্টি এবং পরাজয়ে হতাশ এইসব ফিলিস্তিনীগণ জর্দানের বাদশাহ আবদুল্লাহকে তাহাদের দুর্দশার জন্য প্রধানতঃ দায়ী বলিয়া মনে করে। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ইসরাইলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে আরবদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা নস্যাৎ করিবার জন্য তাহারা তাঁহাকেই দায়ী করে। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে তাহাদের একজন সদস্য জেরুজালেমের আক্‌সা মসজিদে বাদশাহ আবদুল্লাহ্‌কে হত্যা করে।

আবদুল্লাহর পুত্র তালাল তাঁহার উত্তরাধিকারী হন কিন্তু ভগ্ন স্বাস্থ্যের জন্য ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার ১৮ বৎসর বয়স্ক পুত্র হোসাইনের স্বপক্ষে পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন। দৃঢ় চিত্ত ও সাহসী বলিয়া পরিচিত হোসাইন প্রবল বাধাবিপত্তির মুখে দেশের ফিলিস্তিনী ও বেদুঈন লোকদের মধ্যে একটি সমঝোতার সৃষ্টি করেন। নাসেরের উত্থান ফিলিস্তিনীদের মনে নব আশার সঞ্চার করে। তাহারা নাসেরের মাধ্যমে ইসরাইলকে পরাজিত করিয়া তাহাদের হৃতদেশ পুনরুদ্ধার করিবার পথ খুঁজিয়া পায়। হোসাইনের অবস্থা সঙ্গীন আকার ধারণ করে। তিনি ইউ. এ. আর-এ যোগদান করিতে পারেন না, বা সিংহাসন ত্যাগ না করিয়া ইসরাইলের সহিত শান্তি স্থাপন করিতেও পারেন না। তিনি ইউ. এ. আর. কর্তৃক আক্রান্ত হইলে "প্রতিরক্ষামূলক" ব্যবস্থা হিসাবে ইসরাইল জর্দান নদীর পশ্চিম তীর দখল করিয়া লইতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র হইতে তাঁহার সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য লাভের ফলে ফিলিস্তিনী জাতীয়তাবাদীগণ সন্তুষ্ট হয় নাই, কিন্তু ইহা তাঁহার ক্ষমতায় থাকিবার ব্যাপারে সহায়তা করে। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে ইরাকী বিপ্লবের পর হোসাইন প্রকৃত হুমকির সম্মুখীন হন। তাই তিনি গ্রেট ব্রিটেনের নিকট আবেদন জানান, এবং আরব প্রতিবেশীদের হাত হইতে জর্দানকে রক্ষা করিবার জন্য প্রায় ২০০০ বৃটিশ সৈন্য আনয়ন করেন।

কাশেম ও নাসের

ইরাকের কাশেম জনগণের আশানুযায়ী প্যান-আরব বিপ্লবী বলিয়া প্রমাণিত হন নাই। আবার নাসের কর্তৃক অভিযুক্ত প্রতিক্রিয়াশীলও তিনি নহেন। কমিউনিষ্ট ও প্যান-আরব বামপন্থীদের একটি কোয়ালিশনের পুরোধা হিসাবে তিনি ক্ষমতায় আগমন করেন। তবে তিনি একজন ইরাকী জাতীয়তাবাদী, যিনি ইরাকের অ-প্যান-আরবপন্থীদের সাথে স্বদেশের সার্বভৌমত্ব ও সম্পদ নাসেরের সহিত ভাগাভাগি করিতে রাজী হন নাই। ক্ষমতায় আরোহণের ব্যাপারে তিনি বা'থপন্থী ও কমিউনিস্টদের ব্যবহার করেন এবং অতঃপর বা'থপন্থীদের হাত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য কমিউনিস্টদের ব্যবহার করেন। প্যান-আরব জাতীয়তাবাদীদের অন্যতম কর্ণেল আবদ আল-সালাম আরিফ ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের বিপ্লবের দুই দিন পর দামেস্কে নাসেরের সহিত জনগণের প্রশংসা কুড়ান। তিন মাস পর মৃত্যুদণ্ডাদেশ সহ তাঁহাকে বাগদাদ জেলে অবস্থান করিতে হয়।

প্রায় তিন বৎসর যাবৎ কমিউনিস্টগণ ইরাকে স্বাধীন থাকে। তাহাদের বেশ উত্তম সংগঠন ও অনেক প্রকাশ্য দল থাকে। তাহারা একটি প্রকাশ্য "গণ আদালত"ও প্রতিষ্ঠা করে এবং ইহাতে তাহারা প্রাক্তন সরকারের সদস্যদের বিচার করে। এই সব বিচারে ইউ. এ. আর.-এর প্রেসিডেন্ট নাসের সম্পর্কে অনেক বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করা হয়। ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে মোসুলে সংঘটিত একটি ইউ. এ. আর. সমর্থক কাশেম-বিরোধী বিপ্লব নৃশংসভাবে দমন করা হয়। কয়েক মাস পর কাশেমের জীবনের উপর একটি আক্রমণের জন্য মিসরের নাসেরকে দায়ী করা হয়। এই দুইয়ের মধ্যে শত্রুতা দিন দিন বৃদ্ধি পায়। প্যান-আরব জাতীয়তাবাদীগণ তাহাদের ঐক্যের লক্ষ্যে পৌঁছিবার উপক্রম হইলে সাধু-দর্শন ও সাধু-জীবন নির্বাহকারী জেনারেল কাশেম কমিউনিস্টদের সহায়তায় "ইরাক ইরাকীদের জন্য" এই ধুয়া উত্থাপন করে।

লেবাননে সমাধান

আরব ঐক্যের জন্য ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে একটি সঙ্কটাকীর্ণ বৎসর। এই বৎসর প্যান-আরবপন্থীগণ ইউ. এ. আর. প্রতিষ্ঠার কৃতিত্বে আনন্দ উপভোগ করে,

আবার এই ঐক্য ভাঙিয়া পড়িবার দুঃখও অনুভব করে। সর্বাগ্রে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পায় লেবানন। মার্কিন সৈন্যগণ কোন প্রকার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে নাই, কিন্তু তাহাদের উপস্থিতির ফলে গৃহযুদ্ধে বিরোধী পক্ষ চুপ হইয়া যায়। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের ৩১শে জুলাই পার্লামেণ্ট চেমনের উত্তরাধিকারী হিসাবে জনপ্রিয় জেনারেল ফুয়াদ শেহাবকে নির্বাচিত করে। নতুন প্রেসিডেণ্ট গৃহযুদ্ধে মুসলিম বিরোধী দলের নেতা রশীদ কারামীকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। সমসংখ্যক খ্রীস্টান ও মুসলমান লইয়া গঠিত একটি নতুন "উদ্ধারকারী মন্ত্রী সভা" পুনর্গঠন ও শান্তি স্থাপনের কাজ আরম্ভ করে।

ঘটনা পরম্পরা সম্ভবতঃ অধিকাংশ লেবাননীকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, আন্তঃআরব স্নায়ুযুদ্ধে তাহাদের দেশের পক্ষে 'নিরপেক্ষ' থাকাই শ্রেয়। মধ্যপ্রাচ্যের আরবদের জন্য একটি "নিরপেক্ষ সুইজারল্যাণ্ড" প্রয়োজন এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ইহার জনগণের অন্তর্নিহিত স্বভাবের দরুন একমাত্র লেবাননই সেই ভূমিকা পালন করিতে পারে। প্রাচীন ফুনিসিয়ান (Phoenician) বলিয়া গর্বিত লেবাননীগণ আন্তঃআরব প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণকারী হইবার চাইতে আরব জাহানের অর্থ বিষয়ক পরিচালনাকারী হিসাবেই ভাল করিতে পারে। লেবাননের অসংখ্য ব্যাংকে প্রায় সমস্ত আরব দেশেরই হিসাব (Account) রহিয়াছে, এবং ব্যাংকগুলিও এইসব দেশের অনেক শিল্প উন্নয়নে অর্থ প্রদান করিয়া থাকে। লেবানন অনেক সুবিধাদি উপভোগ করে। ইউরোপের বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি হইতে এই দেশে সমুদ্র ও বিমান উভয় পথে প্রবেশ করা যায়, এবং মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশসমূহে প্রায়ই বিদ্যমান বাণিজ্যিক বা অর্থবিষয়ক কোন জটিলতাও এখানে প্রায় নাই বলিলেই চলে। ফলে ইসরাইল ব্যতীত মধ্যপ্রাচ্যের সমস্ত দেশগুলিতে পুঁজি বিনিয়োগকারী প্রায় সমস্ত বিদেশী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অফিস লেবাননেও বিদ্যমান।

আরব দেশসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিবিদদের জন্য একটি নিরপেক্ষ লেবানন প্রয়োজন। সিরিয়া, ইরাক, ইয়েমান ও এমন কি সৌদী আরবে যতদিন বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব চলিতে থাকে, ঘটনাদৃষ্টে যেরূপ মনে হয় পরাজিত পক্ষের জন্য নিরাপদ স্থান প্রয়োজন এবং নিজেদের বিভেদ দূর করিবার

জন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রয়োজন একটি নিরপেক্ষ স্থান। পারস্য উপসাগর ও সৌদী আরবের তৈল-সমৃদ্ধ শেখগণ সুইজারল্যাণ্ডের চাইতে লেবাননকেই সুন্দর ও অধিক সুবিধাজনক মনে করেন। লেবাননের শীতল পর্বতে তাঁহারা তাঁহাদের সুরম্য প্রাসাদসমূহ নির্মাণ করেন এবং কোন দোভাষী ছাড়াই তাঁহারা ইউরোপের ভাল ও খারাপ জিনিসসমূহ উপভোগ করেন। বৈরুতের এক ডজনেরও অধিক দৈনিক পত্রিকাসমূহের প্রায় সবগুলিই কোন না কোন আরবদেশ কর্তৃক সাহায্যকৃত। লেবাননী পার্লামেণ্টের আসন ও মন্ত্রীসভায় মুসলমানদের সংখ্যা এইসব দলের নেতৃবৃন্দের সমান সুযোগের ইঙ্গিত বহন করে।

ইউ. এ. আর.-এর বিলুপ্তি

লেবানন একটি খাঁটি আরব দেশ নহে বলিয়া ইহার স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের প্রক্রিয়া অন্যান্যদের জন্য অনুকরণযোগ্য আদর্শ হয় নাই। ইরাকের জেনারেল কাশেম যেহেতু প্যান-আরব জাতীয়তাবাদী নহেন, তাই সিরিয়ার বা'থপন্থীগণ অসন্তুষ্ট ও হতবুদ্ধি হইয়া যায়। ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক উভয় দিক হইতে সিরিয়ার সহিত স্বাভাবিকভাবে ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে ইরাকের, মিসরের নহে। সিরিয়ার বা'থপন্থীগণ মিসরের নিকট ঐক্যের আবেদন জানায়, কারণ ইরাকের হাশেমীয় শাসকবৃন্দ নীতিগত-ভাবে তাহাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নহে। ইরাকী রাজতন্ত্রের পতনের ফলে ঐক্য আসে নাই এবং সিরীয়বাসীগণ সর্বদা নিজদিগকে মিসরের হাতে নিষ্পেষিত দেখিতে পায়। তাই তাহারা এই ঐক্যের উপকারিতা সম্পর্কে দ্বিতীয়বার চিন্তা করিতে আরম্ভ করে।

সিরিয়ার অন্যান্য দলসমূহ যথা, মধ্যমপন্থীগণ, রক্ষণশীল দল, সামরিক ও ছোট ছোট ব্যবসায়ীগণ ক্রমশঃ অনুধাবন করে যে ঐক্যের সমান অংশী-দার হইবার পরিবর্তে সিরিয়া মিসরের একটি প্রদেশে পরিণত হইতেছে। মিসরীয় চাহিদার উপর ভিত্তি করিয়া আরোপিত অর্থনৈতিক নিয়মকানুনে ব্যবসায়ী ও দোকানদারগণ দুর্ভোগে নিপতিত হয়। সেনাবাহিনী বিরক্ত হয়; কারণ ইহা ইউ. এ. আর.-এর ভাইস প্রেসিডেণ্ট হাকিম আমেরের নিয়ন্ত্রণে চলিয়া যায়। আমের সিরিয়ার নাসেরের শাসনকর্তা হিসাবে

কাজ করেন। ঐক্যের অতি উৎসাহী উদ্যোক্তা বা'থপন্থীগণই সর্বাধিক দুর্ভোগে পড়ে। তাহারা তাহাদের নিজস্ব দলসহ সমস্ত রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণার সিদ্ধান্ত মানিয়া লয় এবং বিশ্বস্ততার সহিত আশা করে যে ইউ. এ. আর.-এর নতুন ন্যাশনাল ইউনিয়ন পার্টি গঠন করিবার বেলায় তাহাদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হইবে। কিন্তু নাসের তাহাদিগকে সে সুযোগ দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। বস্তুতঃ ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচনে বা'থপন্থীগণ সম্পূর্ণভাবে সরকার হইতে বহিষ্কৃত হয়। সম্ভবতঃ কঠোরতম আঘাত আসে যখন নাসের জর্দান ও সৌদী আরবের ন্যায় প্রাক্তন শত্রুদের সহিত সহযোগিতা আরম্ভ করেন, যাহাদের বিরুদ্ধে নাসের ও বা'থপন্থীগণ উভয়েই অনেক প্রতিহিংসামূলক কাজ করিয়াছেন।

যে কারণেই হউক, নাসের সিরিয়া ও মিসরের মধ্যে বর্তমান কৃষি, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পার্থক্য বিবেচনা করেন নাই এবং সিরিয়ার উপর তাঁহার "আরব সমাজবাদ" চাপাইয়া দেন, যাহা মিসরীয় চাহিদা অনুযায়ী সৃষ্ট। অপর দিকে সিরিয়ার বা'থ মতবাদীগণ নাসেরের মৌলিকতা অনুধাবন করে নাই। নাসের ক্ষেত্রভেদে মতবাদমূলক আদর্শ স্থাপন করেন বা পরিহার করেন। নাসের কোন চ্যালেঞ্জ ছাড়াই ইরাকের নাসের-পন্থীদিগকে কাশেম কর্তৃক জেলে আবদ্ধ রাখিতে দেন নাই। আবার জর্দান ও সৌদী আরবের সাহায্য ছাড়া তিনি কাশেমকে চ্যালেঞ্জ করিতে পারেন না। ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দের গ্রীষ্মে নাসের জর্দানের সহিত কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং আরবের বাদশাহ্ সউদকে সম্মানিত অতিথি হিসাবে কায়রোয় অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। তদুপরি, অবস্থাদৃষ্টে মনে হয় সোভিয়েত ইউ-নিয়ন নাসেরের বিরুদ্ধে কাশেমের সহায়তা করেন ফলে নাসের যুক্তরাষ্ট্রের সহিত সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করিতে বাধ্য হন।

অবস্থা চরম আকার ধারণ করে ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের জুনে যখন কুয়েতের উপর ১৮৯৯ খ্রীস্টাব্দে চাপানো বৃটিশ হুকুমনামা উঠাইয়া লওয়া হয় এবং তৈলসমৃদ্ধ এই দেশকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই উপলক্ষে কাশেম কুয়েতকে ইরাকের অংশ বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ইহা অধিকার করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। কুয়েতের শাসক শেখ সঙ্গে সঙ্গে গ্রেট বৃটেনের সহিত স্বাক্ষরিত চুক্তি প্রয়োগের আহ্বান করেন

এবং বৃটিশ সৈন্য দ্বারা ইরাকের বিরুদ্ধে তাঁহার দেশ রক্ষার বন্দোবস্ত করেন। আদর্শগতভাবে একটি প্রকৃত আরব কর্তৃক একটি প্রতিক্রিয়াশীল শেখ শাসিত রাষ্ট্র করায়ত্ত করিবার এই প্রচেষ্টায় ইউ. এ. আর.-এর সমর্থন দান করিবার কথা। কিন্তু কাশেম নাসেরের পরম শত্রু এবং তাই তাঁহাকে এই কাজ করিতে দেওয়া যায় না। ফলে কাশেমের হাত হইতে কুয়েত রক্ষা করিবার ব্যাপারে নাসের কর্তৃক বৃটিশদের সহযোগিতা করিবার এই অসাধারণ ঘটনা আরবগণ অবলোকন করে। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে বৃটিশ সৈন্যগণ কুয়েত ত্যাগ করে এবং মিসর, জর্দান ও সৌদী আরবের সম্মিলিত সেনা-বাহিনী অপর এক আরব দেশের হাত হইতে কুয়েতের প্রতিরক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হয়।

মিসরবাসীগণ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর সিরীয় অফিসারগণ একটি বিপ্লব সংঘটিত করেন এবং ভাইস-প্রেসি-ডেন্ট আমের ও অন্যান্য মিসরীয় অফিসারবৃন্দকে সিরিয়া ত্যাগের আদেশ প্রদান করেন। নাসের এই বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করেন নাই এবং সিরিয়া ও মিসরের পৃথকীকরণ গ্রহণ করেন। বিপ্লবের নেতৃবৃন্দ একটি নির্বাচনের বন্দোবস্ত করেন; প্রায় সমস্ত পুরাতন দলসমূহ আসন লাভ করে (যদিও বা'থপন্থীগণ শুধু ১৮টি আসন লাভ করে) এবং ইউ. এ. আর.-এর প্রায় সমস্ত কার্যাবলী নাকচ করে। আরব ঐক্যের মনোভাব সিরিয়া তবুও ত্যাগ করে নাই। ইহা একটি জাতীয় ঐক্য দলিল (National Unity Charter) প্রণয়ন করে এবং একটি "স্বেচ্ছামূলক" সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র গঠনের সুপারিশ করে। আভ্যন্তরীণ দিক হইতেও ইহা তেমন পরিবর্তিত হয় নাই কারণ ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে সেখানে আর একটি বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহার নেতৃবৃন্দ ইউ. এ. আর.-এর কিছু কিছু সংস্কার পুনর্বহাল করিতে চেষ্টা করেন।

ইতিমধ্যে বা'থ দলের ইরাকী শাখা ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের ৮ই মার্চ কাশেমের বিরুদ্ধে একটি বিপ্লব করে, বিপ্লবের নেতা আবেদ আল-সালাম আরিফ, যাহার মৃত্যুদণ্ডাদেশ কাশেম রহিত করেন; কাশেম ও তাঁহার বামপন্থী সমর্থকদের মৃত্যুদণ্ড দান করেন। নাসের আরিফের নিকট তাঁহার অভিনন্দন বাণী প্রেরণ করেন। বা'থ পার্টির সিরীয় মন্ত্রণাদাতা মাইকেল আফলাক

তাঁহার ইরাকী সহকর্মীদের সহিত দীর্ঘ সভায় মিলিত হন। ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের ৮ই মার্চ সিরিয়ায় আর একটি বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং বহু সংখ্যক সামরিক অফিসার ক্ষমতায় আসেন, যাঁহারা বা'থপন্থী না হইলেও ইহার ভাবধারার প্রতি সহানুভূতিশীল। পুনরায় ইরাক, সিরিয়া ও মিসর এই তিনটি দেশ সংযুক্তির জন্য সভায় মিলিত হয় এবং প্রত্যেকটি সভা পরস্পরের বিরুদ্ধের অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগের ভিতর শেষ হয়। এতকিছু সত্ত্বেও মিসরীয়, ইরাকী ও সিরীয় নেতৃবৃন্দ সংযুক্তির কথা বলেন এবং স্ব স্ব পতাকার নক্সায় তিনটি তারকা অনুমোদন করেন।

নাসের ও আরব সমাজবাদ

পান-আরববাদের জন্য নাসের তাঁহার প্রচুর জীবনীশক্তি ব্যয় করেন এবং ইহার জন্য তিনি শুধু "ইউ. এ. আর." নামটি রাখিয়া যাইতে সক্ষম হন। এই নাম চালু রাখিবার উপর তিনি প্রবল জোর দেন, শুধু মাত্র লক্ষ্য প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একটা প্রতীক হিসাবে। তিনি অবশ্য স্বদেশের সংস্কার সাধন হইতে বিরত হন নাই। তিনি ও তাঁহার বন্ধুগণ কোন সুনির্দিষ্ট মতবাদের কর্মসূচী ছাড়াই ক্ষমতায় আসেন। ফলে কোন পূর্বনির্ধারিত মতবাদের গণ্ডির ভিতর তিনি আবদ্ধ ছিলেন না। যদিও বিভিন্ন কর্মসূচী তিনি গ্রহণ করিতে পারিতেন ও দিন দিন অবস্থার পরিবর্তন করিতে পারিতেন। সম্ভবতঃ ভারতের নেহেরুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ, যুগোশ্লাভিয়ার টিটোর সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব, তাঁহার সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর, সিরিয়ায় বা'থপন্থীদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক এবং সমস্ত উন্নয়নশীল দেশের সাধারণ চাহিদার দরুন তিনি সমাজতন্ত্রের অনুরূপ একটি কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে ভূমি সংস্কার দ্বারা তিনি ইহা সূচনা করেন। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে সুয়েজ খাল কোম্পানী ও অন্যান্য অনেক বিদেশী ব্যবসা জাতীয়করণ করা হইলে শিল্প সংস্থাসমূহ পরিচালনার জন্য সরকার একটি অর্থনৈতিক সংস্থা স্থাপন করে। অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে অর্থনৈতিক সংস্থা শিল্প, বাণিজ্যিক অর্থ'বিষয়ক ও কৃষি প্রতিষ্ঠানসমূহ পরিচালনা করিতে শুরু করে, বস্তুতঃ বিদেশী ব্যবসাসমূহ হাতে লইবার ফলে অর্থনৈতিক সংস্থা গঠন করিবার প্রয়োজন হইয়া পড়ে।

জাতীয় আয়ের ৫০ শতাংশ যেহেতু মাত্র দেড় শতাংশ লোকের হাতে

যায়, তাই নাসের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যথা, ব্যাঙ্ক, তুলা, সার, বীমা, লোহা, জনহিতকর কাজ, ইস্পাত ও কাপড় সমস্ত কিছু জাতীয়করণের আদেশ প্রদান করেন। শুধু ছোট শিল্পগুলি বেসরকারী লোকদের হাতে রাখিয়া দেন। সমস্ত বেতন সীমাবদ্ধ করা হয় এবং ১০০০ মিসরীয় পাউণ্ডের ঊর্ধে সমস্ত আয়ের উপর ৯০ শতাংশ কর ধার্য করা হয়। মাথাপিছু সর্বোচ্চ জমির মালিকানা নির্ধারিত হয় ২০০ হইতে ১০০ ফেদ্দানে। শ্রমিকদের উপকারার্থে বিশেষ আইন রচনা করা হয়। প্রত্যেকের একটির বেশী চাকুরী নিষিদ্ধ করিবার ফলে অনেক শিক্ষিত বেকারদের চাকুরির সংস্থান হয়।

বস্তুতঃ নাসেরের আমলের প্রথম দশ বৎসরের গৃহনির্মাণ, স্কুল, হাসপাতাল ও পঙ্গুদের জন্য আবাসগৃহ, সমাজ কল্যাণ কেন্দ্র ও কৃষি সমবায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মিসর গর্ব করিতে পারিত যাহা আর. সি. সি. (R.C.C.) ক্ষমতারোহনের পূর্বে অর্ধ শতাব্দীতেও হয় নাই। ১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দে নীল নদী ব্যবহারের ব্যাপারে মিসর ও সুদানের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, এবং উচ্চ আসোয়ান বাঁধ নির্মাণের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ৩০ কোটি ডলারের একটি ঋণ মঞ্জুর করে। মিসরে আর. সি. সি. প্রথম সরকার যে জনসংখ্যা সমস্যার উপর গভীরভাবে চিন্তা করে এবং পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রসমূহ স্থাপন করে। নিরক্ষরতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অন্যান্য আরও অসুবিধাদি বিরাজ করিলে সম্ভবতঃ এইসব সংস্কারাদি, এমন কি আসোয়ান বাঁধ নির্মাণ সমাপ্ত হইলেও জীবন যাত্রার মানে কোন পার্থক্য সূচিত হইবে না। কিন্তু জনসাধারণের উপর এইসব সংস্কারে মানসিক প্রতিক্রিয়া প্রবলভাবে দেখা দেয়, এবং মিসরীয়দের মিসর দেশ প্রগতির পথে যাত্রা শুরু করে।

ইয়ামানের ঘটনা

আরব জাহানে ইহার অবিসংবাদিত নেতৃত্ব এবং নাসেরের জনপ্রিয়তার দরুন মিসরকে সমগ্র আরবজাহানে সংঘটিত সমস্ত ঘটনাবলীতে জড়িত থাকিতে হয়। ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে ইয়ামানে সংঘটিত একটি সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে এক বিপ্লবী সরকার ক্ষমতায় আসে। নাসের এই বিপ্লবী সরকারকে সমর্থন দান করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ইয়ামানের ব্যাপারে নাসেরের "হস্তক্ষেপকে" তাঁহার সাম্রাজ্যবাদী নীতির অংশবিশেষ

বলা হয়ত ভুল হইবে। সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত ক্ষমতা প্রদর্শন ইহাতে ছিল, কিন্তু আরব ঐক্যের বিষয় চিন্তা করিলে, যাহাকে অধিকাংশ শিক্ষিত আরব একটি অতি আকাঙ্খিত 'বিষয়' বলিয়া বিবেচনা করে, সমগ্র আরবজাহানে যে কোন প্রগতিশীল আরব দেশের উচিত সর্বত্র সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনে সহায়তা করা।

ইয়ামান একটি নিভৃত দেশ। ১০০০ বৎসরেরও অধিককাল পর্যন্ত ইহা বহিঃপ্রভাব হইতে বঞ্চিত। জায়েদী শীয়া শাখার বংশানুক্রমিক ইমামগণ দ্বারা ধর্মতন্ত্র হিসাবে ইহা শাসিত হয়। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দের ইয়ামান আরবলীগে যোগদান করে এবং ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে ইহা জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে ফেডারেল ব্যবস্থায় ইয়ামান ইউ. এ. আর.-এ যোগদান করে। ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে ইউ. এ. আর. বিলুপ্ত হইলে নাসের ইয়ামানের সহিত ফেডারেল আকারে সংযুক্তি নাকচ করেন। এক বৎসর পর ইয়ামানে একটি বিপ্লব হয় এবং নাসেরকে ইহাতে উস্কানী প্রদানের দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। ইয়ামানে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। মিসর বিপ্লবী সরকারের পক্ষাবলম্বন করে এবং সৌদী আরব বহিষ্কৃত ইমামের সাহায্য করে। যুদ্ধ ছয় বৎসর স্থায়ী হয় এবং মিসর ইহার শক্তি এবং লক্ষ লক্ষ ডলার ইয়ামানে খরচ করিতে বাধ্য হয়। বিষয়টি জাতিসংঘে উত্থাপিত হয়, এবং মিসর ও সৌদী আরবকে গৃহযুদ্ধে হস্তক্ষেপ হইতে বিরত রাখিবার জন্য জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক দল প্রেরণ করে। কিন্তু ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে ইসরাইল আরব-দেশসমূহ আক্রমণ করিবার সময় শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হইলেও ইহার পরিসমাপ্তি ঘটে নাই।

আরব-ইসরাইল যুদ্ধ

১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দে ঐক্যের দ্বিতীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইলে মিসর ও ফারটাইল ক্রিসেন্টের আরব দেশসমূহ তাহাদের চিরাচরিত পন্থায় ফিরিয়া যায়। ইহার সাধারণ অর্থ হইল সিরিয়া ও ইরাকে একটির পর একটি এবং আরব নেতৃবৃন্দের মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধ। শুধুমাত্র ইসরাইলের বিরুদ্ধেই তাহারা ঐক্যমতে পৌঁছিতে সমর্থ হয়। যথারীতি সিরিয়াই অগ্রণী থাকে। তাহারা খাঁটি আরব এবং যে কোন দেশের চাইতে ইসরাইলের প্রবলতম বিরোধী বলিয়া দাবী করে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন মিসর ও সিরিয়াকে অস্ত্র প্রদান করে ; ফ্রান্স ইসরাইলের নিকট অস্ত্রশস্ত্র ও বিমান বিক্রয় করে, এবং যুক্তরাষ্ট্র জর্দান ও সৌদী আরবকে কিছু সামরিক সাজসরঞ্জাম প্রদান করে।

ইতিমধ্যে ইসরাইল আকাবা উপসাগরের আইলাত বন্দরের উন্নয়ন সাধন করে। আইলাত হইতে হাইফা পর্যন্ত সে একটি তৈলের পাইপ লাইন নির্মাণ করে, যাহার মধ্য দিয়া ইসরাইলের শিল্পসমূহে ব্যবহারের জন্য পারস্যের তৈল প্রবাহিত হয়। ইসরাইলের নিকট তেল বিক্রয়ে সম্মতি প্রদানের দায়ে মিসর ইরানের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। ইসরাইল জাতিসংঘের একটি নিষেধাজ্ঞাও ভঙ্গ করে এবং নেগেভ অঞ্চলে কৃষিকার্যের জন্য জর্দান নদীর পানির গতি পরিবর্তন করে।

এইসব কারণে এবং ইসরাইল ও তাহার আরব প্রতিবেশীদের কিছু অমীমাংসিত সমস্যার দরুন মাঝে মাঝে সংঘাত সৃষ্টি হয়। ইসরাইল ও মিসর সীমান্তে একটি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষক বাহিনী নিয়োজিত থাকিবার ফলে উভয়ের মধ্যে তেমন কোন সংঘর্ষ হয় নাই। জর্দানের নাজুক অবস্থার দরুন সে ইসরাইলের সহিত তেমন গোলমাল করিতে পারে না। ইসরাইলী বসতি এবং জাতিসংঘ কর্তৃক নির্ধারিত নিরপেক্ষ বা অসামরিক এলাকায় ইসরাইলী অনুপ্রবেশের উপর হামলা চালাইবার জন্য সিরিয়া খুবই সুবিধা-জনক অবস্থার অধিকারী। ইসরাইল মাঝে মাঝে প্রতিশোধ গ্রহণ করে, সিরিয়ার বিরুদ্ধে নহে, বরং সীমান্তের নির্দোষ জর্দানী গ্রামসমূহের বিরুদ্ধে। ইসরাইলের বিরুদ্ধে জর্দানের প্রতিশোধ গ্রহণের অসামর্থকে মিসর ও সিরিয়া হুসাইনের "ইসরাইল সমর্থক" নীতি বলিয়া সমালোচনা করে।

ইসরাইল সিরিয়ার অপরাধের জন্য জর্দানকে কেন শাস্তি দেয় তাহা নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। সিরিয়া ও মিসরের মধ্যে যেহেতু একটি পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি বিদ্যমান, তাই সম্ভবতঃ ইসরাইল ভয় করে পাছে সিরিয়াকে আক্রমণ করিলে মিসরও ইহাতে জড়াইয়া পড়ে। তদুপরি ফিলিস্তিনী মোহাজেরগণ একটি নির্বাসিত সরকার এবং একটি "ফিলিস্তিন মুক্তি ফৌজ" (Palestine Libaration Army) গঠন করিয়াছে। সিরিয়া ও গাজা অঞ্চলে এই মুক্তি ফৌজের প্রশিক্ষণ শিবির। ইসরাইল কর্তৃক জর্দান আক্রমণের ফলে এই ফৌজ জর্দানে আসিতে পারে এবং সেইক্ষেত্রে ইসরাইল

একটি "প্রতিরক্ষামূলক যুদ্ধ" চালাইবার এক ছুতা লাভ করে ও জর্দান নদীর পশ্চিম তীর সে অধিকার করিয়া লয়। এই ধরনের একটি লক্ষ্য হিরাত পার্টি সর্বদাই ব্যক্ত করিয়া আসিতেছে।

যাহাই হউক, অবস্থা উত্তরোত্তর ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই মে ইসরাইল ইহার উনবিংশ স্বাধীনতা বার্ষিকী পালন করে। এই উপলক্ষে সে জাতিসংঘের আপত্তির বিরুদ্ধে অ-সামরিকী জেরুজালেমে সামরিক কুচকাওয়াজের আয়োজন করে। ইসরাইলের প্রধান মন্ত্রী এসখল্ ইসরাইলীদিগকে অবস্থার ভয়াবহতা স্মরণ করাইয়া বলেন যে ইসরাইলের বিরুদ্ধে সিরিয়ার ক্রমবর্দ্ধমান উস্কানীর মোকাবিলা করিবার জন্য ইসরাইল "প্রয়োজনীয় প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে।" সিরিয়া ও গাজা অঞ্চলে প্রশিক্ষণরত বিভিন্ন কম্যাণ্ডো (গেরিলা) দলসমূহ ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার নির্দেশে তাহাদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা বৃদ্ধি করিয়া তোলে। জাতিসংঘ বাহিনীর পিছনে লুকায়িত থাকিবার জন্য সিরীয়গণ নাসেরকে টিটকারী করে। ১৭ই মে ইউ. এ. আর. সমস্ত জাতিসংঘ বাহিনীকে মিসরীয় ভূমি ত্যাগ করিবার অনুরোধ জানায়। জাতিসংঘের মহাসচিব উ থাণ্ট এই অনুরোধ পালন করিয়া মিসরীয় সৈন্যদিগকে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক বাহিনীর স্থলাভিষিক্ত হইতে এবং আকাবা উপসাগর ও তিরান প্রণালীর প্রবেশ-দ্বার নিয়ন্ত্রণকারী শাম আল-শেখ অধিকার করিবার অনুমতি দান করেন।

২২শে মে ইউ. এ. আর., ইসরাইলী জাহাজ ও ইসরাইলের জন্য সামরিক সাজসরঞ্জাম বহনকারী সমস্ত অ-ইসরাইলী জাহাজের জন্য আকাবা উপ-সাগর বন্ধ করিয়া দেয়। একটি আন্তর্জাতিক জলপথ বন্ধ করাটাকে ইসরাইল যুদ্ধাবস্থা বিবেচনা করে এবং সৈন্য মোতায়েন আরম্ভ করে। ৩০শে মে মিসর ও জর্দান ইহাদের যে কোন একটির উপর যে কোন হামলা প্রতিহত করিবার জন্য এক সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করে। ৩রা জুন লিবিয়া মিসরীয় বাহিনীর সহিত যোগদান করে এবং পরদিন ইরাক মিসরীয়-জর্দানী আঁতাতে অংশ গ্রহণ করে। ইসরাইলের বিরুদ্ধে বেড়ী এইভাবে সম্পূর্ণ হয়।

বৃহৎ শক্তিবর্গ মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ প্রত্যাশা করে না। কিন্তু সোভিয়েত ইউ-নিয়ন আরবদের প্রতি সহানুভূতিশীল; যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেন ইসরাইলের সহিত এই ব্যাপারে একমত হয় যে তিরান প্রণালী আন্তর্জাতিক; ফ্রান্স

এই বিবাদে ইহার নিরপেক্ষতা ঘোষণা করে। এমনকি মিসরও যুদ্ধ প্রত্যাশা করে কি না সন্দেহের বিষয়, কিন্তু ইসরাইল ইহার উপর বাজী রাখিতে পারে না।

১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দের ৫ই জুন সোমবার সকালে ইসরাইলী বিমান ও স্থল-বাহিনী আক্রমণ চালায় এবং সিনাই হইতে সিরিয়া এবং সমগ্র জর্দানী সীমান্তে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রায় দুই ঘণ্টার মধ্যে ইসরাইলী বিমানসমূহ মিসরীয়, সিরীয় ও জর্দানী বিমান বাহিনী ধ্বংস করিয়া ফেলে। অতঃপর সম্পূর্ণ বিমান আধিপত্যের সহায়তায় ইসরাইলী স্থল বাহিনীসমূহ সর্বত্র অগ্রসর হয়। সংক্ষিপ্ত ছয় দিনের মধ্যে ইসরাইলী সৈন্যগণ দক্ষিণে সুয়েজ খাল বরাবর, পূর্বে জর্দান নদী এবং উত্তর-পূর্বে গ্যালিলি হ্রদের বিপরীতে সিরীয় উচ্চভূমিতে দণ্ডায়মান হয়। তাহারা নয় জন মিসরীয় জেনারেল, তিন শতেরও অধিক অফিসার। হাজার হাজার যুদ্ধবন্দী এবং লক্ষ লক্ষ ডলার মূল্যের রুশ নির্মিত সামরিক সাজসরঞ্জাম অধিকাংশ অক্ষত অবস্থায় আটক করে। "ছয় দিনের যুদ্ধ" পুনরায় আরবদের অনৈক্য ও অক্ষমতা এবং ইসরাইলীদের 'ধৃষ্টতা ও একাগ্রতা প্রকাশ করে।' মার্কিন অর্থ, ফরাসী বিমান এবং ইসরাইলী বিমানচালকদের সাহসিকতা ও দক্ষতার দ্বারা ইসরাইল আরবদিগকে এক মারাত্মক আঘাত হানে।

একটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপঞ্জী

Agwani, M.S., ed. The Lebanese Crisis, 1958 : A Documentary Study. New York : Asia Publishing House, 1965.

Avery, Peter, Modern Iran. New York : Frederick A. Praeger, 1965.

Banani, Amin, The Modernization of Iran, 1921-1941. Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1961.

Ben-Gurion, David, Rebirth and Destiny of Israel. New York : Philosophical Library. 1953.

Binder, Leonard, Indealogical Revolution in the Middle East. New York : John Wiley & Sons, 1964.

Campbell, John C., Defense of the Middle East. New York : Frederick A. Praeger, 1960.

Cottam, Richard W., Nationalism in Iran. Pittsburgh : University of Pittsburgh Press, 1964.

Davis, Helen Miller, Constitutions, Electoral Laws, Treaties of States in the Near and Middle East. Durham, N. C. : Duke University Press, 1947.

Dickson, H. R. P., Kuwait and Her Neighbours. London : George Allen & Unwin Ltd. 1956.

Frye, Richard N., ed., Islam and the West. The Hague, Netherlands : Mouton, 1956.

Haim, Sylvia G., ed., Arab Nationalism. Berkeley, Calif. : University of California Press, 1962.

Harris, Christina Phelps, Nationalism and revolution in Egypt. The Hague, Netherlands : Mouton, 1964.

Harris, George L., Iraq, Its People, Its Society, its Culture. New Haven, Conn. : Human Relations Area Files Press, 1958.

Hay, Sir Rupert, The Persian Gulf States. Washington, D. C. : Middle East Institute, 1959.

Hitti, Philip K., History of Syria. London : Macmillan, 1951.

Lebanon in History. London : Macmillan, 1962.

Hourani, Albert H., Syria and Lebanon : A Political Essay. London : Oxford University Press, 1946.

Hurewitz, J. C., The Struggle for Palestine. W. W. Norton, New York : 1950.

Diplomacy in the Near and Middle East (Vol. II, 1914-1956.) Princeton, N. J. : D. Van Nostrand, 1956.

Issawi, Charles, Egypt in Revolution : An Economic Analysis. New York : Oxford University Press, 1963.

Khadduri, Majid, Independent Iraq : A Study in Iraqi Politics Since 1932. London : Oxford University Press, 1951.

Kinross, Lord, Ataturk. New York : William Morrow, 1965.

Lacqueur, Welter Z., The Soviet Union and the Middle East. New York : Frederik A. Praeger, 1959.

Middle East in Transition. New York : Frederick A. Praeger, 1958.

Lebkicher, Roy, Georg Rentz, and Max Steineke, The Arabia of Ibn Saud. New York : Russell F. Moore, 1952.

Lewis, Bernard, The Emergence of Modern Turkey. London : Oxford University Press, 1961.

Lewis, Geoffrey, Turkey. New York : Frederick A. Praeger, 1955. Lilienthal, Alfred, What Price Israel. Chicago : Henry Regnery, 1953.

Marlowe, John, The Persian Gulf in the Twentieth Century. London : The Cresset Press, 1962.

Nasser, Gamal Abd al-, The Philosophy of Revolution. Cairo. 1954.

Neguib, Mohammed, Egypt's Destiny. London : Victor Gollancz, 1955.

Pahlavi, Mohammed Reza Shah, My Mission for my Country. New York : McGraw Hill, 1961.

Patai, Raphael. The Kingdom of Jordan. Princeton, N.J. : Princeton University Press, 1958.

Peretz, Don. Israel and the Palestine Arabs. Washington, D. C. Middle East Institute, 1958.

Rivlin, Benjamin, and Joseph Szyliowicz, eds., The Contemporary Middle East. New York : Random House, 1965.

Sayegh, Fayez A., ed., The Dynamics of Neutralism in the Arab World. San Francisco : Chandler Publishing Co., 1964.

Shwadron, Benjamin, The Middle East Oil and Great Powers. New York : Frederick A. Praeger, 1956.

Smith, Wilfred C., Islam in Modern History. Princeton, N. J. : Princeton University Press, 1957.

Sparrow, Gerald, Modern Jordan. London : George Allen & Unwin Ltd., 1961.

Upton, Joseph M., The History of Modern Iran. Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1960.

Warriner, Doreen, Land and Poverty in the Middle East. New York : Oxford University Press, 1948.

Wenner, Manfred W., Modern Yemen. Baltiomore : Johns Hopkins University Press, 1967.

Weiker, Walter F., The Turkish Revolution, 1960-1961. Washington, D. C : Brookings Institution, 1964.

Weizmann, Chaim, Trial and Error. New York : Harper, 1949.

Winder, R. Bayly, Soudi Arabia in the Nineteenth Century. New York : St. Martins Press, 1965.

Zaideh, Nicola A., Syria and Labanon. New York : Frederick. A. Praeger, 1957.

পরিশিষ্ট

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ তাহাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে উত্তীর্ণ হইয়া সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে অবস্থান করে। অতি ক্ষমতাশালী সামরিক শক্তি হিসাবে মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল রাষ্ট্রের আবির্ভাব এবং ইহার সহিত মোকাবিলার দরুন আরবী-ভাষী লোকদের উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। ইসরাইল প্যালেস্টাইনের সমগ্র অঞ্চল, তৎসঙ্গে সমগ্র সিনাই উপদ্বীপ এবং সিরিয়ার গ্যালিলি হ্রদের বিপরীতে জাওলান জিলা (গোলান উচ্চভূমি) দখল করে। ইসরাইলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সে "পুরাতন" জেরুজালেম ও গোলান উচ্চভূমি অধিকার করে। আরবগণ শুধু ইসরাইলের অবস্থান স্বীকার করিতে রাজী হইলেই ইহা সরাসরি আরবদের সহিত বাকী অধিকৃত অঞ্চলের ভাগ্য লইয়া আলোচনা করিতে ইচ্ছুক। অপরদিকে আরবগণ তাহা করিতে রাজী,—প্রায় ২০ বৎসর ধরিয়া যাহা তাহারা অস্বীকার করিয়া আসিতেছে। অর্থাৎ ইসরাইলকে স্বীকৃতি প্রদান করা,—তবে যদি ইসরাইল ১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দের জুনের পূর্বের সীমানায় তাহাদের সৈন্য সরাইয়া লয়। ইসরাইলী-গণ ইহা পালন করিতে অস্বীকার করে। অধিকৃত ভূখণ্ডের আরব অধি-বাসীদের শাসন করা একটি ক্রমাগত সমস্যার বিষয় হইলেও অধিকৃত এলাকার কোন অংশ ইসরাইল ছাড়িবে কিনা সন্দেহের ব্যাপার। তাহা করিতে যাইয়া সে সুয়েজ খাল ও জর্দান নদীর ন্যায় সংক্ষিপ্ত ও সহজ প্রতি-রোধ্য সীমান্ত ত্যাগ করিয়া নেগেভ ও জর্দান নদীর পশ্চিম তীরের ন্যায় অপ্রতিরোধ্য সীমান্ত গ্রহণ করিবে।

আরব দেশসমূহের মধ্যে জর্দান ভূখণ্ড, অর্থনৈতিক উৎস এবং পর্যটন রাজস্ব খাতে সবচাইতে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইহা তাহার পুরাতন ট্রান্স জর্দান ভূখণ্ডে পরিণত হয়, যেখানে প্রায় কোন অর্থনৈতিক উৎসাহ নাই।

জর্দান নদীর পশ্চিম পারের লক্ষ লক্ষ আরব উদ্বাস্তুও তাহার ঘাড়ে আসিয়া পড়ে। জর্দান অর্থনৈতিক দিক হইতে সৌদী আরব এবং বিশেষতঃ কুয়েতের দান ও ঋণের উপর আরও নির্ভরশীল হইয়া পড়ে।

মিসরের ভূখণ্ড, সৈন্য ও যুদ্ধ সামগ্রী খাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ছাড়াও নাসের তাঁহার ব্যক্তিগত মর্যাদার দিক হইতেও ক্ষতিগ্রস্ত হন। মিসরে এবং আরব দেশসমূহে তাঁহার প্রকাশ্য সমালোচনা হয় এবং অনেক বিরুদ্ধ লোকের সৃষ্টি হয়। মিসর খালের রাজস্ব হইতেও বঞ্চিত হয়, কারণ ইসরাইলকে খালের মধ্য দিয়া অবাধ যাতায়াত করিতে না দিলে সে খাল খুলিতে দিতে নারাজ। তদুপরি, স্বল্প খরচে "জাম্বু" তৈলাধার তৈয়ার করিয়া অন্তরীপের পথে পারস্য উপসাগর হইতে ইউরোপের বন্দর সমূহে তৈল প্রেরণ করিবার ফলে সুয়েজ খালের আয় অনেক কমিয়া যায়। দুর্দশাগ্রস্ত অর্থনীতির দরুন মিসর প্রায় সম্পূর্ণভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়ে। ইসরাইলের ভয়ে মিসর সোভিয়েত নৌ-বাহিনীকে পোর্ট সৈয়দ ও আলেকজান্ড্রিয়ায় অবস্থান প্রদানে বাধ্য হয়। মিসরকে প্রদত্ত বিপুল সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্যের বিনিময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্ভবতঃ এই মূল্যই দাবী করে। সে যাহাই হউক ফলাফল একই—বিদেশী বিজয়ীগণ মিসরের ফারটাইল ক্রিসেন্টের প্রবেশদ্বার সিনাই অধিকার করে এবং মিসরীয় বন্দরসমূহে রুশ যুদ্ধ জাহাজসমূহ বাঁধা থাকে। যেখানে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজসমূহ অবস্থান করিত।

স্বাধীনতা ও সামাজিক পরিবর্তনের দ্বারা আরবদের মধ্যে তেমন বড় রকমের কোন ঐক্য স্থাপিত হয় নাই। ইসরাইলের সহিত "সম্মেলনের টেবিলে" বসিতে অসম্মত জ্ঞাপন করিবার ব্যাপারে তাহারা আপোষহীন, কিন্তু ইসরাইলের বিরুদ্ধে তাহাদের ঐক্য আরব নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিদ্যমান পারস্পরিক সন্দেহ ও ভীতি মোটেই দূরীভূত করে নাই। নিজেদের পার্থক্য ও মতানৈক্য সত্ত্বেও সময় তাহাদের স্বপক্ষে বলিয়া আরবগণ বিশ্বাস করে। তাহারা জোরের সহিত বলে যে এমন এক সময় আসিবে যখন আরবগণ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র শিক্ষা করিয়া দ্বাদশ শতাব্দীতে সালাউদ্দিন যে রূপ খ্রীস্টান ধর্ম-যোদ্ধাদিগকে (Crusaders) পরাজিত করিয়াছিলেন অনুরূপভাবে ইসরাইলকে পরাজিত করিবে।

মধ্যপ্রাচ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগ্রাম, তৎসঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মধ্যপ্রাচ্যের ব্যাপারে বৃহৎ শক্তিবর্গের আনুপাতিক ভূমিকার পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। গ্রেট বৃটেনের ক্ষমতা ও প্রভাব দ্রুত লয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এডেন অধিকারে রাখা বা পারস্য উপসাগরে নৌ-বাহিনী মোতায়েন রাখিবার অর্থনৈতিক বোঝা ইহা বহন করিতে সক্ষম নহে। এতদ্‌সত্ত্বেও জর্দান, সৌদী আরব এবং পারস্য উপসাগরের শেখ শাসিত রাজ্যগুলির সহিত ইহার চুক্তি সম্পর্ক বিদ্যমান এবং তাই ইহা এতদঞ্চলে কিছু প্রভাব বিস্তার করিতে এখনও সক্ষম।

ফ্রান্স অবস্থাভেদে ইসরাইল ও আরব দেশসমূহের মধ্যে উঠানামা করে। ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে মিসরের বিরুদ্ধে ইসরাইলের সহিত আঁতাত করিবার পর ফ্রান্স ইসরাইলের অন্ধ সমর্থক হিসাবে বিরাজ করে এবং তাহাকে অস্ত্রশস্ত্রও সরবরাহ করে। "ছয় দিনের যুদ্ধের" পর পরই ফ্রান্স হঠাৎ ইহার আনুগত্য পরিবর্তন করে এবং যুদ্ধপূর্ব সীমান্তে ইহার সৈন্য প্রত্যাহার না করিবার জন্য ইসরাইলের সমালোচনা করে। প্রেসিডেন্ট দ্য গলের এই কাজে কেউ কেউ বিরক্ত হয় এবং অনেকেই অবাক হয়। কিন্তু পরিণতিতে ইহা মধ্যপ্রাচ্যে সোভিয়েত রাশিয়া ও পশ্চিম ইউরোপের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করিবার ব্যাপারে সহায়তা করিতে পারে।

মধ্যপ্রাচ্যের আরবীভাষী দেশগুলির মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র এক রকম পক্ষাঘাত-গ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আভ্যন্তরীণ রাজনীতির দরুন যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলের নীতিমালা সমর্থন করিতে এইরূপ বাধ্য হইয়াছে যে, কোন কঠোর ভূমিকা পালন দূরে থাকুক, ইহা কোন পক্ষপাতহীন সিদ্ধান্তও লইতে পারে না।

মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন প্রভাব ঘাটতি হওয়ার অর্থ হইল সর্বদা না হইলেও সাধারণতঃ সমানুপাতিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়া। জার বা কমিউনিস্ট রাশিয়ার ইতিহাসের চিরাচরিত ভাবধারা হইল সেই দেশের সরকারের ভূমধ্যসাগর ও পারস্য উপসাগর এলাকায় ঘাঁটি রক্ষা করিবার আগ্রহ। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য রাশিয়া অপ্রতিহতভাবে তুর্কী প্রণালী নিয়ন্ত্রণ ও ইরানের উপর আধিপত্য লাভের প্রচেষ্টা চালায়। অবশ্য রুশগণ সেই উদ্দেশ্য সফলে ব্যর্থ হয় শুধু তুরস্ক ও ইরানের বাধা-বিপত্তির জন্য নহে বরং রুশ উদ্দেশ্যের ব্যাপারে পশ্চিম ইউরোপীয়

দেশসমূহের বিরোধিতার জন্যও বটে। ট্রুম্যান নীতিমালা এই পশ্চিম ইউরোপীয় নীতিরই পুনরাবৃত্তি মাত্র।

আরব জাহানে রুশ অনুপ্রবেশ আরম্ভ হয় ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে এবং তাহা বিশেষতঃ মিসর ও সিরিয়ায় জোরদার হইতে থাকে। ইতিহাসে প্রথম বারের মত ভূমধ্যসাগরে রুশ যুদ্ধ জাহাজসমূহ ঘাঁটি লাভ করে। সোভিয়েত রাশিয়া প্রণালীর উপর নিয়ন্ত্রণ বা ইরানের উপর আধিপত্য লাভ করে নাই। সম্ভবতঃ তুরস্ক বা ইরান ভূমধ্যসাগরের মধ্য দিয়া সোভিয়েত রাশিয়ার ছায়া তাহাদের উপর উল্লম্ফন ক্রীড়া করিবার ব্যাপারে সজাগ বলিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের সহিত বৈরী-নীতি অনুসরণ করে।

শেষ বিশ্লেষণে, মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহের অন্তর্নিহিত শক্তি মধ্যপ্রাচ্যে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের ক্ষমতা প্রদর্শনীতে নহে, বরং মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ তাহাদের অতীত সংস্কৃতির সহিত আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার সংমিশ্রণের গুণের উপর নির্ভর করে। এই সংমিশ্রণে প্রধান ভূমিকা পালন করিবে ইসলাম, যদিও ইহা প্রত্যেক দেশে সমান পরিমাণে নহে। মনস্তাত্ত্বিক দিক হইতে তুরস্ক প্রাচ্য হইতে মুখ ফিরাইয়া পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করে। প্রায় চল্লিশ বৎসর পর সে অনুভব করে যে অতীতের সবকিছু প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব নহে। সম্ভবতঃ পরবর্তী পঞ্চাশ বৎসরে সে এখনও বিদ্যমান অতীত আদর্শ পুনরায় গ্রহণ করিতে বা পুনরায় ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিবে।

ইরান একদিকে পাশ্চাত্যকে গ্রহণ করিতে যেরূপ ইতস্ততঃ করে নাই, অপর দিকে সে মধ্যপ্রাচ্য হইতে মুখ ফিরাইতেও রাজী হয় নাই। কখনও সুসঙ্গত ও কখনও অসঙ্গত আদর্শ হিসাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পাশাপাশি ইরানে অবস্থান করে। একটি সুস্পষ্ট সংমিশ্রণ হিসাবে গড়িয়া উঠা পর্যন্ত ইহা পরীক্ষাধীন থাকিবে এবং এই পর্যায়ে ইহা জ্ঞাতে ও অজ্ঞাতে অনেক ভুল-ভ্রান্তির সম্মুখীন হইবে।

আরব জাহানের একটি সাধারণ শ্রেণী বিন্যাস করা দুরূহ ব্যাপার, কারণ এখানে না আছে রাজনৈতিক ঐক্য, না আছে মতবাদমূলক সামঞ্জস্যতা। আরববাদের সহিত ইসলামের একটি বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান, যাহা তুর্কী বা পারস্য জাতীয়তাবাদের সহিত নাই। মোটের উপর হযরত মুহম্মদ (দঃ) একজন আরব, কোরান আরবী ভাষায় অবতীর্ণ হয় এবং প্যান-আরব

জাতীয়তাবাদীগণ মুসলিম সংস্কৃতিকে "আরব" সংস্কৃতি বলিয়া চিহ্নিত করে। সুতরাং কি ধরনের সংমিশ্রণ এখানে গড়িয়া উঠিবে তাহা নির্ণয় করিবার সময় এখনও আসে নাই।

মধ্যপ্রাচ্যের জনগণ, আরব, পারস্যবাসী ও তুর্কীগণ একটি অতি দ্রুত পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে বিরাজমান, এবং তাহারা নিজেরাও একটি রেনেসাঁ, ধর্মীয় সংস্কার, অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ, রাজনৈতিক পরিবর্তন ও সামাজিক বিপ্লবে জড়িত—সবগুলি একই সাথে। তাহারা এমন একটি পরিবারের ন্যায় যে ভিতরে ও বাহিরে আপন গৃহ পুনর্বিন্যাসে ব্যস্ত। তাহারা ইহাতে বাস করিতে চায়, বন্ধুবৎসলও হইতে চায়, আবার ইহাও কামনা করে যে, বন্ধুরা তাহাদের পুনর্বিন্যাসকৃত গৃহের স্থাপত্য শিল্পের প্রশংসা যেমন করুক ঠিক তেমনই তাহাদের পরিত্যক্ত আসবাবপত্রের প্রশংসা করুক—সবগুলি একই সাথে। সম্ভবতঃ এই কারণে ও অন্যান্য কারণে তাহারা বিশ্বে এমন সব দৃশ্য, মনোভাব, প্রত্যাশা ও আচরণ করে যেগুলিকে বহির্বিশ্বের লোকেরা মনে করে অবাস্তব, অকপট, একগুয়ে, গোঁড়া, নিষ্পাপ, যৌক্তিক ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ—সবগুলি একই সাথে।

গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর একটি কালপঞ্জী

৫৭০	হযরত মুহাম্মদের (সঃ) জন্ম।
৬২২	হিজরত।
৬৩২	হযরত মুহাম্মদের (সঃ) মৃত্যু।
৬৩৪	মুসলমানদের রাজ্য বিস্তার আরম্ভ।
৬৩৫	সিরিয়া বিজয়। কাদেশিয়ার যুদ্ধ।
৬৩৯	মিসর বিজয়।
৬৪০	ইরান বিজয়।
৬৫৩	কোরান প্রজ্জ্বলন।*
৬৫৬	মুসলমানদের গৃহযুদ্ধ। উষ্ট্রের যুদ্ধ।
৬৫৯	আলী হত্যা।
৬৬১	উমাইয়া বংশের ক্ষমতায় আগমন।
৬৮০	কারবালায় হোসাইনের মৃত্যু।
৭১১	স্পেন ও সিন্ধু বিজয়।
৭৫০	উমাইয়া বংশের পতন ও আব্বাসীয় বংশের উত্থান।
৭৫৪	আবু মুসলিম খোরাসানীর হত্যা।
৭৬৭	হানাফী মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা আবু হানিফার মৃত্যু।
৭৯৫	মালেকী মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা, মালেক ইবনে আনাসের মৃত্যু।
৮১৩	মামুন কর্তৃক অনুবাদ সংস্থা প্রতিষ্ঠা।

* কোরান প্রজ্জ্বলনের ব্যাপারে মতভেদ রহিয়াছে। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতানুসারে তৃতীয় খলীফা ওসমান কোরানের হেজাজী সংকলনকে আদর্শ সংকলনরূপে নির্ধারণ করেন। অন্যান্য সংকলনগুলিকে তিনি জ্বালাইয়া দেন। উল্লেখ করা যাইতে পারে যে হেজাজী সংকলনেই কোরান অবতীর্ণ হয়।

—অনুবাদক।

৮২০	শাফেয়ী মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা মুহম্মদ ইবনে ইদ্রিস আল শাফেয়ীর মৃত্যু।
৮৩৩	তুর্কীদের আগমন।
৮৫০	হাম্বলী মযহাবের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ ইবনে হাম্বলের মৃত্যু। ক্ষুদ্র রাজ্য যুগের আরম্ভ।
৯১০	মিসরে ফাতেমীয় বংশ প্রতিষ্ঠা।
৯৫০	দার্শনিক ফারাবীর মৃত্যু।
৯৫৬	ঐতিহাসিক মাসুদীর মৃত্যু।
৯৭২	কায়রোতে আজহার বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত।
১০৩৭	চিকিৎসাবিদ ও দার্শনিক ইবনে সিনার মৃত্যু।
১০৪৮	গণিতশাস্ত্রবিদ বিরুনীর মৃত্যু।
১০৫৫	সেলজুকদের আগমন।
১০৭১	মাঞ্জিকার্তের যুদ্ধ।
১০৯৯	জেরুজালেমে ক্রুসেডারগণ (খ্রীস্টান ধর্মযোদ্ধা)।
১১৩৭	সেলজুকদের পতন।
১১৭১	ফাতেমীয় বংশের পতন।
১১৮৭	হিত্তিনের যুদ্ধ, সালাউদ্দীন কর্তৃক ক্রুসেডারদের পরাজয়।
১২২০	চেঙ্গিস খানের অগ্রাভিযান।
১২৫২	মিসরে মামলুক শাসনের শুরু।
১২৫৮	বাগদাদের পতন। আব্বাসীয় বংশের পরিসমাপ্তি।
১২৬০	মামলুকগণ কর্তৃক মোঙ্গলদের পরাজয়।
১২৭৩	সুফী জামাল আল-দ্বীনের মৃত্যু।
সি.এ. ১৩০০	ওসমানীয় সাম্রাজ্যের শুরু।
১৩২৪	মার্কোপোলোর মৃত্যু।
১৩৬৯	তৈমুরলঙের আগমন।
১৩৮৯	কসোভার যুদ্ধ।
১৪০২	তৈমুরলঙ কর্তৃক বায়েজীদের পরাজয়।
১৪০৬	সামাজিক ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের মৃত্যু

১৪৫৩	কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন। ✓
১৫০০	সাফাভীয় সাম্রাজ্যের শুরু।
১৫০৭	পারস্য উপসাগরে পর্তুগীজদের আগমন। ✓
১৫১৪	কলড্রনের যুদ্ধ।
১৫১৭	ওসমানীয়দের ফারটাইল ক্রিসেণ্ট বিজয়।
১৫৯১	বৃটিশদের পারস্য উপসাগরে প্রবেশ।
১৫৯৯	ইউরোপীয় রাজধানীসমূহে পারস্যের প্রতিনিধিদল।
১৬৫৬	মুহাম্মদ কপরুলুর প্রধান মন্ত্রীর পদলাভ।
১৬৫৭	তুর্কী ঐতিহাসিক হাজী খলীফার মৃত্যু। ✓
১৬৮৩	তুর্কীদের ভিয়েনা অভিমুখে অগ্রসর।
১৬৯৯	কার্লোভিজের শান্তি চুক্তি।
১৭১৮	প্যাসরোভিজের শান্তি চুক্তি।
১৭২২	সাফাভীয়দের পতন।
১৭৩৯	নাদির শাহের দিল্লী অধিকার। ✓
১৭৫৭	ওয়াহাবী মতবাদের আগমন।
১৭৭৪	কুচুক কাইনার্জির চুক্তি।
১৭৮০	ইরানে কাজারদের উত্থান।
১৭৮৯	মিসরে নেপোলিয়ন।
১৭৯৫	তুরস্কে নিজাম-ই-জাদীদ
১৮১১	মামলুকদের পতন।
১৮১৪	এ্যাংলো-পার্সীয়ান ডেফিসিটিভ চুক্তি।
১৮২৬	জান-নিসারীদের পরিসমাপ্তি।
১৮২৮	তুর্কম্যান চাই চুক্তি।
১৮৩১	মিসর কর্তৃক সিরিয়া বিজয়।
১৮৩৯	তুরস্কে হাত্তি শরীফ।
১৮৪০	মিসরে মোহাম্মদ আলী বংশের প্রতিষ্ঠা।
১৮৪৪	ইরানে বাবের আবির্ভাব।
১৮৫১	ইরানে দারুল ফনুন প্রতিষ্ঠানের উদ্বোধন।
১৮৫৩	ক্রিমিয়ায় যুদ্ধ। সুয়েজ খাল কোম্পানী গঠিত।

১৮৫৬	তুরস্কে হাত্তি হুমায়ুন।
১৮৬০	দ্রোজ-ম্যারোনাইটদের যুদ্ধ।
১৮৬২	ওসমানীয় সাইন্টিফিক সোসাইটি, ইব্রাহীম শিনাসী।
১৮৬৯	সুয়েজ খাল খনন সমাপ্ত।
১৮৮২	বৃটিশ কর্তৃক মিসর দখল।
১৮৮৭	তুরস্কের নমিক কামালের মৃত্যু।
১৮৮৮	সুয়েজ খালের উপর কনস্ট্যান্টিনোপল সম্মেলন (Constantinople Convention)।
১৮৮৯	তুরস্কে কমিটি অব ইউনিয়ন এণ্ড প্রোগ্রেস।
১৮৯০	ইরানে তামাকের কনসেশন।
১৮৯৪	তুরস্কে আর্মেনিয়ার হত্যালীলা।
১৮৯৭	প্রথম বিশ্ব ইহুদীবাদী সম্মেলন।
১৮৯৮	নাসির আল দীন শাহ কাজার নিহত।
১৯০৬	ইরানে শাসনতন্ত্র প্রদান।
১৯০৭	ইরান বিভক্তিকরণে ইঙ্গ-রুশ চুক্তি।
১৯০৮	নব্যতুর্কী বিপ্লব।
১৯১১	ইরান হইতে শুসতার বহিষ্কৃত।
১৯১৫	হোসাইন-ম্যাকমাহন পত্রালাপ।
১৯১৬	সাইক্‌স্-পিকট চুক্তি।
১৯১৭	বালফার ঘোষণা।
১৯১৮	দামেস্কে ফরাসী বাহিনীর প্রবেশ।
১৯১৯	গোপন ইঙ্গ-পারস্য চুক্তি। সামসুনে আতাতুর্কের অবতরণ।
১৯২০	স্যান-রেমো চুক্তি। সিরিয়া হইতে ফয়সল বহিষ্কৃত। স্যাভরসের চুক্তি।
১৯২১	ইরানে রেজাখান কর্তৃক সামরিক অভ্যুত্থান, ইরাকের রাজা হিসাবে কামাল, ট্রান্স জর্দান প্রতিষ্ঠা। প্যালেস্টাইনে প্রথম ইহুদীবাদ বিরোধী উত্থান।
১৯২২	গ্রীকদের উপর তুর্কী বিজয়। ইরানে মিলসপ্যাক মিশন।

১৯২৩	লুজ্যানে চুক্তি। রেজা খান কর্তৃক ইরানের প্রধান মন্ত্রীত্ব গ্রহণ। তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের রূপ লাভ।
১৯২৪	আরবে ইবনে সউদের উত্থান। খিলাফতের পরিসমাপ্তি।
১৯২৫	ইরানের শাহরূপে রেজা পাহলভী।
১৯২৩—১৯৩৯	ইরান এবং তুরস্কের সংস্কার আন্দোলন।
১৯৩৩	নতুন ইঙ্গ-পারস্য তৈলচুক্তি।
১৯৩৬	প্রণালীর উপর মন্ট্রু কনভেনশন।
১৯৩৭	আফগানিস্থান, ইরান, ইরাক এবং তুরস্কের মধ্যে সা'দাবাদ চুক্তি।
১৯৩৮	আতাতুর্কের মৃত্যু। ট্রান্স-ইরানীয়ান রেলপথের নির্মাণ কার্য পরিসমাপ্তি।
১৯৩৯	প্যালেস্টাইনের উপর বৃটিশ শ্বেতপত্র।
১৯৪১	মিত্রপক্ষের ইরানে প্রবেশ। রেজা শাহের সিংহাসন ত্যাগ। ইরাকে খিলানীর অভ্যুত্থান। বৃটিশ কর্তৃক ইরাক, সিরিয়া এবং লেবানন দখল।
১৯৪২	ইহুদীবাদীদের বিল্টমোর পরিকল্পনা।
১৯৪৪	আরব লীগ গঠিত।
১৯৪৫	আজারবাইজানের বিচ্ছিন্নবাদী আন্দোলন।
১৯৪৬	লাল ফৌজের ইরান ত্যাগ। প্যালেস্টাইনের উপর ইঙ্গ-মার্কিন কমিশন।
১৯৪৭	ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। ট্রুম্যান মতবাদ
১৯৪৮	আরব-ইসরাইল যুদ্ধ।
১৯৫০	তুরস্কে একদলীয় শাসনের অবসান।
১৯৫১	তুরস্কের ন্যাটোর সদস্যপদ লাভ। ইরান কর্তৃক তৈল জাতীয়করণ।
১৯৫২	মিসরে নাসেরের অভ্যুত্থান।
১৯৫৩	ইরানে ডঃ মোসাদ্দেকের পতন।
১৯৫৪	বৃটিশ কর্তৃক মিসর ত্যাগ।

১৯৫৬	সুয়েজ খাল কোম্পানী জাতীয়করণ। ইঙ্গ-ফরাসী-ইসরাইলী মিসরের উপর আক্রমণ।
১৯৫৭	আইসেন হাওয়ার মতবাদ।
১৯৫৮	মিসর ও সিরিয়ার সংযুক্তি। ইরাকে হাশেমীয় বংশের পরিসমাপ্তি।
১৯৬০	তুরস্কে সামরিক অভ্যুত্থান।
১৯৬১	দ্বিতীয় তুরস্ক প্রজাতন্ত্র। সিরিয়া-মিসর সংযুক্তির অবসান
১৯৬২	ইয়েমেনে সামরিক অভ্যুত্থান।
১৯৬৩	ইরানে শ্বেত বিপ্লবের সূচনা।
১৯৬৭	আরব-ইসরাইল যুদ্ধ। ইরানের শাহের অভিষেক।
১৯৭০	প্রেসিডেন্ট নাসেরের মৃত্যু। মিসরের নতুন প্রেসিডেন্ট হিসাবে আনোয়ার সাদাত।
১৯৭১	পাকিস্তানের অখণ্ডতা বিনষ্ট। নতুন মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশের অভ্যুদয়।
১৯৭৩	আরব-ইসরাইলী যুদ্ধ। আফগানিস্তানের বাদশাহ জহির শাহের পতন। সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে দাউদ শাহের ক্ষমতা দখল।
১৯৭৪	ইসলামী কনফারেন্স প্রতিষ্ঠা।
১৯৭৫	মুসলিম বিশ্বে নব চেতনার উন্মেষ।
১৯৭৬	সউদী আরবের বাদশাহ ফয়সল ইবনে আবদ-আল-আজিজ আততায়ীর গুলীতে নিহত। খালেদ ইবনে আবদ আল আজিজের ক্ষমতারোহন।
১৯৭৭	মিসরের প্রেসিডেন্টের শান্তি মিশনে জেরুজালেম গমন এবং ইসরাইলী পার্লামেন্টে ভাষণ দান।
১৯৭৮	দক্ষিণ লেবাননের ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তু শিবিরে ইসরাইলী সর্বাত্মক হামলা এবং লিতানি নদী পর্যন্ত এলাকা দখল। আফগানিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান ও দাউদ শাহের পতন। নূর মোহাম্মদ তারাকির ক্ষমতারোহন।

নির্ঘণ্ট